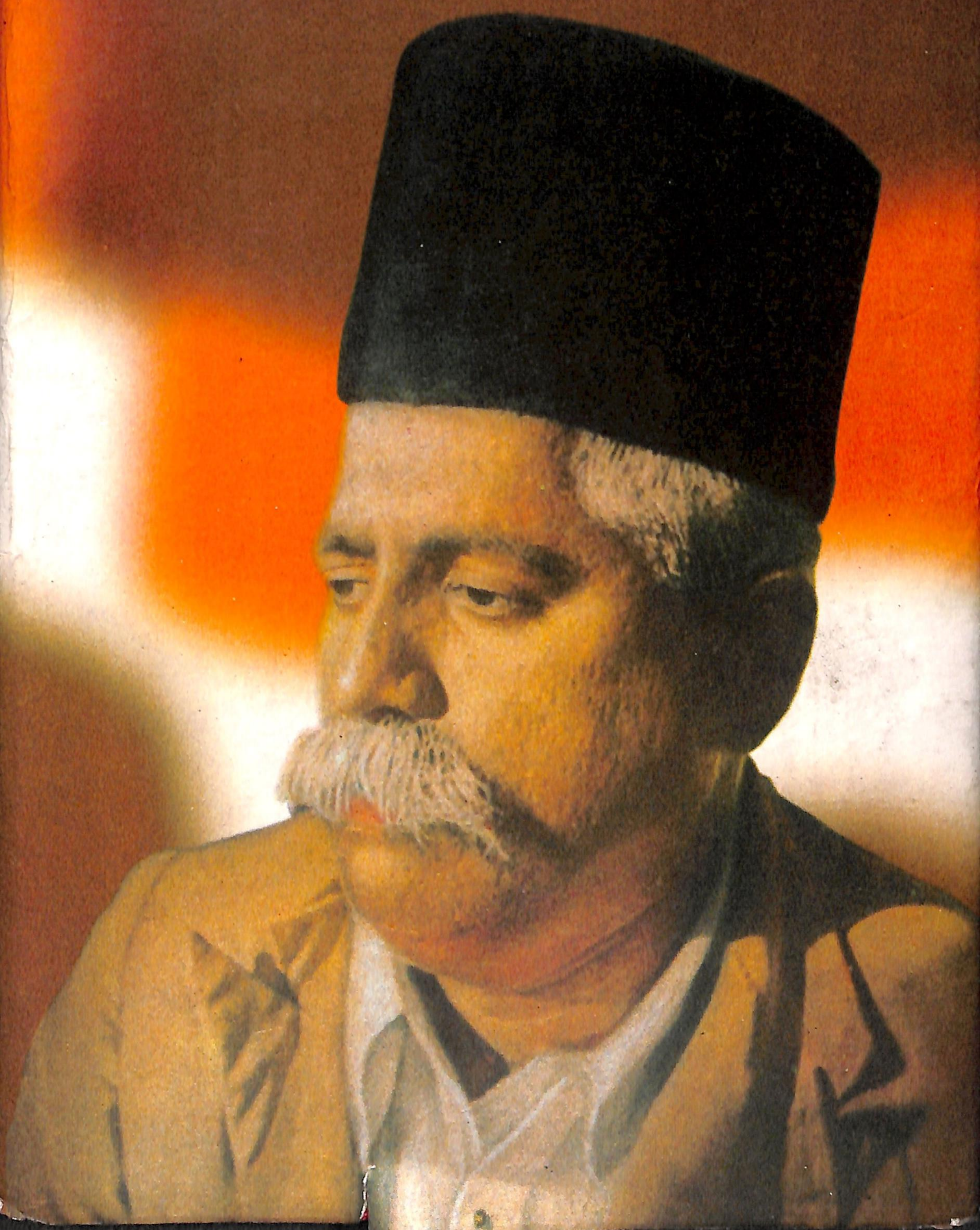
ডাঃ হেডগেওয়ার

জীবন চরিত



ডাঃ হেডগেওয়ার

জীবন চরিত

লেখক

নারায়ণ হরি পালকর

অনুবাদক

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক

ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতি

ডাঃ হেডগেওয়ার

জীবন চরিত

প্রকাশক ঃ

"ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতি"

কেশব ভবন, ৯এ, অভেদানন্দ রোড

কলকাতা—৭০০ ০০৬

এর পক্ষে

শ্রী শম্ভুনাথ ধাড়া

কর্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ ঃ

বিজয়া দশমী

যুগাব্দ ঃ ৫১০৩

বঙ্গাব্দ ঃ ১৪০৮

মূল্য ঃ ১০০'০০

এক শত টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ

শ্রী নেপাল চন্দ্র ঘোষ

বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স

৫৭-এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন

কলকাতা - ৭০০০০৬

প্রস্তাবনা

পরমপূজনীয় ডাঃ হেডগেওয়ারজীর কিছুটা বিস্তারিতভাবে লেখা জীবনচরিত প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর মৃত্যুর কিছু দিনের মধ্যেই পাঠকদের সম্মুখে তাঁর জীবনের কিছুটা উন্মোচনের জন্য একটি জীবনচরিত প্রকাশিত হয়েছিল। প্রঃ পূঃ ডাক্তারজীর জীবন এবং চিন্তাধারা সম্পর্কে সংক্ষেপে জানাবার জন্যই সেটি রচিত হয়েছিল। সেই উদ্দেশ্য খানিকটা পূরণও হচ্ছিল। কিন্তু ডাক্তারজীকে যাঁরা জানতেন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা রাখতেন এমন অনেক বন্ধু সারা দেশে ছড়িয়ে আছেন। ঐ ক্ষুদ্র পুস্তকের দ্বারা তাঁদের তৃপ্তি হওয়া সম্ভব ছিল না। অতএব, অনেকেরই আগ্রহপূর্বক দাবী ছিল যে একটি বিস্তারিত জীবনচরিত প্রকাশ করা হোক। এই গ্রন্থটি তাঁদেরই আগ্রহের ফলশ্রুতি।

এই গ্রন্থের লেখক শ্রী নানা পালকর ছোটবেলা থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নিষ্ঠাবান্ স্বয়ংসেবক। তাঁর মনে পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সমাদরের ভাব রয়েছে। রচনাশৈলীতেও তিনি পটু। এই কষ্টসাধ্য কাজ তাঁকে সমর্পণ করা হলে সেটা যে সুষ্ঠুভাবে পূর্ণ হবে সেই বিশ্বাস নিয়েই তাঁর উপরে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। যে সকল ব্যক্তি অথবা কার্যের সঙ্গে পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর সম্পর্কের কথা তিনি জানতে পারেন সেই সব স্থানে গিয়ে তিনি সেই সকল ব্যক্তি এবং কার্য সম্পর্কে যতখানি তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব, তা একত্রিত করে, যথাযথভাবে সাজিয়ে অত্যন্ত পরিশ্রম করে তিনি এই গ্রন্থের রচনা করেছেন।

গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যাপারে যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলির উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন নেই। তবু কয়েকটি প্রধান কথার উল্লেখ করা অসঙ্গত হবে না। সব থেকে প্রধান বাধা ছিল জীবনচরিতের নায়কের প্রসিদ্ধি-পরাঙ্মুখতা। অতএব, স্বয়ং তাঁর কাছ থেকে তাঁর জীবন সম্বন্ধে সহজেই কিছু জেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এই গুণের কারণে সংবাদপত্রগুলিতে তাঁর বিষয়ে খুব সামান্যই উল্লেখ করা হত। তিনি নিজের কাছেও প্রায় কিছুই লিখে রেখে যাননি। স্বীকৃত কার্যেই আজীবন লীন হয়ে থাকার দরুন এবং কাজের মধ্যেই নিজের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে বিলীন করে দেওয়ার ফলে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের 'আত্মচরিত' লেখার কল্পনা এবং সেজন্য কিছু টিপ্পনী লিখে রাখার চিন্তা তাঁর স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। তাছাড়া, তাঁর জীবনের প্রথম অংশ বিপ্লবী কাজে অতিবাহিত হয়েছিল, অতএব বিদেশী শাসকদের শকুনের দৃষ্টি থেকে নিজেকে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের বিষয়ে জ্ঞাতব্য গোপন করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করাও আবশ্যক ছিল। ফলস্বরূপ এই সতর্কতার কারণে নিজের অস্তিত্বকেই সম্পূর্ণ অগোচর-প্রায় করে রাখার যেন স্বভাবই তিনি তৈরী করে নিয়েছিলেন।

তাঁর বিবিধ গতিবিধির সঙ্গে যুক্ত অনেক সহযোগী কিছু তথ্য জানাতে পারতেন কিন্তু এই গ্রন্থ লেখার মত প্রয়োজনীয় অনুকূল পরিস্থিতি তাঁর ইহলোক ত্যাগের প্রায় কুড়ি বছর পরে তৈরী হয়েছে এবং এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যেও অনেকেই ইহলীলা সম্বরণ করেছেন। এইরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁর জীবন সম্বন্ধে অতি অল্প জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বল করে আনুমানিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তথাপি তাঁর যে সমস্ত সহযোগী মিত্র অথবা পরিচিত ব্যক্তি সৌভাগ্যক্রমে জীবিত ছিলেন বা আছেন এবং তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু উল্লেখ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে সেইগুলিকে সংগ্রহ করে লেখক এই সুসংবদ্ধ তথা প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। দীর্ঘকাল ধরে একটি মাত্র চিন্তা নিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চারিদিকে ছুটোছুটি করে সম্পূর্ণ সামগ্রী একত্র করার জন্য তাঁকে যে কত শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, তার শুধু কল্পনাই করা যেতে পারে।

অবশ্য এ কথা বলা কঠিন যে পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর পরিপূর্ণ চিত্রণ এই গ্রন্থে করা হয়েছে। অনেক ছোট-খাট ঘটনা অনেকেরই স্মৃতিপট থেকে মুছে গেছে। সেই কারণে তাঁর স্বভাব ও গুণাবলীর দিগ্‌দর্শনের সম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আর কোন উপায় না থাকায় এই চরিতকথা থেকেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর কষ্টপূর্ণ, পরিশ্রমী এবং কর্মঠ জীবন থেকে সর্বসাধারণ ব্যক্তি একটি আশাপ্রদ বার্তা লাভ করে। "দারিদ্র্য, প্রসিদ্ধিবিহীনতা, বড়দের উদাসীনতা, পরিস্থিতির প্রতিকূলতা, পদে পদে বাধা, বিরোধিতা, উপেক্ষা, উপহাস ইত্যাদির তিক্ত অনুভূতির সাথে-সাথে স্বীকৃত কার্যের পূর্তির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও উপায়ের অত্যন্ত অভাব প্রভৃতি যত বাধাই আসুক তথাপি নিজ কার্যের সঙ্গে তন্ময় হয়ে "মুক্তসংগোঽনহংবাদী ..." এই মানসিকতা নিয়ে সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, যশ-অপযশ ইত্যাদি কোন কিছুর চিন্তা না করে যদি কেউ প্রচেষ্টারত থাকে তাহলে সে অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে।" পূর্বে প্রকাশিত ডাক্তারজীর ছোট জীবনচরিতের প্রারম্ভে "ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সত্ত্বে ভবতি মহতাং নোপকরণে" যে সুভাষিত দেওয়া হয়েছে সেটা তাঁর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। বরং বলা যায় যে তাঁর সম্পূর্ণ জীবনই এই উক্তিটির মূর্তিমান উদাহরণ। যারা নিজেদের গার্হস্থ্য জীবনে কাজকর্মে হতাশ হয়ে হাত-পা ছেড়ে বসে পড়ে, কোন সামাজিক কাজ করার সময়ে যারা বাধা-বিপত্তিতে সন্ত্রস্ত হয়ে নিরাশার ফলে কার্যবিমুখ হয়ে পড়ে, তারাও এই পবিত্র জীবন থেকে আশার বার্তা প্রাপ্ত হয়ে সর্বদাই কার্যরত থাকার প্রেরণা লাভ করবে।

এই রকম প্রেরণাদায়ক জীবনের কয়েকটি উদ্দীপক গুণ ও নীতিসমূহকে নিজ জীবনেও স্থান দেওয়া মঙ্গলজনক বিধায় কয়েকটি প্রধান বিষয়ের এখানে উল্লেখ উপযুক্ত হবে। তাঁর সর্বপ্রথম উল্লেখনীয় গুণ হল তাঁর মনে রাষ্ট্র-বিমোচন এবং রাষ্ট্রোন্নতির সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। তাঁর হৃদয়ে রাষ্ট্রভক্তির এই ভাব বাহ্য পরিস্থিতির দরুন উৎপন্ন হয়নি, অপিচ এটাই ছিল তাঁর সহজাত স্থায়ী স্বভাব। শৈশব থেকেই তা প্রকট হত। তৎকালীন ইংরাজ শাসনের দাসত্বের কারণে এক বিশিষ্ট রূপে তাঁর রাষ্ট্রভক্তির আবির্ভাব ঘটা ছিল অপরিহার্য। যে কোন উপায়ে

বিদেশী শাসনকে দেশ থেকে নির্মূল করে ফেলতে হবে। তাঁর এই ইচ্ছা এইরূপ প্রখর রাষ্ট্রভক্তি থেকেই জন্মলাভ করেছিল। অন্তঃকরণের মধ্যে নির্ভয় পৌরুষের ভাব থাকার ফলে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু অন্য পন্থাগুলির সমাদর না করার মত ক্ষুদ্রতা তাঁর মধ্যে ছিল না। তাঁর উদাত্ত ভূমিকা ছিল এই যে "সকলেই নিজ-নিজ পন্থায় বিদেশী সত্তাকে নির্মূল করার জন্য প্রযত্নশীল হোক, তার মধ্যে বিচিত্র কিছু নেই, শুধুমাত্র নিজের পন্থার জেদ বজায় রেখে অন্য সকল প্রকারে যারা কাজ করছে তাদের হীন ও হেয় না মনে করে সকলের মধ্যে যতখানি সম্ভব সহযোগিতা বজায় থাকুক।" বর্তমানের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বিভিন্ন দলের ঈর্ষা-দ্বেষের পরিপ্রেক্ষিতে বড়-বড় মানুষরাও একথা বুঝতে পারবেন যে ডাক্তারজীর জীবনের এই নীতিকে নিজ অন্তঃকরণে ধারণ করে সর্বজনীন জীবনে সহকারিতা, মেলামেশা এবং পরস্পর পরিপূরকতার বায়ুমণ্ডল নির্মাণ করার প্রয়াস কতখানি প্রয়োজন।

নিজের উগ্র স্বভাবের দরুন সশস্ত্র প্রতিকার তিনি পছন্দ করতেন, তা সত্ত্বেও তার মূলে রাষ্ট্রভক্তিরই প্রেরণা থাকায় ইংরাজ বিদেশী, শত্রু এবং শোষক হলেও শুধু তাদের বিরোধিতার চিন্তাই তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখবে, সেটা সম্ভব ছিল না। অতএব, যে রাষ্ট্রের ভক্তি অন্তঃকরণে আছে সেটা কেমন, তার স্বরূপ কী, তার শরীর অর্থাৎ দৃশ্য রূপ কাদের কারণে তৈরী হয়েছে ইত্যাদি মূলগত প্রশ্নগুলি নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেন। প্রাচীনতম অতীত কাল থেকে যা ঘটেছে এবং প্রত্যক্ষ চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ থেকে তাঁর এই ত্রিকালাবাধিত সত্যের সাক্ষাৎকার হয়েছিল যে "হিন্দু জীবনই আমাদের পুণ্যভূমির রাষ্ট্রজীবন।" হয়তো বাল্যকালে তার অনুভূতি তিনি সপ্রমাণ, স্পষ্ট তথা অসন্দিগ্ধ রূপে ব্যক্ত করতে না পারলেও পরে এই উপলব্ধি তাঁর পূর্ণ রূপে হয়েছিল। তাঁর জীবিতকালে এবং আজও যে অনৈতিহাসিক ও অসত্য তথাকথিত মিশ্র রাষ্ট্রবাদের মণ্ডন ও গুণগান করা হয়, সেটা বুদ্ধি ও যুক্তির নিরিখে মেকি বা মিথ্যা এবং তা বিশুদ্ধ রাষ্ট্রভাবনাকে আঘাত করে। এই মিথ্যা রাষ্ট্রবাদের কারণেই আপন ও পর, রাষ্ট্রীয় সমাজ ও তার শত্রু, বিদেশী আক্রমণকারী এবং তাদের আক্রমণের হাত থেকে স্বদেশ, নিজ সমাজ ও নিজ জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে রক্ষা করার প্রয়াসে প্রাণ পণ করে সংগ্রামকারীদের মূল্যায়ন করার ব্যাপারে ক্ষমার অযোগ্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত আমাদের জাতি এই ভ্রম তথা অসত্যের ভূমিকা নিয়ে চলার জেদ ধরে থাকবে ততদিন তার উপর একের পর এক অমঙ্গল ঘনিয়ে আসতেই থাকবে। অপমানিত, নিরাপত্তাহীন এবং সংকটগ্রস্ত রাষ্ট্রজীবনের উত্তরোত্তর হ্রাস হতে-হতে অবশেষে হয়তো তার বিনাশের সময়ও এসে যেতে পারে, এইরকম দুঃখজনক প্রতীতি বিগত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের ঘটনাবলী থেকে হচ্ছে। যদি দলীয় স্বার্থের প্রতি অভিনিবেশ, দুরাগ্রহ এবং অন্য সমাজগুলির বিষয়ে ভয় মন থেকে দূর করে নিজেদের রাষ্ট্রজীবন সম্বন্ধে চিন্তা করা যায় তাহলে পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর পদচিহ্ন অনুসরণ করে অগ্রসর হয়ে আমরা সকলে এই কথাই বলব যে, "আমাদের হিন্দুরাষ্ট্রই আছে, পূর্বেও ছিল এবং আমাদের

পরাক্রমের দ্বারা পরবর্তীকালেও চিরকালের জন্য তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থায় রাখতে হবে।"
বস্তুত আমাদের রাষ্ট্রের বিষয়ে পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষ দাঁড় করিয়ে তাকে বিবাদের বিষয় বানিয়ে 'হিন্দু রাষ্ট্রবাদ' বলাটাও পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর সুতীব্র অনুভূতির সহিত সংগতিপূর্ণ নয়। এটা একটা 'বাদ' হতে পারেনা। হিন্দু রাষ্ট্র বাদাতীত সত্য।

আমাদের আরাধ্য হিন্দু রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ সাক্ষাৎকার হয়েছিল বলেই সম্পূর্ণ সংকট, সকল বাধা তাঁর নিকট সহজ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল এবং তাঁর উপাস্যের প্রতি ভক্তির প্রখর আগুনে তিনি ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনের আকর্ষণ এবং সর্বপ্রকার স্বার্থকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবার অলৌকিক আনন্দ অনুভব করেছিলেন। এই জীবনচরিতে তাঁর স্বরাষ্ট্রশরণ, নিঃস্বার্থ এবং সুমহান্ ব্যক্তিত্বের দর্শন লাভ করা যাবে। ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, মান-সম্মান ইত্যাদি সম্পূর্ণ স্বার্থসমূহকে ভস্মীভূত করে রাষ্ট্রসেবকের বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ স্বরূপ এখানে আমরা দেখতে পাব। তাঁর সদা প্রফুল্ল তথা হাসিখুশি জীবনের অনুধ্যান করার ফলে অন্তঃকরণে এই সুস্পষ্ট ছাপ পড়বে যে প্রকৃত সুখ এবং জীবনের সার্থকতার সমাধান স্বার্থশূন্যতার মধ্যেই নিহিত।

স্বার্থরহিত এবং ধ্যেয়নিষ্ঠ জীবনই বিশুদ্ধ, পবিত্র এবং চরিত্রসম্পন্ন থাকতে পারে। আর পরমপূজনীয় ডাক্তারজী তো অন্তর্বাহ্য শুচিতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তিই ছিলেন। তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলে একথাই মনে হত যেন শুচিতা মানুষের রূপ ধারণ করে কাজ করে চলেছে।

সার্বজনীন জীবনে চরিত্র রক্ষা সম্বন্ধে শুধু উদাসীনতাই নয়, চরিত্র ইত্যাদি বিষয়ের উপেক্ষার যে প্রবৃত্তি চতুর্দিকে দেখা যাচ্ছে, সেই পটভূমিতে প্রখর পবিত্রতার তেজে দেদীপ্যমান্ তাঁর জীবন অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উদ্ভাসিত দেখা যায় এবং আমাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে, সেই সঙ্গে আমাদের অন্তঃকরণেও নিজ জীবনকে শুচিতাপূর্ণ ও মঙ্গলময় করে তোলার প্রেরণা ও বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে।

বহুবার দেখা যায় যে যদি কর্তৃত্ববান্ ও গুণী ব্যক্তি নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও পথ খুঁজে নিয়ে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যায়, তখন তার মনে আত্মবিশ্বাসের স্থানে অহংকারের সৃষ্টি হয়। স্বভাব উগ্র হয়ে ওঠে, অপরকে তুচ্ছ মনে করার প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। এইরকম হওয়া এবং তার ফলে অমিশুক স্বভাব তৈরী হওয়া স্বাভাবিক হলেও সেটা অভিপ্রেত নয়। বিশেষতঃ যারা রাষ্ট্রসেবার ব্রত গ্রহণ করেছে তাদের পক্ষে এই ধরনের প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া সর্বথা অনুচিত। পরমপূজনীয় ডাক্তারজী কুল-পরম্পরায় তীক্ষ্ণ-ক্রোধী স্বভাব এবং আত্মনির্ভর থাকার স্বাভিমান লাভ করেছিলেন। এছাড়া, সকল প্রকার সংকটের সম্মুখীন হয়ে সেইগুলিকে পরাস্ত করে একাকী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মত অতুলনীয় সংগঠিত শক্তি নির্মাণে তিনি কল্পনাতীত সাফল্য লাভ করেছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁর মনে অহংকার, উষ্ণ মেজাজ ইত্যাদি দোষের উদ্ভব হওয়ার যথেষ্ট অনুকূল পরিবেশ ছিল। কিন্তু তাঁর জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে এই সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকেই তিনি মুক্ত ছিলেন। তাঁর জীবনে সৌজন্য, নিরভিমান, অহংকার-শূন্যতা, মিশুক-স্বভাব এবং প্রকৃতি ও বাণীর মাধুর্য, প্রত্যেক

পরিস্থিতিতে ক্ষোভরহিত থাকার গুণেরই ব্যাপকতা পাওয়া যায়। বংশ-পরম্পরায় প্রাপ্ত ক্রোধী স্বভাবও তাঁর পরবর্তী জীবনে প্রায় ছিলই না বলা চলে। বলা হয় 'স্বভাবো দুরতিক্রমঃ'। কিন্তু তিনি তাকেও জয় করে নিজের বশে করে নিয়েছিলেন। তাঁর এই স্বভাব পরিবর্তন এমনই অভূতপূর্ব ছিল যে তাকে মনোবৈজ্ঞানিক বিস্ময় বলে আখ্যাত করা যায়। এই সব কেমন করে হল? তিনি চিন্তা-ভাবনা এবং প্রচেষ্টাপূর্বক কেন এই সব করেছিলেন? যদি এ কথা বুঝে নিই তাহলে এই বিস্ময়ের কিছুটা ব্যাখ্যা আমরা পেতে পারি।

আমাদের রাষ্ট্রের স্বরূপের নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট সাক্ষাৎকারের অনুভূতি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি রাষ্ট্রের অবনতি, হ্রাস ও পরাভবের মীমাংসা সত্য মার্গদর্শক ইতিহাসের আলোকে করেন। "আমাদের সমাজের মানুষদের মধ্যে সামাজিক ভাবনার অভাব, মাতৃভূমি, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে কেবল প্রযুক্তিগত ও আনুষ্ঠানিক স্মরণ ও পালনই পর্যাপ্ত নয়, বরং সমস্ত বিদেশী আঘাত থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য জীবন বিসর্জনের প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে চলার মানসিকতা আবশ্যক। এই বিষয়ে অজ্ঞানতা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্যগুলি সম্বন্ধে উদাসীনতা, পরস্পরকে সর্বদাই সাহায্য করার তৎপরতা না থাকা, সংকীর্ণ স্বার্থপরায়ণতা ইত্যাদি এই প্রকার অনেক দোষে ব্যাপ্ত হওয়ার দরুন সমাজ অসংগঠিত, জর্জর ও দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং এই শক্তিহীনতার ফলেই তাকে পরাভব, পরতন্ত্রতা এবং সর্বক্ষেত্রে নিকৃষ্ট অবস্থায় পতিত হতে হয়েছে।" এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করে তিনি সম্পূর্ণ সমাজের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। তিনি এই নির্যাসও উপলব্ধি করেন এবং দেশকে অবহিত করেন যে এই দুরবস্থা দূর করার একটাই উপায় আছে যে "প্রতিটি ব্যক্তির উপরে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের সৎ-সংস্কার করে তাদের এক সূত্রবদ্ধ ও অনুশাসিত শক্তির অঙ্গ রূপে গড়ে তোলা এবং এই ধরনের সকল ব্যক্তির স্নেহময় ব্যবহার, একাত্মতা তথা রাষ্ট্রের সমষ্টির মধ্যে নিজ ব্যক্তিত্বকে বিলীন করে দেবার গুণাবলীর ভিত্তিতে এক অখিল দেশব্যাপী অনুশাসনবদ্ধ এবং সঙ্ঘবদ্ধ সামর্থ্য নির্মাণ করা।"

সংগঠনের কথা বলা সহজ কিন্তু তাকে ব্যবহারে কার্যকর করার জন্য এমন এক তন্ত্রের উদ্ভাবন করা আবশ্যক ছিল যার দ্বারা শুদ্ধ রাষ্ট্রীয় ভাবনা এবং রাষ্ট্র-সমর্পিত জীবনের সংস্কার অন্তঃকরণের মধ্যে হয় এবং তা সুদৃঢ় থাকে। সেই সঙ্গে পরস্পরের প্রতি অনুকূল স্নেহপূর্ণ ব্যবহার প্রত্যেক ব্যক্তির স্থায়ী স্বভাবেই যেন পরিণত হয়। এই আবশ্যকতার পূর্তির জন্যই তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিদিনের শাখার বিশেষ তন্ত্রের নির্মাণ করেন, তার জন্য যোগ্য তথা অঙ্গীভূত ব্যবহারের নির্ধারণ করেন এবং স্বয়ং নিজের উদাহরণ দ্বারা — নিজের দুরতিক্রম স্বভাবকেও পরিবর্তিত করে সেইপ্রকার ব্যবহারের অনুরূপ গড়ে নিয়ে — তিনি অসম্ভবকেও সম্ভব করে দেখালেন। সমর্পিত জীবনের সামর্থ্য কত কিছু করতে পারে? এ কথা কে বলতে পারে? বংশগত সংস্কার গুলিকেও শুদ্ধ করে নিয়ে, অনিষ্টকে নষ্ট করার ইষ্ট তথা আবশ্যক গুণসমূহের স্থাপনা ও সংগ্রহ করার অতি-মানবীয় শক্তি তিনি নিজের সর্বস্বার্পণের বৃত্তি হতেই লাভ করেছিলেন।

এই অসামান্য শক্তির পরিপূর্ণ দর্শন করায় এমন আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। এই জীবন চরিত পাঠ করার সময়ে পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর অনেক রাজনৈতিক গতিবিধির কথা আমরা জানতে পারি। ইংরাজরা প্রত্যক্ষ রূপে বিদেশী ছিল, তাদের অত্যাচারী শাসনের অসহ্যতা অনুভব করা যেত। এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই মনে হত যে ইংরাজদের বিতাড়িত করে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত করাই জীবনের প্রমুখ কর্তব্য। এই কথা চিন্তা করে লোকমান্য নিজ জীবনকালে সমাজ-সংস্কার অথবা রাজনীতি এই দ্বন্দ্বের মধ্যে রাজনীতিকেই অসন্দিগ্ধরূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং তারই ভিত্তিতে ডাক্তারজী বলতেন যে "পরাধীন রাষ্ট্রের নিকট স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যতীত অন্য কোন রাজনীতি থাকতে পারে না।" এই কারণে নির্বাচন, কাউন্সিল ইত্যাদির প্রতি তিনি সর্বদাই উপেক্ষা দেখিয়েছিলেন। অন্যান্য সামাজিক কাজগুলির প্রতি এই কারণেই তিনি মনোযোগ দিয়েছিলেন যাতে স্বাধীনতা সংগ্রামে সেইগুলির সদ্ব্যবহার করা যায়।

যদিও পরিস্থিতি অনুসারে তিনি রাজনীতিকে অবলম্বন করেছিলেন, তথাপি রাষ্ট্রের উৎকর্ষ-অপকর্ষের কারণগুলির মীমাংসা করে তিনি এ বিষয়টি মনে রাখলেন যে প্রতিযোগিতা ও ঈর্ষাদিপূর্ণ প্রচলিত রাজনীতি শুধু যে অনুপযুক্ত তাই নয়, উপরন্তু যদি পুরোপুরি সতর্কতা না গ্রহণ করা যায় তাহলে সেটা অনিষ্টকরও হয়ে উঠতে পারে। সেই সঙ্গে এই সত্য উপলব্ধি করে যে জনতার জাগ্রত, অনুশাসনবদ্ধ এবং সুসংগঠিত সামর্থ্যই রাষ্ট্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তি, পরিস্থিতির আঘাত-প্রত্যাঘাত, স্বজনদের সমালোচনা এবং অবমাননা ইত্যাদিকে হাসতে-হাসতে সহ্য করেও তিনি ঐ তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করার কাজে নিজের জীবন-সর্বস্ব নিয়োগ করেন এবং তাঁর প্রারম্ভিক জীবনে সশস্ত্র বিপ্লব, এবং কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদির সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন ধীরে-ধীরে সহজেই সেগুলি থেকে দূরে সরে এলেন। সেই সব ক্ষেত্রের রাষ্ট্রভক্ত নেতাদের এবং তাঁদের কাজ সম্বন্ধে নিজ মনে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে তিনি স্বয়ংসেবকদেরও এই সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেন যে তাঁদের সম্বন্ধে কোন মুহূর্তেও যেন অশ্রদ্ধার মনোভাব উৎপন্ন না হয়, কিন্তু তিনি নিজ আদর্শ সকলের সম্মুখে উপস্থাপন করে এই শিক্ষাও দেন যে "ঐ সব কার্যপদ্ধতি থেকে দূরে অবস্থান করেই সমাজ-সংগঠন করা সম্ভবপর এবং সেটাই প্রত্যেক কার্যকর্তার করা উচিত।"

বাল্যকাল থেকেই বিবিধ রাজনৈতিক গতিবিধির সঙ্গে সংলগ্ন, বিদেশী শাসনের নামমাত্র শুনলেই যিনি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন, তাঁর মত অতীব সংবেদনশীল তথা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ব্যক্তির পক্ষে প্রচলিত রাজনৈতিক কার্যসমূহ হতে হাত না টেনে নিয়ে মনকেই সরিয়ে নেওয়া এবং নিজ বুদ্ধির অনুকূল কাজের জন্যই নিজের মনকে প্রস্তুত করা যে কত কঠিন ছিল এবং এই প্রকার পরিবর্তন নিজের মধ্যে যিনি আনতে পারেন তাঁর বিবেকশক্তি কত উচ্চকোটির ও সামর্থ্যবান ছিল এবং নিজের সংকল্প ও তদনুরূপ কার্য সম্বন্ধে তাঁর নিষ্ঠা যে কতখানি অটল ছিল তার কল্পনা করাও কঠিন। এই প্রকার কল্পনাতীত শক্তিসম্পন্ন বিবেক ও কার্যনিষ্ঠা তাঁর পবিত্র, নিঃস্বার্থ এবং রাষ্ট্র-সমর্পিত

জীবনের কারণেই লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর জীবনের অতীব উদাত্ত এই উপলব্ধি বাস্তবিকই ছিল পরম বিস্ময়কর।

এই দিক থেকে বর্তমান জীবন চরিতের পঠন লাভজনক হবে। বাইরে থেকে যাঁকে দেখে সাধারণ বলে মনে হত, তাঁর মধ্যে যে অসামান্য তেজস্বিতা প্রত্যক্ষ করা যাবে এবং প্রত্যেকের মনে এই বিশ্বাস উৎপন্ন হবে যে, "আমিও নিজ অন্তঃকরণের উপর রাষ্ট্রসমর্পিত জীবনের সংস্কার প্রদান করে তাকে দৃঢ়মূল করে, নিজের বিকারগুলিকে বিনষ্ট করে, স্বভাবকে শুদ্ধ করে রাষ্ট্রের চিরন্তন বৈভবের নির্মাণের জন্য এবং বাহ্য বাতাবরণের আকর্ষণ সমূহকে জয় করে রাষ্ট্রের স্থায়ী শক্তির এক অটল অঙ্গ হিসাবে আজীবন পরিশ্রম করে নিজ জীবনকে সফল তথা সার্থক করে তুলতে পারব।"

পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর দিব্য জীবনের এটাই আশাপ্রদ ও প্রেরণাদায়ী বার্তা এবং আমার মনে হয় এই গ্রন্থের ফলশ্রুতি এটাই। এই বার্তা প্রতি ঘরে-ঘরে প্রতিটি ব্যক্তির অন্তঃকরণে পৌঁছাক এবং লেখকের পরিশ্রম সফল হোক এই কামনা করি।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য জয়ন্তী
বৈশাখ, শুক্ল পঞ্চমী, শকে ১৮৮২

ইতি
মাঃ সঃ গোলওয়ালকর

অন্তর্নিহিত মহাশক্তির উৎস

প্রাতঃস্মরণীয় ডাঃ হেডগেওয়ার

[পরমপূজনীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রী সুদর্শনজীর শ্রদ্ধার্ঘ্য]

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা তথা আদ্য সরসঙ্ঘচালক পূজনীয় ডাক্তার কেশব বলিরামপন্ত হেডগেওয়ারজী সম্পর্কে জনৈক কবি লেখেন —

"থে অকেলে আপ লেকিন বীজ কা থা ভাব পায়া।
বো দিয়া নিজকো অমরবট সঙ্ঘ ভারত মেঁ উগায়া।।
রাষ্ট্র হী ক্যা অখিল জগ কা আসরা বন জায়।
ঔর উসকী হম টহনিয়াঁ পত্তিয়াঁ বন জাঁয়।।"

(আপনি ছিলেন একাকী কিন্তু বীজের ভাব পেয়েছিলেন।
নিজেকে বপন করে অমর বট সঙ্ঘ ভারতে উৎপন্ন করেছিলেন।।
শুধু রাষ্ট্রই নয়, সে অখিল জগতের আশ্রয়ে পরিণত হল।
আর আমরা তার শাখা-পল্লবে পরিণত হয়েছি।")

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছরে আজ এই পংক্তিগুলি পরিপূর্ণ চরিতার্থ হয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে। দেশের সমগ্র অঞ্চলেই সঙ্ঘের বিস্তার ঘটেছে, সেই সঙ্গে দেশের বাইরেও ৩৫টি দেশে সঙ্ঘের যে স্বয়ংসেবকেরা গেছেন, তাঁরা ভিন্ন-ভিন্ন নামে হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার কাজ করে চলেছেন। একথা উপলব্ধি করা গেল ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে, যখন ৩৮টি দেশ থেকে আগত ৫৬৮ জন কার্যকর্তা বিশ্ব সঙ্ঘ শিবিরে অংশগ্রহণের জন্য মুম্বই ও তারপর নাগপুরে উপস্থিত হন। এই বীজ কত শক্তিধর ছিল, তার প্রমাণ এই তথ্য থেকেই পাওয়া যেতে পারে যে অনেক প্রকার বিরোধিতা তথা বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও সঙ্ঘ অবিরাম বৃদ্ধিলাভ করে চলেছে। শুধু তাই নয়, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৌঁছে, সেই সব ক্ষেত্রের সমস্যাগুলির হিন্দু চিন্তাধারার ভিত্তিতে সমাধান খুঁজে বের করে রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের কাজে সংলগ্ন রয়েছেন।

এটা স্বাভাবিক যে এমন মহাশক্তির উৎস-স্বরূপ যিনি বীজের সমান অনামা থেকে সঙ্ঘকার্যের ভিত্তি স্থাপন করেন, তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানার ইচ্ছা মানুষের মনে উৎপন্ন

হবে। সেই ইচ্ছাপূরণের জন্য মহারাষ্ট্রের শ্রী নারায়ণ হরি পালকর মারাঠী ভাষায় ডাক্তারজীর বিস্তৃত জীবন-চরিত রচনা করেন, যার হিন্দী অনুবাদ ৬০-এর দশকে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় করেন। সেই হিন্দী থেকে বঙ্গানুবাদ সঙ্ঘের প্রাক্তন প্রচারক শ্রী জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাভাষীদের জন্য করেছেন। হিন্দী ও বাংলা উভয় ভাষার উপর তাঁর সমান দক্ষতা থাকার কারণে তাঁর এই অনুবাদ মূল গ্রন্থের আনন্দই প্রদান করবে বলে আমার বিশ্বাস। বাংলাভাষী সুধী ও জিজ্ঞাসুবৃন্দ এই গ্রন্থের মাধ্যমে ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্ঘ-পূর্ব জীবন, কলকাতায় তাঁর অবস্থান, সঙ্ঘ-স্থাপনার পশ্চাদ্ভূমি, সঙ্ঘকার্য বিস্তারের জন্য তাঁর অখণ্ড ও অবিরাম প্রয়াস, তাঁর সারগর্ভ চিন্তাধারা এবং মৌলিক কার্যপদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে অধিক বিস্তারপূর্বক জ্ঞানলাভ করবেন এবং তাঁর অন্তর্নিহিত যে আকাঙ্ক্ষাগুলির সুফল প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, তার পরিপূরণের কাজে অংশগ্রহণের জন্য এগিয়ে আসবেন বলে আশা করি।

মাঘ কৃষ্ণ ১
কলি সংবৎ ৫১০২

(কুপ্.সী. সুদর্শন)
দিনাংক ৯-২-২০০১

শ্রদ্ধার্ঘ্য

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা পূজনীয় ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের জীবনচরিত উপস্থাপন করার সময়ে আজ অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি। এক সুমহান্ মনীষীর জীবনচরিতের জন্য তাঁরই সমান শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট থেকে প্রস্তাবনা লাভ করা গেছে, একে মণিকাঞ্চন যোগই বলা যায়। বর্তমান গ্রন্থের প্রস্তাবনা পরমপূজনীয় শ্রীগুরুজী লিখে দিয়েছেন, এ আমাদ্র পরম সৌভাগ্য।

পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর বিস্তারিত জীবনী অনেক পূর্বেই প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। প্রায় কুড়ি বছর পূর্বে তিনি স্বর্গগত হয়েছেন। এর মাঝে তাঁর 'ব্যক্তিত্বের এক ঝলক' দেবার মত ক্ষুদ্রাকার জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল এবং ভারতের কয়েকটি ভাষায় তার নানা সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিষয়ে লিখিত রচনাসমূহের এক সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর স্মৃতিকথা এবং পত্র-সংগ্রহের ছোট বইও ছাপা হয়েছে। বিগত আঠার-উনিশ বছরের মধ্যে মাঝে-মাঝে 'বিবেক', 'কেশরী', 'রাষ্ট্রশক্তি', 'ভারত', 'অর্গানাইজার' ইত্যাদি পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়েছে। এই জীবনচরিতে সেই সম্পূর্ণ রচনাদির পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করা হয়েছে।

এই জীবনচরিতের পরিকল্পনা তৈরী করার সময়ে এমন অনেক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি যাঁদের ডাক্তারজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সেই সময় একথা অনুভব করলাম যে ডাক্তারজী কর্তৃক সঙ্ঘ স্থাপনার পূর্বের, বিশেষতঃ তাঁর বৈপ্লবিক জীবনের বিষয়ে যাঁরা জানতেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই দেহাবসান ঘটেছে এবং যাঁরা জীবিত ছিলেন তাঁদের স্মৃতিও ধূসর হয়ে গিয়েছিল। সেই কারণে জীবনী রচনার উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহে এত বেশী বিলম্ব হওয়ার দরুন পশ্চাত্তাপ করা ছাড়া আর উপায় নেই।

কিন্তু এর থেকেও অধিক দুঃখের বিষয় হল ১৯৪৮ সালে মহাত্মাজীর হত্যার পরে যে অগ্নি-সংযোগের ঘটনাগুলি হয়, তার কারণে কয়েকজন ব্যক্তির নিকট সংগৃহীত ডাক্তারজীর ভাষণসমূহের প্রতিবেদন ও চিঠি-পত্রগুলিও নষ্ট হয়ে গেছে। এর ফলে জীবনীর উপযুক্ত জ্ঞাতব্য তথ্যাবলী এবং হিন্দুস্থানের অগ্রগণ্য সংগঠকের মননীয় চিন্তাধারা থেকে উক্ত ঘটনাবলীর দরুন আমরা বঞ্চিত থেকে গেলাম। সেই সময়ে সরকার অনেকের নিকট থেকে যে সমস্ত কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করেছিল তাও ফেরৎ পাওয়া যায়নি। যে কাগজগুলি উদ্ধার করা গিয়েছিল সেগুলিও উইপোকায় কেটে নষ্ট করে দিয়েছিল। সেই কারণে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

মৃত্যু, বিস্মরণ, অগ্নিকাণ্ড, অবহেলা ও বিলম্বের পরেও অবশিষ্ট যে সামগ্রী আমি হাতে পেলাম, সেইগুলির ভিত্তিতেই এই জীবনচরিত গ্রন্থ তৈরী করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষভাবে পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব বেশী ছিল না, এবং যেটুকু ছিল তাও আমার ছাত্রাবস্থায়। সেই কারণে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্থানে অপরের নিকট হতে শোনা কথাই এই রচনায় বেশী আছে। এই তথ্যগুলির অভ্রান্তা প্রতিপাদন করার আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও একথা বলা যাবে না যে কোন ত্রুটি থেকে যায়নি।

সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠার পরের তথ্য জানাবার মত অনেক কার্যকর্তার সাক্ষাৎ পেয়েছি। কিন্তু তার পূর্বের তথ্য জানাবার মত যদিও বেশী মানুষ পাওয়া যায়নি, তথাপি সেই অভাব অনেকাংশে পূরণ করেছে নাগপুর থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র 'মহারাষ্ট্র'-এর পুরাতন সংখ্যাগুলি। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এই কথা ব্যক্ত করা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। যদি উক্ত সংখ্যাগুলি না পাওয়া যেত, তাহলে ১৯১৮ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত ডাক্তারজীর জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ গতিবিধির কথা জানাই যেত না।

'মহারাষ্ট্র'-এর এই সংখ্যাগুলির পুরান, বিবর্ণ, জীর্ণ পাতাগুলিতে হাত লাগতেই ঝুর ঝুর করে ছিঁড়ে পড়ে। মাসখানেক ধরে এই সংখ্যাগুলি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্ধার করার সময়ে প্রথমেই একটি চিন্তার উদয় হল যে ঐতিহাসিক দিক থেকে এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-সমৃদ্ধ এই পৃষ্ঠাগুলিকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সরকারের পক্ষেই এই কাজ করা সম্ভব। এর জন্য সরকারের দিক থেকে এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাতে সমস্ত সংবাদপত্রের সংখ্যাগুলিকে সংগ্রহ করে সেগুলির উপযুক্ত সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজন হলে সেগুলি যেন নজির বা তথ্য অনুসন্ধানের জন্য পাওয়া যায়। এর জন্য সংখ্যাগুলিকে মজবুত ও স্থায়ীভাবে বাঁধিয়ে রাখতে হবে। তার পূর্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগুলিকে শক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী কাগজে আলাদা করে মুদ্রিত করে রাখতে হবে।

স্বাভিমানী মানুষদের সামগ্রিক ও সুসংগঠিত জীবনই রাষ্ট্রের বাস্তব ভিত্তি। বিগত বহু শতাব্দী যাবৎ এই ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ার ফলেই আমাদের রাষ্ট্রকে বার বার নতুন-নতুন সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই ভিত্তিকে ভালভাবে, সূত্রবদ্ধ ও সুদৃঢ় করে তোলার প্রয়াস অনেকেই করেছেন। কিন্তু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে সেই সমস্ত প্রয়াস কখনো ভ্রান্ত দিশায় পরিচালিত হয়েছে, আবার কখনো সঠিক দিশায় করা হলেও তা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। রাষ্ট্র-নির্মাণের এই সকল প্রয়াস সততা ও বর্ধমান উৎসাহের সঙ্গে পরিচালিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু চতুর্দিকের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, যে কোন কাজের জন্য আন্তরিকতার সহিত কর্মরত ব্যক্তির বিদায় গ্রহণের পরে অনেক সময়ে সেই কাজ পরিস্থিতির বিরূপতার ফলে কালের গহ্বরে সমাহিত হয়। এরূপ অবস্থায় প্রথম দিন থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত যদি কোন একজন ব্যক্তির কাজ প্রগতি ও কৌশলগত দিক থেকে প্রভাবী বলে প্রতিপন্ন হয়ে থাকে তাহলে সে কাজটি পরমপূজনীয় ডাঃ হেডগেওয়ারজী ব্যতীত আর কারো নয়। নিঃসন্দেহে তিনি সঙ্ঘ-রূপে এমন এক তন্ত্র উপস্থাপিত করেন যে সমাজের নৈমিত্তিক উৎসাহকে নিত্য ও স্থায়ী স্বরূপ দিয়ে তার দোষগুলিকে মূল থেকে পরিমার্জন করে সামগ্রিক জীবনের দিব্যদর্শন প্রদানকারী সংস্কার দিতে সক্ষম। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত লক্ষ-লক্ষ স্বয়ংসেবকে পরিপূর্ণ সঙ্ঘ-শাখাগুলি এই উক্তির পর্যাপ্ত প্রমাণ রূপে বিদ্যমান।

সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের দেশভক্তি, তাঁদের ধ্যেয়নিষ্ঠা, প্রচেষ্টার সততা এবং বিজিগীষু বৃত্তি আজ জনসাধারণের আস্থার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই তথ্য ডাক্তারজীর অসামান্য কৃতিত্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ।

সঙ্ঘের সম্পূর্ণ সামর্থ্য পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর নিজ জীবনের দ্বারা প্রভাবিত হিন্দু রাষ্ট্রের পুনরুত্থানের আকাঙ্ক্ষার এবং সঙ্ঘের শাখাসমূহ রূপে প্রচলিত অভ্রান্ত কার্যপদ্ধতিরই পরিণাম। ডাক্তারজীর আকাঙ্ক্ষা আজ লক্ষ-লক্ষ তরুণদের অন্তরে প্রজ্বলমান। সঙ্ঘ-শাখাসমূহের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই আকাঙ্ক্ষা ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দেশব্যাপী হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে। এরূপ সময়ে যে পুণ্যপুরুষের অসাধারণ প্রতিভা ও পুণ্য প্রতাপে রাষ্ট্রের এই রূপান্তর আমাদের চোখের সামনে ঘটে চলেছে তাঁর প্রেরণাদায়ক জীবনের নিকট হতে প্রদর্শন করার একটি বিনম্র প্রয়াসই এই জীবনচরিত।

এই জীবনী রচনার সময়ে ডাক্তারজীর ব্যবহারের ছোট ছোট দিক্গুলিও বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে। এরূপ করার উদ্দেশ্য এই যে "লোকসংগ্রহ করাই যাঁর স্বভাব ছিল, তিনি অন্য সকলের সহিত কী রূপ আচরণ করতেন সে কথা জানাও সব দিক থেকে উপযুক্ত হবে। একটি দেওয়ালে সমর্থ রামদাসের একটি বাণী লেখা ছিল ঃ "শহাণে করুণ সোডাবে। সকলজন।।" ("সকলকে বুদ্ধিমান্ করে ছাড়বে।") এই বাণী দেখে ডাক্তারজী বলেছিলেন, "আমার মতে 'শহাণে করুণ ধরাবে সকলজন'। "সকলকে বুদ্ধিমান্ করে ধরবে" এইরূপ লেখা উচিত।" এইভাবে মানুষকে স্বাভিমানী ও সজাগ করে তুলে তাদের এক অনুশাসন তথা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে উপযুক্ত দিশায় চালিত করার তন্ত্র তাঁর কথাবার্তায় দেখা যাবে। এই প্রকার দেশভক্তির দ্বারা প্রেরিত হয়ে নিঃস্বার্থ ভাবনা নিয়ে কাজ করার সময়ে কখনো চন্দনের মত ধীরে-ধীরে ক্ষয় হতে হয়, আবার কখনো কর্পূরের মত মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠতে হয়। পরিস্থিতি অনুসারে এইগুলির মধ্যে যে অবস্থাই জীবনে প্রাপ্ত হোক না কেন, ধৈর্যের সঙ্গে তার সম্মুখীন হয়ে মনকে সর্বদা আনন্দে পরিপূর্ণ ও বিজিগীষু রাখতে হবে — এটাই ছিল তাঁর জীবন-সূত্র। তাঁর আলোকচিত্রের তলায় কেউ লিখে রেখেছিল "Teach me how to die" ('আমাকে মরতে শেখাও')। তাঁর এটা পছন্দ হয়নি। তিনি বললেন — এখানে "Teach me how to live" ("আমাকে বাঁচতে শেখাও") হওয়া উচিত। কারণ বাস্তবিক শিক্ষা তো এটাই হওয়া উচিত যে কেমন করে বাঁচা যায়। তাঁর জীবনের ছোট-ছোট তথ্য থেকেও তাঁর জীবনে বিজিগীষা ও লোক-সংগ্রাহক বৃত্তিরই দর্শন পাওয়া যায়।

পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ অবিরাম বলবান্ হয়ে উঠছে, এবং সেই কারণে হিন্দুরাষ্ট্রের বৈভবকাল ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই সময়ে আমার কামনা এই যে রাষ্ট্রদর্শী ডাক্তারজীর এই জীবনচরিত দ্বারা প্রত্যেকে যেন নিজ রাষ্ট্রীয় কর্তব্য করার প্রেরণা লাভ করে।

গুরু পূর্ণিমা
শক ১৮৮২

নারায়ণ হরি পালকর

অনুবাদকের নিবেদন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের জীবন-চরিতের বাংলা অনুবাদ করার সুযোগ লাভ করে আমি নিজেকে মহা সৌভাগ্যবান বলে অনুভব করছি।

পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর মত স্থিতপ্রজ্ঞ কর্মযোগী মহাপুরুষ সর্ব যুগেই বিরল। তাঁর সৃষ্টিও সমগ্র বিশ্বে অভিনব, অতুলনীয়। সঙ্ঘে যে সফল শাখা-পদ্ধতি তিনি উদ্ভাবন করেছেন, তা সত্যই অকল্পনীয়। সেই সঙ্গে বাইরের কোন ধনী ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট হতে ন্যূনতম আর্থিক সাহায্য না নিয়ে — শুধুমাত্র স্বয়ংসেবকদের শ্রদ্ধার্ঘ্য-স্বরূপ প্রদত্ত গুরুদক্ষিণার মাধ্যমে বিশ্বের বিশালতম এমন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যে চালানো সম্ভব, তা এখনও অনেকের নিকট অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। অস্পৃশ্যতার বিষয় তিলমাত্র প্রচার না করে তিনি যেভাবে এই অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করার সার্থক প্রয়াস করেন, তা মহাত্মা গান্ধীকেও বিস্মিত করে।

পরমপূজনীয় ডাক্তারজী প্রাচীনকালের দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষি-মনীষীদের মতই দূরদর্শী ছিলেন, তার দৃষ্টান্ত দেখা যায় ১৯৩৩ সালের তাঁর একটি ভাষণে। এক শীত শিবিরের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "পূর্বের গান্ধার আজ আফগানিস্তান হয়ে গেছে। সেইভাবে আজকের হিন্দুস্থানকে আমাদের যেন ইসলামিস্তান রূপে দেখতে না হয় — এই আশংকা সর্বক্ষণ মনে উদয় হয়।" আজ বহিরাগত মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের দেশের সীমান্ত অঞ্চলগুলিকে প্রায় হিন্দুশূন্য করে সেগুলিকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করছে। ডাক্তারজী বহুকাল পূর্বেই এই ভয়াবহ অবস্থা মানস-চক্ষে প্রত্যক্ষ করে তার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সতর্ক ও সজাগ করে দিয়েছিলেন।

কার্যকর্তাদের আচরণ সম্পর্কে পরম পূজনীয় ডাক্তারজী বিভিন্ন স্থানে সূত্ররূপে যা লিখে গেছেন, সেই সবগুলি যদি সংগ্রহ করা যায়, তাহলে সংগঠন-শাস্ত্রের এক অপূর্ব আচার-সংহিতা সংকলিত হতে পারে।

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এমন এক মহান্ ব্যক্তি, যিনি বিশ্বের বৃহত্তম সংগঠনের নির্মাতা, তাঁকে কিন্তু তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীর সময় পর্যন্ত ভারতের অধিকাংশ মানুষই চিনত না, অথচ সঙ্ঘের নামের সঙ্গে তারা সকলেই মোটামুটি পরিচিত ছিল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন তাঁর উপযুক্ত শিষ্য নরেন (স্বামী বিবেকানন্দ)কে আবিষ্কার করেছিলেন, পরমপূজনীয় ডাক্তারজীও তেমনই মাধব (শ্রীগুরুজী)কে আবিষ্কার করে তাঁর আরব্ধ কাজের দায়িত্ব তাঁর হাতে অর্পণ করে গিয়েছিলেন। এবং পরমপূজনীয় শ্রীগুরুজীও দীর্ঘ তেত্রিশ বছর অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করে সঙ্ঘকে বিশ্বময় বিস্তৃত করে দিয়ে গেছেন।

আমাদের সৌভাগ্য, আমাদের পরম পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রী সুদর্শনজী এই বাংলা অনুবাদ-গ্রন্থের জন্য একটি সুন্দর বাণী আমাদের উপহার দিয়েছেন। তার জন্য তাঁর প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি যে রকম আশা প্রকাশ করেছেন, পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর জীবন-চরিতের এই বাংলা অনুবাদ তাঁর সেই আশা পূরণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সর্বত্যাগী মহাপ্রাণ পরমপূজনীয় ডাক্তার হেডগেওয়ারকে জানাই আমার অন্তরের প্রণতি।

বর্ষ প্রতিপদ, ২০০১ খ্রীঃ
(বিঃসংঃ ২০৫৯)

বিনীত
জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতি

কর্তৃক

নিবেদন

পৃথিবীর সব থেকে বড় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ আজ ৭৬ বছর ধরে হিন্দু সমাজকে একটি জাগরূক সমাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। আজ সঙ্ঘের শাখা-প্রশাখা দেশের গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতের বাইরেও কয়েকটি দেশে সঙ্ঘের কাজ চলছে।

আমাদের প্রদেশেও সঙ্ঘের কাজ অনেক বেড়েছে — বেড়েছে শুভানুধ্যায়ীদের সংখ্যাও। তাঁরা জানতে চান কে এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, কি তাঁর জীবন পরিক্রমা। তাই আমরা সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের জীবন চরিত প্রকাশনে উদ্যোগী হয়েছি।

মূল গ্রন্থ রচয়িতা হলেন শ্রী নারায়ণ হরি পালকর। হিন্দী অনুবাদ করেছেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়। বাংলা অনুবাদ করেছেন বন্ধুবর শ্রী জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দীর্ঘকালের সঙ্ঘ কার্যকর্তা। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

পুস্তক প্রকাশনার অনেকগুলি প্রক্রিয়া আছে — তার মধ্যে অন্যতম ক্লিষ্ট ও কষ্টকর কাজ হচ্ছে বেশ কয়েকবার প্রুফ দেখা। এই কষ্টকর কাজটি সম্পন্ন করেছেন বেশ কয়েকজন অসুস্থ কার্যকর্তা। এছাড়া মুদ্রণের মূলহোতা শ্রী বাসুদেব পাল ও শ্রী সুভাষ রায়। এঁরা সবাই সঙ্ঘের নবীন ও প্রবীণ প্রচারক। এছাড়া নাম না জানা অনেকেই এই পুস্তক প্রকাশনের ব্যাপারে সহায়তা করেছেন। সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এত কিছু করেও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েই গেছে, তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

রাখী পূর্ণিমা
৫১০৩ যুগাব্দ

অমল কুমার বসু
সভাপতি
ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ

সূচীপত্র

।। পরিশিষ্ট ।।

ডাঃ হেডগেওয়ার জীবনচরিত

১. শৈশব

রাষ্ট্রের পুনরুত্থান কার সাহায্যে সম্পন্ন হয় এবং কিসের ভিত্তিতে রাষ্ট্র বৈভবশালী এবং অজেয় হয়? ভূমি, জনসংখ্যা, অর্থ, বুদ্ধিমত্তা ও পরাক্রম — এই সব গুলির দ্বারা পরিপূর্ণ রাষ্ট্রসমূহের ধুলায় মিশে যাওয়ার উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। বিশাল সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখত যে সব সমাজ, তাদের শুধু নামটুকুই অবশিষ্ট আছে। রোমানরা গেল, গ্রীকরা গেল আর ব্যাবিলোনিয়ার নাম উচ্চারণের মতও কেউ বেঁচে নেই। নির্মল এবং অতি তীব্র দেশভক্তি, ঐতিহ্য-পরম্পরার প্রতি অটুট শ্রদ্ধা এবং সমষ্টি জীবনের ভাবনা সততার সঙ্গে সমাজের মধ্যে বিদ্যমান রাখেন এমন মহাপুরুষ যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন, সেই রাষ্ট্রই স্বয়ং সুখে জীবন যাপন করে এবং সম্পূর্ণ বিশ্বকেও সুখ ও পরিতৃপ্তি দিতে সক্ষম হয়।

জগতের সম্পূর্ণ আচরণ সংঘর্ষময়। শ্রী সমর্থ রামদাস একে সংঘাতময় জগৎ বলে এর সুন্দর বর্ণনা করেছেন। এই সংঘর্ষে কখনো জয় আবার কখনো পরাজয় লাভ হয়। কিন্তু যে রাষ্ট্রের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতা, দেশভক্তি এবং বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত রাখার মত মহাপুরুষ একের পর এক এগিয়ে আসেন, তার পরাজয় স্বভাবতঃ স্বল্পকালীন হয়। যেমন ঝরাপাতার মরসুমে বৃক্ষসমূহের পাতা ঝরে পড়ার পর কিছুদিনের মধ্যে বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষগুলি সবুজ পত্রে পরিপূর্ণ হয়। এইরূপ জীবনীশক্তি সম্পন্ন পরাক্রমী সমাজ বিশ্বে অমর হয়ে বেঁচে থাকে।

সৌভাগ্যক্রমে হিন্দু সমাজ অমরত্বের এই উত্তরাধিকার লাভ করেছে। মানব ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠায় আমাদেরই জয়গান অঙ্কিত হয়ে আছে এবং তখন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত হিন্দু সমাজ অনেক জয়-পরাজয়ের মাঝখানে মানবতার আলোক-স্তম্ভের মত প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অবিরাম এগিয়ে চলেছে। বেদকাল থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্যন্ত যে অসংখ্য যুগ-প্রবর্তক ও কর্তৃত্বশালী নররত্ন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন তাঁদের পুণ্য প্রতাপই আমাদের এই পরম্পরার সঞ্চালক শক্তি। আজকের পতনের অবস্থাতেও রাষ্ট্রের চৈতন্যকে যিনি জাগ্রত করে তুলেছেন, ভারতমাতার সেই সুসন্তানের জীবনচরিত আমাদের সামনে প্রস্তুত। সেই মহাপুরুষ হলেন ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার।

'হেডগেওয়ার' কুলনাম যদিও মূলতঃ তৈলঙ্গ, তথাপি এই বংশটি ঋগ্বেদ অন্তর্গত আশ্বলায়ন সূত্রের শাকল শাখার মহারাষ্ট্রীয় তৈলঙ্গ অর্থাৎ দেশস্থ ব্রাহ্মণ অন্তর্ভুক্ত। এঁদের গোত্র কাশ্যপ। অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা অঞ্চলের কন্দকুর্তী নামক গ্রাম এই বংশের মূল স্থান। প্রায় দেড়শো বছর পূর্বে বলিরামপন্ত হেডগেওয়ারের পিতামহ নরহর শাস্ত্রী সেখান থেকে নাগপুরে এসেছিলেন এবং তার পর থেকে তাঁর পরবর্তী দুই-তিন বংশ নাগপুরেই বসবাস করে।

কন্দকুর্তী গ্রাম মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রের সীমান্তে ইন্দুর (নিজামাবাদ) জেলার বোধন তালুকে অবস্থিত। দুই হাজার জনসংখ্যার এই গ্রামের নিকটেই গোদাবরী, বঞ্জরা ও হরিদ্রা এই তিন নদীর ত্রিবেণী সঙ্গম। পুরাণে তীর্থরাজ বঞ্জরা সঙ্গমের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনটি নদীর মতই এখানে মারাঠী, তেলুগু ও কানাড়ী এই তিনটি ভাষারও সঙ্গম হয়েছে। যদিও এই তিন ভাষাই সহোদর ভগিনীদের মত অত্যন্ত প্রেমপূর্বক সেখানে থাকে তথাপি মারাঠীর প্রচলন সব থেকে বেশী।

এক সময় এই তীর্থস্থানে অনেক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদের বর্ধিষ্ণু পরিবার বাস করতেন। হেডগেওয়ার পরিবার তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। বেদসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই ছিল তাঁদের কুল-পরম্পরা। এছাড়া, অগ্নিহোত্রের দীক্ষাও গ্রহণ করেছিলেন এই পরিবার। একথাও জানা যায় যে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য যখনই এই অঞ্চলে ভ্রমণ করতে আসতেন তখনই হেডগেওয়ার-কুলের বিদ্বান্‌দের এই অঞ্চলে ধর্মরক্ষার্থে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করতেন। এই সংক্রান্ত মানপত্র আজও ইন্দুরে তাঁদের বংশধরদের নিকট বিদ্যমান আছে। কন্দকুর্তী গ্রামে শ্রীধর মহারাজ নামে এক সন্ত ছিলেন। তাঁর এবং অন্য অনেকের কুলগুরু পদ হেডগেওয়াররা অলংকৃত করেছিলেন। "হেডগে কুলগুরু পূর্বাপর। যেন সূর্যবংশ বশিষ্ঠবর।" এই প্রকার বর্ণনা তাঁদের সম্পর্কে পাওয়া যায়।

বিদ্যার নৈপুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক সুদৃঢ়তাও বংশপ্রম্পরায় এই কুলের বৈশিষ্ট্য ছিল। গ্রামে বিভিন্ন পরিবারের বংশানুক্রমিক গুণ-দোষের বিশেষত্বের উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কেউ কৃপণ হয়, কেউ অমিতব্যয়ী, কেউ ক্রোধী আবার কেউ একেবারে সরল প্রকৃতির হয়। হেডগেওয়ার বংশ সম্বন্ধেও এইরকম জনশ্রুতি কন্দকুর্তী গ্রামে প্রচলিত ছিল। বংশের সকলেই বেশ ভোজন-রসিক ছিলেন এবং দৈহিক গঠনে বেশ শক্ত পোক্ত ও বলবান্ ছিলেন। কথিত আছে, একবার আকস্মিক বর্ষণে উঠানে রাখা জোয়ারের দানাগুলি ভিজে যাচ্ছিল। সেগুলির ওজন প্রায় চার-পাঁচ মন ছিল। কিন্তু হেডগেওয়ার বংশের এক দম্পতি অতি সহজেই সেই ভারী বোঝা তুলে ঘরের ভিতরে রেখেছিল। গোদাবরীর তীরে কুস্তী খেলার শখ ছিল এই বংশের পুরুষদের। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এমনই বলবান্ ছিলেন যে বাড়ীর মধ্যে কাঠের থামের নীচে পাথরের ভারী ভিৎ তাঁরা সহজেই তুলতে পারতেন।

দেড়শো থেকে পৌনে দুশো বছর পূর্বে অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার তাঁদের ভিটে ছেড়ে তেলেঙ্গানা থেকে বাইরে চলে গেল। মোগল শাসকদের অধীনে হিন্দুদের প্রতি যে উপেক্ষা, প্রবঞ্চনা ও দারিদ্র্য নেমে এসেছিল, সেটাই ছিল তাদের জন্মভিটে ত্যাগ করে চলে যাবার কারণ। নাগপুরের ভোঁসলেরা নিজেদের পরাক্রমের দ্বারা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তার শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁদের রাজধানীতে বেদবিদ্যার প্রতি যে মর্যাদা দেওয়া হত, সে সংবাদ অনতিদূরবর্তী কন্দকুর্তী গ্রামেও পৌঁছেছিল। অতএব, বিদ্যা থাকা সত্ত্বেও নিজ গৃহে অর্ধভুক্ত থেকে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করার চেয়ে নাগপুরে গিয়ে পুরুষার্থ করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কর্তৃত্ববান হেডগেওয়ার বংশের মানুষদের মধ্যে জাগ্রত হলে আশ্চর্যের কিছু নেই।

মনের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নাগপুরে এসে হেডগেওয়ার বংশের মানুষেরা তাঁদের পাণ্ডিত্যের জোরে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন এবং সুখে স্বাচ্ছন্দে দিন যাপন করতে থাকেন।

সাধারণভাবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই পরিবারের দিন ভালই কাটে। কিন্তু ১৮৫৩ সালে ইংরেজ শাসকদের কালো ছায়া নাগপুরে বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য স্থানের মত বেদবিদ্যার সূর্য অস্তাচলগামী হতে থাকে। বেশ বড় শাস্ত্রজ্ঞ ও বেদবিদ্যার প্রকাণ্ড পণ্ডিতরাও নিরুপায় হয়ে পৌরোহিত্যের জীবিকা গ্রহণ করে দ্বারে-দ্বারে ঘুরতে থাকেন। সেই সময়ে ইংরাজী বিদ্যাই সর্বত্র ব্যাপ্ত ছিল। বেদবিদ্যার দুর্ভাগ্যে ছিল উপেক্ষা, উপহাস ও অজ্ঞাতবাস। কিন্তু দুর্দিনেও বেদমূর্তি বলিরামপন্ত হেডগেওয়ার নাগপুরে বেশ দাপটের সঙ্গে তাঁর কাজ অব্যাহত রাখেন এবং দৃঢ়তা ও দক্ষতার সঙ্গে তাঁর কুল-পরম্পরাকে রক্ষা করেন।

তাঁর পত্নী ছিলেন পৈঠনকর পরিবারের কন্যা। পৈঠনকররাও মূলতঃ তৈলঙ্গী ছিলেন এবং হেডগেওয়ারের মতই দুই পুরুষ আগে নাগপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। তাঁর নাম ছিল রেবতীবাঈ (অনেকের স্মৃতি অনুসারে তাঁর নাম ছিল যমুনাবাঈ)। তাঁর রং ছিল ফর্সা এবং তিনি স্বভাবে অত্যন্ত মিশুক ও শান্ত ছিলেন। তাঁর তুলনায় বলিরামজী ছিলেন উষ্ণ প্রকৃতির। দারিদ্র্য সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রী উভয়ই মিতব্যয়ী ছিলেন এবং আটার ভূসি দিয়েও হালুয়া বানাতে পারতেন। সেই কারণে তাঁদের সংসার স্বাচ্ছন্দ্যেই চলত।

তাঁদের মোট ছয়টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সব থেকে বড় পুত্রের নাম ছিল মহাদেব। তাঁর পরে দুই কন্যা — রাজু ও সরযু। তার পরে এক পুত্র, যার নাম রাখা হয় সীতারাম। এই ছেলে-মেয়েদের কারণে সংসার সর্বদা হাসি-খুশিতে পরিপূর্ণ থাকত। তাঁদের হৈচৈ শৈশব-চাপল্য দেখে মা-বাবাও আনন্দে বিভোর হয়ে উঠতেন। সন্তান সুখে তাঁদের সংসারে নতুন আনন্দের সঞ্চার হল। একে তো সুসংস্কৃত বৈদিক ঘরানা, তার উপর বলিরামজী ও তাঁর পত্নী উভয়েই তাঁদের সন্তানদের মনের উপর উজ্জ্বল প্রাচীন পরম্পরার সংস্কার দেবার বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান্ ছিলেন। প্রাতঃকালে দেবমূর্তিকে প্রণাম করা থেকে শুরু করে সন্ধ্যার সময়ে প্রদীপ জ্বালানোর সময়ে 'শুভং করোতি কল্যাণং' এর প্রার্থনা করা পর্যন্ত অনেক কিছুই কুলের ঐতিহ্য অনুসারে চলত। অতএব, সহজেই বালকদের জীবন সঠিক ছাঁচে ঢালাই হতে থাকল।

সুখ, পরিতৃপ্তি ও সন্তোষে পরিপূর্ণ এই সংসারে শক সম্বৎ ১৮১১ সালের চৈত্র শুক্ল প্রতিপদের দিন প্রত্যূষের সাড়ে তিনটের শুভ মুহূর্তে বর্ষ প্রতিপদের প্রাতঃকালে সৌভাগ্যবতী রেবতীবাঈ আর একটি পুত্ররত্নের জন্ম দিলেন। দিনটি ছিল রবিবার, যেটি প্রচণ্ড তেজপুঞ্জ ভগবান সূর্যের বার। ইংরেজী গণনা অনুসারে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল। ভোঁসলেদের রাজধানী নাগপুরে বিজয়েরগুঢ়ী (মহারাষ্ট্রের প্রত্যেক গৃহের ছাদের উপর বাঁশে সুন্দর বস্ত্র ও পাত্র বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, বর্ষ প্রতিপদের দিনে। একে "গুঢ়ী" বলা হয়।) উড্ডীন করার সময়ে জন্মগ্রহণকারী এই বালকই ছিল হিন্দু রাষ্ট্রের দ্রষ্টা এবং বর্তমান জীবনচরিতের নায়ক হিন্দু সংগঠনের স্রষ্টা ডাক্তার কেশবরাও হেডগেওয়ার।

বলা হয় যে, নিজের ভাবনা এবং আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ বালক নিজের মাতা-পিতার চয়ন করে। কিন্তু শক-কর্তা শালিবাহনের বিজয়ের স্মরণ করায় যে গুঢ়ী গৃহে-গৃহে উড্ডয়ন করার শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করে এই বালক বুঝি নিজের জন্মকালকেও নির্বাচন করে নিজের সময় জ্ঞানেরও অপূর্ব পরিচয় দিয়েছে।

শীত ঋতু শেষ হয়েছে। পর্ণহীন পাদপগুলি কোমল কিশলয়ে পল্লবিত এবং বৃক্ষলতাগুলির সুবাসিত ও মোহময় পুষ্প-শৃঙ্গারে সুশোভিত হয়ে ঋতুরাজ বসন্তের প্রবেশ ঘটছিল। রাত্রির অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দিয়ে দশদিকে আশার অরুণিমা ছিটিয়ে ঊষা আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসেছিল, প্রকৃতির এই পরিবর্তন কালে এই শিশুর জন্ম বুঝি তার মনীষা ও ভবিষ্যতেরই সংকেত বহন করে এনেছিল। তার জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতীয় জীবনের উদাসীনতার শীতকাল সমাপ্ত হয়ে মঙ্গল আকাঙ্ক্ষার অঙ্কুরোদগম শুরু হয়ে গেল। দিব্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বাণী বহনকারীর রূপ নিয়েই এই শুভমুহূর্ত এসেছিল তার জন্মলগ্নে। কারণ, 'মাটির অশ্বারোহী সৈন্যদের' মধ্যে প্রাণ-সঞ্চার করে তাদের দিগ্বিজয়ী বাহিনী তৈরী করে তাদেরই শক্তিবলে শকদের মত প্রবল বিদেশী শত্রুদের যিনি পরাজিত করেছিলেন সেই শালিবাহনের বিজয় দিবসেই গলিতগাত্র তথা আত্মবিস্মৃত হিন্দু সমাজের মধ্যে বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা যুক্ত সংগঠন নির্মাতা মহাপুরুষের জন্মদিন হওয়া শুধু আকস্মিক ঘটনা হতে পারেনা। এর মূলে নিশ্চিতই বিধির বিধান নিহিত।

বলিরামপন্ত হেডগেওয়ার সেই সময়ে নাগপুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ রূপে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর সাংসারিক জীবন যদিও দারিদ্র্যযুক্ত ছিল, তথাপি তাঁর বৃত্তি ছিল সাত্ত্বিক ও স্বাভিমানী। তাঁদের বংশ-পরম্পরায় যে বেদাধ্যাপনার কাজ প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গে অগ্নিহোত্রের দীক্ষা গ্রহণ করে অত্যন্ত দক্ষতা ও ভক্তিভাবের সহিত শ্রী অগ্নিনারায়ণের উপাসনাও তিনি নিষ্ঠাপূর্বক চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রথমে কয়েক বছর তিনি 'স্মার্তাগ্নি' দেবতার পূজা করেন, এবং তার পরে ত্রিকুণ্ড অগ্নিহোত্রের ব্রত গ্রহণ করেন। শ্রী বলিরামপন্ত ঋগ্বেদের উত্তম অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি তাঁর কুল-পরম্পরা অনুসারে উপজীবিকার জন্য পৌরোহিত্য এবং কর্তব্যের খাতিরে বিদ্যাদান উভয় কাজই করতেন। পরবর্তীকালে তিনি কারো গৃহে ভোজন করতে যাওয়া ত্যাগ করেছিলেন। সেই সময়ে তিনি শাস্ত্রবিহিত পদ্ধতি অনুসারে কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিবার থেকে ভিক্ষা রূপে সিধা গ্রহণ করতেন। মাথার উপর কানঢাকা লাল টুপি, কপালে ভস্ম এবং হাতে বাটি নিয়ে বলিরামপন্তের হাসি মুখ, কৃশকায় কৃষ্ণবর্ণ মূর্তি আজও কিছু বৃদ্ধ মানুষের স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে। ধুতি ও সাদা উত্তরীয়, এই ছিল তাঁর পরিধেয় বস্ত্র। এই সরল বেশেই তিনি সব কাজকর্ম করতেন।

বেদমূর্তি বলিরামজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাদেব শাস্ত্রী তাঁর নামের অনুরূপই যেন রুদ্রের সাক্ষাৎ অবতার ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র সীতারামপন্ত এবং তৃতীয়পুত্র কেশবরাও তাঁর তুলনায় শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর কন্যাও ছিলেন তিনজন। সরু, রাজু ও রঙ্গু। এঁদের মধ্যে সরুর শ্বশুরবাড়ী ছিল নাগপুরে দেবদের গৃহে এবং রাজু থাকতেন বিঞ্ঝুরেদের গৃহে। তৃতীয় রঙ্গুবাঈ এর বিবাহ পট্টলওয়ারদের পরিবারে হয়েছিল।

মহাদেব শাস্ত্রী এবং সীতারাম ও কেশবের বয়সের মধ্যে অনেক ব্যবধান ছিল। মহাদেবকে বিদ্যাধ্যয়ন করার জন্য সংস্কৃতের বিদ্যাকেন্দ্র কাশীতে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করে এবং তাঁর অধীত বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করে নাগপুরে ফিরে এলেন এবং নিজের ব্যবসায় শুরু করে দিলেন। সেই সময়ে সীতারাম ও কেশব সবে পাঠশালায় যেতে

আরম্ভ করেছিল। অতএব, ক্রমে-ক্রমে মহাদেব শাস্ত্রীর প্রতিপত্তি কনিষ্ঠ দুই ভাইয়ের উপর বিস্তৃত হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

মহাদেব শাস্ত্রী পালোয়ানী ঠাটে থাকতেন। গায়ে মলমলের পিরান আর গলায় শক্তির চিহ্ন স্বরূপ গিঁটবাঁধা রুমাল ও কবচ ধারণ করতেন। তাঁর দেহ ছিল কৃষ্ণবর্ণ। মনে যেমন দৃঢ় সংকল্পে বলীয়ান, তেমনি ছিল তাঁর বলিষ্ঠ বাহুযুগল, যেন ইস্পাতের মত শক্তিশালী। তাঁর ব্যায়ামের বিশেষ শখ ছিল। বাড়ীর এক অংশে আখড়া তৈরী করে রেখেছিলেন। সেখানে মুদ্গর, মলখম্ব, গদা ইত্যাদি ব্যায়ামের প্রধান উপকরণগুলি একত্রিত করা হয়েছিল। সংসারে দারিদ্র্য সত্ত্বেও নিজের উপার্জন থেকে বাড়ীতে কিছু দিয়ে বাকি পয়সা আখড়ায় তাঁর সঙ্গে দণ্ড-বৈঠক এবং মলখম্ব যারা করে পাড়ার সেই সব যুবকদের নিজের ইচ্ছায় খাওয়াতেন। গ্রীষ্মকালে তো মাঝে-মাঝে সিদ্ধিও তৈরী হত।

সীতারাম ও কেশব পাঠশালায় ভর্তি হয়ে অক্ষর জ্ঞান লাভ করতে শুরু করেন। বাড়ীতে তাদের উপর মাতা-পিতার শাসন তো ছিলই, তার উপর মহাদেব শাস্ত্রীর কড়া শাসনে ওদের তটস্থ থাকতে হত। বড় দাদার সঙ্গে আখড়ায় নামায় কোন সমস্যা ছিলনা, কিন্তু মহাদেব শাস্ত্রীর কড়া আদেশ হল পাড়ার এক দুষ্ট প্রকৃতির দলের ছেলেদের আচ্ছা করে মার দিতে হবে। এই কথা শুনে ছোট ভাইয়েরা যদি জামার হাতা গুটিয়ে নিজেদের প্রস্তুতি না দেখাত, তাহলে তাদের ধমক দেওয়া হত -- 'তোমরা যদি ওদের খুব ভালো করে মার না দিয়ে আস তাহলে আমার হাতে খুব মার খেতে হবে'। ওরা ভাল করেই জানতো যে তাঁর হুমকি শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। একথাও সত্য যে কারো সঙ্গে লড়ে যেতে তারা পিছ পা হবার ছেলে নয়, সেই কারণে এমন দুর্যোগ খুব বেশি আসেনি যখন হুম্‌কি অনুসারে তাঁকে হাত তুলতে হয়েছে। অন্যায় বা অবিচার দেখলে বা তাঁকে অপমান করা হলে তাঁর ক্রোধী স্বভাব আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়ত। একবার এক নিরীহ ব্যক্তির উপর কয়েকজন গুণ্ডাকে অত্যাচার করতে দেখে তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে দুতলা থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়লেন এবং দুর্বৃত্তদের বজ্রমুষ্টিতে ধরে এমন ধোলাই দিলেন যে ওরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণদের জ্ঞানকোষ রচনাকারীরা বর্ণনা করেছেন যে 'স্বভাবে ওরা ভীষণ ক্রোধী' এ কথা হেডগেওয়ারদের দিকে দেখলে সত্য বলে প্রতীত হয়।

বালক কেশব পাঠশালায় যেতে শুরু করে দিয়েছিল। বাড়ীতেও স্তোত্র, শ্লোক, রামরক্ষা ইত্যাদির পাঠ চলছিল। পড়া-শুনার পরে সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে বল ইত্যাদি নিয়ে খেলাধুলা নানা প্রতিযোগিতায় সে খুবই উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করত। যদিও এ কথা সত্য যে বিদর্ভ ও মধ্যপ্রান্তে সেই সময়ে সাধারণভাবে যে আর্থিক সমৃদ্ধি এসেছিল সে তুলনায় হেডগেওয়ারদের জীবন দারিদ্র্যপূর্ণই ছিল, তথাপি তাঁদের খাওয়া-পরার কোন অভাব ছিল না। সেই সময়ে সস্তায় জিনিষপত্র পাওয়া যেত, সেই কারণে গরীবদের জীবনযাপন সহজ ছিল। এক টাকায় সোয়া মণের চেয়ে কিছু বেশী জোয়ার পাওয়া যেত, বারো থেকে পনের সের দুধ এবং ঘি বারো আনায় এক সের পাওয়া যেত। সেটা ছিল প্রাচুর্যের যুগ। বালকেরা পাঁচ-সাত বছর বয়স থেকেই ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিত। একটি ধুতি বারো আনায় পাওয়া

যেত, আর যদি একটু মিহি সুতোর ধুতি হয়, তাহলে আড়াই টাকায় এক জোড়া পাওয়া যেত। সস্তার যুগের সাথে-সাথে সাধারণ মানুষরা ছিলেন ধার্মিক প্রকৃতির এবং সমৃদ্ধির কারণে তাঁরা দক্ষিণাও দিতেন মুক্ত হস্তে।

বলিরামপন্ত বাড়ীতে একটি গরু পুষে রেখেছিলেন। সেই কারণে রেবতীবাঈ ছেলেদের ব্যায়ামের পর দুধ পান করাবার বিলাসিতা করতে পারতেন। প্রাথমিক শিক্ষাক্রম চলাকালীনই নাগপুরে বসন্তরোগের প্রকোপ দেখা দিল। আট-ন বছর বয়স্ক কেশবের সমস্ত শরীরে বসন্ত ছেয়ে গেল। মাতা-পিতার পরিচর্যা ও প্রচেষ্টায় কেশবের প্রাণ বাঁচলেও তার মুখে বসন্ত তার চিহ্ন রেখে গেল। এর পরেই কেশবের যজ্ঞোপবীত সংস্কার সম্পন্ন হল। এখন থেকে সন্ধ্যা, পূজা, রুদ্রপাঠ ইত্যাদি ব্রহ্মকর্ম তাকে নিত্য নিয়মানুসারে শেখানো শুরু হল। বলিরামজীর গৃহে পুরোহিতদের বিপুল যাতায়াত ছিল। তাঁরা যখন বেদ-পাঠে কেশবের স্বচ্ছ ও শুদ্ধ উচ্চারণের প্রশংসা করতেন তখন মাতা-পিতার বুক গর্বে ফুলে উঠত।

ক্রমে কেশব হাত চাকা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সকালে কয়েক মাইল দৌড় শুরু করল। বড়দাদার সংস্পর্শে মলখম্বের বেশ কিছু ব্যায়ামও শিখে ফেলল। কেশবের প্রাথমিক শিক্ষা পূর্ণ হবার পূর্বেই সীতারামকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে নাগপুরের শ্রী রুক্মিনী মন্দিরে অবস্থিত বেদশালায় ভর্তি করে দেওয়া হল। ঐ বেদশালা প্রসিদ্ধ ঘনপাঠী বিদ্বান শ্রী নানাজী বঝের নেতৃত্বে চলছিল। কুল-পরম্পরা অনুযায়ী কেশবেরও প্রাথমিক শিক্ষার পরে ঐ বেদশালাতেই যাওয়ার কথা। কিন্তু তার রুচি সেদিকে বিশেষ ছিল না। তার কথাবার্তায় বন্ধুদের কাছ থেকে শোনা বাইরের রাজনীতির কথাও এসে যেত এবং 'কেশরী' সংবাদপত্র সে খুব রুচি সহকারে পাঠ করত। কেশবের এই অভিরুচি মাতা-পিতারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁরা তার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনাও শুরু করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে অন্তত একটি ছেলেকে নতুন শিক্ষা-পদ্ধতি দেওয়া উচিত। সময়ের গতি বুঝতে পেরে তাঁদের এরকম চিন্তা করা অস্বাভাবিক ছিল না। এমনিতেই বাড়ীর সবচেয়ে ছোট ছেলেকে সকলেই বেশী ভালবাসে, তার উপর বালক কেশবের বুদ্ধি সহজেই তাকে সকলের স্নেহ ও আদরের পাত্র করে তুলেছিল। অতএব কেশবকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। তাকে মহালের কাছে নীলসিটি হাই স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল।

ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই বালক কেশবের মনে দেশভক্তির চিন্তার উদয় শুরু হয়ে গিয়েছিল। ক্লাসে ইতিহাসের ঘণ্টার সময়ে ছত্রপতি শিবাজীর জীবনীর পাঠ সে তন্ময় হয়ে শুনত এবং তার মধ্যে যে রোমাঞ্চকর অদ্ভুত ঘটনাগুলির উল্লেখ করা হত, সেগুলিকে সে নিজের মানসপটে অঙ্কিত করে 'আমাদেরও এইরকম পরাক্রম করতে হবে' এইরূপ প্রেরণা তার বালক-হৃদয়কে মথিত করে তুলত। নাগপুরে সকাল বেলায় তোপ, হাতি, ঘোড়া ও পালকি নিয়ে খুব জাঁক-জমক সহকারে ভোঁসলেদের যে শোভাযাত্রা বেরুত, তাতে মহারাজকে 'সরকার' নামে উল্লেখ করা হত, বিশাল রাজপ্রাসাদ, পুরাতন মহালের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত কেল্লার প্রাচীরের বিরাট সিংহদ্বার ইত্যাদি কেশবের বালকমনে এই ধারণা দৃঢ় হয়ে গিয়েছিল যে নাগপুরে ভোঁসলেদের রাজত্ব বিদ্যমান। কিন্তু সংবাদপত্র পাঠ করে, বিদ্যালয়ের

শিক্ষকদের মুখে 'শিবচরিত্রের' অনুষঙ্গ থেকে শোনা চিন্তাধারা এবং ডঃ খানখোজে, শ্রীরামলাল বাজপেয়ী এবং তৎকালীন তরুণ বিপ্লবীদের গতিবিধির কথা জেনে একথা বুঝতে দেরী হল না যে তাঁর ধারণা ভুল ছিল। পরিস্থিতি অনেক সময়ে মানুষকে নতুন দৃষ্টি প্রদান করে, তবে সেটা তাকেই দেয় যার মধ্যে অন্তর্নিহিত বাণী শোনার ভাবনাত্মক পাত্রতা আছে। এই দিক থেকে বিচার করলে বালক কেশবের মনে পরিস্থিতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা তার নবম বর্ষের বয়সেই প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিল।

১৮৯৭ সালের ২২ শে জুন ইংল্যাণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনে আরোহণের ৬০ বছর পূর্ণ হচ্ছিল। বিদেশী সরকার এই সুযোগটিকে পুনরায় একবার তাদের বিজয়-ডঙ্কা বিজিতদের মনে বাজাবার উপযুক্ত সময় বলে বিবেচনা করল। রাজ্যারোহণের দিনে সরকারী আদেশে সম্পূর্ণ দেশের গ্রামে-গ্রামে উৎসব অনুষ্ঠিত হল। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে রাজনিষ্ঠা প্রকাশের জন্য সমারোহের আয়োজন করা হল। ঝাণ্ডা, পতাকা, মালা, ভেরী, ঢাক ইত্যাদি বাজনা, আতর এবং স্বাভিমানশূন্য বক্তৃতা ছাড়াও শিশুদের মিষ্টান্ন বিতরণের কার্যসূচীও এই সমারোহের অন্তর্ভুক্ত হয়। ছোটদের মিষ্টান্নের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক ভাবেই থাকে। যে সময়ে আমাদের সমাজের বয়স্ক লোকেরাও কোন নীতির কারণে নয়, স্বাভিমান-শূন্যতার কারণেই কর্তাভজা ভাটদের মত ইংরাজ সম্রাজ্ঞীর ভজনা করে, সেখানে তাদেরই গৃহের ছোট-ছোট শিশুরা যদি এইসব সমারোহে তাদের হাতে তুলে দেওয়া মিষ্টান্নের ঠোঙা নিয়ে আনন্দে নৃত্য করে তাহলে আশ্চর্য্যের কী আছে?

কিন্তু এই সব মণ্ডা-মেঠাইয়ের উপরে অঙ্কিত গোলামীর ছাপ যে কয়েকজন মাত্র বালকের দৃষ্টিগোচর হল, তাদের মধ্যে কেশবও ছিল একজন। সে সেই মিষ্টির ঠোঙা বাড়ীতে এনে জঞ্জালের স্তূপের মধ্যে ফেলে দিল। যেখানে প্রতিবেশী ছেলেমেয়েরা বাড়ীর লোককে ঐ মিষ্টির ঠোঙা দেখিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছিল, সেই সময়ে 'কেশব গম্ভীর হয়ে আছে কেন?' সেই প্রশ্ন ওর দাদার মনে এল। "মনে হচ্ছে তুমি মিষ্টি পাওনি, কেশব!" দাদা জিজ্ঞেস করল। "হ্যাঁ পেয়েছি তো," কেশব উত্তর দিল, "কিন্তু আমাদের ভোঁসলেদের রাজ্য যারা জয় করেছে, সেই রাজার সমারোহে আমাদের আনন্দ কিসের?" এই উত্তরের মর্ম জঞ্জালের মধ্যে পড়ে থাকা মিষ্টি সকলকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিল।

এই স্বাভিমান ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট এডোয়ার্ড সপ্তমের রাজ্যারোহণের সময়ে কেশবের আচরণে প্রকাশ পেয়েছিল। সেদিন 'এম্প্রেস' মিলের মালিকরা বাজি ফাটিয়ে তাঁদের রাজ্য-নিষ্ঠা বিরাট ধূমধাম সহকারে ব্যক্ত করেছিলেন। বাজি উৎসব দেখার জন্য যখন কেশবের বাল্যবন্ধুরা ডাক দিল, তখন কেশব তাদের উত্তর দিল, "বিদেশী রাজার রাজ্যারোহণ উৎসব পালন করা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয়। আমি ওখানে যাচ্ছি না।"

এই সময়ে কেশব ও তাঁর বন্ধুদের বালক মনের উপর স্বরাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জীবনের বিশেষ প্রভাব ছিল। নাগপুরের সীতাবর্ডী দুর্গের উপর সারা দিন 'ইউনিয়ন জ্যাক' উড়তে দেখা যেত। সেটা দেখে এই বালকদের মনে হল এটাকে সরিয়ে দিয়ে যদি ওখানে ভগোয়া ধ্বজ তুলে দেওয়া হয় তাহলে দুর্গ জয় হয়ে যাবে। এই কল্পনা অনুসারে

বালকেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, সেখানে আমাদের পতাকা তুলতে হবে। কিন্তু দুর্গে সব সময়ে প্রহরা থাকত। অতএব, ঘর থেকে দুর্গ পর্যন্ত সুড়ঙ্গ তৈরী করতে হবে বলে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। ব্যস্, ঠিক পরের দিনই বঝে গুরুজীর যে ঘরে ছাত্ররা পড়াশুনা করত, ঐ ঘরের মেঝে কোদাল আর গাঁইতি দিয়ে খোঁড়া আরম্ভ হয়ে গেল। গুরুজনদের দৃষ্টি বাঁচিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে এই কাজ শুরু হল। কিন্তু দুই-তিন দিন পরেই ছাত্রদের পড়ার ঘরের দরজা কদিন থেকে বন্ধ দেখে গুরুজীর মনে সন্দেহ হল। কী ব্যাপার দেখার জন্য তিনি ভিতরে ঢুকলেন আর দেখলেন যে ঘরের মেঝেতে বেশ বড় গর্ত খোঁড়া হয়েছে এবং তার মাটির স্তূপ ঘরের এক কোনায় উঁচু করে রাখা আছে। এবার তাঁর হাতে প্রচণ্ড মার খেতে হবে আশঙ্কা করে কেশব ও তার বন্ধুরা এক কোণে ভয়ার্ত মুখে দাঁড়িয়েছিল। "এ সব কী বাজে কাজ করছ?" বঝে গুরুজী জিজ্ঞেস করলেন। বালকেরা সত্য কথা বলে দিল। শিক্ষক হিসাবে গুরুজী তাদের বোঝালেন যে এই রকম বৃথা কাজে সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। কিন্তু এই বালকদের খেলার মধ্যে যে বিরাট দেশভক্তির ভাবনা লুকিয়ে আছে তা দেখে মনে-মনে তিনি খুবই পুলকিত বোধ করলেন। পরে বড় হয়ে কেশবরাও যখন উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য কলকাতা গেলেন তখন শ্রী বঝে বড় কৌতুকের সহিত ঐ ঘটনার কথা অন্য সকলকে বলতেন।

পরিস্থিতির এই জ্ঞান কেবল বয়স অথবা বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর অবলম্বন করে না। অন্যদের সামনে 'মাথা নত হবে না মা' এই উদ্দীপ্ত ঘোষণা বালক শিবাজীর মুখ থেকে নিঃসৃত হয় এবং 'চিন্তা করে বিশ্বজগতের' এই বাণী বালক রামদাস উচ্চারণ করে ওঠেন। শুধু তাই নয়, যোগবিদ্যার শক্তিবলে চৌদ্দশত বছর জীবিত থেকেও যিনি অহংকার থেকে মুক্ত হতে পারেন নি সেই যোগী চাঙ্গদেবকে উপদেশ দেবার জ্ঞান ও অধিকার অল্প-বয়স্ক জ্ঞানদেবের ছিল। কিন্তু সেই জ্ঞানদেবই যখন লোকের নিন্দায় বিচলিত ও বিরক্ত হয়ে দরজা বন্ধ করে ক্রোধের চোটে বসে পড়ে তখন "রাগেঁ ভরাবেঁ কবণাসী। আপণ ব্রহ্ম সর্বদেশী" ("যিনি জগৎকে প্রভুময় দেখেন, তাঁর সঙ্গে কি বিরোধিতা করা সাজে!") এই রূপ বেদান্ত-বাক্য তার থেকে ছোট মুক্তাবাঈয়ের মুখ থেকে শোনে। কোন কোন মানুষ স্বার্থের বাইরে কখনো যেতেই পারে না, কেউ আবার পরিস্থিতির দরুন বুঝতে শেখে, কিন্তু কিছু মানুষের উপলব্ধি তাঁদের পূর্বজন্মের পুণ্যের ফলে জন্মগতভাবেই এসে যায়। তাঁরা সহজাত রূপেই জ্ঞান-লব্ধ বলে প্রতীত হন। উপরোক্ত সবগুলিই এইরূপ উদাহরণ।

বাড়ীর কাজে তিন ভাই-ই খুব তৎপর ছিলেন। পরিশ্রমে কেউ কারো থেকে কম ছিলেন না। তাঁদের বাড়ীর পিছনে একটা নতুন কুয়ো খোঁড়া হয়েছিল। সেই সময়কার একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। কুয়োর জল ব্যবহার করার আগে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হচ্ছিল। তিন ভাই ঠিক করলেন যে এই অনুষ্ঠানের পূর্বে কুয়ো খুব ভাল করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। কিন্তু এর জন্য বাড়ীর অন্য সকলের সম্মতি পাওয়া সহজ হবে না। সুতরাং ওঁরা সেদিন রাত্রে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে পরের দিনের ব্যবহারের জন্য জল ভরে রেখেছিলেন এবং নিজেদের সংকল্প-পূরণের কাজে নেমে পড়লেন। সকাল হবার আগেই ওঁরা কুয়োর তলাটা পরিষ্কার করে ছাড়লেন। এইভাবে দিন-রাত এক করে কাজ করাই ছিল তাঁদের সব সময়ের প্রকৃতি।

বাড়ীর কাজ ছাড়া তাঁদের অনেক সময়ে অন্যদের বাড়ীতেও যেতে হত। কেশবের এটা ভাল লাগত না। কিন্তু বয়সে সকলের ছোট হওয়ার দরুন যেই বড় দাদা মহাদেব শাস্ত্রী কট্‌মট্ করে তাকাতেন অমনি না গিয়ে আর উপায় থাকত না।

একদিন পুজো সেরে বাড়ী ফেরার পথে কেশব দেখল 'বিক্রম শশিকলা' নাটকের প্রাচীর পত্র লাগানো হয়েছে নানাস্থানে। সেগুলি দেখে কেশবের মনে হল "কে এই বিক্রম যার কেবল 'শ' শেখার পর এমন আড়ম্বর হচ্ছে?* 'বিক্রম শশিকলা'-কে বালক কেশব "বিক্রম 'শ' শিকলা" অর্থাৎ "বিক্রম" 'শ' শিখেছে" এই রকম পড়ল। "আমি তো মারাঠীর বই গড়-গড় করে পরে ফেলতে পারি, কিন্তু তার জন্য তো কেউ পিঠ চাপড়ে দেয় না।" বাল্যকালের এই সহজ অর্থ বিপর্যয় পরবর্তীকালে বহুবার ডাক্তার হেডগেওয়ারের পরিহাসের বিষয়ে পরিণত হয়েছিল।

সেইকালে সর্বমান্য রীতি অনুসারে তাঁদের গৃহেও শৌচ-অশৌচ (শৌচাচার)-এর কঠোর বিধি নিয়ম ছিল। জ্ঞাতসারে যদিও তার উল্লঙ্ঘন করার প্রবৃত্তি কেশবের ছিল না, কিন্তু সে ব্যাপারে তার বিশেষ আস্থাও ছিল না। কখনো-কখনো এই কড়াকড়ি দেখে তার হাসিও পেত। 'ই ডবল জি এগ মানে ডিম' এইভাবে কেশব ইংরাজী শব্দ মুখস্থ করতে বসলে বড় দাদার মেজাজ খুব গরম হয়ে যেত। কখনো-কখনো রেগে [illegible] তার বই হাত থেকে কেড়ে নিয়ে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। তখন রেবতীবাঈ এগিয়ে এসে মহাদেব শাস্ত্রীকে বকুনি লাগাতেন আর কেশবের পক্ষে কথা বলতেন।

মাতা-পিতার ছত্রছায়ায় থাকা জীবন অত্যন্ত সুখকর হয়। অনেকে মাতৃছায়াকে কোকিলের কুজনে নিনাদিত পুষ্পবন তথা ঘন-পল্লবিত আম্রকুঞ্জের ছায়ার সহিত তুলনা করেন, আবার অনেকে কল্পবৃক্ষের ছায়ার মত মূর্তিমান মমতার রূপ বলে এর গুণগান করেন। কিন্তু বিধাতার বিধানে কেশবের বয়স যখন তের-চৌদ্দ এবং সীতারামের বয়স আঠার বছর, তখন এই মমতার ছায়া তাদের উপর হতে অপসৃত হল।

সম্ভবতঃ ১৯০২ বা ১৯০৩ সালে নাগপুরে প্লেগের ভীষণ প্রকোপ দেখা দিল। উনিশ শতকের শেষ চার বছর এবং বিংশ শতকের প্রথম দশক এই চৌদ্দ বছরে ভারতে প্রায় এক কোটি মানুষ প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে। সেই প্লেগ যুগের এই ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এক লক্ষ জনসংখ্যার নাগপুর শহরে এক দিনই প্রায় তিন শো মানুষ প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেত। একজন পরিচিতকে শ্মশানে পৌছে আসার সঙ্গে-সঙ্গে আর এক জনের যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যেত। সমাজসেবী ও কর্তব্য-পরায়ণ ব্যক্তিদের যে কত পরিশ্রম করতে হত, তার কল্পনা করা যাবে না। কোন-কোন দিন দশ বারো অথবা পনের বার শ্মশানে দৌড়তে হত। এই প্রকার কর্মরত ব্যক্তিরও প্লেগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ ছিলনা। শহরে থাকাও কঠিন, আবার শহরের বাইরে গিয়ে কুঁড়ে ঘরে গিয়ে বাস করতে

---

* 'বিক্রম শশিকলাকে বালক কেশব "বিক্রম 'শ' শিকলা" অর্থাৎ "বিক্রম 'শ' শিখেছে" এই রকম পড়ল।

গেলে বাড়ীতে চুরির ভয়। সে এক বিচিত্র দোটানার অবস্থা।

সেই সময়ে আজকের মত কার্যকর ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থাও ছিলনা। বিদেশীদের সরকার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মানুষের সাহায্য করার পরিবর্তে তাদের কষ্ট আরো বাড়িয়ে তুলছিল। এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ বিপ্লবী ডাঃ খানখোজে লেখেন যে "কেউ সামান্য অসুস্থ হয়েছে খবর পেলেই তৎক্ষণাৎ সরকারী অধিকারীরা তাকে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে দরমা দিয়ে তৈরী ঝুপড়ীতে মরার জন্য ছেড়ে চলে আসত। অনেক সময়ে সরকারী ডাক্তারদেরও প্লেগের এত ভয় ছিল যে রোগীকে স্পর্শ না করে জোর করে প্লেগ ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিত। যদি রোগী প্লেগে না মারা যেত, তাহলেও সরকারের অবহেলার দরুন অবশ্যই মারা পড়ত।" (কেশরী, ৭ই আগষ্ট, ১৯৫৩)।

এই ভীষণ মহামারীর সময়ে বলিরাম পন্ত হেডগেওয়ার এক বিষম অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করছিলেন। তিনি নিজ গৃহে স্বচ্ছতার সব রকম উপায় গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শহরের বাইরে গিয়ে ঝুপড়ি বানিয়ে সেখানে বাস করায় তাঁর সায় ছিল না। অগ্নিহোত্রের দীক্ষা ও দারিদ্র্যই সম্ভবতঃ তাঁর এইরূপ সিদ্ধান্তের কারণ ছিল। হয়তো তাঁর নিজ গৃহের পরিচ্ছন্নতার উপর ও সেই কারণে সংক্রমণ হতে রক্ষা লাভের বিষয় পূর্ণ আস্থা ছিল। সেই সময়েও ভোর চারটের সময়ে ঘুম থেকে উঠে ঠাণ্ডা জলে স্নান সেরে ডুমুরের গাছের নীচে বসে বেলা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত আহ্নিক করতেন। এই দৈনন্দিন কাজ তাঁর নিয়মিত চলত। কিন্তু একদিন তাঁর বাড়ীতেও ইঁদুর মরতে লাগল। অতএব, সেখান থেকে চলে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হল। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে তাঁরা বডকস চৌকের নিকট তাঁদের জামাই শ্রীবিঞ্চুরের বাড়ীতে চলে এলেন।

এখানে আসার পরেও তিনি প্রতিদিন দেবপূজার জন্য নিজের বাড়ীতে যেতেন এবং কারো অন্তিম যাত্রার সময়ে ডাক পড়লে কখনো ইতঃস্তত না করে কর্তব্য মনে করে অবশ্যই যেতেন। শুধু তাই নয়, একই দিনে কয়েক বার শ্মশান যাত্রা করতে হলেও এবং প্রত্যেক বার ফিরে এসে ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হলেও তিনি তাঁর সামাজিক কর্তব্য তথা আচার নিষ্ঠায় কখনো অবহেলা করেননি।

অবশেষে একদিন বলিরামজী প্লেগের শিকার হলেন। একই সঙ্গে রেবতীবাঈও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শ্রীবিঞ্চুরে ও মহাদেব শাস্ত্রী কবিরাজের চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় কোন ঘাটতি হতে দেননি। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। মাঘ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথিতে শ্রীবিঞ্চুরের বাইরের কামরায় শ্রী বলিরামপন্ত এবং রেবতীবাঈ ভিতরের কামরায়--দুজনেই কিছুক্ষণের ব্যবধানে প্রাণ ত্যাগ করলেন। একে অপরের বিয়োগ সহ্য করতে পারবেন না, তাই একই সময়ে তাঁদের প্রয়াণ বোধ হয় ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত ছিল। দুজনকেই এক সঙ্গে একটা খাটেই শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। এবং একই চিতায় তাঁদের দাহ-সংস্কার করা হল। 'সহচারিণী' শব্দটিকে আক্ষরিক অর্থে সত্য প্রমাণ করে দেখালেন।

মা-বাবা দুজনেই চলে গেলেন। তাঁরা শান্তি পেলেন, কিন্তু এখন ঐ বালকদের কী হবে? তাদের উপর যেন আকাশই ভেঙে পড়ল।

২. বন্দেমাতরম্

বেদশাস্ত্রজ্ঞ শ্রী বলিরামপন্ত এবং তাঁর সঙ্গেই তাঁর পত্নী রেবতীবাঈয়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর হেডগেওয়ার পরিবারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাদেব শাস্ত্রীর উপর এসে পড়ল। যাগযজ্ঞ ও বেদপাঠের সাহায্যে সংসারে যে অর্থ আসছিল, তাতে টান পড়ল। একটিমাত্র খুঁটি অবলম্বন করে গড়ে তোলা গৃহের খুঁটি ভেঙে পড়লে যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থাই হল এই পরিবারের। এখন অনেক সময়ে সীতারাম ও কেশবকেই বাড়ীর রান্না করতে হত। যে দিন কোথাও নিমন্ত্রণ থাকত, সেদিন অবশ্য রোজকার এই কাজ থেকে ছুটি পাওয়া যেত। তা না হলে কাঠ চেরাই করা, ঘর দোর পরিষ্কার করা, জল তোলা, রান্না করা ইত্যাদি সংসারের সব কাজই নিয়ম করে তাদের করতে হত। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য কাজ করার ব্যাপারেও তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হত।

গুরুজনদের চাপ কমে যেতেই মহাদেব শাস্ত্রীর জীবন লাগামছাড়া হয়ে উঠল। পেপারওয়েট তুলে নেবার পর কাগজ যেমন হাওয়ায় এলোমেলো উড়তে থাকে, তাঁর অবস্থাও হল সেইরকম। শারীরিক বল যতক্ষণ মানসিক বলের সঙ্গে সংগতি রাখে ও তার নিয়ন্ত্রণ থাকে, ততক্ষণই সেই বল কল্যাণকর ও সুখপ্রদ হয়। অন্যথায় চিন্তাধারার স্থির স্রোত থেকে সরে বিকারের ঘূর্ণাবর্তে অথবা চঞ্চল ঢেউএর তোড়ে কোথায় ভেসে যাবে কেউ বলতে পারেনা। মাতা-পিতার মৃত্যুর পর মহাদেব শাস্ত্রী যা শুরু করেছিলেন এছিল তার পূর্ব লক্ষণ। সেই সময়ের অনেক কুঅভ্যাস ও ব্যসন জ্ঞানে-অজ্ঞানে তাঁর মধ্যে এসে গিয়েছিল। অবস্থা কী রকম দাড়িয়ে ছিল, তার একটা দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হবে। সেভাবে কেশব কোন দায়িত্ব পালনে অবহেলা করতনা। কিন্তু ভাং তৈরী করার কাজ তার বা সীতারামের কারো পছন্দ ছিলনা। এই কারণে কখনো-কখনো বড় দাদার সঙ্গে বাক্-বিতণ্ডাও হত। এমন কি তাঁর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বিরক্ত হয়ে সীতারাম বাড়ী ছেড়ে ইন্দোর বেদাধ্যয়নের জন্য চলে গেল। আর কেশবও ধীরে-ধীরে তার বন্ধুদের সঙ্গেই বেশী সময় কাটাতে আরম্ভ করল। সে সময়ে বেশীর ভাগ দিনই দুই ভাইকেই অভুক্ত থাকতে হত এবং ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে ঘুরতে হত।

এই অবস্থায় সীতারাম ও কেশব পরস্পরকে সামলে নিয়ে চলত। কোন দিন কেশবের আহার যদি না জুটত, তাহলে সীতারাম নিজের প্রতিদিনের ভোজনের স্থান শ্রী তাত্যাজীর গৃহে নিজে না গিয়ে কেশবকে পাঠিয়ে দিত। এত অভাব ও বিপদের দিনেও কিন্তু কেশব তার পড়াশুনায় উপেক্ষা করেনি। নিজের শ্রেণীতে যদিও সে প্রথম স্থানের অধিকারী ছিলনা, কিন্তু প্রথম পাঁচ জনের মধ্যে থাকত। এই অল্প বয়সেও তার সম্পর্কে যে ছাত্ররা আসত, তারা তার অলৌকিক আকর্ষণীয় ও প্রেমপূর্ণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় লাভ করত। বাইরে থেকে তাকে দেখতে

বা আকর্ষণ করার মত কোনো বস্তু তার কাছে ছিল না। তার রং ছিল কালো এবং মুখে বসন্তের দাগ ছিল। তার জামা-কাপড় সাদা-সিধে, কখনো-কখনো ছেঁড়াও থাকত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও গম্ভীর ও স্বল্পভাষী এই ছাত্র নিজের চতুর্দিকে বন্ধুদের একত্র করতে পারত একথা উল্লেখনীয়।

স্কুলের ছুটির পর এই বন্ধুদের নিয়ে কেশব মাঝে-মাঝে বেড়াতে বেরুত। আবার কখনো চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে তেলঙ্গখেড়ীর পুকুর পর্যন্ত দৌড়ত এবং সেখানে প্রাণভরে সাঁতার কাটত। নাগপুরে শুক্রবার দীঘির পূর্ব দিকে আগে একটা টিলা ছিল। এই ছোট টিলার উপর বন্ধুদের দুটো দল তৈরী করে ধ্বজ জয় করে আনার খেলা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এবং বাজী ধরেও চলত। সংঘর্ষের প্রতি আকর্ষণ মানব স্বভাবের একটি সহজ প্রবৃত্তি। কিন্তু মহারাষ্ট্রে ছত্রপতি শিবাজীর পরাক্রম পরম্পরা মানুষের রক্তের মধ্যে এমন ছেয়ে গিয়েছিল যে ছোট-ছোট ছেলেদের খেলার মধ্যেও যে দুটো দল তৈরী হত, তা হত মোগল ও মারাঠার নামে। শিবাজীর সময়ে ছোট-ছোট ছেলেরা ফণী মনসার মাথাকে মোগলদের মুণ্ড কল্পনা করে তাদের খেলার তলোয়ার দিয়ে যে আবেশের সঙ্গে সেগুলি কেটে ফেলত, সেই আবেশেই কেশবের বন্ধুদের খেলা চলত। খেলা এমনই জমে উঠত যে শুক্রবার তালাব থেকে ফিরে আসার পরেই বোঝা যেত কার পা মচকে গেছে আর কার দেহ ছড়ে গেছে।

খেলার এই রোমাঞ্চ শুধু বাহ্যিক ছিল না। সেই সময়ে সম্পূর্ণ দেশে এবং তার অনুষঙ্গ রূপে নাগপুর অঞ্চলেও যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনগুলি চলছিল বালকদের উপর তার প্রভাব বিস্তৃত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। এইসব খেলা ছিল তারই বাহ্যিক প্রকাশমাত্র। সেই সময়ে লোকমান্য তিলক 'কেশরী' সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাভিমানকে জাগ্রত করে যে সিংহ-গর্জন শুরু করেছিলেন, তাতে ব্রিটিশ শাসকেরা ভীত হয়ে পড়েছিল। শ্রী শিবরামপন্ত পরাঞ্জপের 'কাল' পত্রিকায় ব্যক্ত চিন্তাধারার ফলে তরুণ মনে যে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল, তাতে ইংরাজ শাসক বুঝি নিজেদের কালকেই চক্ষের সম্মুখে নাচতে দেখছিল। সেই সময়ে আফ্রিকার 'বুয়র যুদ্ধ' থেকে ফিরে এসে ডাঃ বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জে নিজের ডাক্তারী ব্যবসায়ের সঙ্গে-সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বরূপের নতুন কার্যক্রমও নাগপুরে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় মনোভাব-সম্পন্ন বন্ধুদের সংগ্রহ করে তাঁদের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় চিন্তা জাগরণের কার্যক্রমের যোজনা তৈরী করলেন। তার মধ্যে লোকমান্য তিলক প্রবর্তিত উৎসব ও আন্দোলনেরও সমাবেশ হত। অতএব, এই সব উৎসব ও আন্দোলনমূলক কার্যক্রম নাগপুরেও শুরু হল। অর্থাৎ নতুন চিন্তাধারার হাওয়া বইতে আরম্ভ করায় সেই সব চিন্তাধারায় জাগ্রত তথা অনুপ্রাণিত তরুণদের চতুর্দিকের পরিস্থিতির অন্তর্বাহ্য অবলোকন করার দৃষ্টি এবং তার বিশ্লেষণ করার সম্যক বুদ্ধিও স্বাভাবিক রূপে ক্রমশঃ প্রকাশ হতে শুরু করল।

এই তরুণরা যখন নিজেদের আশে-পাশে দৃষ্টি প্রসারিত করতে আরম্ভ করল তখনই তাদের মনে এই চিন্তা বলীয়ান হতে থাকল যে আমাদেরও রাষ্ট্রোত্থানের জন্য নিজেদের প্রচেষ্টার পরাকাষ্ঠা করা প্রয়োজন। কারণ, তৎকালীন পরিস্থিতির ছবি প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে অশান্ত করে তুলত এবং প্রত্যেক ভাবুক ব্যক্তির রক্তকে উত্তপ্ত করে তোলার মত হয়ে উঠছিল। সেই সময়ে তরুণদের নাগপুরের দৃশ্য, কী ভীষণ বলে মনে হত তার ছবি

অনেক বছর যাবৎ বিপ্লবের জন্য আমেরিকা প্রবাসী বিখ্যাত বিপ্লবী শ্রীরামলাল বাজপেয়ী তাঁর 'অপ্রকাশিত' আত্মজীবনীতে এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ "এক কাবুলী পাঠান লক্ষাধিক লোকের বস্তীতে প্রবেশ করে গরীব মানুষদের মেরে এবং তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিরাপদে ফিরে যেতে পারে। হিস্‌লপ কলেজের পাশে বহু নোংরা বস্তী ছিল। মদ, চরস ও গাঁজা পান করে অল্পবয়স্ক মুসলমান ছোঁড়াগুলো আমাদের কলেজ যাবার সময়ে গালিগালাজ করে আর আমরা চুপচাপ সব অপমান সহ্য করে কলেজে চলে যাই। একজন ইংরেজ সেপাই একা শহরে এসে হাজার-হাজার লোকের সামনে দু-একজন গরীবকে মেরে-ধরে ফিরে চলে যায়। আমরা শুধু তাকিয়ে দেখি। কেউ এর প্রতিকার করে না। ব্যায়ামাগারে আমরা শিক্ষিত লোকেরা যদি ব্যায়াম করতে যাই, তখন অবশিষ্ট সমাজ আমাদের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। এই রকম মৃত সমাজকে দেখে কী যে করা যায় তা বুঝতে পারি না।"

ডাঃ মুঞ্জের বয়স ১৯০৪-০৫ সালে বত্রিশ-তেত্রিশ বছর ছিল মনে হয়। তাঁর আশেপাশে একত্রিত মানুষদের মধ্যে আইনের শাসন মেনে চলার সাত্ত্বিক মনোবৃত্তির মানুষ থেকে আরম্ভ করে পিস্তল নিয়ে খেলা করার মত রাজসিক স্বভাবের তরুণ পর্যন্ত সকলেই ছিল। নাগপুরে কোন্ সরকার-বিরোধী তথা জন-জাগরণের আন্দোলন হলে তাতে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হাত থাকত অবশ্যই।

লোকমান্য তিলক এই সময়েই 'কেশরী' পত্রিকায় 'পয়সা-ফাণ্ডের' কল্পনা উপস্থাপিত করেন। চারদিকে তদনুসারে কাজও আরম্ভ হয়ে গেল। নাগপুরে ঐ কল্পনাকে সাকার করার জন্য যে প্রচেষ্টা শুরু হল তাতে ছাত্র কেশব হেডগেওয়ার অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সংলগ্ন হল। বাড়ীতে আধপেটা খেয়েও সে অন্যের বাড়ীতে কখনো খেতে যায়নি এবং তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের কাছ থেকে পূজাপাঠ, শিক্ষকতা ইত্যাদির কাজ করে কিছু অর্থ গ্রহণ করত। সেই কেশবের 'পয়সা-ফাণ্ডের' জন্য বাড়ী-বাড়ী গিয়ে অর্থ সংগ্রহে কোন সংকোচ ছিল না। 'মরে গেলেও মাঙিনা কভু নিজ দেহের কাজে। পরমার্থের কারণে মোর মাথা নিচু হয় না লাজে।" এই প্রবৃত্তি হল সমাজসেবীর। অতএব, রাষ্ট্রকার্যের জন্য অভুক্ত থেকেও দোরে দোরে ভিক্ষা করার তৎপরতা যদি কেশব নিজের ছাত্র জীবনেই দেখাতে শুরু করে থাকে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

মা-বাবার মৃত্যুর পর ধীরে-ধীরে কেশবের বাড়ী থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হতে শুরু করেছিল। সে তার বন্ধু বঝের বাড়ীতে পড়তে যেত। তবু মাঝে-মাঝে বাড়ীতে যাতায়াত চলত। কিন্তু ১৯০৫-এর দিকে মহাদেব শাস্ত্রীর ভাইয়ের গতিবিধি একেবারেই অপছন্দ হতে লাগল। "পতাকা জয়ের খেলা, সভা-সমিতিতে যোগদান, মুষ্টিফাণ্ড জমা করা, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আন্দোলন নিয়ে আলোচনা প্রভৃতি আমাদের মত গরীবদের জন্য নয়। তুই এই সব ফালতু ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কেন জড়াচ্ছিস নিজেকে? আরে, খাওয়া-দাওয়া করা, ডন-বৈঠক লাগানো আর বাড়ীর কাজ করা — এটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। এই সব বেকার ঝামেলার সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক? আমরা ভাল, আমাদের সংসার ভাল।" এই ধরনের উপদেশ তিনি দিতেন। ওদিকে মহাদেব শাস্ত্রীর জীবন ও আচরণ তরুণ কেশবকে বিরক্ত করে তুলছিল। তার

মনে হল এইভাবে বড় দাদার স্বেচ্ছাচারিতার উপর নির্ভর হয়ে থাকার চেয়ে কষ্ট সহ্য করেও শিক্ষালাভ ও দেশের সেবা করার ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করাই ভাল। স্বাবলম্বনের ভাবনা ও তার জন্য আবশ্যক আত্মবিশ্বাস দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকল। এর পিছনে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের ভালবাসা ও দেশভক্ত শিক্ষকদের স্নেহপূর্ণ প্রেরণাও কাজ করছিল। ডাঃ মুঞ্জেরও বিরাট সাহায্য সে লাভ করছিল।

কেশবরাওএর বয়স এখন ষোল বছর। সভা-সমিতিতে আলোচিত বিষয়গুলিও তাঁর মনকে আলোড়িত করত। অপরদের বক্তৃতা শুনে শুনে কয়েকজন সমবয়স্ক তরুণের মনে হল যে আমাদেরও বক্তৃতা দেওয়া শেখা উচিত। এর জন্য তাঁরা একটি আলোচনা চক্র শুরু করলেন। পরবর্তীকালে সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ পাণ্ডুরঙ্গরাও খানখোজের বিপ্লবী গোষ্ঠী 'স্বদেশ বান্ধব'-দের কাছ থেকেও এই আলোচনা চক্র উৎসাহ লাভ করেছিল। ডাঃ খানখোজে 'কেশরী' সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর নিবন্ধমালায় বলেন, "ব্যাখ্যানমালা এবং স্বদেশী প্রচারের কাজে গর্দে, জোশী, মোরু অভ্যঙ্কর, খরে, সপ্রে, বাবুরাও সুতার, কেশবরাও হেডগেওয়ার ইত্যাদি অনেক তরুণ এগিয়ে এসেছে। ডাঃ খানখোজের 'স্বদেশ-বান্ধব' সংগঠনের দিক থেকে স্বদেশী বস্তুর প্রচার করার উদ্দেশ্যে 'আর্য বান্ধব বীথিকা' নামক বিপণির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল মহাল এলাকায়। এতে হাতে গড়া ট্যারা-বেঁকা সাবান, বোতাম, কাগজ, খাম ইত্যাদি বিক্রীর জন্য রাখা হয়েছিল। এই দোকানের জিনিসগুলির উপর 'পাঁচ অস্ত্রের ছাপ' দেওয়া থাকত। এর থেকে অনুমান করা যেত যে দোকানের প্রবর্তকদের মনোবৃত্তি কী ধরণের ছিল। কেশবরাও দোকানে বিক্রীর কাজে বেশ কিছুটা সময় দিতেন এবং বিদ্যালয় ও অন্যত্র জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশীর ব্যবহারের জন্য প্রচার করতেন।

কেশবরাওয়ের এক বাল্যবন্ধু শ্রীবলবন্তরাও মণ্ডলেকরের স্মৃতি অনুসারে ১৯০৫-৬ এর কাছাকাছি সময়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কয়েকজন নির্বাচিত ছাত্রের একটি গুপ্ত বৈঠক ডাঃ মুঞ্জের বাড়ীতে হয়েছিল। সেই বৈঠকে বোমা তৈরী করার পদ্ধতি বোঝানো হয়। সেখানে মহারাষ্ট্র ও বাংলার পরিস্থিতিরও বর্ণনা করা হয়। এই বৈঠকে কেশবরাও হেডগেওয়ার, মণ্ডলেকর ইত্যাদি তরুণরা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ঐ সভা কার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সেকথা জানা যায়নি।

ঐ সময়ে সারা দেশে যে হাওয়া বইছিল, তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় নাগপুরের ঐ গুপ্ত বৈঠক থেকে। সেটা ছিল বিপ্লবের হাওয়া এবং জন-সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক 'বঙ্গ-ভঙ্গ' করার ফলে বিপ্লব-আন্দোলন সাময়িক রূপে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বাংলার মুসলমানদের কাছে টানার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার ১৯০৫ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর বাংলাকে দুভাগে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কোন দেশপ্রেমিকেরই এই সিদ্ধান্ত রুচিকর মনে হতে পারে না। সরকারের অনুমান ছিল যে এর প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কিছু হিন্দুর মধ্যে দেখা দিতে পারে এবং একটু ডাণ্ডা দেখালে আর ক্রোধ প্রকাশ করলেই বিক্ষোভ সেখানেই চাপা পড়ে যাবে। কিন্তু সরকারের এই অনুমান যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে হিন্দুদের উৎসাহ এই বঙ্গভঙ্গের কারণে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়বে, ভ্রান্ত বলে

প্রমাণিত হল। ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ তারিখের দিনটি সমগ্র বাংলায় 'শোক দিবস' রূপে পালন করা হল এবং লক্ষ-লক্ষ মানুষ সভা, মিছিল, বিক্ষোভ-প্রদর্শন ও প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করে। অনেকেই সেদিন 'অরন্ধন' ও 'অনশন ব্রত' পালন করেন। সর্বসাধারণ জনগণের ছিল এই প্রতিক্রিয়া। কিন্তু ভাবাবেগে উদ্বেল তরুণ ও যুবকেরা বিদেশী বস্ত্রে আগুন লাগিয়ে বিদ্যালয় বর্জন করে এবং বিদেশী বস্ত্র বয়কট করে স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে ওরা কিছু কার্যকর প্রয়াস করার উদ্দেশ্যে কলকাতা, ঢাকা ইত্যাদি স্থানে গোপনে সশস্ত্র বিপ্লবী দল সংগঠিত করতে আরম্ভ করে। এইভাবে নানা প্রকারে সরকার-বিরোধী বিক্ষোভ জন-সাধারণ প্রকাশ করতে আরম্ভ করে এবং দিনের পর দিন তা প্রখরতর রূপ ধারণ করতে থাকে। সরকারও জনতার এই বিক্ষোভকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যে অনেক কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে। কিন্তু প্রথম দিকে এই সব উপায় বিপ্লবের প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিকে শান্ত করার পরিবর্তে আরো বেশী বহ্নিমান্ করে তুলল। কিছুদিনের মধ্যেই বঙ্গভঙ্গ শুধু পূর্বাঞ্চলেই নয়, সমগ্র দেশের এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনে পরিণত হল। সকল প্রান্তকে একই সূত্রে গেঁথে ফেলল দেশভক্তির সুপ্ত ভাবনা, বাংলার উপর ইংরাজদের এই প্রত্যক্ষ আঘাত হতে যার উদ্ভব হয়েছিল। সেই ভাবনার দিব্য প্রকাশ রূপে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র সমগ্র ভারতে গুঞ্জিত হতে শুরু করল। সেই সময়ে 'বন্দেমাতরম্'-এর মন্ত্র জনমনে কী বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়েছিল তার বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ লিখেছিলেন যে ''বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের মাধ্যমে একটি দিনেই সম্পূর্ণ জনতা দেশভক্তির দীক্ষা লাভ করে।'' দেশভক্তির দীক্ষা-প্রদানকারী এই মন্ত্র নাগপুরেও ধ্বনিত হল।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবী পটভূমিতে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। সেখান থেকে স্বদেশী, স্বরাজ্য, বয়কট এবং জাতীয় শিক্ষার সক্রিয় আন্দোলনের চতুঃসূত্রীয় কার্যক্রমের সংকল্প গ্রহণ করে প্রতিনিধিরা নিজ-নিজ প্রদেশে ফিরে গেলেন। ঐ অধিবেশনে যাঁর বিশেষ প্রেরণা ও উৎসাহে এই চতুঃসূত্র স্বীকৃত হয়েছিল, সেই লোকমান্য তিলক প্রত্যাবর্তনের পথে নাগপুরে থামলেন। তাঁর ওজস্বী বক্তৃতাগুলি কেশবরাও হেডগেওয়ারের মত উদ্দীপ্ত তরুণরা অত্যন্ত উৎসুকতা ও তন্ময়তার সঙ্গে শুনেছিলেন। এর স্বাভাবিক পরিণাম স্বরূপ তাঁদের জাতীয় ভাবনা আরো বেশী উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল।

বাংলা থেকে এই বিক্ষোভের ঝঞ্ঝাবাত সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। তবে একথা বলা অতিশয়োক্তি হবে না যে মহারাষ্ট্রে এর পরিণাম বাংলার মতই তীব্র ও ব্যাপকই নয়, বরং বেশীই হল। নিজের বাড়ীর প্রতি আকর্ষণ কমে যাওয়ায় স্কুলের ছুটি থাকলেই কেশবরাও রামপায়লীতে তাঁর কাকার কাছে চলে যেতেন। দূর-সম্পর্কের কাকা হলেও তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত স্নেহ ও আত্মীয়তাপূর্ণ ছিল। তাঁর নাম ছিল মোরেশ্বর শ্রীধর হেডগেওয়ার। কিন্তু তাঁকে সকলে 'আবাজী' নামে সম্বোধন করতেন। তিনি রাজস্ব বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯০৬-০৭ সালে তিনি রেভিনিউ ইন্সপেক্টরের কাজ করছিলেন। রামপায়লীতে তিনি একটা

ছোট বাড়ী ও কৃষির ক্ষেতও কিনেছিলেন। তাঁর ক্ষেতে চার বলদের কৃষিকাজ হত, যাতে গম, ধান, ছোলা ইত্যাদি পর্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হত। গোয়ালে দুগ্ধবতী গাভীও ছিল। ছুটিতে কাকার বাড়ীতে এসে কেশবরাও সেখানকার তরুণদের একত্র করে তাদের দেশের তখনকার পরিস্থিতি ও স্বদেশী আন্দোলনের বিষয় বলতেন এবং তাঁদের মনেও এই ইচ্ছা জাগিয়ে তুলতেন যে তাঁদেরও চুপ করে ঘরে বসে না থেকে নিজেদের উদ্যোগে কিছু করা উচিত। নরহরি সিংহ ঠাকুর, ভগোরে ও ডবীর প্রমুখ সজ্জনদের তিনি এই সব বৈঠকেই নিজের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে আকৃষ্ট করেছিলেন এবং নিজের একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন।

১৯০৭ অথবা ১৯০৮ সালের বিজয়া দশমীর একটি ঘটনা কেশবরাও-এর সেই সময়ের মনঃস্থিতির উপর চমৎকার আলোকপাত করে। স্বদেশীর প্রচার ও 'বন্দেমাতরম্'-এর প্রসারে তাঁর মন সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। বিপ্লবী দলের চিন্তাধারার দরুন তাঁর আচরণে নির্ভীকতা ও বাণীতে ওজস্বিতার সঞ্চার হওয়াও স্বাভাবিক ছিল। বিদ্যালয়ের প্রথম দিকের কয়েক বছর তাঁর ব্যবহারে গাম্ভীর্য ও মৌনতাই বেশী প্রকাশ পেত, কিন্তু দেশভক্তির ভাবনা বৃদ্ধিলাভ করার সঙ্গে-সঙ্গে গাম্ভীর্যের সাথে সাথে উৎসাহ এবং মনোগত চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের আগ্রহ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হতে থাকে। সে বছর দশহরার পূর্বেই তিনি রামপায়লীতে চলে এসেছিলেন।

বিজয়া দশমীর দিন বন্ধুদের কাছ থেকে কেশবরাও জানতে পারেন যে সন্ধ্যার সময়ে গ্রামে সীমোল্লঙ্ঘনের শোভাযাত্রা বের করা হবে। তিনি ভাবলেন এই দিন স্থানীয় এলাকার দুই-তিন শো মানুষ উৎসবে যোগদান করবে। তাঁর স্বদেশী-প্রচারের এটা একটা সুন্দর সুযোগ এনে দেবে। তৎক্ষণাৎ তিনি বন্ধুদের সামনে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করলেন এবং ঐ কার্যক্রমে তাঁরা নিজেরা পরিচিত ব্যক্তিদের যেন নিয়ে আসেন বলে অনুরোধ করলেন। তিনি নিজেও প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন।

সন্ধ্যার সময়ে যথারীতি গ্রামের বাইরে গিয়ে রাবণ-বধ করার জন্য সীমোল্লঙ্ঘনের শোভাযাত্রা বের হয়। বাজনা বাজনদাররা চলল, সেই সঙ্গে গ্রামের প্রতিষ্ঠিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ও সরকারী অফিসাররা সকলেই সেজে-গুজে ধীর গতিতে শোভাযাত্রার সঙ্গে চললেন। আজকের শোভাযাত্রায় তরুণদের সংখ্যা অন্যবারের চেয়ে বেশী বলে মনে হচ্ছিল। এবং তাঁদের মধ্যে খুব উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। শোভাযাত্রা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবার আগেই কেশবরাও 'বন্দেমাতরম্'-এর উদ্‌ঘোষ করলেন এবং পূর্ব-সংকেত অনুযায়ী অন্য তরুণরা তাঁর উদ্‌ঘোষণার সঙ্গে তাদের ধ্বনি যুক্ত করল। রাবণ-বধের স্থানে শোভাযাত্রা বিসর্জনের পর সবাই একটু থামতেই তরুণদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেশবরাও তাঁর বন্ধু ভগোরে ও ডবীর উচ্চকণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' রাষ্ট্রগীত গান করলেন। গান শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে কেশবরাও 'রাবণ-বধের' বাস্তবিক অর্থ কী? — এইভাবে সেই সময়কার অনুকূল বিষয় নিয়ে নিজের অভিনব কল্পনার ভিত্তিতে অতি উগ্র বক্তৃতা দিলেন। এই ভাষণ শোনামাত্রই সরকারী অফিসাররা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, অভিভাবকেরা ভয় পেলেন। গ্রামে সকলের মুখে একটাই আলোচনা শুরু হল। কেউ কেউ এই ঘটনার প্রশংসা করল, আবার অনেকে 'এবার না জানি

কী হবে,' এই কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

নির্দিষ্ট দিনে একই পথ ধরে গ্রামের বাইরে গিয়ে চৈতন্যহীন এবং কেবল একটা গতানুগতিক প্রথা হিসাবে রাবণ বধকারী মানুষদের কুণ্ঠিত বৃত্তিকে কেশবরাও আজ বাস্তবিক সীমোল্লঙ্ঘন করালেন। ১৯২০ সালের সামগ্রিক আন্দোলন এবং তার পরে 'বন্দেমাতরম্'-এর ঘোষণা এক সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এই অবস্থা সেই সমস্ত দেশভক্তদের তপস্যার ফলে উদ্ভব হয়েছিল, যাঁরা এই শতাব্দীর প্রারম্ভে অত্যন্ত বিপরীত পরিস্থিতিতেও নির্ভীকতার সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে নিস্তেজ ও নিরুদ্যম সমাজের কর্ণকুহরে এই সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে তাদের জাগ্রত করার প্রয়াস করেছিলেন।

এই ঘটনার সংবাদ পুলিশের উপর মহলে পৌঁছে দেওয়া হল এবং রাজদ্রোহের মামলা চালাবার চেষ্টা করা হল। তার জন্য সরকারী উকিল আর্মস্ট্রং রামপায়লীতে এল। তার আগেই ডবীর ও ভগোরে দুজনকেই বিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। যদি মামলা চলে তাহলে তিন তরুণেরই জীবন নষ্ট হয়ে যাবে, একথা চিন্তা করে ভাণ্ডারার শ্রী পুরুষোত্তম সীতারাম দেব এগিয়ে এলেন এবং তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী রুস্তমজীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বললেন, "এই বালকদের বুদ্ধি কতটুকু? তাদের বয়সের কথা বিবেচনা করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করা উচিত। তাছাড়া, ওরা যে গান গেয়েছে তাতে মাতৃভূমির বন্দনা ব্যতীত আর কী ছিল?" সরকারী অফিসারদের এই যুক্তির কথা বোধহয় বোধগম্য হয়নি, তবু শ্রী দেবের প্রার্থনা ও আগ্রহের কারণে মামলার চিন্তা ত্যাগ করা হল। ডবীর ও ভগোরেকে পুনরায় স্কুলে ভর্তি করে নেওয়া হল। শ্রী কেশবরাও রামপায়লী থেকে যশস্কর অভিজ্ঞতা নিয়ে ছুটি শেষ হবার পর নাগপুর প্রত্যাবর্তন করলেন। মামলার সংকট থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেলেও এর পর থেকে কেশবরাওএর পিছনে সর্বদাই সরকারী গোয়েন্দাদের ঝামেলা শুরু হয়ে গেল।

কেশবরাও ফিরে এলেন, কিন্তু তাঁর কাকা আবাজী হেডগেওয়ার সরকারের বক্র দৃষ্টির শিকার হয়ে পড়লেন। রামপায়লী থেকে তাঁকে বদলি করে দেওয়া হল। সরকারী অফিসাররা ওদিকের ক্রোধ এই দিকে প্রকাশ করলেন। ধোপার উপর রাগটা পড়ল তার গাধার উপর। অতএব, তাঁর মনে এই স্বাভিমানপূর্ণ চিন্তার উদয় হল যে এমন সরকারের চাকুরী চাইনা এবং তিনি চাকুরী থেকে পদত্যাগ করলেন। সেই সময়ে যাঁরা টাকা-আনা দিয়ে জীবনের চিন্তা করতেন সেই রকম অনেক বন্ধু বললেন, "কেশবরাওএর দেশভক্তি কাকা সহ্য করতে পারেননি।" কিন্তু এই ধরনের টীকা-টিপ্পনী শোনার মত তাঁর ফুরসৎ কোথায়?

স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা প্রদীপ্ত নাগপুরের বাতাবরণকেও পরিবর্তন করার দিক থেকে সরকার চেষ্টা শুরু করে দেয়। অতএব, আজ যদি কেউ 'স্বদেশী'র দোকান করার জন্য "হ্যাঁ" করে দেয় তো পরের দিনই 'আমি এই দোকানের জায়গা দিতে পারব না' বলে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে। তরুণরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হবার জন্য ও ব্যায়াম করার জন্য আখড়া শুরু করে তাহলে পুলিশের হুমকির দরুন সেটা বেশী দিন চলতে পারে না। শুধু তাই নয়, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জন্মোৎসব পালনের জন্য স্থান পাওয়াও দুরূহ হয়ে উঠল। লোকনায়ক

মাধবরাও আণের জীবনের এই সময়কার বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর জীবনচরিত লেখক লেখেন — "যারা 'বন্দেমাতরম্' শব্দের উচ্চারণ করত, শিবাজী উৎসব, গণপতি উৎসব, রামদাস-নবমী ইত্যাদির আয়োজন করত এবং প্রকাশ্য সর্বজনীন সমারোহে অংশগ্রহণ করত, এই ধরনের ব্যক্তিরা সিংহের ভয়ঙ্কর মুখের মধ্যে হাত ঢোকাবার মত সাহসী বলে বিবেচিত হত।"

কিন্তু সিংহের ভয়ঙ্কর মুখগহ্বরে শুধু হাত ঢোকানোই নয়, তার ভীষণ দাঁতগুলোকে পর্যন্ত উপড়ে ফেলার প্রয়াস করার ধৈর্যও কিছু তরুণের মধ্যে ছিল এবং তাঁরা সরকারী কোপের তীব্রতার ধারণা থাকা সত্ত্বেও সভা ও শোভাযাত্রায় 'বন্দে মাতরম্' রাষ্ট্রগীত গান করা এবং মন্ত্রোদ্‌ঘোষ বরাবর চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বিদ্যার্থী শ্রেণীর মধ্যে আন্দোলনের প্রতি এই অভিরুচি শাসক বর্গের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠেছিল। অতএব, সরকার এক সার্কুলার পাঠিয়ে ছাত্রদের কোন সভার ও বিক্ষোভ-প্রদর্শনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করল এবং শিক্ষকদের নির্দেশ দিল যে এই আদেশ লঙ্ঘনকারী ছাত্রদের নাম যেন সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়। সকল ছাত্রদের এই সার্কুলারে উল্লেখিত সর্তকবাণী জানিয়ে দেওয়া হয়। এটাই ছিল সেই কুখ্যাত 'রিস্‌লে সার্কুলার'।

নীল সিটি হাইস্কুলেও এই সার্কুলার এসেছিল। এর কারণে সেখানকার শিক্ষকদের সামনে এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁদের একটা মন বলছিল যে সরকারের ছত্রছায়ার এই বিদ্যালয় পরিচালিত হওয়ার দরুন সার্কুলার পালন করে 'জী হুজুর' করতে হবে, কিন্তু অপর দিকে ভিতর থেকে তাঁদের মন তাঁদেরই খেয়ে ফেলেছিল। ঐ বিদ্যালয়ের বেশীর ভাগ শিক্ষকই ছিলেন জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন। সেই কারণে যদিও সার্কুলারের অর্থ ছাত্রদের বুঝিয়ে দিলেন, তথাপি তাঁরা তরুণদের উপযুক্ত দিশায় এগিয়ে চলার পথে কোন বাধা সৃষ্টি করতে চাইছিলেন না। ঐ শিক্ষকদের সম্বন্ধে ডাক্তার হেডগেওয়ারের এক সহপাঠী চান্দার শ্রী নানাসাহেব ভাগবৎ বলেন যে "বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বঝলওয়ার, সোমণ ও বাকরে এঁদের চালচলন ছিল অত্যন্ত সাদা-সিধে, এবং হিন্দুদের পোশাক তাঁরা পরিধান করতেন। আর তাঁরা মারাঠী রাজ্যের প্রতি গৌরবের মনোভাব পোষণ করতেন। বিদ্যালয়ের পাঠের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় বোঝাতেন যে ভোঁসলেদের রাজ্য কীভাবে শেষ হল। তাঁরা সকলেই নিখুঁত স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করতেন।"

শিক্ষকেরা জাতীয় মনোভাবাপন্ন হওয়ার দরুন সভাগুলিতে ছাত্রদের বিপুল সংখ্যা উপস্থিত থাকত। অতএব, সরকারের একথা জানতে বিলম্ব হয়না যে 'রিস্‌লে সার্কুলার' অনুযায়ী শিক্ষকেরা হয় ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না অথবা করতে চাইছেন না। শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে বার-বার বিদ্যালয়গুলিকে ও ছাত্রদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া এই হয় যে "স্কুলের সময় ছাড়া অন্য সময় ছাত্ররা কী করে, তার সঙ্গে সরকারের কী সম্পর্ক" এই মনোভাব ছাত্রদের মধ্যে বিরাজ করতে শুরু করল। আর সরকারের এই অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করার পরিকল্পনা আরম্ভ হয়। বিভিন্ন সভায় যাতায়াতকারী সব ছাত্রদের নাম উপরতলায় পাঠাবার কথাও উঠল। কিন্তু তার ফলে আন্দোলন করার চিন্তা আরো জোরদার হয়ে উঠল। আন্দোলনের নেতৃত্ব স্বভাবতঃ

বিদ্যালয়ের শীর্ষ শ্রেণীর ছাত্রদের হাতেই থাকত, কেশবরাও তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। এটা ১৯০৮ সালের ঘটনা।

সেই সময়ে কেশবরাও-এর বয়স ছিল উনিশ বছর। বয়সের অনুরূপ তেজস্বী স্বভাব, নির্ভীকতা, দেশভক্তিতে ওতপ্রোত হৃদয় এবং দশ জনকে সঙ্গে নিয়ে গৃহীত কাজকে নিখুঁতভাবে সম্পূর্ণ করার দক্ষতা, এই সব গুণই একই সঙ্গে তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এই সকল গুণের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের জনপ্রিয় এই ছাত্র, শিক্ষকদেরও প্রিয়পাত্র ছিল। কেশবরাও ও তাঁর সহপাঠীরা সংকল্প করলেন যে অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য যখন স্কুল ইন্সপেক্টর আসবে তখন সমস্ত ছাত্র একসঙ্গে 'বন্দেমাতরম্'-এর উদ্‌ঘোষ করবে এবং এইভাবে রিস্‌লে সার্কুলারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। কানে কানে এই যোজনার কথা সব ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, ইন্সপেক্টর যে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করবে, সেই শ্রেণীর ছাত্ররা তৎক্ষণাৎ এক স্বরে ধ্বনি দেবে। ছাত্রদের মধ্যে আরো সূচনা দেওয়া হয় যে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পরে যখন এবিষয়ে অনুসন্ধান শুরু হবে তখন এই যোজনা কে তৈরী করেছে সে বিষয়ে কোন ছাত্র কারোর নাম বলবে না। এইসব প্রস্তুতি হয়ে যাবার পরে সব ছাত্ররা সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে রইল যেদিন ইন্সপেক্টর স্কুল পরিদর্শনে আসবে।

নির্দিষ্ট দিনে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী জনার্দন বিনায়ক ওক এবং মুসলমান ইন্সপেক্টর শ্রেণীগুলি পরিদর্শনের জন্য চললেন। সবার আগে তাঁরা ম্যাট্রিক শ্রেণীতে প্রবেশ করলেন। তৎক্ষণাৎ 'বন্দেমাতরম্'-এর মন্ত্রঘোষের মাধ্যমে তাঁদের অকল্পিত ও অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা করা হল। সেই সময়ে ছাত্রদের মুখমণ্ডল সাফল্যের আনন্দে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ইন্সপেক্টর একেবারে আশ্চর্যচকিত ও স্তম্ভিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। প্রধান শিক্ষকও ঘাবড়ে গেলেন। তিনি ইন্সপেক্টরকে অন্য একটি শ্রেণীকক্ষে নিয়ে গেলেন। সেখানেও 'বন্দেমাতরম্'-এর উদ্‌ঘোষ নিনাদিত হল। প্রথম যে শ্রেণীতে ইন্সপেক্টর পরিদর্শনে গিয়েছিল, সেই শ্রেণীর ঘনগম্ভীর গর্জন শুনে উৎসাহিত এই শ্রেণীর ছাত্ররা আরো উচ্চকণ্ঠে ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ধ্বনি দিল।

বিদ্যালয়ের পরিদর্শন সেখানেই শেষ হয়ে গেল। ইন্সপেক্টর ভীষণ রেগে-মেগে গটমট করে বেরিয়ে গেল। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বাস্তবিক পরীক্ষার সময় এখন শুরু হল। যে শ্রেণীগুলিতে এই ঘটনা ঘটেছিল সেখানে তদন্ত শুরু হল। এই যোজনা কে তৈরী করেছিল তা জানার জন্য প্রত্যেক ছাত্রকে ডেকে ভীষণভাবে জেরা করা হল। কিন্তু ছাত্ররা পূর্ব সংকল্প অনুসারে, মৌনং সর্বার্থ-সাধনম্ এই মন্ত্রকে অনুসরণ করাই উপযুক্ত বিবেচনা করল। কেউই কোন কথা বলতে রাজি হল না।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের শাস্তি দেবার কথা ঠিক করেই রেখেছিলেন। কিন্তু তবু বার-বার তাঁরা ধমক দিয়ে বললেন, "এখনও নাম বল তা না হলে সব ছাত্রদের স্কুল থেকে বিতাড়িত করা হবে।" কিন্তু কারো কাছ থেকে কিছু জানা গেল না। অবশেষে চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দেওয়া হল যে "যতক্ষণ পর্যন্ত নাম জানানো হবে না ততক্ষণ দুই শ্রেণীর ছাত্রদের

বিদ্যালয়ে আসতে দেওয়া হবে না।" সব ছাত্ররা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে-দিতে বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে গেল।

এরপর কী হবে? এই প্রশ্ন দেখা দিল। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি শুনে সরকার যতখানি বিচলিত হয়েছিল তার চেয়ে সম্ভবত বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন সেই সমস্ত অভিভাবক যাঁরা শুধুমাত্র পরিবারের সোজা-সরল জীবন যাপনকেই নিজেদের একমাত্র সার্থকতা বলে মনে করতেন এবং কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চাইতেন না। সরকারের সঙ্গে সংঘাতের কল্পনায় যেখানে বড়-বড় মানুষের বুকও কেঁপে উঠত, সেখানে এই সব সাধারণ অভিভাবকদের উপর এই ঘটনার কী পরিণাম হয়েছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। অনেক অভিভাবক তাঁদের ছেলেদের পরামর্শ দিলেন যে, "প্রকৃত নেতার নাম বলে দাও, আর ঝুট-ঝামেলা থেকে মুক্তি পাও।" কিন্তু নাম বলানো এত সহজ ছিল না।

বিদ্যালয় থেকে ফিরে কেশবরাও হেডগেওয়ার ও তাঁর সঙ্গীরা ডাঃ মুঞ্জে এবং 'দেশসেবক' সংবাদ-পত্রের সম্পাদক শ্রী অচ্যুত বলবন্ত কোল্‌হটকরের সঙ্গে দেখা করলেন। এবং আলাপ-আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত করা হল যে যতদিন পর্যন্ত কাউকেই শাস্তি না দিয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবেনা, ততদিন পর্যন্ত বিদ্যালয়কে বর্জন করা হবে। পরের দিন বিভিন্ন পথের উপর ধরনা দিয়ে সব ছাত্রদের বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করার পরিকল্পনা তৈরী হল। বাড়ী-বাড়ী গিয়ে প্রকাশ্যে সম্ভব না হওয়ায় প্রত্যেক ছাত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে গোপনে সাক্ষাৎ করে দৃঢ়তার সঙ্গে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য তাদের প্রস্তুত করার ব্যবস্থাও শুরু হল।

এই আন্দোলন সাধারণভাবে প্রায় দেড় থেকে দু'মাস চলল। এই সময়ে হরতালের কারণে যাতে মারপিট না হয়, তার জন্য বিদ্যালয়ের রাস্তায় পুলিশ পিকেট বসিয়ে দেওয়া হয়। ছাত্রদের ঐক্য বজায় রাখার জন্য কেশবরাওকে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যেতে হল। এই ব্যাপারে তিনি শ্রী অচ্যুতরাও কোল্‌হটকরের নিকট হতে বিশেষ সাহায্য লাভ করেছিলেন। ঐ সময়ে তিনি নাগপুরের তিলক নামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা দিয়ে সর্বদা তাদের উৎসাহিত করতেন। তিনি কিছুতেই ছাত্রদের মনোবল ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। এই হরতালের দরুন ছাত্রদের পড়াশুনার ক্ষতির কথা চিন্তা করে অভিভাবকেরা ও স্বাধীনতাবাদী শিক্ষকেরা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। অভিভাবকেরা অবিরাম ছাত্রদের 'এবার হরতাল শেষ করে স্কুলে যাও' বলে বলে ওদের কান ঝালাপালা করে তুলছিলেন। অতএব কিছু ছাত্র আন্দোলনের পংক্তি ভেঙে স্কুলে যাওয়ার কথা ভাবতে শুরু করল। সেই সময় তাদের তৎক্ষণাৎ চুড়ি উপহার দেওয়া হল আর বলা হল যে আগে চুড়ি পরে যেন ওরা স্কুলে যায়। বিদ্যালয়ের পরিচালন কর্তৃপক্ষেরও মনে হল যে বেশী দিন হরতাল চলা বিদ্যালয়ের সম্মান হানি ঘটাবে। অতএব এই উদ্দেশ্যে তাঁরা চাইছিলেন যে ছাত্ররা তাদের ভুল স্বীকার করে নিয়ে যেন স্কুলে আসতে শুরু করে দেয়। ঐ বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী স্যার বিপিন কৃষ্ণ বোস এই পরামর্শ দেবার জন্য একবার ছাত্রদের কাছেও গেলেন। কিন্তু আন্দোলনকারীরা এমন গোলমাল শুরু করে দিল যে তিনি সেটা সহ্য করতে পারলেন না।

তদানীন্তন সর্বোদয় নেতা তাত্যাজী বঝলকর বলেন যে স্যার বোস এমন শান্ত ও নরম প্রকৃতির মানুষ ছিলেন যে এই গোলমালের পর তিনি তৎক্ষণাৎ কলের জলের নিচে বসে তাঁকে মাথা ঠাণ্ডা করতে হয়েছিল। অবশেষে শ্রী বিপিন কৃষ্ণ বোস ও প্রধান শিক্ষক শ্রী জনার্দন পন্ত ওক ও কয়েকজন ছাত্র ও বালকের বিশ্বাস অর্জন করে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি উপায় বের করলেন। সেটা ছিল এই রকম — ছাত্রদের অভিভাবকেরা প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করবেন — "ভুল হয়ে গেছে তো?" আর ছাত্ররা শুধু মাথা নেড়ে বলবে "হ্যাঁ", "নিজেদের এক বছর নষ্ট না করে বরং এইভাবে, একটা উপায় করে স্কুলে আবার যাওয়াই তো ভাল।" ছাত্ররা ক্রমে এই যুক্তি মেনে নিল এবং শুধু দু'জন ছাত্র ব্যতীত অবশিষ্ট তেরো-চৌদ্দজন ছাত্র পুনরায় বিদ্যালয়ে পড়তে শুরু করে দিল। এই দুই ছাত্রের মধ্যে একজন যে কেশবরাও হেডগেওয়ার ছিলেন সে কথা না বললেও অনুমান করা যেতে পারে।

৩. যবতমালের বিদ্যাগৃহে

বিদ্যালয় থেকে নাম কাটার আগে কয়েকজন শিক্ষক ও শুভাকাঙ্ক্ষী কেশবরাওকে তাঁর জেদ ছেড়ে দেবার অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁর সংকল্প ছিল অটল। বাড়ীর জন্য উপজীবিকার চিন্তা ছিল না, অতএব বিদ্যালয় ছেড়ে দিতে হল তো হল। কোন নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে কেশবরাও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। তাঁর বিবেক তাঁকে বলছিল, "যে মাতৃভূমি আমাদের সমাজকে কত সহস্র বছর যাবৎ ধারণ ও পালন-পোষণ করেছে, সেই মাতৃভূমির প্রতি হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবে যে ভাবনার সঞ্চার হয় তাকে গোপন করা অথবা চাপা দেওয়া সম্ভব নয়। বিদেশী সরকারের শাসনে মাতৃভূমির বন্দনা যদি অপরাধ বলে গণ্য হয় তবে সেই অপরাধ একবার নয় অসংখ্য বার করব। এবং তার ফলে উদ্ভূত সকল সংকট ও যাতনাকে সানন্দে সহ্য করব।" হৃদয়ের এই সুতীব্র দেশভক্তির প্রেরণার কারণেই তিনি ঐ আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন এবং তদনুরূপ সংকল্পের দরুনই 'বন্দেমাতরম্'-এর উদ্‌ঘোষ পাপ নয়, পুণ্য কর্ম — এই সত্য প্রতিপাদনের জন্য দৃষ্টান্তমূলক দৃঢ়তা তিনি দেখিয়েছিলেন। ভাবুকতার ক্ষণিক আবেগের বাতাসে উড়ে, পরিস্থিতি বুঝে ভাবুকতার আবেগের দম ফুরিয়ে যেতেই ঘুড়ির মত গোঁত্তা খেয়ে কাঁটাবনে আট্‌কা পড়ে শরণাগতি স্বীকার করার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। তাঁর বৃত্তিতে ছিল নিজের অন্তরের শক্তির ডানার উপর নির্ভর করে ঝঞ্ঝাবাতের পরোয়া না করে লক্ষ্যের দিকে তীর বেগে ধাবমান বলশালী গরুড়ের দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। দু-তিন বছর যাবৎ ডাঃ মুঞ্জের বাড়ীতে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। মাঝে কিছু দিন তিনি সেখানে বাসও করেছিলেন। ডাঃ মুঞ্জে স্বয়ং লড়াকু মনোভাবের মানুষ ছিলেন। অতএব ডাক্তার হেডগেওয়ারের মত কার্যকর্তার দৃঢ়তা ও ধৈর্যপূর্ণ ব্যবহার দেখে তাঁর অবশ্যই আনন্দ হয়ে থাকবে।

এই সময়ে কেশবরাও ডাঃ মুঞ্জের বাড়ীতে থাকতেন অবশ্য, কিন্তু সেখানে খাওয়া-দাওয়া করতেন না। তাঁর পিছনে গোয়েন্দাদের ঝামেলা কিছুটা কম হোক এই জন্যই তিনি ডাঃ মুঞ্জের বাড়ীতে থাকতেন এবং মনে হয় সেই দিক থেকে তাঁর উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হয়েছিল। কিন্তু এই দু-তিন বছরে কেশবরাওয়ের খাওয়া-দাওয়ার এমনই দুরবস্থা ছিল যে অনেক দিন তাঁকে খালি পেটেই ঘুমিয়ে পড়তে হত। কখনো-কখনো মুড়ি ছোলা খেয়েই তাকে দিন কাটাতে হত। কিন্তু নিজের এই কষ্টকর জীবনের বিষয়ে তিনি সেই সময়ে কাউকে কিছু বলেন নি। ভবিষ্যতে কখনো-কখনো নিজের ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে নিজের জীবন-স্মৃতি বলার সময়ে এই বিষয়ে উল্লেখ এসে পড়ত।

বিদ্যালয় থেকে নাম কেটে দেওয়া হয়েছিল। এবার কী করবেন সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছিল। এরই মাঝে একবার কাকার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য তিনি রামপায়লী

গিয়েছিলেন। আবাজী তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের দেশভক্তি দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং তাঁর প্রশংসা করলেন। ঐ সময়ে যবতমালের শ্রী মাধব শ্রীহরি অণে (যিনি ১৯৩১ সাল থেকে 'লোকনায়ক' নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন) এবং শ্রী নারায়ণরাও বৈদ্য রামপায়লীতে বক্তৃতা দেবার জন্য এসেছিলেন। তাঁদের বক্তৃতা শেষ হবার পর আবাজী তাঁদের কেশবরাওএর বিষয়ে বলেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁকে কি যবতমালের জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করা যাবে। শ্রী অণে তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

আন্দোলনের দরুন তিনি স্কুল ছেড়েছেন। এরকম ছাত্র হিসাবে প্রায় সকলেই তাঁর দিকে সম্মানের চোখে দেখতেন। কিন্তু কয়েকজন প্রৌঢ় সজ্জন দুঃখ করতেন যে এই ছেলেটার ক্ষতি হয়ে গেল। এই সময়ে আবাজীর সঙ্গে কেশবরাওএর ভাণ্ডারায় শ্রী জকাতদারের কাছে যাবার সুযোগ হল। সেই সময়ে তাঁর গৃহে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার শ্রী অমৃতরাও বম্বাওয়ালে বসেছিলেন। পরস্পরের পরিচয় করানোর সময়ে শ্রী জকাতদার বললেন, "কেশবরাওএর পড়াশুনার দিকে মন নেই। ইনি আন্দোলনে জড়িয়ে নিজের ক্ষতি করছেন।" তাঁর মত সরকারী পদে নিযুক্ত ব্যক্তির নিকট কেশবরাওএর কাজকর্ম ক্ষতিকর মনে হওয়ার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই। তিনি কেশবরাওকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। 'ভাই, এখন তো তুমি কিছুই বোঝো না। কিন্তু পরে অনুতাপ করতে হবে। অতএব এই শখ ছেড়ে দাও আর পড়াশুনা কর। রাজনীতি করা ছাত্রদের কাজ নয়।" এই কথা শুনে কেশবরাও তাঁকে শান্ত কণ্ঠে বললেন, "আপনার কথা মত আমি এক পায়ে দাঁড়িয়ে পড়াশুনা করতে রাজি আছি। কিন্তু রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য আপনার মত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের চাকুরী ছেড়ে এগিয়ে আসা উচিত। যতক্ষণ সে রকম না হচ্ছে, ততক্ষণ আমার মত তরুণদেরই পড়াশুনা করার সময়ে এবং কখনো বা পড়াশুনা ত্যাগ করে রাজনীতি করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।" এই দৃঢ় প্রত্যয়যুক্ত উত্তরের পিছনে যে সংকল্প ও আন্তরিকতা ছিল তা দেখে শ্রী অমৃতরাও মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

রামপায়লীর এই যাত্রাকালে তিনি নারকোলের খোলে বোমা তৈরীর চেষ্টা করেন এবং পুলিশ ফাঁড়ির কাছে রাত্রি নটার সময়ে বোমা বিস্ফোরণ করেন। 'কাজ সেরে কেটে পড়ার' দক্ষতা তাঁর মধ্যে পুরোপুরি থাকার ফলে অনেক দিন যাবৎ তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তের জের চললেও কোন অনিষ্ট হয়নি।

কিছুদিন পরে কেশবরাও নাগপুর ফিরে এলেন এবং ডাঃ মুঞ্জের কাছ থেকে শ্রী মাধবরাও অণের নিকট লিখিত পত্র নিয়ে যবতমাল গেলেন। যবতমালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শুরু থেকেই ডাঃ বাবাসাহেব বা নরহর শিবরাম পরাঞ্জপে-র প্রচেষ্টায় একটি জাতীয় বিদ্যালয় চলছিল। তার নাম ছিল 'বিদ্যাগৃহ'। এই বিদ্যালয়ে কেশবরাও ১৯০৯ সালের প্রথম দিকে ভর্তি হন।

সেই সময়ে সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর জাতীয় আন্দোলনের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল, তার দরুন কেশবরাও হেডগেওয়ারের মত ছাত্রদের এবং বাপুজী অণে এবং ডাঃ পরাঞ্জপে-র মত নেতারা অনুভব করছিলেন যে তরুণ

প্রজন্মের অনুপস্থিতির দরুন আন্দোলনের প্রগতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। এই রকম সমস্যা বাংলাতে সব থেকে বেশী অনুভূত হচ্ছিল। এই সমস্যা থেকে পথ খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যেই জাতীয় বিদ্যালয় তথা তার পাঠক্রমের যোজনা তৈরী করে এবং পরীক্ষা গ্রহণ করে প্রমাণ-পত্র দানের অধিকারী একটি জাতীয় বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করা হল। বাবু অরবিন্দ ঘোষ, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, ব্যারিস্টার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সজ্জনগণ এই রাষ্ট্রীয় বিদ্যাপীঠের আহ্বায়ক ছিলেন।

বাংলার পরে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ইত্যাদি প্রান্তেও নতুন প্রজন্মের ছাত্রদের জাতীয় মনোভাব যুক্ত শিক্ষাদানের জন্য এই ধরনের কার্যক্রম ন্যূনাধিক পরিমাণে গ্রহণ করতে হল। বেরারে অমরাবতীর 'শিবাজী বিদ্যালয়' ও যবতমালের 'বিদ্যাগৃহ' এই পরিকল্পনাকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়েছিল।

যবতমাল 'বিদ্যাগৃহের' প্রতিষ্ঠাতা তপস্বী বাবাসাহেব পরাঞ্জপে লোকমান্য তিলকের আন্দোলনে এমন মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন যে ১৯০৮ সালের পর তাঁর ব্যক্তিগত জীবন বলে কোন্ বস্তুই অবশিষ্ট ছিল না। যবতমালে 'বিদ্যাগৃহের' কল্পনা সামনে আসার সঙ্গে-সঙ্গে ঐ জেলার মানুষেরা অন্ন ও অর্থ একত্র করে ঐ কল্পনাকে সাকার রূপ দিলেন। বাড়ী-বাড়ীতে রাখা মাটির ঘড়ার মধ্যে জনসাধারণ আগ্রহ সহকারে মুষ্টিপূর্ণ অন্ন ফেলে দিতেন। যার মাধ্যমে বহু দরিদ্র ছাত্রের ভোজনের ব্যবস্থা হয়ে যেত। সেই সঙ্গে জেলায় বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা জমা করতে পারে এরকম পঞ্চাশ জন তরুণকে তপস্বী পরাঞ্জপে খুঁজে বের করেছিলেন। এই অর্থের দ্বারা এবং অন্যান্য দানের সাহায্যে শিক্ষকদের উপজীবিকা এবং 'বিদ্যাগৃহের' অন্য ব্যয় নির্বাহ করা হত।

'বিদ্যাগৃহের' প্রধান শিক্ষক শ্রীদত্তাত্রেয় বিষ্ণু আপটে লোকমান্য তিলকের স্নেহের পাত্র এবং একজন নিষ্ঠাবান্, ত্যাগী ও সাত্ত্বিক কার্যকর্তা ছিলেন। ১৮৯৬ সালের দুর্ভিক্ষ নিবারণ আন্দোলনে লোকমান্য তাঁকে কৃষকদের মধ্যে জাগৃতি আনার জন্য গ্রামে পাঠিয়েছিলেন এবং সেই কাজ করার সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে মামলাও চালানো হয়েছিল।

যবতমালে আসার পর কেশবরাও প্রায়ই বাপুজী অণের গৃহে ভোজন করতে এবং পড়ার জন্য দত্তোপন্ত আপটের ঘরেও যেতেন। নাগপুরে বিগত দু-তিন মাসে 'রিস্‌লে সার্কুলার'-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে ব্যস্ত থাকায় তাঁর পড়াশুনার বেশ ক্ষতি হয়েছিল। পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের সমান সারিতে নিয়ে আসার জন্য দত্তোপন্ত বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। সেই সময়ে 'বিদ্যাগৃহের' শিক্ষক শ্রী টকলে, শ্রী হরিভাউ ফাটক, দাদাসাহেব বা বিষ্ণু গঙ্গাধর কেতকর ইত্যাদির সেই সময়ের নিরিখে বিরাট অবদান ছিল। তাঁরা শুধু উপজীবিকার মত বেতন গ্রহণ করে কাজ করতেন। ১৯১৬ সালে লোকমান্যকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "আমাদের দেশের বুদ্ধিমান্ লোকদের কী ধরনের কাজ করা উচিত?" লোকমান্য সেই সময়ের বস্তুস্থিতির যে রূপ বর্ণনা করেছিলেন, সে কথা মনে রেখে বলতে হবে যে এইসব জাতীয় বিদ্যালয়ে জীবিকা-নির্বাহের মত বেতন নিয়ে, নিজেদের ত্যাগ ও দেশভক্তির মাধ্যমে কাজ করে বিদ্যালয়গুলিকে চালিয়ে যেতেন যে শিক্ষকবৃন্দ, তাঁরা সেই সময়ের সুশিক্ষিত মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর মধ্যে ব্যতিক্রম স্বরূপ এবং তাঁদের সামনে ত্যাগ ও তপস্যার দৃষ্টান্ত উপস্থাপনকারী অগ্রদূতের সমান ছিলেন।

লোকমান্য বলেছিলেন, ''আমাদের দেশের বুদ্ধিমান্ শ্রেণীর লোকেরা এখনো সরকারী চাকুরীর জালে আটকে আছে। প্রথম শ্রেণীর বিদ্বান্‌কে আমি ভালো বেতন দিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁদের আকর্ষণ সরকারী অথবা আধা-সরকারী চাকুরীর প্রতি নিবদ্ধ। এই অবস্থা পাল্‌টাতে দশ-পনের বছর লাগবে।''

কেশবরাও-এর শিক্ষক শ্রী দত্তোপন্ত আপটে পরবর্তীকালে এক ভারসাম্য-যুক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস গবেষক এবং গণিতজ্ঞ হিসাবে মহারাষ্ট্রে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। শ্রী দাদাসাহেব কেতকরের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে পুনা ও নাসিকে 'অনাথ বিদ্যার্থী গৃহ' নামে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং শ্রী হরিভাউ ফাটকও কংগ্রেসের আন্দোলনে সর্বদা এগিয়ে থাকতেন। এই রকম বিদ্বান্, পুরুষার্থী, ত্যাগী ও দেশভক্তিপূর্ণ শিক্ষকদের সান্নিধ্য ও পথনির্দেশে কেশবরাও-এর ম্যাট্রিকের পড়াশুনা চলছিল। এটা শুধু তাঁরই নয় সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের সৌভাগ্য যে রাষ্ট্র-নির্মাতার নির্মাণ অত্যন্ত তেজস্বী বাতাবরণে হচ্ছিল।

'বিদ্যাগৃহ' বিট্‌ঠল মন্দিরের কাছেই একটি ঘরে চলত। কেশবরাও প্রতিদিন ভোরে উঠে স্নান-সন্ধ্যা সেরে দশটা পর্যন্ত পড়াশুনা করতেন। বাপুজী অণের গৃহে দুপুরের ভোজনে কখনো-কখনো দেরী হয়ে যেত। এইরূপ অবস্থায় তিনি ভোজন না করেই 'বিদ্যাগৃহে' চলে যেতেন। কিন্তু ''আজ আমি ক্ষুধার্ত'' এইরকম কথা তিনি কখনো উচ্চারণ করেননি। কিন্তু দত্তোপন্তের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যেত যে কেশবরাও মাঝে-মাঝে না খেয়েই থাকতেন। সুতরাং তিনি ঐ স্কুলেরই ছাত্র গণেশ সুলের উপর একথা জানার ভার দিলেন যে কেশবরাও খেয়ে এসেছেন কিনা। তাঁর নির্দেশে বহুবার সুলে কেশবরাওকে শ্রী টকলের বাড়ীতে ভোজন করাবার জন্য নিয়ে যেত। দত্তোপন্ত টাট্‌কা ছোলা ভাজা খুব পছন্দ করতেন এবং বাজার থেকে ছোলা এলেই তিনি কেশবরাও-এর জন্য একটা অংশ আলাদা করে রাখতেন। এইভাবে তাঁদের দুজনের মধ্যে চমৎকার বোঝাপড়া গড়ে উঠেছিল।

বেলা এগারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত লেখাপড়ার পরে সন্ধ্যায় 'বিদ্যাগৃহের' আদর্শ আখড়ায় নিত্য নিয়ম অনুসারে ব্যায়াম হত। পিছিয়ে পড়া পাঠ পুরো করার জন্য কেশবরাও অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতেন। অতএব শ্রী হরিভাউ ফাটক কখনো-কখনো তাঁকে বলতেন, ''স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা ভাল নয়।'' স্বাস্থ্যের চিন্তা প্রয়োজনীয় নিশ্চয়ই, কিন্তু কেশবরাও লেখাপড়ার অবহেলা করবেন কেমন করে? লেখপড়া করেও 'কাল', 'কেশরী,' 'ভালা' ও 'দেশসেবক' ইত্যাদি সংবাদপত্র পাঠ করতে কখনো ভুলতেন না। পরীক্ষার কথা মনে রেখে কেশবরাও-এর লেখাপড়া চলছিল। কিন্তু তার আগেই সরকার এই ছাত্রদের পরীক্ষা নেবার কথা বিবেচনা করছিল।

'বিদ্যাগৃহের' মত সংস্থা কেবল জনসাধারণের বল-ভরসার উপর নির্ভর করে তিন সাড়ে তিন বছর ধরে অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে এবং তার পরিণামে সরকারী স্কুলগুলির ছাত্রদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে এবং এখানকার শিক্ষকেরাও জাতীয় বিদ্যালয়ে চলে

যাবেন — এই সব জিনিস সরকারের সহ্য হবার কথা নয়। তা ছাড়া এই ধরনের বিদ্যালয়ে রাষ্ট্রীয় স্বাভিমানকে পরিপুষ্ট করে তোলার মনোভাব গড়ে ওঠে। বিদেশী সরকারের চোখে সেটা আরো যন্ত্রণার সৃষ্টি করত। কেশবরাও যবতমালে এসেছিলেন প্রায় দু-তিন মাস আগে, এরই মধ্যে সরকার গোয়েন্দা বিভাগের ক্লীভল্যাণ্ড নামক বড় অফিসারকে বেরারে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমূলে উচ্ছেদসাধনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিল। ১৯০৫ সালে লোকমান্য তিলক যবতমালের তরুণ কার্যকর্তাদের উৎসাহ ও কর্তব্যপরায়ণতা দেখে বলেছিলেন, "যবতমাল শীঘ্রই জনমত সৃষ্টির কেন্দ্রে পরিণত হবে।" যবতমালে দিনের পর দিন সমগ্র জেলার ক্রমবর্ধমান জাতীয় আন্দোলন লোকমান্য তিলকের ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য প্রমাণিত করেছিল। যবতমালের উপর সরকারের বক্র দৃষ্টি থেকে সেখানে জাতীয় আন্দোলনের গতি ও তীব্রতা উভয়েরই বিষয়ে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

'বিদ্যাগৃহকে' খতম করার উদ্দেশ্যে প্রথমে অভিভাবকদের উপরে পরোক্ষরূপে সরকারী চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করা শুরু হল। প্রথমেই 'বিদ্যাগৃহের' সামনে একটি পুলিশ ফাঁড়ি বসিয়ে দেওয়া হল। সরকারের এই সন্ত্রাসসৃষ্টি ও অন্যায়পূর্ণ নীতির বিরুদ্ধে যাতে কেউ আওয়াজ তুলতে না পারে তার জন্য তপস্বী বাবাসাহেব পরাঞ্জপের নিকট হতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৮ ধারা অনুযায়ী জামানত গ্রহণ করে তাঁর উপর বক্তৃতাদানের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। ক্লীভল্যাণ্ড জনসাধারণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে ইতিপূর্বে অমরাবতীর বিদ্যালয়টি বন্ধ করে দিয়েছিল। এবার যবতমালের প্রতি তার কুদৃষ্টি পড়েছিল। এটা ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসের ঘটনা।

যবতমালের 'বিদ্যাগৃহ' সরকার শেষ করে দিলেও কেশবরাও তাঁর কয়েকজন সহপাঠী হতাশ হলেন না। যে কোন সংকটকেই জয় করবার মত জীবনীশক্তিকে সম্বল করে তিনি জুলাই মাসে কলকাতার রাষ্ট্রীয় বিদ্যাপীঠে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে তাঁর পড়াশুনা শুরু করে দিলেন। শ্রী দত্তোপন্ত আপটে এবং শ্রী হরিভাউ ফাটকের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করলেন। তাঁরা তাঁকে পড়ার জন্য পুনায় যাবার পরামর্শ দিলেন। তাঁদের দুজনেরই এবিষয়ে আগ্রহ দেখে রামগোপাল হরদেব বাজোরিয়া, মহাদেব শিবরাম জয়বন্ত এবং কেশবরাও তিনজনেই পুনায় চলে এলেন। পুনার মুঞ্জাবাগলিতে, যেখানে এখন শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের মঠ অবস্থিত, একটি গৃহের দ্বিতলে তিনজনেই বাস করে পড়াশুনা শুরু করে দিলেন। কেশবরাও ও জয়বন্তের ভোজন-ব্যবস্থা প্রথমে কয়েকদিন উপরোক্ত শিক্ষকদের গৃহে এবং পরে 'মহারাষ্ট্র' বোর্ডিং-এ করে দেওয়া হল। দু মাস পুনাতে থেকে তিনজনেই জুলাই মাসে অমরাবতীতে গিয়ে পরীক্ষায় বসলেন। সম্পূর্ণ বেরারের জন্য পরীক্ষা-কেন্দ্র ছিল অমরাবতীতে। পরীক্ষা দিয়ে ফের নাগপুরে ফিরে এলেন কেশবরাও। স্বাভিমান বজায় রাখতে হলে কতরকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সেই সময়ে 'বন্দেমাতরম্' কাণ্ডের ব্যাপারে ক্ষমাপ্রার্থী ছাত্ররা তো পরীক্ষা দিয়ে উপরে উঠে গিয়েছিল। কিন্তু কেশবরাও এখনও একটার পর একটা বাধার সম্মুখীন হয়ে এগিয়ে চলেছিলেন।

৪. কলকাতায়

নাগপুরে ফিরে এসে কেশবরাও হেডগেওয়ার আগের মত সর্বজনীন কাজে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে দিলেন। নাগপুরের কাছেই কবি কালিদাস বর্ণিত 'মেঘদূত'-এর রামগিরি অর্থাৎ রামটেক-এ শ্রীরামনবমীর বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় যে পেঁড়া বিক্রী করা হয় সেটাকে স্বদেশী করার উদ্দেশ্যে তিনি গুড়ের পেঁড়া তৈরী করান, কেননা সেই সময়ে চিনি আসত জাভা থেকে। গুড়ের তৈরী পেঁড়া যাতে সুলভে ও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হল। সেই সময়ে নাগপুরের বিপ্লবী তরুণদের কাছে তিনি সর্বদাই যাতায়াত করতেন এবং তাঁদের এত ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলেন যে বিভিন্ন প্রদেশে যেসব বিপ্লবী কাজ-কর্ম চলছিল তার বিষয়ে তিনি পুরোপুরি অবগত হয়েছিলেন। এই সময়ে মাধবদাস সন্ন্যাসী নামে পরিচিত জনৈক বাঙালী বিপ্লবী নাগপুরে এসেছিলেন। বিপ্লবী দলের নির্দেশে এই তরুণের জাপান যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিদেশে প্রেরণের যোজনা তৈরী করা এবং অর্থ-সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে কোথাও লুকিয়ে রাখা দরকার ছিল। যাতে সব কাজ চুপচাপ সম্পন্ন করা যায়। কেশবরাও তাঁকে মোহোপার শ্রী আপ্পাজী হলদের গৃহে রাখার ব্যবস্থা করলেন, তিনি বয়সে বড় হলেও নিজেকে কেশবরাওএর অনুগামী বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। তিনি সেখানে ছ' মাস ছিলেন এবং পরে তাঁকে জাপানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শ্রী হলদে এই কাজে মুক্ত হস্তে আর্থিক সাহায্যও করেন।

এই সময়ে নাগপুরের বিপ্লবী দল কলকাতার 'অনুশীলন সমিতির' সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে নিয়েছিল। অতএব, আলিপুর বোমা মামলায় জড়িত দেশপ্রেমিক তরুণদের সমর্থনের জন্য নাগপুর থেকেও অর্থ-সংগ্রহ করে পাঠান হল। এই তহবিলে উকিল শ্রী মঃ রাঃ তথা ভৈয়াসাহেব বোবড়ে কেশবরাওকে এক শত টাকা দিয়েছিলেন। এর থেকে মনে হয় অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট হতেও এইভাবে অর্থ-সংগ্রহ করা হয়েছিল।

এইসব গতিবিধি চলার সময়েই কেশবরাওএর পরীক্ষার ফল ঘোষিত হল। তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর প্রমাণপত্রে 'দি ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন (বেঙ্গল) সভাপতি হিসাবে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের স্বাক্ষর ছিল। এই প্রমাণপত্র তাঁকে ১৯০৯ সালের ১লা ডিসেম্বর দেওয়া হয়। তারিখটি প্রমাণপত্রে মুদ্রিত ছিল। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে এ কথা বলা যায় যে সেই সময়ের সর্ব সাধারণ ব্যক্তিদের হিসাবে তিনি পর্যাপ্ত শিক্ষা লাভ করেছিলেন। কেশবরাওএর বাড়ীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যদি কোন জীবিকা-উপার্জনের ব্যবস্থা করে গৃহস্থ জীবনে প্রবেশ করার চিন্তা করতেন, সেটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার হত না। কিন্তু তাঁর মন তো অন্য দিকে নিবদ্ধ ছিল। বিদেশী ইংরেজদের পদাঘাতে কলুষিত মাতৃভূমির কলঙ্ক কেমন করে দূর করা যায় এই চিন্তা প্রবলরূপে তাঁর মনকে উদ্বেলিত করে রেখেছিল। পরম

আকাঙ্ক্ষা, পূর্ণ নির্ভীকতা ও সর্বস্ব অর্পণের বৃত্তি নিয়ে আগুয়ান যে তরুণের হৃদয়ে তথা রক্তে আবেশ ও উদ্যমশীলতা পরিব্যাপ্ত, সেই সময়ে এ ধরনের ব্যক্তির একথা চিন্তা করা অস্বাভাবিক ছিল না যে সশস্ত্র বিপ্লবই মাতৃভূমির উদ্ধারের একমাত্র পন্থা। কেশবরাও এর পদক্ষেপও সেই দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তাঁর ঐ সময়ের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এ কথাই প্রত্যক্ষ করা যায় যে দারিদ্র্য এবং একের পর এক যত সংকটই আসুক না কেন, ধ্যেয়নিষ্ঠরা হতাশ হয়ে কখনই বসে পড়ে না। সংকটের দরুন তার গতি মন্দীভূত হওয়ার পরিবর্তে আরও বৃদ্ধি পায়। উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি টিউশনি শুরু করলেন এবং ইতওয়ারীর এক পাঠশালায় শিক্ষকতাও করতে লাগলেন। মনের মধ্যে তীব্র ইচ্ছা থাকলে পকেট খালি হলেও ঠিক সময়ে কোন্ না কোন্ উপায় খুঁজে পাওয়া যায়, এই অভিজ্ঞতা তাঁর বহুবার হয়েছে। অতএব, পরবর্তী শিক্ষালাভ যে কোন্ পরিস্থিতিতে করার দৃঢ় সংকল্প তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

এই সময়ে কেশবরাও ডাঃ মুঞ্জের গৃহে থাকতেন। তিনিও তাঁকে কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে পরবর্তী শিক্ষার জন্য পাঠাবার কথা বিবেচনা করেছিলেন। কলকাতা যাওয়ার ব্যাপারে কেশবরাও ও তাঁর বিপ্লবী সহকর্মীদের খুবই উৎসাহ ছিল, কারণ এই দল শ্রী পুলিনবিহারী দাসের বাংলাব্যাপী সংগঠন অনুশীলন সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলত। অতএব, তাঁরা মনে করছিলেন যে কেশবরাও কলকাতা গেলে সেই সম্পর্ক দৃঢ়তর হবে এবং সেটা তাঁদের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। সম্ভবতঃ তাঁর কয়েকজন বন্ধু কেশবরাও এর শিক্ষার আর্থিক ভারও বহন করেন।

কেশবরাও এর সেই সময়কার এক ঘনিষ্ঠ বিপ্লবী বন্ধু শ্রীরামলাল বাজপেয়ী নিজের জীবনীতে সুস্পষ্ট ভাষায় লেখেন যে কেশবরাও এর কলকাতা যাবার প্রধান হেতু ছিল উচ্চতর শিক্ষা অপেক্ষা বিপ্লবীদের সংগঠন সম্পর্কে অবহিত হওয়া। তিনি বলেন, "শ্রী কেশবরাও হেডগেওয়ার, আর.এস.এস.-এর প্রতিষ্ঠাতাকে, শ্রী দাজীসাহেব বুটীর কাছ থেকে কিছু আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে শিক্ষালাভ ছাড়া পুলিনবিহারী দাস (কলকাতার বিপ্লবী) -এর তত্ত্বাবধানে বিপ্লব ও সংগঠনের জন্য প্রেরণ করা হল।" এইভাবে বিপ্লবের কাজ ও শিক্ষালাভ দুই উদ্দেশ্য মনের মধ্যে ধারণ করে কেশবরাও ১৯১০ সালের মাঝামাঝি নাগপুর থেকে সাত শো মাইল দূর কলকাতার অপরিচিত পথে যাত্রা করেন। তিনি নিজের সঙ্গে ডাঃ মুঞ্জের কাছ থেকে পরিচয় পত্রও নিয়ে গিয়েছিলেন।

সেই চিঠি নিয়ে তিনি কলকাতায় সর্বপ্রথম 'মহারাষ্ট্র লজ্'-এ গেলেন। সেই সময়ে ঐ লজ ৭০ নং বউবাজার স্ট্রীটে অবস্থিত ছিল। সেখানে পৌঁছে জানা গেল একটা সিটও খালি নেই। কিন্তু ডাঃ মুঞ্জের পত্র নিয়ে আগত ছাত্রকে "এখানে জায়গা নেই, তুমি নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নাও", একথা বলারও উপায় ছিল না। অতএব, অস্থায়ীভাবে সেখানে তাঁর ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। ঐ বছরই মহারাষ্ট্র লজে স্থান না পাওয়ার দরুন অমরাবতীর সুপ্রসিদ্ধ দেশভক্ত দাদাসাহেব খাপর্ডের পুত্র অন্নাসাহেব এবং তাঁর বন্ধু শঙ্কররাও নাইক খোঁজাখুঁজি করে আরো কয়েকজন সঙ্গী জুটিয়ে ১৮/২, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটের গৃহের দ্বিতলায় ছ' খানা

ঘর ভাড়া করলেন। একে তাঁরা 'শান্তিনিকেতন' নাম দিলেন। 'মহারাষ্ট্র লজের' সম্পাদক কেশবরাওকেও 'শান্তিনিকেতন'-এ পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু বাধা ভিন্ন এক পা অগ্রসর হওয়াও বুঝি সম্ভব ছিল না, কেশবরাওএর ব্যাপারে যেন এটাই নিয়তির নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। ফলে সেখানে পৌঁছে দেখা গেল যে ওখানেও জায়গা নেই। তা দেখে অন্নাসাহেব খাপর্ডে সমস্ত ছাত্রদের ডেকে প্রস্তাব করলেন যে আরো একজন ছাত্রের জন্য আমাদের জায়গা করে দিতে হবে। কিন্তু সকলেই নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করেন। এইভাবে সকলে না করে দেবে সেরকম আশা অন্নাসাহেব করেননি। অতএব, তাঁর সামনে বিষম অবস্থার সৃষ্টি হল। ডাঃ মুঞ্জের কথা উপেক্ষা করার উপায় ছিল না। এদিকে কোন ছাত্রই নিজের ঘরে কেশবরাওকে জায়গা দিতে প্রস্তুত ছিল না। অবশেষে তিনি নাইকের সঙ্গে আলাদা কথা বলে তাঁদের ঘরেই কেশবরাওকে থাকতে বললেন।

'শান্তিনিকেতন'-এর এই ঘরটি ছিল রাস্তার দিকে এবং দুদিকে বারান্দা ছিল। এই ছোট ঘরের একদিকে শ্রীনাইকের তক্তপোষ আর অপর দিকে শ্রী খাপর্ডের খাট পাতা ছিল। এই দুজনের মাঝখানের সংকীর্ণ একটুখানি জায়গায় কেশবরাও তাঁর বিছানা মাটিতে পেতে শয়ন করতেন। কিন্তু নিজের ব্যবহারে তিনি কখনই প্রকাশ হতে দেননি যে তাঁর কোন অসুবিধা হচ্ছে। 'হাসিমুখ সদাসুখী' এই উক্তিকে তিনি সর্বদা চরিতার্থ করতেন। বাংলায় বাড়ীগুলির জানালা সাধারণভাবে মেঝের সঙ্গে লেগে থাকে। এই ধরনের একটি জানালা এই ঘরেও ছিল এবং তার থেকে যে বাতাস আসত, সেটুকুই কেশবরাও পেতেন। একটা ঘরে যদি পরস্পর ভিন্ন-ভিন্ন অভ্যাসের মানুষ থাকে তাহলে কিছুটা বিবাদ বিসম্বাদ না হয়ে থাকতে পারে না। কেশবরাও-এর ঘরের বাসিন্দা শ্রীনাইক লোক ভাল ছিলেন, কিন্তু একটু ঝগড়াটে প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর একটু ঠাণ্ডা লাগলেই তিনি খট্ করে কেশবরাও-এর মাথার কাছের জানালা বন্ধ করে দিতেন। নাইকের একটু ঘুম এলেই কেশবরাও আবার জানালা খুলে দিতেন। 'এটা কি হচ্ছে?' বলে নাইক গজ্-গজ্ করতে শুরু করতেন। কিন্তু কেশবরাও মুচকি হেসে ডাঃ মুঞ্জের থেকে জানা আরোগ্য শাস্ত্রের নিয়ম শেখাতে শুরু করতেন, বলতেন — "শীত করে তো চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়, কিন্তু জানালা তো খুলে রাখাই উচিত।" নাইকের স্বভাবের বর্ণনা করে কবিভূষণ অধ্যাপক অন্নাসাহেব খাপর্ডে আজও মজা করে বলেন, "নাইকের সম্পর্কে একটা ক্রিয়াপদই উপযুক্ত ছিল 'ঝগড়া করা'।" কেশবরাও ও অন্নাসাহেব অনেক সময়ে তাঁকে এই বলে রাগাতেন যে 'নাইক, ভোজনের সঙ্গে ঝগড়া করছে', 'স্নানের সঙ্গে ঝগড়া করছে' ইত্যাদি। এই পরিহাসের জবাবে নাইকও কেশবরাওকে 'হেডগাঁওয়ার' (গাঁওয়ার বা গাঁইয়াদের প্রধান) বলে উপহাস করতেন। কেশবরাও তৎক্ষণাৎ জবাব দিতেন — "তোমার মত গাঁইয়াদের বা গাঁওয়ারদের জন্য আমার মত একজন 'হেড' তো অবশ্যই দরকার।" ওপর থেকে এই হাস্য-পরিহাস চললেও উভয়ের অন্তরে দেশভক্তির অসীম সমুদ্র উদ্বেলিত ছিল, কারণ কেশবরাও ও নাইক দুজনই বিপ্লব-পথের পথিক ছিলেন।

আপার সার্কুলার রোডে অবস্থিত 'ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ' তাঁদের নিবাস-স্থানের কাছেই ছিল। সেখানে বেলা এগারটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ক্লাস চলত। ডাঃ এস কে

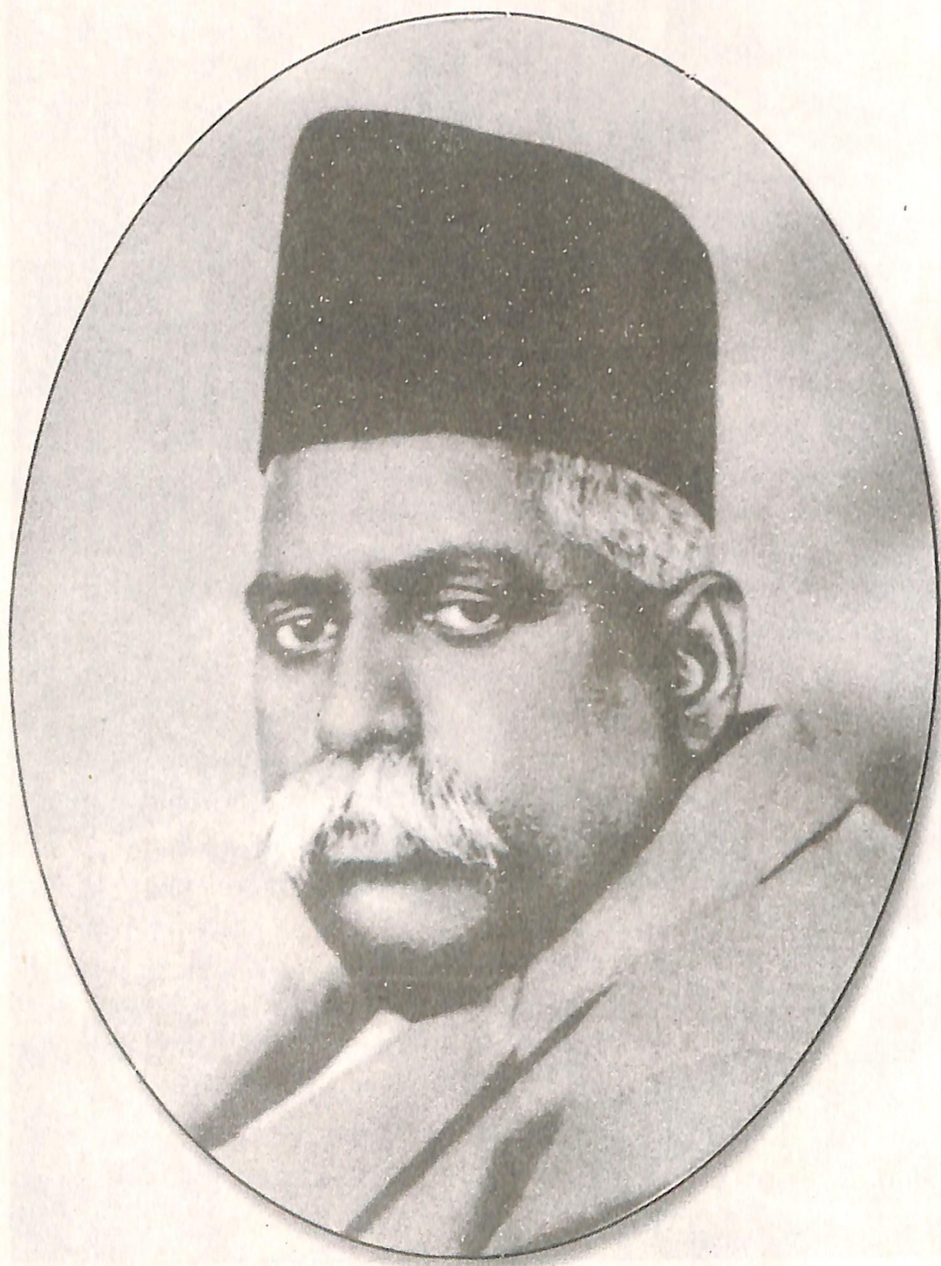
মল্লিক কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনি ছিলেন এম এস এম ডি (এডিনবরা) উপাধি প্রাপ্ত। পাশ্চাত্য দেশে বহু বছর সফল চিকিৎসক থাকা সত্ত্বেও বৃত্তি ও ব্যবহারে তিনি পূর্ণরূপে ভারতীয় ছিলেন। তিনি কলেজে শুধু ক্লাস নেবার সময়ে ইংরেজীতে কথা বলতেন। অবশিষ্ট সব সময়ে মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। অন্য অধ্যাপকরাও অনুরূপ বৃত্তি ও স্তরের মানুষ ছিলেন। কেশবরাও-এর উপর তাঁদের আচরণের এমনই প্রভাব পড়েছিল যে পরবর্তীকালে যদি কেউ সাধারণ ঘরোয়া ব্যাপারে ইংরেজীর ফোড়ন দেবার চেষ্টা করত তখন তিনি তাঁর এই গুরুদের উদাহরণ গৌরবের সঙ্গে উল্লেখ করে তাদের ভুল ধরিয়ে দিতেন।

ঐ কলেজে পড়ার সময়ে কেশবরাও বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুললেন। কলেজ থেকে ফেরার পর তিনি নিজের ঘরে বেশীক্ষণ থাকতেন না। নেবুতলা লেনে পাঞ্জাবী ছাত্রদের একটি মেস ছিল। সেখানে সর্দার নিরঞ্জন সিংহ ও শ্রী শিবদত্তজী পরাশরের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ওঁরা দুজনেই কেশবরাও-এর সহপাঠী ছিলেন এবং খেলোয়াড়ী মনোভাবে সমানধর্মী ছিলেন। কেশবরাও পাঞ্জাবী মেসে পা রেখেই কারো হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে একদিকে ফেলে দিতেন, নয়তো কারো আলো নিভিয়ে দিতেন। এইসব খেলা প্রায়ই চলত এবং এই হাসি তামাশা দেখার জন্য মেসের সবাই সেখানে জড় হত। তাঁর কথা-বার্তায় এমন মিষ্টতা ছিল যে এমন গোলমাল করা সত্ত্বেও সেখানে কারো যেতেই অস্বস্তি হত না। ডাঃ পরাশরের কথায় সেখানকার বন্ধুরা কেশবরাওকে পাঞ্জাবী মিষ্টি খাওয়াতেন। তাঁর পরিবর্তে কেশবরাও তাঁদের মহারাষ্ট্রের শ্রীখণ্ড খাওয়াতেন।

এই সময়ে কেশবরাও-এর স্বভাবে তাঁর বংশের প্রকৃতিগত গরম মেজাজ কিছু কম ছিল না। কিন্তু ক্রোধাগ্নির বৃদ্ধির প্রসঙ্গ খুব কমই আসত। পাঞ্জাবী নিবাসে নিরঞ্জন সিংহ স্নান করার পর দোতলার জানালার সামনে বসে চুল শুকোতেন। এবং উঁচু স্বরে 'জপজী সাহেব'-এর পাঠ করতেন। এই জানালাটি এক বাঙ্গালী পরিবারের উঠোনের দিকে খোলা থাকত। তাঁদের উচ্চৈঃস্বরের পাঠ ভাল লাগত না, তাই তাঁরা জানালা বন্ধ করতে বলেন। কিন্তু নিরঞ্জন সিংহের সেইদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ ছিলনা। একদিন যখন নিরঞ্জন সিংহ স্নান ঘরে স্নান করছিলেন, সেই সময়ে বাইরে থেকে কোন সজ্জন মই বেয়ে তাঁর জানালা বন্ধ করে দেবার জন্য উঠতে থাকেন। একথা বুঝতে পেরে নিরঞ্জন সিংহ ছুটে আসেন আর এক ঝট্‌কায় মই ঠেলে ফেলে দেন। মইয়ে উঠেছিল যে ব্যক্তি সে উঠোনে পড়ে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ক্রুদ্ধ হয়ে চীৎকার করতে থাকে "নিয়মমত আমি জানালা বন্ধ করে ছাড়ব।" কিন্তু তার বাক্য পুরো হওয়ার আগেই নিরঞ্জন সিংহ জানালা দিয়ে চিৎকার বলে ওঠেন "যা, যা। আমি নিয়ম-টিয়ম মানি না।"

এই বিবাদের পর পুলিশে রিপোর্ট করা হয়। তা শুনে বাংলার প্রসিদ্ধ নেতা শ্রী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী কেশবরাওকে মধ্যস্থ করে বিবাদ মিটিয়ে দেন, যিনি প্রায়ই এই মেসে যাতায়াত করতেন। কিন্তু বিবাদ একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। পাঞ্জাবী ছাত্রদের সেখান থেকে একেবারে চিরদিনের মত বিতাড়িত করার যোজনা তৈরী করে ঐ গলির লোকেরা রাত্রের অন্ধকারে পাঞ্জাবী মেসের উপর ইঁট-পাথর ছুঁড়তে শুরু করে দিল। অনেক চেষ্টা করেও বোঝা গেলনা







সহপাঠীদের সঙ্গে ঃ দাঁড়িয়ে (১) ডাঃ সরদেশপাণ্ডে, বাঢ়োনা, জেলা-ওয়ার্ধা, (২) ডাঃ হেডগেওয়ার, (৩) শ্রীপরশরাম (রাঁধুনি) চেয়ারে ঃ (১) ডাঃ সালপেকর, ছিন্দওয়াড়া; (২) ডাঃ শঙ্কররাও নাইক, মুর্তিজাপুর; (৩) শ্রী আপ্পাসাহেব খাপর্ডে, অমরাবতী; (৪) ডাঃ কেলাপুরে, যবতমাল।
বসে ঃ ডাঃ ইংলে,অমরাবতী; (২) ডাঃ বি,আর,কানিটকর, অকলুজ; (৩) ডাঃ লুলে, উমরেড।



ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

চেয়ারে বসে ঃ সীতারামপন্ত হেডগেওয়ার ও তাঁর আত্মীয়-স্বজন
দাঁড়িয়ে ঃ ডাঃ হেডগেওয়ার



আর্বীতে দত্তবিধান সমারোহে- শ্রী নঃ গোঃ দেশপাণ্ডের গৃহে; বসে বাঁ দিক থেকে ঃ শ্রী সীতারামপন্ত হেডগেওয়ার, মাঝখানে ঃ শ্রী নঃ গোঃ দেশপাণ্ডে , তাঁর স্ত্রী ও দত্তকপুত্র; ডানদিকে ঃ ডাঃ হেডগেওয়ার।

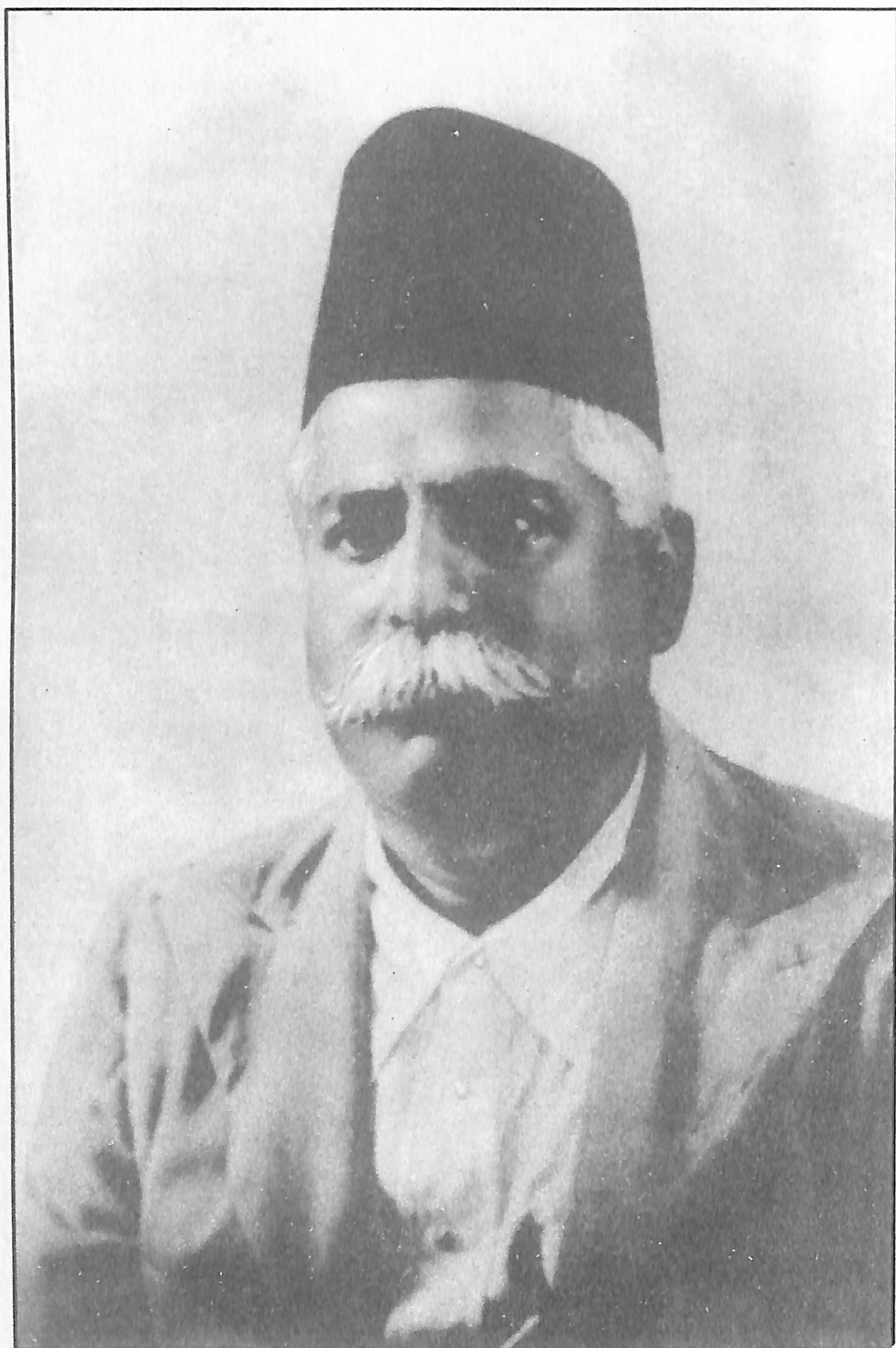


ডাক্তারজীর পৈতৃক গৃহ





ডাক্তারজীর একমাত্র (তৎকালীন) গণবেশ পরিহিত ছবি



যে কোন্ দিক থেকে পাথর ছোঁড়া হচ্ছে। একদিন সন্ধ্যায় কেশবরাও সেখানে এলেন। সংযোগবশতঃ ঠিক সেই সময়ে পাথর ছোঁড়া শুরু হয়ে গেল। "এই বিবাদের আজই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে ফেলতে হবে"- এই কথা ভেবে তিনি ও নিরঞ্জন সিংহ দুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসেন এবং সামনেই গলিতে দুজনকে জোরে চড় কষিয়ে দেন। এই আকস্মিক ব্যাপারে হতচকিত হয়ে তারা বলল - "আমাদের মারছেন কেন?" তাঁদের কথা শুনে কেশবরাও কড়া সুরে বললেন - "আমাদের বাড়ীতে কারা ইঁট-পাথর ছোঁড়ে। আমরাও তাই কাউকে মারছি। ঢিল ছোঁড়া বন্ধ হলে আমরাও থেমে যাব।" তাঁদের রুদ্র রূপ দেখে এবং কঠোর বাক্য শুনে ওরা ভয় পেয়ে আর কিছু না বলে চুপচাপ কেটে পড়ল। কিন্তু 'ঝিকে মেরে বউকে শেখানো' নীতি অনুযায়ী গলির অধিবাসীদের উপর এর যথাযথ পরিণাম হল এবং ঢিল ছোঁড়ার ঝামেলা চিরতরে শান্ত হয়ে গেল।

মাঝে-মাঝে এরকম বিবাদ-বিসম্বাদের পরিণাম তিনি কখনো নিজের উপর হতে দেননি। তাঁর মনে কোন ব্যক্তি বা প্রদেশের সম্বন্ধে কোন বিকৃত মনোভাব অথবা বিদ্বেষ ছিলনা। বরং তাঁর নিয়ম ছিল, যখন যে প্রদেশে যাবেন সেখানকার জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়েই থাকা উচিত। কলকাতার পর্দানশীন পরিবারেও তিনি আত্মীয়ের মত বাস করতেন। এই মনোবৃত্তির দরুন ১৯১০ সালে কলকাতায় যখন দাঙ্গা হল তখন তিনি নিজের কলেজের ছাত্রদের নিয়ে একটি শুশ্রূষা-বাহিনী গঠনের কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

কাবুলি পাঠানরা একবার প্রকাশ্যে রাস্তার উপর গোহত্যা করল। এর ফলে কলকাতায় গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। এই দাঙ্গার সময়ে মুসলমানরা কলকাতার ধনী মারোয়াড়ীদের খুব লুটপাট করে। কানের সোনার গয়না ও নাকের নথ লুন্ঠনের জন্য ওরা মহিলাদের কান ও নাক কাটতেও কসুর করেনি। এই ধরনের অত্যাচার দেখেও প্রতিবেশী বাঙালী হিন্দুরা যে রকম করা উচিত সে রকম সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে স্বদেশীর কার্যক্রমে মারোয়াড়ীদের সহযোগিতা না করারই এটা প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া ছিল। এই কারণেই চোখের সামনে সিন্দুক ভাঙ্গতে ও দোকান লুঠ করতে দেখেও 'এটা ওদের কৃতকর্মের শাস্তি' এইরূপ মনোভাব গ্রহণ করে অন্যান্য হিন্দুরা চোখ বুঁজে থাকত। হিন্দু সমাজের মধ্যে এই বিরূপ পারস্পরিক সম্পর্ক দেখে কেশবরাও অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং শুশ্রূষা-বাহিনীতে তিনি অত্যন্ত উৎসাহ ও তন্ময়তার সঙ্গে কাজ অব্যাহত রাখলেন। এই বাহিনীতে মোট দশ-বারো জন ছাত্র ছিলেন। আহত ব্যক্তিদের স্ট্রেচারে তুলে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া এবং সেখানে তাদের শুশ্রূষার কাজ এঁরা করতেন।

একবার যখন তাঁরা এক অচৈতন্য ব্যক্তিকে চিকিৎসালয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এক ব্যবসায়ীর চৌকিদার চোখের পলকে জনৈক পাঠানের পিঠে ছোরার আঘাত করল। শুশ্রূষা-বাহিনীর একজন বললেন — "এসো, এর প্রাথমিক চিকিৎসা করি।" কিন্তু এই ধরনের গণ্ডগোলের অবস্থায় যার ভাল করতে যাওয়া হয় সে-ই অনেক সময়ে বিরুদ্ধাচরণ করে, ফলে চোরের বদলে সাধুরই শাস্তি হয়। এরকম অনেকবার দেখা গেছে। এই কথা মনে রেখে কেশবরাও বললেন, "আমাদের মধ্যে থেকে কেউ প্রাথমিক চিকিৎসা করতে গেলে

পুলিশ এসে আমাদেরই ধরে নিয়ে যাবে, কারণ আমরা সবাই হিন্দু। তখন সব ঝামেলা আমাদেরই মাথার উপর এসে পড়বে।''

এই দাঙ্গার পরেও ছাত্ররা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে সেখানে পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করতেন।

কেশবরাও যখন কলকাতার আসেন তখন 'স্বদেশী আন্দোলন' কার্যতঃ মন্দীভূত হয়ে পড়েছিল। ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে ক্ষুদিরাম বোস কর্তৃক বোমা নিক্ষেপের পরে কিছু দিন পর্যন্ত বাংলার বাতাবরণ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর সেই সময়ের বর্ণনা এইভাবে করেছিলেন — ''ঐ বোমার বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানের পুরাতন রাজনীতিতে বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছিল এবং সশস্ত্র বিপ্লবের নতুন রক্ত-রঞ্জিত যুগের উদয় হয়েছিল।'' এই নতুন যুগের সংকেত বার্তা ইংরেজদের নিকট চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। একজন কৃষক যদি দুর্বার এক একটি করে মূল খুঁড়ে সম্পূর্ণ ঘাসের বিস্তারকে ধ্বংস করার মুর্খতাপূর্ণ প্রয়াস করে, সেই ভাবেই বিপ্লবীদের আন্দোলনকে সমূলে ধ্বংস করার প্রয়াস ইংরেজরা শুরু করে দিল। শুধুমাত্র 'আলিপুর বোমা মামলা' সম্পর্কে সরকার যে সব প্রমাণ ও দলিলপত্রের বিশাল পরিমাণ সংগ্রহ করেছিল, তাই দেখেই তাদের এই প্রচেষ্টার বিষয়ে অনুমান করা যেতে পারে। ঐ মামলায় দুশো ছয় জন সাক্ষী পেশ করা হয় এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ নথিবদ্ধ হয় চার হাজার পৃষ্ঠা কাগজে। বোমা, পিস্তল, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদির সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। এত সব তদন্তের দরুন কয়েক হাজার মানুষের তল্লাশি করা হয় এবং কত অসংখ্য লোককে মারধোর করে পায়ে-বেড়ী পরানো হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সরকার অনেক প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে সমাজে এক সন্ত্রাস তথা আতঙ্কের বাতাবরণ সৃষ্টি করে রেখে ছিল। সূর্যাস্তের পরে চতুর্দিকে ১৪৪ ধারা বলবৎ করা হত এবং এই আদেশ অমান্যকারীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। যে 'যুগান্তর'-এর গ্রাহক সংখ্যা কুড়ি হাজারেরও বেশী ছিল, কিংসফোর্ডের বক্র দৃষ্টির দরুন তার প্রকাশন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে যে পত্রিকার মাধ্যমে জনসাধারণের মনোভাব তেজস্বী হয়ে উঠত এবং সকল সংকটকে তারা সহজেই সহ্য করতে পারত, সেই মাধ্যমটিও মানুষের হাতছাড়া হয়ে গেল। সরকারের এই দমননীতির পরিণামে সাধারণ মানুষ ভীতিগ্রস্ত ও নির্জীব হয়ে পড়েছিল। অত্যাচারের উগ্রতা দেখে জন মোর্লের মত রাজনৈতিক নেতাও চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি লর্ড মিন্টোকে প্রেরিত এক পত্রে লেখেন, ''আমাদের শান্তি প্রতিষ্ঠা করা উচিত, কিন্তু মাত্রাহীন কঠোরতা শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ নয়। উল্টে সেটা বোমার দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ হয়ে দাঁড়ায়।''

গণ-আন্দোলনের আবেগ সোডা-ওয়াটারের বোতলের মতই খোলার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার পরে ক্রমে তার আবেগ শেষ হয়ে যায়। সরকারী দমননীতি চলতে থাকায় প্রাথমিক উদ্দীপনা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আন্দোলনকারী সমাজে যদি সংগঠন ও ধ্যেয়নিষ্ঠার অভাব থাকে তাহলে আন্দোলনের বাহ্য রূপ অচিরেই স্তিমিত হয়ে পড়ে। কেশবরাও যখন কলকাতায় যান তখন বিপ্লবী তরুণরা ছাড়া অবশিষ্ট জনসাধারণের মধ্যে জড়তাপূর্ণ বাতাবরণ পরিব্যাপ্ত ছিল। অভিযোগ থেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন হয়ে বেরিয়ে আসার

পর ১৯০৯ সালে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এই অবস্থার যথার্থ বর্ণনা করেছিলেন। তিনি লেখেন — ‘‘আমি যখন কারাগারে গেলাম তখন ‘বন্দেমাতরম্’-এর গর্জনে সম্পূর্ণ দেশে এক চৈতন্যের সঞ্চার হয়েছিল। একটি রাষ্ট্রের আশা-আকাঙ্ক্ষায় সম্পূর্ণ দেশ উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। অধঃপাতের নিদারুণ দুরবস্থা থেকে উপরে ওঠার জন্য কোটি-কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা চতুর্দিকে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পর যখন আমি সেই উদ্‌ঘোষ শোনার জন্য কান পেতে রইলাম, তখন চারিদিকে শান্তি বিরাজ করছিল। সম্পূর্ণ দেশে এক আশ্চর্যজনক নীরবতা ছেয়ে গিয়েছিল এবং জনতাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখাচ্ছিল। এটা স্বাভাবিকই ছিল, কারণ আমরা ভবিষ্যতের দিবা স্বপ্নের মাধ্যমে যে উজ্জ্বল দিব্য আকাশ দেখেছিলাম, তার স্থানে এখন চারিদিকে ঘন অন্ধকার ছেয়ে গিয়েছিল যেখানে আসুরিক বৃত্তির বজ্র-বিদ্যুতের ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল।’’ এই বিষম পরিস্থিতিতেও যাঁরা সজাগ ও সতর্ক ছিলেন, তাঁদের উদাম ক্রমান্বয়ে অব্যাহত ছিল। তাঁদের মধ্যে দেশভক্ত পুলিনবিহারী দাসের ‘অনুশীলন সমিতির’ নাম প্রধানভাবে উল্লেখ করতে হবে। সরকারের এমন বক্রদৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও এর কর্মকর্তারা জনসাধারণকে জাগ্রত করার জন্য গুপ্তরূপে পত্রক ও পুস্তক মুদ্রিত করে চুপচাপ বিতরণ করে চলেছিলেন। এই কাজে কেশবরাও অংশগ্রহণ করছিলেন। ছুটিতে পরিচিত যে সব ছাত্ররা বাড়ী যেতেন, তাঁদের হাতে এই ধরনের সাহিত্য প্রচুর সংখ্যায় বিভিন্ন প্রান্তে প্রচারের জন্য পাঠাতেন। তিনি বহু ব্যক্তির সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে নিয়েছিলেন, তাঁরাই এ সময়ে কাজে লাগছিলেন। নাগপুরের দিকেও এই ধরনের পত্রক তিনি পাঠাতেন।

‘অনুশীলন সমিতি’র প্রধান শ্রী পুলিনবিহারী দাস স্নাতক ছিলেন। বঙ্গ-ভঙ্গের পরে সরকার বিভিন্ন কারণে তাঁকে গ্রেপ্তার করার অনেক ফন্দি আঁটে। কখনও অস্ত্র-শস্ত্র জড়ো করার অভিযোগ, আবার কখনো ছেলেদের ফুসলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ। ঢাকাতে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সরকারের মত মুসলমানেরাও সেখানকার নবাবের পৃষ্ঠপোষকতায় সমিতির বিরুদ্ধে অনেক ঝড় তোলে।

প্রথমে তাদের হুমকি দেওয়া হয় এবং পরে প্রত্যক্ষ আক্রমণও করা হয়। পুলিনবাবুর আখড়ায় একদিন সাতশো মুসলমান আক্রমণ করে। কিন্তু আখড়ার কেবল ছয় তরুণ এমন কৌশল ও সাহসিকতার সঙ্গে সেই আক্রমণের সম্মুখীন হয় যে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন মুসলমান আক্রমণকারী আক্ষরিক অর্থে সেখানেই আহত হয়ে পড়ে যায়। বাংলার পুলিনবাবুর এই আখড়াগুলি বাস্তবিক দেশভক্ত ও ধৈর্যশীল তরুণদের সংস্কার কেন্দ্রই ছিল। কেশবরাও-এর সঙ্গে পুলিনবাবুর কতখানি সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল সেকথা বলা কঠিন। কারণ ১৯০৯ সালের আগষ্ট মাসে পুলিনবাবুকে কোন তদন্ত না করেই দু মাসের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়েছিল এবং ওখান থেকে ছাড়া পাবার দু-এক বছরের মধ্যেই তাঁকে দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ ১৯১১ থেকে ১৯১৩-র প্রথম দিকেই কেশবরাও-এর সঙ্গে তাঁর কিছুটা সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু সেই সময়ে উভয়ের উপরেই সরকারের কঠোর ও বক্র দৃষ্টি ছিল। শ্রীরামলাল বাজপেয়ী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন যে ছুটিতে কেশবরাও নাগপুরে গেলে তাঁর উপর

দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যে তিনি যেন দুই-তিনশো টাকা মূল্যের একটি রিভলভার নিজের সাথে নাগপুরের বিপ্লবীদের জন্য নিয়ে যান। সেই সঙ্গে তিনি একথারও সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে তিনি 'অনুশীলন সমিতি'তে প্রবেশ লাভ করেছিলেন। প্রসিদ্ধ বিপ্লবী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীও নিজের গ্রন্থ 'জেলের মধ্যে ত্রিশ বছর' (পৃঃ ১৫১) তে লিখেছিলেন যে কেশবরাও-এর কলেজেরই এক সহপাঠী শ্রী নলিনী কিশোর গুহ তাঁকে ও ডাঃ নারায়ণরাও সাভারকরকে 'অনুশীলন সমিতি'-তে নিয়ে এসেছিলেন।

কলকাতায় যে 'অনুশীলন সমিতি'-তে কেশবরাও প্রবেশ করেছিলেন সেখানে অনেক পরীক্ষার পরেই প্রবেশ লাভ করা যেত। ব্যক্তির বৃত্তি, চরিত্র, শারীরিক বল, সতর্কতা, সহনশীলতা, আদেশ-পালন, সংযম ইত্যাদি বিষয়ের যথাযথ পরখ করে তার যোগ্যতা অনুসারে তাকে ক্রম-পর্যায়ে সমিতিতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হত। এর জন্য সমিতির একেবারে নির্বাচিত ও মাত্র কয়েকজনকে নিয়ে একটি কেন্দ্র এবং তার বাইরে ক্রম — নিম্ন পর্যায়ে অনেক মণ্ডলের যোজনা করা হয়েছিল। সমিতির সদস্য হবার পর দশ-বারো জনের সম্মুখে কালী মন্দিরে অথবা শ্মশানে ধার্মিক বিধিপূর্বক প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হত। যোগ্যতা অনুসারে সদস্যদের চারটি শ্রেণী ছিল এবং তাঁদের প্রতিজ্ঞাগুলিও উগ্রতার দিক থেকে ক্রমশঃ কঠোর হতে থাকত। কেশবরাও-এর যদি সমিতির অভ্যন্তরে প্রবেশ হয়ে গিয়ে থাকে তো তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ঐ সমিতির অগ্রগণ্য সদস্য শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী তাঁর "জেলের মধ্যে ত্রিশ বছর" গ্রন্থে অনুশীলন সমিতি'র কয়েকজন সদস্যের ছবি মুদ্রিত হয়েছে, তার মধ্যে কেশবরাও-এর ছবিও অন্তর্ভুক্ত। তাতে তিনি একথাও লিখেছিলেন যে, "যাঁরা অন্তিম প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতেন, তাঁরাই সমিতির প্রকৃত সদস্য বলে গণ্য হতেন। যে সদস্যরা বাড়ী-ঘর ত্যাগ করে চলে আসতেন তাঁরাই অন্তিম প্রতিজ্ঞা গ্রহণের অধিকারী হতেন।" প্রকৃত সদস্যের যে নিরিখের শ্রী চক্রবর্তী উল্লেখ করেছিলেন, সেই নিরিখে কেশবরাও নিশ্চয়ই খাঁটি বলে প্রতিপন্ন হয়েছিলেন।

কেশবরাও-এর কলকাতার বিপ্লবী জীবন সম্বন্ধে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে জানা যায়। একে তো সশস্ত্র বিপ্লবে এমনিতেই বিশেষ গোপনীয়তা রক্ষা করে চলা হয়। সেখানে বিপ্লবীদের নামের চেয়ে পিস্তল ও বোমার মাধ্যমেই তাঁদের মনোগত অবস্থার পরিচয় লাভ করা যেত। তাছাড়া, কেশবরাও-এর স্বভাবই ছিল কোন রকম প্রচার না করে চুপচাপ শান্তভাবে কাজ করে যাওয়া। নিজের ঢোল নিজেই পেটানো তিনি পছন্দ করতেন না মোটেই। এই কারণে গণপতির বিসর্জনের পরে যেমন আসল মূর্তিটি জলের গভীরে ডুবে যায় আর জলের উপর শুধু ফুল ও দূর্বাই দেখতে পাওয়া যায়, সেই রকম কেশবরাও-এর বিপ্লবী জীবনের আসল কর্মকাণ্ড তো কালের গহ্বরে লীন হয়ে গেছে, কেবল তাঁর সহপাঠীদের উপর-উপর যেটুকু অবগতি হয়েছিল, অথবা তাঁর সঙ্গে থেকে যেটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল, তা থেকেই সম্প্রতি কিছু জানা গেছে।

কেশবরাও যখন থেকে নাগপুর ছেড়ে চলে আসেন, তখন থেকেই সরকারী গোয়েন্দাদের নজর তাঁর প্রতি নিবিষ্ট ছিল এবং কলকাতায় জনৈক গোয়েন্দা তাঁর নিবাসস্থানেই থাকতে শুরু

করে দিয়েছিল। কিন্তু মানুষকে চেনার এক অদ্ভুত ক্ষমতা থাকার ফলে তাকে চিনে নিতে কেশবরাও-এর বিলম্ব হল না। এবং তিনি প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করলেন। শ্রী গোপাল বাসুদেব কেতকর নামক সজ্জন কলকাতার আয়ুর্বেদিক কলেজে ভর্তি হয়েছিল। সে মহারাষ্ট্র থেকে আগত সকল ছাত্রদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে নিয়েছিল। "এই ছাত্রটিকে খুব সোজা বলে মনে হচ্ছে না। অতএব ঘরে ও থাকলে রাজনীতির বিষয়ে আলোচনা করা ঠিক হবে না এবং ওর থেকে সতর্ক থাকতে হবে।" এই সতর্কবার্তাটি কেশবরাও তাঁর সব বন্ধুদের দিয়ে রেখেছিলেন। বণীর ডাঃ যাদবরাও অণে, চান্দার ডাঃ শঙ্কর সীতারাম বৈদ্য, বোম্বাই-এর ডাঃ শঙ্কররাও নাইক (আজকাল 'তেণ্ডুলকর' উপাধি ব্যবহার করেন), গোপাল রাও দেব, আর্বির ডাঃ মোহরীর ইত্যাদি সমস্ত ব্যক্তিরা আজও ঐ ব্যক্তির কথা মনে রেখেছেন। কিন্তু তাঁর বন্ধুরা বললেন, "কেতকর সম্পর্কে আপনার আশঙ্কা ভিত্তিহীন।" এই কথার জবাবে কেশবরাও শুধু এইটুকুই বলেন যে, 'যথাসময়ে বলব, কিন্তু আপনারা সতর্ক থাকবেন।" পরে ১৯১১ সালের জুন মাসে স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রী নারায়ণরাও সাভারকর জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আয়ুর্বেদিক শিক্ষার জন্য কলকাতায় আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কেশবরাও তাঁর বন্ধুর পত্রে সে সংবাদ আগেই জেনেছিলেন। অতএব, তাঁর অনুমান ছিল যে এ ব্যাপারে বোম্বাই-এর সরকারের পক্ষ থেকে কেতকরের নিকট অবশ্যই নির্দেশ এসে থাকবে। তাঁর অনুমান সত্য ছিল। কেতকর ঘর থেকে বাইরে গেলে সুযোগ বুঝে তার বাক্সের তালা খুলে তার মধ্যে সদ্য আগত একটি পত্র খুঁজে বার করলেন। সেই পত্রে লেখা ছিল — 'নাঃ দাঃ সাঃ ওখানে যাচ্ছেন। তাঁর উপর নজর রেখ।" পত্রটির ঐ অংশ বন্ধুদের দেখিয়ে সেটি যেমন ভাবে ছিল সেই ভাবে বাক্সে রেখে তালা বন্ধ করে দিলেন। এই ঘটনার পরে কেশবরাও-এর বন্ধুদের পরামর্শ ছিল যে, "এই সজ্জনকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে।" কিন্তু কেশবরাও-এর মত ছিল যে 'আমাদের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য এর নিযুক্তি হয়েছে। অতএব, আমাদেরও ওর উপর নজর রাখা দরকার। এটা আমাদের পক্ষেও লাভজনক হবে, আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়ার থেকেও আমাদের মাঝে থাকলে তার উপর নজর রাখা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। তবে তার বিষয়ে সঠিক কল্পনা রেখে আমাদের সাবধানে চলতে হবে, সেটুকুই যথেষ্ট।"

এই সময়ে মধ্যপ্রান্ত সরকারের আদেশানুসারে তার এক পুলিশ অফিসার শ্রী তারে শিং ভেঙে বাছুরের দলে ভিড়ার মত ছাত্র হিসাবে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। যদিও এই তথ্য আশাতীতভাবে ১৯২০ সালে জানা গেল, তথাপি তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হত যে তাঁর আসল পরিচয় কেশবরাও আগেই জানতেন। তারে মহোদয় অন্য সকলের সঙ্গে কথা বলার সময়ে এমন তেজস্বিতা ও উৎসাহ দেখাতেন যে তার কথার তীব্রতার দরুন অনেকে বেশ ভয় পেয়ে যেত। তার কথাবার্তায় অতি-নাটকীয়তা সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নজর এড়াতে পারত না। সত্যিকার দেশভক্তির কল্পনা যাঁর আছে, তাঁর যখন-তখন ভাবুকতার প্রদর্শন দেখে সেই ব্যক্তির প্রতি ঘৃণাই হবে। কিন্তু কেশবরাও ও তাঁর সহযোগীরা তার আবেগে পরিপূর্ণ বক্তৃতা শান্তভাবে শোনার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। পরে ঐ ব্যক্তি

তার কৃতকর্মের জন্য স্বয়ং অনুতপ্ত হন এবং তিনি সরকারী চাকুরী থেকে পদত্যাগ করে সাগর চলে যান।

'অনুশীলন সমিতি'-তে কেশবরাও নিশ্চিতরূপে কী কাজ করতেন তা জানা যায়নি। কিন্তু এটুকু অবশ্য জানা গেছে যে তিনি 'শান্তিনিকেতন' থেকে মাঝে মাঝে রাত্রিবেলায় বাইরে যেতেন এবং কখনো-কখনো রাত্রি প্রায় ১২টা-১টার সময়ে শুতে যেতেন। সেই সময়ে তিনি ও তাঁর বন্ধু ডাঃ পরাশর এবং আরো কয়েকজনের সঙ্গে রসায়ন অধ্যাপক শ্রী চৌধুরীর কাছে যেতেন। সরকারের সন্দেহ ছিল যে চৌধুরী এঁদের বোমা বানাতে শেখাতেন। সেই কারণে ছাত্ররা তাঁর গৃহে প্রবেশ করার সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে গোয়েন্দা কয়েকঘণ্টা তাঁর দরজার সামনে ঘুরে বেড়াত। একবার অধ্যাপক মহোদয়ের সাথে ছাত্রদের গল্প-গুজব অনেক রাত পর্যন্ত চলতে থাকে। গোয়েন্দা বেচারা ক্লান্ত হয়ে তার বাইরের সিঁড়িতে বসে পড়ে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চোখ বুজে আসে। রাত প্রায় বারোটার সময়ে যখন কেশবরাও, পরাশর ইত্যাদি নিচে নামতে থাকেন, তখন অন্ধকারে দু-একজন ছাত্র যাঁরা সামনে ছিলেন, তাঁরা সিঁড়িতে উপবিষ্ট ব্যক্তির ঘাড়ে, পা দিতেই পড়ে যান। "কে এখানে?" চীৎকার শুনে বেচারা চোখ খুলেই পালাতে শুরু করে। কিন্তু তাঁরা তাকে ধরে ফেলেন আর দু-চারটে চড়-চাপড়ও লাগিয়ে দেন। "চল থানায়" শুনেই সে বেচারা ভয়ে কাঁপতে থাকে। শেষে তার অনেক অনুনয়-বিনয় শুনে কেশবরাও বলেন, "ছেড়ে দাও, এ বেচারা তো আমাদের বন্ধু আর এই কারণে প্রতিদিন আমাদের সাথে থাকে কিন্তু ভুলেও আমাদের সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানায়না।" এই মর্মাঘাতে বেচারা গোয়েন্দার মনের অবস্থা কল্পনা করা যেতে পারে। তার উপর অনুগ্রহ করার দরুন ছাত্ররা সেই রাতে গোয়েন্দা প্রবরের কাছে থেকে মিষ্টি খেয়ে তবে ছাড়ে।

'স্বদেশী আন্দোলনের' সময়ে অনেক নেতা বিভিন্ন প্রান্ত হতে আগত ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন ছাত্রদের নিবাস-স্থানে। এইরূপ অবসরে যে নতুন পরিচয় ঘটত, কেশবরাও বার-বার তাদের কাছে গিয়ে পরিচয়কে ঘনিষ্ঠতর করে তুলতেন। এঁদের মধ্যে দুজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। একজন ছিলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এবং অপর জন মৌলবী লিয়াকৎ হুসেন।

শ্রী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ছিলেন খর্বকায় ও কৃশকায়। তিনি তাঁর নামের অনুরূপ শ্যামবর্ণ ছিলেন, কিন্তু নির্মেঘ আকাশের মতই স্বচ্ছ ছিল তাঁর চরিত্র। ১৯১০ সালে ব্রহ্মদেশে একান্তবাসের দণ্ড ভোগ করে ফিরেছিলেন এবং অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে কিন্তু হাসতে-হাসতে জীবনে কর্মযোগের আচরণ করছিলেন। নির্বাসন-দণ্ডলাভের পূর্বে তিনি তাঁর ধারাল ও বঙ্কিম লেখনীর মাধ্যমে 'প্রবাসী', 'সন্ধ্যা' ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকাগুলিতে যে দেশভক্তি ও উত্তেজনাপূর্ণ তথা ব্যাঙ্গাত্মক রচনা লিখেছিলেন, তার দরুন দ্বীপান্তরের দণ্ড-প্রাপ্ত প্রথম নয় জনের মধ্যে তাঁকে সম্মিলিত করার সম্মান সরকার দিয়েছিল। শ্যামসুন্দর বি এ পর্যন্ত পড়েছিলেন এবং ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাংলা তিনটি ভাষাতেই তাঁর প্রভুত্ব ছিল। লোকমান্য তিলকের কলকাতায় আগমন উপলক্ষে 'বন্দেমাতরমের' সংখ্যায় 'Crime of Nationalism' (রাষ্ট্রভক্তির অপরাধ) শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধের ভাষা,

ভাবনা ও চিন্তাধারার ত্রিবেণী সঙ্গম দেখে লোকমান্য তিলক এমন প্রসন্ন হন যে তিনি স্বয়ং মতিলাল ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পাদক শ্রী অরবিন্দ ঘোষকে অভিনন্দন জানাবার জন্য তাঁর গৃহে পদার্পণ করলেন। কিন্তু শ্রী অরবিন্দ তাঁকে বললেন যে এই অভিনন্দন তাঁর প্রাপ্য নয়, ঐ প্রবন্ধের লেখক হলেন শ্রী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। এমন প্রভাবী লেখনীর অনায়াস সদ্ব্যবহার করার ক্ষমতাসম্পন্ন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী বরাবর সরকারের চক্ষুশূল হয়ে থাকার দরুন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে কলকাতায় নগ্নপদে ঘুরে বেড়াতেন। অনেক সময়ে তিনি শুধু ধুতি পরে একটা চাদর গায়ে দিয়ে থাকতেন, শুধু এটুকুই ছিল তাঁর দেহাবরণ। কিন্তু এত কিছু হওয়া সত্ত্বেও যখনই তিনি কেশবরাওদের নিবাসস্থানে আসতেন, তখনই তরুণদের উদ্যমী হওয়া ও ধ্যেয়বাদের প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। কেশবরাও ও তাঁর বন্ধুদের শ্যামবাবুর অবস্থা অজানা ছিল না, সেই কারণে যখনই তিনি আসতেন, তখনই তাঁকে নিজেদের সঙ্গে ভোজনে বসাতেন এবং তিনি চলে যাবার সময়ে কিছু অর্থ দিতেও ভুলতেন না। শ্যামসুন্দর স্বভাবে এমন নিরহংকারী অনাসক্ত ছিলেন যে কেউ কিছু দিলে তা গ্রহণ করতেন। এবং একটু পরেই কেউ চাইলে তখনই হাসিমুখে সব কিছু দিয়েও দিতেন। শ্রী বিপিন চন্দ্র পাল তাঁর উদারতার বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখেন যে "কোন বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তির যদি তাঁর থেকে অধিক অথবা তাঁর সমানই প্রয়োজন আছে বলে মনে করতেন, তা হলে নিজের কাছে যা থাকত তার পাই-পয়সা সব কিছু দিয়ে দিতে তিনি এতটুকু ইতস্তত করতেন না। যে ব্যক্তিই শ্যামসুন্দরের নিকট সম্পর্কে আসতেন তিনিই তাঁর সতত উদাত্ত প্রবৃত্তি ও মহান্ তথা উচ্চ চিন্তার পরিচয় পেতেন।"

এই প্রকার সাত্ত্বিক দেশপ্রেমিকের সম্বন্ধে কেশবরাও-এর হৃদয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধার মনোভাব ছিল। তিনি তাঁর বক্তৃতা শুনতে অবশ্যই উপস্থিত থাকতেন। তাঁর গৃহেও কেশবরাও সর্বদাই আসা-যাওয়া করতেন। কেশবরাও নিজেও এই প্রকার দারিদ্র্য ও বাধা-বিপত্তির সঙ্গে লড়াই করে এগিয়ে চলেছিলেন, অতএব, শ্যামবাবু সম্পর্কে তাঁর সমবেদনা ও আস্থার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তিনি তাঁর মনোভাবকে দুর্বাদলের মত গড়ে তুলেছিলেন, যার ফলে তার উপর অশ্রুধারার বর্ষণ হলেও তিনি তাকে হাসির মুক্তা রূপে জগতের সম্মুখে প্রকাশ করতেন। শ্যামসুন্দরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে তাঁর এই মনোভাবের বিশেষ পরিচয় তাঁর লাভ হয়েছিল। শ্যামবাবুর প্রতি সমবেদনার কারণেই কেশবরাও তাঁর কন্যার পাকা-দেখা থেকে শুরু করে নির্বিঘ্নে বিবাহের শুভকার্য সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সব কাজে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন এবং মঙ্গলকার্যে আর্থিক সাহায্যের জন্য অর্থ-সংগ্রহও করেন।

মৌলবী লিয়াকৎ হুসেন ছদ্ম 'রাষ্ট্রীয়' মুসলমানদের মধ্যে তুলসীর চারার মতই ব্যতিক্রম ছিলেন। কেশবরাও যখন কলকাতায় ছিলেন তখন মৌলবীর বয়স ষাটের উপর ছিল কিন্তু অখণ্ড অধ্যবসায় ও কর্মক্ষমতায় তিনি তরুণদেরও লজ্জা দিতেন। মাত্র দুই-চার আনা ব্যয় করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। এই বৃদ্ধ মৌলবী লোকমান্য তিলকের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন এবং স্বদেশী ব্রতের কঠোরভাবে পালন করতেন। দরিদ্র মানুষদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে তিনি তাদের মধ্যে বিতরণ করতেন। দরিদ্র ছাত্রদের ঐ অর্থ থেকে পাঠ্যপুস্তক ও

বিদ্যালয়ের বেতনের ব্যবস্থা করতেন। এইভাবে তাঁর কোন-না-কোন কাজ চলতে থাকত। নিজের সঙ্গে যত জনকে সংগ্রহ করতে পারতেন, তাদের নিয়েই 'স্বদেশীর' প্রভাতফেরী বের করতেন এবং বিডন স্কোয়ার ও কলেজ স্কোয়ারে সভাও করতেন মাঝে-মাঝে। এইসব প্রভাতফেরী ও সভাগুলিতে কেশবরাও ও তাঁর বন্ধুরাও যেতেন। তিনি সেই সভাগুলির ব্যবস্থাও করতেন এবং কখনো বা ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে বক্তৃতাও করতেন। কিছু দিন, 'দেশের জন্য পাগল' এই বৃদ্ধ মৌলবী 'কুবের বস্ত্র ভাণ্ডার' নামে স্বদেশী বস্ত্রর একটি দোকানও চালিয়েছিলেন। সাদা রঙের টুপি, পাজামা ও শেরওয়ানী ছিল তাঁর সাদাসিধে পোশাক। কিছু দিন শহরে আর কিছুদিন কারাগারে তাঁর নিবাস চলত। তিনি একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে কেশবরাও তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেন। ডাঃ যাদবরাও আগে এই মৌলবী সম্বন্ধে নিজের স্মৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য কথা বলেন যে স্বদেশী ব্রত পালন করার সময়ে মৌলবী তুর্কী টুপি পরিত্যাগ করে তাঁর শোভাযাত্রায় গৈরিক পতাকা নিয়ে অংশগ্রহণ শুরু করেন।

একবার মৌলবী লিয়াকৎ হুসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় জনৈক বক্তা লোকমান্য তিলক সম্বন্ধে কিছু অনভিপ্রেত শব্দ প্রয়োগ করে। সে কথা শোনামাত্র কেশবরাও ক্রোধে মুখ লাল করে উঠে দাঁড়ান এবং ঐ জনাকীর্ণ সভার মধ্যে উক্ত বক্তার মুখে প্রচণ্ড চড় মারেন। ডাঃ ঘোষের স্মৃতিচারণ থেকে এই ঘটনার কথা জানা যায়। মৌলবীর প্রভাত ফেরীর দুই-একটি প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করাও উপযুক্ত হবে। একবার কেশবরাও পতাকা নিয়ে সবার সামনের দিকে হাঁটছিলেন, এমন সময় এক ইংরেজ অফিসার কাছে এসে মারাঠীতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। এই ঘটনায় তিনি বেশ আশ্চর্যান্বিত হলেন। সে কেমন করে জানল যে তিনি মারাঠী ভাষী। চিন্তা করার পরে বুঝলেন যে মাথায় বৃহদাকার শিখা দেখেই সে চিনেছে নিশ্চয়ই, কারণ মহারাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যযুক্ত এই চিহ্নটি তাঁর ছিল। বলা বাহুল্য যে এই ঘটনার পর তিনি শিখার বিস্তার হ্রাস করে ফেলেছিলেন।

কলকাতায় এই সব গতিবিধির কারণে কেশবরাও-এর পড়াশুনার প্রতি মনোযোগ কিছুটা কমে গিয়েছিল। অতএব, একবার ছুটিতে নাগপুরে এলে ডাঃ চোলকর, যিনি তাঁর প্রতি গভীর ভালবাসার দরুন তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন, তিনি তাঁর অসন্তোষ ব্যক্ত করেছিলেন। একথা সত্য যে অন্য ছাত্রদের মত নিজের ঘরকেই সংসার মনে করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাঠ্যপুস্তকের উপর মাথা ঠুকতে থাকার অভ্যাস তাঁর ছিল না। কিন্তু ক্লাসের পড়াশুনায় সর্বদাই তাঁর মনোযোগ থাকত, সেই কারণে পরীক্ষার কিছু দিন আগে কিছুটা পাঠাভ্যাস করে তিনি ভাল নম্বর অর্জন করতেন। তার প্রমাণপত্র থেকে জানা যায় যে ১৯১২ সালের পরীক্ষায় রসায়ন-শাস্ত্রে তিনি বাহাত্তর শতাংশ এবং শারীরিক শাস্ত্রে পঁয়ষট্টী শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন। এতদিকে দৌড় ঝাঁপ করা সত্ত্বেও এত নম্বর পেতেন, সেটা তাঁর অপূর্ব স্মরণ-শক্তিরই যাদু ছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হতেই ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে ডাক্তারদের নিযুক্তি আরম্ভ হয়ে গেল। একবার যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা গেলে পরে তা কাজে লাগবে কল্পনা করে কেশবরাও, নীঃ সঃ মোহরীর ইত্যাদি বন্ধুরা ডাঃ সুহ্রাবর্দীর সঙ্গে দেখা করে

নিজেদের নামও সেনাবাহিনীতে ভর্তির জন্য লিখিয়ে আসেন। কিন্তু এই তরুণদের নাম বিপ্লবীদের কালো তালিকায় (Black list) থাকার দরুন তাঁরা সে সুযোগ পাননি।

কলকাতায় নিবাসকালে কেশবরাও-এর মন বাস্তবিক অর্থে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গ্রহণের প্রতি সংলগ্ন ছিল। নিজের এবং খুব বেশী হলে পরিবারের চিন্তা করার মত অসংখ্য মানুষ পৃথিবীতে আছে। কিন্তু সমাজের চিন্তা করা, তার সঙ্গে এতখানি একাত্ম হয়ে থাকা যে নিজের সর্বস্বেরও সম্পূর্ণ বিস্মরণ হয়ে যায় এবং নিজ জীবন ও হৃদয়কে তারই জন্য উন্নত করে তোলার মানুষ খুব অল্পই দেখা যায়। এইরূপ দুর্লভ মনঃস্থিতি গঠনের কাজ সেই সময়ে কেশবরাও করছিলেন। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ছাত্ররা অন্য প্রান্তের বিষয়ে কী রূপ পূর্ব ধারণা নিয়ে চলে তার তিনি পরীক্ষা করে চলছিলেন এবং আমাদের সমাজে আগত উৎসাহের জোয়ার যে কত ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী হয় তার উপলব্ধি তিনি করছিলেন। 'বাংলার দৃষ্টিতে স্বরাজ্য কেবল একটি দিনের প্রশ্ন' — এই ধরণের বক্তৃতার প্রবাহে ভেসে যাওয়া বক্তাদের কথা যখন তিনি শ্রবণ করতেন তখন তাঁর মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হত যে, "এই একটি দিনেই যে স্বরাজ্য আসবে, আজকের অসঙ্ঘবদ্ধ সমাজের যা অবস্থা, তাতে সম্ভবতঃ একই দিনে তা অস্তমিতও হয়ে যাবে।" বিপ্লবী কার্যকলাপের আভ্যন্তরীণ প্রবাহেরও তিনি অবলোকন করেছিলেন এবং দেশের সম্মুখে সেই সময়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলির সমাধানের দিক থেকে সমাজের মনঃস্থিতি ও সংগঠন কীরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও চিন্তা-ভাবনা ও যুক্তি নিয়ে তাঁর হৃদয় মথিত হচ্ছিল। কিন্তু এই সব থেকেও বেশী — অন্য সকলকে দেশভক্তির শিক্ষা দেবার আগে স্বয়ং নিজের শরীর ও মনকে বজ্রের সমান কঠোর করে তুলে অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতা তথা সমাজের বৈভবের জন্য প্রয়াস করে চলার শুভ সংকল্প তাঁর মনে দৃঢ়তর হয়ে উঠছিল। চোখ-কান খোলা রেখে তিনি যাদের সংস্পর্শে আসছিলেন, সেই সকল ব্যক্তি ও ঘটনাসমূহের অভ্যন্তর পর্যন্ত নিরীক্ষণ করা এবং তার মধ্য থেকে মৌমাছির মত যেটুকু ভাল সেটুকুকে গ্রহণ করে নিজ জীবনে তার সদ্ব্যবহার করার প্রবৃত্তির মাধ্যমে সেগুলির গুণসমূহের সঞ্চয়ে তাঁর জীবন সেই সময়ে সাধনারত ছিল। লোকমান্য তিলকের ছয় বছর কারাদণ্ড হওয়ার দিন থেকেই তপস্বী বালাসাহেব পরাঞ্জপে নিজের কোটের উপর কালো পটি বেঁধে ঘুরতে শুরু করেছিলেন। এবং লোকমান্যের সঙ্গে মান্দালয়ের জেলে সাক্ষাৎ করে অমরাবতীর ধনী দেশপ্রেমিক দাদাসাহেব খাপর্ডে দেশে ফিরেছিলেন। এঁরা কলকাতায় এলে কেশবরাও তাঁদের নিজ নিবাস স্থানে আমন্ত্রিত করে তাঁদের সব রকম ব্যবস্থা করতেন এবং বর্তমান সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসুকতার সঙ্গে তাঁদের বক্তব্য শুনতেন। আন্দামানের অন্ধকার কাল-কুঠুরিতে বসে যে রক্তাশ্রুতে লেখা স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরের পত্র যখন ডাঃ নারায়ণরাও সাভারকরের কাছ থেকে নিয়ে তিনি পড়ার সুযোগ পেতেন তখন যেন তার পরিপূর্ণতায় তন্ময় হয়ে যেতেন। সেই পত্র পাঠ করার সময়ে মনে-মনে তিনি আন্দামানে পৌঁছে যেতেন এবং সেখানে সর্বপ্রকার যাতনা হাসিমুখে সহনকারী সেই রাষ্ট্রভক্তের ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে ভক্তিভরে একাত্ম হয়ে উঠতেন।

এইভাবে চোখ খোলা রেখে আচরণ করার সময়ে কর্তব্য বলে যাকে স্বীকার করে নিতেন তার জন্য যে কোন প্রকার কষ্ট সহ্য করতে তিনি কখনো ইতস্তত করেননি। দিন হোক বা রাত, কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিতে তিনি কখনই কাতর হতেন না। একদিন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী খুব ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে মহারাষ্ট্র নিবাসে এলেন এবং কয়েকজন মহারাষ্ট্রীয় তরুণকে বেছে নিয়ে একান্তে ডেকে এনে রাত্রেই কলকাতার সন্নিকটে এক গ্রামে যাওয়ার কথা বললেন। রত্নগিরির এক তরুণ বিপ্লবী বিদেশ থেকে বোমা তৈরীর বিদ্যা শিখে এসে সেখানে অজ্ঞাতবাস করছিল। সেখানেই সে খুব সতর্কতার সঙ্গে বিপ্লবীদের বোমা তৈরী করতে শেখাত। সেই অজ্ঞাতবাসে থাকার সময়ে সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল। বন্ধুদের সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসাতেও কাজ হল না এবং সে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। সে তার শেষ ইচ্ছা ব্যক্ত করে বলেছিল যে আমার অন্তিম সংস্কার যেন ব্রাহ্মণদের দ্বারা করা হয়। তার ইচ্ছা পূরণের জন্য শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এই তরুণদের সেই গ্রামে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সংকেত অনুসারে আট-দশ জন ছাত্র রাত্রে সেখানে পৌঁছলেন। তাঁদের মধ্যে শ্রী রামকৃষ্ণঃ সদাশিব পিম্পুটকর, কেশবরাও ইত্যাদি ছিলেন।

তাঁরা গ্রামের এক অন্ধকার ঘর থেকে ঐ তরুণের মৃতদেহ চুপি-চুপি দূরে নিয়ে গেলেন। অত্যন্ত শোকাকুল মন নিয়ে কলকাতা থেকে আগত এই তরুণরা চিতা তৈরী করল। আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছিল। দাহ-সংস্কার শুরু করার প্রাক্-মুহূর্তে শ্যামসুন্দর একটি পুঁথি হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন এবং একজনকে প্রদীপ দেখাবার জন্য সংকেত করে বললেন, "মাতৃভূমির সেবায় আত্মোৎসর্গকারী এই দেশভক্তকে মহাগ্নি (মন্ত্রবিহীন চিতা) দেওয়া যেতে পারে না।" তাঁর কথা শুনে উপস্থিত সকলের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তখন নিজের একটি ভাঙ্গা ও সুতোয় বাঁধা চশমা কানের সঙ্গে জড়িয়ে শ্যামসুন্দর পুঁথি খুলে অন্তিম সংস্কারের মন্ত্র পাঠ শুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা ধু-ধু করে জ্বলে উঠল এবং এক অজ্ঞাত তরুণ দেশভক্ত অজ্ঞাতরূপে অজ্ঞাতের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল।

উপরে কালো মেঘ আরো ঘন হয়ে উঠেছিল। দিব্যত্বের প্রতীতি দানকারী ঐ তরুণের আবেগপূর্ণ বন্দনা করে অন্য সকলেও অশ্রুধারার তিলাঞ্জলি অর্পণ করলেন।

৫. জীবনের দিশা

কলা ও জীবনের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কেউ এ পর্যন্ত কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি। পরেও পাওয়া যাবে কি না বলা মুশকিল। বাংলাতেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীবনের মধ্যে এইরকম দ্বন্দ্ব চলতে দেখা যায়।

সম্পূর্ণ বাংলা প্রান্ত পুরোপুরি সমতল এবং নদী-নালায় পরিপূর্ণ। ভূমির এই সমতল গঠন অন্যদের কাছে নীরস মনে হতে পারে, কিন্তু কবি-হৃদয়কে তা অবশ্যই মুগ্ধ করে। সমতল প্রকৃতিকে দোষ মনে করে যারা নাসিকা কুঞ্চন করে সেই অরসিকদের নিকট কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রশ্ন করেন — "কোথায় আছে এমন দেশ যাকে অপলক নেত্রে দেখা যায় এবং যা হৃদয়ে স্থায়ীভাবে স্থান করে নেয়?" তিনি আরো বলেছেন--"অনেকে বাংলা সমতল প্রদেশ হবার কারণে তার প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মনোভাব নিয়ে দৃষ্টিপাত করে, কিন্তু তার এই রূপই তার সৃষ্টি-সৌন্দর্যের অধিক অভিব্যক্তি বলে প্রতীত হয়। গোধুলির সুবর্ণপট যখন সম্পূর্ণ গগনমণ্ডলে অবাধে বিস্তৃত হয়, তখন উন্মুক্ত আকাশ যেন রসে পরিপূর্ণ এক মধুভাণ্ড বলে প্রতীত হয়।"

কিন্তু কবি-হৃদয়কে আনন্দদানকারী বাংলার এই ভূমির বৈশিষ্ট্যের কারণেই বিগত সহস্রাধিক বর্ষ যাবৎ লক্ষ-লক্ষ মানুষ প্রতি বছর অখণ্ড রূপে বন্যা কবলিত হয় ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকে। বাংলায় বন্যা এক চিরন্তন অভিশাপ। প্রান্তের উত্তরে মুষলাধার বর্ষণের ফলে নদীগুলিতে এমন প্রবল বেগে জল প্লাবিত হয় যে কুড়ি-পঁচিশ মাইল পর্যন্ত দূরের গ্রামগুলি দ্বীপের রূপ গ্রহণ করে। এই গ্রামগুলির মধ্যে যোগাযোগের জন্য ছোট-ছোট ভেলা ও নৌকার ব্যবহার করতে হয়। চতুর্দিকের ধানের ক্ষেত এক মানুষ জলের মধ্যে ডুবে যায় এবং বিবিধ বর্ণের পদ্মফুল শোভিত পুষ্করিণী ও সরোবর তাদের পৃথক অস্তিত্ব সেইভাবেই বিস্মৃত হয় যেমন নিরহংকারী ব্যক্তি সমষ্টির মধ্যে বিলীন হয়ে নিজেকে ভুলে যায়। প্রৌঢ় ব্যক্তিদের পোশাক পরিধান করে তাঁদের অনুকরণকারী শিশুদের মত বন্যাগ্রস্ত এলাকাগুলি সমুদ্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে।

বাংলার দামোদর নদে বছরে অন্ততঃ একবার এই বন্যার তাণ্ডব অবশ্যই দেখা যায়। সেই সময়ে বিশেষতঃ তার পশ্চিম তীরের বর্ধমান জেলার মানুষেরা ভীষণ সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ১৯১৩ সালে দামোদরের বন্যা ছিল অতিশয় ভয়ংকর। তার বর্ণনা শুনে কলকাতার অনেক সর্বজনীন সংস্থা তৎক্ষণাৎ অর্থ সংগ্রহ করে বন্যা-কবলিত জনসাধারণের সাহায্যের ব্যবস্থা করল। সমাজের সংকটকে নিজের সংকট মনে করে ঐ কার্যে কেশবরাও নিজেকেও সম্মিলিত করেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে সহায়তাকার্যে অংশগ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। তাঁর দলে ছয় জন ছিলেন। তাঁর সঙ্গে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম যাঁরা করেন, তাঁদের

মধ্যে মাদ্রাজের দেশভক্ত শ্রী কেঃ এসঃ বেঙ্কটরমণের দৈনন্দিনী থেকে প্রাপ্ত নামের তালিকায় সর্বশ্রী নলিনী, গোখলে, দেশপাণ্ডে, আরঃ এসঃ সুর্বে, বেঙ্কটরমণ ও কেশবরাও — এই ছয়জনের নাম পাওয়া যায় যাঁরা একটি দলে কাজ করেছিলেন। এই প্রকার আরো কয়েকটি দল সেখানে কর্মরত ছিল।

উক্ত অঞ্চলে যাওয়ার জন্য যতদূর সম্ভব নৌকায় অন্যথায় কোমর পর্যন্ত জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চিঁড়ে মুড়ির বস্তা বন্যাপ্লাবিত এলাকায় পৌঁছে দিতে হত। পিঠের উপর বস্তা নিয়ে কাদার মধ্যে পা ডুবিয়ে গ্রামে-গ্রামে পৌঁছতে হত। সে সব গ্রাম চতুর্দিক থেকে জলমগ্ন থাকায় গ্রামের লোকেরা শিশু সন্তান ও পরিবার নিয়ে মাচার উপরে সাহায্য পাবার আশায় বসে থাকত। তাঁরা সেখানে পৌঁছলে তারা অত্যন্ত আনন্দিত ও আশ্বস্ত হত। বুঝি ভগবানই তাদের সাহায্যের জন্য এসে পৌঁছেছেন। বস্তা পিঠে নিয়ে জল-কাদা ভেঙ্গে যাবার সময়ে মাঝে মাঝে পাশ দিয়ে সাপ এঁকে-বেঁকে চলে যেত। আবার কখনো চিল বা শকুন এক ঝাপ্টায় নিজের শিকার নিয়ে উড়ে চলে যেত। ১১, ১২, ১৩ আগষ্ট তিন দিনই ক্রমাগত কেশবরাও ও বেঙ্কটরমণ অবিরাম ঐ সেবাকার্যে সংলগ্ন ছিলেন। বেঙ্কটরমণ তাঁর দৈনন্দিনীতে লেখেন— "ডাক্তার আক্ষরিক অর্থে রাতদিন অত্যন্ত পরিশ্রম ও উৎসাহের সহিত কাজ করেছেন। তাঁর কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে অতুলনীয় ছিল।"

প্রবাদ আছে যে বিপদ কখনো একলা আসেনা। বন্যার সঙ্গে-সঙ্গে কলেরা মহামারীর প্রকোপও শুরু হয়ে গেল। এখন তাঁর ঔষধ বিতরণের জন্য রাত্রি একটা পর্যন্ত কাজ করতে হত। পরের দুঃখ কষ্ট নিবারণের সময়ে প্রকৃত সেবক কেমন করে নিজের কষ্টের কথা একেবারে ভুলে যায়, তার মূর্তিমান দৃষ্টান্ত সেই সময়ে সেবাকার্যে সংলগ্ন কেশবরাও-এর আচরণে প্রত্যক্ষ করা যেত।

কলকাতায় ছয় বছর ব্যাপী অবস্থানকালে কেশবরাও আর একবার বন্যা পীড়িতদের সেবা করতে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে ডাঃ নাঃ দাঃ সাভারকর, ডাঃ যাদবরাও অণে এবং ডাঃ তেণ্ডুলকর প্রমুখও ছিলেন। কলকাতা থেকে ষাট মাইল দূরে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে প্রতি বছর মকর সংক্রান্তির সময়ে বিরাট মেলা হয়। সে বার মেলার সময়ে বিরাট আকারে কলেরার প্রকোপ দেখা দেয়। সেই সময়ে প্রতিটি ঝুপড়িতে ঘুরে-ঘুরে রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা ও ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা কলকাতা থেকে আগত কেশবরাও-এর দলটি করেছিল এবং তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই কাজও তিনি অত্যন্ত তন্ময়তা ও অবিশ্রান্ত ভাবে করেছিলেন। এইরূপ বিবিধ প্রসঙ্গ উপলক্ষে কেশবরাও-এর বাংলার গ্রামীণ জনসাধারণের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও রোগ কিভাবে সেখানকার মানুষদের নিঃস্ব ও করুণ করে তোলে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেন। এই অবস্থা দেখে তাঁর হৃদয় দুঃখ ও সহানুভূতিতে অত্যধিক কাতর হয়ে উঠত। সেই সময়ে তিনি নিজের সম্পূর্ণ জীবন ভারতের দৈন্য ও দুঃখ দূর করার জন্যই সমর্পণ করার দৃঢ়তর সংকল্প গ্রহণ করেন।

কলকাতায় প্রথম বছরে কেশবরাও-এর থাকা খাওয়া 'শান্তিনিকেতনেই' চলত। পরবর্তী চার-পাঁচ বছর থাকার ঠিকানা একই থাকলেও তিনি 'জগন্মিত্র ভোজন'-এর জন্য দিন নিশ্চিত

করে অন্য ছাত্রাবাসে যেতেন। মাঝে-মাঝে তাঁকে ঢাবাতেও ভোজন করতে হত। ভোজন-ব্যবস্থার এই পরিবর্তন আর্থিক অবস্থা অনুসারে হত। তখন সস্তা-গণ্ডার দিন ছিল। সুতরাং মাত্র পঁচিশ টাকায় কলকাতায় বেশ আরামেই দিন কাটানো যেত। টাকায় আট সের দুধ এবং দুই-তিন পয়সায় এক ডজন কলা পাওয়া যেত। নাগপুরের মত এখানেও ব্যায়াম করার অভ্যাস কেশবরাও কায়েম রেখেছিলেন। তার জন্য প্রয়োজনীয় দুধও যোগাড় করতে অসুবিধা হতনা। কেশবরাও-এর বুকের পাটা বেশ বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এবং তাঁর কব্জি ও বাহু যুগলও বেশ শক্ত-পোক্ত হয়ে উঠেছিল। একবারে তিনি কুড়ি-পঁচিশ খানা রুটি সহজেই খেয়ে নিতেন, আর কখনো প্রতিযোগিতা শুরু হলে ঐ সংখ্যা অনেক বেড়ে যেত।

একবার অধ্যাপক মহাশয়ের ক্লাসে আসতে দেরী হওয়ায় সব ছাত্ররাই তারুণ্য বৃত্তির কারণে পরস্পর হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজবে মেতে উঠেছিল। হাস্য-পরিহাসের মধ্যেই কেশবরাও-এর বন্ধু হাওড়া বাবু অর্থাৎ ডাঃ অমূল্য রতন ঘোষ প্রস্তাব করলেন যে বাহুতে ঘুঁসি মেরে দেখা যাক যে কে হারে আর কে জেতে। হাওড়া বাবু ঘুসি খাবার জন্য জামার আস্তিন গোটাতে শুরু করতেই কেশবরাও বললেন, "তুই আগে আমাকে হারিয়ে দেখা।" তৎক্ষণাৎ কেশবরাও-এর বাহুতে জোরে ঘুসি পড়তে শুরু হল। সমস্ত ক্লাসের ছাত্ররা দুজনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে উৎসুকতার সাথে ফলাফল দেখতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে মুষ্টি প্রহার চলল কিন্তু কেশবরাও-এর মুখে কষ্টের চিহ্ন মাত্র দেখা গেল না। তাঁর কষ্ট সহিষ্ণুতা দেখে সব ছাত্ররাই বিস্মিত হল। অবশেষে ঘুসি মারতে মারতে হাওড়া বাবুর নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হল এবং একেবারে ক্লান্ত হয়ে তিনি বসে পড়লেন। এই ঘটনার উল্লেখ করে ইংরাজী 'মডার্ন রিভিউ'-এর একটি সংখ্যায় ডাঃ অমূল্য রতন ঘোষ লেখেন, "হেডগেওয়ার এক ইঞ্চিও পিছনে সরে যাননি। আমি তাঁকে হারাতে গিয়ে নিজেই হেরে গেলাম।"

১৯০৬ সালে লোকমান্য তিলকের কলকাতা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সর্বজনীন রূপে গণেশোৎসবেরও সূচনা হল। রাষ্ট্রীয় জাগৃতির এই কার্যক্রমকে বিভিন্ন ছাত্রনিবাসে পৌঁছে দেওয়ার কাজ কেশবরাও করেন। তিনি সেইসব ছাত্রাবাসে গণপতির প্রতিষ্ঠা করিয়ে সেখানে ছাত্রদের ও বিভিন্ন নেতাদের বক্তৃতার ব্যবস্থা করতেন। এই উৎসবগুলিতে মহারাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে মঙ্গলারতির পর মন্ত্র-পুষ্পাঞ্জলির সময়ে এমন উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করা হত যেন আকাশকেই কাঁপিয়ে দেবার চেষ্টা বলে মনে হত। সেই সময়ে 'সাম্রাজ্যং', 'বৈরাজ্যং' শব্দগুলি শুনে পুলিশের লোকেদের মনে কেমন সন্দেহ হল এবং ছাত্রদের থানাতেও ডাকা হল।

শ্রীকেশবরাও পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পরেও কিছু দিন কলকাতায় ছিলেন। সেই সময়ে নাগপুরের শ্রী নানাসাহেব তেলংও ঐ কলেজে ভর্তি হবার জন্য গিয়েছিলেন। ডাক্তারজী এক মাদ্রাজী হোটেল থেকে টিফিন কেরিয়ারে খাবার আনাতেন। তার মধ্যে কুড়ি খানা রুটি এবং সেই অনুপাতে অন্যান্য জিনিষ থাকত। একবার ডাক্তারজী সেইখানে উপস্থিত থাকার সময়ে একজন লোক হোটেলের ম্যানেজারের কাছে অভিযোগ করল যে "আমি যা পয়সা দিই সেই একই দাম দিলেও ওঁকে এত বেশী করে ভাত-রুটি ও তরকারী কেন দেন?" শুনে ম্যানেজার বললেন, "ডাঃ হেডগেওয়ারকে যে পরিমাণে খাবার দিই কিছু দিন আপনিও এই পরিমাণে

এক সঙ্গে খেয়ে দেখান, তাহলে আপনাকেও সেই পরিমাণে খাবার পাঠাব। ডাঃ হেডগেওয়ারকেও আগে আমি অল্প পরিমাণে খাবার পাঠাতাম। কিন্তু তিনি বললেন যে তাতে তাঁর পেট ভরে না। আমি তাঁকে দুই-তিন দিন এখানে বসে খেতে বললাম, আর যখন দেখলাম যে তাঁর বাস্তবিকই ঐ পরিমাণ খাবারের প্রয়োজন, তখন সেইমত খাবার পাঠাতে শুরু করলাম।" এই কথা শুনে ঐ ভদ্রলোকের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তেলং বলেন যে কোন কোন দিন তাঁর একলার খাবারে তিন-তিন জন লোকের পেটভরা ভোজন হয়ে যেত।

ডাঃ হেডগেওয়ার চলে যাবার পরেও তেলং তাঁর নামে ঐ প্রকার ভর্তি টিফিন কেরিয়ারে খাবার আনাতেন এবং একজনের জায়গায় তিন-তিন জন সেই খাবার খেতেন। কিন্তু মাস শেষ হবার পর তিনি হোটেলে পয়সা পাঠালেন না। হোটেলের ম্যানেজারের সন্দেহ হল, কারণ ডাঃ হেডগেওয়ার নির্দিষ্ট দিনে অবশ্যই দাম পাঠিয়ে দিতেন। একদিনও দেরী হতনা। ডাঃ হেডগেওয়ার থাকলে পয়সা দেবার নির্দিষ্ট তারিখ পেরিয়ে যাবে, তা হতেই পারেনা। এরকম তাঁর পুরো বিশ্বাস ছিল। তিনি অনুমান করলেন যে সম্ভবতঃ ডাক্তার কলকাতার বাইরে গেছেন। একদিন তিনি নিজেই ছাত্রাবাসে ডাক্তারের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলেন যে তাঁর অনুমানই ঠিক। ব্যস্, পরের দিন থেকে সাধারণ পরিমাণে অর্থাৎ কম ভোজন পাঠান শুরু হল।

বছরে দু বার কেশবরাও ছুটিতে নাগপুর আসতেন। পথে কিছুদিন তিনি রামপায়লীতে কাকার বাড়ীতে থেকে যেতেন। সেখানে যেতে হলে তিরোডা স্টেশনে নেমে রাত্রে একাই হেঁটে দশ-পনের মাইল যেতে হত। নাগপুরে এলে তিনি ডাঃ মুঞ্জের অথবা শ্রী তাত্যাজী ফডনবীসের বাড়ীতে থাকতেন। ছুটির কয়েক দিন তিনি তাঁর সহপাঠী শ্রী যাদবরাও অণের বাড়ীতে যবতমালেও অতিবাহিত করতেন। এইভাবে তাঁর বিপ্লবী বন্ধু শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ পাণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে ওয়ার্ধাতেও যেতেন।

একবার ছুটিতে তিনি যবতমাল গিয়েছিলেন। একদিন কেশবরাও, গোবিন্দরাও আবদে ও যাদবরাও অণে তিনজনেই সিভিল লাইসের রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। তাঁদের সামনে ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে আসতে দেখা গেল। তার সঙ্গে সরকারী ডাক্তার ও অন্য এক অফিসারও ছিল। সেই সময়ে সাধারণ মানুষের উপর ইংরেজ অফিসারদের প্রতি এক ভীতিযুক্ত সম্ভ্রমের মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল এবং নিজেদের প্রভুত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি সম্মান আদায়ের জন্য তাদের উদ্দণ্ড বৃত্তির সঙ্গেও মানুষের নিত্য পরিচয় ঘটত। যখন তাদের সামনে দিয়ে আসতে দেখা যেত তাহলে অন্যান্য লোকদের নিজ স্থানেই দাঁড়িয়ে পড়তে হত এবং তারা সামনে দিয়ে চলে যাবার সময়ে নম্রতা দেখিয়ে তাদের স্যাল্যুট করার রীতি প্রচলিত হয়েছিল। ডাক্তার কেশবরাও সেখানে নতুন এসেছিলেন, তাই তাঁর বন্ধুরা তাঁকে এক পাশে সরে দাঁড়াতে ও সায়েবরা সামনে দিয়ে গেলে তাদের স্যাল্যুট করতে বলে দিলেন। কিন্তু ঐ মদোন্মত্তদের সম্মুখে নত হবার মানুষ কেশবরাও ছিলেন না এবং এই ধরনের অবান্তর নিয়ম মানারও তিনি প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনি বললেন, "এটা সর্বজনীন রাস্তা, অতএব আমি যেমন চলছি ঐভাবেই সোজা চলতে থাকব।" ইতিমধ্যে ঐ

ত্রিমূর্তি কেশবরাও-এর সামনে এসে পৌঁছল। কেশবরাও-এর কাছ থেকে প্রত্যাশিত স্যাল্যুট পাওয়া দূরস্থান, তাঁর এক পাশে সরে দাঁড়ানোর কোন ভাব-গতিক না দেখে ওরা তিনজনেই একটু পাশ কাটিয়ে চলে গেল। কিন্তু এই অপমানের আঘাত তারা সহ্য করতে পারেনি। সাপের লেজ মাড়িয়ে দিলে যেমন সাপ পাল্‌টি খায়, সেই রকম দশ পা এগিয়ে তারা ফিরে এল এবং কেশবরাওকে থামিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্নের কেশবরাও শান্তভাবে উত্তর দিলেন। শেষে "স্যাল্যুট করার শিষ্টাচার জাননা?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "এই রকম প্রশ্ন করাই অশিষ্টতা" এই মনোভাব ব্যক্ত করে কেশবরাও বলেন, "এখানকার শিষ্টাচারের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? আমি তো রাজধানীর নাগরিক এবং সেখানে এরকম কোন প্রথা শিষ্টাচার বলে গণ্য হয়না। বিনা পরিচয়ে কাউকে নমস্কার করা কোন্ দেশের শিষ্টাচার?" নির্ভীকতার সহিত এই কথাগুলি বলার সময়ে কেশবরাও-এর দুই হাত তাঁর কোটের পকেটে ছিল। তখন সরকারী ডাক্তার পেড্রো কেশবরাওকে একটু বোঝাবার জন্য বলল যে তিনি যেন কোটের পকেট থেকে হাত বের করে নেন এবং পরামর্শ দিল যে শিষ্টাচার মনে না হলেও আর যাতে বিবাদ না বাড়ে তার জন্য এখন অন্ততঃ স্যাল্যুট করা উচিত। কেশবরাও মুচ্‌কি হেসে বললেন, "এই পরামর্শের জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ" এবং মুখ ঘুরিয়ে এগিয়ে গেলেন। এই ঘটনার পর সেখানে সরকারী মহলে কিছু দিন বেশ উত্তেজনা দেখা গেল। নাগপুরে ফিরে এসে ডাঃ মুঞ্জেকে যখন এই ঘটনার কথা জানালেন, তখন তিনি "খুব ভালো করেছ" বলে তাঁর পিঠ চাপড়ে দিলেন।

১৯১৪ সালের জুন মাসে 'এল এম অ্যাণ্ড এস'-এর পরীক্ষার আগে তিনি কয়েকদিনের জন্য নাগপুরে এসেছিলেন। সেই সময়েই মান্দালয় জেল থেকে ১৭ জুন লোকমান্য তিলকের মুক্তিলাভের সংবাদ জানা গেল। এই সংবাদ নাগপুরে পাওয়া গেল ১৮ই জুন। প্রায় ষাট বছর বয়সে লোকমান্য তিলকের মত অগ্রণী নেতা মান্দালয়ের অস্বাস্থ্যকর কারাগারে ছয় বছরের নির্বাসন দণ্ড ভোগ করে ফিরে আসছেন জেনে সারা দেশে এক আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। ১৮ তারিখে আনন্দোৎসব উদ্‌যাপনের জন্য কেশবরাও ডাঃ মুঞ্জের গৃহে দীপমালা সজ্জিত করার ব্যবস্থা করেন। ডাঃ পরাশরের স্মৃতি-কথন থেকে জানা যায় যে লোকমান্যের দণ্ডাজ্ঞা হওয়ার দিন থেকেই কেশবরাও তাঁর মুক্তির দিন পর্যন্ত বরাবর একাদশী ব্রত পালন করতেন এবং তাঁর দেখাদেখি পাঞ্জাবী ছাত্রাবাসের বেশ কয়েকজন ছাত্রও ব্রত পালন করতে থাকে। লোকমান্যের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা যদি তাঁর মুক্তিলাভের সংবাদে অসংখ্য দীপমালিকা রূপে প্রোজ্জ্বল হয়ে ব্যক্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাতে আশ্চর্যের কী আছে?

এই আনন্দ নিয়েই তিনি কলকাতায় গেলেন এবং শেষ পরীক্ষায় বসেন। পরীক্ষার পরিণাম অনুকূল হল এবং কেশবরাও এলঃ এমঃ অ্যাণ্ড এসঃ ডিগ্রী নিয়ে ডাক্তার হয়ে গেলেন। ১৯১৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হল। তার পরে এক বছরের জন্য নিয়মানুসারে হাসপাতালে তিনি অভিজ্ঞ ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে রোগ-নির্ণয়, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবহারিক শিক্ষা লাভের জন্য রইলেন। ১৯১৫ সালের ৯ই জুলাই তাঁর

এই শিক্ষাক্রম সম্পূর্ণ হল এবং ডিগ্রী লাভের পর প্রত্যক্ষ প্রায়োগিক অভ্যাসক্রম পূর্ণ করার প্রমাণ পত্রও লাভ করলেন।

এই প্রমাণপত্র লাভের পর তিনি ব্যাংককের প্রখ্যাত ডাক্তার কে এস আইয়ারের নিকট চাকুরীর জন্য আবেদন পত্র পাঠান। সেখানে তিনশত টাকা মাসিক বেতন এবং বিখ্যাত শল্য চিকিৎসকের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা দুইই লাভ হত। কিন্তু তিনি এই আবেদন পত্র নিজ ইচ্ছায় পাঠাননি, বরং উপাচার্য ডাঃ মল্লিকের বিশেষ অনুরোধে পাঠিয়েছিলেন। আবেদন প্রেরণ করার সময়ে তিনি বলেছিলেন, "সত্যি বলতে আমার এই প্রকার কোন চাকুরী অথবা ব্যবসা করার ইচ্ছা নেই।" সংযোগবশতঃ ২৯শে জুলাই আবেদনের উত্তর এসে গেল যে ঐ পদ ইতিপূর্বেই পূর্ণ হয়ে গেছে। সে কথা জেনে ডাক্তার কেশবরাও অত্যন্ত স্বস্তিলাভ করলেন, কারণ এর ফলে ডাঃ মল্লিকের কথাও মান্য করা হল এবং তাঁর মনের বাসনাও পূর্ণ হল।

এই ধরনের জাতীয় বিদ্যালয়গুলি থেকে উপাধি লাভ করে যাঁরা বেরোতেন তাঁদের অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করে এই সমস্ত জন-স্বীকৃত উপাধিধারীদের সরকারী স্বীকৃতি না দিয়ে তাঁদের অপদস্থ করার সরকারী প্রয়াস অব্যাহত ছিল। এই উদ্দেশ্যে স্যার পাড্রে লুকিস কেন্দ্রীয় বিধানসভায় এ বিষয়ে একটি বিধেয়কও উপস্থাপন করেছিলেন। তাতে এই ধরনের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ব্যবসায়ের অধিকার দেওয়া হলেও শর্ত ছিল যে তাঁরা রোগীদের যে প্রমাণপত্র দেবেন তা সরকারের স্বীকৃতি পাবেনা। সরকারকে উপেক্ষা করেও জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সংস্থাগুলি চলে ও অগ্রগতি করে সেগুলিকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই এই ধরনের বাধাদানকারী ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সরকারের এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে ডাক্তার হেডগেওয়ার নতুন ও প্রাক্তন সকল উপাধিধারীদের সহযোগিতায় এক আন্দোলন সংবাদপত্রগুলিতে আরম্ভ করলেন।

বিভিন্ন প্রান্তের সংবাদপত্রগুলিতে 'বোগাস মেডিকেল ডিগ্রীজ বিল'-এর বিরুদ্ধে কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভাগুলির সংবাদ প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে এবং সরকার কর্তৃক এই সব জাতীয় সংস্থাগুলিকে উচ্ছেদ করার দুষ্ট চক্রান্তের ব্যাপক সমালোচনামূলক সম্পাদকীয় প্রবন্ধও সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হতে থাকে। বস্তুতঃপক্ষে এ ধরনের কোন সভাই প্রত্যক্ষরূপে অনুষ্ঠিত হতনা, তথাপি এই সব অননুষ্ঠিত সভাগুলির কল্পিত প্রতিবেদন ও বক্তৃতার সংবাদ যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত তখন সরকারী আফিসাররা এইগুলি পাঠ করে তাদের মনে প্রশ্ন উঠত যে এই সভাগুলির খবর গোয়েন্দারা পায়না কেন?

এই আন্দোলন শুরু করার আগে ডাক্তার হেডগেওয়ার স্যার আশুতোষ মুখার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তখন স্যার আশুতোষ তাঁর এই আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে "আন্দোলনের সংবাদ যেন সংবাদপত্রে খুব ভালোভাবে প্রচারিত হয়।" ডাক্তার হেডগেওয়ার বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। অমৃতবাজার পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রী মতিলাল ঘোষ তাঁর সহিত সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। এই বিধেয়কের বিরুদ্ধে কলকাতায় কয়েকটি সভারও আয়োজন করা হয়। কিন্তু বিশেষ ব্যাপার হল যে এই যে ঘরের মধ্যে বসেই

কলকাতার বিভিন্ন নতুন-নতুন স্থানে কল্পিত সভা অনুষ্ঠানের সংবাদ লেখা হতে লাগল এবং সংবাদপত্রগুলিতে ছাপাও হতে লাগল। এই সব সভায় সভাপতি ও বক্তা হিসাবে যাঁদের নাম ও বক্তৃতা ছাপা হত, তাঁদের সঙ্গে আগেই দেখা করে কথা বলে নেওয়া হত। অতএব, যখন কোন গোয়েন্দা সে বিষয়ে তাঁদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত, তখন তাঁরা উত্তর দিতেন যে, "সভা খুব ভাল হয়েছে এবং তার যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা একেবারে সঠিক।" এ ব্যাপারে গোয়েন্দা বিভাগ একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। এদিকে তারা সভা অনুষ্ঠানের কোন খবরই আগে-ভাগে জানতে পারতনা, ওদিকে অফিসারদের কাছে ওদের প্রায় কানমলা খেতে হত।

কলকাতার এই সব সংবাদপত্রের সংবাদের 'কাটিং' অন্যান্য প্রান্তের সংবাদপত্র গুলির কাছেও পাঠানো হত এবং তারাও প্রচণ্ড বিক্ষোভের ঢেউ তুলে সম্পাদকীয় প্রবন্ধও লিখত।

দেশের সকল প্রান্তেই তীব্র জন-বিক্ষোভ গড়ে তোলার এই যোজনাকে নিজ কল্পনাশক্তির মাধ্যমে সফল করে তোলার পরে ডাক্তার কেশবরাও কলকাতায় এক বিশাল জনসভার আয়োজন করেন। ঐ সভায় তখনকার বিখ্যাত নেতা শ্রী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সভাপতিত্ব করেন। ঐ সভায় গৃহীত সমস্ত প্রস্তাবের উপর জনমতের পুরো ছাপই অঙ্কিত হয়ে গেল।

এইসব প্রচারের পরিণাম হল এই যে সরকার এই সব জাতীয় বিদ্যালয়গুলি থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্তদের জন্য একটি পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। তারপর নামমাত্র পরীক্ষার মাধ্যমে এই সমস্ত ডিগ্রীধারী ব্যক্তিদের সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে ব্যবসা করার পথ উন্মুক্ত হল। সে বছর এই পরীক্ষা ১৯১৫ সালের ৩রা নভেম্বর হবার কথা ছিল এবং ঐ পরীক্ষায় বসার অনুমতিপত্র ডাক্তার হেডগেওয়ারের কাছেও এসে পৌঁছল।

যদিও পরীক্ষা শুধু লোক-দেখানোর ব্যাপার ছিল, তথাপি ডাক্তার হেডগেওয়ার কলকাতায় থেকেও পরীক্ষায় না বসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে 'আমরা রাষ্ট্রীয় বিদ্যাপীঠের ছাত্র এবং ঐ বিদ্যাপীঠ আমাদের ডিগ্রী প্রদান করেছে। তাহলে সরকারের স্বীকৃতির কী প্রয়োজন? বিদেশীদের চাকুরী করে তাদের পদলেহন যাতে না করতে হয়, তার জন্যই তো আমরা সরকারী বিদ্যালয় বর্জন করে এই পথ অবলম্বন করেছি।"

ডাক্তার হেডগেওয়ার প্রায় পাঁচ বছরের শিক্ষণ সমাপ্ত করে ১৯১৬ সালের প্রথম দিকে নাগপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি যখন কলকাতায় যান তখনও তাঁর মনে এই সংকল্প ছিল যে "আমি সরকারের সামনে মাথা নত করবনা।" এবং "এখন সরকারী স্বীকৃতি লাভের পরীক্ষার দিকে ফিরেও তাকাবনা।" এই প্রকার স্বাভিমানী বৃত্তির পতাকা উড্ডীন করে তিনি নাগপুরে ফিরে এলেন। জীবনে স্থিরতালাভের আশায় তাঁর সহপাঠীরা সরকারের সামনে মাথা নত করে ব্যবসা আরম্ভ করলেও সেই সময়ে ডাক্তার হেডগেওয়ার নিজের জীবনের লক্ষ্য স্থির করে ফিরে এসেছিলেন। অর্থ বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেননি। শ্রী অরবিন্দ ঘোষ তাঁর উপর যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল তার দরুন জাতীয় (রাষ্ট্রীয়) বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষের পদ থেকে পদত্যাগপত্র দেবার সময়ে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলেছিলেন যে "আপনাদের কিছু পুঁথিগত জ্ঞান দেবার জন্য এবং উদর-পূর্তির

কোন পথ উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্যে আমরা এই কার্যে ব্রতী হইনি। আপনাদের মধ্য থেকে মাতৃভূমির জন্য কাজ করার এবং কষ্ট সহ্য করার মত সুসন্তান তৈরী হয়ে উঠুক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।"

কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়সমূহের এই বাস্তবিকতা ডাক্তার হেডগেওয়ার ছাড়া আর কতজন ডিগ্রীধারী বুঝেছিলেন? তাঁর কঠোর সংকল্পে বলীয়ান ধ্যেয়নিষ্ঠ মন কেবল ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের চিন্তা ত্যাগ করে হৃদ্-তন্ত্রীতে এক অন্য সুরের ঝংকার তুলেছিল।

চতুর্দিকে দুঃখ দেখে
মনে বিঁধেছে শল্য।
তার উচ্ছেদে প্রয়াসী আমরা
এতেই মোদের জীবন-সাফল্য।।

৬. বিপ্লবী গতিবিধি

ডাক্তার কেশবরাও যখন নাগপুরে ফিরে এলেন তখন তাঁর বড় দাদা মহাদেব শাস্ত্রী বাড়ীতে থাকতেন। বাড়ীর এক অংশে কিছুদিন আগে থেকে শ্রী বামনরাও ধর্মাধিকারী বসবাস করছিলেন। অতএব, বাড়ীর ভাঙা-চোরা অংশের কিছুটা সংস্কার করা হয়েছিল। শ্রী বামনরাও যখন ১৯১০ সালের পরে সর্বপ্রথম বসবাস করতে আসেন সেই সময়ে বাড়ীর প্রতি মহাদেব শাস্ত্রীর কোন নজর না থাকার ফলে তার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। স্থানে-স্থানে ছাদ থেকে জল পড়ত এবং অনেক জায়গায় ঘাসও গজিয়ে উঠেছিল। কেশবরাও ডাক্তারী পাশ করে ফিরে আসার পর যদি ডাক্তারীর ব্যবসা আরম্ভ করে দিতেন তাহলে তাঁর উগ্র-প্রকৃতি জ্যেষ্ঠভ্রাতার মন শান্ত হত এবং বাড়ীতে বাস করার অনুকূল বাতাবরণ পেতেন। কিন্তু বেশ কিছুকাল নাগপুরে কেটে গেলেও তাঁর ব্যবসা শুরু করার কোন সংকেত দেখতে পাওয়া গেল না। উপরন্তু শ্রী তাত্যাজী ফড়ণবীসের বাড়ীর দুতলায় বাস করে তিনি সামাজিক কাজকর্মেই বেশী ব্যস্ত থাকতেন। এই কারণে দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিলনা। এতৎসত্ত্বেও ডাক্তারজী মাঝে-মধ্যে বাড়ী গিয়ে শাস্ত্রীজীর সঙ্গে দেখা করে আসতেন। ডাক্তারজীর নাগপুরে আগমনের কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে পুনরায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হল। আগের মত জনসাধারণ প্লেগ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলনা। অতএব, তাড়াতাড়ি তারা শহরের বাড়ীঘর ছেড়ে শহরের বাইরে গিয়ে ঝুপড়ী বানিয়ে বসবাস করতে এবং প্লেগের টিকা নিতে শুরু করে দিল। সেই সময়ে ডাক্তারজী ও সীতারামজী দুজনেই হাম্পইয়ার্ডের নিকট ঝুপড়ী বানিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। তাঁরা মহাদেব শাস্ত্রীকেও বার-বার অনুরোধ করলেন সেখানে এসে তাঁদের সঙ্গে বসবাস করার। কিন্তু তিনি তাঁর উদ্দণ্ড মনোভাবে মশগুল হয়ে বললেন — "আমাকে শালা প্লেগ কী করতে পারে?" এই বলে শহরের বাড়ী ছেড়ে যেতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু এই জেদ অবশেষে মারাত্মক প্রমাণিত হল এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি প্লেগের শিকার হলেন। কিছুতেই তাঁকে বাঁচানো গেল না। তাঁর মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে কিছু চোর-বদমাস তাঁর বাড়ীর বাসন-কোশন ও অন্যান্য জিনিষপত্র লুটে-পুটে নিয়ে যেতে কসুর করলনা।

এই দুর্ঘটনার পরে মহামারী শান্ত হয়ে গেলে ১৯১৭ সালের প্রথম দিক থেকে কেশবরাও ও সীতারামজী নাগপুরে তাঁদের পৈতৃক গৃহে বসবাস করতে শুরু করলেন। ইন্দোরে শিক্ষাগ্রহণের পর সীতারামজী ফড়ণবীসের গৃহেই থাকতেন এবং পুরোহিতের কাজ করতেন। এখন দুই ভাই এক জায়গায় এসে বসবাস করলেও তাঁদের রীতি-নীতি ছিল ভিন্ন ধরণের। সীতারামজী পুরোহিতের কাজ করতেন, সেই কারণে ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে প্রায়ই তাঁকে বাইরে যেতে হত, কিন্তু ডাক্তারজী তাঁর ইচ্ছামত কখনো বাড়ীতে আবার কখনো

বন্ধুদের বাড়ীতে গিয়ে ভোজন করতেন। সেই সময়ে তাঁর বন্ধুরা ডাক্তারী ব্যবসা আরম্ভ করার জন্য প্রতিনিয়ত তাঁকে চেপে ধরতেন। "তুমি ব্যবসা শুরু করে দাও, আমরা জায়গা দেখে তোমার ঔষধালয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" সকাল-সন্ধ্যায়, উঠতে-বসতে এই রাগিনী তাঁকে নিরন্তর শুনতে হত। এইসব শুনে শান্তভাবে তিনি উত্তর দিতেন যে "কিছু দিন পরে দেখা যাবে। এত তাড়াতাড়ি কিসের?" কিন্তু কিছু না করেও কখনো-কখনো শুধু হেসেই উড়িয়ে দিতেন। এই সময়ে তাঁর কাছে দশ-পাঁচটা ঔষধ, একটি স্টেথিস্কোপ, ছোট আকারের তুলাদণ্ড ও কয়েকটি নির্বাচিত ডাক্তারী পুস্তকও জমা হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুদের মধ্যে, কারো প্রয়োজন হলে তিনি ঔষধও দিতেন। কিন্তু এইসব দেখেই বলা যাবেনা যে তিনি ডাক্তারী পেশা শুরু করে দিয়েছিলেন। ব্যবসার চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে ছিলইনা।

যে সময়ে তিনি ডাক্তারী পাশ করে এসেছিলেন সে সময়ে এই পেশার খুব চাহিদা ছিল। সেই সময়কার শ্রী কৃঃ দাঃ বহ্নারপাণ্ডের একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে সেই সময়ে সম্পূর্ণ মধ্যপ্রান্ত ও বেরারে বেসরকারীভাবে ডাক্তারীর ব্যবসা করেন এরকম ডাক্তারদের সংখ্যা পঁচাত্তরের বেশী ছিলনা। যে প্রান্তে আজ কয়েক হাজার ডাক্তার আছেন, সেখানে ১৯১৭ সালে মাত্র পঁচাত্তরজন ডাক্তার ছিলেন। সেই কারণে সে সময়ে ডাক্তারদের স্বাভাবিকভাবেই অত্যধিক প্রতিপত্তি ছিল, এবং ডাক্তার কেশবরাও যদি চাইতেন তাহলে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারতেন। একদিকে ব্যবসা আরম্ভ করার আগ্রহ চলছিল, অপরদিকে পাঁচ-পাঁচ হাজার টাকা পণ দিয়ে বিবাহের প্রস্তাবও আসছিল। কেউ-কেউ চুপি-চুপি নিজ কন্যার কোষ্ঠী তাঁর নিকট পাঠিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করত, আবার কেউ পরিচিতদের সুপারিশ পাঠিয়ে নিজের দাবীর ওজন বৃদ্ধির চেষ্টা করত। কিন্তু এই সব কুণ্ডলীর নবগ্রহে তাঁকে জড়িয়ে ফেলা সম্ভব হলনা। তিনি সর্বদা একটাই উত্তর দিতেন - - "এখন বড় ভাই-এর বিবাহ বাকি আছে। সেটা হয়ে গেলে নিজের কথা চিন্তা করব।" কিন্তু এই কৌশলও বেশী দিন চালানো গেল না। ১৯১৭ সালেই সীতারামজীর বিবাহ সম্পন্ন হল এবং হেডগেওয়ার পরিবারে গৃহলক্ষ্মীর প্রবেশ ঘটল। শূন্য গৃহ পূর্ণ হল। রুক্ষ পরিবেশে সরসতার সঞ্চার হল। চতুর্দিকে মঙ্গলধ্বনি শোনা যেতে লাগল। কিন্তু ডাক্তারজীর অবস্থা এমন হল যেন প্রাচীরের আড়াল সরে গিয়ে তাঁকে প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল।

এই সব কুণ্ডলী তথা বিবাহ প্রস্তাবগুলি থেকে নিস্তার লাভের জন্য তাঁর কাছে যাঁরা আসতেন তাঁদের আবাজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য রামপায়লীতে যেতে বলতে লাগলেন। বিবাহযোগ্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে কী না করতে পারে? সেই কারণে এই ধরনের লোকেরা রামপায়লী পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করে দিলেন। এত সব লোকের অনবরত আনাগোনা দেখে অবশেষে আবাজী ডাক্তারজীকে পত্র লিখে জানতে চাইলেন যে "বিবাহের ব্যাপারে তোমার ইচ্ছাটা পরিষ্কার করে জানিয়ে দাও।" পত্রের জবাবে ডাক্তারজী তাঁর কাকাকে লিখে জানালেন-"অবিবাহিত থেকে সারা জীবন দেশের কাজ করার আমি সংকল্প গ্রহণ করেছি। দেশের কাজ করার সময়ে যে কোন দিন জীবন-সংকট উপস্থিত হতে

পারে, সে কথা জেনেও কোন মেয়ের জীবন নষ্ট করার কী কোন অর্থ থাকতে পারে?" এর পরে বিবাহের পরিচ্ছেদের সেখানেই সমাপ্তি ঘটল।

বড় ভাইয়ের শুভবিবাহের পরে সংসারে নতুনভাবে সুস্থিতি এসেছিল। তখন ডাক্তারজীর ভোজনের অব্যবস্থা কিছু অংশে হ্রাস পেয়েছিল। মহাদেব শাস্ত্রীর জমানার আখড়ার অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ার ফলে সেখানকার উপকরণগুলি অন্য আখড়াকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মলখম্ব ভারত ব্যায়ামশালাকে দিয়ে দেওয়া হল। ডাক্তারজী তাঁর প্রয়োজনীয় উপকরণ নিজের জন্য রেখে নিয়েছিলেন। আখড়া বন্ধ হয়ে গেলেও বাড়ীতে ব্যায়াম নিয়মিত চলত। কলকাতা থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে দুই ভাই দৌড় লাগাতেন মাঝে-মাঝে কামঠী পর্যন্ত এবং সেখানে কন্হানে স্নান করে পূজার জন্য ফুল নিয়ে ফিরতেন।

যুদ্ধকালের শেষ পর্যন্ত ডাক্তারজী সম্পূর্ণ শহরে ঘুরে-ঘুরে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তাঁর স্নেহভাজন শ্রী ভাউজী কাবরের নেতৃত্বে ১৯০৮ সাল থেকে মধ্যপ্রান্তে যে বিপ্লবী কার্যকলাপ চলছিল, সেই সময়ে ডাক্তারজী তার যোজনা তৈরীতে এবং সেইগুলিকে কার্যকর করার কাজে যত্নশীল থাকতেন। তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁদের উপর দেওয়া দায়িত্ব কতখানি পূর্ণ হয়েছে তা জেনে নিয়ে পরবর্তী যোজনা বুঝিয়ে দিয়ে আসতেন। একজন ত্যাগী ও চরিত্রবান তরুণ হিসাবে সকলেই ডাক্তারজীকে শ্রদ্ধা করত, সেই কারণে যখনই তিনি কারো কাছে যেতেন, তাঁরা সকলেই অত্যন্ত প্রীতি ও সম্মানের সঙ্গে তাঁর কাজের সম্বন্ধে আলোচনা করতেন।

১৯১৬ থেকে পরবর্তী দু-তিন বছর মধ্যপ্রান্তে বিপ্লবী দলের যেসব কার্যকলাপ চলেছিল, সেগুলি সম্বন্ধে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ এখনও শোনা যায়। এইগুলি থেকে একটা কথা সুস্পষ্ট জানা যায় যে এগুলিতে ভাউজী কাবরে ও ডাক্তরজীর প্রধান হাত থাকত। কিন্তু প্রত্যক্ষ কোন যোজনাকে কার্যান্বিত করার দায়িত্ব ভাউজী নিজেই গ্রহণ করতেন। যোজনা তথা দিশা নির্দেশের দায়িত্ব ছিল ডাক্তারজীর হাতে। এইভাবে দুজনে নিজেদের দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছিলেন বলে মনে হয়। এর কারণও ছিল পরিষ্কার। ডাক্তারজী নাগপুর, কলকাতা ও পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতেন। অতএব, অন্যদের সহযোগিতা লাভ করার এবং তাঁদের মধ্যে যোগাযোগের সূত্ররূপে তিনিই ছিলেন সব থেকে উপযুক্ত ব্যক্তি। এ ছাড়া ১৯০৮-৯ থেকেই সরকারী গোয়েন্দারা ডাক্তার হেডগেওয়ারের পিছনে লেগে থাকত। অতএব, যাতে কারো সন্দেহ না জাগে এবং বাইরের কাজকর্মের মধ্যে কোনও আইন-বিরুদ্ধ ব্যাপার দৃষ্টিগোচর না হয়, সেই কারণে এইভাবে কাজ করাই সম্পূর্ণ বিপ্লব-কার্যের সুরক্ষা ও সাফল্যের দিক থেকে অধিক সুবিধাজনক ও যুক্তিসঙ্গত ছিল। শ্রী ভাউজী কাবরের ব্যাপার ছিল একটু অন্যরকম। ম্যাট্রিক পর্যন্ত শিক্ষালাভের পর কতকগুলি আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে তিনি চিকিৎসা করতেন, এমনই এক গৃহস্থ ছিলেন তিনি। তাঁর বাহ্য রূপ ছিল অত্যন্ত সাদা-সিধা। কিন্তু অন্তরে তাঁর নানা কলা-কৌশলের নিবাস ছিল। তিনি ডাক্তারজী থেকে বয়সে দু বছরের বড় ছিলেন এবং তাঁর শরীরও ছিল হৃষ্ট-পুষ্ট ও শক্ত-সমর্থ। তাঁর দৃষ্টি ছিল তেজোদ্দীপ্ত, কিছুটা উগ্র ও

পিঙ্গল ছটাযুক্ত, তার সঙ্গে বেশ বড় গোঁফজোড়া ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু স্ত্রী গত হয়েছিলেন। অতএব 'একেলা প্রাণ, সদা কল্যাণ' এই উক্তি অনুসারে তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় ছিলেন। কোন বিপত্তিতেই তাঁর মনের ভারসাম্য ও সংকল্প বিচলিত হবার কথা কল্পনাও করা যেতনা। নিজের দলের কর্মীদের উপর তাঁর অসীম প্রভাব ছিল। তার পিছনে কঠোর অনুশাসনের সঙ্গে ভালবাসায় পরিপূর্ণ হৃদয়ের সরসতাও ছিল। তাঁর কথামত চলাতে কৃতার্থতার অনুভব করতেন, তাঁর এমন এক সহকর্মী স্মৃতি-রোমন্থন করে একবার বলেছিলেন যে "ভাউজীর ব্যক্তিত্ব এমন ছিল যে তাঁকে মাতা বলি অথবা পিতা বলি, ভাই বলি না বন্ধু বলি — তা বুঝতে পারতাম না। কারণ এঁদের সকলের ভালবাসা তাঁর মধ্যে একত্রে পাওয়া যেত।" এই কথাগুলি বলার সময়ে তাঁর চক্ষু এমন অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল যে তা দেখেই তাঁর উক্তি কতখানি যথার্থ তা ব্যক্ত হয়ে উঠেছিল।

ভাউজী কাবরে ও ডাক্তারজীর বন্ধুত্ব ছিল অপূর্ব। যেমন দুই ঠোঁট দিয়ে একই শব্দ নির্গত হয় এবং দুটি চোখ দিয়ে একই দৃশ্য দেখা যায়, দুই-কান দিয়ে একই শব্দ শোনা যায় এবং দুই হাত দিয়ে একটাই তালি বাজে। সেই রকমই তাঁদের দুজনের মধ্যে পূর্ণ একত্বের অনুভূতি হত। তবে ডাক্তারজী থেকে অধিক ভাবুক প্রকৃতির হওয়ার দরুন ভাউজী রক্তাক্ত বিপ্লব ব্যতীত অন্য পথে যারা চলে তাদের বিষয় অভিনয় সহকারে উপহাস করার ব্যাপারে অত্যন্ত কুশল ছিলেন। নরহরি সোনারের মত দেশভক্তির রক্তাক্ত বিপ্লবের রূপেই তাঁর ভক্তি ছিল। তাঁর আরাধ্য দেবতা পাণ্ডুরঙ্গের মত কোমরে হাত রেখে দণ্ডায়মান মূর্তি নয়, বরং নিত্য কোদণ্ডধারী রামের মূর্তিই ছিল। ডাক্তারজীর চিন্তার মধ্যে শুদ্ধতা ও ব্যাপকতার সঙ্গে-সঙ্গে ভাবুকতার উপর সংযমের রাশ টেনে তাকে উপযুক্ত পথে পরিচালনার পাত্রতা তথা কুশলতা বেশী ছিল। সেই কারণে ভাউজীর ভাষায় অন্য পথে যাঁরা চলেন তাঁদের বিষয়ে যে রকম তিক্ত উপহাস ব্যক্ত হত, সে রকম ডাক্তারজীর ভাষায় না থাকলেও সেখানে সহিষ্ণুতার স্নিগ্ধতা অনুভূত হত। কিন্তু ভিন্ন স্বভাবের এই দুই ব্যক্তির পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা ও দেশাত্মবোধে পরিপূর্ণ অন্তঃকরণ থাকার দরুন একই চৌকাঠের মধ্যে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছিলেন।

ভাউজী ডাঃ মুঞ্জের বাড়ীর কাছেই থাকতেন। সেখানে ডাক্টরজীর প্রায় নিয়মিত যাতায়াত ছিল। সেইভাবে ভারী পাগ্ড়ী বেঁধে বিশাল গোঁফযুক্ত ভাউজী ডাক্তারজীর বাড়ীতেও যেতেন এবং দুজনের মধ্যে আলাপ-আলোচনাও চলত। এঁরা দুজন ছাড়া সেই বৈঠকে যদি অন্য কেউ উপস্থিত হত, তাহলে নাগপুরের রীতি অনুযায়ী মুক্ত হাসি-ঠাট্টা ও গল্প--গুজব শুরু হয়ে যেত। মাঝে-মাঝে অট্টহাসিও শোনা যেত। এই হাসি-খুশি ও নিছক আড্ডার পরিবেশ দেখে কারো এ রকম আশংকাও হওয়া সম্ভব ছিলনা যে সেখানে গোলা-বারুদ নিয়েও কখনো আলোচনা হতে পারে। পাড়া-প্রতিবেশীদের আশ্চর্য লাগত যে এদের এই রকম আড্ডা ছাড়া কি আর কোন কাজকর্ম নেই? কিন্তু এই ধরনের বৈঠক থেকে সশস্ত্র বিদ্রোহের সামগ্রিক পরিকল্পনার চিন্তা-ভাবনা এগিয়ে চলত। মানুষ, অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্র, তিনটি প্রয়োজন পূরণের কাজই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই বিপ্লবী দলে নতুন-নতুন তরুণদের ভর্তি করার সুবিধার কথা

চিন্তা করে আন্না খোত "নাগপুর ব্যায়ামশালার" প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে ওয়ার্ধা ও নাগপুর উভয় স্থানে পাঠাগারও শুরু করা হল। মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে বিপ্লবী দলের জাল বিস্তারের চেষ্টা চলছিল এবং সেই কাজে বেশ সাফল্যও লাভ করা যাচ্ছিল।

শ্রী ভাউজী কাবরে ও ডাক্তারজীর প্রান্তের প্রধান স্থানগুলিতে যোজনানুসারে পরিভ্রমণেরও ব্যবস্থা করা হল। কারো বিবাহ উপলক্ষ্যে অথবা অন্য কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সুযোগ সুবিধামত যাওয়ার কার্য্যক্রম তৈরী হত। কিন্তু তাঁদের মনোগত উদ্দেশ্য তো আলাদাই ছিল। বাইরের লোকেরা যাতে বুঝতে না পারে তাই সুযোগ খুঁজে নিতে হত। নাগপুর ও বেরার অঞ্চলে বিপ্লবী দলে যোগদানকারী এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রূপে আর্থিক সাহায্যকারী ধনবান ব্যক্তিদেরও একটি দল ভাউজী ও ডাক্তারজী গড়ে তুলেছিলেন। এইসব লোকের মাধ্যমে প্রত্যেক বার নতুন-নতুন গ্রামে মিষ্টান্ন-ভোজের আয়োজন করা হত। সেই সব স্থানে একত্রিত মানুষদের বাহ্য উদ্দেশ্য অবশ্য বনভোজন বা ভ্রমণ-জাতীয় কার্যক্রম থাকত, কিন্তু এইসব বৈঠক থেকেই বন্দুক, পিস্তল, গোলা-বারুদ গোপনে ক্রয় করার এবং অন্যান্য কাজের প্রয়োজনের জন্য হাজার-হাজার টাকা সংগ্রহের কাজও চলত। এই ধরনের এক-একটি বৈঠক থেকে পাঁচ-পাঁচ, দশ-দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে কাবরে ও ডাক্তারজী ফিরে আসতেন। এই প্রকার বৈঠকগুলিকে তৎকালীন রাজা-রাজড়াদের বৈঠকের অনুকরণে পরিহাস করে 'নরেন্দ্রমণ্ডল' নামে অভিহিত করা হত। এই বৈঠকগুলিতে ধোটীওয়াডার শ্রী সমীমুল্লা খাঁও ধুতি পরে তিলক কেটে সকলের সঙ্গে পংক্তিতে বসতেন।

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে বিভিন্ন স্থানের তরুণদের জন্য পিস্তল ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র কিনে আনা হত ও তাদের হাতে তুলে দেওয়া হত। এর জন্য কলকাতা, ভাগানগর (হায়দরাবাদ) ও গোয়া প্রভৃতি স্থানে বিশ্বস্ত কর্মীদের পাঠিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র খরিদ করা বা জোগাড় করা হত। অন্যান্য প্রান্তের বিপ্লবীদের অকেজো হয়ে যাওয়া পিস্তলগুলিকে পরিষ্কার করিয়ে সেগুলিকে সচল করার কাজও ডাক্তারজীর এক বন্ধু শ্রী দাদাসাহেব বক্‌শি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করতেন। শ্রীবক্‌শি একজন অভিজ্ঞ কারিগর এবং ১৯১৪-১৫ সালে ডাঃ সাভারকর ও ডাক্তার হেডগেওয়ার যে পিস্তলগুলি এনেছিলেন সেগুলির কথা আজও তাঁর মনে আছে।

এই সময়েই ডাক্তারজী বাংলা ও পাঞ্জাবে বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ওয়ার্ধা ও নাগপুর জেলার প্রায় কুড়ি জন তরুণদের একটি দল উত্তর দিকে পাঠিয়ে দিলেন। এই দলের নেতৃত্ব দেওয়া হল ওয়ার্ধার এক অত্যন্ত সাহসী ও নিষ্ঠাবান্ বিপ্লবী শ্রী গঙ্গাপ্রসাদ পাণ্ডেকে। গঙ্গাপ্রসাদ পাণ্ডে রাজস্থানের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলির অনুকূল অবস্থা বিবেচনা করে এই সব তরুণ বিপ্লবীদের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে নিযুক্ত করেন এবং বিদ্রোহের সম্পূর্ণ সূত্রের সঞ্চালনের জন্য আজমীরকে কেন্দ্র বানালেন। এই কাজে আজমীরের প্রসিদ্ধ নেতা শ্রী চাঁদকরণ শারদাও গঙ্গাপ্রসাদকে সাহায্য করেন। এই দলের আর্থিক ব্যবস্থার কাজ ডাক্তার হেডগেওয়ার নাগপুর থেকেই চালাতেন।

মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার ফলে বিভিন্ন রণাঙ্গনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ইংরাজদের অনেক সৈন্যদের ভারতের বাইরেও পাঠাতে হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে জনসাধারণের উপর

প্রভুত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে যে অল্প সংখ্যক সৈন্য অবশিষ্ট রইল, তাদেরই ছোট-ছোট দলে গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়ে প্রদর্শন করা হত। অবধের নবাবের বংশধররা যেমন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের জ্বালায় মরতে থাকলেও গোঁফে ঘি লাগিয়ে নিজেদের বড়মানুষী জাহির করার চেষ্টা করত, ইংরাজদের প্রয়াসও অনেকটা সেই রকম ছিল। এই বস্তুস্থিতির জ্ঞান বিদ্রোহের প্রস্তুতি গ্রহণকারী বিপ্লবীদের ছিল। কেশবরাও-এর মনে হত দেশের বিদেশী শাসকদের তখন যে রকম শক্তিহীন অবস্থা ছিল তার সুযোগ গ্রহণ করে দেশের সমস্ত প্রধান নেতাদের এই ঘোষণা করে দেওয়া উচিত যে "হিন্দুস্থান স্বাধীন হয়ে গেছে" এবং "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র একই সঙ্গে বিভিন্ন দেশেও প্রকাশিত করে দেওয়া উচিত"। তিনি তাঁর এই কল্পনার কথা ডাঃ মুঞ্জের সম্মুখে উপস্থাপন করলেন, কিন্তু তিনি সেটা মেনে নিতে পারেন নি। ডাক্তারজী তাঁর এই কল্পনার কথা অন্য কয়েকজন নেতার নিকটও প্রকাশ করেন, কিন্তু মনে হয় কারো নিকট হতে সমর্থন পাননি।

ইতিমধ্যে ডাক্তারজীর ইচ্ছা হয়েছিল, যে একবার পুনাতে গিয়ে লোকমান্যের দর্শন লাভ করে আসবেন। এর পিছনে তাঁর এরকম উদ্দেশ্যও ছিল যে বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে লোকমান্যের বিশ্লেষণ ও চিন্তাধারা শোনারও সুযোগ পাওয়া যাবে। ডাঃ মুঞ্জের কাছ থেকে পরিচয় পত্র নিয়ে তিনি পুনায় গেলেন এবং লোকমান্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ডাঃ মুঞ্জের পরিচয় পত্র নিয়ে যাওয়ার দরুন সাক্ষাতের পরে লোকমান্য তাঁকে অন্য কোথাও না থেকে তাঁর গৃহেই থাকতে বললেন। ডাক্তারজী দুই দিন তাঁর কাছে রইলেন। লোকমান্য অত্যন্ত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও স্বয়ং সময় করে তাঁর শোবার ও জলখাবারের ব্যবস্থা ঠিক মত হচ্ছে কিনা তার খোঁজ-খবর নিতেন। এই প্রকার আতিথ্যের কারণে ডাক্তারজীর সেখানে থাকতে সংকোচ হত, সেই জন্য কাজ পুরো হবার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি শিবনেরী যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং লোকমান্যের অনুমতি নিয়ে তিনি গায়কওয়াড-বাড়ার বাইরে এলেন। সেখানে থাকাকালীন তিনি যুদ্ধ-পরিস্থিতি এবং নাগপুর-বেরার এলাকায় যে কার্যকলাপ চলছিল সে সব বিষয়ে লোকমান্যের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন।

লোকমান্যের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ডাক্তারজী শিবনেরী গিয়ে ছত্রপতি শিবাজীর বাল্যলীলার পবিত্র বাতাবরণে তাঁর নিজের রাষ্ট্রসেবার সংকল্পকে আরো প্রদীপ্ত করে নাগপুর ফিরলেন। সেই সময়ে শিবাজীর জন্মস্থানের সন্নিকটেই তিনি মসজিদ ও দরগা দেখতে পেলেন। এই সংগতিহীন দৃশ্য দেখে তাঁর বড় বেদনা হল। এরপর যখনই শিবনেরীর উল্লেখ করা হত, তখনই সেই বেদনা নতুন করে তাঁর মনকে নাড়া দিত।

নাগপুরে যে সকল উপকরণ একত্র করা হত, সেগুলি পাঞ্জাব ও রাজস্থানে প্রেরণ করা হত। একবার ভুসাওয়াল স্টেশনে এই উপকরণ সঙ্গে নিয়ে যে দল যাচ্ছিল, দুর্দৈবক্রমে তারা ধরা পড়ে গেল। এই ঘটনায় সতর্ক হয়ে এর পর থেকে তরুণদের স্ত্রীলোকের বেশে সজ্জিত করে তাদের হাত দিয়ে এইসব উপকরণ পাঠানোর যোজনা করা হল। ১৯১৭ সালে এই রকম তরুণদের বিশেষভাবে নির্বাচিত করা হল যারা নিখুঁতভাবে স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করতে পারে। নাগপুরের কয়েকজন চট্‌পটে, উৎসাহী ও চালাক চতুর তরুণদের

এনে শ্রী নানাসাহেব টালাটুলে এবং শ্রী ভাউসাহেব টালাটুলের পথ নির্দেশে বন্দুক চালানোর শিক্ষাও দেওয়া হল। এই শিক্ষা গ্রহণকারীদের ডাক্তারজী সকলকে ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন যে বিপ্লব-কাজে সংলগ্ন ব্যক্তিদের কী রকম সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এই শিক্ষণ বর্গের উপলক্ষে ডাক্তারজীর সঙ্গে ওয়ার্ধার শ্রী হরিকৃষ্ণ (আপ্পাজী) জোশীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হল, যা পরবর্তীকালে প্রগাঢ় মৈত্রীতে বিকশিত। বিপ্লবের কাজে যারা নতুন ভর্তি হত তাদের পরীক্ষা করে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করানোর কাজ ডাক্তারজী এবং ভাউজী কাবরে করতেন। এই দীক্ষা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ এবং সমর্থ রামদাস স্বামীর প্রতিকৃতির সম্মুখে দেওয়া হত।

তরুণদের কীভাবে পরীক্ষা করা হত, তার একটি পদ্ধতির কথা জানা গেছে। একদিন ভাউজী কাবরে তিনজন তরুণকে সঙ্গে নিয়ে নাগপুর থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরবর্তী ইন্দোরা গ্রামে রাজা ভোঁসলের কুয়ার নিকট গেলেন এবং তাদের সেই কুয়ার মধ্যে ঝাঁপ দিতে আদেশ করলেন। এই কুয়ার গভীরতা চল্লিশফুটেরও বেশী ছিল। এই কারণে দুই জন তরুণ ভীত হয়ে পড়ল, কিন্তু তৃতীয় তরুণ নির্ভয়ে তৎক্ষণাৎ ঝাঁপ দিল। এই বালকবীর ছিলেন বাবুরাও হরকরে। বাবুরাও-এর পিছনেই ভাউজীও ঝাঁপ দিলেন এবং তাঁকে উপরে তুলে আনলেন। এরপরে তাঁকে বিপ্লবী দলে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হল।

এই প্রকারে পরখ করে যারা খাঁটি বলে উত্তীর্ণ হত সেইসব যুবকদের বৈঠক নাগপুরের বারাহদ্বারী, তুলসীবাগ, সোনেগাঁও-এর মন্দির, কর্নেলবাগ, ইন্দোরার মন্দির এবং মোহিতেবাড়েতে অদল-বদল করে রাখা হত। বৈঠক শেষ হবার পরে পরবর্তী বৈঠকের স্থান, তারিখ ও সময় জানিয়ে দেওয়া হত। ম্যাৎসিনি, জোয়ান অফ আর্ক, বাংলার বিপ্লবীদের বীরগাথা, আলিপুর ও মানিকতলা বোমাকাণ্ডের মকদ্দমা, এবং 'টু বিউটীজ্'-এর আবরণে লুকানো ব্যারিস্টার সাভারকরের 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' ইত্যাদি সাহিত্য তাদের পাঠ করার জন্য দেওয়া হত।

এই সময়ে মধ্যপ্রদেশের বিপ্লবী দলে প্রায় দেড়শত তরুণ যোগ দিয়েছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই সতর্ক থাকার দরুন এইসব প্রস্তুতির বিষয়ে কোন সংবাদই বাইরে কেউ জানতে পারেনি। যদি ঘটনাক্রমে একাধজনের কথা জানাজানি হয়েও যেত তবু তার কারণে একটি একটি যোগসূত্র খুঁজে বের করে যাতে সম্পূর্ণ যোজনা উদঘাটিত না হয়ে পড়ে সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। এর জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুরোপুরি পরখ করার, তার সম্পূর্ণ কাজের নিশ্চিত যোজনা তৈরী করার এবং তার মধ্যে অকারণ কৌতুহল তথা জিজ্ঞাসার মনোভাব যাতে সৃষ্টি না হয় ইত্যাদি সকল ব্যাপারে পর্যাপ্ত সতর্কতা পালন করা হত। কোন বার্তা ডাক মারফৎ না পাঠিয়ে লোকের মাধ্যমেই পাঠানো হত এবং বার্তায় সাংকেতিক ভাষা, ছদ্ম নাম ইত্যাদি ব্যবহার করে সেটাকে পুরোপুরি গুপ্ত রাখা হত।

নাগপুরের উপাধ্যের বাড়েতে শ্রী নানাসাহেব তেলঙ্গ এবং তাঁর কলেজের কয়েকজন সহপাঠী একসঙ্গে থাকতেন। তাঁরা সকলেই এই বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এবং তাঁদের বইয়ের বাক্সগুলি কিছুদিন ডাক্তারজীর পিস্তল ও গুলি লুকিয়ে রাখার কাজে লাগত।

শ্রী ভাউজী কাবরে এবং ডাক্তারজীর নেতৃত্বে নাগপুর অঞ্চলে যে বিপ্লবী দলের কাজ চলছিল, সেই দল অস্ত্র-শস্ত্র ও অর্থ-সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পথ অবলম্বন করে চলত। তার জন্য প্রয়োজনীয় অভিযানগুলির যোজনা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত কার্যকর করা হত, সেই কারণে কেউ কোন দিন তার কথা জানতে পারেনি। কয়েকজনের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে এই ধরনের অভিযানে যাদের পাঠানো হত তাদের জন্য ডাক্তারজী স্বয়ং খাবার ও পাথেয় খরচের ব্যবস্থা করে দিতেন। একবার এই প্রকার এক পরিকল্পিত অভিযানে যাবার জন্য শ্রীনানাসাহেব তেলঙ্গকে বাইরের এক স্থান থেকে নাগপুরে ডেকে পাঠাবার প্রয়োজন হল। সদ্য বি এ পরীক্ষা দিয়ে তিনি নিজের গ্রামে গিয়েছিলেন। এই সময়ে তাঁকে ডেকে পাঠালে বাড়ীর লোকেদের যাতে সন্দেহের উদ্রেক না হয়, তার জন্য ডাক্তারজীর এক বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষে তাঁকে নাগপুরে আসার জন্য অত্যন্ত আগ্রহভরা পত্র লিখলেন। এই সাংকেতিক পত্রে উভয় পক্ষেরই কাজ হাসিল হল।

অর্থ-সংগ্রহের মতই কামঠীর সৈন্য-শিবিরে কিছু লোকের সঙ্গে সম্পর্কে স্থাপন করে গোপনে অস্ত্র-শস্ত্র কেনার কাজও করা হয়েছিল। একবার নাগপুর থেকে সরকারী গোলা-বারুদের বাক্স যখন মালগাড়ীতে তোলা হচ্ছিল, তখন কয়েকজন বিপ্লবী সৈনিকের পোশাক পরে অত্যন্ত কৌশলে বাক্সগুলি গাড়ি থেকে নামিয়ে নেন এবং খুব গোপনে সেগুলি যথাস্থানে পৌঁছে দেবার পর, সরকারী তদন্তে যাতে কোন কথা প্রকাশ না হয়ে পড়ে এবং কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ বা সূত্র না পাওয়া যায়, তার জন্য ডাক্তারজী ঐ সৈনিকদের পোশাকগুলি পুড়িয়ে তার ছাইও নর্দমায় ফেলে দিয়েছিলেন। এই ধরনের অনেক চিত্তাকর্ষক ঘটনার কথা এ পর্যন্ত অনেকেই মনে চেপে রেখেছিলেন। এখন ক্রমে সেগুলি জানা যাচ্ছে। সম্ভবতঃ উপযুক্ত সময়ে সে সব ঘটনাও কোন লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশিত হবে।

মানুষ ও অস্ত্র শস্ত্রের এই সংগ্রহ অবশ্যই কোন বিদ্রোহের জন্য করা হচ্ছিল । কিন্তু সেই বিদ্রোহের যোজনা ও স্বরূপ কী রকম ছিল তা জানার আজ কোন উপায় নেই। এই ধরনের ব্যাপার সাধারণভাবে তখনই প্রকাশ হয়ে পড়ে যখন বিপ্লবের পূর্ব প্রস্তুতি সত্ত্বেও তা সরকারী নজরে পড়ে যায় এবং প্রস্ফুটিত হওয়ার পূর্বেই সেই কুঁড়িটিকে পিষে ফেলা হয়। অথবা বিপ্লবের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে সরকারকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে ব্যক্তিগত অথবা সামগ্রিক আক্রমণের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে যায়।

যেটুকু জানা গেছে, তা থেকে একথা অবশ্য বলা যায় যে এই বিদ্রোহের স্বরূপ ছিল সামূহিক, কারণ তা পাঞ্জাব থেকে নাগপুর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল । সেই সঙ্গে মনে হয় বিদেশ থেকে জাহাজে আমদানী করা অস্ত্র-শস্ত্রের উপরেও তা কিছুটা নির্ভরশীল ছিল। যবতমালের বামনরাও ধর্মাধিকারী বলেন যে "১৯১৭-১৮ সালের কাছাকাছি সময়ে ডাক্তারজী বিদ্রোহের কথা আমাদের কর্ণগোচর করেছিলেন।" শুধু তাই নয়, ১৯১৮ সালে ডাক্তারজী তাঁকে মার্মাগোয়া পাঠিয়েছিলেন এবং বলে দিয়েছিলেন যে "সংকেত অনুযায়ী একটি জাহাজ আসবে। অতএব, জাহাজ পৌঁছবার সঙ্গে-সঙ্গে নাগপুরে এসে যেন সংবাদ দেন।" সেই সময় তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট অর্থও দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ অনুযায়ী বামনরাও

বম্বে থেকে সমুদ্রপথে গোয়া গিয়েছিলেন। সেখানে সাতারার শ্রী পাটিলের সঙ্গে মিলে পরবর্তী কাজ করার কথা ছিল। সেই মত তিনি পাটিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক পাটিল ছিলেন কৃষ্ণবর্ণ ছিপছিপে যুবক। তিনি গোয়ার কেরীতে শ্রী দাদাসাহেব বৈদ্যের গৃহে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যে আট দিনের মধ্যে জাহাজের আসার কথা ছিল, তা আসেনি। এর বিপরীতে জানা গেল যে ইংরেজরা মাঝপথেই একটি নৌকা আটকে রেখেছে। এর ফলে বামনরাও পুনা হয়ে নাগপুরে ফিরে ডাক্তারজীকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে দেন। এর আগেও ধর্মাধিকারীকে শ্রী নানাসাহেব তেলঙ্গের সঙ্গে গোয়া পাঠিয়ে ডাক্তারজী কিছু পিস্তল আনিয়েছিলেন। প্রথম থেকেই বামনরাও-এর গোয়া যাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল বলেই তাঁকে দ্বিতীয় বার পাঠানো হয়েছিল। এইভাবে এদিক-ওদিক থেকে পাওয়া খুচ্‌রো খবর থেকে সেই বিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানা কঠিন হলেও তার স্বরূপ যে সামগ্রিক বা সাংঘিক ছিল একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

জার্মানিকে পরাজিত করে ইংরাজ সরকার নিশ্চিন্ত হয়েছিল। এর ফলে ভারতে বৈপ্লবিক কার্যকলাপকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার তাদের নীতি আরো তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। ইংরেজদের উপর বিশ্বযুদ্ধের সংকট পরাধীন ভারতের স্বতন্ত্রতা-প্রাপ্তির প্রচেষ্টার যেমন সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছিল, তেমনি ইংরেজদের যুদ্ধে জয়লাভ পদদলিত ভারতকে নিজেদের বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরার সাহস এনে দিয়েছিল, যেটা ভারতের পক্ষে অভিশাপ হয়ে উঠেছিল। ভারতের সর্বত্রই এই পরাভবের অনুভূতি বিদ্ধ হতে লাগল। বড় উৎসাহ ও আশা নিয়ে প্রারব্ধ আন্দোলনে বিফল-মনোরথ হয়ে সাধারণ জনতা এবং বিশেষতঃ বিপ্লবীদের মনে চতুর্দিক থেকে ঘোরতর হতাশার কালো মেঘ ঘনিয়ে এল.। বিপ্লবী আন্দোলনের জাল চারদিকে বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু এখন তার সম্ভাবনা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তার উপর কার্যকর্তাদের হতাশা ও ব্যর্থতার মনঃস্থিতির দরুন এই আশংকাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল যে তাঁদের পেটের কথা মুখে এসে পড়বেনা তো? অতএব চতুর্দিকের বিস্তৃত জালকে গুটিয়ে নিয়ে অত্যন্ত শান্ত মনোভাব তথা সতর্কতার সঙ্গে লীলা সংবরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। কাজটা ছিল ঠিক সেই রকম যেমন খুব ঘটা করে তৈরী করা বিবাহ-মণ্ডপ বিবাহের অনুষ্ঠান না করেই ভেঙে ফেলা। বরং এই কাজ ছিল তার থেকেও কঠিন, বেদনাদায়ক তথা উদ্বেগজনক। কিন্তু দাবার খেলায় একটি চাল ভুল হয়ে যাবার পরে তার পরিণাম নিজের বিরুদ্ধেই চলে গেলেও বিচলিত না হয়ে আরো বেশী কৌশল ও সতর্কতা অবলম্বন করে যে ঘুঁটি চালতে শুরু করে, সে হেরে যাওয়া বাজিও পাল্‌টে দিতে পারে। ঠিক সেই রকম রাজনীতিতে পদক্ষেপ রাখতে হয়। এখানে কোন ঘটনাই চূড়ান্ত হয়না।

বিফলতা বা ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়ে কয়েকজন তরুণের মনে অনুতাপ শুরু হল আর তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে — আর কখনো ভুলেও তারা এইরকম ঝামেলার সঙ্গে নিজেদের জড়াবেনা। তাদের দিক থেকে এই রকম সার্বজনীন কাজের ইতি বা পূর্ণ বিরাম চিহ্ন বলেই ধরে নিতে হবে। এর বিপরীত তখনও একটি শ্রেণী ছিল যারা সাময়িক হতাশার দরুন কাজে বিরত হয়ে বসে পড়েছিল। কিন্তু ঝরাপাতার মরশুম কেটে গেলে বসন্তের আগমনে যেমন

শুষ্ক বৃক্ষে নব কিশলয়ের আবির্ভাব ঘটে, সেই রকম অনুকূল অবস্থার পুনরাবির্ভাব ঘটলেই হতাশা ঝেড়ে ফেলে পুনরায় নব উদ্যমে কাজে নেমে পড়তে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু স্বয়ং-প্রেরণায় পরিপূর্ণ জ্ঞাতসারে সশস্ত্র বিপ্লবে নিজেকে উৎসর্গ করার ব্রতধারীদের অবস্থা এই দুই শ্রেণী থেকে ভিন্নতর হয়। তাঁদের এই সব ঘটনায় মনে দুঃখ হয়না তা নয়, কিন্তু তাঁদের ধ্যেয়নিষ্ঠা এমনই দৃঢ় ও অটল হয় যে ঐ পরিস্থিতিতে সংঘটিত ঘটনাগুলির বিশ্লেষণ করে, পরে অনুরূপ বিষম পরিস্থিতিতেও কী ভাবে অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হবে তার পথ খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন। এই কাজ করার সময়ে তাঁদের মনে কোন ক্ষোভ বা বিরক্তির উদয় হয়না। তাঁরা জানেন যে আম্রবৃক্ষে যত মুকুল দেখা যায় তার সবগুলি ফলে পরিণত হয় না। সেগুলির মধ্যে কিছু নিজে থেকেই ঝড়ে পড়ে। আবার অনেকগুলি পাখি ঠুকরে খেয়ে যায়। তাঁর নিজের দিক থেকে প্রচেষ্টার পরাকাষ্ঠা করতে কোন ত্রুটি রাখেন না, কিন্তু তাতেও যদি প্রত্যাশিত সুফল না পাওয়া যায়, তাহলে তাঁরা নিজেদের পন্থা ও উপায়গুলি সঠিকভাবে পরীক্ষা করে দেখেন এবং তার মধ্যে দোষ-ত্রুটি ধরা পড়লে, সেগুলিকে সংশোধন করে এবং প্রয়োজন হলে সেগুলিকে পরিত্যাগ করেও, আরো এগিয়ে যাওয়ার জন্য সেগুলি থেকেও প্রভাবী তথা কার্যকর পন্থা ও উপায় খুঁজে বের করেন এবং ব্যর্থতাকে আত্ম-নিরীক্ষণের সুযোগ বলে মেনে নিয়ে 'গাছের কিছু অংশ ছেঁটে ফেললে সেই গাছ দ্রুতগতিতে বড় হয়ে উঠবে।' এই উক্তির সার্থকতা প্রমাণ করে বিরূপ পরিস্থিতির বিরুদ্ধেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ডাক্তারজী ও তার সহযোগীরা এই প্রকার কাজের অনুকূল মনঃস্থিতি নিয়ে নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন।

এই সময়ে গণেশ উৎসব উপলক্ষে ডাক্তারজীর খুব গরম বক্তৃতা হত। এই উপলক্ষে তিনি সম্পূর্ণ প্রান্তে পরিভ্রমণ করে সংশ্লিষ্ট তরুণদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে তাদের হতাশার গহ্বরে নিমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। মধ্যপ্রান্তের 'হোমরুল লীগেও' তিনি প্রবেশ করেন এবং তার সভাগুলি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রীয় পরিষদগুলিতে কখনো সভাপতি হিসাবে, আবার কখনো প্রধান বক্তা হিসাবে উৎসাহবর্ধক বক্তৃতা দেন। সেই বছর বেরারে লোকমান্যের ভ্রমণের পূর্বে ডাক্তারজী স্বয়ং ডাঃ মুঞ্জের প্রত্যাশা অনুযায়ী লোকমান্যের যথোচিত অভ্যর্থনার ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। আমার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক আছে তাদের কাউকেই হতোৎসাহ হয়ে বসে পড়তে দেবনা, এই সংকল্প নিয়ে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য তিনি খুব দৌড়াদৌড়ি করেন। একদিকে এই সার্বজনীন কাজ চলছিল, অপর দিকে একই সঙ্গে বিপ্লবের জন্য সংগৃহীত অর্থ, অস্ত্র-শস্ত্র ও কর্মকর্তাদের যথাযথ ব্যবস্থা করার কাজও ডাক্তারজী চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শুধু তাই নয়, এই গুটিয়ে ফেলার কাজের প্রতি যাতে কারো নজর না পড়ে তার জন্য বাইরে সার্বজনিক সভায় বক্তৃতা তথা সভা অনুষ্ঠানের জোরদার কাজকর্মও চলছিল।

এই কাজে শ্রী গঙ্গাপ্রসাদ পাণ্ডে, শ্রী আপ্পাজী জোশী, শ্রীবাবুরাও হরকরে এবং শ্রী নানাজী পুরাণিক ইত্যাদি ব্যক্তিরা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। যে সব জিনিষ অমৃতসরে পাঠানো হয়েছিল তার ঠিকমত ব্যবস্থার সংবাদ ১৯১৯ সালের প্রথম দিকেই পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু

উত্তর দিকে যাদের প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। এর জন্য শ্রী আপ্পাজী যোশীকে অমৃতসরে পাঠানো হল। ঐ ব্যক্তিদের ফিরিয়ে এনে তাদের আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারজীর পক্ষ থেকে আপ্পাজীকে সেই সময়েই কারাগার থেকে মুক্ত শ্রীঅর্জুনলাল শেঠীর ওয়ার্ধাতে ব্যবস্থা করার আদেশ দেওয়া হল। অর্জুনলাল বিপ্লবী আন্দোলনে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে বিপ্লব-সংক্রান্ত খবর বের করার জন্য পুলিশ তাঁর উপর ভীষণ অত্যাচার করে। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সব অত্যাচার সহ্য করেন এবং তাঁর কোন সহকর্মীর নাম মুখে আসতে দেননি। কিন্তু এই সব যন্ত্রণার দরুন জেলের মধ্যেই তাঁর কিছুটা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল এবং স্বাস্থ্য ভীষণ ভেঙ্গে পড়েছিল। এই অবস্থায় ১৯১৯ সালের প্রথম দিকে তিনি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। এমন সহকর্মীর দুঃসময়ে তাঁকে সাহায্য করা কর্তব্য মনে করে ডাক্তারজী আপ্পাজীকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তদনুসারে তাঁকে সপরিবারে ওয়ার্ধাতে নিয়ে গিয়ে তাঁর চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। তিন-চার বছরের মধ্যে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি সেরে যায় এবং স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটে। ১৯১৭ সালে যে "রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক মণ্ডল" শুরু হয়েছিল, তার এক সদস্য শ্রীচিরঞ্জীলালজী বড়জাতে প্রধানতঃ তাঁর আর্থিক ভার বহন করেন।

সংশ্লিষ্ট সকলেই এই আশংকায় থাকতেন যে ভুলেও যদি তাঁদের যোজনার কথা সরকার জানতে পেরে যায় তাহলে কিছু করার আগেই অনেকের জীবন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তাই সকলেই খুব সতর্ক থাকতেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পাঞ্জাব থেকে ফিরে আসা এক সজ্জন হিংগনীতে বোমা ফাটিয়ে দিলেন। এর ফলে তদন্তের ঝামেলা শুরু হয়ে গেল। সেই সঙ্গেই ঐ প্রতিকূল সময়ে বিপ্লবীদের শৃঙ্খলাও আল্‌গা হয়ে পড়েছিল। কিছু লোকের স্বার্থচিন্তা মাথা তুলতে শুরু করেছিল। যে বিপ্লবীদের কাছে অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্র ছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন সেগুলি ফিরিয়ে দেবার আদেশ পুরোপুরি উপেক্ষা করল। লিখিত দলিল সত্ত্বেও যারা পরের অর্থ আত্মসাৎ করতে ইতস্ততঃ করেনা, তখন যে কাজ সম্পূর্ণ বিশ্বাসের উপর চলে, সেখানে এই ধরনের মানুষ থাকলে কী করা যাবে? এখানে কোন চিঠিপত্র বা লিখিত কোন কিছু নেই। শুধু তাই নয়, যদি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে বঞ্চনাও করে, তবু তার সম্বন্ধে মুখ থেকে শব্দ উচ্চারণ করাও অপরাধ ছিল। এইরকম অভিজ্ঞতার বেশ কিছু তিক্ত স্বাদ কাবরে তথা ডাক্তারজীকে গ্রহণ করতে হল।

কিন্তু সাফল্যের অমৃত-ঘটের দিকে যে উৎসাহের সঙ্গে তাঁরা হস্ত সম্প্রসারিত করেছিলেন, সেই রকম সহজ ভাব নিয়েই তাঁরা ব্যর্থতার হলাহল-কুম্ভকেও স্বীকার করে নিলেন। সাফল্য লাভ হলে তাকে নিজের পরাক্রম বলে আত্মশ্লাঘায় বিভোর হওয়া এবং ব্যর্থতার জন্য পরিস্থিতিকে দায়ী করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু এঁরা দুজনেই এইরূপ প্রবৃত্তির ঊর্ধে উঠে গিয়েছিলেন। তাঁরা সম্পূর্ণ ঘটনার উত্তম রূপে বিশ্লেষণ করেন এবং কোথায় তাঁদের দিক থেকে ত্রুটি হয়েছে তাঁর অনুসন্ধান করেন।

এই বিশ্লেষণ থেকে ডাক্তারজী পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে পূর্ণ প্রভাবী সংস্কার ব্যতীত দেশভক্তির স্থায়ী মনোভাব গড়ে তোলা সম্ভব নয়, এবং এই রকম অবস্থা যতক্ষণ সৃষ্টি করা

না যায় ততক্ষণ সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে প্রামাণিকতা আনাও সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে তিনি দেখলেন যে ভাবুকতার ঘোরে এবং যৌবনের উৎসাহের বশে বহু তরুণ এগিয়ে আসে, কিন্তু দমন চক্র শুরু হতেই মুখ ফিরিয়ে চিরকালের মত সামাজিক ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে যায়। এই ধরনের লোকের ভরসায় দেশের বিকট তথা অত্যন্ত জট পাকানো সমস্যা সমূহের কেমন করে সমাধান করা সম্ভব? তার জন্য ধ্যেয়ের প্রতি অবিচল দৃষ্টি রেখে চলার পথে মসৃণ মখমল পাতা থাক বা কাঁটা বিছানো থাক, তার চিন্তা না করে অবিরাম শুধু এগিয়ে যাবার দৃঢ় সংকল্পশীল ধৃতি-কৃতিশীল তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। তিনি দেখলেন যারা নিজেদের দেশভক্ত বলে মনে করে সেই তরুণরা অনুশাসন বা শৃঙ্খলাপরায়ণতা সহ্য করতে পারেনা। নিঃস্বার্থ বুদ্ধি ব্যতীত প্রকৃত অনুশাসন সৃষ্টি হয়না এবং অনুশাসন ব্যতীত বিদেশী শক্তিদের যন্ত্র-তন্ত্র সজ্জিত পাশববলকে আঘাত করার সামর্থ্য কোন রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থানের প্রয়াসের মধ্যে আবির্ভূত হতে পারেনা। এই ব্যর্থতা থেকে ডাক্তারজীর তৎকালীন সমাজের অবস্থার অত্যন্ত সুস্পষ্ট তথা যথার্থ বোধ বা জ্ঞান হয়েছিল এবং তার ভিত্তিতে তিনি তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপের দিশা নির্দিষ্ট করেছিলেন। তথাপি সশস্ত্র বিপ্লবের পথ থেকে তাঁর বিশ্বাস এতটুকু স্খলিত হয়নি। তাঁর সুনিশ্চিত অভিমত ছিল যে দেশের শত্রুদের যে কোন পন্থায় এই ভূমি থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব, সেটাই ইষ্ট তথা উপযুক্ত। তবে হ্যাঁ, যে কোন পন্থায় অগ্রসর হয়ে সাফল্য লাভ করার জন্য যে মনোবৃত্তির প্রয়োজন তার অভাব প্রধান রূপে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যাঁর কাছে দৃষ্টি থাকে তিনি খারাপের মধ্যে ভালোকে খুঁজে নিতে পারেন।

৭. নাগপুরের কংগ্রেস অধিবেশন

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হল। সেই সময়ে হিন্দুস্থানের মুসলমানদের মধ্যে 'খিলাফৎ আন্দোলন' এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। হিন্দু মুসলিম একতার জন্য মহাত্মা গান্ধী সেই আলোড়নের সঙ্গে হাত-মেলালেন। এর থেকেই অসহযোগ আন্দোলনের জন্ম হল। এই আন্দোলনে ডাক্তার হেডগেওয়ারও সম্মিলিত হয়েছিলেন। অতএব, এই ঘটনাচক্রের পটভূমির প্রতি কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে অবলোকন করা হিতপ্রদ হবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ইংরাজদের বিরুদ্ধে এবং জার্মানদের সঙ্গে ছিল। পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদের ধর্মগুরু 'খলীফা' সেই সময়ের তুরস্কের বাদশাহ ছিলেন। অতএব সমস্ত মুসলমানদের কামনা ছিল যেন তুরস্কের জয় হয়। কিন্তু ইংরেজরা জার্মানীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্যের প্রত্যাশী ছিল। এই কারণে আগা খাঁ-এর মত মুসলমানদের খোশামোদ করে ইংরেজরা মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি দিল যে জার্মানীর পরাজয়ের পরে তারা খলীফা তথা মুসলিম ধর্মস্থানগুলির সম্মান রক্ষার ব্যাপারে তিলমাত্র অন্যথা হতে দেবেনা। মুসলমানরা ইংরেজদের বিশ্বাস করে তাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করল এবং ইংরাজরা জয়লাভ করল। কিন্তু রাজনীতিতে দরকার হলে গাধাকে মামা বলে কাজ চুকে গেলে মামাকে কিমা বানিয়ে গিলে নেবার নীতিতে ইংরেজরা খুব দক্ষ ছিল। অতএব ইংরাজরা তুরস্কের অটোমন সাম্রাজ্যকে ছিন্ন-বিছিন্ন করে 'ভার্সাই' সন্ধি অনুসারে মিশর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, আরব ইত্যাদি পৃথক পৃথক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করল। শুধু তাই নয়, প্রত্যক্ষ তুরস্কের উপরেও মিত্র-রাষ্ট্রগুলির প্রভুত্বের সংকেত মুসলমানেরা দেখতে পেল। এই প্রকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। এই ক্ষোভ থেকেই মুসলমানদের এই দাবী জন্ম নিল যে "খলীফার উপর মিত্র-রাষ্ট্রগুলির অন্যায় ও অত্যাচার বন্ধ করতে হবে, তা না হলে আমরা ইংরাজদের সহিত অসহযোগ করব।"

মুসলমানদের অসন্তোষ যে সময় দানা বাঁধছিল সেই একই সময়ে জাস্টিস স্যার সিড্‌নী রওলাটের সভাপতিত্বে ভারতে বিপ্লব আন্দোলন সম্বন্ধে তদন্ত করতে ও তার প্রতিকারের ব্যাপারে পরামর্শ দেবার জন্য 'সিডীশন এন্‌কোয়ারী কমিটি' (রাজদ্রোহ তদন্ত সমিতি) নিযুক্ত করা হয়। এই সমিতির প্রতিবেদন ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হল। এটি অত্যন্ত নিম্নস্তরের এবং অসন্তোষ সৃষ্টিকারী দলিল ছিল। সেই প্রতিবেদনকে স্বীকৃতি দিয়ে তার ভিত্তিতে ভারত সরকার কেন্দ্রীয় বিধানসভায় একটি বিধেয়ক উপস্থাপন করল। এতে সরকারকে এই অধিকার দেওয়া হল যে হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনকারীদের সরকার তদন্ত না করেই আটক করতে পারে এবং জুরি ছাড়াই তাদের বিরুদ্ধে মামলা চালাতে পারে। এটাই ছিল কুখ্যাত 'রাওলাট অ্যাক্ট' আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত বিধেয়ক।

দেশপ্রেমিক বিপ্লবীরা কী ভাবে মৃত্যুর কথাও চিন্তা না করে ইংরেজ শাসনকে উচ্ছেদ করার জন্য গোপন প্রয়াস চালিয়েছিলেন তার কিঞ্চিৎ পরিচয় রাওলাট সমিতির প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যায়। ডাক্তারজীর মনে হল এই প্রতিবেদন পাঠ করলে জনমনে দেশভক্তির ভাবনা উজ্জীবিত হয়ে উঠবে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। অতএব, তিনি ঐ প্রতিবেদন-এর ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করেন। সরকার যেই জানতে পারল যে মধ্যপ্রান্তে এই প্রতিবেদনের ব্যাপক প্রচার চলছে, অমনি তাদের মনে সংশয় দেখা দিল এবং ঐ প্রতিবেদনের কপির বিক্রী বন্ধ করে দেওয়া হল।

সরকারের প্রস্তাবিত বিধেয়কের মাধ্যমে দমন-পীড়নের এক নতুন বিপজ্জনক হাতিয়ার তাদের হাতে এসে পড়বে, সেই কারণে তার বিরুদ্ধে বিরাট বিক্ষোভ শুরু হল। ১৯১৩ সালের ১৩ই এপ্রিল বৈশাখীর পুণ্য পর্বের দিন অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দশ হাজার মানুষের উপর জেনারেল ডায়ার অকস্মাৎ গুলি বর্ষণের নির্দেশ দেয়, যার ফলে শত-শত নিরীহ মানুষ নিহত হয়। সরকারের অমানুষিক বর্বরতায় সমগ্র দেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

খিলাফতের দরুন মুসলমানদের মনে আগেই অসন্তোষ ছিল। জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনায় দেশ আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এই দুই বিক্ষোভকে সংযুক্ত করে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের প্রয়াস শুরু হল। এর জন্য খিলাফৎ সমিতির পক্ষ থেকে মৌলানা শওকৎ আলি ও মৌলানা মহম্মদ আলি এবং স্বতন্ত্রভাবে গান্ধীজী সচেষ্ট ছিলেন। ২৪শে নভেম্বর, ১৯১৯, অখিল ভারতীয় খিলাফৎ পরিষদ্ গঠিত হল। তাতে হিন্দু মুসলমান সকলেই সম্মিলিত হল। পরিষদের সভাপতি রূপে গান্ধীজী যে বক্তব্য রাখেন, তার থেকেই এই সব প্রচেষ্টার পিছনে কী ধরনের মনোবৃত্তি কাজ করছিল তার কল্পনা করা যায়। তিনি বললেন, ''আমরা হিন্দু মুসলিম একতার কথা বলি। কিন্তু মুসলমানদের উপরে বিপত্তি এলে আমরা হিন্দুরা যদি পিছিয়ে পড়ি তাহলে একতার ঘোষণার অর্থ কী? কিছু লোকে বলে যে আমাদের মুসলমানদের শর্ত সাপেক্ষে সাহায্য করা উচিত, কিন্তু প্রকৃত সাহায্য তো নিঃস্বার্থ হওয়া উচিত।'' এই কথাগুলি মুসলমানদের হাতে 'ব্ল্যাংক চেক' তুলে দেওয়ার মত গান্ধীজীর নীতির ভূমিকা ছিল মাত্র। এর পিছনে একটিই মনোভাব কাজ করছিল যে যেমন করে হোক হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপন করতেই হবে। এই অতি উৎকট কল্পনার পিছনে এই আত্মবিশ্বাসহীন তথা দুর্বল মনোবৃত্তিও সক্রিয় ছিল যে হিন্দু সমাজ একাকী আত্ম-নির্ভর হয়ে ইংরেজদের সম্মুখীন হতে পারবে না।

হিন্দু মুসলিম ঐক্যই 'স্বরাজ্যের সমার্থক' — এইরূপ একটি ঐকান্তিক চিন্তাধারাই মহাত্মাজীর সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে ছিল। তিনি এই ঐক্য লাভের জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত — এ কথা আলি ভ্রাতৃদ্বয় খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই সদিচ্ছার সুযোগ নিয়ে নিজেদের সমাজকে জাগ্রত করার এবং হিন্দুদের সাহায্য নিয়ে ইংরাজদের শিক্ষা দেওয়ার শুধু স্বার্থপর ও সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা চলছিলেন। মহাত্মাজীর সামনে তো স্বরাজ্যের কল্পনা ছিল, কিন্তু আলি ভাইদের স্বরাজ্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁরা শুধু

"খিলাফৎ" নিয়ে মেতে ছিলেন, যার হিন্দুস্থানের ভালো-মন্দের সঙ্গে কোন সংস্রবই ছিলনা। এক জনের হৃদয়ে ছিল সরল রাষ্ট্রভক্তি, আর অপর পক্ষের মনে দেশের বাইরের নিষ্ঠা থেকে উৎপন্ন রাজনৈতিক কুটিলতা। মহাত্মাজী অহিংসার পূজারী ছিলেন, কিন্তু আলি ভ্রাতাদের মুখ থেকে খিলাফতের জন্য রক্তাক্ত বিপ্লবের হুংকার শোনা যেত। মহাত্মাজী ছিলেন সহিষ্ণুতার মূর্তি, তার বিপরীত আলি ভ্রাতাদের রূপ গ্রহণ করে ধর্মান্ধতাই সশরীরে বিচরণ করছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে মৌলানা মহম্মদ আলির জন্য 'most irrationally religious' অর্থাৎ 'একেবারে চূড়ান্ত যুক্তিহীনভাবে ধর্মান্ধ' — এই অত্যন্ত উপযুক্ত বিশেষণটি ব্যবহার করেছিলেন। এই পরস্পর বিরোধী প্রবৃত্তি দুইটির ১৯১৯ সালে মিলন ঘটেছিল। তাদের মধ্যে সমানতা শুধু এইটুকুই ছিল যে উভয়ই ঐক্য চাইছিল। কিন্তু এ কথাও বলতে হবে এই ঐক্য একটি স্বার্থপর সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির — অপর পক্ষের সততা-যুক্ত কিন্তু আত্মবিস্মৃত শ্রেণীর কাছ থেকে পুরোপুরি সুযোগ হাতিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে একটি চতুর চাল ছিল।

ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম একতার যখন ডুগডুগি বাজছিল তখন সে বিষয়ে ডাক্তার হেডগেওয়ারের দৃষ্টিভঙ্গী কী রকম ছিল সেটা জেনে নেওয়া দরকার। বিশ্বযুদ্ধের পরে বিপ্লবের মনোরথ ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও বিষণ্ণ না হয়ে তিনি কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সেই সময়ে মধ্যপ্রান্তের রাজনীতির সূত্র লোকমান্যের অনুগামীদের হাতে ছিল। ডাঃ বা শি মুঞ্জে, শ্রীনীলকণ্ঠরাও উধোজী, শ্রীনারায়ণরাও অলেকর, শ্রীনারায়ণরাও বৈদ্য, ব্যারিষ্টার মোরুভাউ অভ্যঙ্কর, শ্রীগোপালরাও ওগলে, ব্যারিষ্টার গোবিন্দরাও দেশমুখ, ডাঃ চোলকর, শ্রীভবানীশঙ্কর নিয়োগী, ডাঃ না ভা খরে, শ্রী বিশ্বনাথ রাও কেলকর, ডাঃ পরাঞ্জপে প্রমুখ ষোল জন মিলে রাষ্ট্রীয় মণ্ডল নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। এই মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত নেতাদের নাম দেখেই বোঝা যায় যে মধ্যপ্রান্তের এই সময়ের রাজনীতির সকল মহারথী তার মধ্যে সম্মিলিত হয়েছিলেন। কংগ্রেসের উপর তাঁদের এমন প্রভাব ছিল যে এই মণ্ডল যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত কংগ্রেস তাকেই গ্রহণ করে কাজ করত। ডাঃ হেডগেওয়ার এই 'রাষ্ট্রীয় মণ্ডল'-এর নেতাদের তুলনায় বয়সে তরুণ এবং তাঁদের থেকে উগ্র মনোভাব-সম্পন্ন ছিলেন। সেই সময়ে কংগ্রেসের মধ্যে "সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্বরাজ্য" অথবা "ঔপনিবেশিক স্বরাজ্য" ভাষাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু ডাক্তার হেডগেওয়ার নির্ভীকতার সঙ্গে "শুদ্ধ স্বাধীনতা"-এর কল্পনা জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপন করতে শুরু করলেন। সেই রকম, একমাত্র শান্তিপূর্ণ ও বিধিসম্পন্ন পথই স্বাধীনতা লাভের ন্যায়সঙ্গত পথ — এই সিদ্ধান্তের তিনি কঠোর বিরোধী ছিলেন। এই মত-পার্থক্য সত্ত্বেও যদিও তিনি রাষ্ট্রীয় মণ্ডলের সঙ্গে কাজ করতেন, তথাপি তিনি তার সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারেননি। ডাঃ মুঞ্জের স্নেহের কারণে ডাক্তারজী প্রথম দিকে মণ্ডলের সভা ও বৈঠকে অংশগ্রহণ করতেন, কিন্তু সেখানেও তাঁর এবং তাঁর গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ না হয়ে থাকতনা। অবশেষে 'রাষ্ট্রীয় মণ্ডল'-এর কয়েকজনের সহযোগিতায় ডাক্তারজী 'নাগপুর ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন' নামে একটি নূতন রাজনৈতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে

শ্রী বোবড়ে, শ্রী বিশ্বনাথরাও কেলকর, শ্রী বলবন্তরাও মণ্ডলেকর, শ্রী চোরঘড়ে প্রমুখ বন্ধুরা একত্র হয়েছিলেন। কিছু দিন পরে ডাঃ না. ভা. খরেও এতে সম্মিলিত হলেন।

এই সময়ে 'রাষ্ট্রীয় মণ্ডল'-এর পক্ষ থেকে 'সংকল্প' নামে একটি হিন্দী সাপ্তাহিক প্রকাশ করার কথা বিবেচনা করা হল। এর আগে 'মহারাষ্ট্র' নামে একটি মারাঠী সাপ্তাহিকের প্রকাশন শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই নতুন সাপ্তাহিকের একটি হিন্দী সংস্করণ মহাকোশলের হিন্দী ভাষী অঞ্চলের জন্য প্রকাশ করা প্রয়োজন বলে মনে করা হল। ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে এই কাজের জন্য ডাক্তারজীকে 'সংকল্প' সাপ্তাহিকের সংগঠক নিযুক্ত করা হল এবং এই কাজের জন্য তিনি চার-পাঁচ মাস মহাকোশলের সমগ্র অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তাঁর সঙ্গে 'নাগপুর ব্যায়ামশালার' প্রধান শ্রী অণ্ণা খোতও ছিলেন। এই পরিভ্রমণের সময়ে তিনি 'সংকল্প'-এর প্রচারের সঙ্গে মহাকোশলের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও গড়ে তোলেন। এই পরিচয় পরবর্তীকালে মহাকোশলে সঙ্ঘের কাজ আরম্ভের দিক থেকে অত্যন্ত লাভজনক বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

'সংকল্প' সাপ্তাহিকের প্রচারের জন্য ডাক্তারজী রায়পুরে গিয়ে অনেক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অধিকাংশ স্থানে যেখানেই তিনি যেতেন সেখানেই সাপ্তাহিকটি সাদরে গৃহীত হত। কিন্তু যখন তিনি শ্রী জ্ঞানরঞ্জন সেনের কাছে গেলেন এবং তাঁকে গ্রাহক হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন তখন শ্রী সেন বললেন, "আমার কাছে ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদপত্র আসে। তাই, হিন্দী সংবাদপত্রের কী দরকার?" এই কথা শুনে ডাক্তারজীর মনোভাব একটু কঠোর হল। তিনি বললেন, "আপনার সম্পূর্ণ জীবন এই হিন্দী ভাষা-ভাষী প্রান্তে কেটেছে, তাহলে এখানকার ভাষার সংবাদপত্র গ্রহণ করতে আপনার এত ভার কেন মনে হচ্ছে?" ডাক্তারজী এটুকুই বলেই থামলেন না, তিনি আরো বললেন, "হিন্দুস্থানে আমরা যে কোন প্রান্তে যাই না কেন, সে প্রান্ত আমারই মনে করা উচিত এবং সেখানকার জীবনের সঙ্গে একাত্ম হওয়া উচিত। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে এই প্রান্ত ছেড়ে চলে যান না কেন?" এই সরল-সহজ কথার পিছনে ভারতীয় একাত্মতার এমন গভীর অনুভূতি তথা আন্তরিকতা ছিল যে শ্রীজ্ঞানরঞ্জন তৎক্ষণাৎ এক বছরের চাঁদা ডাক্তারজীর হাতে দিয়ে 'সংকল্প' সাপ্তাহিকের গ্রাহক হয়ে গেলেন।

প্রায় এই সময়েই ডাক্তারজী আর্বীতে গিয়েছিলেন সেখানে একদিন বিকেলে শ্রী গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি ডাক্তারজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সেই সময়ে শ্রীদেশপাণ্ডেকে চিন্তিত অবস্থায় দেখে ডাক্তারজী তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জবাব দিলেন, "ভাগ্নীর চিঠি এসেছে যে তার কাকা তাকে এক বুড়োর গলায় ঝুলিয়ে দিতে যাচ্ছেন।" এই কথা শুনে ডাক্তারজীর মনও অশান্ত হয়ে উঠল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে আপনার কী ইচ্ছা?" যদি আপনি তার বিয়ের খরচ বহন করতে রাজী থাকেন, তাহলে আমি দেখতে পারি কী করা যায়?" দেশপাণ্ডে যেন ভগবানেরই ভরসা পেয়ে গেলেন। তিনি "হ্যাঁ" বলে দিলেন। ডাক্তারজী তাঁর বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বিবাহের কিছুক্ষণ আগে নাগপুর পৌঁছলেন এবং একজন উপযুক্ত ব্যক্তির মাধ্যমে ঐ মেয়েটির কাছে

সংবাদ পাঠালেন যে "গায়ে হলুদের সময়ে গঙ্গাধররাও মোটর গাড়ী নিয়ে যাবেন এবং ঐ সময়ে তুমি তাঁর সঙ্গে চলে যাবার জন্য তৈরী থাকবে।" বাজনা বাজিয়ে গায়ে-হলুদের জন্য যখন মেয়েকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন পূর্ব-সংকেত অনুসারে সেই মোটরগাড়ী এল এবং গঙ্গাধররাও মেয়েটিকে গাড়ীতে বসিয়ে আর্বীতে নিয়ে এলেন। পরে এই নিয়ে মামলা-মকদ্দমাও চলল, কিন্তু সেই বুড়োর সঙ্গে বিয়ের হাত থেকে মেয়েটি রেহাই পেল। এর পর একটি ভাল উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ সম্পন্ন হল।

নাগপুরে ছাত্রদের সভায় ডাক্তারজীর বক্তৃতার ব্যবস্থা হত, সেই কারণে ছাত্রদের সঙ্গে ডাক্তারজীর খুব ভালো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হল। ছাত্ররা ডাক্তারজীর বাড়ীতেও যাতায়াত শুরু করে দিল। সমাজে রাষ্ট্রীয় মহাপুরুষদের জীবন-চরিতের ভিত্তিতে জাগৃতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি "রাষ্ট্রীয় উৎসব মণ্ডল" প্রতিষ্ঠিত হল। ডাক্তারজী এই মণ্ডলের সম্পাদক রূপে বেশ কয়েক বছর কাজ করেন। মণ্ডলের পক্ষ থেকে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জন্ম ও রাজ্যাভিষেক দিবস, গণেশোৎসব, রামনবমী, শস্ত্রপূজন, মকর সংক্রান্তি ইত্যাদি প্রধান-প্রধান উৎসব ও পর্বের অনুষ্ঠান হত। সেই উপলক্ষে ডাঃ মুঞ্জে, শ দা পেণ্ডসে, খাপর্ডে, লোকনায়ক অণে ইত্যাদির বক্তৃতার আয়োজন করা হত। শ্রী ছত্রপতি শিবাজী ও রামদাস উভয়ই ডাক্তারজীর প্রেরণাদাতা ছিলেন। এই সব উৎসবে তাঁর অত্যন্ত ওজস্বী ভাষণ হত। ডাক্তারজীর মিত্র-মণ্ডল ক্রমেই বৃদ্ধি লাভ করছিল। তাঁর বন্ধুদের বৈশিষ্ট্য ছিল যে তাঁরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতেন এবং নানা ধরনের অভিমত পোষণ করতেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে দুই ভিন্ন মত-পোষণকারীদের মধ্যে বন্ধুত্ব বজায় থাকেনা, আর থাকলেও তার ওপর-ওপর লোক-দেখানো সম্পর্ক মাত্র থাকে। আজকাল তার থেকেও অগ্রসর হয়ে নিজের সুরের সঙ্গে যার সুর মেলে না, তাদের চার হাত দূরেই রাখা এবং তাঁদের সম্বন্ধে সত্যমিথ্যা সব রকম নিন্দে-মন্দ করা ও উপেক্ষা করার মত অসহিষ্ণু মনোভাব দুর্ভাগ্যক্রমে সমাজের মধ্যে প্রচলিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু ডাক্তারজীর স্নিগ্ধ বন্ধুত্বের ছায়ার তলায় নরম-গরম সব রকম মতাবলম্বী সুখে ও সানন্দে এসে মিলিত হতেন। ধনবানরাও সেখানে এসে মজে যেতেন, আর দরিদ্রতর ব্যক্তিরা তো সেটাকে নিজেদের আশ্রয়-স্থল বলেই মনে করতেন। তিনি তাঁর ভালবাসা দিয়ে বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিদের খোলাখুলিভাবে উন্মুক্ত হৃদয়ে নিজেদের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এই মেলামেশার সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে শরৎ-পূর্ণিমার দিন ডাক্তারজীর নিমন্ত্রণে সকলেই তাঁর গৃহে সমবেত হতেন। যুদ্ধকালের শেষে কিছুটা ব্যাহত হওয়ার পরে ১৯২৫-২৬ পর্যন্ত শরৎ-পূর্ণিমার মিত্র-সম্মেলন অখণ্ড রূপে অব্যাহত ছিল এবং নাগপুরের রাজনৈতিক বাতাবরণে যা অন্যত্র সহসা দেখা যেতনা, এমন সহযোগিতা তথা সৌহার্দ্যের মনোভাব সৃষ্টিতে এই মিত্র-সম্মেলনের বিরাট অবদান ছিল।

ভারতে কোজাগরী শরৎ পূর্ণিমা অত্যন্ত আনন্দের পর্ব রূপে পালন করা হয়। এই প্রসন্ন জ্যোৎস্না রাতে ডাক্তারজীর সত্তর-আশিজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে রাজা লক্ষ্মণ রাও ভোঁসলে, ডাঃ মুঞ্জে প্রমুখ সেকালের বিশিষ্ট ও প্রধান ব্যক্তিরাও সম্মিলিত হতেন। ফুটিয়ে ঘন করা

কেশর বা জাফরান মিশ্রিত দুগ্ধ বিতরণের পূর্বে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা চলত। এইরূপ আনন্দ-মিলনের সময়ে হাসি-ঠাট্টা চলা স্বাভাবিকই। সেই সময়ে প্রত্যেকের কথাবার্তা ও ব্যবহার লক্ষ্য করে ডাক্তারজী তাঁদের স্বভাব পরখ করতেন। কখনো-কখনো, বিগত কার্যক্রম ও আন্দোলনগুলির বিষয়ে পর্যালোচনা করা হত এবং এর পরে কী করণীয় সে সম্বন্ধে চিন্তা করে সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হত। কার্যক্রমের শেষে দুগ্ধ সেবন ও পান-সুপারির পরে ডাক্তারজী সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলতেন না। তাঁর বক্তৃতা ভোজনের পরে এলাচ-লবঙ্গ দেবার মতই ছোট কিন্তু অর্থবহ এবং চিন্তা উদ্রেককারী হত। একবার সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করার পর ডাক্তারজী বিখ্যাত শ্রমিক নেতা শ্রীরামভাউ রুইকরের দিকে ঘুরে বললেন, ''এখন আমাদের মধুর ও আনন্দপূর্ণ কার্যক্রম শেষ হচ্ছে। এবার দুধের কড়া ও বাসন পরিষ্কার করার কাজ আমার বন্ধু রামভাউ রুইকর করবেন, কারণ তিনি শ্রমিক নেতা। এই তীক্ষ্ণ পরিহাস শুনে সকলেই অট্টহাস্য করে উঠলেন। রাজনৈতিক মত-পার্থক্যের ফলে উৎপন্ন সংঘাতের তীব্রতা এই ধরনের সম্মেলনে হ্রাস পেত এবং নতুন ও পুরাতন প্রজন্মের নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক চিন্তার আদান-প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হত।

সরকারের নীতির দরুন দেশের বাতাবরণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। 'খিলাফৎ আন্দোলন' তথা মহাত্মা গান্ধী যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন, তার ফলে পরিস্থিতি দিনের পর দিন আরো অশান্ত হয়ে উঠছিল। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ইংরেজরা 'শান্তি দিবস' পালনের আদেশ দিয়েছিল, কিন্তু সেই আদেশকে উপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে নাগপুরের নেতারা সেই দিনই সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস পালনের জন্য জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানান। এরজন্য প্রচারিত পরিপত্রে ডাক্তারজীও স্বাক্ষর করেন।

''আমরা কি শান্তি দিবস পালন করতে পারি?'' এই রূপ তীক্ষ্ণ ছিল পরিপত্রের শীর্ষক। সে বছর ডাক্তারজীও কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে যোগদান করতে গিয়েছিলেন। অধিবেশনের সময়ে তিনি জালিয়ানওয়ালা বাগ পরিদর্শন করতে ভোলেননি। অধিবেশনের আলোচনা দেখে উপলব্ধি করতে অসুবিধা হলনা যে সাধারণভাবে গান্ধীজীর চিন্তাধারা উপস্থিত সদস্যদের সমর্থন লাভ করবে।

এই অধিবেশনের পূর্বেই 'খিলাফৎ আন্দোলন'-এর সহিত গান্ধীজীর গাঁটছাড়া বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। এই কারণে মহাত্মাজী ১৯১৯ সালের ২৪শে নভেম্বর হিন্দু মুসলমানদের অখিল ভারতীয় সংযুক্ত 'খিলাফৎ আন্দোলন' সমর্থন করে হিন্দুদের নিঃস্বার্থভাবে মুসলমানদের সাহায্য করার দাবী জানান। এই রূপ পরিবেশেই ১৯২০ সালের কংগ্রেস অধিবেশন নাগপুর করা হবে বলে স্থির হয়। এবং তার প্রস্তুতি জোর কদমে শুরু হয়ে যায়। ১৯০৭ সালে নাগপুরের নেতারা লোকমান্য তিলকের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে গরম ও নরম দল দুইটির মধ্যে মারামারি হওয়ার পর কংগ্রেসের উপর নরম দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ফলে নাগপুরের নেতাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি। সেই সঙ্গে সুরাতের ঝামেলাও সৃষ্টি হয়েছিল। সেবার যে সুযোগ হাতছাড়া হয়েছিল, এবার সেটা সফল করতেই হবে এই সংকল্প নিয়ে নাগপুরের

আসন্ন অধিবেশনের জন্য এক নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়েছিল।

ডাঃ লা বা পরাঞ্জপের নেতৃত্বে ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে 'ভারত স্বয়ংসেবক মণ্ডল' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মণ্ডলের উদ্দেশ্য ছিল সার্বজনীন কার্যসমূহকে সুব্যবস্থিত রূপে চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান। ডাক্তারজী এই মণ্ডলে পরাঞ্জপের সহকারীর দায়িত্ব পেয়েছিলেন। একই সময়ে মধ্যপ্রান্তে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে প্রচার-ভ্রমণও শুরু হল। ১৯২০ সালের মে মাসের ভ্রমণের প্রতিবেদনে 'মহারাষ্ট্র' লেখে, "যেখানে-যেখানে ভ্রমণ হল, সেখানেই গ্রামের লোকেরা নিজের গ্রামকে সাজিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করে। কিষান ভাইয়েরা যে উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করে তা ছিল অপূর্ব। ডাঃ মুঞ্জে, ডাঃ হেডগেওয়ার, গণপতিরাও যোশী এবং বাবাসাহেব দেশপাণ্ডের বক্তৃতা অত্যন্ত প্রভাব সৃষ্টি করে। এই ভ্রমণ উপলক্ষে ছাব্বিশ দিনে সাতাশটি স্থান পরিদর্শন করা হয় এবং প্রায় পনের-ষোল হাজার জনতার সম্মুখে এই নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। এইসব জনসভায় কখনো ডাঃ মুঞ্জে আবার কখনো ডাঃ হেডগেওয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করতেন।

এই প্রচার ভ্রমণের সঙ্গে-সঙ্গে জুলাই মাসের কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য হাজার-বারোশো স্বেচ্ছাসেবক ভর্তি করার কাজও শুরু হয়ে গেল। স্থির হল যে স্বেচ্ছাসেবকরা নিজেদের পোশাক বা ইউনিফর্ম নিজেরাই তৈরী করিয়ে নেবে। সে সময়ে এইভাবে স্বেচ্ছাসেবক ভর্তির পদ্ধতি নতুন হওয়ার দরুন চারিদিকে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল যে এই ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যবস্থা স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন হবে। তখন একটি পরিপত্র প্রকাশ করে জানানো হল যে "এই স্বেচ্ছাসেবকরা শুধু অধিবেশনের সময়ের জন্য নয়, তাদের দলকে স্থায়ীভাবে রাখা হবে।" পরিপত্রে আরো লেখা হল যে, গণবেশ সংক্রান্ত এই নিয়ম গরীবদের পথে অন্তরায় সৃষ্টির জন্য রাখা হয়নি। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হবার পরেও এই নতুন স্বেচ্ছাসেবকদের দলকে স্থায়ীভাবে রেখে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। .... গ্রামে-গ্রামে আমাদের রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিকে সাহায্য করার এবং সভা ও শোভাযাত্রাগুলিতে যথাযথ ব্যবস্থা বজায় রাখার প্রয়োজনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে তৈরী রাখা আবশ্যক।"

চতুর্দিকে যখন পরম উৎসাহে অধিবেশনের প্রস্তুতি চলছে, তখনই ৩১শে জুলাই অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হল। ভারতের মুকুটহীন সম্রাট লোকমান্য তিলক বম্বেতে অল্পদিন অসুস্থ থাকার পর ৩১ শে জুলাই রাত্রে গোলোকবাসী হয়েছেন। সমগ্র দেশ দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হল। আর নাগপুরবাসীদের দুঃখের তো কোন সীমাই রইল না। সেই সময়ে শ্রীঅচ্যুৎ বলবন্ত কোল্হটকর লিখেছিলেন যে "লোকমান্য তিলক সভাপতি হবেন এর জন্য নাগপুরের লোকেরা বারো-তেরো বছর ধরে তপস্যা করছিলেন। ১৯২০ সালে দুর্ভাগ্যবশতঃ তা ব্যর্থ হয়ে গেল। লোকমান্য করাল কবলিত হলেন। 'তিনিই সভাপতি হোন, তিনিই সভাপতি হোন' এই জপমালা যখন নাগপুর কংগ্রেস জপছিল, ঠিক তখনই লোকমান্যের স্বর্গবাস হওয়ায় ধরিত্রীর দশ দিকেই ঘোর অন্ধকার ছেয়ে গেল।"

লোকমান্যের দেহাবসানের সংবাদ শুনেই ডাক্তারজী ডাক্তার মুঞ্জের গৃহে গেলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে পাঁচ-ছ জন স্কুলের ছাত্র বল খেলছিল। তাদের দেখে ডাক্তারজীর একটু

রাগ হল। তিনি বললেন, ''আরে? লোকমান্যের মৃত্যু হয়েছে, আর তোমরা খেলা করছ।'' এই কথা শুনে দু-এক জন ছেলে কিছু তর্কাতর্কি আরম্ভ করল, কিন্তু ডাক্তারজী তাদের দিকে এমন চোখে তাকালেন যে তারা একেবারে চুপ করে গেল। তাদের কথা থামিয়ে তারা খেলা বন্ধ করে বাড়ী চলে গেল। সেই সময়ে ডাক্তারজীর প্রশ্ন একজন তরুণের মনকে এমন গভীরভাবে স্পর্শ করল যে পরবর্তীকালে তাঁর জীবনপ্রবাহই বদলে গেল। ক্রীড়ারত এই তরুণ, ডাক্তারজী কর্তৃক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পরে প্রচার-কার্যে আত্ম-নিয়োগ করেন। তাঁর নাম দাদারাও পরমার্থ।

লোকমান্যের মৃত্যুর দশমদিন সোমবার, ৯ আগস্ট নাগপুরে হরতাল, শোকসভা, শোকযাত্রা ইত্যাদি কার্যক্রমের আয়োজনে এবং তাকে সফল করার ব্যাপারে ডাক্তারজী অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন। এই সময়ে ১১ই আগস্ট থেকে ১৮ই আগস্ট নাগপুরে অসহযোগ-সপ্তাহও পালন করা হয়। এই সপ্তাহে জনসাধারণ কীভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং কী কী কার্যক্রম করবে এ বিষয়ে দিক্-নির্দেশক একটি পরিপত্র প্রকাশ করা হয়। ঐ পরিপত্রে ''নন-কোঅপরেশন বোর্ড''-এর সম্পাদক রূপে যে চারজন স্বাক্ষর করেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন ডাক্তারজী।

লোকমান্যের মৃত্যুর দিনই 'খিলাফৎ সমিতি' দ্বারা ইংরেজ সরকারকে দেওয়া চূড়ান্ত সময়-সীমা শেষ হয়েছিল, এবং অসহযোগ-পর্ব শুরু হয়ে গেল। সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ইত্যাদি প্রান্তে মুসলমানদের মধ্যে এই চিন্তা পরিব্যাপ্ত হল যে ইংরেজ রাজত্ব হল অমুসলমানদের, সেই কারণে হিন্দুস্থান 'দার-উল-হরব' (যুদ্ধভূমি)। এই রাজ্যে থাকা ইসলাম-বিরুদ্ধ, সুতরাং এখান থেকে 'হিজরত' করে 'দার-উল-ইসলাম' অর্থাৎ আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশে চলে যাওয়া উচিত। এর ফলে কিছু দিনের মধ্যেই প্রায় আঠার হাজার মুসলমান তাদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে আফগানিস্তানের দিকে রওনা হয়ে যায়। তাদের এই 'হিজরত'-এর কার্যক্রমের প্রতি তৎকালীন 'খিলাফৎ সমিতির' নেতাদের আশীর্বাদ ছিল। কিন্তু হিন্দুস্থানের মুসলমানদের এই ধর্মীয় গোঁড়ামি তথা 'হিজরত'-এর মনোভাব অন্য দেশের লোকেরা বুঝতে পারলনা। দেশের বাইরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে কাবলীরা তাদের উপর আক্রমণ চালায়। 'দার-উল-ইসলাম'-এর স্বপ্ন নিয়ে যারা গিয়েছিল সেই মুসলমানরা বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে পড়ল। তাদের যথাসর্বস্ব নিজেদেরই ধর্মীয় আক্রমণকারীদের হাতে সঁপে দিয়ে প্রাণ নিয়ে যেমন-তেমন করে তারা পালিয়ে এল।

লোকমান্য তিলকের দেহাবসানের পর 'খিলাফৎ সমিতির' অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন কলকাতায় আহ্বান করা হল। এই অধিবেশনে তিলকের অনুগামীরা পিছিয়ে পড়ল এবং অসহযোগপন্থী গান্ধীজীর আধিপত্য কংগ্রেসের উপর প্রতিষ্ঠিত হল। এর ফলে কংগ্রেস 'খিলাফৎ সমিতি' কর্তৃক প্রয়াগ অধিবেশনে গৃহীত অসহযোগ-এর কার্যসূচী গ্রহণ করে।

কলকাতা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির প্রবণতা দেখে নাগপুরের কর্মকর্তারা চিন্তা করলেন যে অন্ততঃ নাগপুর অধিবেশনের জন্য এমন একজন ব্যক্তিকে সভাপতি করা প্রয়োজন যাঁর

চিন্তাধারা তিলকবাদীদের অনুরূপ এবং সেই স্তরের হবে। এই চিন্তার পরে শ্রী অরবিন্দ ঘোষের নাম সকলের মনঃপুত হল। ঠিক হল যে একবার ডাঃ মুঞ্জে সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করুন। ১৯১০ সাল থেকে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরিতে অধ্যাত্মচিন্তণে নিমগ্ন ছিলেন। কিন্তু তিনি তিলকের মতবাদের অনুরূপ মনোভাব পোষণ করতেন এবং ইংরেজদের রাজ্যসত্তার সম্পূর্ণ উচ্ছেদের সমর্থক ছিলেন। অতএব, তিলকজীর মৃত্যুর পর কংগ্রেসের গরম দলের অবস্থা উপলব্ধি করে তিনি পুনরায় রাজনীতিতে পদার্পণ করতে রাজি কিনা তা যাচাই করা আবশ্যক বলে মনে করা হয়।

ডাঃ মুঞ্জে যোগী অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত ডাক্তার হেডগেওয়ার এবং তাঁর অন্য বিপ্লব-পন্থী সঙ্গীদেরও খুব পছন্দ হল। ডাঃ মুঞ্জের সঙ্গে নাগপুরের তরুণদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ডাক্তার কেশবরাও হেডগেওয়ারও পণ্ডিচেরি গেলেন। পণ্ডিচেরির এই সাক্ষাৎকার মনে হয় ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

ঋষি অরবিন্দের সহিত সাক্ষাতের জন্য যখন এঁরা দুজনে ট্রেনে যাচ্ছিলেন তখন একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনাটি হিন্দু সমাজের অন্তরে যে স্বাভাবিক তথা দৃঢ় বদ্ধমূল দেশভক্তিকে প্রকট করে তার উল্লেখ করা এখানে উপযুক্ত হবে। ডাঃ মুঞ্জে ঐ ট্রেনের প্রথম শ্রেণীতে এবং ডাক্তার হেডগেওয়ার তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করছিলেন। পথে কোন স্টেশনে ট্রেন থামলে ডাক্তারজী ডাঃ মুঞ্জের কামরায় গিয়ে তাঁর কিছু জিনিষের প্রয়োজন আছে কিনা জেনে নিতেন। মাদ্রাজের আগে যখন ট্রেন থামল তখন ডাক্তারজী ডাঃ মুঞ্জের কামরায় গিয়ে তাঁর বিছানা বাঁধতে লাগলেন। তাঁর কাজ পুরো হবার আগেই গাড়ী ছেড়ে দিল। সেই কারণে তিনি তাঁর তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ফিরে যেতে পারলেন না। ঘটনাক্রমে ঠিক সেই সময়ে টিকিট পরীক্ষক তাঁদের কামরায় উঠে এল। কেশবরাও-এর কাছে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট দেখে সে তাঁর কাছে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণের জন্য অতিরিক্ত ভাড়া ও জরিমানা দাবী করল। ডাঃ মুঞ্জে তার কাছে বাস্তবিক অবস্থা বলেন এবং বোঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে তার নিয়ম থেকে নড়তে প্রস্তুত ছিলনা এবং বেশ জোর দিয়ে তার ন্যায্য অর্থ দাবী করতে থাকে। তার এরকম ব্যবহার ডাঃ মুঞ্জে কেমন করে সহ্য করবেন। তিনিও কঠিন স্বরে ধমক দিয়ে বললেন, "যা, তোকে একটা পাইও দেওয়া হবেনা। মনে রেখ, তুমি চাকর আর আমরা তোমার মালিক।" বেচারা টিকিট পরীক্ষক আগে এরকম কোন যাত্রী দেখেনি। সাধারণতঃ ধরা পড়ার পর মানুষ অনুনয়-বিনয় করে থাকে। কিন্তু ডাঃ মুঞ্জের কথা শুনে সেও বিক্ষুব্ধ হয়ে বলে ওঠে, "আমার ওপর মেজাজ দেখাবেন না। মনে রাখবেন, এটা মুসলমানদের দেশ নয়।" ডাঃ মুঞ্জের উঁচু গোল কালো টুপি আর লম্বা দাড়ি এবং কেশবিহীন মাথা দেখে সে তাঁকে মুসলমান মনে করে বসেছিল। তার কথা শুনে দুই ডাক্তারই মনে-মনে হাসলেন। তাঁদের মনে এক প্রকার তৃপ্তির অনুভব হল। সেই সময়ে চতুর্দিকে এই কথাই প্রচলিত ছিল যে হিন্দুস্থানে বসবাসকারী সবাই এই দেশের মালিক। কিন্তু সংঘাতের উপক্রম হলেই হিন্দু মনের দেশভক্তি কিরূপ জাগ্রত হয় এবং এই দেশ যে কেবল হিন্দুদের এই

ইতিহাস-নিষ্ঠ সত্য কেমন নির্ভীকভাবে মুখে এসে পড়ে, তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখে তাঁদের হৃদয় আনন্দ-বিভোর হয়ে উঠল। প্রবাস-কালে এই ঘটনা ডাক্তারজীর মনের মধ্যে এমন গভীর দাগ কেটেছিল যে তিনি হিন্দুদের স্বতঃপ্রমাণিত রাষ্ট্রীয়তার বিষয়ে আলোচনা করার সময়ে এই ঘটনার উল্লেখ করতেন।

পণ্ডিচেরিতে ডাক্তারজী চার-পাঁচ দিন ছিলেন। তখন, ঋষি অরবিন্দের সম্মুখে দেশের পরিস্থিতি বর্ণনা করে তাঁকে নেতৃত্ব গ্রহণের আগ্রহ নিশ্চয়ই করে থাকবেন। সেই আলোচনার সময়ে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের না পেয়ে সে সময়ে কী কী কথা হয়েছিল তার পুরো বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরি ত্যাগ না করার সিদ্ধান্তের কোন নড়-চড় হয়নি। এর পূর্বেও তাঁকে রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস অনেকেই করেছিলেন। ১৯২০ সালে স্বয়ং লোকমান্য তিলকের অনুরোধে শ্রীজোসেফ ব্যাপ্টিস্টা একটি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সম্পাদনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা জানান। তার উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন "আমার সামনে এত বিরাট কাজ পড়ে রয়েছে যে এখনই সরকারের অতিথি হয়ে সময় নষ্ট করার এতটুকু ইচ্ছে আমার নেই। ভারতের জন্য আমার যা করার তা আমি নিজের মত করে করছি। আমার মনোগত ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার আগে আমি কোন দায়িত্বই নিজের মাথায় নিতে পারছিনা। ভারতে ফিরে গেলে অনেক ব্যাপারে হাত দিতে হবে।" এই ধরনের উত্তরই ডাক্তারজীকেও তিনি দিয়েছিলেন বলে মনে হয়।

১০ই অক্টোবর নাগপুরে অভ্যর্থনা সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে সভাপতি পদের জন্য বারোটি প্রদেশের মধ্যে ছয়টি প্রদেশ শ্রী বিজয়রাঘবাচার্যের নাম প্রস্তাব করে। সিন্ধু শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, বাংলা ব্যারিস্টার চক্রবর্তী এবং অন্ধ্র মোহম্মদ আলির নাম পাঠিয়েছিল। এই সময়ে ডাক্তারজীর ধ্যেয়নিষ্ঠা কত বিশুদ্ধ ও কঠোর ছিল তা উপলব্ধি করা গেল। ডাঃ মুঞ্জে সভার নিকট প্রস্তাব রাখেন যে ছয়টি প্রান্ত থেকে শ্রী বিজয়রাঘবাচার্যের নাম এসেছে, সুতরাং আমাদের সেই নামই গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু ডাক্তার হেডগেওয়ার এর বিরোধিতা করে বলেন, "বিজয়রাঘবাচার্য কিছু দিন আগেই গভর্নরের পার্টিতে গিয়েছিলেন। যাঁর গায়ে একটুও দাগ লেগেছে তাঁকে আমাদের কংগ্রেসের সভাপতি রূপে নির্বাচিত করা উচিত নয়। অতএব, সেই স্থানে বাংলার শ্রী চক্রবর্তীর নামের সুপারিশ করে নির্বাচনের এই কাজ অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নিকট প্রেরণ করা উচিত।" অবশেষে, যেমন-তেমন করে শ্রী বিজয়রাঘবাচার্য জয়ী হলেন। ডাক্তারজী নিজের সম্মতি না থাকলে সরাসরি তা প্রকাশ করে দিতেন। প্রান্তীয় কংগ্রেসের বৈঠকে বহুবার তাঁর মতভেদ দেখা যেত। কিন্তু এই মতভেদের পিছনে তাঁর চিন্তার বিশুদ্ধতা তথা সততাই ছিল তার কারণ। সেই সঙ্গে অনুশাসনের প্রতিও তাঁর অত্যন্ত দৃঢ়তা ও আস্থা ছিল। ২৮শে নভেম্বরের বৈঠকে প্রান্তীয় কংগ্রেস বারো জনকে অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির জন্য মনোনীত করে। সেই সময়েও তিনি বলেন, ".....প্রান্তীয় কংগ্রেস কমিটির যে সদস্যরা জনমতকে উপেক্ষা করে কাউন্সিলের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করা উচিত নয়।" কিন্তু রাজনীতির মধ্যে যে

সুযোগ-সন্ধানীর মনোবৃত্তি প্রবেশ করেছিল সে এই বিশুদ্ধতা তথা অনুশাসনের কথা কেমন করে সহ্য করবে?

নাগপুর কংগ্রেসের সঙ্গেই 'অখিল ভারতীয় মহাবিদ্যালয়ীন বিদ্যার্থী পরিষদ্'-এর আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নাগপুরের ছাত্ররা তাঁদের এক বিরাট সভায় গ্রহণ করেন। এই পরিষদের প্রচারের জন্য শ্রী রামভাউ গোখলে সরকারী চাকুরী থেকে পদত্যাগ করে চারিদিকে পরিভ্রমণ শুরু করে দেন। 'ইয়ং প্যাট্রিয়ট'-এ এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়া মাত্রই ডাক্তারজী তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সীতারামজীর মাধ্যমে রামভাউ-এর পিতার গৃহের পরিস্থিতি এবং তাঁর পদত্যাগের ফলে তাঁর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেন। রামভাউ নিজের নতুন কাজের ব্যাপারে সর্বপ্রথম বোম্বাই গেলেন এবং গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বিভিন্ন প্রান্তের প্রমুখ ব্যক্তিদের নামে পরিচয় পত্র লিখে দেবার অনুরোধ করেন। কিন্তু গান্ধীজী পরিচয় পত্র লিখে দিতে অস্বীকার করেন। এতে রামভাউ ক্ষুব্ধ হয়ে নাগপুরে ফিরে এলেন এবং ডাক্তারজীকে সব কথা বললেন। ডাক্তারজীর স্বভাব ছিল যে যদি কোন ব্যক্তি নিজ প্রেরণায় কাজ করতে এগিয়ে আসে তাহলে তাকে সবরকম সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া উচিত। তিনি রামভাউকে আশ্বস্ত করেন এবং দিল্লী, কলকাতা, ঢাকা, মৈমনসিংহ, পাটনা, বারাণসী, প্রয়াগ ইত্যাদি স্থানের জন্য পরিচয় পত্র দিয়ে পরিষদের প্রচারের জন্য যেতে উৎসাহিত করেন। এ বিষয়ে শ্রী গোখলে লেখেন, "ডাক্তারজী পরিভ্রমণের জন্য তাঁকে রেশমী পাগড়ি দিলেন এবং ভ্রমণকালে নিজেদের উদ্দেশ্যের কী ভাবে প্রতিপাদন করতে হবে সে বিষয়ে তথ্যাদিও প্রদান করেন। সেগুলির দ্বারা আমার যে কত উপকার হয়েছিল শব্দের দ্বারা তা প্রকাশ করা কঠিন।"

কংগ্রেসের অধিবেশন ২৬শে ডিসেম্বর আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল। তার আগে প্রান্তীয় কংগ্রেস সমিতি একটি অসহযোগ মণ্ডল নিযুক্ত করে। সেই মণ্ডলে ডাক্তারজীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সভাগুলির বিষয় নিশ্চিত করা এবং সেগুলির আয়োজন করার কাজ প্রধানতঃ তাঁর উপর অপর্ণ করা হয়। রাষ্ট্রের স্বাধীনতার জন্য ডাক্তারজীর যেমন হিংসার প্রতি অনীহা ছিলনা, তেমনই উদ্দেশ্য-পূরণের স্বার্থে অসহযোগের প্রতিও তাঁর সহযোগিতার অভাব ছিলনা। বিদেশীদের যে কোন পন্থায় বিতাড়িত করতে উদ্যোগী ব্যক্তিদের জন্য ডাক্তারজী গর্ব অনুভব করতেন এবং সেই কারণে তাঁদের সঙ্গে তিনি যথাসাধ্য সহযোগিতা করতেন। এমনিতেই ডাক্তারজী ও তাঁর সহযোগীদের বিধানসভার মাধ্যমে স্বাধীনতা-লাভের পন্থার প্রতি বিশ্বাস ছিলনা। অতএব, মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড সংস্কারসমূহের প্রতি তাঁদের অসহযোগিতার নীতির মধ্যে আপত্তি করার মত কোন কিছু ছিলনা। নরম নীতি গ্রহণকারী কংগ্রেসের প্রতি সহযোগিতার নীতি গ্রহণের পিছনে ডাক্তারজীর আর তাঁর সহযোগীদের অন্য একটি উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সেই কালে সরকারের যাকেই বিপ্লবী বলে সন্দেহ হত তার পিছনেই গোয়েন্দারা ছায়ার মত লেগে থাকত। সরকারের দৃষ্টিতে সৌম্য তথা অহিংসার বুলি যারা অখণ্ডভাবে আওড়াত, কেবল সেই কংগ্রেসই এমন একটি আন্দোলন ছিল, যার সঙ্গে মিশে থাকলে সরকারী ব্যক্তিদের মনে এই বিশ্বাস সম্পাদন করা যেতে পারে যে, এরাও অহিংসার

পথের অনুগামী হয়ে পড়েছে। এই বিশ্বাসের ফলে সরকারের মনের সন্দেহ দূর হয়ে গেলে অন্যান্য কাজ করার ব্যাপারে অনেক ঝামেলা এড়ানো সম্ভব হতে পারে।

কংগ্রেস অধিবেশনের কয়েক দিন আগে ডাক্তার হেডগেওয়ার, শ্রী বলবন্তরাও মণ্ডলেকর ইত্যাদি ব্যক্তিরা নাগপুরের 'বেঙ্কটেশ নাট্যগৃহে' একটি সভা করে ''বিশুদ্ধ স্বাধীনতাই আমাদের উদ্দেশ্য'' — এই মর্মে ঘোষণা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কংগ্রেসও অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করুক এই কথা বলার জন্য এঁদের মধ্যে চার জন গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন। গান্ধীজী তাঁদের কথা শুনে শুধু এই মন্তব্য করেন যে স্বরাজ্যের মধ্যে বিশুদ্ধ স্বাধীনতার সমাবেশ হয়ে যায়।

২৬শে ডিসেম্বর কংগ্রেস অধিবেশন আরম্ভ হল। আজকাল 'কংগ্রেস নগর' নামে নাগপুরে যে পল্লীটি বিখ্যাত, সেখানেই অধিবেশনের মণ্ডপ তৈরী করা হয়েছিল। ''এই স্থানে ১৪৫৮৩ জন প্রতিনিধি, তিন হাজার স্বাগত সমিতির সদস্য এবং সাত-আট হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন'' — এই প্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়। সংখ্যার দিক থেকে এই অধিবেশন ছিল বিগত সকল অধিবেশন থেকে বৃহত্তম। কংগ্রেসের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে এই অধিবেশন এত বড় ছিল যে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সমস্ত অধিবেশনই এর কাছে ছিল অকিঞ্চিৎকর। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান হিসাবে ডাঃ পরাঞ্জপে ও ডাঃ হেডগেওয়ারকে এত লোকের ব্যবস্থা করার জন্য অত্যধিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। খাকি গণবেশ ও পাগড়ি বেঁধে স্বেচ্ছাসেবকদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু সঞ্চলন তথা অভ্যাসের অভাবে তাদের শরীরের অনুশাসনের কোন রকম শিক্ষা ছিলনা। অতএব, প্রতিনিধিদের সবরকম ব্যবস্থা করার সঙ্গে-সঙ্গে এই স্বেচ্ছাসেবকদের সামলানো একটা বড় কাজ ছিল যার জন্য ডাক্তারজীকে খুবই খাটতে হত। ডাক্তারজী ভোজন-ব্যবস্থা ও বসতিগৃহের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। সংখ্যা ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এমন উত্তম ব্যবস্থা করেছিলেন যে সকলের মুখে-মুখে শুধু প্রশংসার শব্দই শোনা গেল। ব্যবস্থার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর সেবাভাব ও বিনম্রতা দেখে প্রত্যেক প্রতিনিধি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেই সময়ে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হল তার থেকে স্বয়ংসেবক কেমন হওয়া উচিত এবং তাদের কীভাবে গড়ে তোলা যায় এই চিন্তাও তাঁর মনকে আন্দোলিত করতে থাকে। সেই সময়ে এইরকম পদ্ধতি প্রচলিত ছিল যে কাজের জন্য প্রয়োজন হলে কিছু তরুণদের একত্র করে এবং যে যেমন স্বভাব বা অভ্যাসেরই হোক না কেন তাকে সেইভাবেই গ্রহণ করে চালিয়ে নেওয়া হত এবং কাজ মিটে গেলে ছুটি দিয়ে দেওয়া হত। এই ব্যাপারটা ডাক্তারজীর ভাল লাগত না। সেইভাবে তিনি একথাও অনুভব করলেন যে অপরের সাহায্য করার জন্য যে স্বয়ংসেবক এগিয়ে এসেছে সে যদি শৃঙ্খলাপরায়ণ ও দৃঢ় না হয় তাহলে শরীরের হাড় নরম ও শিথিল হয়ে পড়লে মানুষের যেমন অবস্থা হয়, সেই অবস্থাই হয় ঐ কাজেরও। এইসব অভিজ্ঞতা থেকেই পরবর্তীকালে আদর্শ স্বয়ংসেবকের কল্পনা বাস্তব স্বরূপ গ্রহণ করে।

কংগ্রেস অধিবেশনে অখিল ভারতীয় কার্য-সমিতির একটি ঘটনা ডাক্তারজীর চিন্তাধারাকে বিরাট আঘাত করে। 'ননদের নন্দাই আমার হয় না কেউই'—এই উক্তি চরিতার্থ হতে দেখেও

মুসলমানদের কাছে টানবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস খিলাফৎ-এর প্রশ্ন হাতে নিয়েছিল। কিন্তু সেই কংগ্রেসেই যখন শ্রী বড়ে এই প্রার্থনা করেন যে গোরক্ষার প্রশ্নটি রাষ্ট্রীয়, অতএব কংগ্রেসের সে ব্যাপারেও কিছু করা উচিত, তখন বলা হল যে "সে রকম করলে মুসলমানদের মনে কষ্ট হবে, সেই কারণে ঐ প্রশ্ন কংগ্রেস হাতে নিতে পারেনা।" এর ফলে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। তখন মহাত্মাজী শ্রীবড়েকে মণ্ডল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু বড়ে তাঁর জিদ্ ছাড়তে রাজি হলেন না এবং তাঁর স্থানও ছাড়লেন না। তাঁর আত্মা তাঁকে ডেকে বলছিল যে গোমাতার প্রতি এই উপেক্ষা সত্যের প্রতি হিংসার সমান। এই প্রকার উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে গান্ধীজী তাঁর হাত ধরে বাইরে ছুঁড়ে না ফেলে নিজের অহিংস বৃত্তির অনুরূপ কাজ করলেন এবং অঃ ভাঃ কার্যকারিণী বৈঠকই স্থগিত করে দিলেন। এই ঘটনায় ডাক্তারজী মনে বড় আঘাত পেলেন। তিনি এই ঘটনার উল্লেখ করে বলতেন যে "সে সময় প্রত্যেক প্রশ্নের একটাই কষ্টিপাথরে যাচাই করা হত যে মুসলমান কেমন করে খুশি হয়ে আমাদের দিকে চলে আসবে।"

ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ অসহযোগের যে নয়টি ধারার প্রস্তাব উত্থাপন করেন, গান্ধীজী সেই প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং লালা লাজপত রায়, শ্রী শংকরাচার্য (পুরী), স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, শ্রী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও শ্রী যমুনাদাস মেহতা প্রস্তাব সমর্থন করেন। প্রস্তাব গৃহীত হবার ফলে 'খিলাফৎ সমিতি' ও কংগ্রেসের গাঁটছড়া বাঁধার উপরে অধিকৃত রূপে শিলমোহর লেগে গেল।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। সেটা হল অভ্যর্থনা সমিতির একটি প্রস্তাব। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল "কংগ্রেসের লক্ষ্য হিন্দুস্থানে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে পুঁজীবাদী দেশগুলির কবল থেকে বিশ্বের দেশগুলির মুক্তি।" বিষয় সমিতি 'বিশ্বের দেশগুলির মুক্তির' কল্পনার উপহাস করে সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। এই বিষয়ে কলকাতার 'মডার্ন রিভিউ'-এর মার্চ ১৯২১-এর সংখ্যায় লেখা হয় — "The draft resolution deserved a better fate, than what it met with, in the subjects committee." অর্থাৎ ঐ প্রস্তাবটির প্রতি বিষয়-নির্বাচন কমিটিতে আরো বেশী নজর দেওয়া উচিত ছিল। এর পরে ঐ সাময়িক পত্রে এ বিষয়ে আনন্দও ব্যক্ত করা হয় যে নাগপুরের অভ্যর্থনা সমিতির মধ্যে কয়েকজন গণতন্ত্রবাদী সদস্য আছেন। অভ্যর্থনা সমিতির এই প্রস্তাব 'নাগপুর ন্যাশনাল ইউনিয়ন'-এর ডাক্তার হেডগেওয়ার, বিশ্বনাথ রাও কেলকর ইত্যাদি তরুণদের প্রেরণায় উপস্থাপন করা হয়েছিল। সে সময়ে 'স্বাধীনতা' শব্দটির উচ্চারণেও শঙ্কিত ব্যক্তিরা যদি ঐ প্রস্তাবটিকে উপহাস না করতেন তাহলেই বড় আশ্চর্যের ব্যাপার ঘটত।

হিন্দুস্থানের রাজনীতির মধ্যে সার্বভৌম গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা নির্ভীকতার সহিত ব্যক্ত করতে অগ্রণী তরুণদের কণ্ঠস্বর সেই সময়ে উপহাসের অট্টহাস্যে নিমজ্জিত হলেও, বর্তমান গণতন্ত্র তথা জাগতিক মুক্তির গুরুগম্ভীর ঘোষণাগুলি কি সেই উপহাসকেই উপহাস করছেনা?

৮. অসহযোগ আন্দোলন ও অভিযোগ

যখন ডাক্তারজী ও তাঁর সহযোগীরা নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখন ভাউজী কাবরে সেদিকে উঁকি মেরেও তাকিয়ে দেখেননি। সশস্ত্র বিপ্লব ব্যতীত অন্য সব পন্থাই তাঁর নিকট অত্যন্ত অর্থহীন ও অনুপযুক্ত বলে মনে হত। অতএব, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে দেশের প্রধান-প্রধান নেতারা তাঁর শহরে উপস্থিত হলেও তাঁদের দর্শন করার কোন আগ্রহ তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। তার বিপরীত যখন বিষয়-নির্বাচনী সমিতিতে যে তর্ক-বিতর্ক হল তার সংবাদ ডাক্তারজী প্রমুখের মাধ্যমে তিনি শুনলেন, তখন তাঁদের পরিহাস করে তিনি এই সব ব্যর্থ কথাবার্তার প্রতি তাঁর বিরক্তির মনোভাবই প্রকাশ করেন।

অধিবেশনের সমাপ্তির পর ডাক্তারজী তাঁর বন্ধুদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন। সেই সময়ে তিনি এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে খিলাফৎ আন্দোলন অবশেষে দেশের পক্ষে মারাত্মক বলে প্রমাণিত হবে। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ্যের ঘোষণা করে দেওয়া হলেও সমাজের মনের অবস্থা দেখে তার কৃতকার্যতা অসম্ভব। ডাক্তারজী বলেন যে ভারতে মুসলমানরা ছাড়া, খ্রীষ্টান, পারসী, ইহুদি ইত্যাদি অন্যরাও বাস করে, কিন্তু তাদের উল্লেখমাত্র না করে শুধু হিন্দু-মুসলমান একতার কথা বলায় মুসলমানদের মধ্যে ঐ মনোভাব উৎপন্ন করবে যে তারা অন্যদের থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্য রাখে। এর ফলে তাদের মধ্যে এক বিচ্ছিন্নতাবোধ জেগে উঠবে যার ফলে ভারতের রাষ্ট্র জীবনের সঙ্গে তাদের একীকরণে বাধার সৃষ্টি হবে। তাঁর এরূপ চিন্তা সত্ত্বেও ডাক্তারজী একথা অবশ্য স্বীকার করতেন যে অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে জনসাধারণকে কিছুটা জাগ্রত করা সম্ভব। সেই সঙ্গে যখন দেশের হাজার-হাজার মানুষ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অসহযোগ করে সংগ্রাম করছে, তখন এর দ্বারা প্রত্যাশিত লাভ হবে না, শুধু এই কথা চিন্তা করে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা পালন করা তাঁর মনঃপুত ছিলনা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ছিল তাঁর স্বভাব এবং 'কণ্ঠাঁসি মানুঁ ঝোলা। মৃত্যুশী খেলুঁ খেলা।' (কণ্ঠকে দোলনা বানিয়ে আমি মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করি) — এইরকম ছিল তাঁর মনের ধৈর্য। এছাড়া আর একটি কল্পনা আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রেরণার পিছনে থাকতে পারে। ডাক্তারজী রাষ্ট্রজীবন হতে অলিপ্ত থেকে নিজের ব্যক্তিগত উন্নতিতে যারা আত্মনিয়োগ করে তাদের মত ছিলেন না। তিনি তো সর্বক্ষণ রাষ্ট্রেরই চিন্তায় নিমগ্ন থেকে তার উদ্ধারের সঠিক ও সরল পথের সন্ধান করছিলেন। তিনি জানতেন, আজ নয় তো কাল সমাজের সামনে নিজ কল্পনা অনুসারে তাঁকে প্রয়াস করতেই হবে। সেই সময় যদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হত "যখন আন্দোলন চলছিল, তখন কোথায় ছিলে? এখন এসেছ নিজের নতুন-নতুন কল্পনা নিয়ে।" তখন কী উত্তর দিতেন? অতএব আন্দোলনের দোষ ও গুণ উভয়ের কথা বিবেচনা

করে তিনি তাতে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং নিজ স্বভাব অনুসারে সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে সেই কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ছাত্ররা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করা, সাধারণ মানুষ আদালত বর্জন করুক, সরকারের প্রদত্ত পদবী ফেরৎ দেওয়া হোক, স্থানে স্থানে রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হোক এবং ঘরে ঘরে চরখা চলুক — এই ধরনের প্রচার চারিদিকে শুরু হয়ে গিয়েছিল। সভা সমিতি ও পরিষদগুলিতে এই সব বিষয় নিয়েই প্রচার চলতে লাগল। লোকমান্য তিলকের নামে জমানো 'স্বরাজ্য নিধি' প্রতিদিন উর্ধমুখী হতে লাগল। গান্ধীজীর 'এক বছরের মধ্যে স্বরাজ'-এর ঘোষণায় সাধারণ মানুষ মুগ্ধ হয়েছিল এবং তার থেকে উৎসাহ লাভ করে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। এই সময়ে ডাক্তারজী মধ্যপ্রান্তের গ্রামে-গ্রামে ভ্রমণ করে বক্তৃতার সাহায্যে প্রচার-কার্যে নেমে পড়েন। শুধু তাই নয়, ডাঃ নারায়ণরাও সাভারকরের সঙ্গে বোম্বাই শহর ও শহরতলীতেও তিনি তার ওজস্বী তথা দেশভক্তিপূর্ণ ভাষণের মাধ্যমে শত-সহস্র মানুষের মুখ স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে ঘুরিয়ে দিতে সাফল্য অর্জন করেন। সেই সময়কার তাঁর ভাষণগুলি অভিজাত স্বাধীনতা প্রেমে ওতপ্রোত এবং বিদেশীদের সম্বন্ধে বিক্ষোভের জ্বলন্ত আগুনের মত ছিল। তাঁর কথা 'প্রথমে কৃতি পরে উক্তি' এই তত্ত্বের অনুসারী হওয়ার কারণে তৎক্ষণাৎ মানুষের মনকে স্পর্শ করত। সেই সময়ে তাঁর বক্তৃতায় অত্যধিক প্রভাবিত শ্রী দাদারাও পরমার্থের ভাষায় — "ইংরেজ তথা ইংরেজদের রাজত্বের আলোচনা শুরু হওয়ার পর ডাক্তারজীর ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণে থাকত না। সেই সময় তাঁর কথা শুনে মনে হত যেন শত্রু সামনেই দাঁড়িয়ে আছে আর তিনি বুঝি তার উপর প্রবল আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাঁর শরীর ভাবাবেগে কম্পিত হতে থাকত। রক্তবর্ণ চক্ষু, মুষ্টিবদ্ধ হাত, বাহুযুগল স্ফুরিত — এই রকম জাজ্বল্যমান্ মূর্তি সেই সময়ে প্রকাশ হয়ে পড়ত।" তাঁর ভাষণের এই অগ্নি-বর্ষণ গান্ধীজীর আশে-পাশে বিচরণকারী নরম প্রকৃতির মানুষদের অস্বস্তিতে ফেলে দিত এবং সেই কারণে বক্তৃতার জন্য ডাক্তারজীর নাম প্রস্তাবিত হলে তাঁরা আপ্পাজী যোশী ও আপ্পাজী হলদে প্রমুখ সহকর্মীদের বলতেন, "ডাক্তারজীকে বক্তৃতার জন্য কেন ডাকছেন? অন্য কাউকে দেখুন না।"

১৯২১ সালের প্রথম দুই-তিন মাসে ডাঃ মুঞ্জে ও ডাঃ হেডগেওয়ার ভাণ্ডারা, খাপা, কেলবদ, দশসহস্র, তলগাঁও, দেবলী, ওয়ার্ধা, বোরী ইত্যাদি গ্রামগুলিতে পরগনা অথবা জেলা পরিষদগুলিতে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির প্রতিবেদন সংবাদপত্রের বিবরণে পাওয়া যায়। ডাক্তারজী সভাপতিরূপে যেখানেই ভাষণ দিয়েছেন, সেখানকার সমস্ত প্রতিবেদনে এই বর্ণনাই পাওয়া যায় যে "সভাপতি মহাশয়ের অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক এবং হৃদয়কে প্রবল নাড়া দিয়ে যাবার মত ভাষণ হল।" সেই প্রচার-ভ্রমণের সময়ে বেশ কয়েকটি স্থানে বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসবও হয়েছিল।

ডাক্তারজীর 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের' শব্দ প্রয়োগ ভাল লাগত না। এই কারণে একবার তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে প্রশ্ন করেন যে "হিন্দুস্থানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পারসী, ইহুদি ইত্যাদি অনেকেই বসবাস করে। তাদের সকলের ঐক্যের কথা বলার বদলে

আপনি শুধু হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা কেন বলেন?" এর উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "এই কারণে আমি মুসলমানদের মনে দেশের সম্বন্ধে আত্মীয়তার সৃষ্টি করেছি, যার ফলে আপনি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছেন যে এই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে তারা কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে।" এই উত্তর শুনে ডাক্তারজীর এতটুকু তৃপ্তি হলনা। তিনি বললেন, "হিন্দু-মুসলিম একতা" শব্দ প্রয়োগের প্রচার শুরু হওয়ার আগেই অনেক মুসলমান রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের ভালবাসার কারণে লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে কাজ করতেন। ব্যারিস্টার জিন্না, ডাঃ অন্সারী, হাকিম আজমল খাঁ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই নতুন শব্দ প্রয়োগের ফলে আমার আশংকা মুসলমানদের মধ্যে একতার পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতার মনোভাবই বৃদ্ধি পাবে।" "আমার সেরকম আশংকা আছে বলে মনে হয়না" — এই কথা বলে মহাত্মাজী ডাক্তারজীর কাছ থেকে ছুটি নিলেন। সময় একথা প্রমাণ করে যে ডাক্তারজীর আশংকা কত সত্য ছিল। তাঁর অভ্রান্ত দূরদৃষ্টিতে ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ভয়াবহ সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকতে পারেনি।

ডাক্তারজীর জোরদার প্রচার এবং গরম ভাষণের কারণে ফেব্রুয়ারী মাসে সরকার তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী সিরিল জেম্স ইরবিন তাঁর আদেশে লেখেন ঃ "I hereby require you ...... to refrain from attending, holding or otherwise being concerned in any way in public meeting or public assembly of five or more persons for the period of one month from the date thereof."

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯২১ তারিখে ১৪৪ ধারা অন্তর্গত এই আদেশ দেওয়া হয়। এতদনুসারে তাঁকে এক মাস পর্যন্ত কোন সার্বজনিক সভায় অংশগ্রহণ, বক্তৃতাদান অথবা আয়োজন করার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সেই সঙ্গে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ এই আদেশ অনুসারে সার্বজনীন সভা বলে বিবেচিত হয়। সরকারের সঙ্গে অসহযোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর এই ধরনের আদেশ নিয়ে ডাক্তারজীর চিন্তা করার কোন কারণ ছিলনা। তাঁর সভায় ভাষণ দেওয়ার কার্য যথাপূর্ব বেশ জোরেই চলতে থাকে। এ সবের পরিণতি হল তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চালানো। ১৯২১ সালের মে মাসে ডাক্তারজীর বিরুদ্ধে মামলা শুরু করা হল। কিন্তু সরকার তাঁর উপর যে একমাস বক্তৃতা না দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, তার উল্লঙ্ঘনের জন্য মামলা না চালিয়ে তাঁর কাটোল ও ভরতওয়াড়ার আগের বক্তৃতাগুলিকে আপত্তিজনক বলে অভিহিত করে তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনল।

নাগপুরের বিচারপতি শ্রী সিরাজ আহমেদের সম্মুখে ৩১শে মে এই মামলা শুরু হল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ১৪ই জুন শুনানীর দিন ধার্য হয়। ১৪ই জুন শ্রী স্মেলীর আদালতে মামলা পেশ করা হল। সর্বশ্রী বোবড়ে, বিশ্বনাথ রাও কেলকর, বাবাসাহেব পাধ্যে, হরকরে এবং বলবন্তরাও মণ্ডলেকর—এঁরা সকলে ডাক্তারজীর পক্ষ থেকে উকিল ছিলেন। ২৪শে অক্টোবর কাটোল তালুকা সভা এবং কাটোল পরগনা সভার সভাপতি রূপে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার উপর ভিত্তি করেই সরকার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল।

প্রথম দিন ১৪ই জুন পুলিশ ইন্সপেক্টর আবাজীর সাক্ষ্য গৃহীত হল এবং দ্বিতীয় দিন শ্রীবোবড়ে সাক্ষীকে জেরা করেন। কিন্তু শ্রী স্মেলীর তরফ থেকে বারবার শ্রীবোবড়েকে বাধা দেওয়া হতে থাকে। "এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা চলবেনা", "এই প্রশ্ন অসংলগ্ন", "এটা অভিযোগের সহিত সংগতিহীন" — এই প্রকার বাক্য শ্রী বোবড়েকে এক পা-ও এগুতে দিচ্ছিলনা। গাড়ীর চেন বারবার টানা হলে সে তার যাত্রা পুরো করবে কেমন করে, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। ২০শে জুন আবাজীকে জেরা করার সময়ে শ্রী বোবড়ে প্রশ্ন করেন, "ডাক্তার হেডগেওয়ার এ কথাই প্রতিপাদন করছিলেন যে হিন্দুস্থান হিন্দুস্থানের মানুষদের দেশ, তাই না?" কিন্তু শ্রীস্মেলী এই প্রশ্ন লিখতে অস্বীকার করেন। এই দেখে বোবড়ে রেগে-মেগে, "বিচারপতি আমাকে জেরা করতে দিচ্ছেন না, অতএব আমি এই মামলা করতে পারবনা।" বলে আদালত ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সেই সময়ে ডাক্তারজী বললেন, 'আমি আমার মামলা অন্য আদালতে পাঠাবার আবেদন জানাব। অতএব, এখন মামলা মুলতুবি করে দেওয়া হোক।" এই কথা শুনে দুপুর দুটোর সময়ে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

২৫শে জুন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী ইরউইনের নিকট মামলা অন্য আদালতে পাঠাবার জন্য আবেদন করা হল। তাতে ডাক্তারজী লিখলেন যে "ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মারাঠির একটুও জ্ঞান আছে কিনা এই আশংকা মামলা চলার সময়ে উৎপন্ন হয়েছে। ভাষণ এবং প্রতিবেদন সবই মারাঠি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। অতএব, এই ধরনের ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে নিয়ম এবং আইন অনুযায়ী মামলা বোঝাই অসম্ভব। অতএব, শ্রী স্মেলী এই মামলা শোনার পক্ষে অযোগ্য। এছাড়া, শ্রী স্মেলীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ফৌজদারী মামলা শোনার জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ জ্ঞানের দারুণ অভাব রয়েছে। অভিযুক্তের উকিল জেরার সময়ে যখন কোন প্রশ্ন করেন 'তখন প্রধান সওয়ালের সময়ে যে বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে শুধু সেই বিষয়েই প্রশ্ন কর। যদি অন্য কোন কথা প্রমাণ করতে হয় তা হলে নিজেদের দিক থেকে সাক্ষী ও প্রমাণ পেশ করো।' এইভাবে নানা আপত্তি তুলে কোন প্রশ্নই করতে দেওয়া হয়নি। সেই প্রশ্নগুলির উত্তর যদি সাক্ষীর কাছ থেকে পাওয়া যেত তাহলে তখনই একথা প্রমাণিত হয়ে যেত যে অভিযুক্তের ভাষণের মধ্যে রাজদ্রোহের কোন ব্যাপার ছিলনা। কিন্তু প্রত্যেকটি প্রশ্নের ব্যাপারেই ম্যাজিস্ট্রেটের কিছু না কিছু আপত্তি ছিল। প্রত্যেক প্রশ্ন তোলার সময়ে সেই প্রশ্নের উদ্দেশ্য তাঁকে বোঝাতে হত, তারপর কাজ অগ্রসর হত। এই কারণে সাক্ষীর পক্ষে উত্তর এড়িয়ে যাওয়া বা অসংলগ্ন উত্তর দেওয়া সহজ হয়ে যেত। ১৪ই জুন তারিখে এতক্ষণ ধরে জেরা চলল, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টের কাগজে একটি আঁচড়ও পড়েনি। এর ফলে অভিযুক্তের উকিলকে আদালত ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হল। সদর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মামলার সুষ্ঠু শুনানী হওয়ার আশা দেখা যাচ্ছেনা। সেই সঙ্গে এই মামলার সওয়াল করার জন্য অন্য কোন উকিল ঐ আদালতে যেতে পারবেনা। অতএব, এই মামলা অন্য আদালতে প্রেরণ করা হোক।"

এই আবেদনের ভাষা থেকে, বলার প্রয়োজন নেই যে ইংরেজ অফিসার শ্রীইরউইন এর উপর কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ২৭শে জুন আর্জি খারিজ করে দেওয়া হল। সেই সময়ে

আদালতে ডাক্তারজীর পক্ষ থেকে কোন উকিল উপস্থিত ছিলেন না। সেই দিন শ্রী স্মেলী ডাক্তারজীকে তাঁর লিখিত উত্তর দিতে বললেন। এই কথা শুনে ডাক্তারজী বললেন যে "অভিযোগকারীদের সমস্ত সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হোক তারপরে আমার যা বলার আমি বলব।" স্মেলী বললেন, "কোর্ট যখনই মনে করবে তখনই লিখিত উত্তর চাইতে পারে।" ডাক্তারজী এর উত্তরে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 'আমরা যা বলার ছিল বলে দিয়েছি। সব শেষে উত্তর দেব।" সেদিন এখানেই আদালতের কাজ শেষ হল।

৮ই জুলাই মামলা আবার শুরু হল এবং কাটোল বিভাগের সার্কেল ইন্সপেক্টর শ্রী গঙ্গাধররাও-এর সাক্ষ্যদান শুরু হল। তাঁর সাক্ষ্য শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্তারজী স্বয়ং জেরা করতে শুরু করেন। তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা উপযুক্ত হবে। শ্রীগঙ্গাধররাও বলেন, "প্রায় সাতটা থেকে পৌনে আটটার মধ্যেই সভা শেষ হয়ে গেল। আমরা টর্চের আলোর রিপোর্ট লিখছিলাম।" এই কথায় ডাক্তারজী বলেন, "এঁরা অন্ধকারে ছিলেন এবং এঁদের কাছে কোন টর্চ ছিলনা। আমি শুদ্ধ মারাঠিতে কথা বলি, কিন্তু আমার মুখে এঁরা 'বায়কোচা পোর' (মেয়েছেলের বেটা) শব্দ বসিয়েছেন।" এতে সাক্ষী বললেন, "আমি ব্যাকরণের নিয়ম জানিনা। আমি আমার মায়ের সঙ্গে তেলুগুতে কথা বলি আর স্ত্রীর সঙ্গে মারাঠিতে। আমি গড়ে প্রতি মিনিটে পঁচিশ থেকে ত্রিশটি শব্দ লিখতে পারি। কখনো পুরো বাক্য লিখে নিতাম, কখনো এক-আধ শব্দ অথবা বাক্যের সারাংশ লিখতাম। সারাংশ লেখার জন্য সম্পূর্ণ বাক্য শোনার প্রয়োজন হয় না। সারাংশ লেখার সময়ে আমাকে চিন্তা করতে হয়নি। আপনি যেমন-যেমন বলেছেন, আমি সারাংশ লিখে গেছি। যা বুঝতে পারিনি তা অন্যের কাছে জেনে নিয়ে লিখেছি। এই কাজ আমি বক্তা যখন মাঝখানে অন্যের সঙ্গে কথা বলতেন সেই সময়ে লিখে নিতাম (আর প্রত্যেক বক্তাই মাঝে-মাঝে অন্যের সঙ্গে কথা বলতেই থাকেন) ..... ডাক্তার প্রতি মিনিটে কুড়ি পঁচিশ শব্দ বলতেন। বক্তৃতা শোনার সময়ে বক্তার কথা যে ঠিক সে কথা মেনে নিয়ে অন্যদের মত আমার মনের উপরেও প্রভাব হয়েছিল। কিন্তু বক্তা যে সব মিথ্যে কথাই বলবে একথা আমি পাকাপাকি জানতাম।"

জেরাতে এই ধরনের কথা বের করার পর ডাক্তারজী স্মেলীর দিকে মুখ করে বলেন, "ভাষণের রিপোর্ট লেখায় সার্কেল ইন্সপেক্টরের পটুতার পরীক্ষা নেবার অনুমতি দেওয়া হোক।" কিন্তু এই অনুমতি দেওয়া হয়নি।

এর পরে ডাক্তারজী বক্তৃতা দিয়ে নিজের পক্ষের প্রতিপাদন করেন। তার মধ্যে আইনজ্ঞের মার-প্যাঁচ না থাকলেও তার মর্মস্পর্শিতা তথা স্পষ্টবাদিতা ছিল উল্লেখনীয়। তিনি বললেন, "কোর্টের সম্মুখে উপস্থাপিত ভাষণ আমার ভাষণ নয়। আমি প্রতি মিনিটে অন্ততঃ দুশো শব্দ বলি। এবং আমার ভাষণের রিপোর্ট লেখার জন্য যে লংহ্যাণ্ডের আনকোরা রিপোর্টার এসেছিলেন তাঁরা তো ভাষণের অষ্টমাংশ ভাগও লিখতে পারেন নি। অতএব, বাদী পক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত সম্পূর্ণ রিপোর্টের মধ্যে ভাঙা-ভাঙা বাক্য ও শব্দ এবং অসমাপ্ত কথাই আছে এবং তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক রাজনৈতিক কল্পনা এবং চিন্তাধারা উপলব্ধি করতে অত্যন্ত অযোগ্য পুলিশ তার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে যা বুঝতে পেরেছে সেই রকম এবং

যখন প্রয়োজন হয়েছে নিজের স্মরণশক্তির সাহায্য নিয়ে লিখেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সম্পূর্ণ রিপোর্ট থেকে একথা বোঝার উপায় নেই যে আমি কী অথবা কেমন বলেছি। তাছাড়া, ভরতওয়াড়ার আমার শেষ ভাষণের রিপোর্ট লেখাই সম্ভব ছিলনা, কারণ তখন এত অন্ধকার ছিল যে তাতে কাগজ বা পেন্সিল পর্যন্ত দেখা সম্ভব ছিল না। আর পুলিশের কাছে কোন আলোর ব্যবস্থা ছিলনা। অতএব, আমার ভাষণের যে রিপোর্ট এখানে দেওয়া হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ মনগড়া এবং একথা দেখাবার চেষ্টা যে জনতার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য আমরা কত দৌড়ঝাঁপ করছি।" একথা পরিষ্কার যে পুলিশের লোকেরা পরে পরিকল্পনা অনুসারে এই রিপোর্ট তৈরী করেছে বলে মনে হয়। রিপোর্টের দিকে একটু মনোযোগ সহকারে দেখলে লেখা-পড়া জানা মানুষ সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন যে এটা কত মিথ্যা। এই ভয়ের কারণেই মনে হয় কোর্টের মধ্যে কিছু নোটস্ পড়াও হয়নি। মোট কথা যদি যথাযথভাবে মামলা চলত তাহলে বাদী পক্ষের ভূমিকা পুরোপুরি ধসে পড়ত। একথা পরের কথাগুলি শুনলে পরিষ্কার বোঝা যাবে। তাঁর রিপোর্ট লেখার পদ্ধতি এবং আমার ভাষণের গতি সম্বন্ধে শ্রীগঙ্গাধররাও যে হাস্যাস্পদ কথাগুলি বলেছেন তা শুনে যে কোন জুডিশিয়াল মাইণ্ডের বুঝতে অসুবিধা হবেনা যে বাদী পক্ষের রিপোর্ট একেবারেই অকেজো। এই ধরনের সভায় আমার ভাষণ সাধারণ গতিতে বলা হলে সাক্ষী কতখানি লিখতে সক্ষম তা দেখাবার সুযোগ যদি আমাকে দেওয়া হত তাহলে পুলিশ অফিসারদের অসত্যতা ও নীচ বৃত্তি সকলের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ত। কিন্তু আশ্চর্য ও দুঃখের কথা এই যে আমার মামলায় সর্বাধিক বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। মাতৃভূমির ভক্তদের দমনচক্রে নিষ্পেষিত করে যে সরকার তার উপরে আমার বিরোধিতার কোন পরিণাম হবেনা তা আমি জানি। আমি এখনও একথাই বলব যে "হিন্দুস্থান এই দেশের অধিবাসীদের এবং স্বরাজ্য আমাদের লক্ষ্য। আজ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার তথা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যেসব ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলি যদি নেহাতই প্রহসন হয় তবে সরকার সানন্দে আমার ভাষণকে রাজদ্রোহ মনে করতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায়-বিচারের উপর আমার পুরো বিশ্বাস আছে।"

ডাক্তারজী দাবী করেন যে তিনি অন্য সাক্ষীদেরও জেরা করতে চান। কিন্তু একজন সাক্ষীরই যখন এমন দুর্দশা হয়েছে তখন এর পরে না জানি কী হবে, সম্ভবতঃ এই কথা চিন্তা করে স্মেলী সেই দাবী স্বীকার করেন নি। মামলা ৫ই আগষ্ট পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

৫ই আগষ্ট মামলা আবার শুরু হলে ডাক্তারজী তাঁর লিখিত উত্তর এবং নিজের ভূমিকা সুস্পষ্ট করে একটি বক্তৃতা দেন। তাঁর সঙ্গে কোন উকিল না থাকায় সব কিছু তাঁকে স্বয়ং একলাই করতে হচ্ছিল। তাঁর লিখিত উত্তরে তিনি বলেন ঃ —

(১) "আমার ভাষণ নিয়মতান্ত্রিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ রাজ্যের বিরুদ্ধে অসন্তোষ, দ্বেষ, ও দ্রোহ সৃষ্টিকারী এবং হিন্দী ও ইউরোপীয় মানুষদের মধ্যে শত্রুতার মনোভাব উৎপন্নকারী বলে আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ব্যাখ্যা আমার কাছে চাওয়া হয়েছে। একজন ভারতীয় দ্বারা কৃত কাজের তদন্ত ও ন্যায়বিচারের জন্য একজন বিদেশী রাজসত্তা (বিচারকের আসনে) বসবে, এটাকে আমি নিজের ও নিজের মহান দেশের অপমান বলে মনে করি।

(২) "হিন্দুস্থানে ন্যায়ের উপর অধিষ্ঠিত কোন শাসন আছে বলে আমি মনে করিনা এবং কেউ যদি আমাকে সে কথা বলে তাহলে আমার আশ্চর্যই লাগবে। আমাদের এখানে যা কিছু আজ চলছে সেটা তো পাশবিক শক্তির দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া ভয় ও আতঙ্কের সাম্রাজ্য। আইন তার দাস এবং আদালত তার খেলনা মাত্র। বিশ্বের কোন ভূভাগে যদি কোন শাসনের থাকার অধিকার থাকে, তাহলে সেটা জনতার দ্বারা, জনতার জন্য এবং জনতার সরকারের আছে। এ ছাড়া অন্য সব শাসন রাষ্ট্রসমূহকে লুণ্ঠন করার জন্য ধূর্ত মানুষদের দ্বারা যোজনাপূর্বক পরিচালিত ধোকাবাজির দৃষ্টান্ত।

(৩) "আমি আমার দেশের ভাই-বোনদের মধ্যে আমাদের দীন-হীন মাতৃভূমির প্রতি তীব্র ভক্তিভাব জাগ্রত করার চেষ্টা করেছি। আমরা তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে এই কথা অঙ্কিত করার প্রয়াস করেছি যে ভারত ভারতবাসীদেরই। যদি একজন ভারতীয় রাজদ্রোহ না করে রাষ্ট্রভক্তির এই তত্ত্ব প্রতিপাদিত না করতে পারে এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে শত্রুত্বের ভাবনা না জাগিয়ে সে যদি স্পষ্ট সত্য কথা বলতে না পারে, যদি অবস্থা এমন পর্যায় গিয়ে পৌঁছে থাকে তাহলে ইউরোপীয়দের এবং যাঁরা নিজেদের ভারত সরকার বলেন তাহলে তাঁদের সতর্ক হওয়া উচিত যে তাঁদের সসম্মানে ফিরে যাবার সময় এসে গেছে।

(৪) আমার ভাষণের উক্তিগুলি পুরোপুরি এবং ঠিক ঠিক লেখা হয়নি এটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, এবং আমি যা বলেছি বলে বলা হচ্ছে, সেটা আমার ভাষণের ভাঙা-ভাঙা এবং উল্টা-পাল্টা ও বিপর্যস্ত বিবরণ। কিন্তু আমার তার জন্য চিন্তা নেই। রাষ্ট্রের-রাষ্ট্রের সম্পর্ক যে সকল মূলগত তত্ত্বসমূহের দ্বারা নির্ধারিত হয়, তারই ভিত্তিতে গ্রেট ব্রিটেন ও ইউরোপীয় মানুষদের প্রতি আমার ব্যবহার। আমি যা কিছু বলেছি তা আমার স্বদেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দের অধিকার তথা স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার জন্য বলেছি এবং আমার প্রত্যেক শব্দের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আমি প্রস্তুত। আমার উপর যে অভিযোগ করা হয়েছে যদি সে সম্বন্ধে কিছু না বলতে দেওয়া হয় তাহলে তার প্রত্যেকটি অক্ষর সমর্থন করার জন্য আমি প্রস্তুত এবং বলছি যে সেগুলি সবই ন্যায্য।"

এই জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে পড়তেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলে ওঠেন — "এঁর মূল ভাষণ অপেক্ষা এই প্রতিবাদমূলক বক্তব্য আরো বেশী রাজদ্রোহপূর্ণ।" ("This statement is more seditious than his speech.")

এতে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই। কেননা তাঁর বক্তব্যের মধ্যে ডাক্তারজী কোন প্রকার আবরণ না রেখে তাঁর অন্তরের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। তার মধ্যে স্পষ্টতা তথা অসন্দিগ্ধতা ছিল এবং প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত সিংহের বিক্রম ও তেজোদীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। নাগপুর কংগ্রেসে অভ্যর্থনা সমিতির প্রস্তাব রূপে উপস্থাপিত যে গণতান্ত্রিক রাজ্যের কণ্ঠস্বরকে চাপা দেওয়া হয়েছিল, সেই গণতন্ত্রের ঘন-গম্ভীর ঘোষণার দ্বারা ডাক্তারজী ইংরাজদের অন্যায় শাসনকে কম্পায়মান করে তুলেছিলেন।

লিখিত বক্তব্য দেবার পর সম্ভবতঃ তার মধ্যে আরো কিছু অভাব থেকে গেছে মনে করে তিনি ভাষণের দ্বারা আদালতের সম্পূর্ণ বাতাবরণকে উত্তপ্ত করে তুললেন। তার মধ্যে যেমন

অপূর্ব যুক্তিবাদ ছিল, তেমনই নির্ভীকতার আওয়াজও ছিল।

সরকার পুলিশ ছাড়া আর কোন সাক্ষী আনেনি, আর পুলিশের লোকেরা তো সকলেই সরকারের হাতের পুতুল হওয়ায় তাদের "সাক্ষীর পরিবর্তে বাদী পক্ষ বলাই যুক্তিযুক্ত হবে", এই বাক্যের মাধ্যমে সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, "হিন্দুস্থান হিন্দুস্থানের মানুষদেরই। অতএব, আমাদের হিন্দুস্থানের স্বরাজ্য চাই, এটাই সাধারণভাবে আমার ভাষণের বিষয় থাকে। কিন্তু শুধু এইটুকুতে কাজ চলেনা। স্বরাজ্য কেমন ভাবে অর্জন করা উচিত এবং অর্জন করার পর আমাদের কেমন ভাবে থাকা উচিত একথাও জনসাধারণকে জানানোর প্রয়োজন হয়। তা নইলে 'যথা রাজা তথা প্রজা' এই নীতি অনুসারে আমাদের জনসাধারণ ইংরাজদের অনুকরণ করতে আরম্ভ করে দেবে। ইংরাজরা নিজ দেশের রাজ্যের দ্বারা সন্তুষ্ট না হয়ে অপরের দেশের উপর ডাকাতি করে, সেখানকার মানুষদের ক্রীতদাসে পরিণত করে তাদের উপর রাজত্ব করতে, এবং তাদের নিজেদের স্বাধীনতার উপর যদি বাধার সৃষ্টি হয় তাহলে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে রক্তের নদী প্রবাহিত করতে প্রস্তুত থাকে। সাম্প্রতিক বিশ্বযুদ্ধ দেখে সে কথা সকলেই জেনে গেছে। অতএব, আমাদের জনগণকে একথা হলতে হয় যে 'বন্ধুগণ। আপনারা ইংরাজদের এই দানবের মত গুণের অনুকরণ করবেন না। কেবল শান্তির পথেই স্বরাজ্য অর্জন করুন এবং স্বরাজ্য অর্জন করার পর অন্য কারো দেশের উপর আক্রমণ না করে নিজ দেশ নিয়েই যেন আমরা সন্তুষ্ট থাকি।' এই কথা মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে দেবার জন্য তাঁদের একথাও বোঝাই যে একটি দেশের পক্ষে অপর দেশের মানুষদের উপর শাসন করা অন্যায়। সেই সময় প্রচলিত রাজনীতির সহিত সম্পর্ক এসে পড়ে। কারণ আমাদের এই প্রিয়তম দেশের উপর দুর্দৈবক্রমে বিদেশী ইংরেজরা অন্যায়ভাবে রাজত্ব করছে, একথা আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি। বাস্তবিক এমন কোন নিয়ম আছে কি যে যার মাধ্যমে একটি দেশের লোকেরা অন্যদের উপর রাজত্ব করার অধিকার লাভ করে? সরকারী উকিল সাহেব, আপনার কাছে এটাই আমার প্রশ্ন। আপনি কি এই প্রশ্নের উত্তর আমাকে দেবেন? এটা কি প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে নয়? যদি একথা ঠিক হয় যে একটি দেশের অন্য দেশের উপর রাজত্ব করার অধিকার নেই, তাহলে হিন্দুস্থানের জনগণকে পদদলিত করে তাদের উপর রাজত্ব করার অধিকার ইংরেজদের কে দিয়েছে? ইংরেজরা এদেশের লোক নয়, একথা তো ঠিক? তাহলে হিন্দুভূমির জনগণকে ক্রীতদাসে পরিণত করে 'হিন্দুস্থানের মালিক আমরাই' এ কথা বলা কি ন্যায়-নীতি তথা ধর্মকে হত্যা করার সামিল নয়?"

'ইংল্যাণ্ডকে পরাধীন করে তার উপর রাজত্ব করার ইচ্ছা আমাদের নেই। কিন্তু যেমন ইংল্যাণ্ডের লোকেরা ইংল্যাণ্ডে আর জার্মনীর লোকেরা জার্মনীতে রাজত্ব করে, সেইভাবে আমরা হিন্দুস্থানের মানুষেরা হিন্দুস্থানের প্রভু রূপে রাজত্ব করতে চাই। ইংরাজদের সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে ইংরাজদের দাসত্বের ছাপ চিরকালের মত নিজেদের উপর অঙ্কিত করে নেবার কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা চাই এবং তা অর্জন না করা পর্যন্ত আমরা চুপ করে বসে থাকব না। আমরা নিজ দেশে স্বাধীনতার সহিত বাস করার ইচ্ছা করব এটা

কি নীতি ও বিধির বিরুদ্ধে? আমার বিশ্বাস বিধি নীতিকে পদাক্রান্ত করার জন্য নয়, তার সংরক্ষণ করার জন্য। এটাই তার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।”

ডাক্তারজীর বিরুদ্ধে মামলা চলার সময়ে আদালতে অসংখ্য মানুষের ভিড় একত্রিত হয়ে যেত। এর আগে যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল, তাঁরা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অস্বীকার করে দিয়েছিলেন। সেই কারণে সেই সব মামলায় শাস্তির রায় ছাড়া শোনার মত কিছু থাকতনা। কিন্তু ডাক্তারজী সরকারের অযোগ্যতা এবং অসহযোগের উদ্দেশ্য, সভার মতই আদালতে সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। জনতা একত্রিত হয়ে তাঁর বক্তৃতা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনত, এটাই ছিল তাঁর নীতির যথাযথতার প্রমাণ। ডাক্তারজী এইভাবে ময়দানের জনসভার আবহাওয়া আদালতের মধ্যেও সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন।

ডাক্তারজী নিজের ভূমিকা পরিষ্কার করে দিয়ে এই বক্তব্য দেবার পর সরকারী উকিল সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়ে তাঁর মন্তব্যে বলেন, “... ডাক্তার হেডগেওয়ার এই মাত্র যে বক্তৃতা দিলেন সেটি অত্যন্ত সহজ ও সরল। কিন্তু জনসভায় তাঁর ভাষণ-পদ্ধতি এর থেকে অন্যরকম নিশ্চয়ই। প্রতিবেদন লেখকের ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার কোন কারণ আছে বলে মনে হয়না।” সরকারী উকিলের মতে এই বক্তৃতার সরল হওয়ার প্রমাণপত্র পাওয়া গিয়েছিল। অতএব, জনসভাগুলিতে তাঁর ভাষণ কী ধরনের হত তার কল্পনা করা যেতে পারে।

১৯ শে আগষ্ট ডাক্তারজীর উপর ১০৮ ধারা অনুযায়ী জামিনের মামলার রায় বেরুবার কথা ছিল, তাই আদালতে বিপুল জনসমাগম হয়েছিল। বেলা সাড়ে বারোটার সময়ে শ্রীস্মেলী এইরূপ রায় দেন যে “আপনার ভাষণ রাজদ্রোহপূর্ণ। অতএব এক বছর পর্যন্ত আপনি রাজদ্রোহী ভাষণ দেবেন না, এইরূপ প্রতিশ্রুতি লিখে এক হাজার টাকা হিসাবে দুইটি জামিন এবং এক হাজার টাকার নগদ মুচলেকা লিখে দিন।” এই রায় জানার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারজী এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনের কথা ব্যক্ত করে বলেন, “আপনি যা রায় দেবার দিতে পারেন। কিন্তু আমি যে নির্দোষ সে বিষয়ে আমার আত্মা আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে। সরকারের দুষ্ট নীতির কারণে ইতিপূর্বেই প্রজ্জ্বলন্ত আগুনে এই দমননীতি তেলের কাজ করেছে। বিদেশী রাজ্যসত্তা শীঘ্রই তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ লাভ করবে বলে আমার বিশ্বাস। সর্বসাক্ষী পরমেশ্বরের ন্যায় বিচারের উপর আমার পরিপূর্ণ আস্থা আছে। অতএব, আমার নিকট যে জামিনের দাবী করা হয়েছে তা আমি স্বীকার করিনা।”

ডাক্তারজীর বাক্য পুরো হবার সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীস্মেলী তাঁকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ ঘোষণা করেন। তাই শুনে ডাক্তারজী সহাস্য বদনে দণ্ডাদেশকে স্বাগত জানান এবং পুলিশ আফিসারদের নির্দেশ অনুসারে কারাগারের উদ্দেশে প্রস্থান করার জন্য তিনি বাইরে এলেন। বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চতুর্দিকে বন্ধু-বান্ধব ও জনতার ভিড় একত্রিত হল এবং নগর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্রীগোখলে, তাঁকে মাল্যভূষিত করেন। তারপর একে-একে সর্বশ্রী বিশ্বনাথ রাও কেলকর, দামুপন্ত দেশমুখ, হরকরে এবং অন্যান্যরাও তাঁকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে তাঁর জয়ধ্বনি করেন। টাঙ্গায় বসার আগে রামপায়লী থেকে আগত আবাজী হেডগেওয়ার, দাদা শ্রী সীতারামজী ও ডাঃ মুঞ্জেকে ডাক্তারজী প্রণাম করেন এবং ব্যারিস্টার

মোরুভাউ অভ্যঙ্কর, সমীমুল্লা খাঁ, শ্রী অলেকর বৈদ্য, মণ্ডলেকর, হরকরে ইত্যাদি বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে উপস্থিত জনতার সম্মুখে ছোট বক্তৃতা দিয়ে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, "রাজদ্রোহের এই মামলায় আমি নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করি। আজকাল অনেকের এইরূপ ধারণা হয়েছে যে (আসামীর) পক্ষ সমর্থনকারীও রাজদ্রোহী। কিন্তু আপনারা এত লোক এখানে সমবেত হয়েছেন, তার থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে অন্ততঃ আপনাদের সে রকম ধারণা নয়। আমার বিরুদ্ধে মামলা চলবে আর আমাকে ছারপোকার মত পিষে মারা হবে আর আমি কোন প্রতিবাদ করবনা, সেটা আমার উপযুক্ত মনে হয়নি। প্রতিপক্ষের নীচতাকে জগতের সম্মুখে অবশ্যই উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়া উচিত। এটাই প্রকৃত দেশসেবা। তার বিপরীত, আত্মপক্ষ সমর্থন না করা আত্মহত্যার সামিল। আপনার যদি পছন্দ না হয় তাহলে প্রতিরোধ করবেন না। কিন্তু যে প্রতিরোধ করছে তাকে কম যোগ্য বলে মনে করা ভুল হবে। দেশের কাজ করার সময়ে জেল কেন, কালাপানি বা চির-নির্বাসন এমন কি ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলে পড়ার জন্যও আমাদের তৈরী থাকতে হবে। কিন্তু জেলে যাওয়া যেন স্বর্গের সমান, সেটাই স্বাধীনতার প্রাপ্তি বলে ভুল ধারণা পোষণ করবেন না। শুধু জেলে গেলেই আমরা স্বাধীনতা অথবা স্বরাজ্য লাভ করব — এরকমও মনে ভাববেন না। জেলে না গিয়ে বাইরে থেকেও দেশের অনেক কাজ করা যায়। একথা মনে রাখবেন। আমি এক বছর পরে ফিরে আসব। ততদিন পর্যন্ত দেশের অবস্থার কথা আমি জানতে পারবনা। কিন্তু হিন্দুস্থানের পূর্ণ স্বাধীনতার লাভের সংগ্রাম যে শুরু হবেই এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস আছে। হিন্দুস্থানের পক্ষে আর বিদেশী সত্তার অধীনে থাকা সম্ভব নয়। আর তাকে দাসত্বের মধ্যে রাখা যাবে না। আপনাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আপনাদের কাছ থেকে এক বছরের জন্য অনুমতি নিচ্ছি।" এই কথা বলে ডাক্তারজী হাত জোড় করে সকলকে নমস্কার করেন। হাততালির মধ্যে "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র ধ্বনিত হল।

ডাক্তারজী মৃদু হাস্য সহকারে টাঙায় উঠে বসলেন। টাঙা চলতে আরম্ভ করল এবং যতক্ষণ চোখের আড়ালে গেল না, ততক্ষণ জনতার ঘোষণা শোনা যেতে লাগল —

'ভারত মাতা কী জয়', 'ডাক্তার হেডগেওয়ার কী জয়।'

৯. নাগপুরের কারাগারে

১৯২১ সালের ১৯শে আগষ্ট, শুক্রবার, ডাক্তারজী কারাগারে গেলেন। সেই দিনই টাউনহলের ময়দানে ব্যারিস্টার গোবিন্দরাও দেশমুখের সভাপতিত্বে ডাক্তারজীর অভিনন্দনের জন্য এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডাঃ মুঞ্জে, শ্রী নারায়ণরাও অলেকর, শ্রী হরকরে এবং শ্রী বিশ্বনাথ রাও কেলকরের অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা হয়। "নিজের একাগ্রতা তথা স্বার্থত্যাগের কারণে আগামী প্রজন্মের নেতা ডাক্তার হেডগেওয়ারই হবেন" — এইরূপ আশার বাণী শ্রী অলেকর ব্যক্ত করেন। শ্রী হরকরে ডাক্তারজীর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতি নিষ্ঠার মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করেন। সভাশেষে শ্রী বিশ্বনাথ রাও কেলকর ডাক্তারজীর জেল-যাত্রার প্রাক্কালে প্রদত্ত বাণীর কথা উল্লেখ করে বলেন, "কাজ করতে-করতে জেলে যেতে হলে অবশ্যই যাবেন, কিন্তু জেলে যাওয়াই আমাদের সম্মুখে ধ্যেয় নয়, বরং দেশসেবাই হওয়া উচিত। এটাই আপনাদের নিকট ডাক্তারজীর নির্দেশ।"

ডাক্তারজীর কারাদণ্ডের আদেশের পর নাগপুরের সাপ্তাহিক 'মহারাষ্ট্র'-র ২৪ তারিখের সংখ্যায় তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সম্পাদক শ্রী গোপালরাও ওগলে তাঁর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মাধ্যমে তাঁকে স্বতন্ত্রভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ডাক্তারজী তাঁর সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই দেখা-সাক্ষাৎ করতেন, অতএব এই অভিনন্দন-নিবন্ধের ব্যক্ত চিন্তাধারাকে বিশেষ প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। ডাক্তারজী কারাবরণকে স্বীকার করে নিলেন কেন? এ বিষয়ে শ্রী গোপালরাও বলেন, "ডাঃ হেডগেওয়ার তাঁর সদসৎ বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধে জেলে গেলেন। তিনি জেলে যেতে ভয় পেয়েছিলেন — এই ধরনের অপবাদ যাতে উচ্চারিত না হয়, সেই কারণে জেলে যাওয়া তাঁর কাছে আবশ্যক মনে হয়েছিল। জন-অপবাদ অত্যন্ত ঘৃণিত দুর্বাসা ঋষি। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও এদের কষ্টি পাথরে পরীক্ষিত হয়। তার দ্বারা ভীত হয়েই শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে নিষ্পাপ জেনেও বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। সেই প্রকার ডাক্তারজীর এই বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও যে জেলের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকা অপেক্ষা বাইরে অনেক বেশী কাজ করতে পারব, লোকাপবাদকে এড়াবার জন্যেই তাঁকে জেলে যেতে হল। 'লোকাপবাদো বলবান্তো মে' ভগবান রামচন্দ্রের এই বাক্য সকল নেতাদেরই বহুবার আচরণে প্রকাশ করতে হয়। জেনে-বুঝে কারাবাস স্বীকার করে ডাক্তার হেডগেওয়ার স্বার্থত্যাগের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তথা অধিক প্রদীপ্ত হয়ে নাগপুরের উদীয়মান প্রজন্মের নেতৃত্ব করার এবং তাঁর বিশুদ্ধ স্বাধীনতার ধ্যেয়কে প্রতিপাদন করার জন্য শীঘ্রই, সম্ভবতঃ এক বছরের পূর্বেই জেল থেকে বাইরে ফিরে আসবেন বলে আমরা আশা করি।"

এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করার জন্য ডাক্তারজীকে অজনী জেলে রাখা হয়েছিল। কারাবাস, তাঁর নতুন কোন ব্যাপার মনে হল না, কেননা কলকাতায় থাকার সময়ে বহুবার

তাঁকে ঘন্টার পর ঘন্টা পুলিশ ফাঁড়িতে বসে থাকতে হত, আর দু একবার তো চার-চার দিন তাঁকে থানাতেও আটক থাকতে হয়েছিল। অতি পরিচয়ের কারণে গোয়েন্দা ও পুলিশের ভয় ছোটবেলা থেকেই দূর হয়ে গিয়েছিল, এবং কষ্টের ব্যাপারে একথাই বলা যায় যে তার সঙ্গে ডাক্তারজীর অনেক পুরানো ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বই হয়ে গিয়েছিল।

সেই সময়ে নিয়ম ছিল কারাগারে প্রবেশ করার সময়ে বন্দীকে তার যজ্ঞোপবীত খুলে রেখে যেতে হত। ডাক্তারজীকেও এই নিয়ম বলা হল। কিন্তু তিনি পৈতে খুলতে পরিষ্কার অস্বীকার করলেন। সেখানকার অফিসাররা তাঁর অস্বীকৃতির পিছনে দৃঢ় সংকল্প দেখে এই নিয়ম পালনে জোর না দেওয়াই বুদ্ধিমানী বলে মনে করলেন। জেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন শ্রী ফোর্ড নামের এক আইরিশ সজ্জন, যিনি মনে-মনে ইংরেজদের বিরোধী ছিলেন। অতএব, ডাক্তারজীর স্বাভিমানকে তাঁর ভূষণ বলে মনে হওয়া তাঁর পক্ষে আশ্চর্যজনক ছিল না। এর পরে নানা কারণে যখন জেলগুলি ভরে উঠতে থাকল এবং সত্যাগ্রহীরা রাজনৈতিক বন্দীর স্বীকৃতি লাভ করতে থাকলেন, তখন এই অপমানজনক নিয়ম নিজে থেকেই বাতিল হয়ে গেল।

ডাক্তারজী কারাগারে প্রবেশ করার পূর্বেই শ্রী রঘুনাথ রামচন্দ্র অর্থাৎ কর্মবীর বাপুজী পাঠক সরকারী দমনচক্রের শিকার হয়ে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁর পরেই পণ্ডিত রাধামোহন গোকুলজী, ডাক্তারজী এবং বালবীর শ্রী বাবুরাও হরকরে জেলে এলেন। কিছু দিন পরে 'খিলাফৎ আন্দোলনে' দণ্ডপ্রাপ্ত কুড়ি বছর বয়স্ক তরুণ কাজী ইনামুল্লাও তাঁদেরই কুঠুরীতে এসে পড়ল। সে ছিল ইন্টারমিডিয়েটের পাঠরত উত্তরপ্রদেশের ছাত্র এবং গোঁড়া মুসলমান।

এঁদের প্রথম দিকে ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের কাজ দেওয়া হল। শ্রী পাঠককে মাড়াইয়ের কাজ দেওয়া হয় এবং ডাক্তারজীকে হাতে তৈরী কাগজ পালিশ করার কাজ দেওয়া হয়েছিল। এই সময়ে শ্রীবিশ্বনাথরাও কেলকর এবং শ্রীচোরঘড়ে কারাগারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণ থেকে জানা যায় যে ডাক্তারজীর হাতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল পেপার পলিশিং-এর কাজ করার দরুন। তখন তাঁকে কাগজের মণ্ড তৈরীর কাজ দেওয়া হয়। এর কিছুদিন পরে এই পাঁচজনকেই বই বাঁধাইয়ের কাজ দেওয়া হয়।

এঁদের সকলের চিন্তা, নিষ্ঠা স্বভাব ও কল্পনার কথা বিবেচনা করলে সন্দেহ নেই তাঁদের একসঙ্গে থাকার ফলে ঝগড়া-ঝাঁটির সঙ্গে মনোরঞ্জনেরও ঘটনা ঘটা স্বাভাবিকই ছিল। শ্রী পাঠক আইনজীবী ছিলেন এবং তাঁর স্বভাব ছিল অত্যন্ত সরল ও সাত্বিক। বালবীর হরকরে তরুণ ও বীরব্রতের পক্ষে শোভনীয় উগ্র প্রকৃতির ছিলেন। পণ্ডিতজী কট্টর আর্যসমাজী এবং আক্রামক হিন্দুত্বের সমর্থক ছিলেন। ইনামুল্লা এমন অসহিষ্ণু ও ধর্মান্ধ প্রকৃতির ছিল তাকে বাকি চারজনই 'উল্লু' বলে সম্বোধন করতেন। ওর আগমনের পরদিনই ভোরে মোরগের ডাকের আগেই ইনামুল্লা উঠে জোরে-জোরে কোরান শরীফের আয়াৎ পড়তে শুরু করে দিত। দু-এক দিন পাঠক ও হরকরে ইত্যাদিরা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে "তোমার কোরান শরীফ পাঠে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু এমন জোরে পাঠ করনা যাতে অন্যদের নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটে।" কিন্তু সদুপদেশ শোনার মত বিবেক ও সদ্‌বুদ্ধি তার মধ্যে ছিলনা। এর ফলে পর দিন

পণ্ডিত রাধামোহনজী ঠিক একই সময়ে তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' থেকে অত্যন্ত উচ্চস্বরে চৌপদী পাঠ করতে শুরু করে দিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর এমন জোরালো ছিল যে তার সামনে ইনামুল্লার কণ্ঠস্বর নাকাড়ার সামনে ডুগডুগীর মত মনে হতে লাগল। ইনামুল্লা প্রিয় বাক্য দ্বারা বুঝতে না পারলেও আর্যসমাজী পণ্ডিতজীর এই ঔষধে কাজ হল। এর পর প্রাতঃকালীন মধুর নিদ্রায় আর সে ব্যাঘাত ঘটায়নি।

'খিলাফৎ আন্দোলন'-এর কারণে মুসলমানদের মধ্যে কী ধরনের মনোবৃত্তি গড়ে উঠছিল তা ইনামুল্লার ব্যবহার থেকে আঁচ করা যাচ্ছিল। যেমন-যেমন ইনামুল্লার স্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছিল, সেই মত সে পাঠকজী ও ডাক্তারজীকে ইসলামের শ্রেষ্ঠতার বিষয়ে উপদেশ দিতে শুরু করল। পণ্ডিতজী ছিলেন আর্যসমাজী, তাই তাঁর সামনে এই বিষয় উত্থাপন করা সহজ ছিলনা। কিন্তু এই দুজনকে বোঝাবার সে বরাবর চেষ্টা করত। সে কিছু বললে ডাক্তারজী মুচ্‌কি হেসে চুপ করে থাকতেন, আর পাঠকজী তাকে পরামর্শ দিতেন যে "প্রথমে বালবীরের উপর চেষ্টা কর, পরে দেখা যাবে।" তারা জানতেন যে বালবীরের সামনে এই প্রশ্ন তোলার অর্থ হবে বোল্‌তার চাকের মধ্যে হাত ঢোকানোর সামিল।

ডাক্তারজী সবার সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতেন। তিনি তৎকালীন প্রান্তীয় কংগ্রেস সমিতির সদস্য ছিলেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে জেলে এসেছিলেন। তা সত্ত্বেও অকারণ কোন বিবাদে জড়িয়ে অথবা কোন অজুহাত খুঁজে নিয়ে কাজ বন্ধ করার মত প্রবৃত্তি তাঁর ছিলনা। ১৩ই এপ্রিল 'জালিয়ানওয়ালা বাগ' দিবস উদ্‌যাপনের কথা ছিল। প্রস্তাব করা হল যে সেদিন পাঁচ জনেই কাজ করবেন না। এই প্রস্তাবের প্রতি মনের থেকে ডাক্তারজীর সম্মতি ছিলনা। এই কারণে "দেখা যাবে" বলে ডাক্তারজী অনিশ্চিতরূপে তাঁর মতামত জানালেন। ইনামুল্লা 'খিলাফৎ' ব্যতীত অন্য কোন পর্ব বা উপলক্ষের চিন্তাই করত না। কিন্তু সে ডাক্তারজীর মনের গতি বুঝতে পেরে চালাকি করে বলল যে "যদি ডাক্তারজী কাজ বন্ধ করেন, তাহলে আমিও বন্ধ করব।" জালিয়ানওয়ালা বাগের বর্বর অত্যাচারের স্মরণ মাত্রেই ডাক্তারজীর মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠত। কিন্তু জেলের প্রাচীরের অভ্যন্তরে বই বাঁধাইয়ের কাজ বন্ধ করে হৃদয়ের ক্ষোভ ব্যক্ত করাকে তিনি অত্যন্ত গৌণ এবং অনাবশ্যক পন্থা বলে মনে করলেন। তথাপি ডাক্তারজীর একথাও পছন্দ হল না যে ইনামুল্লা তাঁর সাহায্য গ্রহণ করে জালিয়ানওয়ালা কাণ্ডের প্রতি তাঁর মনের উপেক্ষাকে চাপা দিয়ে রাখবে। তাই তিনি কাজ বন্ধ করার প্রস্তাবে স্বীকৃতি দিলেন। তখন নিরুপায় হয়ে বেচারা ইনামুল্লাকেও হরতাল করতে হল এবং তার দরুন শাস্তিও ভোগ করতে হল। সেই দিন থেকে তার কথা-বার্তায় এই মনোভাব ব্যক্ত হতে লাগল যেন ডাক্তারজী তাকে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছেন।

যে সময়ে ডাক্তারজীর কারাবাস শুরু হল, সেই সময়ে ডাঃ নীলকণ্ঠরাও জঠার 'জেলর' হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। একেবারে নতুন হওয়ার দরুন তাঁর নিজের কাজ সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিলনা। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার পর ডাক্তারজী বই-এর সাহায্যে তাঁকে তাঁর কাজ সম্বন্ধে বোঝাতে বিশেষ সহযোগিতা করেছিলেন। কিন্তু এই সাহায্যের পিছনে তাঁর নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির অথবা সুযোগ গ্রহণের কিছুমাত্র ভাবনা ছিলনা। একথা স্বয়ং স্বর্গীয় কর্নেল

নীলকণ্ঠরাও জঠার ব্যক্ত করতেন। শুধু তাই নয়, ডাক্তারজীর সৌজন্যপূর্ণ তথা প্রভাবী ব্যক্তিত্বের পরিণাম কর্নেল জঠারের উপর এত বেশী হয়েছিল যে সে কথা স্বীকার করে তিনি বলেন যে "ডাক্তারজীর জেল থেকে মুক্তিলাভের পর তাঁর স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের কারণে আমরা সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়ীতে যেতাম। শহরে গেলে নিজে থেকেই তাঁর বাড়ীর দিকে কে যেন টেনে নিয়ে যেত।"

ঐ সময়ে অসহযোগ আন্দোলনের বন্দীদেরও অন্য কয়েদীদের মত জেলের পোশাক পরতে হত এবং রুটি, ডাল, তরকারীও তাদের সমানই খেতে হত। রাজনৈতিক বন্দীদের ভিন্ন শ্রেণী শহীদ যতীন্দ্রনাথ দাসের অনশন ও শহীদের মৃত্যুবরণের কারণে তৈরী হয়েছিল। তার আগে পর্যন্ত অপরাধী এবং রাজনৈতিক বন্দীদের সকলকেই একই দাড়িপাল্লায় ওজন করা হত। কাগজের বাণ্ডিল বাঁধা, বইয়ের মলাট সেলাই করা ইত্যাদি কাজ করার পরে যে সময় বাঁচত, সেই সময়ে ডাক্তারজী সুতো কাটতেন অথবা 'মহাভারত' পাঠ করতেন। কথিত আছে, সেই সময় তাঁর কাছে 'শান্তিপর্ব' ছিল।

বই বাঁধাইয়ের কাজ দুটি দলে করা হত। ডাক্তারজী ও পাঠকজী থাকতেন একটি দলে এবং বাকি তিনজন অন্য দলে। এই কাজ চলত জেলের কুঠুরীর মধ্যে। একবার আঠা দিয়ে জোড়ার পর বই-এর উপর চাপ দেবার জন্য ইনামুল্লা হরকরের রামায়ণ গ্রন্থ তুলে নিয়ে তার উপর রাখে এবং ওজন দেবার জন্য নিজে তার উপর দাঁড়িয়ে পড়ে। বইগুলিকে চাপা দেবার যান্ত্রিক ব্যবস্থা না থাকার দরুন ইনামুল্লা এইরকম উপায় অবলম্বন করেছিল। কিন্তু ডাক্তারজীর পক্ষে এ জিনিষ সহ্য করা সম্ভব ছিলনা যে কেউ রামায়ণের মত গ্রন্থের উপর যে কারণেই হোক পা রেখে দাঁড়াবে। এই ঘটনায় তিনি হরকরের উপর ক্রুদ্ধ হলেন।

কিছুদিন পরে ডাক্তারজীর হাতের এক জায়গায় একটু ফুলে ওঠে। তিনি রোজ রাত্রে কুঠুরীর এক কোনায় টেবিলের উপর রাখা হারিকেনের উপর রুমাল গরম করার জন্য সেখানেই বসে পড়তেন। একদিন রোজকার মত তিনি টেবিলের উপর বসে হাতে সেঁক দিচ্ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে পনের-কুড়ি ফুট দূরে শোবার জায়গায় হরকরে ও ইনামুল্লা বসেছিলেন। তাঁদের কাছেই কোরান পুস্তক রাখা ছিল। সেদিন ইনামুল্লা একটু তীক্ষ্ণ স্বরে ডাক্তারজীকে বলল, "আপনি কোরান থেকে উঁচু স্থানে বসে আছেন। এর দ্বারা কোরানের অপমান করা হচ্ছে না কি?" ডাক্তারজী বললেন, "আমি তো এক কোনায় বসে আছি এবং তোমার কোরান এখান থেকে দশ পনের ফুট দূরে রয়েছে। কোরানের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? তাছাড়া, আমার মনে তোমার ধর্মগ্রন্থের অবমাননা করার কোন ভাব নেই। আমি তো রোজই এখানে বসি, আজ এমন কী হল যে তোমার মস্তিষ্কে এই কথা এল?" সেদিন ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হয়ে গেল।

পরের দিন যখন হরকরে, রাধামোহন ও ইনামুল্লা কাজ করছিলেন তখন ইনামুল্লা হরকরের কাছ থেকে রামায়ণের ভারী গ্রন্থ চাইল তাঁর উপর দাঁড়াবার জন্য। সেই সময়ে হরকরে একটু রাগত স্বরে বললেন, "আমার এই গ্রন্থের উপর তুমি পা রাখতে পারবেনা। এটা আমার ধর্মগ্রন্থ।"

"গতকাল পর্যন্ত ছিলনা, আজ কী করে হয়ে গেল?" ইনামুল্লা জিজ্ঞেস করল।

এর উত্তরে হরকরে বললেন, "তোর মনে পাগলামি ঢুকেছে। আমাদের নীতি বলে 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'। বস্তুতঃ আমাদের ধর্ম বইয়ের মধ্যে নেই।"

এই ঘটনার দু দিন পরে বিশ্রামের সময়ে ইনামুল্লা রকের উপর বসে বলল, "আপনারা খিলাফতের সাহায্য করছেন, সেই কারণে আমরা অসহযোগে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি। গোরক্ষা ব্যাপারটাও একই রকম। 'গোহত্যা করনা' একথা যখন আপনারা আমাদের নিকট প্রার্থনাপূর্বক বলবেন, তখন হয়ত আমরা গোহত্যা করবনা। কিন্তু যখন আপনারা গোহত্যা বন্ধ করার উপর জোর দেবেন, তখন গরু কাটা আমাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।"

একথা শুনে হরকরে এমন রেগে উঠলেন যে তিনি তাঁর দাড়ি টেনে ধরে দু-চারটে কিল চড় দিলেন। "আরে এ কী?" বলে ডাক্তারজী এগিয়ে এলেন এবং বিবাদ সেখানেই থেমে গেল। ডাক্তারজী খিলাফতের ভিতরের ব্যাপার আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। মুসলমানদের রাষ্ট্রবিরোধী মনোভাব তিনি জানতেন। অতএব, ইনামুল্লার কথা শুনে তাঁর অদ্ভুত কিছু মনে হল না। তার বিপরীত, তাঁর অনুমান যে কত অভ্রান্ত তারই প্রমাণ পেলেন।

পরের দিনই ইনামুল্লাকে সেই কুঠুরী থেকে অন্য ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল এবং ডাক্তারজীর মনোরঞ্জনের উপকরণটি চলে গেল। মাঝে-মাঝে রাত্রে আলাপ-আলোচনা চলত, গল্প-সল্প হত। ভবিষ্যতের বিষয়েও কথা হত। সেই আলোচনার সময়ে ডাক্তারজী তাঁর মনোভাব সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন —"আমার একলার বোমা যথেষ্ট নয় এবং সামগ্রিক বিদ্রোহের কোন সম্ভাবনা নেই। সেই কারণে এই সময়ে আমি জেলে এসেছি। ১৯২২ সালে সর্বপ্রথম কর্মবীর পাঠকজী জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। এবং তারপরে একে একে অন্যান্যরা মুক্তিলাভ করেন।

ডাক্তারজী ১৯২২-এর ১২ই জুলাই সকালে মুক্তিলাভ করেন। বাইরে বেরুবার সময়ে যখন তিনি বাড়ীর কাপড়-জামা পরেন, তখন দেখা যায় যে তাঁর গলাবন্ধ কোট ও ফতুয়া টান-টান লাগছে। ডাক্তারজীর ওজন পঁচিশ পাউণ্ড বেড়ে গিয়েছিল। তারই স্বাভাবিক পরিণামে জামাগুলো ছোট হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেক পরিস্থিতিতে হাসিমুখে জীবন অতিবাহিত করা তাঁর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সেই কারণে কারাবাসও তাঁর নিকট স্বাস্থ্যপ্রদ প্রমাণিত হল।

ডাক্তারজী যখন কারাগার থেকে বাইরে এলেন তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। সেই অবস্থাতেও ডাঃ মুঞ্জে, ডাঃ পরাঞ্জপে এবং ডাঃ নাঃ ভাঃ খরে ছাড়াও অনেক বন্ধু বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের আনা ফুলের মালা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে ডাক্তারজী সকলের সঙ্গে বাড়ী ফিরলেন। পথে স্থানে-স্থানে থামিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। 'মহারাষ্ট্র' সেই দিনই তাদের 'শেষ সংবাদে' ডাক্তারজীকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের সুযোগ হাতছাড়া করেনি। 'মহারাষ্ট্র' লিখেছিল যে "ডাক্তার হেডগেওয়ারের দেশভক্তি, নিঃস্বার্থবৃত্তি এবং প্রচণ্ড উদ্দীপনার বিষয়ে কারো মনেই কোন সন্দেহ ছিলনা। কিন্তু এই সব গুণ স্বার্থত্যাগের অগ্নিতে পরীক্ষিত হয়ে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। তাঁর এইসব গুণের পরবর্তীকালে রাষ্ট্রকার্যের জন্য শতগুণ অধিক সদ্‌ব্যবহার হোক এই আমরা কামনা করি।"

সেই দিনই চিটণীস পার্কে একটি অভ্যর্থনা সভার ঘোষণা করা হয়। সেই সময়ে পঃ মতিলাল নেহেরু, শ্রীবিঠ্ঠলভাই প্যাটেল, হাকিম আজমল খাঁ, আন্সারী, শ্রীরাজগোপালাচারী, শ্রী কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার প্রমুখ নেতারা কংগ্রেস কার্যসমিতির বৈঠকের জন্য নাগপুরে এসেছিলেন এবং তাঁরা সকলেই অভ্যর্থনা সভায় উপস্থিত থাকবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

কিন্তু সন্ধ্যার সময়ে বৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়ার দরুন 'ব্যঙ্কটেশ নাট্যগৃহে' সভার অনুষ্ঠান করতে হল। নাট্যগৃহ নাগরিকদের দ্বারা পুরোপুরি ভরে গিয়েছিল। ডাঃ নাঃ ভাঃ খরে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাক্তারজীকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের প্রস্তাব বিপুল করতালির মধ্যে গৃহীত হল। এর পর পঃ মতিলাল নেহরু এবং হাকিম আজমল খাঁয়ের বক্তৃতা হল। তারপর ডাক্তারজী বলার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত কিন্তু মর্মস্পর্শী বক্তৃতা উপস্থিত সকলকেই উদ্দীপ্ত করে তুলল। তিনি বললেন, "এক বছর সরকারের অতিথি রূপে কাটিয়ে এলেও আমার যোগ্যতা আগে থেকে কিছু মাত্র বৃদ্ধি পায়নি। আর যদি বৃদ্ধি পেয়েও থাকে তার জন্য আমাদের সরকারের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। দেশের সম্মুখে ধ্যেয় সবথেকে উত্তম তথা শ্রেষ্ঠই থাকা উচিত। পূর্ণ স্বাধীনতার থেকে কম কোন লক্ষ্যই আমাদের সম্মুখে থাকা উচিত নয়। কোন পথ গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে ইতিহাসবেত্তা শ্রোতাদের কিছু বলা তাঁদের অপমান করার সামিল হবে। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার সময়ে যদি মৃত্যুবরণও করতে হয় তাহলে তারও চিন্তা করা উচিত নয়। এই সংঘর্ষ উচ্চ ধ্যেয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মস্তিষ্ককে ঠাণ্ডা রেখেই চালানো উচিত।"

নাগপুরের পরে যবতমাল, বর্ধা, আর্বী, বাঢোণা, মোহোপা ইত্যাদি বহু স্থানের বন্ধুরা ডাক্তারজীকে আমন্ত্রণ করে ডেকে আনেন এবং তাঁকে নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে অভ্যর্থনা সমারোহের আয়োজন করেন। নানা স্থানে তাঁকে আরতি করা হয় এবং খদ্দরের পোশাক উপহার দেওয়া হয়। যবতমালের সমারোহ লোকনায়ক বাপুজী অণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

জগতের দৃষ্টিতে ডাক্তারজী মুক্তিলাভ করে ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর মস্তিষ্ক এই গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল যে এই বিষম পরিস্থিতিতে কোন পথ গ্রহণ করতে হবে। নানা চিন্তা তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। উপর থেকে ফুলের মালায় ঢাকা থাকলেও তাঁর ঘাড় চিন্তার ভারে চাপা পড়েছিল। কোন সমস্যার চিন্তা ঐ সময়ে তাঁর মনকে ব্যথিত করে তুলছিল?

১০. বিচার-মন্থন

ডাক্তারজী ১৯২২ সালের ১২ই জুলাই কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। অসহযোগ আন্দোলন ইতিপূর্বেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। গান্ধীজীকে বন্দী করা হয়েছিল। ভাবাবেগের বশে যারা ঐ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল তারা বিভ্রান্ত হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঐ বছরই ৫ই ফেব্রুয়ারী উত্তরপ্রদেশের চৌরীচৌরা নামক স্থানে এক ক্রুদ্ধ জনতা পুলিশ চৌকিতে হামলা করে একুশজন পুলিশকে ও একজন অফিসারকে হত্যা করে এবং পুলিশ ফাঁড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই ঘটনায় ব্যথিত হয়ে ১২ই ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করে দেন। কিন্তু এই কারণটি ছিল তাৎক্ষণিক ও গৌণ। অহিংসার পন্থাকে পুরোপুরি পালন করার জন্য জনসাধারণের মধ্যে যে ধরনের যোগ্যতা তথা অনুশাসন প্রয়োজন, তার অভাব ইতিপূর্বেই স্পষ্টরূপে চতুর্দিকে অনুভব করা যাচ্ছিল। এইরূপ অবস্থায় ডুবন্ত আন্দোলনের জন্য খড়কুটোর সাহায্য নিয়ে গান্ধীজী নিজের লজ্জা রক্ষা করলেন।

সেই সময়ে মহাত্মাজী লেখেন, "ঈশ্বর আমাকে তৃতীয় বার সাবধান করে দিয়েছেন — যাদের উপর ভরসা করে সামগ্রিক অসহযোগ সমর্থনীয় ও ন্যায়সঙ্গত গণ্য করা যেতে পারে, সেরূপ সততাপূর্ণ তথা অহিংসাময় বাতাবরণ এখন ভারতে নেই।"

কুড়ি হাজার মানুষ এই অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। এর জন্য সর্ব সাধারণ মানুষের প্রেরণা ছিল 'এক বছরের মধ্যে স্বরাজ্য' এই ঘোষণা। কিন্তু আন্দোলন বন্ধ হতেই মানুষ একেবারে হতপ্রভ হয়ে যায়। অকস্মাৎ তড়িদাহত হলে যেরূপ অবস্থা হয়, তাদের মনের অবস্থা হল ঠিক সেই রকম। জনসাধারণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়ে পড়ল। ১৯২৩ সালে কারাগার হতে মুক্ত হবার পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই পরিস্থিতির বর্ণনা করে লেখেন, "... ধ্যেয়বাদের কোথাও নামগন্ধ ছিল না। তার স্থানে শুদ্ধ হৃদয়ের ভাবনাশীল ব্যক্তির রাজনীতির প্রতি ঘৃণা জন্মায় সেই ধরনের চক্রান্ত চলছিল। কংগ্রেসকে নিজেদের কব্জায় আনার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠী তাল ঠুকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।" এইরূপ অবস্থায় যে ছাত্ররা স্কুল ছেড়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, পুনরায় তারা পড়াশুনায় মন দিল এবং আদালতকে যাঁরা বহিষ্কার করেছিলেন, সেইসব উকিলরাও নিজেদের কাজে ফিরে গেলেন।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে সাফল্যের অন্তিম সোপানই একমাত্র সোপান বলে গণ্য হয়না। মাকড়শার মত ক্রমাগত জাল বুনে যেতে হয় এবং জাল একবার ছিঁড়ে গেলে আবার নতুন করে বুনতে হয় — এই কর্মযোগ তথা নিষ্ঠার দ্বারাই প্রকৃত দেশভক্তের আচরণের ভিত্তি প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারে। মাঝখানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলেও সেই প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরবর্তী প্রয়াস তেজস্বী ও প্রভাবী হতে পারে। এই আন্দোলন এইরূপ অভিজ্ঞতারই শিক্ষা দিয়েছিল, যার ভিত্তিতে ডাক্তারজী পরবর্তী পদক্ষেপ রাখার পথ খুঁজছিলেন।

১৯২১ সালের আন্দোলন সরকারের বিরুদ্ধে হওয়া সত্ত্বেও তার পিছনে গান্ধীজীর 'হিন্দু-মুসলিম একতার' ভাবই প্রবল রূপে প্রতীয়মান হচ্ছিল। এই আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার আগে থেকেই খিলাফৎ আন্দোলনের সূত্রধররা ইংরাজদের এখান থেকে বহিষ্কৃত করে আফগানিস্তানের আমীরকে গদীতে বসাবার যোজনা তৈরী করছিলেন। গান্ধীজী এই যোজনার বিষয়ে অবহিত ছিলেন, কিন্তু স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর মতে এ ব্যাপারে তাঁর আশীর্বাদও ছিল। হিন্দুস্থানের সৌভাগ্যক্রমে এই ষড়যন্ত্র যদ্যপি সেই সময়ে সাফল্য লাভ করেনি, তথাপি আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে এর পিছনে খিলাফতের নেতারা মুসলমানদের অরাষ্ট্রীয় আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে যে সংগঠন গড়ে তুলেছিল সেটা চিরকালের জন্যে দেশের পক্ষে অভিশাপে পরিণত হল। কিছু লোকের মতে হিন্দু-মুসলিম একতার জন্য এটা গান্ধীজীর বিরাট সাহসেরই পরিচায়ক ছিল। কিন্তু কলেরার স্থানে নিরাময়ের জন্য প্লেগকে স্বীকার করে নেবার সাহস, মহাত্মাজী তিনি যে সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন, তার আত্মবিশ্বাসহীনতার কারণেই করতে পেরেছিলেন, অন্যথায় রাষ্ট্রীয় ভাবনায় পরিপূর্ণ মানুষ এই কাজকে গৌরবজনক বলে গ্রহণ করতে পারেনা। ডাঃ ভীমরাও আম্বেডকর এই প্রচেষ্টার বিষয়ে বলেছিলেন — "কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি কি হিন্দু-মুসলিম একতার জন্য এত দূর পর্যন্ত যেতে পারে?" ("Can any sane man go so far, for the sake of Hindu Muslim unity ?")। ডাঃ আম্বেডকর এইভাবে মহাত্মাজীকে ধিক্কার জানালেও, ডাক্তারজী এই কথা ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে এই ধরনের সকল প্রয়াসের পিছনে কেবল ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার দৌড় অথবা ইচ্ছাই কারণ নয়, পরন্তু আত্মবিস্মৃত হিন্দু সমাজের সামর্থ্যবিহীন তথা শোচনীয় অবস্থাই তার প্রকৃত কারণ।

ডাক্তারজী যখন জেল থেকে বেরিয়ে এলেন তখন মুসলমানদের মুখে 'বন্দেমাতরম্' এর স্থানে "আল্লা হো আকবর"-এর ধ্বনি গুঞ্জিত হচ্ছিল এবং সভা-সমিতিগুলিতে মোল্লা-মৌলবীরা 'কাফেরদের' হত্যা তথা 'জেহাদ'-এর অনুজ্ঞা প্রদানকারী কোরান শরীফের আয়াৎ পাঠ করে শোনাতেন। আলি-ভ্রাতৃদ্বয়ের মত ব্যক্তিরা যে খিলাফতের নেতা ছিলেন, তার থেকে আর কী আশা করা যেতে পারে? কারণ হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার কাজেই কৌশল দেখাবার জন্য 'ফিরিঙ্গি মহল' থেকে তাঁদের মৌলানার সনদ লাভ হয়েছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও এই মনোভাব প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিল যে মুসলমানেরা অন্য সকলের থেকে আলাদা এবং কিছুটা বিশেষ ধরনের মানুষ। ইংরাজী শিক্ষার যে পরিণাম হিন্দুদের উপর দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল, তা মুসলমানদের উপর দেখা যাচ্ছিলনা। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন, "ধার্মিকতার কোন আকর্ষণ নেই এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার মুসলমানেরাও দাড়ি রাখতে শুরু করে দিল এবং গোঁড়া আচার আচরণ পালন করতে লাগল।" বেচারা সরল প্রকৃতির হিন্দুদের পকেট থেকে নিষ্কাসিত আশি লক্ষ টাকার অর্থরাশি সেই সময় মুসলমান নেতাদের হস্তগত হয়েছিল। এর পরে পৃথক হয়ে দাঁড়ানোই তাদের যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল এবং বিচ্ছিন্নতার বিষাক্ত প্রচার ওরা বেশ জোরালোভাবে শুরু করে দিল।

ডাক্তারজী একটি পরিষদের বৈঠকে যোগদান করতে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে সমীউল্লা খাঁও তাঁর সঙ্গে যাচ্ছিলেন। ডাক্তারজী সেই সময়ে সাদা খদ্দরের টুপি এবং মাঝে মাঝে খদ্দরের চাদর ব্যবহার করতেন। খাঁ সাহবের মাথায় তুর্কী টুপি দেখে ডাক্তারজী জিজ্ঞেস করলেন, "অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে সাদা টুপির এত প্রচলন হবার পরেও আপনি তা পরতে শুরু করেননি?" তৎক্ষণাৎ খাঁ সাহেব স্পষ্ট কথায় উত্তর দিলেন, 'আমি প্রথমে মুসলমান এবং এই টুপি তারই প্রতীক। তাই এ টুপি ত্যাগ করার তো প্রশ্নই ওঠেনা।" মুসলমান মনের পরিচয় জানার সময়ে আর একটি ঘটনার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যখন তিনি জেলে ছিলেন তখনই মালাবারে মোপলাদের দ্বারা সরকার ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র দাঙ্গার সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের নেতাদের যে কোন মূল্যে মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে চলার নীতির দরুন এই ঘটনার ভয়ঙ্করতার সংবাদ জনসাধারণ জানতে পারেনি। মোপলা-কাণ্ডের পরে যখন কংগ্রেস ঐ ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করার প্রস্তাব গ্রহণ করল, তাতে মোপলাদের পর্বত-প্রমাণ অত্যাচারকে সর্ষের মত ক্ষুদ্র করে এবং সরকারী দমনের সর্ষের মত ক্ষুদ্র সংবাদকে পর্বতের মত বিরাট আকারে প্রকাশ করা হয়েছিল। 'ভারত সেবক সমাজ' (সার্ভেন্ট্স অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটি')— এই সংস্থার নাম বদল করে 'হিন্দ সেবক সঙ্ঘ' করা হয়;)-এর পক্ষ থেকে মোপলা-বিদ্রোহের যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয় যে দেড় হাজার হিন্দু নিহত হয় এবং কুড়ি হাজার হিন্দুকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়। ধন-সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় তিন কোটি টাকা। কিন্তু কংগ্রেস তাঁর রঙ্গীন চশমা দিয়ে এ বিষয়টিকে কী ভাবে দেখেছিল তা বোঝা যায় তাদের নিম্নলিখিত প্রস্তাব থেকে — "যে সব হিন্দু পরিবারকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয় তারা ছিল মাজেরীর অধিবাসী, এবং যে ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা এই কাজ করে তারা খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিল, এবং এ যাবৎ প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে কেবল তিনটি পরিবারের উপর এই জোর জবর্দস্তি করা হয় বলে জানা গেছে।" (রাষ্ট্রীয় সভার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৫৪-২৫৫)। কোথায় কুড়ি হাজার আর কোথায় তিনটি মাত্র পরিবার!

মোপলাদের এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সেই কারণে মহাত্মাজী ও জওহরলালজী অত্যন্ত ব্যথিত হন। মহাত্মাজী লেখেন "... ঈশ্বর বিশ্বাসী শূর মোপলারা যাকে তারা ধর্ম বলে মনে করেছিল, তারা যে পন্থাকে ধার্মিক বলে মনে করত, তার জন্য সংগ্রাম করছিল।" ("...... brave, god-fearing moplahs who were fighting for what they consider as religion and in a manner which they consider as religious.") অনুরূপভাবে, নেহরুজীও মোপলাদের প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত করে সরকারী অত্যাচারের বর্ণনা করে লেখেন, "মোপলাদের বিদ্রোহ এবং অসাধারণ ভাবে তার দমন, বন্ধ রেলের কামরার মধ্যে গরমের চোটে মোপলা-বন্দীদের মৃত্যু, কী ভয়ঙ্কর তথা ক্রূরতাপূর্ণ ঘটনা ছিল।" ("The Moplah rising and its extraordinary cruel suppression, what a horrible thing was the baking to death of the Moplah prisoners in the closed railway vans.") ক্রূরতাকে শূরতা বলে মেনে নিলে এই

রকম অশ্রু-বিসর্জন সমর্থনযোগ্য অবশ্যই! কিন্তু এই তিক্ত সত্যকে অস্বীকার করা যায়না যে মালাবারের নির্যাতিত হিন্দুদের স্বয়ং তাদের দুর্দশার জন্য অশ্রু-বিসর্জনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, এবং কংগ্রেস নেতাদের বিপুল সহানুভূতির মণিকোঠায়, তাদের ধর্মান্ধ উন্মত্ততায় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আবরণে যে মোপলারা হিন্দুদের উপর নির্মম গণহত্যা ও বলপূর্বক ধর্মান্তরের অত্যাচার চালায়, তাদেরই একাধিপত্য বজায় ছিল।

মুসলমানদের খুশি করার জন্য মোপলা বিদ্রোহের ভীষণতার উপরে যখন এইভাবে চুনকাম করা হচ্ছিল, তখন ডাঃ মুঞ্জে স্বয়ং মালাবার পরিভ্রমণ করে ফিরে এলেন এবং সেখানকার হিন্দুদের ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ তথা স্বচক্ষে দেখা বিবরণ সকলের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। ডাক্তারজী ডাঃ মুঞ্জের গৃহে প্রতিদিন যাতায়াত করতেন। তিনি তাঁর বর্ণনা পুরোপুরি শোনেন। কার কী মনে হবে তার আদৌ চিন্তা না করে ডাঃ মুঞ্জে বললেন, "মুসলমানদের রাজত্বের সমাপ্তির পরে হিন্দু জনসাধারণের উপর এমন ভয়ঙ্কর আকারে বিপদ এই প্রথম বার দেখা গেল।" সেই সময়ে ডাঃ মুঞ্জে এইরূপ যোজনাও রাখেন যে ঐ জংলী ধর্মান্ধ মুসলমানদের হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য ঐ অঞ্চলে শিখ, রাজপুত ও মারাঠাদের নিয়ে গিয়ে বসানো উচিত। এই ঘটনা ১৯২৩ সালের মে মাসের।

সেই সময়ে মালাবারের মহিলারা তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড রীডিং-এর স্ত্রীর নিকট অত্যন্ত করুণ আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। আবেদন পত্রে তাঁরা লেখেন ঃ "... আমাদের দাবী অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ করা এবং আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যদি সরকার অসম্ভব বলে মনে করেন তাহলে আমাদের প্রার্থনা এই যে এই প্রান্তের কাছাকাছি আমাদের যে কোন স্থানে জমি প্রদান করা হোক। সেই প্রদেশ যদি আমাদের প্রদেশের মত প্রকৃতির কৃপায় সমৃদ্ধ নাও হয় তথাপি সেই স্থান মানুষের পাশবিক ক্রূরতার অভিশাপ থেকে তো মুক্ত থাকবে।"

মোপলাদের এই বিদ্রোহের পরেও মুসলমানদের তোষণের কংগ্রেসী প্রয়াস বরাবর চলছিল। অসহযোগ আন্দোলনে বহুমূল্য বিদেশী বস্ত্রের হোলি জ্বালানো হচ্ছিল এবং তার ফলে জনসাধারণের মনে দেশভক্তির অগ্নি প্রদীপ্ত হচ্ছিল। কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন দেশ ও স্বাধীনতার সহিত মুসলমানদের কোন সম্পর্ক ছিলনা এবং তার প্রতি তাদের কোন কর্তব্য ছিল বলেও মনে হচ্ছিল না। তারা এই ধরনের বস্ত্রের হোলি না জ্বালিয়ে সেগুলি তাদের তুর্কী বন্ধুদের প্রেরণ করার অনুমতি গান্ধীজীর কাছে চাইল। এবং মুসলমানদের জন্য মোমের থেকেও নরম গান্ধীজী তাদের সেই অনুরোধও স্বীকার করে নেন। সেই প্রকার মুসলমানদের প্রিয় স্লোগান "আল্লা হো আকবর" ধ্বনিও শুরু হয়ে গেল। কিন্তু ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসে মৌলানা শওকত আলি "মুখে রাম, বগলে ছুরি' এই উক্তিটিকে চরিতার্থ করে কর্ণাবতীর এক সভায় বলেন, "আল্লা হো আকবর' এবং 'বন্দেমাতরম্' ঘোষণা দুটির মধ্যে আগের মত একতা আমি দেখতে পাই না। হিন্দুরা 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি দেবার পরেও মুসলমানেরা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দেয় না। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে হিন্দুরা আমাদের খিলাফৎ আন্দোলনে কত সাহায্য করেছে সে কথা তোলা উচিত নয়।" এ সবই ছিল লোক দেখানো কথা। এর থেকে 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনিকেই উৎসাহ প্রদান করা হয়। সেই সঙ্গে অসংগঠিত হিন্দু

সমাজের মনে ভীতির সঞ্চার করে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচারকারী মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি করা হয়। এই সমস্ত অপকৌশল এবং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির প্রতি ডাক্তারজী সূক্ষ্মরূপে দৃষ্টি রাখছিলেন। তিনি উপর হতে পরিদৃশ্যমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে মুসলমানদের আক্রামক এবং হিন্দুদের হীনবল মনোবৃত্তির কারণগুলির একেবারে মূলে গিয়ে তার মীমাংসায় সংলগ্ন ছিলেন। এই সমস্ত চিন্তণ চলার সময়েও তাঁর সমাজসেবার অনেক প্রকার কাজ বিঘ্নিত হয়নি। উপরন্তু সেই সময়েও তিনি কার্যকর্তা সংগ্রহের প্রয়াস অবিরাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯২২ এর আগষ্টের পরবর্তী ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি দিলেই তাঁর অবিশ্রান্ত পরিশ্রম তথা সমাজের নিরীক্ষণ সংক্রান্ত প্রয়াসের কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে।

১৯২২ সালে তিনি প্রান্তীয় কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হন এবং তার সহ সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। এই পদে কার্যরত থাকার সময়ে প্রতি পদে-পদে অনুশাসনের অভাব তিনি অনুভব করতেন। সেই অভাব দূর করার জন্য কংগ্রেসের মধ্যেই তিনি একটি সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক তহসিল থেকে চার জন করে ব্যক্তিকে ডেকে পাঠান হল। কিন্তু এই কাজে বিশেষ সাফল্য লাভ করা যায়নি, কারণ 'স্বেচ্ছাসেবক' বলতে সেই সময়ে নেতারা মনে করতেন চেয়ার-টেবিল যারা তোলে, এবং ফাই-ফরমাস খাটে — এইরকম বিকৃত কল্পনা ছিল। সেই সঙ্গে গান্ধীজীর অহিংসার বড়ি খাওয়ার দরুন এই ধরনের সংগঠনের প্রতি লোকেদের মনে মূলগত বিরূপতা ছিল। তার পরিণাম ডাক্তারজীর এই প্রয়াসের উপরেও অনুভূত হল। ডাক্তারজীর এই প্রচেষ্টার পরে ১৯২৩ সালে কোকোনাডা কংগ্রেস অধিবেশনে ডাক্তারজীর কলকাতার ছাত্রজীবনের সময় থেকেই তাঁর বন্ধু হুবলীর ডাঃ নাঃ সুঃ হার্ডিকর 'হিন্দুস্থানী সেবা দল' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সমর্থন লাভ করার পরেও তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয় সে কথা পণ্ডিতজী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে রেখে গেছেন। বলা বাহুল্য, ডাক্তারজীরও অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়। পণ্ডিত নেহরু লেখেন যে "প্রধান-প্রধান কংগ্রেসী নেতাদের সেবাদলের প্রতি বিরোধিতা দেখে আমাদের বড় আশ্চর্য হয়। কয়েকজন বলেন, এটা অত্যন্ত বিপদজনক পরিবর্তন, কারণ এর ফলে কংগ্রেসের মধ্যে একটি সৈনিক শ্রেণীর প্রবেশ ঘটবে এবং পরিশেষে সৈনিক দল অসৈনিক শ্রেণীর উপর লাঠি ঘোরাবে। কিছু লোক মনে করতেন যে স্বেচ্ছাসেবকদের শুধু মাত্র উপর থেকে দেওয়া আদেশ মাত্র পালন করার মত অনুশাসন দরকার, অন্য কোন কথার প্রয়োজন নেই, এমন কি পা মিলিয়ে চলার ব্যবস্থাও স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। কয়েকজনের মনে এই রূপ ভাবনা কাজ করছিল যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তথা অনুশাসনবদ্ধ কুচকাওয়াজ করে চলা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কল্পনা কংগ্রেসের অহিংসার নীতির সঙ্গে খাপ খায় না।"

'স্বেচ্ছাসেবক দল' তথা অনুশাসন সম্বন্ধে এই রকম বিকৃত ধারণার মাঝখানে ডাক্তারজীর মনোগত কল্পনাকে বাস্তবায়িত করার সুবিধা সেখানে কেমন করে পাওয়া যাবে? ডাক্তারজী কেবল ফাই-ফারমাস খাটার মত সেবক তৈরী করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল দেশাত্মবোধে ওতপ্রোত, শীল দ্বারা বিভূষিত, গুণোৎকর্ষ দ্বারা প্রভাবিত এবং

সীমাহীন সেবাভাব সহ স্বতঃস্ফূর্ত অনুশাসিত জীবন অতিবাহিত করার যারা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে এরকম ক্রিয়াশীল এবং কর্তব্য-পরায়ণ তরুণ লক্ষ-লক্ষ সংখ্যায় তৈরী হোক। এই পরিকল্পনায় কাজের প্রয়োজন অনুসারে কোন নেতা অথবা অন্য কোন ব্যক্তি তাঁর অনুগামী হলেও তাঁদের গুণ, স্বভাব, কর্তব্য এবং অনুশাসনে তাঁদের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য থাকবে না। যারা কারো কথা শুনবেনা, বরং এই মনোভাব নিয়ে চলবে যে তাদের কথাই সকলকে মান্য করে চলতে হবে, এবং কেউ তা না মানলে হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার করবে এবং অনুগামীদের সঙ্গে যথেচ্ছ আচরণ করবে — এই ধরনের ও এই প্রবৃত্তির নেতা ডাক্তারজী সর্বক্ষণই প্রত্যক্ষ করছিলেন। এ রকম ধরনের নেতারা শুধু টেবিল-চেয়ার তোলার মত স্বেচ্ছাসেবকই চান। ডাক্তারজী মনে করতেন যে নেতৃত্ব শুধু এমন লোকের হাতেই থাকা উচিত যাঁদের সেবাভাব হবে জ্বলন্ত তথা উৎসাহপূর্ণ। সেই সঙ্গে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন সমাজের মধ্যে পৌরুষ ও তারুণ্য ঘোরতরভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে। সেই সময়ে এক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর সহযোগীদের এক মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ডাক্তারজীর কয়েকজন বন্ধু একবার এক প্রদর্শনের জন্য কয়েকজন হৃষ্ট-পুষ্ট তথা সাহসী যুবকদের সংগ্রহ করেন। তাদের দেখেই কংগ্রেসের অহিংসাপন্থী নেতাদের ভুরু কুঁচকে উঠল। তাঁরা বললেন, "এই রকম তরুণদের যদি আপনারা প্রদর্শনের জন্য পাঠান তাহলে পুলিশের লাঠির মার নিজেরা সহ্য করার পরিবর্তে ওরা সেই লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে পুলিশদেরই মেরে তাড়াবে।" একথা শুনেই ডাক্তারজীর বন্ধুদের হাসি এসে গেল এবং তাঁরা বললেন, "এদের যদি প্রতিরোধ করতে না বলা হয়, তাহলে এরা প্রতিরোধ করবেনা। কিন্তু দুর্বল স্বেচ্ছাসেবকরা লাঠির মারের চোটে নিজেরাই মরে যাবে এবং এইভাবে হিংসাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। তার থেকে যারা এইরূপ হিংসা এড়িয়ে যেতে সক্ষম সে রকম এই বলবান্ তরুণদের প্রতিকারই তো ভাল হবে।" এটা হল ১৯২২-২৩ সালে মাদক-বিরোধী এক প্রদর্শনের অভিজ্ঞতা।

পাঞ্জাব ও রাজস্থানে যে বিপ্লবী তরুণদের প্রেরণ করা হয়েছিল তাঁদের ফিরিয়ে এনে উপার্জনের কাজে লাগানোর কাজ অনেকটাই সম্পূর্ণ হয়েছিল। সেই দলের প্রধান শ্রী গঙ্গাপ্রসাদ পাণ্ডে তখনও ফিরে আসেননি। অতএব, তাঁদের এই বন্ধুকে ফিরিয়ে এনে তাঁর গুণ তথা অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে ওয়ার্ধার শ্রীরালেগণকরের একটি স্থান ভাড়া নিয়ে সেখানে শ্রী গঙ্গাপ্রসাদের নেতৃত্বে 'রাষ্ট্রীয় মল্ল বিদ্যাশালা' নামে একটি সংস্থা শুরু করা হল। সংস্থার জন্য একটি 'বিশ্বস্ত মণ্ডল' গঠন করে আগামী দিনে সম্পূর্ণ প্রান্তে তার শাখা খোলার কথাও চিন্তা করা হল। তদনুসারে ডাক্তারজীর সভাপতিত্বে একটি 'বিশ্বস্ত মণ্ডল' গঠিত হল। বিপ্লব আন্দোলন চলার সময়ে যে তরুণদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে, অন্যান্য কর্তৃত্ববান তরুণদের সন্ধান করার ব্যবস্থা করা — এই দুইটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সংস্থা গঠন করা হয়েছিল। এই শালাতে পাঞ্জাবের দিক থেকে দশ-বারো এবং মধ্যপ্রান্তের বারো তেরজন তরুণ ছিল। চাকর-বাকর নিয়ে সংস্থায় প্রায় ত্রিশজন ছিল। ব্যায়াম, কুস্তি, মলখম্ব ছাড়া ধনুর্বিদ্যা শিক্ষাও এখানে দেওয়া হত।

গঙ্গাপ্রসাদ ডাক্তারজীর বিপ্লবী আন্দোলনের সময়ের একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত, নির্ভীক ও বুদ্ধিমান সহকর্মী ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বভাবে অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ব্যক্তি ছিলেন। মিতব্যয়িতা তিনি জানতেনই না। সেই কারণে বিদ্যালয়ের পক্ষে তাঁর ভার বহন করা কষ্টকর হয়ে পড়ল। সকালে দুধ, বাদাম এবং দুবেলা ভালো ভোজন ছাড়া মাঝে-মাঝে মিষ্টান্ন ও মালাই—এই ছিল তার সারা দিনের ভোজন। এছাড়া অন্য খরচও হত দরাজ হাতে। তিনি নিজে এক হাজার ডন লাগাতেন এবং অন্যান্যদেরও প্রচুর ব্যায়াম করিয়ে নিতেন। ওখানকার তরুণদের প্রশস্ত বুক, পুরুষ্টু মজবুত বাহুদণ্ড, সতেজ চক্ষু এবং অঙ্গকান্তি দেখে ডাক্তারজী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হতেন, এবং এই কারণে পাণ্ডের খরচের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে যে দৌড়াদৌড়ি ও কষ্ট সহ্য করতে হত তা তিনি সানন্দে সহ্য করতেন। এইভাবে যেমন-তেমন করে সংস্থা দেড় বছর চলার পরে পাঞ্জাব থেকে গঙ্গাপ্রসাদের বিরুদ্ধে এক তদন্তের ঝামেলা পিছনে লাগল এবং নাগপুরের গোয়েন্দারাও এ ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে পড়ল। ডাক্তারজী সরকারের এই গতিবিধি লক্ষ্য করে সংস্থা বন্ধ করে দিলেন। এই কাজ করার সময়ে তিনি গঙ্গাপ্রসাদের একটা ব্যবস্থা করার কথা ভোলেননি। এই দায়িত্ব তিনি ওয়ার্ধার শ্রী আপ্পাজী যোশীকে দিয়েছিলেন।

এই কর্মশালার কাজ উপলক্ষে তাঁকে মাঝে-মাঝে ওয়ার্ধা যেতে হত। সেই সময়ে কংগ্রেসের মধ্যে 'পরিবর্তন-অপরিবর্তনের' বিবাদ শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং বিশেষ আলোচনা এই বিষয়টি নিয়েই চলত। এই বিবাদে ডাঃ মুঞ্জের সহিত ঘনিষ্ঠতার কারণে তাঁর প্রবৃত্তি কাউন্সিলে প্রবেশের অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার উপর বিশেষ জোর দিতেন না। সেই সময়ে কংগ্রেস কার্যকর্তাদের শিবিরে বসবাসকারী পণ্ডিত রামগোপাল বিদ্যালংকারের সঙ্গে তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তিনি ডাক্তারজী সম্বন্ধে বলতেন, "ডাক্তারজী রামভাউ পিঙ্গলে, বামনরাও ঘোরপড়ে, রাজারাউ ডোঙ্গরে প্রমুখ বন্ধুদের সঙ্গে বেশ মেলামেশা করতেন। তাঁরা শিবিরে এলেই 'অহিংসাকে নীতির স্থানে সিদ্ধান্ত বলে কেন গ্রহণ করেন?' 'মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব কেন করেন?' প্রভৃতি প্রশ্ন করা হত এবং পরিবর্তনবাদী চিন্তাধারাকে স্বীকার করে শৃঙ্খলা-পরায়ণ জীবন তৈরী করার কথা আগ্রহের সঙ্গে বলতেন। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।" যাদের মতের সঙ্গে মিল নেই তাদের থেকে চার হাত দূরে থেকে তাদের উপর সমালোচনার অস্ত্র নিক্ষেপ করা ডাক্তারজী পছন্দ করতেন না। তিনি নিজের বক্তব্য রাখার জন্য খোলা মন নিয়ে ভিন্নতর চিন্তাধারার সমর্থকদের কাছে যেতেন এবং অসংকোচে তাঁদের সহিত চিন্তার আদান-প্রদান করতেন। এর পরিণাম সব সময়ে ভালই হত। এ বিষয়ে পণ্ডিত রামগোপালজী বলেন, "ডাক্তারজী মত-পার্থক্য থাকলেও মধুর সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। এই কারণে, আমি যখন তাঁর বাড়ীতে যেতাম, তখন তিনি প্রাণ খুলে হাসতে-হাসতে বলতেন — "আমি আপনাকে স্বাগত জানাই, কিন্তু আপনার চিন্তাধারাকে নয়।" চিন্তাধারা ও ব্যক্তিকে মনের মধ্যে পৃথক রেখে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তার প্রভাব ব্যক্তিগত ভালবাসার উপর যাতে না পড়ে সেই কলা ডাক্তারজীর স্বভাবের এক অলৌকিক এবং লোক-সংগ্রহের দৃষ্টি থেকে একটি অত্যন্ত প্রভাবী গুণ ছিল। পণ্ডিত রামগোপালজী ওয়ার্ধা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'রাজস্থান কেসরী' পত্রিকার

সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু ডাক্তারজী শিবিরে গেলে সেখানে এই সব বন্ধুদের সাথে খুব হাসি-খেলা এবং প্রচুর আড্ডা ও আনন্দের মধ্যে কাটিয়ে ফিরতেন।

যে বছর ডাক্তারজী কারাগার থেকে মুক্ত হলেন, সেই বছরের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল 'অনাথ বিদ্যার্থী গৃহের' স্থাপনা। সেই বছরের গণেশ চতুর্থীর দিন ডাক্তারজীর বন্ধু শ্রীগোবিন্দ গণেশ চোলকর এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। এই কাজে তিনি ডাক্তারজীর সহযোগিতা লাভ করেন। সন্দেহ নেই যে শ্রী চোলকর কর্তৃক স্থাপিত এই সংস্থা দরিদ্র ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ উপকারী প্রমাণিত হয়। কিন্তু এই সংস্থা শহরের বাইরে ভাণ্ডারা মার্গে স্থান লাভ করার পর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত গুপ্ত বিপ্লবীদের নানা সময়ে আশ্রয় দানেরও বিরাট কাজ করেছিল। এই স্থানে ডাক্তারজী কিছুদিন গোপন অস্ত্র-শস্ত্রের বাক্সও লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং বিপ্লবীদের সেখানে রেখে তাদের জন্য প্রতিদিন নিয়ম করে ভোজন পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই সময়ে যারা ভোজনের টিফিন-বাক্স পৌঁছে দেবার কাজ করতেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীতাত্যা তেলঙ্গ ও ভেদী প্রমুখ কয়েকজন বাছাই করা তরুণ এই কথা জানতেন। এই সংস্থার কার্যকারী মণ্ডলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ডাক্তারজীর সম্পর্ক ছিল এবং মাঝে-মাঝে তিনি সংস্থার কাজে মনোনিবেশ করতেন। পরবর্তী সময়ের একটি ঘটনা প্রাসঙ্গিক হওয়ায় এখানেই তার বিষয়ে আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত হবে। একবার 'অনাথ বিদ্যার্থী গৃহের' দুইটি বালককে এক মিশনারী মহিলা ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারজী তাঁর সহযোগীদের সাহায্যে অনেক চেষ্টার পর তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। এই ঘটনার উল্লেখ ১৯২৬ সালে সংস্থার প্রতিবেদনে শ্রী গোবিন্দরাও চোলকর করেছিলেন।

ঐ সময়ে বিভিন্ন পরিষদে যাওয়ার কাজও অব্যাহত ছিল। ডাঃ মুঞ্জে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনেও' ডাক্তারজী অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে অনুশাসন, সঞ্চলন এবং লক্ষ্যভেদ — এই বিষয়গুলি পদদলিত রাষ্ট্রের স্বত্ত্বকে বজায় রাখার দিক থেকে বিশেষ উপযুক্ত। এই ধারণা অহিংসার সেই অন্তঃসারশূন্য ঢিলাঢালা বাতাবরণেও কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস পায়নি। কলকাতায় অবস্থানকালেই তিনি বন্দুক চালাতে শিখেছিলেন। সেই কারণে সুবিধা পেলেই তিনি বন্ধুবর শ্রীভাউসাহেব টালাটুলের সঙ্গে বেশ আগ্রহের সহিত শিকারেও যেতেন। সেই সময়ে দু-তিন দিন জঙ্গলেও থাকতে হত।

এই রকমই একদিন বান্নেরা গ্রামে একটি গাছে বেগুণ টাঙ্গিয়ে তাইতে নিশানা লাগাবার প্রতিযোগিতা শুরু হল। সেদিন ডাক্তারজীই একমাত্র নিখুঁত নিশানায় গুলি মেরে বাকি সকলকে হারিয়ে দেন। অন্য এক সময়ে তাঁর এক বন্ধু বন্দুকে কোন কার্তুজ নেই মনে করে বন্দুকের ঘোড়া একটু টিপে দিতেই একেবারে নিকটে দণ্ডায়মান ডাক্তারজীর গা ঘেঁসে সুঁউউ করে গুলি বেরিয়ে গেল। একেবারে প্রায় শরীরের সঙ্গে ঠেকে মৃত্যুর বেরিয়ে যাওয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে ডাক্তারজী বলেছিলেন যে "গুলি থাকুক বা না থাকুক, ঠাট্টাচ্ছলেও কোন মানুষের দিকে তাক করে বন্দুক চালানো উচিত নয়।"

শহরে কোন নতুন কাজ শুরু হলে তাতে ডাক্তারজী নেই এরকম সহসা কখনো হত না। ১৯২২ সালে খেলাধুলার জন্য গঠিত প্রান্তীয় সমিতিতেও তাঁর নাম পাওয়া যায়। মহালে

'নরসিংহ সিনেমাঘর'-এর কাছে হনুমানজীর মন্দিরে দৈনিক সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনাতেও অন্যদের সঙ্গে তিনি উপস্থিত থাকতেন। স্বাধ্যায় মণ্ডলে গিয়ে যেমন তিনি আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন, তেমনই বন্ধুদের গৃহেও প্রীতিভোজে যোগদান করতেন। যেখানে কয়েকজন সমবয়স্ক ব্যক্তি একত্রিত হতেন, অথবা রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক দৃষ্টিতে কোন কার্যক্রম হত, সেখানেই তিনি প্রয়াসপূর্বক যোগদান করতে যেতেন। মদের ভাটিখানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের পিঠেও তিনি হাত বুলিয়ে দিতেন, আবার বালক-বালিকারা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে গণেশোৎসবের আয়োজন করলে নিজের দারিদ্রের কথা চিন্তা না করে তাদের চাঁদাও দিতেন।

কিছু লোকের একথাও মনে আছে যে সেই সময়ে ডাক্তারজী নাগপুরের 'খণ্ডোবা' মন্দিরে কবি পরমানন্দ রচিত 'শিব ভারত'-এর উপর কয়েকটি প্রবচনও দিয়েছিলেন। তাঁর প্রবচন-এর স্বরূপ বিশেষ ধরনের হত। প্রাঃ নাঃ সিঃ ফডকে এই বিষয়ে লেখেন যে ''বক্তা তাঁর বক্তৃতার বিষয় হিসাবে গীতার কোন শ্লোক অথবা দাসবোধের কোন বাণী দিয়ে শুরু করলেও গীতা বা দাসবোধের সূত্র ধরে তিনি রাজনীতি এবং তা-ও লোকমান্য তিলকের উগ্র রাজনীতির বিষয়েই বক্তৃতা দিতেন।''

সেই বছর কলকাতায় বিপ্লবীদের এক গুপ্ত বৈঠকেও তিনি গিয়েছিলেন, যদিও প্রকাশ্য কারণ হিসাবে তিনি জানিয়েছিলেন যে ''ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের এক সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছেন।'' ঐ বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল সে কথা জানার কোন উপায় নেই। কিন্তু সেই সময়ে বিপ্লবীরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দরুন পরিস্থিতি অত্যন্ত প্রতিকূল ছিল। অতএব, কিছু দিন চুপ করে থেকে উপযুক্ত সুযোগের জন্য অপেক্ষা করা এবং নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্তই সম্ভবতঃ গৃহীত হয়েছিল।

১৯২২ সালের ১৮ই মার্চ মহাত্মা গান্ধী ছয় বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁর মুক্তিলাভ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক মাসের ১৮ তারিখ 'গান্ধী দিন' রূপে পালন করা হত। ঐ বছরের অক্টোবর মাসের 'গান্ধী দিন' উল্লেখযোগ্য। মহাত্মাজী কারাগারে ছিলেন, এবং তাঁর তথাকথিত অনুগামীরা নিজেদের স্বার্থে মগ্ন থেকে যে যার পেশাগত কাজ করে চলেছিলেন, আর শুধু বাক্‌সর্বস্ব দেশভক্তির খেলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে ডাক্তারজী চোখ খোলা রেখে চলাফেরা করতেন, সেই কারণে এইরূপ অসংগতি তাঁর মনকে পীড়া দিত। তাঁর মনে কীরকম তুফানের সৃষ্টি হচ্ছিল, তা ১৯২২-এর অক্টোবর মাসে 'গান্ধী দিন' উপলক্ষ্যে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ থেকে উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলেন, ''আজকের দিন অত্যন্ত পবিত্র। মহাত্মাজীর মত স্থিতধী পুরুষের জীবনে ব্যাপ্ত সদগুণাবলীর শ্রবণ তথা চিন্তণের দিন আজ। যাঁরা নিজেদের তাঁর অনুগামী বলে থাকেন, তাঁদের উপর তাঁর এইসব গুণগুলির অনুকরণের বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত। মহাত্মাজীর অত্যন্ত মহত্ত্বের সদ্‌গুণ হল — হাতে যে কাজের ভার তুলে নেন তার জন্য সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তি। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন তাঁর অনুগামীদের নিকট হতে যদি কোন জিনিষের প্রত্যাশা করে, সেটা হল সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগের মুখে এক কথা বলা এবং কাজে অন্য রকম করা এইরূপ দ্বিচারিতার মনোভাবাপন্ন মানুষ গান্ধীজীর প্রয়োজন

নেই। মুখে 'মহাত্মাজী কী জয়', বলব, দুই হাত তুলে তাঁর কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন জানাব আর বাড়ী গিয়ে নিজের সুখ-আরাম ও অর্থ উপার্জনের সব কাজ একই ভাবে চালিয়ে সেই কার্যক্রমের বিপরীত আচরণ করব—এরূপ কপট অনুগামীদের সাহায্যে মহাত্মাজীর কর্মের নৌকা কখনই তীরে ভিড়তে পারবে না। নিজেদের দুর্বলতা গোপন করার জন্য শান্তির আবরণের আশ্রয় নেবেন না। প্রতিপক্ষের সমান শরীরে সামর্থ্য আনুন এবং তার পরে শান্তির ভাষা উচ্চারণ করুন, তবেই সেটা শোভনীয় হবে। মহাত্মাজীর অনুগামী যদি হতে চান তাহলে বাড়ীতে তুলসী-পত্র রেখে, সর্বস্ব ত্যাগ করে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।"

ডাক্তারজীর অন্তঃকরণে সর্বদাই এই ধরনের ভাবনার উদ্রেক হত। সম্মুখের বিকট সমস্যা তিনি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছিলেন এবং কী ভাবে তার সমাধান করা যায় সেই চিন্তার মাধ্যমেই তিনি পরিস্থিতির মন্থন করতেন। ঐ সময়ের এবং তার পরবর্তী সময়ের ডাক্তারজীর অবস্থা দেখে সমর্থ রামদাসের এই বাণী কানে গুঞ্জিত হতে থাকে ঃ —

"ভাগ্যবন্ত নর যত্নাসী তৎপর
অখণ্ড বিচার চালণেচা।
চালণেচা যত্ন যত্নাচী চালনা
অখণ্ড শহাণা তোচি এক।।"

(ভাগ্যবান্ মানুষ সেই যে যত্নে তৎপর, এগিয়ে চলাই যার লক্ষ্য। সঞ্চালনের যত্ন, যত্নের সঞ্চালন যে করে সেই একমাত্র পরিপূর্ণ বিচক্ষণ ব্যক্তি।)

১১. দিণ্ডী সত্যাগ্রহ

নাগপুর অধিবেশনের পর দিনের পর দিন গান্ধীজীর প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার সূত্র তাঁর অনুগামীদের হস্তগত হতে থাকে। এই নতুন পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের যে পুনর্গঠন করা হয়, তার মাধ্যমে নাগপুর, ভাণ্ডারা, ওয়ার্ধা এবং চান্দা জেলা নিয়ে মারাঠী মধ্যপ্রদেশ নামে একটি পৃথক প্রান্ত গঠন করা হল। কিন্তু এই প্রদেশের কংগ্রেস প্রথম থেকেই তিলকের মতাবলম্বীদের হাতে ছিল এবং অসহযোগ-আন্দোলনের কালেও তাঁদের প্রভাব কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। চতুর্দিকে গান্ধীবাদীদের হাতে কংগ্রেস চলে গেলেও এই একমাত্র প্রান্ত ব্যতিক্রম রূপে থেকে গিয়েছিল। সে কথা শেঠ যমুনালাল বজাজের মত গান্ধী-ভক্তদের মনঃপুত হচ্ছিল না। অতএব, ১৯২২ নাগাদ এই প্রদেশের কংগ্রেসের ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য দুইটি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান ছিল।

এদিকে খিলাফৎ তথা অসহযোগ আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখে ডাক্তারজী অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন এবং নতুন পথ অন্বেষণের প্রয়াস করছিলেন। কিন্তু এই নতুন পথ খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর সহযোগীদের এই সূচনা দিয়ে রেখেছিলেন যে বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব তাঁরা যেন নিজেদের হাতে রাখার চেষ্টা করেন। অতএব, শ্রী আপ্পাজী যোশী এবং তাঁর কয়েকজন সমবয়স্ক তরুণ কার্যকর্তারা 'গয়া কংগ্রেসের' পূর্ববর্তী নির্বাচনে গান্ধী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জোরদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই সময়ে পুরাতন প্রজন্মের মধ্য থেকে তিলকপন্থী ডাঃ মুঞ্জে, ব্যারিস্টার অভ্যঙ্কর, চান্দার শ্রীবলবন্ত রায় দেশমুখ ইত্যাদি সজ্জনরা এই তরুণবর্গের পিছনে ছিলেন। সেই কারণে নির্বাচনে তাঁদের জয় হল। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এর পরেও বেশ কয়েক বছর ধরে চলতে থাকে।

ডাক্তারজী ঐ সময়ে কংগ্রেসেই ছিলেন এবং খাদির টুপি ও চাদর ব্যবহার করতেন। বিভিন্ন স্থানের মানুষ তাঁকে যে খদ্দরের বস্ত্র উপহার দিতেন, সেগুলি তিনি প্রেমপূর্বক গ্রহণ করতেন। কংগ্রেসে থাকা সত্ত্বেও অতি আড়ম্বরযুক্ত কথাবার্তা তথা আচার-আচরণের প্রতি তাঁর কোন শ্রদ্ধা ছিলনা। তিনি খাদির বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু কংগ্রেসে যখন কোন নির্বাচন হত, তখন ভাড়া করে অথবা কারুর কাছ থেকে চেয়ে এনে খদ্দরের পোশাক পরে ভোট দিতে যাবার ব্যাপারটি সকলেরই জানা থাকা সত্ত্বেও ঐ নিয়মের বিষয়ে আগ্রহ কেন, তা তাঁর বোধগম্য হতনা। সেই সঙ্গে তিনি মনে করতেন নিজের হাতে সুতো কেটে খদ্দর ব্যবহার করাই সব থেকে ভাল। কিন্তু ভারতের কারখানায় ভারতীয় শ্রমিকদের তৈরী বস্ত্র বর্জন করতে হবে কেন? ম্যাঞ্চেস্টার তথা অন্য বিদেশী বস্ত্র পূর্ণতঃ ত্যাজ্য মনে করে চলা তো সঠিক কাজ, কিন্তু দেশের কোটি-কোটি জনসাধারণের জন্য খদ্দরের কাপড়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলেও এবং আর্থিক দিক থেকে সেটা লাভজনক না হওয়া সত্ত্বেও ভারতে তৈরী

বস্ত্র যখন পাওয়া যাচ্ছে, তখন খদ্দরের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি নিজে যতটা সম্ভব খদ্দর, অন্যথায় স্বদেশী বস্ত্রই ব্যবহার করতেন।

স্বয়ংসেবক তৈরী করার প্রয়াস তাঁর অব্যাহত ছিল এবং সংবাদ পত্র থেকে জানা যায় যে ১৯২৩ সালে ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত স্বয়ংসেবক পরিষদেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি সভা, পরিষদ্ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতেন বটে, কিন্তু সেগুলির অসম্পূর্ণতা দেখে তিনি চিন্তিত হতেন। অন্য বারের মত এ বছরও তিনি গণেশোৎসবের কার্যক্রমের জন্য বিভিন্ন স্থানে গেলেন। এই সময়ে তিনি যে বক্তৃতাগুলি দিতেন তাতে ক্রমাগত এই কথার উপর জোর দিতেন যে প্রচলিত প্রচেষ্টার মধ্যে পরিবর্তন আনা দরকার। ৪ঠা এপ্রিল তারিখে সালোডের নাচণগাঁও পরগনা-পরিষদের সভাপতি রূপে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। সেদিন তিনি যে ভাষণ দিলেন তা এতই গরম ছিল যে অনেকের মতে তাঁর ভাষণ অহিংসার সীমা উল্লঙ্ঘন করে যাচ্ছিল। পরের দিন দেহগাঁও-এ পরগনা-পরিষদ্ ছিল। সেখানেও ডাক্তারজীই সভাপতি ছিলেন। সেখানে এইরূপ কার্যসূচী স্থির হয়েছিল যে সভার শুরুতে গোপূজন করা হবে এবং পরিষদে গোরক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে। কিন্তু ঐ পরিষদে আগত কয়েকজন গান্ধীবাদী সজ্জনের এই কার্যসূচীতে সম্মতি ছিলনা এবং তাঁরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। মহাত্মা ভগবানদীন ডাক্তারজীকে বললেন, "গোপূজন তথা গোরক্ষা কংগ্রেসের কার্যক্রমের মধ্যে নেই। অতএব, সভায় যদি এই কার্যক্রম নেওয়া হয় তাহলে আমি উপস্থিত থাকবনা।"

ডাক্তারজী তাঁর বক্তব্য শান্ত ভাবে শুনলেন, কিন্তু পূর্বনির্ধারিত কার্যক্রমের পরিবর্তনে সম্মতি দিলেন না। নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুযায়ী সভার পূর্বে গোপূজন হল। সেই সময়ে ভগবানদীন রাগতভাবে উঠে সভা থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। ডাক্তারজী বিচক্ষণতার এবং লোক-সংগ্রহের মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে ভগবানদীনজীকে বিশেষ অনুরোধ করে যেতে নিষেধ করলেন এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণের পরেই তাঁকে তাঁর বক্তব্য পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপন করতে বললেন। তিনি বক্তৃতা দিয়ে চলে যাওয়ার পর ডাক্তারজী বহু সহস্র জনতার সম্মুখে তাঁর সভাপতির ভাষণ দিলেন। সকল ব্যক্তিই একই ছাঁচে গড়া গণপতির মূর্তির মত হতে পারেনা। অতএব, তাঁদের স্বভাব, অভিমত ও ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। যেখানেই মত-পার্থক্য ঘটবে সেখানেই বিবাদ শুরু করে দেওয়ার পরিবর্তে সৌজন্য তথা সদিচ্ছার সাহায্যে তাকে শেষ করে দেওয়ার মধ্যেই লোক-সংগ্রহের রহস্য অন্তর্নিহিত। ডাক্তারজী সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন যে মতভেদের কারণে যেন তিক্ততার সৃষ্টি না হয়।

অনেক বার দেখা যায় যে বহু লোকের বর্তমানে যা আছে তা পছন্দ হয়না, অথচ অন্য কোন উপায়ও দেখতে পায় না। এই মনঃস্থিতির কারণে তারা অন্যমনস্ক হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ডাক্তারজী এই শ্রেণীর মানুষ ছিলেন না। তিনি প্রচলিত কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নেননি এবং নতুন অন্বেষণের প্রয়াসও ত্যাগ করেননি। ১৯২২-এর পরে দু বছরের মধ্যে ডাক্তারজী এবং তাঁর সঙ্গীরা বেশ কয়েকবার বৈঠক করে তখনকার পরিস্থিতির মধ্যে থেকে কোন্ পথ খুঁজে বের করা যায় এ বিষয়ে প্রচুর আলোচনা করেন। এ সম্বন্ধে কর্মবীর বাপুজী

পাঠক বলেন, "ডাক্তার, বটে, হরকরে, বামনরাও ঘোরপড়ে, হিঙ্গনঘাটের ঘটওয়াই প্রমুখ আমরা সব বন্ধু টোঙ্গুর ঘরের নিকট তিন-চার বার একত্রিত হই। এতেও সকলের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ডাক্তারজীর মনোভাব ছিল যে নির্বাচনের রাজনীতি হতে অলিপ্ত থেকে এমন সংস্থা গঠন করা যার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে সংস্কারিত করা যায়। কিন্তু তাঁর এই কল্পনা অন্যদের মনঃপুত হয়নি।"

মহাত্মাজীর জেলে যাওয়ার আগেই অসহযোগ-আন্দোলন স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। কংগ্রেসের মধ্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিধান-মণ্ডলগুলিতে প্রবেশের মনোভাব জোরালো হয়ে উঠছিল। এই অবস্থায় খিলাফতের দিকেও নজর দেওয়া কারো পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। সেই কারণে তাদের নেতারাও অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। ঠিক এই সময়ে এই নেতাদের উপর বাইরের পরিস্থিতিও প্রচণ্ড আঘাত হানে। যে খলিফার সমর্থনে ভারতের মুসলমানরা ইংরাজদের সঙ্গে অসহযোগ করছিল, তুর্কীর সাধারণ মানুষের মনেও তার জন্য কোন স্থান ছিল না। নবোত্থিত তুর্কী নেতা কামাল পাশা খলিফাকে অপসারিত করে তাঁকে বলেছিলেন, "খলিফা, তোমার গদি ইতিহাসের একটি ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এর অস্তিত্ব রাখার আর কোন ঔচিত্য নেই।" ("The Caliphate! Your office is no more than a historical relic. It has no ustification for existence.") এই ঘটনার পরে খিলাফতের নেতারা কামাল পাশাকেই অনুরোধ করেন — "আপনিই খলিফা হয়ে যান।" কিন্তু প্রতিনিধি মণ্ডলকে কামাল পাশা উত্তর দিলেন — "আপনারা ইংরাজ ও ফরাসীদের সাম্রাজ্যে থাকেন। আমি খলিফা হয়ে গেলে আপনারা কি আমার আদেশ পালন করতে পারবেন?" এ কথা শুনে প্রতিনিধি মণ্ডলের সদস্যরা বাক্যহীন হয়ে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। তাই দেখে কামাল হেসে বললেন, "যদি আদেশ পালন করতে না পারেন তাহলে খলিফা তো শুধু 'কাক-তাড়ুয়া' হয়ে বিরাজ করবে।" কামাল শুধু এটুকু বলেই থেমে থাকেননি, বরং তিনি সম্পূর্ণ তুরস্কে প্রচার করলেন যে বিজিগীষু তুরস্কের দৃষ্টিতে ইসলাম পরাজিতদের ধর্মমত এবং যেদিন থেকে এই ধর্মমত তুরস্কে পা রেখেছে সেদিন থেকেই এই দেশের অধঃপতন শুরু হয়েছে। এই প্রকারে জনমনকে জাগ্রত করে ১৯২৪-এর প্রারম্ভেই তিনি তুরস্ক থেকে খলিফাকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করেন। খিলাফৎ আন্দোলনের দোলনা গাছের যে ডালে ঝুলছিল, সেই ডালটাই ভেঙে পড়ে গেল। এই ঘটনায় খিলাফৎ-আন্দোলনের কারণে সংগঠিত তথা জাগ্রত মুসলমানদের মধ্যে এক পরাভূত মনোবৃত্তি তথা ব্যর্থতার মনোভাব পরিব্যাপ্ত হওয়া স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু সেই সময়কার মুসলিম নেতারা সজাগ থেকে কৌশলে মুসলমানদের ভাবাবেগকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে উস্‌কে দিল এবং "প্যান-ইসলামিজ্‌ম"-এর নতুন স্লোগান তুলে খিলাফতের দরুন সৃষ্ট মুসলমানদের সংগঠনকে ভগ্ন হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করল। ১৯২৩ সালের পরে মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত দাঙ্গাসমূহ এই নীতিরই পরিণতি ছিল।

ঐ বছর বর্ষা শুরু হওয়ার পরেই কোথাও প্রকাশ্যে গোহত্যা করে, আবার কোথাও হিন্দুদের বাজনা বন্ধ করে বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের উপর মুসলমানরা আক্রমণ আরম্ভ করে

দিল। ১৯২৩ সালের গ্রীষ্মকালে উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে যে দাঙ্গা হল, তা থেকে খিলাফৎ-আন্দোলনের হিন্দু-বিরোধী স্বরূপ স্পষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ করা গেল। সেখানকার ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখার পর নিজের মনোদশার বর্ণনা করে দেবতা-স্বরূপ ভাই পরমানন্দ তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন, "সেখানকার হিন্দুদের অসহায়তা ও নির্যাতন দেখে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হই। যখন আমি জানতে পারলাম যে 'খিলাফৎ সমিতির পদাধিকারীরা দাঙ্গা বাধাবার তথা হিন্দুদের জীবন ও ধন-সম্পদ্ বিনাশের জন্য দায়ী ছিলেন, তখন বাধ্য হয়ে আমাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হল যে 'খিলাফৎ-আন্দোলন'ই হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার মূলে ছিল।" এই অভিজ্ঞতা থেকে সজাগ হয়ে ভাই পরমানন্দ লাহোরে এলেন এবং সেখানে তিনি "হিন্দু সঙ্ঘ" নামে একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা করলেন। "খিলাফৎ-আন্দোলন'-এর এই স্বরূপ ১৯২৩ সালে নাগপুরেও প্রত্যক্ষ করা গেল এবং তার ফলে ডাক্তারজী যে কাজের পরিকল্পনা করছিলেন তার তাত্ত্বিক ভূমিকা দৃঢ়তর হল।

নাগপুরে 'শুক্রবার-পুষ্করিণী'র দক্ষিণ দিকে গণেশ পেঠ অবস্থিত। সেখানে একটি 'গণেশ মণ্ডল' চলত। এই কার্যালয়ের সম্মুখে খোলা জায়গা দেখে মুসলমানরা সেখানে একটি ঝুপড়ি বানিয়ে মসজিদ স্থাপন করে। এটা ১৯২১ সালের ঘটনা। সেই সময়ে 'হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই'-এর স্লোগান খুব প্রচলিত ছিল। অতএব হিন্দুরা মুসলমানদের এই কাজের কোন বিরোধিতা না করে তাদের সবরকম সাহায্যই প্রদান করে। মুসলমানদের আক্রমণের স্বরূপ প্রথম দিকে খুব ছোট ও গোপন আকারে শুরু হয়, যে কারণে সেদিকে কারুর দৃষ্টি যায়না, এবং যদি দৃষ্টি পড়েও তাহলে তাকে কোন সংকট মনে না করে তার প্রতি উপেক্ষাই দেখানো হয়। কিন্তু ধীরে-ধীরে হিন্দুদের কোমল মনোভাবের সুযোগ নিয়ে ক্ষুদ্র কাঁটাই শূল হয়ে হিন্দুদের বিদীর্ণ করতে শুরু করে। নাগপুরে মসজিদের জন্য যে সাহায্য প্রদান করা হয় তা একই ভাবে হিন্দুদের মাথার উপরেই বিপদ হয়ে দেখা দেয়। মসজিদ তৈরী হয়ে যেতেই মুসলমানরা হিন্দুদের হুমকি দেয় যে 'বাজনা বাজিও না'। সেই সঙ্গে হিন্দুদের শোভাযাত্রা ও মিছিল আট্‌কে দেওয়া শুরু হয়। "মুসলমানদের অসন্তুষ্ট করা ঠিক নয়" এই মনোভাব হিন্দুদের মনে সেই সময়ে এতই গভীরে প্রোথিত হয়েছিল যে তারা ঢোল তাশা ইত্যাদি বাজনা বাজানো একেবারে বন্ধ করে দিল। এই রকম সাফল্য লাভ করার পর ওরা 'পাখোয়াজ' বন্ধ করারও দাবী তুলল এবং পরবর্তী কালে বীণা প্রভৃতি শ্রুতি-নন্দন বাদ্যও তাদের কাছে কর্কশ বলে মনে হতে লাগল। কথিত আছে যে যখন মসজিদকে সাহায্য প্রদান করা হয়েছিল তখন মুসলমানরা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে হিন্দুদের বাজনা ইত্যাদিতে ওরা বাধা দেবেনা। কিন্তু ১৯২৩ সালের পর সব প্রতিশ্রুতি শিকেয় তুলে রাখা হল। শুধু তাই নয়, মসজিদের পিছনের দিকে আগে কোন দরজা ছিলনা, কিন্তু রাতারাতি পিছনের দিকেও দরজা তৈরী করা হল এবং ওদিকের রাস্তা দিয়েও বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে শোভাযাত্রা নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বাধা দেওয়ার সুযোগ তৈরী করা হল।

নাগপুরের বেশীর ভাগ মসজিদই বস্তুতঃ ভোঁসলেদের উদার তথা সহিষ্ণু মনোভাবেরই পরিণাম। ১৯২০-২১ পর্যন্ত কোন মসজিদের সামনেই বাজনা বাজাবার ব্যাপারে কোন

নিষেধ ছিলনা। কিন্তু ১৯২৩ সালে মুসলমানরা চীৎকার-চেঁচামেচি করে সেপ্টেম্বর মাসে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের তরফ থেকে গণপতির শোভাযাত্রা নিয়ে ঐ মসজিদের সামনে দিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়ে নিল। গণপতির মূর্তি মাত্র চার-পাঁচ দিন পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু ঐ আদেশের ফলে ঐ অঞ্চলে গণপতির কোন শোভাযাত্রা নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলনা। অতএব, রাজা লক্ষ্মণরাও ভোঁসলে, ডাঃ মুঞ্জে এবং ডাঃ হেডগেওয়ার এঁদের ভরসায় সেখানকার হিন্দু জনসাধারণ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে "যতক্ষণ বাদ্যযন্ত্র সহকারে শোভাযাত্রা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া না যাবে ততক্ষণ গণপতির বিসর্জন করা হবেনা।"

কংগ্রেস এবং খিলাফৎ-সমিতির মধ্যে বেশ কিছু দিন আলোচনা চললেও কোন মীমাংসার সম্ভাবনা দেখা গেলনা। স্থানীয় খিলাফৎ-সমিতির প্রতিনিধি 'ওকালতির ভাষা' ব্যবহার করে প্রস্তাব করল যে "আপনারা মসজিদের সামনে দশ পা জায়গা খালি ছেড়ে দিয়ে দু দিকেই বাজনা দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু মসজিদের সামনে বাজনা বাজাতে পারবেন না। এর ফলে আপনাদের বাজনা বন্ধ হবেনা এবং মসজিদের সামনেও বাজনা বাজবেনা।" এর থেকে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে বাজনাতে ওদের কোন কষ্ট হতনা, কিন্তু মসজিদের সামনে দশ পায়ের দূরত্বের মধ্যে বাজনা বাজানো চলবেনা — এই দুরাগ্রহ ওরা হিন্দুদের উপর চাপাতে চাইছিল। এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হিন্দুদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলস্বরূপ গণপতি পূর্ব স্থানেই থেকে গেলেন। শহরে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকল।

অক্টোবর মাসে ঐ পথেই কাকড় আরতির দিণ্ডী (ভজন মণ্ডলী) যাওয়ার কথা ছিল। সেই পথেও মুসলমানরা বাধার সৃষ্টি করতে পারে, এই আশংকায় রাজা লক্ষ্মণরাও ভোঁসলে মুসলমান নেতাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন — "আপনারা কাকড় আরতি তথা পাঁচ মন্দিরা সহ দিণ্ডী যেতে দিবেন কি না? ভেবে-চিন্তে উত্তর দিন।" এই স্পষ্ট প্রশ্ন শুনে এবং তাঁর মনোভাব দেখে ওঁরা "হাঁ" বলে দিলেন। তদনুসারে ২৩শে অক্টোবর দিণ্ডী নির্বিঘ্ন রূপে বাজনা বাজিয়ে চলে গেল। কিন্তু পরের দিনই মুসলমানরা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে দিণ্ডীর পথে বাধা সৃষ্টি করে। পুলিশও ওদের সাহায্য করছিল। কিন্তু এই দুই বাধার চিন্তা না করে ঐ দিণ্ডীও এগিয়ে চলল এবং পার হয়ে গেল। কিন্তু ২৫শে অক্টোবর পুলিশের লোকেরা দিণ্ডীকে আট্‌কাতে শুরু করল। ওরা ভজন-মণ্ডলীর লোকেদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে গিয়ে দশ টাকা করে জামিন নিয়ে ওদের ছেড়ে দিচ্ছিল।

এই সময়ে ডাঃ হেডগেওয়ার, ডাঃ চোলকর এবং শ্রী দাজী শাস্ত্রী চাঁদকর বিভিন্ন অঞ্চলে সভা করে এবং ঘরে-ঘরে গিয়ে প্রচার করে জনসাধারণকে বোঝান যে অনেক বেশী সংখ্যায় জনগণের দিণ্ডীতে অংশগ্রহণ করা উচিত। ৩০শে অক্টোবর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দিলেন যে ঐ পথে যেন দিণ্ডী নিয়ে যাওয়া না হয়। তার কারণ হিসাবে বলা হল যে মুসলমানদের 'ফজরের নমাজ' এবং দিণ্ডীর সময় সূর্যোদয়ের পূর্বে পৌনে ছটা থেকে সওয়া ছটা পর্যন্ত পড়ছিল। সরকারের আদেশ সত্ত্বেও সকলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে দিণ্ডীর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার জন্য জনগণ যাতে

অধিকতর সংখ্যায় উপস্থিত থাকে, তার জন্য ডাক্তারজী প্রচণ্ডভাবে সক্রিয় ছিলেন। সরকারী আদেশ যেদিন প্রচারিত হল, সেদিনই এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হল। সভায় রাজা লক্ষ্মণরাও ভোঁসলে, সরদার তাত্যাসাহেব গুজর, গঙ্গাধররাও চিটনবীস, ডাঃ মুঞ্জে এবং ডাঃ হেডগেওয়ারকে নিয়ে গঠিত একটি সমিতি হিন্দুদের অধিকার রক্ষার জন্য নিযুক্ত করা হল। ডাঃ হেডগেওয়ার এই সমিতির সম্পাদক মনোনীত হন। ৩১শে অক্টোবর থেকে দশ-বারো দিন সম্পূর্ণ নাগপুর শহর ''জয় বিঠ্ঠল, জয়-জয় বিঠ্ঠল'-এর ভজনে গুঞ্জরিত হতে থাকল। এই প্রভাবশালী বাতাবরণে বাহ্য রাজনৈতিক মতভেদ তথা সামাজিক ভেদাভেদ সব ধুয়ে মুছে গেল এবং দিণ্ডী সত্যাগ্রহ আন্দোলন একটি সামগ্রিক এবং প্রতিনিধিত্বমূলক স্বরূপ লাভ করল।

বৃহস্পতিবার, ৮ই নভেম্বর দিণ্ডীতে ডাঃ চোলকর, ডাঃ পরাঞ্জপে, ডাঃ হেডগেওয়ার প্রমুখ একচল্লিশ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। দিণ্ডী আন্দোলনের প্রবর্তক নেতারা সেদিন সত্যাগ্রহে যাবেন জেনে পথের দু ধারে জনতার বিশাল ভিড় একত্রিত হয়েছিল। দিণ্ডী মন্দিরা বাজাতে-বাজাতে মসজিদের নিকটবর্তী হতেই অন্যদিনের মত তাঁদের থামিয়ে দিয়ে গ্রেপ্তার করা হল। সেখান থেকে পুলিশ সকলকে ওয়াকার রোড ও কেলীবাগের পথ দিয়ে প্রধান থানায় নিয়ে গেল। সম্পূর্ণ পথে সত্যাগ্রহীরা অবিরাম ভজন গেয়ে চলে ছিলেন। সেদিন রাজা লক্ষ্মণরাও ভোঁসলে এবং স্যার গঙ্গাধররাও চিটণবীস সত্যাগ্রহে সম্মিলিত না হয়ে দিণ্ডীর পিছন-পিছন চলছিলেন।

এই দিনগুলিতে মসজিদের কাছে এক শো থেকে সওয়া শো সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন থাকত। শহরের বাতাবরণ উত্তেজনাপূর্ণ তথা উত্তপ্ত ছিল। সেই কারণে এধারে-ওধারে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই উত্তেজনার পরিস্থিতিতে ডাঃ মুঞ্জে এবং ডাঃ হেডগেওয়ারকে খুন করা হবে বলে হুমকি দিয়ে চিঠি আসতে লাগল। ডাঃ মুঞ্জের মোটরগাড়ী ছিল, কিন্তু ডাঃ হেডগেওয়ারের সব কাজই চলত পায়ে হেঁটে। ভয় নামক কোন বস্তু তিনি জানতেনই না। ঐরকম সময়েও তিনি অতি ভোরবেলা বা রাত্রে একা বা কাউকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে মুসলমান পাড়ার মধ্যে দিয়েও হেঁটে যেতেন। তাঁর বন্ধুরা সতর্কতার জন্য তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাঁর সঙ্গে থাকার কথা মনে রাখতেন। তা দেখে ডাক্তারজী বলতেন— ''আমাকে কে কী করবে? এই অনর্থক ভয় কিসের জন্য?''

বাতাবরণ যতই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল ততই হিন্দু সমাজের উৎসাহ বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং দিণ্ডী সত্যাগ্রহ দেখার জন্য রোজই পুরো নাগপুরই ভেঙে পড়ত। ১১ই নভেম্বর রাজা লক্ষ্মণরাও ভোঁসলে সত্যাগ্রহ করলেন। সেদিন তো সারা রাস্তা জুড়ে প্রচণ্ড জনসমুদ্র সমবেত হয়েছিল। কোথাও তিল-ধারণেরও জায়গা অবশিষ্ট ছিলনা। অনুমান, চল্লিশ হাজারেরও বেশী মানুষ সত্যাগ্রহ প্রত্যক্ষ করতে উপস্থিত হয়েছিল। জনতা-জনার্দনের এই বিরাট স্বরূপ নাগপুরে অভূতপূর্ব ছিল। এর পরিণাম এই হল যে সেদিন পুলিশ দিণ্ডীকে বাধা দেওয়ার আগেই মুসলমানেরা পাঁচ জনের দিণ্ডী মসজিদের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্মতি দিল। এই ছোট্ট সাফল্য দেখে সকলের এই বিশ্বাস দৃঢ় হল যে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা সাফল্য লাভ

করা সম্ভব। এই উৎসাহকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্য সেই দিন সন্ধ্যায় একটি সার্বজনীন সভার অনুষ্ঠান করা হয়। ডাক্তার হেডগেওয়ার সেই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভায় উপস্থিত দশ হাজার জনতার সামনে বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে রাজা লক্ষ্মণরাও ভোঁসলে 'হিন্দু সভা' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। তিনি বললেন, ''হিন্দু ধর্মের অধিকারসমূহ হিন্দুস্থানের সকল হিন্দুরাই যেন উপভোগ করতে পারে। যদি এই সকল অধিকার হিন্দুস্থানের হিন্দুরাই নিজ মাতৃভূমিতেই উপভোগ করতে না পারে তাহলে আর কোথায় করতে পারবে? হিন্দু ধর্মের অর্থ গণেশ পেঠের কাকড আরতি অথবা গণপতির শোভাযাত্রা মাত্র নয়। এই সকল বিবাদকে অন্ধ হিন্দুজাতিকে দৃষ্টিদানকারী অঞ্জনই বলা যেতে পারে।''

এই দিন ঘোষিত হিন্দু সভার সভাপতি রাজা লক্ষ্মণরাও ভোঁসলে এবং সহ-সভাপতি ডাঃ মুঞ্জেকে করা হয়। ডাঃ হেডগেওয়ারের উপর সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। সভার প্রচারক মণ্ডলেও ডাক্তারজী এবং বিশ্বনাথরাও কেলকরকে নিযুক্ত করা হয়।

এই সম্পূর্ণ কাণ্ড দেখে মুসলমানদের মনে হল ওদের পরাজয় হয়েছে। এর ফলে ক্রোধ সৃষ্টি হওয়া ওদের মনোবৃত্তির অনুকূলই ছিল। অতএব কার্তিক একাদশী, ১৯ তারিখের যাত্রার দিন এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার কথা ওদের মহল্লার নানা স্থানে আলোচিত হতে লাগল। ডাঃ মুঞ্জে এবং ডাঃ হেডগেওয়ার এ বিষয়ে অবগত হয়েছিলেন। সরকারও সতর্কতার জন্য মুসলমানদের নমাজের পাঁচ সময় বাদে অবশিষ্ট সময়ে হিন্দুদের মস্‌জিদের সামনে দিয়ে তাদের দিণ্ডী বাজিয়ে যাত্রার আদেশ দিল। ১৮ই নভেম্বর রাত একটা পর্যন্ত এবং পরের দিন সকাল থেকেই রাজা লক্ষ্মণরাও ভোঁসলে, ডাঃ মুঞ্জে, ডাঃ হেডগেওয়ার এবং উদারাম পহলওয়ান সকলে মোটরগাড়িতে সারা শহরে ঘুরে ঘুরে জনসাধারণকে জানিয়ে দিলেন যে নমাজের পাঁচটা সময় বাদে অবশিষ্ট সময়ে হিন্দুরা দিণ্ডী বাজিয়ে যেন যাত্রা নিয়ে যায়। দৌড়াদৌড়ির এই পরিণাম হল যে সেদিন দিণ্ডীদের মধ্যে উৎসাহ ও অনুশাসন দুইই ব্যাপক আকারে প্রত্যক্ষ করা গেল। কিন্তু শুধু হিন্দুদের সংযম ও অনুশাসনের উপরেই তো শান্তি নির্ভর করেনা। এত নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে চলা সত্ত্বেও গণেশ পেঠে বিকেল পাঁচটার পরে ফিরে আসা এক দিণ্ডীর উপর মুসলমানরা ইঁট, পাথর, জুতো ইত্যাদি ছুঁড়ে মারতে শুরু করে এবং কিছু ক্ষেত্রে লাঠি, তলোয়ার, ছোরা ইত্যাদি ব্যবহার করে হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালায়। এই স্থানে দু বার বেশ জোরালো সংঘাত হয়। শহরের অন্য কয়েকটি স্থানেও ছোট-খাট আক্রমণ এবং কোথাও কোথাও সংঘর্ষও হয়। সারা শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, মুসলমানরা দলে-দলে 'আল্লা-হো-আকবর' এবং 'দীন-দীন' এর ধ্বনিতে গলা ফাটিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে। পরের দিন কোষ্টীপুরা, হংসাপুরী এবং ইতওয়ারীর রাস্তায় সংঘর্ষ বেধে যায়।

এই পরিস্থিতির মূল্যাংকন করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার যে প্রয়াস করা হয় সে ব্যাপারে ডাক্তার হেডগেওয়ার অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন। ''আল্লা হো আকবর'' ধ্বনির পিছনে মুসলমানদের হিন্দু-বিরোধী মনোবৃত্তিকে তিনি ভালোমতই উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি তাঁর বন্ধুদের বলতেন যে ''আল্লা হো আকবর'' ধ্বনির মধ্যে লুকানো মুসলমানদের বৃত্তিকে

উৎসাহিত করে আমরা নিজ রাষ্ট্রের কবর নিজেরাই খুঁড়ে চলেছি। হিন্দু পাড়াতে তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করেন এবং সারা রাত ব্যাপী পাহারার ব্যবস্থা করেন। নিজেও সারা রাত জেগে তিনি বিভিন্ন পাড়ায় ঘুরে রক্ষীদলের সদস্যদের তদারকি করেন।

নাগপুরে হিন্দুদের মধ্যে এই সময়ে এক নতুন উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। কার্তিক ত্রয়োদশীর দিন অনুষ্ঠিত জাগোবা যাত্রায় এর প্রমাণ পাওয়া গেল। সাধারণ মানুষেরা সিঁদুর আবিরের টিপ পরে, হাতে মোটা মোটা লাঠি নিয়ে যাত্রায় সম্মিলিত হয়েছিল। 'মহারাষ্ট্র' ঐ দৃশ্যের বর্ণনা করে লিখেছিল — "প্রত্যক্ষদর্শীদের মনে হচ্ছিল যেন সম্পূর্ণ ইতওয়ারী অঞ্চলে লাঠির এক জঙ্গল উৎপন্ন হয়েছে।" এর দু দিন পরে ছিল ত্রিপুরী পূর্ণিমা। সেদিনই কাকড আরতির সমাপ্তি দিবস ছিল। এই সমাপ্তি উৎসবের দিনেই বহু প্রতীক্ষিত গণেশ-বিসর্জনের কার্যক্রমও সম্পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, এবং এই উপলক্ষে হিন্দু সভার পক্ষ থেকে ডাক্তারজীর নেতৃত্বে সারা শহর-জুড়ে তুফানী প্রচার শুরু হয়ে গেল।

পূর্ণিমার দিন বেলা তিনটের সময়ে শোভাযাত্রা বেরিয়ে পড়ল। এই দিনও লাঠির সমুদ্রে পথ-ঘাট প্লাবিত হল। এই অভূতপূর্ব শোভাযাত্রার এইরূপ বর্ণনা প্রকাশিত হয় — "শহরের ছোট-বড় কোন পুরুষই আজ বাড়ীতে ছিলনা।" সেদিনের মিছিল গণপতির জয়-জয়কার ধ্বনির মধ্যে পূর্ণ হয়। এই বিরাট শোভাযাত্রা দেখে মুসলমানরা স্বভাবতই ক্রুদ্ধ হয় এবং তার ফলে পরবর্তী তিন-চার দিন ছোটখাট হামলা, ইঁট-পাথর ছোঁড়া ইত্যাদির ঘটনা চলতে থাকে। রাতের পাহারা যথারীতি চলছিলই। তা সত্ত্বেও এক দিন হনুমানজীর মূর্তি ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গেল এবং নাগেশ্বর মন্দির ও জৈন মন্দিরে গরুর কাটা পা পাওয়া গেল। এই ঘটনায় চতুর্দিকে বিক্ষোভের ঢেউ আছড়ে পড়ে। হরতাল ও প্রতিবাদ সভায় সন্তুষ্ট না হয়ে হিন্দুরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে এই সব আক্রমণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের সামাজিক বয়কট করা হবে। এই সিদ্ধান্তের কথা ঘরে-ঘরে প্রচার করা হয়। জনসাধারণের মনের মধ্যে এই সংকল্প অটলরূপে গেঁথে যায়।

নাগপুরে এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে বাজনদাররা মসজিদের সামনে বাজনা বাজাতে ইতস্তত করত। বাস্তবিক এটা তাদের দোষ ছিল না, বরং যে দুর্বল সংস্কার অবিরাম মনের উপর পড়েছিল তার কারণেই ঐরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের মন থেকে সেই ভয়কে নির্মূল করার জন্য ডাক্তারজী ও তাঁর সহকারীরা স্বয়ং মসজিদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, এবং বাজনদাররা আতংকগ্রস্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরা স্বয়ং ঢোল গলায় ঝুলিয়ে বাজাতে শুরু করে দিতেন। তাঁর এই সাহসিকতা দেখে অনেকেই ডাক্তারজীকে তাঁদের বাড়ীতে বিবাহ ও যজ্ঞোপবীত অনুষ্ঠানে তাঁকে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানাতেন। তাঁদের এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে ডাক্তারজী ব্যতীত তাঁদের মঙ্গলকার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবেনা। ডাক্তারজী চিন্তা করতেন যে নাগপুরে মুসলমানদের জনসংখ্যা হিন্দুদের এক সপ্তমাংশ মাত্র। তা সত্ত্বেও তারা উদ্ধত হয়ে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করে চলবে এবং হিন্দুরা ভয়ে কম্পিত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রহরার ব্যবস্থা করতে থাকবে -- এটা কত শোচনীয় অবস্থা? বাস্তবিক তথ্য এই যে হিন্দুদের বিপুল সংখ্যায় অস্তিত্ব তথা সৌজন্যের

কারণেই মুসলমানদের মনে প্রীতি অথবা ভীতি উৎপন্ন হওয়া উচিত। কিন্তু এরকম না হয়ে, এর বিপরীত, নিচের জল উপর দিকে গড়িয়ে যাওয়ার মত তাদের অত্যাচার চলে আমাদের উপর। তারাই বিদ্বেষ অথবা ক্রোধের বশে আমাদের গায়ে হাত তোলে। এরকম কেন হবে? এই রকম প্রশ্ন তাঁর মনকে উদ্বিগ্ন করে তোলে এবং এই বিপরীত অবস্থার মূলে গিয়ে তিনি এর বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছিলেন।

উপরিউক্ত পরিস্থিতির নানা প্রতিক্রিয়া জন-সাধারণের মনে হয়ে থাকে। কেউ মনে করে অপর পক্ষ আমাদের থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী এবং আমরা সে রকম শক্তিশালী কখনই হতে পারব না। সুতরাং আত্মবিশ্বাসের অভাবের দরুন সে নিরাশ হয়ে ভগবানের ভরসায় বসে পড়ে, নয়তো অনুনয়-বিনয়ের নীতিকে স্বীকার করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। কেউ-কেউ ঐ সংকটের তাৎক্ষণিক উপায় খুঁজে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে চায়। তার দৃষ্টি সংকটের স্থায়ী ও মূল কারণের দিকে যায়না, সেই কারণে সে তার সমাধানের কোন স্থায়ী উপায় অনুসন্ধানেরও চেষ্টা করেনা। এই সংকটের দোষ অপর পক্ষের অসহিষ্ণু তথা তামসিক প্রবৃত্তির উপরে চাপিয়ে তাদের সৌজন্য তথা সহিষ্ণুতার বাণী ও উপদেশ দেওয়ার অভ্যাস অনেকের মধ্যে দেখা যায়। অনেকে আবার নিজেদের দোষের দিকে চোখ বন্ধ করে আক্রামকের উপর দোষ চাপিয়ে নিজেদের ইতিকর্তব্য সম্পন্ন করে। এ ছাড়া, আরেক শ্রেণীর অহংকারী তথা হঠকারী মানুষ দেখা যায়। তারা তাদের সৌজন্যের দুধ শত্রুরূপী সাপকে পান করিয়ে তাকে নির্বিষ তথা অহিংস করে তোলার চেষ্টা করে এবং সাপের লোল জিহ্বা ও ফোঁসফোঁসানি চোখের সামনে দেখেও নিজেদের অর্থহীন প্রয়াসের দিশা বদল করার প্রয়োজন বোধ করেনা। ধন্য ওদের ধৈর্য। কিন্তু ডাক্তারজী তাঁর প্রখর রাষ্ট্রভক্তি ও বিবেকবুদ্ধির কারণে এইরূপ কোন নির্বুদ্ধিতার ধাঁধায় নিজেকে জড়াতে পারেননি। হিন্দুদের অপমান এবং অকারণে তাদের উপর যে আক্রমণ চলত তা দেখে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হতেন। কিন্তু তাঁর চিন্তা-পদ্ধতি ছিল স্বতন্ত্র ধরনের। তিনি প্রতিক্রিয়ামূলকভাবে চিন্তা করতেন না। তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন যে মুষ্টিমেয় লোকেরা অসংখ্য হিন্দুদের উপর নির্মম আঘাত করে চলেছে। এটা আক্রমণকারীদের শৌর্যের নয়, বরঞ্চ হিন্দু মাত্রের অসংগঠিত তথা স্বাভিমানশূন্য অবস্থারই স্বাভাবিক পরিণাম। এর জন্য অপরের প্রতি দ্বেষ না করে, তাদের নামে গালি-গালাজ না করে, এবং সৌজন্যের দ্বারা দুষ্টের হৃদয়-পরিবর্তনের অবাস্তব পন্থা গ্রহণ না করে, আমাদের নিজ সমাজের যে সকল দোষের কারণে অন্যরা আমাদের উপর আক্রমণ করতে প্ররোচিত হয়, সেইগুলিকেই বিশেষ প্রয়াসের দ্বারা এবং দ্রুত দূর করে তারুণ্য, স্বাভিমান তথা পরাক্রম-যুক্ত সমাজ-পুরুষের জাগ্রত স্বরূপকে দাঁড় করাতে হবে—এই পন্থাই তিনি প্রত্যক্ষ করছিলেন।

আর একটি বিষয় তাঁর মনকে উদ্বেল করে তুলছিল। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের শ্লোগান অবশ্য অব্যাহত ছিল, কিন্তু সেই ঐক্য নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে আরো দূরে সরে যাচ্ছিল। ডাক্তারজীর মনে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠল যে আজ যে ঐক্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছেনা ইতিহাসে তা কি কোন দিন বিদ্যমান ছিল? অতীত তো এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে একেবারে দাহিরের সময় থেকেই হিন্দু স্বরাজ্যের শেষ সময় পর্যন্ত কখনো পৃথ্বীরাজ, কখনো মহারাণা

প্রতাপ, কখনো হুক্ক-বুক্ক, আবার কখনো কৃষ্ণদেব রায়, কখনো গুরুগোবিন্দ সিংহ ও গুরুবান্দা, কখনো ছত্রপতি শিবাজী ও সম্ভাজী, আবার কখনো বাজীরাও অথবা মহাদজী মুসলমানদের তৎকালীন আক্রমণকে বিদেশীদের আক্রমণ জ্ঞানে তাকে বিনষ্ট করার এবং নিজেদের বিজয় পতাকাকে অটকের ওপারে উড্ডীন করার পরাক্রম করেছেন। এইরূপ অবস্থায়, যারা ভারতের মন্দিরগুলিকে, ভারতের জীবনাদর্শসমূহকে এবং তার পরম্পরা ও অস্মিতাকে ধ্বংস করে সেখানে বিদেশী সংস্কৃতির দীক্ষা দেয়, সেই অসংস্কৃত, অসহিষ্ণু তথা অমানবিক বৃত্তির মাধ্যমে ষড়যন্ত্র করে চলেছে, তাদের আজই কেন আমরা 'আমাদের আপন' বলার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছি? তাদের মনের মধ্যে কি হিন্দু সমাজ এবং তার নর-কে নারায়ণ করে তোলার দৈবী সংস্কৃতি সম্বন্ধে আস্থার সৃষ্টি হয়েছে? তারা কি 'বেঁচে থাকো ও বাঁচতে দাও'-এর বিশ্বের জন্য মহামূল্য ভূষণের মত ভারতীয় সংস্কৃতির সহিষ্ণুতার মূল তত্ত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে? আজ ভারতমাতার জয়-জয়কার ধ্বনিতে নিজেদের স্বর মিলিয়ে দেবার মনীষা কি তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে? এগুলির মধ্যে কোনটির ব্যাপারেই যদি অনুকূল পরিবর্তন না হয়ে থাকে, তাহলে তারাও ততটাই আক্রমণকারী, যতটা ইংরেজরা। এই উভয়বিধ আক্রমণকে যদি আমাদের নির্মূল করতে হয়, তাহলে এমন পরিস্থিতি নির্মাণ করতে হবে যে হিন্দু সমাজের প্রাচীন কিন্তু নিত্য-নূতন জীবন-পরম্পরার পাবন গঙ্গার পুণ্য প্রবাহ যেন অপ্রতিহত গতিতে প্রবহমান থাকে। ডাক্তারজী একথাও উপলব্ধি করেন যে 'হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই' এর আত্মঘাতী তথা এক-তরফা ঘোষণাগুলির মূলে রয়েছে হিন্দু সমাজের নিজের সঠিক ইতিহাস-এর বিস্মরণ এবং ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই অপপ্রচার যে এই দেশে যারাই বসবাস করে তারা সকলেই এই দেশের মালিক। এই অনুভূতির মধ্য থেকেই হিন্দু সংগঠনের মহামন্ত্রের তিনি প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করলেন।

সম্পূর্ণ বিচার মন্থন হতে ডাক্তার হেডগেওয়ার এই নিষ্কর্ষে উপনীত হলেন যে হিন্দু রাষ্ট্রের আগ্রহপূর্বক প্রতিপাদন করা ভিন্ন ভারতের রাষ্ট্রীয়তাকে বিকৃত করার প্রয়াস থেকে রক্ষা করা যাবেনা। এই সময়ে ব্যারিস্টার সাভারকর 'হিন্দুত্ব' সংক্রান্ত রাষ্ট্রবাদী কল্পনাকে তাঁর ওজস্বী তথা প্রতিভাশালী লেখনীর দ্বারা লিপিবদ্ধ করে যে কোন প্রকারে কারাগারের বাইরে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করেন। যোগাযোগবশতঃ 'হিন্দুত্ব' সর্বপ্রথম ডাক্তারজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীবিশ্বনাথ রাও কেলকরের হাতেই এসে পড়ল। অনুমান করা যেতে পারে যে ঐ পাণ্ডুলিপি ডাক্তারজীও অবশ্যই পাঠ করে থাকবেন। তাঁর মনোগত হিন্দুত্বের কল্পনা এবং উক্ত গ্রন্থের অত্যন্ত তর্কশুদ্ধ, দৃঢ় প্রত্যয়যুক্ত তথা আগ্রহপূর্ণ হিন্দুত্বের প্রতিপাদন প্রত্যক্ষ করে তিনি অতীব আনন্দিত হলেন। গ্রন্থটি তাঁর খুবই পছন্দ হল। তিনি সর্বত্র তার প্রচার শুরু করে দিলেন। সুষুপ্ত হিন্দু সমাজকে জাগাবার জন্য মুসলমানদের আক্রমণসমূহ 'বিপদ্ সংকেতের ঘণ্টাধ্বনি'-র কাজ করেছিল। কিন্তু তার থেকেও অগ্রসর হয়ে হিন্দুত্বের সুপ্ত মানসকে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে জাগ্রত করার সামর্থ্য সাভারকরজীর যুগ-প্রবর্তক গ্রন্থ 'হিন্দুত্ব'-এর মধ্যে নিহিত ছিল।

স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর সেই সময়ে জেলের মধ্যে বন্দী ছিলেন। ১৯২৩ সালে বোম্বাই-এর বিধানসভায় সরদার বল্লভভাই প্যাটেল, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীযমুনাদাস মেহতা প্রমুখ

নেতৃবৃন্দ তাঁর মুক্তির দাবী উত্থাপন করেছিলেন। নাগপুরেও সাভারকরজীর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণকারী বিরাট শ্রেণী ছিল। তাঁরাও এই ব্যাপারে এখানে প্রয়াস করেছিলেন। ১৪ই অক্টোবর নাগপুরে শ্রী তাত্যারাও সাভারকারের মুক্তির দাবীতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে সভা অনুষ্ঠিত হল সেই সভায় ডাক্তারজীর অত্যন্ত জোরালো ভাষণ হল। তিনি বললেন, "চোদ্দ বছর পরে সরকার যদি তাঁকে মুক্তি দেয়, তাহলে কী অনুগ্রহ করা হবে? সেটা তো জয় বলেই গণ্য হবে। ন্যায়-বিচারকে হত্যা করে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়। সরকার যদি সেই কলঙ্ক ধুয়ে ফেলতে চায়, তাহলে তাঁকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। কিন্তু সরকারের সে রকম ইচ্ছা আছে বলে মনে হয়না। সাভারকরজীর বিরুদ্ধে এক পক্ষের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়। সরকার সুস্পষ্টভাবে দ্বেষ ভাব প্রদর্শন করছে। এখনও যদি তাঁকে মুক্তি না দেওয়া হয়, তাহলে ভারতীয় রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাদের মনে যে দুষ্ট গ্রহ বাসা বেঁধেছে, তার আরো একটি প্রমাণ পাওয়া যাবে।"

১২. সঙ্ঘের সংকল্প

ডাক্তারজীর 'নাগপুর ন্যাশনাল ইউনিয়ন'-এর এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে তাঁরা 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র কথা প্রচার করতেন। ঐ সময়ে হয় নীতির কারণে, নয়তো মনের অভিরুচির কারণে দেশের অনেক নেতা 'সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্বরাজ্য'-এর বেশী কিছু চিন্তা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। সর্বোদয় নেতা আচার্য দাদা ধর্মাধিকারী বলেন যে ঐ দিনগুলিতে গণেশোৎসব অথবা অন্য কোন কার্যক্রমে কোন বক্তাকে আমন্ত্রণ করার সময়ে ডাক্তারজী তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আগ্রহপূর্বক বলতেন যে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যকেই যেন প্রতিপাদন করা হয়। আন্দোলনের পরবর্তী কালের বিফলতা ও গণ্ডগোলের সময়ে ঐ ধরনের বিশুদ্ধ স্বাধীনতার কল্পনার প্রচার করার বিশেষ আবশ্যকতা ছিল। ঐ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে ডাঃ হেডগেওয়ার, শ্রীবিশ্বনাথ রাও কেলকর, ডাঃ খারে, শ্রীবাসুদেব ফড়নীস, শ্রীগোপালরাও ওগলে, শ্রীবলবন্ত রাও মণ্ডলেকর প্রমুখ ব্যক্তিরা নাগপুর থেকে 'স্বাতন্ত্র্য' নামে একটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং মাস দুয়েক দৌড়াদৌড়ি করে সমবায়ের ভিত্তিতে 'স্বাতন্ত্র্য প্রকাশন মণ্ডল'—এর প্রতিষ্ঠাও করেন। এই মণ্ডলের নিমিত্ত ডাঃ হেডগেওয়ার ও ডাঃ খারে বেরারে পরিভ্রমণ করে অর্থও সংগ্রহ করেন। সেই সময়ে প্রান্তে শিক্ষার দৃষ্টিতে যে পশ্চাৎপদ অবস্থা ছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে একটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করার চিন্তা অত্যন্ত সাহসেরই কাজ ছিল। কারণ সীমিত সংখ্যক পাঠকদের মধ্যে আগে থেকেই 'প্রজাতন্ত্র' (অকোলা) 'উদয়' (অমরাবতী), 'লোকমত' (যবতমাল), 'তরুণ ভারত' (ওয়ার্ধা), 'মারোয়াড়ী প্রণবীর' এবং 'মহারাষ্ট্র' (নাগপুর) সাপ্তাহিক পত্রগুলি বিভিন্ন স্থানে বেশ শিকড় গেড়ে বসেছিল। কিন্তু তারুণ্যের প্রবল উৎসাহ এমনই জিনিষ যা বৈপরীত্য দেখেও তার উপর জয়লাভের আকাঙ্ক্ষাই পোষণ করে। নাগপুর থেকে 'স্বাতন্ত্র্য' প্রকাশের প্রয়াসও এই উৎসাহেরই দ্যোতক ছিল। চিটনীস পার্কের নিকট বেনিগিরি মহারাজের প্রাঙ্গণে 'স্বাতন্ত্র্য' দৈনিকের কার্যালয় খোলা হল এবং ১৯২৪ সালের শুরুতে শ্রী বিশ্বনাথ রাও কেলকরকে সম্পাদক করে 'স্বাতন্ত্র্য' দৈনিক সংবাদ প্রত্রের প্রকাশন আরম্ভ হল। ডাঃ হেডগেওয়ার প্রকাশন মণ্ডলের অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন এবং প্রথম থেকেই 'স্বাতন্ত্র্য'-এর পথে আগত বাধাগুলিকে দূর করার ব্যাপারে প্রধানতঃ অংশগ্রহণ করতেন। সুতরাং একদিক থেকে তাঁকে তার পরিচালক বলাই ঠিক হবে। ডাক্তারজী ভোজন করার জন্য বাড়ীতে যেতেন এবং সভা-সমিতি ছাড়া অবশিষ্ট পুরো সময়টাই 'স্বাতন্ত্র্য' কার্যালয়ে কাটাতেন। লেখা কম পড়লে তিনি হাতে কলম নিয়ে লিখতে শুরু করে দিতেন, এবং সম্পাদক কর্তৃক লিখিত রচনাগুলি পড়ে

সেগুলির মধ্যে কোন-কোন স্থানে কিছু যোগ করার অথবা বাদ দেওয়ার পরামর্শও দিতেন। যেমন-তেমন করে এই দৈনিক এক বছর চলল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে দুই জন সম্পাদক বদল হল। কিছু দিন শ্রীবিশ্বনাথরাও কেলকরের সাহায্যের জন্য বোম্বাই-এর সিদ্ধহস্ত লেখক শ্রীঅচ্যুতরাও কোল্হটকরকেও নিয়ে আসা হল। তাঁর রচনাগুলি সরস, সরল এবং আকর্ষক হত, কিন্তু দৈনিক সংবাদপত্রের জন্য নাগপুরে আশানুরূপ ক্ষেত্র না থাকায় তিনি মাঝপথেই চলে গেলেন। এর পরে শ্রীগোপালরাও ওগলেকে সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয় এবং তিনি কিছু দিন ঐ দায়িত্ব পালন করেন। এই সংবাদপত্রে 'স্বাধীনতার' অনুকূল যথেষ্ট সামগ্রী ছাপতো বলেই মনে হয়, কিন্তু দুঃখের কথা অনেক অনুসন্ধানের পরেও নাগপুরে এই দৈনিকের কেবল একটি মাত্র সংখ্যা পাওয়া গেছে—তাও মারাঠীর বিখ্যাত লেখক ডাঃ শঃ দাঃ পেণ্ডসের সংগ্রহের স্বভাবের দরুন। এই সংখ্যায় "ব্যারিস্টার সাভারকরের সভাপতি হওয়া উচিত" এই শীর্ষকে তাঁর একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, এবং তিনি সযত্নে সংখ্যাটি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। ঐ একটি সংখ্যা থেকেই ঐ দৈনিক সংবাদপত্র সম্বন্ধে কিছুটা কল্পনা করা যেতে পারে।

"স্বাতন্ত্র্য" দৈনিক সোমবার ব্যতীত সপ্তাহের প্রতিদিনই প্রকাশিত হত। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল দুই পয়সা। বার্ষিক শুল্ক ছিল সাড়ে বারো টাকা। দৈনিকের শীর্ষভাগে "মধ্যপ্রান্তের প্রমুখ তথা একমেব দৈনিক" লেখা থাকত। প্রথম স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরের লিখিত পুস্তক 'ইকোজ্ ফ্রম আন্দামান্স" এবং শেষ পৃষ্ঠায় "হিন্দুত্ব" পুস্তকের বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়। এই সংখ্যাটি ছিল ৬-১১-১৯২৪-এর প্রথম বর্ষের (এবং দুর্ভাগ্যক্রমে অন্তিম বর্ষেরও) ২৩৮তম সংখ্যা। ঐ বছরেই স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরকে কারাগার থেকে মুক্ত করে কিছু দিনের জন্য ত্র্যম্বকেশ্বর যাবার ছুটি দেওয়া হয়েছিল। অতএব, ঐ বছর নাগপুরে অনুষ্ঠিতব্য সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির পদ যাতে তিনি গ্রহণ করেন--এই রূপ চিন্তা ডাঃ হেডগেওয়ার, বাসুদেবরাও ফড়নীস এবং ডাঃ শঃ দাঃ পেণ্ডসে উপস্থাপন করেন। এই দাবীর সমর্থনে "স্বাতন্ত্র্য" দৈনিকেও কয়েকটি রচনা এসেছিল। কিন্তু গোপালরাও ওগলে এই রচনাগুলির সহিত সহমত ছিলেন না। সেই কারণে তিনি সম্পাদকের পদ ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এই সময়ে 'স্বাতন্ত্র্য প্রকাশন মণ্ডল'-এর আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। তার ফলে প্রত্যেক নতুন দিন ডাক্তারজীর চিন্তা বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

"স্বাতন্ত্র্য" দৈনিক প্রকাশনার ঝামেলা ডাক্তারজী শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান প্রচারের তীব্র আকাঙ্ক্ষার দরুনই গ্রহণ করেছিলেন। এই দৈনিকের ব্যাপারে ডাক্তারজী অনেক রকম কাজ করতেন, কিন্তু বেতন হিসাবে এক পয়সাও নেননি। বেতন নিয়ে লোকে কত কাজে ফাঁকি দেয় সে কথা কারো অজানা নয়। কিন্তু বেতন না নিয়েও, যে কাজই করার প্রয়োজন হোক, নিরলসভাবে এবং কোন অহংকার না রেখে সেই কাজ করা ডাক্তারজীর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি নিজে সর্বক্ষণ সেখানে কর্মব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু কেউ যদি কাজে অবহেলা করত, তবু ক্রোধ প্রকাশ করতেন না। এই সময়ের একটি প্রসঙ্গ উল্লেখনীয়।

'স্বাতন্ত্র্য' দৈনিকে একজন সহ-সম্পাদক ছিলেন। একদিন তিনি নিজের অসুস্থতার কথা জানিয়ে ডাক্তারজীর কাছে চিঠি পাঠিয়ে ছুটি নিলেন। কাজে এলেন না, কিন্তু ফড়ণবীসের প্রাসাদে তাস খেলতে গেলেন প্রতিদিনের মত। তাসের নেশা এইরকমই বিচিত্র হয়। ডাক্তারজী চিঠি পড়ে বুঝতে পারলেন যে অসুস্থতার কথা সত্য নয়। তাঁর খেলার আড্ডা তাঁর জানা ছিল। অতএব কার্যালয়ের কিছু কাজ সেরে ফড়ণবীসের প্রাসাদে গেলেন এবং তাঁর প্রতিদিনের নিয়ম অনুসারে দোলনায় বসে তাঁর সঙ্গে গল্প-গুজব করে ফিরে গেলেন। পাশের ঘরে তরুণদের খেলার স্বাভাবিক চেঁচামেচি চলছিল. সেখানে 'অসুস্থ' সহ-সম্পাদকও ছিলেন। ডাক্তারজী সেখানে যেতেই তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু ডাক্তারজী তাঁকে একটি কথাও বললেন না। বেশী চালাকদের কথার আঘাতে কাবু হতে হয়, কিন্তু প্রিয়জনদের ডাক্তারজীর এই নীরবতাই বেশী ভীত করত। যদি কেউ কাজে ফাঁকি দিত এবং তার জন্য অজুহাত দেখাত, তাহলে ডাক্তারজীর শুধু এটুকুই করতেন যে তার চালাকি ডাক্তারজী ধরে ফেলেছেন। কিন্তু তার উপরে, ক্রোধ প্রকাশ করে তাঁকে দুঃখ দেওয়ার পরিবর্তে তাঁর সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার দিয়ে তাকে স্বয়ং সংশোধন করে নেবার সুয়োগ দেওয়াই বেশী উপযুক্ত বলে মনে করতেন।

১৯২৪ সালের শেষের দিকে একথা পরিষ্কার বোঝা গেল যে 'স্বাতন্ত্র্য' দৈনিক আর বেশী দিন চালানো যাবেনা। সেই বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব করার পরে দেখা গেল ১০,৭৯৪ টাকার লোকসান হয়েছে। অতএব, ব্যপারটাকে গুটিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। সে সময়ে কেউই সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে দৈনিক বন্ধ করার বদনাম নিতে রাজি ছিলনা। সাফল্যের মুকুট পরতে সকলেই তৈরী থাকে, কিন্তু ব্যর্থতার হলাহল পান করতে কেউ রাজি হয়না। সেই কারণে ডাক্তারজী এগিয়ে এলেন এবং সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করে সংবাদপত্রের "ইতি" ঘোষণা করে সম্পাদকীয় লেখেন। "অপযশের সম্পাদন" — এর ধৈর্য তিনি তাঁর নিষ্কাম তথা নিঃস্বার্থ সেবার মনোবৃত্তি থেকেই লাভ করেছিলেন। ১৯২৫ এর প্রথমেই "স্বাতন্ত্র্য" বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার বিরুদ্ধে এক মানহানির মামলা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলেছিল।

এই অসফলতার সিংহাবলোকন করে ডাঃ খারে তাঁর "তরুণ ভারতে" একটি প্রবন্ধে লেখেন "... অর্থের অভাবে এবং মানুষের মধ্যে দৈনিক সংবাদপত্র পাঠের অভিরুচি তখনও গড়ে না ওঠায় এই প্রয়োগ অসফল হল।" ঐ বছরের প্রথম দিকের একটি ঘটনার এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্রান্তিবীর শ্রীগণেশপন্ত (বাবারাও) সাভারকর ঐ সময়ে নাগপুরে ছিলেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং তাঁর বন্ধু শ্রী বিশ্বনাথ রাও কেলকরের কাছে এসেছিলেন। ডাক্তারজীও সেখানে প্রায় প্রতিদিনই যাতায়াত করতেন, সেই কারণে তাঁদের দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাবারাও সাভারকার, বিশ্বনাথরাও কেলকর এবং ডাক্তারজী তিন জনেরই অনেক বিষয়ে মনের খুব মিল ছিল। তিন জনেই সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন এবং হিন্দুত্বের প্রেমও তাঁদের মধ্যে অত্যন্ত জ্বলন্তরূপে বিদ্যমান

ছিল। তিন জনেরই আর একটি বিশেষত্ব ছিল এই যে তাঁরা কোন কাজ হাতে নিলে নিজেদের অস্তিত্বের কথা ভুলে তাতেই একেবারে লীন হয়ে যেতেন। শ্রী বিশ্বনাথরাও কেলকরের মৃত্যুর পর তাঁর ডায়েরীতে তাঁর জীবনের লক্ষ্য লিখে রেখেছিলেন। সেগুলি উদ্ধার করা হয়। পংক্তিগুলি হল ঃ —

নকো স্থান মজ বহুমানাচেঁ
কণ্ঠাবরচেঁ, শীর্ষাবিরচেঁ,
কণকমণ্যাচেঁ চকাকণ্যাচেঁ,
তুঝ্য়া পদাঁচা ঘুঙ্গুরবালা দেবি মলা কর না।।
(কণ্ঠাভরণ, শিরোভূষণ হওয়ার বর চাইনা জননি।
আমায় করে নিও মা গো, তোমার চরণ-কিঙ্কিণি।।)

শ্রী বিশ্বনাথ রাও কেলকর এই ধ্যেয়বাক্য নিজের দৈনন্দিনীতে নিজের জন্য লিখে রাখলেও, এঁদের তিনজনের আচরণেও এই কিঙ্কিণির মধুর ঝংকারই ব্যাপ্ত ছিল, তার সাক্ষ্য তাঁদের সম্পর্কে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের যে কেউ সহজেই দিতে পারবেন। এই ত্রয়ী একত্র হওয়ার পর অত্যন্ত স্বাভাবিক রূপেই তৎকালীন পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ তাঁদের মধ্যে চলত এবং পরস্পরের অভিজ্ঞতা শোনার পর একটাই সিদ্ধান্তে তাঁরা উপনীত হলেন যে হিন্দু সমাজকে সুসংগঠিত করা আবশ্যক। নিশ্চিতভাবেই ডাক্তারজীর নিজের সংকল্পও এইভাবে দিনের পর দিন দৃঢ়তর হয়ে উঠছিল।

সেই সময়ে নাগপুরে ছোট-ছোট 'বিদ্যার্থী মণ্ডল' গড়ে উঠেছিল এবং সেগুলির সঙ্গেও ডাক্তারজীর সম্পর্ক ছিল। এই মণ্ডলগুলির কার্যক্রমসমূহের মধ্যে প্রচলিত রাজনীতির বিষয়ে আলোচনা, হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকার প্রকাশন, বাজেয়াপ্ত গ্রন্থগুলি পাঠ করা এবং উৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রী বাবারাও সাভারকরের মধ্যে সভায় বক্তৃতা করার নৈপুণ্য না থাকলেও বৈঠকে কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে তরুণদের বিপ্লব-প্রবণ করে তোলার তাঁর দক্ষতা দর্শনীয় ছিল। তিনি যেখানেই যেতেন, সেখানেই তরুণের দলকে তাঁর চতুর্দিকে একত্রিত করে নিতেন এবং তাদের নিয়ে 'তরুণ হিন্দু সভা' গঠন করে নিতেন। নাগপুরে তাঁর অবস্থানকালে অনেক তরুণ তাঁর কাছে এসেছিল। তাদের সামনে তিনি শুদ্ধি, সংগঠন, আত্ম-সংরক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলতেন। কিন্তু আলোচনার গণ্ডী ছাড়িয়ে তাদের নিয়ে প্রত্যক্ষ সংগঠন গড়ে তোলার শক্তি তাঁর মধ্যে অবশিষ্ট ছিলনা। আন্দামানে ঘানি টেনে, নারকোলের ছোবড়া কুটে এবং ক্ষয়রোগে তাঁকে এত ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় যে তাঁর সম্পূর্ণ শরীর জর্জর হয়ে পড়েছিল। তবে, তরুণদের হিন্দুত্বের দীক্ষা দানের দিক থেকে তাঁর ঐ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিঃসন্দেহে অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হয়েছিল।

"স্বাতন্ত্র্য" দৈনিকের ঝামেলা থেকে মুক্ত হওয়ার পর তরুণদের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে তাদের নিয়ে এক সংগঠন গড়ে তোলার তাঁর পরিকল্পনা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল। তিনি কয়েকটি ছেলেকে সাঁতারের শিক্ষা দেবার জন্য একত্র করলেন, এবং এই

উদ্দেশ্যে তাঁর কাছাকাছি আসা তরুণদের সঙ্গে তিনি খুব খোলাখুলি আলোচনা করতেন। কোনও মেধাবী ছাত্র দেখতে পেলেই তিনি তাকে সাঁতার শেখার জন্য তাঁর সঙ্গে যাওয়ার আগ্রহ্ করতেন। এই কার্যক্রম হ্ত ডাক্তারজীর এক বন্ধুর * কুয়োতে। একবার ডাক্তারজী কয়েকটি ছেলেকে সাঁতার শেখাচ্ছিলেন, তখন বারো-তের বছর বয়সের এক বালক কুয়োর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ডাক্তারজী তাকে থামিয়ে ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করলেন — "কি রে, তুইও ঝাঁপ দিবি নাকি?" ছেলেটি এমনই নির্ভীক ছিল যে সাঁতার না জানা সত্ত্বেও সে "হ্যাঁ" বলে দিল এবং জামা ছেড়ে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারজীর কাছে কোমরে দড়ি বাঁধার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। দড়ি বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে সে কুয়োতে ঝাঁপ দিল। বালকটির সাহ্স দেখে ডাক্তারজীর বড় আনন্দ হ্ল। তিনি ওর সঙ্গে বেশ ভালভাবে পরিচয় করে নিলেন। ঐ বালক — গোপাল রাও এরকুন্টওয়ার পরবর্তীকালে সঙ্ঘের কাজের প্রচারে বেশ বড় ভূমিকা গ্রহ্ণ করে। ডাক্তারজী খুব সহ্জেই তাকে নিজের ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। এই প্রসঙ্গের বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীএরকুন্টওয়ার বলেন যে "কুয়োর কাছে ঐ অপরিচিত শ্যামবর্ণ মানুষটির উজ্জ্বল চোখের মধ্যে আমি যে তেজস্বিতা ও আকর্ষণ ক্ষমতা দেখলাম, তার ছাপ আমার মনের উপর একেবারে স্থায়ীভাবে বসে গেল।"

এখন থেকে বালকদের মণ্ডলে বক্তৃতা দেবার জন্য ডাক্তারজী প্রচেষ্টাপূর্বক যেতে শুরু করে দিলেন। তাদের হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকায় ডাক্তারজীর প্রেরণাদায়ক বক্তব্যও আসতে লাগল। বিদ্যার্থী মণ্ডলের কয়েকটি কিশোর ডাক্তারজীকে তাদের মণ্ডলের সভাপতি হওয়ার জন্য আগ্রহ্ প্রকাশ করল। কিন্তু তখন পর্যন্ত ডাক্তারজী সংবাদপত্রের নানা ঝামেলা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেন নি। সেই সঙ্গে তাঁর বাড়িতে মেরামতির কাজ চলছিল। সেই কারণে ডাক্তারজী তাদের 'না' বলতে পারলেন না, কিন্তু "পরে ভেবে দেখব" বললেন। কিন্তু ঐ কিশোররা একথা একবারও মনে করেনি যে ডাক্তারজী তাদের এড়িয়ে যেতে চান। তাঁর কথার মূলে থাকত সংগঠন সম্পর্কে তাঁর মনে দিবারাত্র যে চিন্তা ও বিশ্বাস গড়ে উঠছিল, তারই আভাস। সেই কারণে ডাক্তারজীর উক্ত উত্তর শুনেও তরুণদের তাঁর নিকট আসা যাওয়ায় কোন বাধা ছিলনা। অধ্যাপক পাঃ কৃঃ সাবলাপুরকরও ঐ তরুণদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি লেখেন যে "নাগপুরে তরুণদের সব কার্যক্রমের দিকে ডাক্তার হেডগেওয়ারের লক্ষ্য থাকত এবং সেই সময়ে প্রত্যেক তরুণই পথ-প্রদর্শনের জন্য তাঁর দিকে স্বাভাবিকভাবেই দেখত। বিপ্লবী দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং সে বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা শুনতে খুব ভাল লাগত। ১৯২৩ অথবা ১৯২৪ সালে "রাষ্ট্রপ্রেম চর্চা মণ্ডলে" আমরা ডাক্তার হেডগেওয়ারকে ডেকেছিলাম। সেখানে তিনি শুদ্ধ রাষ্ট্রবাদ কাকে বলে সে বিষয়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী বিশ্লেষণ করেছিলেন।"

* [নাগপুর অঞ্চলের এই কুয়োগুলি খুব প্রশস্ত হয় এবং তাতে নামার জন্য বেশ চওড়া সিঁড়ি থাকে — যেমন বড় প্রাসাদের বাইরের বারান্দায় ওঠা-নামার জন্য প্রশস্ত সোপান থাকে। ঐ কুয়োতে বেশ সাঁতার কাটা যায়। — অনুবাদক।]

দিগ্ডী সত্যাগ্রহের সময়ে মুসলমানদের দাঙ্গার একটা ক্ষুদ্র রূপ ১৯২৪ সালেও দেখা গেল। ১২, ১৩ জুলাই ঈদ এবং আষাঢ়-একাদশী একই সময়ে উপস্থিত হল। সেই সময়ে মুসলমানদের আক্রমণকারী প্রবৃত্তি পুনরায় মাথা তুলতে লাগল। কিন্তু এ বছর হিন্দুরা সজাগ ছিল, অতএব ওদের চক্রান্ত সফল হওয়া সহজ ছিলনা। ফলে ৩০-৩৫ জন মুসলমানদের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হল। এই সময়ে ডাঃ মুঞ্জে ও ডাঃ হেডগেওয়ার সতর্কতা অবলম্বন করে মুসলমান মহল্লা থেকে হিন্দুদের আগেই সরিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়েছিলেন। হিন্দু মহল্লাগুলিতেও রাতের পাহারা থাকত। সেই সঙ্গে মুসলমানদের ব্যবসা-পত্র বয়কট করার কথা আবার শুরু হল। এখন আর মুসলমানদের নিয়ে নাচানাচি করার কোন রুচি হিন্দুদের ছিলনা। কেননা এ বিষয়ে সকলেরই তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে আমরা ভালো ব্যবহার করলেও প্রতিদান হিসাবে মুসলমানদের দিক থেকে সৌজন্য লাভ করা যাবেনা। সেই সময়ে মুসলমান ফল-সবজি বিক্রেতার পরিবর্তে হিন্দু ফল-সব্জি বিক্রেতা পাওয়া গেলনা বলে ডাঃ মুঞ্জে নিজেই ফল-সব্জি বিক্রেতার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এর থেকেই বয়কট-আন্দোলনের তীব্রতার অনুমান করা যেতে পারে। সেই সময়ে হিন্দুদের লাঠি নিয়ে যাতায়াত করার বিষয়ে বেশ জোর প্রচার করা হয়েছিল। ডাঃ মুঞ্জে তরুণদের জোরের সঙ্গে বলতেন, "যদি একাধটা লাঠিওয়ালা গুণ্ডা আমাদের দরজায় এসে দাঁড়ায়, তাহলে তার হাত থেকে নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করার সামর্থ্য তরুণদের মধ্যে অবশ্যই থাকা উচিত। লাঠি চালনার শিক্ষা গ্রহণ করে 'শঠং প্রতি শাঠ্যং চ লাঠ্যং চ'-এর প্রয়োগ সুদ সমেত শোধ করার দক্ষতা থাকা উচিত। নিশীথে প্রহরাকালে ডাক্তারজী যখন টহল দিতেন, তখন তিনি প্রহরারত রক্ষীদের সঙ্গে পরিচয় করতেন এবং তাদের পরখও করতেন। বলা বাহুল্য তিনি তাঁর পরবর্তী কার্যক্রমের দৃষ্টিতে এইসব তরুণদের একত্র করার ভূমিকা তৈরী করছিলেন।

নাগপুরের সঙ্গে-সঙ্গে দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বুদ্বুদ ফেটেই চলেছিল এবং সর্বত্রই হিন্দু নেতাদের পক্ষে সমগ্র পরিস্থিতির পুনর্মূল্যায়ন করা আবশ্যক হয়ে পড়ল। আমেঠি, সম্ভল, গুলবর্গা, কোহাট ইত্যাদি স্থানে মুসলমানরা তাদের অত্যাচারে মানবতা তথা শান্তির সমস্ত অস্তিত্বকেই একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছিল। ৯, ১০ সেপ্টেম্বর কোহাটের দাঙ্গায় একশো পঞ্চান্ন জন নিহত হয় এবং প্রায় নয় লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। মুসলমানরা প্রাণভরে হিন্দুদের গৃহ ও দোকান লুণ্ঠন করে। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু মহাত্মা গান্ধীকে লেখেন — "শান্তির ভাষণ ও প্রবচন ঢের হয়েছে।" এই সব দাঙ্গার কারণে মহাত্মাজীও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও মর্মাহত হলেন। তিনি দিল্লীতে মৌলানা মোহম্মদ আলির বাড়ীতেই ডাঃ আন্সারী ও শ্রী আব্দুল রহমানের তত্ত্বাবধানে একুশ দিন অনশন করার কথা ঘোষণা করেন। অনশন চলাকালীন মহাত্মাজী বলেছিলেন—"আমার ইচ্ছা হয় যে প্রয়োজন হলে আমার রক্ত দিয়েও দুই পক্ষের মধ্যবর্তী ফাটল ভরাট করে দিই।" এই অনশনের ফলে শান্তি পরিষদসমূহ গঠিত হয় এবং পুনরায় একবার প্রেমের প্রদর্শন করে মুসলমানেরা ঐক্যের কথা ঘোষণা করে। এই সব পরিষদের পরিণাম সম্পর্কে

ডাঃ আম্বেডকর লেখেন—"একতা পরিষদে কেবল লোভনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হত এবং সেগুলি ঘোষণা হবার পরমুহূর্তে তার উল্লঙ্ঘন শুরু হয়ে যেত।"

কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও গান্ধীজী তাঁর অহিংসার উপদেশে যৎকিঞ্চিৎ বদল করেননি। তিনি অমানবিকতার নগ্ন নৃত্য প্রত্যক্ষ করছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি হিন্দুদের একথাই বলতেন যে 'আমার কথা কে শুনছে? কিন্তু এ সময়ে আমি হিন্দুদের এ কথাই বলব যে তোমরা মরে যেতে পারো, কিন্তু মেরোনা।" ডাক্তারজীর পরিচালনায় প্রকাশিত 'স্বাতন্ত্র্য' দৈনিকের সংখ্যাগুলি যদি পাওয়া যেত তাহলে হয়তো তাঁর সে সময়কার চিন্তা তাঁর নিজের কথাতেই জানা যেত, কিন্তু তা সম্ভব না হলেও একথা অনুমান করা যেতে পারে যে এই সব ঘটনায় তিনি অবশ্যই অত্যন্ত বেদনার্ত তথা চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন। সেই মারদাঙ্গার সময়ে যারা নিজেদের 'ইণ্ডিয়ান' নামে জাহির করে গৌরব অনুভব করত, তারাও 'হিন্দুত্বের' কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মোপলা বিদ্রোহের পর থেকেই শুদ্ধি ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার কথা বলতে শুরু করেছিলেন। তিনি 'আইন-ভঙ্গ' তদন্ত সমিতির সম্মুখে পরিষ্কার বলেছিলেন যে "এক-একটি প্রান্তে দুই জাতিই পরস্পরের বিষয়ে সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়েছে — এ কথা আমি স্বয়ং দেখতে পাচ্ছি। তার কারণ এই যে মুসলমানরা যতখানি সুসঙ্ঘবদ্ধ, হিন্দু সমাজ ততখানি নয়। তারা এখনও বিশৃঙ্খল। এর একটাই উপায় আছে যে হিন্দু নেতাদের উচিত তাঁদের সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলা।" ১৯২৪ সালে হিন্দু মহাসভার বেলগাঁও অধিবেশনে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এই কথাই বলেন। তিনি বলেন, "হিন্দুদের মধ্যে যদি ভীরুতা ও দুর্বলতা না থাকত, তাহলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অনেক দাঙ্গা এড়ানো যেত। এইসব দাঙ্গার ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে যে ভীষণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য অনেকাংশে দায়ী হিন্দুদের দুর্বলতা, তাকে দূর করা আবশ্যক।" ঐ অধিবেশন থেকে ফেরার পথে পুনার জনসভায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দের ব্যক্ত চিন্তাধারা মননীয়, এবং সেই সময়কার হিন্দু নেতাদের মনঃস্থিতির উপর উত্তম আলোকপাত করে। তিনি বলেছিলেন, "সিংহগড়ের মত কঠিন স্থানে যে মহারাষ্ট্র গৈরিক ধ্বজ উড্ডীন করেছিল, সেই মহারাষ্ট্র ছিল অত্যন্ত নির্ভীক। আজ আমরা আমাদের গৈরিক পতাকা ত্যাগ করে যে কোন পতাকার নিচে সমবেত হচ্ছি। এই ভুলকে দূরে সরিয়ে পুনরায় নিজেদের স্বরূপ চিনে নিন এবং সত্যিকার বৈদিক ধর্ম তথা আর্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করুন।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ছয় মাস ধরে কেবল মুসলমানদের ইতিহাস ও মুসলিম আইনের অধ্যয়ন ও মননে ব্যয় করেন এবং তাঁর চিন্তণের নির্যাস তিনি লালা লাজপত রায়কে এই বাক্যের মাধ্যমে অবহিত করেন--"আমার মনে হয় হিন্দু-মুসলিম একতা সম্ভব নয় এবং ব্যবহারিকও নয়।" দেশবন্ধুর মত লালা লাজপত রায়ের নিকটও কংগ্রেসের পাঁচ বছর ব্যাপী হিন্দু-মুসলিম একতার প্রয়াসের অর্থ অনেকটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। মৌলানা হসরৎ মোহানীর এই প্রস্তাব যে "হিন্দু ও মুসলমানদের দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য নির্মাণ হওয়া উচিত।" — এর উপরে মন্তব্য করে তিনি বলেছিলেন, "... আগে না হলেও গত পাঁচ বছর যাবৎ কংগ্রেস হিন্দু ও মুসলমানদের সংযুক্ত সংগঠন থেকেছে, কিন্তু এরা হিন্দুদের থেকে মুসলমানদেরই বেশী

ভালো করেছে।" ঠিক এই সময়ে হসরৎ মোহানী 'উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও পাঞ্জাবকে নিয়ে স্বতন্ত্র মুসলিম রাজ্য'-এর দাবী উত্থাপন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও এই বছরেই একথা অনুভব করলেন যে 'সর্বসাধারণ মুসলমানরা হল গুণ্ডা আর হিন্দুরা কাপুরুষ।'

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুরও এর থেকে ভিন্ন অনুভব হওয়ার কথা নয়। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে ঐ সময়ের পরিস্থিতির বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "অনেক কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদের বোরখা পরা সাম্প্রদায়িকই ছিলেন।" এতদ্ব্যতীত, ঐ গ্রন্থেই তিনি হিন্দুদের — 'বাবুগিরিতে রাঙানো এবং নিদ্রাশীল' বলে অভিহিত করেন। প্রসিদ্ধ বিপ্লবী লালা হরদয়াল ১৯২৫ সালের প্রথম দিকে লাহোর থেকে প্রকাশিত 'প্রতাপ'-এ তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে 'হিন্দু রাষ্ট্রের' উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শুদ্ধি, সংগঠন, হিন্দু রাজ্যের স্থাপনা এবং আফগানিস্তানকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা--এই চারটি বিষয়কে আবশ্যক বলে অভিহিত করে বলেন, "যতদিন হিন্দু রাষ্ট্র এই চারটি বিষয়কে বাস্তবায়িত না করবে ততদিন হিন্দু জাতির নিরাপদে থাকা সম্ভব হবেনা। ডাঃ মুঞ্জে সে সময়ে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, "গলায় তুলাসীর মালা পরে রাজনীতি করা যায় না।" ১৯২৫-এর জানুয়ারী মাসে পুনার একটি সভায় তাঁর নীতির ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলেন, "নাগপুরের দেড় লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র কুড়ি হাজার মুসলমান থাকা সত্ত্বেও আমাদেরই নিজের ধন-সম্পত্তি ও জীবনের আশংকা নিয়ে থাকতে হয়। কিন্তু মুসলমানদের কখনো এরকম ভয় হয়না যে এক লক্ষ তিরিশ হাজার মানুষের মনে কষ্ট দিলে আমাদের কী হবে। অতএব, এর পরে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হলে 'হিন্দু' হিসাবেই তার সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত। কংগ্রেসের মধ্যেও 'ইণ্ডিয়ান' ও বাইরে হিন্দু এই মনোবৃত্তি রাখা ছাড়া কোন উপায় নেই। মুসলমানরাই আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছে।" এই বছরই সাতারায় মহারাষ্ট্র প্রান্তীয় পরিষদে ব্যারিস্টার রাজরাও দেশমুখ সবার উপরে তাঁর নির্ভীক মনোভাব ব্যক্ত করে বলেছিলেন, "ভারতীয় রাষ্ট্রীয়ত্বকে যদি পুনরায় বাঁচিয়ে তুলতে হয় তাহলে হিন্দুদের মুসলমানদের সমান সঙ্ঘবদ্ধ তথা শক্তিশালী হতে হবে। চার বছর ধরে আলি ভায়েরা মহাত্মাজীর সঙ্গে বিদুষকের মত ঘুরে বেড়ালেও তাঁদের নিজেদের চিন্তাধারায় রাষ্ট্রীয়তার জ্ঞান জন্মায়নি। তাঁদের চিন্তার মূলেই রাষ্ট্রীয়তা ছিলনা এবং মহাত্মাজীর সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যেও রাষ্ট্রীয়তা ছিলনা। অতএব, আলি ভাইদের মধ্যে সেটা আসবে কোথা থেকে?"

১৯২৫ সালের দেশের নেতাদের মনঃস্থিতি কী রকম ছিল তার বিষয়ে জ্ঞাত করার জন্য ভূমিকা হিসাবে উপরের উদ্ধৃতিগুলি দেওয়া হল, কিন্তু হাঁড়ির একটা চাল টিপলেই যেমন ভাতের অবস্থা বোঝা যায়, সেইভাবে বিজ্ঞ পাঠকগণ সেকালের অবস্থা অনুমান করতে পারবেন। হিন্দু-মুসলিম একতার জন্য এ যাবৎ যে সাধনা করা হয়েছিল, তার ফল চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সুস্পষ্ট অনুধাবন করতে পারছিলেন এবং নিজ-নিজ বিবেচনা অনুযায়ী তাঁরা নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। আজ তো কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দুর নামোচ্চারণও ঘোর সাম্প্রদায়িকতা বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের

পক্ষ থেকে স্বামী সত্যদেবের পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং নাগপুর, ভাণ্ডারা, ওয়ার্ধা, গোন্দিয়া প্রভৃতি অনেক স্থানে তিনি হিন্দু সংগঠনের বিষয়েই বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই সম্পূর্ণ পরিভ্রমণে ডাক্তার হেডগেওয়ার এবং শ্রীবামনরাও ঘোরপড়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কয়েকটি সভায় ডাক্তারজীকেই সভাপতি করা হয়েছিল, সে কথা তখনকার সংবাদপত্র থেকে জানা যায়। বলা বাহুল্য যে ডাক্তারজী ঐ সময়ে কংগ্রেসেরই কার্যকর্তা ছিলেন।

সেই সময়ে ডাক্তারজীর প্রচার কী ধরনের ছিল, তার অনুমান ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত এক সভা থেকে করা যেতে পারে। ডাক্তারজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় স্বামী সত্যদেব পরিব্রাজক তাঁর লিখিত ভাষণে বলেন, "এরূপ কল্পনা করা ভুল যে হিন্দু সংগঠনগুলি মুসলমানদের বিরোধী। মহাত্মাজীর এই বক্তব্যও ভুল যে হিন্দু সংগঠনগুলি বদমাশ লোকদের পিটিয়ে ঠাণ্ডা করার জন্য তৈরী করা হয়েছে। হিন্দুস্থান আমাদের প্রাণ, এ আমাদের জীবন-সর্বস্ব, হিন্দুদের অন্তরের এই নিষ্ঠা মুসলমানদের মধ্যে নেই। এই নিষ্ঠার বিষয়ে যখন তাদের বোঝাবার চেষ্টা করা হয়, তখন ওরা মনে করে হিন্দুরা ওদের ভয়ে ভীত। তাদের এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য হিন্দুদের সংগঠন অবশ্য করা উচিত।"

এই পরিভ্রমণ শুরু করার পূর্বে ডাক্তারজী শ্রী ভাউজী কাবরে, শ্রী আপ্পাজী যোশী, শ্রীবিশ্বনাথরাও কেলকর প্রমুখ ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের এবং মধ্যপ্রান্তের রাজনৈতিক কার্যকর্তাদের নিয়ে কয়েকবার বৈঠক করেন। ঐ সব বৈঠকে তিনি সংগঠন কোন পদ্ধতিতে করা যেতে পারে এবং কী ধরনের সংগঠন গড়ে তোলা উচিত — এই সব বিষয়ে সকলের মতামত জানার চেষ্টা করেন এবং নিজের মতামতও সকলের বিচার-বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করেন। এই সব আলাপ-আলোচনার সময়ে তিনি এই মনোভাবই ব্যক্ত করেছিলেন যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একতার কল্পনা ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং হিন্দু সমাজের তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে তাদের উপর সংস্কার করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে হিন্দুস্থানের স্বার্থের সঙ্গে যাদের সম্পূর্ণ স্বার্থ অভিন্নভাবে বিজড়িত, যারা এই দেশকে ভারতমাতা বলে সম্বোধন করে, এর প্রতি অতি পবিত্র মনোভাব নিয়ে দৃষ্টিপাত করে এবং যাদের এই দেশের বাইরে অন্য কোন আধার নেই, এমন এক সুমহান ধর্ম ও সংস্কৃতি দ্বারা এক সূত্রে গাঁথা হিন্দু সমাজই এখানকার রাষ্ট্রীয় সমাজ। এই সমাজকে জাগ্রত ও সুসংগঠিত করাই হবে রাষ্ট্রের জাগরণ তথা সংগঠন। এটাই রাষ্ট্রকার্য। এই প্রকার রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে দলীয় রাজনীতি হতে পূর্ণতঃ অলিপ্ত থাকতে হবে এবং কোনও রাজনৈতিক দলের ব্যক্তির নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদ থাকা সত্ত্বেও এই সংগঠনের কাজ করতে সক্ষম থাকা উচিত। এটাই ছিল সংক্ষেপে ঐ সময়ে তাঁর চিন্তাধারা।

যে সমস্ত ছোট-বড় কার্যকর্তাদের সঙ্গে ঐ সময়ে ডাক্তারজী বিচার-বিনিময় করেন, তাঁদের নিকট তাঁর চিন্তাধারা একটু নতুন ধরনের মনে হল, কারণ সেই সময়ে কংগ্রেসে প্রচলিত 'পরিবর্তনবাদী' এবং 'অপরিবর্তনবাদী' উভয় ভূমিকা থেকে ডাক্তারজীর চিন্তাধারা ভিন্ন প্রকারের ছিল। এ বিষয়ে শ্রী আপ্পাজী যোশী লেখেন — "এই সব কার্যকর্তারা কোন-না কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিলেন। এঁদের কারো উপর মহাত্মাজীর আন্দোলনের আবার কারো

উপর স্বরাজ্য-দলের চিন্তাধারার প্রভাব পড়েছিল। অতএব, ডাক্তারজী এই ভানুমতীর রং-বেরং পরিজনদের শেষ পর্যন্ত সংযুক্ত করে রাখতে পারেন নি। ১৯২৫ সালে তিনি সকলের মোহ ত্যাগ করলেন এবং তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার সঙ্গে যারা সহমত পোষণ করে তাদের নিয়েই হিন্দু রাষ্ট্রের পুনরুদ্ধারের কাজ আরম্ভ করার বিষয়ে নিজের মনে সংকল্প করেন।"

হিন্দু রাষ্ট্রের সংগঠন করার এইরূপ সংকল্প গ্রহণের পর ডাক্তার হেডগেওয়ার ব্যারিস্টার সাভারকরের সঙ্গে দেখা করবেন বলে ঠিক করলেন। বীর সাভারকর ঐ সময়ে রত্নগিরিতে অন্তরীণ ছিলেন। ডাক্তারজী শ্রী বিশ্বনাথরাও কেলকর এবং ডাঃ সাভারকরকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেলেন। রত্নগিরিতে তখন প্লেগ ছড়িয়ে পড়ায় সাভারকর রত্নগিরির কাছেই শিরগাঁওয়ে শ্রী বিষ্ণুপন্ত দামলের গৃহে ছিলেন। ডাক্তারজী সেখানে দুই দিন ছিলেন এবং তাত্যারাও-এর সম্মুখে তাঁর পরিকল্পিত সংগঠনের কথা উপস্থাপন করেন এবং সে বিষয়ে তাঁর অভিপ্রায়ও জেনে নেন।

দিণ্ডী সত্যাগ্রহের সময়ে নাগপুরের অনেক আখড়ার ওস্তাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল এবং পরেও তাঁদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ অব্যাহত রাখেন, যার ফলে তাঁদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সঙ্ঘের কাজ প্রত্যক্ষ আরম্ভ করার সময়ে ডাক্তারজীর মস্তিষ্কে যে সমস্ত কার্যক্রমের কথা আনাগোনা করছিল, তার মধ্যে আখড়ার ব্যায়ামগুলিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই দিক থেকে ওস্তাদদের সঙ্গে এই সম্পর্ক খুব কাজ দিয়েছিল। তিনি একই কারণে নাগপুরের গণেশোৎসবগুলির পরিচালকদের 'গুণোৎকর্ষ মণ্ডল'-এর পক্ষ থেকে শ্রী ভাউসাহেব টালাটুলের দোতলায় এক বৈঠকে আমন্ত্রণ জানালেন এবং চেষ্টা করলেন যাতে এই উৎসবগুলির মধ্যে একসূত্রতা তথা বিশালতা আনা যায়। সেই সময়ে তিনি 'রাষ্ট্রীয় উৎসব মণ্ডল'-এর সম্পাদকও ছিলেন।

আমরা উপরের বর্ণনায় দেখেছি যে সেই সময়ে সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরই হিন্দু সংগঠনের আবশ্যকতা কত উৎকণ্ঠার সঙ্গে অনুভূত হচ্ছিল। সেই সঙ্গে এ বিষয়েও দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন তথা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হবে যে এই উপলব্ধির ভিত্তিতে কতজন প্রত্যক্ষ সংগঠন করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন এবং তাদের কার্যের স্বরূপ কী রকম ছিল। সকলের মনেই হিন্দু সংগঠনের আবশ্যকতার অনুভূতি সমান তীব্রতায় বোধ হওয়া সম্ভব ছিলনা। কোন একটা পাশবিক অত্যাচারের কারণে যাঁদের ক্রোধ জেগে ওঠে, তাঁদের একটি শ্রেণী ছিল। দ্বিতীয় একটি শ্রেণী ছিল যাঁদের মনে হত এই সব দাঙ্গা অস্থায়ী তথা সাময়িক প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি মাত্র। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে যদি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বেশ জোরদার প্রচার করা হয়, তাহলে মুসলমানদের মনোবৃত্তির মধ্যে পরিবর্তন আনা সম্ভব, এবং তার ফলে দাঙ্গাগুলি শেষ করা যেতে পারে। তাঁদের নিজেদের প্রচার-পদ্ধতির উপর অত্যন্ত শ্রদ্ধা থাকে। তৃতীয় শ্রেণীতে ছিলেন এমন সব মানুষ যাঁদের নিজেদের হিন্দুত্বের সম্বন্ধে জ্ঞান হলেও একটা প্রশ্ন তোলা হলেই তাঁদের মুখে কুলুপ আঁটা হয়ে যেত--"এতদিন পর্যন্ত যে 'ইণ্ডিয়ান' হওয়ার গাল-ভরা আওয়াজ তুলতেন, তার কী হবে?" চতুর্থ শ্রেণীটি প্রামাণিকতার দিক থেকে এদের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে ছিল। তাঁরা নিজেদের 'ইণ্ডিয়ান' হওয়ার দাবী ত্যাগ না করে এবং

মহাত্মাজী তাঁদের উপর অসন্তুষ্ট যেন না হন — সেই সীমারেখার কথা মনে রেখে হিন্দু সংগঠন সম্বন্ধে কথা বলার ধৈর্য দেখাতেন। 'ইণ্ডিয়ান' রাষ্ট্রীয়ত্বের মোহিনী-মায়ায় এঁদের সকলের চেতনা লোপ পেয়েছিল এবং সেই কল্পনাকে ত্যাগ না করে যতটা সম্ভব তত পরিমাণে তাঁদের হিন্দুত্ব প্রকট হত। মহাত্মাজী ও জওহরলালজীর মত গোঁড়া ইণ্ডিয়ান রাষ্ট্রবাদীদের সামনে হিন্দুদের সম্বন্ধে সহানুভূতিপূর্ণ কথা বলা সাম্প্রদায়িকতা তথা বিচ্ছিন্নতারই পরিচায়ক ছিল। তাঁদের দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলিম একতার জন্য হিন্দুরা যতই ত্যাগ স্বীকার করে থাকুক না কেন, তা ছিল অকিঞ্চিৎকর। তাঁদের দৃঢ় ধারণা ছিল যে হিন্দু-মুসলমানরা মূলতঃ একই ছিল, শুধু ইংরেজরা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। এমনই পরিস্থিতিতে ডাক্তার হেডগেওয়ার হিন্দু সংগঠনের আবশ্যকতার কথা নির্ভীকভাবে প্রতিপাদন করতে শুরু করেছিলেন এবং দেশে তাঁর মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করার মত কিছু নেতাও বিদ্যমান ছিলেন। হিন্দুস্থানে বসবাসকারী সকল মানুষের এই রাষ্ট্র, এই কল্পনার উপর থেকে তাঁর বিশ্বাস সম্পূর্ণ উবে গিয়েছিল এবং "হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব" এই কথাই তাঁর মন তাঁকে দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিচ্ছিল।

এই বিবিধ শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে "হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব" এই কথা যাঁরা মানেন, তাঁরাও মুখে এই কথা ঘোষণা করা ছাড়া আর কিছু করতে সক্ষম ছিলেন না। বক্তৃতা, প্রবন্ধ লেখা এবং প্রস্তাব গ্রহণ পর্যন্তই ছিল তাঁদের দৌড়। 'সংগঠন' করা বলতে কী করতে হয় — এটা তাঁদের বোধগম্য হত না। তাঁরা কোন পথ খুঁজে পেতেন না, তাই তাঁরা 'এই ধরনের সমাজ হওয়া উচিত' এই রকম কল্পনাই শুধু ব্যক্ত করতে পারতেন। পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষের সমাজ যে দিকে চলেছিল, তার বিপরীত স্রোতে সাঁতার কাটার মতই ছিল হিন্দু সংগঠনের কাজ। কিন্তু এরকম পরাক্রম করার জন্য যে ধৈর্য, নিষ্ঠা, কর্তৃত্ব তথা দক্ষতার প্রয়োজন — দুর্ভাগ্যক্রমে তা অনেকের মধ্যেই ছিলনা। যাঁদের কাছে এই গুণগুলি ছিল, তাঁদেরও সংগঠনের স্থির, কার্যকর তথা চিরন্তন স্বরূপের দর্শন হয়নি, এবং তার স্থানে মুসলমানদের প্রতি ঘৃণার কারণে শুধু এক প্রতিক্রিয়াত্মক স্বরপের সংগঠনেরই আবশ্যকতা তাঁরা বুঝতে সক্ষম ছিলেন।

এইরূপ পরিস্থিতিতে অনেকেই হিন্দু সমাজের উপরে বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের সংকটের বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু যে পাহাড় ভেঙে পড়ছে তাকে রুখে দেবার সামর্থ্য উৎপন্ন করার কাজ দুর্ভাগ্যক্রমে কেউই করেননি। তার ফলে ১৯২৫ সালে হিন্দু সংগঠনের ব্যাপক অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও তার প্রত্যক্ষ আবির্ভূত স্বরূপ কোথাও দেখতে পাওয়া গেলনা। শুধু তাই নয়, ডাক্তারজী যখন কাজ আরম্ভ করলেন তখন তাকে 'সাম্প্রদায়িক', 'ছেলে-ছোকরাদের ব্যাপার', 'ত্রেতাযুগীন' ইত্যাদি দুর্নাম দিয়ে তাঁর গতি রুদ্ধ করার দুর্ভাগ্যজনক প্রচেষ্টাও এমন মহাপুরুষরা করতে কসুর করেননি।

লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যে ডাক্তারজী যে সংকল্প করেছিলেন, তার পিছনে এমন নিষ্ঠা ও ধ্যেয় এবং তাঁর নির্ধারিত পথের প্রতি এমন অবিচল বিশ্বাস ছিল যে সমাজের বিপরীত মনঃস্থিতি দেখে তার উপর তাঁর করুণাই হল, ক্রোধ নয়। তিনি পাঁচ-সাত বছরের ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে করলেন এবং হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষের

পশ্চাতের কারণ-মীমাংসার সন্ধান করে সমূলে তার উচ্ছেদ সাধনের সংকল্প গ্রহণ করলেন। তাঁর নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে হিন্দুস্থানকে দেশের সংজ্ঞা দেবার জন্য যে সমাজ ভগীরথ-প্রয়াস করেছে, সেই হিন্দুদেরই এই দেশ। এই সমাজ মুসলমান অথবা ইংরেজদের কারণে অধঃপতিত হয়নি, পরন্তু রাষ্ট্রীয় ভাবনা শিথিল হওয়ার দরুন ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যেকার সঠিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় এবং এইরূপ অসংগঠিত অবস্থার কারণেই এক সময়ে যে হিন্দু সমাজ দিগ্বিজয়ের ডঙ্কা দশদিকে বাজিয়ে দিয়েছিল, আজ সেই সমাজই শত-শত বর্ষ ব্যাপী বিদেশীদের পাশবিক সত্তার নিচে পদদলিত হচ্ছে। আমাদের সমাজে মনুষ্য-বল, অর্থ-বল ও শস্ত্র-বল সবই ছিল, কিন্তু "আমি রাষ্ট্রের অঙ্গ এবং তার জন্য আমার জীবন নিয়োজিত হওয়া উচিত" এই কর্তব্য-বোধ ব্যক্তির হৃদয় থেকে বিলুপ্ত হওয়ার কারণেই সমস্ত শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমাদের সমাজ পরাভূত হয়। এর জন্য সমাজের শিরায়-শিরায় রাষ্ট্রীয়তার তীব্র ভাবনা পরিপূর্ণ করে, সেই ভাবনা দ্বারা সম্পূর্ণ সমাজকে অনুশাসনবদ্ধ তথা সঞ্জীবিত করে, তাকে পুনরায় দিগ্বিজয়ী রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে — এই মহৎ মঙ্গলময় সংকল্প করলেন ডাক্তারজী। এই সংকল্পেরই মূর্ত স্বরূপ হল "রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ।"

১৩. সঙ্ঘের শুভারম্ভ

ডাক্তারজীর মনের মধ্যে সঙ্ঘের পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। এবার তাকে চিন্তা জগৎ থেকে বাস্তব জগতে নিয়ে আসতে হবে। এর জন্য তিনি বিজয়াদশমীর শুভ মুহূর্তটিকে নির্দিষ্ট করলেন। তদনুসারে ১৯২৫ সালের বিজয়াদশমীতে নিজ গৃহে পনের-কুড়ি জন ব্যক্তিকে একত্র করে সবাইকে বললেন, "আমরা আজ থেকে সঙ্ঘ শুরু করছি।" প্রথম দিনের এই বৈঠকে শ্রী ভাউজী কাবরে, শ্রী আপ্পা সোহোনী, শ্রী বিশ্বনাথ রাও কেলকর, শ্রী বালাজী হুদ্দার, শ্রী বাপুরাও ভেদী ইত্যাদি সজ্জনরা উপস্থিত ছিলেন। সঙ্ঘের 'শুভারম্ভ' ঘোষণা করার পর ডাক্তারজী সকলের সামনে এই প্রশ্ন রাখলেন যে "সঙ্ঘে প্রত্যক্ষ কী কার্যক্রম করা যায় যাতে আমরা বলতে পারি যে সঙ্ঘ শুরু হয়ে গেছে?" এ বিষয়ে তিনি সকলের অভিমত শুনলেন। বৈঠকের শেষে ডাক্তারজী অত্যন্ত প্রভাবযুক্ত ভাষায় তাঁর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে বলেন যে আমরা সকলে শারীরিক, সামরিক ও রাজনৈতিক — তিন ধরণের শিক্ষাই গ্রহণ করব এবং অন্যদেরও দিতে আরম্ভ করব।

সাধারণতঃ যখন কোন নতুন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন প্রথম দিনই তার নাম, রসিদ বই, খাতাপত্র, অর্থভাণ্ডার, সংবিধান, কার্যালয় ইত্যাদির কথা চিন্তা ও ব্যবস্থা করে সংবাদপত্রে খুব জাঁক-জমক করে প্রচার করা হয়। কিন্তু সঙ্ঘ আরম্ভ করার সময়ে এই সব জিনিসেরই অভাব ছিল। বিজয়াদশমীর ঐ দিনে সঙ্ঘের দৃষ্টিতে দুইটি বিষয়ই বীজরূপে নিশ্চিত হয়েছিল। প্রথম, হিন্দু রাষ্ট্রের পুনরুত্থানের বিষয়ে ডাক্তারজীর মনের উচ্চাকাঙ্খা, এবং দ্বিতীয় তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সমর্পিত ডাক্তারজীর চারিত্র্যপূর্ণ, ধ্যেয়নিষ্ঠ তথা সেবাময় জীবন।

হিন্দু রাষ্ট্রকে সংগঠিত করার সূচনা ডাক্তারজী তাঁর বিজিগীষু মানসিকতার অনুরূপ 'সীমোল্লঙ্ঘন'-এর শুভমুহূর্তে করেন। ব্যক্তিগত জীবন হতে সমষ্টি-জীবনের দিকে, দাসত্ব হতে স্বাধীনতার দিকে, নিদ্রা হতে জাগৃতির দিকে, দৈন্য হতে স্বর্গতুল্য সুখের দিকে, এবং দুর্বলতা হতে দিগ্বিজয়ী সামর্থ্যের দিকে সমগ্র হিন্দু রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সীমোল্লঙ্ঘন ডাক্তারজী ঐ দিনেই আরম্ভ করে দেন। প্রভু রামচন্দ্র, চতুর্দশ ভুবনের উপর শাসনকারী এবং দেবতাদেরও দাসে পরিণত করেছিল যে রাবণ তাকে এই দিনেই রামবাণের প্রতাপ দেখিয়েছিলেন, বিরাট-রাজার গোশালার গরুদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল যে কৌরবরা, তাদের পরাভূত করার নিমিত্ত অর্জুন এই দিনেই গাণ্ডীবের টঙ্কার-ধ্বনি শুনিয়েছিলেন। দুষ্টদের ভয়ে কম্পিত করে দেবে যে শক্তিশালী হিন্দু-রাষ্ট্র তাকে জাগ্রত করে তোলার জন্য এই ধরনের বিজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিজয়াদশমী, তার থেকে উপযুক্ত মুহূর্ত আর কী হতে পারে?

যে সকল তরুণ ও বালকেরা ডাক্তারজীর সম্পর্কে এসেছিল, যে খাতায় তাদের নাম, বয়স, শিক্ষা এবং তারা কোন ব্যায়ামশালায় যেত — এইগুলি লেখা ছিল, সেটি পাওয়া গেছে। প্রথমদিকে সঙ্ঘে আজকের মত দৈনন্দিন কার্যক্রম থাকতনা। সঙ্ঘের সদস্যের নিকট এটুকুই প্রত্যাশা ছিল যে সে যেন যে কোন ব্যায়ামশালায় গিয়ে পর্যাপ্ত ব্যায়াম করে। রবিবার ভোর পাঁচটায় 'ইতবার দরওয়াজা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের' ময়দানে সকলকে সমবেত করা হত। এই একত্রীকরণের সময়ে কিছু দিন পরে শ্রী মার্তণ্ডরাও জোগের পর্যবেক্ষণে সামরিক প্রশিক্ষণও শুরু করে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম দিকে কয়েক মাস রবিবার ও বৃহস্পতিবার রাজনৈতিক বর্গ নিয়মিত চলত। এই রাজনৈতিক বর্গের উদ্দেশ্য ছিল সঙ্ঘের সভাসদদের (সে সময়ে এই শব্দটি প্রচলিত ছিল) দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য কী ধরনের প্রয়াস করতে হবে সে বিষয়ে পথ প্রদর্শন করা। এই বর্গ অনাথ বিদ্যাগৃহে এবং শ্রী বডকস, শ্রী টালাটুলে, শ্রীমার্তণ্ডরাও জোগ ও ডাক্তারজীর গৃহে পাল্‌টা-পাল্‌টি করে চলত। বর্গগুলিতে ডাক্তারজীর ভাষণ তো হতই, তা ছাড়া তরুণদের মধ্যে শ্রী বালাজী হুদ্দার, শ্রী দাদা পরমার্থ, শ্রী ভৈয়াজী দাণী প্রমুখদেরও বলার জন্য উৎসাহিত করা হত। এই রাজনৈতিক বর্গগুলির মত কয়েকটি উৎসবের নিমিত্তও ভাষণ হত। এই রাজনৈতিক বর্গই পরবর্তীকালে 'বৌদ্ধিক বর্গ' রূপে বিকাশ লাভ করেছে। 'বৌদ্ধিক বর্গ' নামটি ১৯২৭ সালের পরে প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

সঙ্ঘের তরুণ ও বালকরা প্রধানতঃ শ্রী আণ্ণা খোতের নাগপুর ব্যায়ামশালায় যেত। তার কারণ এই হতে পারে যে প্রথমতঃ সেখানে ব্যায়ামের উত্তম উপকরণাদি ছিল, এবং দ্বিতীয়তঃ ডাক্তারজী এবং আণ্ণা খোতের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। ডাক্তারজীর সংগঠনের সদস্যারা ঐ ব্যায়ামশালায় দণ্ড, ডন-বৈঠক, মলখম্ভ, একদণ্ডী (Single-bar), দ্বিদণ্ডী (Double-bar) ইত্যাদির কার্যক্রম করত। সেই সময়ে ডাক্তারজী স্বয়ং দেখাশোনা করার জন্য উপস্থিত থাকতেন। ১৯২৫ সালের আগে ব্যায়ামশালাগুলিতে স্কুলের ছাত্ররা এবং ব্যবসায়ীরা যেত। সরকারের বক্রদৃষ্টির ভয়ে কলেজের তরুণ ছাত্রদের সেখানে দেখা যেতনা। কিন্তু ডাক্তারজীর চেষ্টার ফলে এইরকম তরুণদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং কিছুদিনের মধ্যেই ঐ ব্যায়ামশালার প্রশিক্ষক এবং শ্রী আণ্ণা সোহোনীর পক্ষে এত বেশী শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

ব্যায়াম ছাড়াও অনেকগুলি বিষয় ডাক্তারজীর সামনে ছিল। সেই কারণে সঙ্ঘে যে তরুণরা আসত তাদের স্বতন্ত্র রূপে প্রশিক্ষণ দেওয়ার চিন্তা শুরু হল। এই সময়েই রাজা লক্ষ্মণরাও ভোঁসলে তার পুত্রের যজ্ঞোপবীত সংস্কার উপলক্ষে যে অর্থ দান করলেন, তা দিয়ে শ্রীদত্তোপন্ত মারুলকর আণ্ণা খোতের ব্যায়ামশালা থেকে আলাদা 'মহারাষ্ট্র ব্যায়ামশালা' এবং 'প্রতাপ আখাড়া' নামক ব্যায়ামশালা স্বতন্ত্ররূপে আরম্ভ করলেন। এই নতুন ব্যায়ামশালাগুলির জন্য চাঁদা দাতাদের তালিকার মধ্যে ডাক্তারজীর নাম সবার উপরে লেখা পাওয়া যায়। এই সময় আখড়া ও সঙ্ঘ, এই প্রকার সংগঠনের দুইটি স্বরূপ দেখা যায়। এই নতুন আখড়াগুলিতে

সঙ্ঘের সদস্যরা যেতে শুরু করে দিল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই 'নাগপুর ব্যায়ামশালা' ও 'মহারাষ্ট্র ব্যায়ামশালার' মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তথা উত্তেজনা শুরু হয়ে গেল। এই বিবাদের মধ্যে সঙ্ঘ অকারণেই জড়িত হয়ে পড়বে বলে মনে হল। তখন ডাক্তারজী সঙ্ঘকে পৃথক করে নেবেন বলে স্থির করলেন। তদনুসারে 'ইতবার দরওয়াজা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের' মাঠে শ্রী আগ্না সোহোনী স্বতন্ত্রভাবে সঙ্ঘের লাঠির কার্যক্রম শুরু করে দিলেন। প্রথম দিকে ব্যায়ামশালা ও সঙ্ঘের পৃথক কার্যক্রম হত এবং পরে প্রার্থনার জন্য সকলে এক সাথে সমবেত হত।

সঙ্ঘের বাহ্য রূপ আখড়ার মতই ছিল। ১৯২৬-এর এপ্রিল মাসে রামনবমীর মেলা উপলক্ষে সঙ্ঘের সদস্যদের রামটেক নিয়ে যাওয়ার কথা ডাক্তারজী চিন্তা করলেন। রামটেকের যাত্রার সময়ে খুব বেশী ভিড় হত এবং অব্যবস্থার দরুন অনেক যাত্রীদের প্রচণ্ড ধাক্কা-ধাক্কি ও ঠেলাঠেলির জন্য খুব কষ্ট সহ্য করতে হত, সেই কারণে তারা ঠিকমত দর্শন পর্যন্ত করতে পারতনা। ডাক্তারজী ভাবলেন সঙ্ঘের শৃঙ্খলা-পরায়ণ তরুণদের সাহায্যে এই অব্যবস্থার যদি সুরাহা করা যায়, তাহলে সংগঠনের শক্তি তথা তার শ্রেষ্ঠতার খনিকটা ছাপ জনসাধারণের মনের উপর অঙ্কিত হবে। সেই সঙ্গে এই কারণে সঙ্ঘের সদস্যদেরও আত্মবিশ্বাস তথা সঙ্ঘনিষ্ঠাও কিছুটা বর্ধিত হবে। এই দ্বিবিধ কারণে তিনি সকল সদস্যদের রামটেক নিয়ে যাবার চেষ্টা শুরু করলেন। 'অনাথ বিদ্যার্থী গৃহের' ছাত্ররা প্রতি বছর রামটেক যেত এবং যাওয়ার সময়ে সঙ্গে 'ভগবাধ্বজ' নিয়ে যেত। একই সময়ে যদি নিজেদের লোকেদেরও সেখানে নিয়ে যেতে হয় তাহলে তাদের আলাদা নাম ও আলাদা পোশাক থাকা আবশ্যক, যাতে তাদের পৃথক প্রভাব তথা পরিণাম জনসাধারণের চোখে পড়ে — এই কথা ডাক্তারজীর মনে হল। তিনি সঙ্ঘের নাম নিশ্চিত করার বিষয়ে নিজে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন এবং ১৭ই এপ্রিল তারিখে এই উদ্দেশ্যে একটি বৈঠক আহ্বান করেন। এই বৈঠকে সঙ্ঘের নাম সম্বন্ধে অনেক প্রস্তাব আসে এবং প্রত্যেকে নিজ প্রস্তাবের স্বপক্ষে অনেক যুক্তিরও অবতারণা করেন। সেই সময়ে নাগপুরের কার্যবাহ যে প্রতিবেদন লেখেন, তাঁতে বলা হয়, "সভায় ছাব্বিশ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় সঙ্ঘের জন্য অনেকগুলি নামের প্রস্তাব রাখা হয়। সেই গুলি নিয়ে তর্ক-বিতর্কের পর তিনটি নাম সভার মতামতের জন্য উপস্থাপন করা হয়।" এই তিনটি নাম ছিল — (১) রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (২) জরিপটকা মণ্ডল, (৩) ভারতোদ্ধারক মণ্ডল। এইগুলির মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নাম গৃহীত হল।

অধ্যাপক পাঃ কৃঃ সাবলাপুরকরও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লেখেন — "... ডাক্তারজী আগেই নিজের মনে সঙ্ঘের নাম নিশ্চিত করে রেখেছিলেন। তথাপি আমরাও নিজের মন থেকে কী করতে পারি এই আত্ম-বিশ্বাস তরুণদের মনে জাগানোর জন্য ডাক্তারজী ঐ সব ভবিষ্যৎ স্বয়ংসেবকদের (সঙ্ঘের) নামের প্রস্তাব করতে বলেন। কলেজে সেই বছরই ভর্তি হয়েছিল এমন একজন ছাত্র (এখন তিনি একজন ডিস্ট্রিক্ট জজ) 'জরিপটকা মণ্ডল' নামের প্রস্তাব করেন এবং তার উপরে খুব উৎসাহের সহিত বক্তৃতা করেন। অন্যরাও ঐ সময়ে যে নাম মনে উদয় হল সেই নামের প্রস্তাব রাখলেন। এই সব হবার পর 'রাষ্ট্রীয়

স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' নামই সঠিক কেন, এ বিষয়ে আমাকে বক্তৃতা করতে ডাক্তারজী আদেশ করেন। আমি প্রায় আধ ঘন্টা বললাম। আর ভালই বললাম। আমার বক্তৃতা শুনে ডাক্তারজী বেশ খুশী হলেন। তিনি সকলের সামনে আমার প্রশংসা করলেন। ডাক্তারজীর চিন্তাধারা শুনে আমার উপর যে সংস্কার হয়েছে, তার ফলেই আমি ঐ রকম বক্তৃতা করতে পেরেছিলাম, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই — অর্থাৎ এই শ্রেয় তাঁরই প্রাপ্য।"

"রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ" নামটি অত্যন্ত চিন্তাপূর্বক নিশ্চিত করা হয়েছিল। হিন্দুস্থান এ দেশে বসবাসকারী সকলের রাষ্ট্র, এই বিভ্রান্তি তদানীন্তন হিন্দু নেতাদের মনে এমন গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে তাঁদের কাছে হিন্দু সংগঠনের কাজ রাষ্ট্রীয় বলে মনে করা সম্ভবই ছিলনা। অতএব, ডাক্তারজীর এই শব্দটি ভুল এবং তিনি এটি ভ্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করেছেন — একথা পরকীয় শত্রু এবং স্বকীয় বন্ধু উভয় পক্ষই বলতে শুরু করল। রাষ্ট্রীয়ত্বের বিকৃত কল্পনা নিয়ে যারা চলত, তারা সঙ্ঘের 'রাষ্ট্রীয়' বিশেষণ ব্যবহারের বিরোধিতা করে থাকতে পারে, কিন্তু ডাক্তারজীর দৃঢ় আস্থা ছিল যে হিন্দুস্থানে হিন্দু সমাজের প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক সংস্থা তথা আন্দোলনই রাষ্ট্রীয়, এবং সেটাই সঠিক অর্থে পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় হতে পারে। পরস্পর বিরোধী পরম্পরা, সংস্কৃতি তথা চিন্তাধারার মানুষদের টেনে-টুনে বাঁধা পুঁটলী রাষ্ট্র হতে পারেনা, বরং ধর্ম, সংস্কৃতি, দেশ, ভাষা ও ইতিহাস সমান হওয়ার ফলে 'আমরা সকলে এক' এই জ্ঞান, এবং 'এক থাকা' এই সংকল্পের ফলে যে অপূর্ব আত্মীয়তা তথা তন্ময়তা হৃদয় হতে উৎসারিত হয় — সেটাই রাষ্ট্রীয়তার অধিষ্ঠান — ঐ সত্যকে তারা ভালভাবে উপলব্ধি করেছিল। বিদেশীরা হিন্দুদের আত্মবিশ্বাসে আঘাত করার জন্য সঙ্ঘকে সাম্প্রদায়িক, রাষ্ট্রবিরোধী ও সংকীর্ণ বললে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ হিন্দু-সমাজের স্বত্ব-জাগরণের অর্থ হল তাদের মরণ। এই কারণে হিন্দু সমাজের মনে আত্মীয়তা অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়তার জাগৃতি যাতে না হতে পারে এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই 'হিন্দুস্থান এখানে বসবাসকারী সকলেরই' — এরকম স্বার্থপর প্রচার ওরা বেশ জোরের সঙ্গে শুরু করে রেখেছিল। এই প্রচার এত দূর সফল হয়েছিল যে চোখের সামনে বিদেশীদের দ্বারা যোজনাবদ্ধভাবে চার দিক থেকে হিন্দুদের উপর আক্রমণ হতে দেখেও তার প্রতিকার করার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াও সংকীর্ণ বলে মনে করত, এবং তার বিপরীতে আক্রমণকারীদের আলিঙ্গন করার মত আত্মহননের প্রবৃত্তিই দুর্দৈবক্রমে শ্রেয়স্কর তথা সঠিক বলে মনে করা হতে লাগল। ডাক্তারজী সমাজের এই শোচনীয় দৃশ্য স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। সুতরাং নানা জনের তাৎকালিক নিন্দা-স্তুতির চিন্তা না করে যেটা সত্য তথা ইতিহাস-সম্মত, রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক, কিন্তু কার্যকর করা কষ্টসাধ্য ছিল, সেই সঙ্ঘকার্য তিনি নির্ভয়-চিত্তে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। শিশুদের ঔষধ পান করাবার সময়ে তারা হাত-পা ছুঁড়ে খুব জোরে কান্নাকাটি করে। আত্মবিস্মৃত হিন্দু সমাজের অবস্থা ঐ সময়ে এই রকমই ছিল। কিন্তু শিশু প্রচণ্ড চীৎকার করলেও মা যেরকম স্নেহভরে ও আগ্রহ সহকারে শিশুকে ঔষধ সেবন করান, সেই নিষ্ঠা ও আগ্রহের মনোভাব সহকারে 'হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব' এই আরোগ্যপ্রদ তথা কল্যাণকর ঔষধি হিন্দু সমাজকে সেবন করানোর সংকল্প ডাক্তারজীর হৃদয়ে পরিপূর্ণ ছিল।

রাষ্ট্রীয়ত্বের এই দীক্ষা দেওয়ার জন্যই ডাক্তারজী সঙ্ঘের স্থাপনা করেছিলেন। সেই সময়কার অবস্থা তাঁর কী রকম মনে হত, সেটা বাস্তবিক উল্লেখযোগ্য। তাঁর স্মরণিকায় তিনি লেখেন, 'মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে রাষ্ট্রের মধ্যে যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল, তা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। সেই আন্দোলনের কারণে রাষ্ট্রের মধ্যে উৎপন্ন দোষ মাথা উঁচু করে ঘুরতে শুরু করেছিল। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের জোর কম হয়ে পারস্পরিক দ্বেষ ও মাৎসর্য পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। ব্যক্তি-ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে গিয়েছিল বলে দেখা যাচ্ছিল। জাতি-জাতির মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতরবাদ তাণ্ডব-নৃত্য করছিল। কোন সংস্থার মধ্যে একসূত্রতা দেখা যাচ্ছিলনা। অসহযোগ-আন্দোলনের সময়ে দুগ্ধ পান করে পরিপুষ্ট যবন রূপী সর্প তার বিষে পরিপূর্ণ ফোঁস-ফোঁসানী সর্বত্র ছড়িয়ে রাষ্ট্রের মধ্যে কলহ উৎপন্ন করছিল। এই সম্পূর্ণ অরাজকতার বাহ্য রূপ বিবিধ বলে দৃশ্যমান হলেও তার মূল-কারণ হিন্দুদের আত্মবিস্মৃতি তথা অসঙ্ঘবদ্ধতা — এই অভ্রান্ত নিদান ডাক্তারজী করে ফেলেছিলেন এবং এই বাহ্য লক্ষণগুলির বিচার না করে মূল রোগেরই নিরাময় করার দিকে দৃষ্টি রেখে সংগঠনের চিকিৎসা শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর মনে এই বিশ্বাস ছিল যে মূল রোগকেই যদি সমূলে খনন করে উচ্ছেদ করে দেওয়া যায়, তাহলে তার বাহ্য লক্ষণগুলি নিজে থেকেই ক্রমে-ক্রমে বিনষ্ট হয়ে যাবে। বলা যেতে পারে, দিল্লীর মোগলদের সিংহাসনেই কুঠারাঘাত করে বাজীরাও যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, সেটাই ডাক্তারজীর এই প্রয়াসের পিছনে কাজ করছিল।

সংস্থার নামকরণ হয়ে যাওয়ার পরে সব সদস্যদের একই ধরনের বিশিষ্ট পোশাক তৈরী করিয়ে নেবার জন্য ডাক্তারজী আগ্রহ করলেন এবং অধিকাংশ সদস্য রামনবমীর এই মেলায় নির্দিষ্ট পোশাক পরে উপস্থিত ছিল। প্রথম দিকে সঙ্ঘ সেই পোশাকই নির্দিষ্ট করেছিল যে পোশাক কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে ডাঃ পরাঞ্জপে ও ডাঃ হেডগেওয়ারের নেতৃত্বে গঠিত 'ভারত সেবক সমাজ'-এর স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য করা হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল খাকি হাফ প্যান্ট (যেটার তখন হাঁটু পর্যন্ত ঝুল থাকত), খাকি শার্ট ও দুইটি বোতাম-যুক্ত খাকি টুপি। ১৯শে এপ্রিল তারিখে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, অনাথ বিদ্যার্থী গৃহ এবং বজরঙ্গ সঙ্ঘের একটি সংযুক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে রামটেক যাওয়ার পরিকল্পনা তৈরী হয়।

রামটেকের ঐ মেলায় রামনবমীর এক দিন আগেই সব স্বয়ংসেবকেরা সেখানে পৌঁছে গেল। সকাল ৮ টায় ব্যবস্থার জন্য টেকরিতে যাওয়ার সময়ে তারা সমর্থ রামদাসের 'মনাচে শ্লোক' গাইতে-গাইতে সঞ্চলন করে গেল। এটা সেখানকার জনসাধারণ ও তীর্থযাত্রীদের কাছে একটা নতুন জিনিষ ছিল। সেই কারণে সারা দিন ওখানকার জনতার মধ্যে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক এবং তাদের কার্যক্রম একটা আলোচনার বিষয়ে পরিণত হল। হাজার-হাজার দর্শনার্থীদের ভিড় ভেঙে পড়লে পুলিশের পক্ষে তাদের কোন ব্যবস্থা করাই সম্ভব হত না। কারণ, তাদের সংখ্যা ও কর্তব্যনিষ্ঠা দুটোই কম পড়ে যেত। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা এবং তাদের সহকর্মীরা প্রবেশ পথের কাছে দাঁড়িয়ে দর্শকদের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করে তাদের লাইনে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং এক এক করে সকলকে দর্শন করার ব্যবস্থা করে। তারা

স্থানে-স্থানে জল ভরে যাত্রীদের জল পান করাবারও ব্যবস্থা করে। এই সময়ে আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করা গেল যে হিন্দুদের অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করে মুসলমান ফকিররা নাগারখানা পর্যন্ত পথের ধারে ছোট-ছোট কবর তৈরী করে পীরদের নামে সরল যাত্রীদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করত। সহজ সরল লোকেদের এই সব তথাকথিত পীরদের আক্রমণের বিষয়ে কোন জ্ঞান ছিলনা এবং যাদের মনে সন্দেহ হত, তারাও ওদের কাজে বাধা দেবার সাহস করতনা। ডাক্তারজী তাঁর সহকর্মীদের ও রামটেক স্থিত তাঁর বন্ধুদের সাহায্যে এই পীরদের উৎখাত করে দিলেন। ডাক্তারজী ধার্মিক ছিলেন, গোঁড়া হিন্দু ছিলেন এবং তাঁর স্বভাবের মধ্যে সহিষ্ণুতারও অভাব ছিল না। কিন্তু পীরদের নামে হিন্দুদের উপর আক্রমণকারী মুসলমানদের এইভাবে গরীব মানুষদের লুণ্ঠনের ধূর্ততা তিনি সহ্য করতে পারেননি। মুসলমানদের মতই, ভিড়ের মধ্যে দর্শন করিয়ে দেবার নাম করে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে বেআইনিভাবে অর্থ উপার্জনকারী পাণ্ডাদেরও, ডাক্তারজী যাত্রীদের লাইনে দাঁড় করিয়ে একে-একে সুশৃঙ্খলভাবে দর্শন করানোর ব্যবস্থা করার ফলে লোকসান হল। ভগবানের কাছে আর সুপারিশ করার উপায় রইলনা এবং এইভাবে কিছুটা হাত গরম করার যে সুযোগ পাওয়া যেত, তাও শেষ হয়ে গেল। সেই কারণে মনে-মনে তারাও ডাক্তারজীর উপর অসন্তুষ্ট হল। কিন্তু ধর্মক্ষেত্রে অধর্মের কুকর্মগুলিকে বন্ধ করা হলে ঠগ-জোচ্চরদের কেমন লাগবে সেকথা তিনি চিন্তা করেননি। জলছত্রের মাধ্যমে তৃষ্ণার্ত মানুষদের জলপানের ব্যবস্থা করার ফলে তাদের উপর ডাক্তারজীর মমতা ভরা হাতই, পশুত্ব তথা নীচতা দেখতে পেলেই বজ্রমুষ্টিতে পরিণত হত। এটাই, ছিল তাঁর স্বভাব। সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত স্বয়ংসেবকেরা সেখানে কাজ করল এবং রাত্রের ভোজনের পর বিশ্রাম করল। সঙ্ঘের আরম্ভকাল থেকে গৃহীত এই কার্যক্রম বহু বছর যাবৎ চলতে থাকে এবং প্রত্যেক বছর অধিকতর সংখ্যায় স্বয়ংসেবকেরা ঐ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করত।

রামটেকের কার্যক্রম শেষ হবার পরে শ্রীসোহোনীর নেতৃত্বে সঙ্ঘে লাঠির প্রশিক্ষণের কাজ পূর্বের মত চলতে থাকল। এই আকর্ষণের দরুন নতুন-নতুন তরুণরা সঙ্ঘে আসতে লাগল। শ্রী অনন্ত গণেশ (আপ্পা) সোহোনী দীর্ঘকায় ও গৌরবর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর শরীরে, শক্তি ও স্ফূর্তি দুই-ই ছিল। তিনি লাঠি, তলোয়ার, বর্শা ও ছুরিকা চালনায় অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। তাঁর নৈপুণ্য সহজেই মনকে আকৃষ্ট করত। এইভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ডাক্তারজী নতুন-নতুন সদস্যদেরও ধীরে-ধীরে সঙ্ঘের চিন্তাধারা-সম্পর্কে অবহিত করতে শুরু করেন। তবে যে কোন তরুণই ইচ্ছামত সঙ্ঘে প্রবেশ লাভ করতে পারতনা। যদি কোন নতুন তরুণ সঙ্ঘে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক হত, তাহলে দুই জন পুরাতন স্বয়ংসেবককে একথা প্রমাণ করতে হত যে ওর সঙ্গে তাদের ভালো সম্পর্ক আছে। তারপর ডাক্তারজী তাকে ডেকে দু-তিন বার তার সঙ্গে কথা বলতেন। এই কথাবার্তা খুব সহজভাবে ও খোলাখুলি হত। কিন্তু ডাক্তারজী স্বয়ংসেবকদের স্বভাব, মনোবৃত্তি তথা গুণগুলি পরখ করে নেবার দিকে নজর রাখতেন। তিনি তার নাম, গ্রাম, বয়স, শিক্ষা, অভিভাবক, বন্ধু, সন্ধ্যার সময়ে সে কী করে ইত্যাদি বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেন। এই রূপ নবাগতদের বাড়ীর

লোকেদের অনেকেই ডাক্তারজীর পূর্ব-পরিচিত বলে জানা যেত। এই প্রকার প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর ডাক্তারজী তাকে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন। এই সব প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি দেখতেন যে তার গভীরতা ও বোধশক্তি কতখানি আছে। "এখান থেকে ফিরে যাবার সময়ে যদি পুলিশ জিজ্ঞাসা করে, "তুমি ডাক্তার হেডগেওয়ারের কাছে গিয়েছিলে, সেখানে কী-কী কথা হল, তাহলে তুমি তার কী জবাব দেবে?" "সঙ্ঘে কেন আসতে চাও?" "কাল যদি সঙ্ঘে মতভেদ হয় তাহলে কী করবে?" ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন থাকত। এগুলির উত্তরে সে কী বলে তার বিচার করে তাকে দু-চার দিন পরে আবার আসতে বলে বিদায় দিতেন। এইরূপ সাক্ষাৎকারে যারা আসত তাদের মনোভাব উপলব্ধি করার সাথে-সাথে তাঁর প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের মনে সমাজের অবস্থা ও তার প্রতি নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তাও যেন শুরু হয়ে যায়। এটাও তাঁর চেষ্টা থাকত। "লাঠি শেখার ইচ্ছা কেন হচ্ছে?" "একলা লাঠি শিখে কী হবে?" "তুমি তোমার সঙ্গে আর কত জন তরুণকে আনতে পারবে?" ইত্যাদি ধরনের প্রশ্ন ব্যক্তির চিন্তাগুলিকে শান্ত হয়ে বসে থাকতে দিতনা। যদি কোন বুদ্ধিমান্ তরুণের দেখা পেতেন, তাহলে তাকে অন্য ধরনের প্রশ্ন করতেন। যেমন — "স্বরাজ্যের অর্থ কী? স্বরাজ্য চাই এই কথা মুখে কতজন বলে এবং তাঁর জন্য প্রত্যক্ষ প্রয়াস ক'জন করে?" এই হিসাব জিজ্ঞেস করে তিনি তাকে বুঝিয়ে দিতেন যে আঙুলে গোনা যায় এতজন লোকও স্বরাজ্যের বিষয়ে চেষ্টা করেনা। ডাক্তারজীর ব্যক্তিত্ব এমনই ছিল যে একবার তাঁর সঙ্গে যার দেখা হয়েছে তার পদক্ষেপ আপনা থেকেই তাঁর গৃহের দিকেই অগ্রসর হত। তাঁর শব্দগুলি ঠোঁট থেকে নয়, হৃদয় থেকে নিঃসৃত হত। ফুলের সুবাস যেমন নিজে থেকেই ছড়িয়ে পড়ে, সেই রকম ডাক্তারজীর ত্যাগপূর্ণ ও ধ্যেয়নিষ্ঠ জীবনের সুবাস তাঁর কৃতি তথা উক্তি থেকে স্বভাবতঃই প্রকাশিত হত। তাঁর প্রেম উপর-উপর তথা কৃত্রিম ছিল না, বরং তাঁর সুতীব্র তথা অনন্য দেশভক্তির রং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারীকে রঞ্জিত না করে থাকতে পারতনা। তাঁর সঙ্গে দেখা করে কেউ যখন ফিরে যেত, তখন তিনি উঠে তাকে বাইরে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে আসতেন এবং তার কাঁধে হাত রেখে নিজের অনাবিল হাসি দিয়ে তার অভিষেক করে জিজ্ঞেস করতেন, "আবার কবে আসবে?" এই প্রশ্ন শুনে বাড়ীর দিকে ফিরে যেতে গিয়েও কিছুক্ষণের জন্য থেমে যেতে হত — এরকমই অভিজ্ঞতা হত।

নতুন-নতুন স্বয়ংসেবক ভর্তি হওয়ার দরুন 'ইতবার দরওয়াজা প্রাথমিক বিদ্যালয়'-এর মাঠে স্থান সংকুলান করা কঠিন হয়ে পড়ল এবং নতুন স্থানের খোঁজ শুরু হল। ডাঃ খানখোজে, শ্রী ভাউজী কাবরে এবং ডাক্তারজী ১৯০৮-৯ সাল থেকে যে মোহিতের প্রাঙ্গণে তাঁদের বিপ্লবের গোপন কাজকর্ম চালাতেন, সেই দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। কিন্তু ১৯০৮ সালের তুলনায় ১৯২৬ সালে ঐ প্রাঙ্গণ একেবারে ভেঙে-চুরে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছিল। ডাঃ খানখোজে ১৯০৮ সালে ঐ প্রাঙ্গণের বর্ণনা এইরূপ করেছিলেন — "এটা একটা ছোট-খাট দুর্গই ছিল। সে সময়ে বৃদ্ধা সালুবাঈ একাকী সরদারী মান-মর্যাদা সহ সেখানে বাস করতেন। তাঁর মধ্যে প্রাচীন মারাঠাদের দেশাভিমান বিপুল মাত্রায় জাগ্রত ছিল।

প্রাসাদের বিশাল প্রস্তর-নির্মিত সিংহ-দুয়ারে এক জন সেপাই দিন-রাত পাহারা দিত। অনুমতি ব্যতীত কেউ ভিতরে যেতে পারতনা। প্রাসাদ ছিল দুইতলা বিশিষ্ট এবং ভিতরে বড়-বড় দালান ছিল।'' কিন্তু ১৯২৬ সালে এই প্রাসাদের কয়েকটি প্রাচীর ও চেয়ারই অবশিষ্ট ছিল। এদিক-ওদিক ভেঙে পড়া দেওয়ালের ধ্বংসস্তূপের নিচে তার প্রাচীন বৈভব ধূলিতে মিশে যেন কাতরধ্বনি করছিল। সালুবাঈ-এর পরে প্রাসাদের উত্তরাধিকারী কেউ বেঁচে ছিলনা। অতএব, তার এই প্রকার দুর্দশার অবধি ছিল না। এই ধ্বংসাবশেষের সদ্ব্যবহার ডাঃ পরাঞ্জপে এবং ডাঃ হেডগেওয়ার ১৯২০ সালে কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে করেছিলেন। কিন্তু সে সময়ে যেমন-তেমন করে যে অংশগুলি কিছুটা কাজ চালাবার মত ছিল, এখন তা-ও ভেঙে পড়েছিল। তা সত্ত্বেও স্থানটি পরিষ্কার করে নিয়ে সেখানেই সঙ্ঘস্থান করার কথা চিন্তা করা হল। সেই সময়ে শ্রী ভাউজী কাবরে তাঁর পরিহাস-প্রিয় স্বভাব অনুযায়ী বললেন যে ''শ্রীমতী সালুবাঈ-এর পর প্রাসাদ ভূতদের হস্তগত হয়েছিল এবং আজকাল তার উত্তরাধিকার আমি লাভ করছি। অতএব, আপনি যেভাবে ইচ্ছে এর সদ্ব্যবহার করতে পারেন।''

সঙ্ঘস্থানের জন্য জায়গা ঠিক করার পরে বর্তমানে পাথরের সদর দরজার পূর্ব দিকের কিছু অংশ পরিষ্কার করা হল। এই কাজ শাখা আরম্ভ করার আগে এবং ছুটির দিনে অন্য সময়ও করা হত। কোদাল, শাবল আর ভাঙ্গা কড়া নিয়ে ডাক্তারজী স্বয়ং অন্য তরুণ স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে নিয়ে ভেঙে পড়া ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করার কাজে নেমে পড়তেন। উঁটের পিঠে বসে ভেড়া চরানোর পদ্ধতি তিনি বাইরে বেশ ভালোভাবে দেখেছিলেন এবং এই ধরনের কাজের পদ্ধতির প্রতি তাঁর বড় ঘৃণা তথা অরুচি জন্মেছিল। তাঁর ধারণা ছিল যে নিজেকে অন্যদের থেকে বড় মনে করে বাকিদের আদেশ মাত্র না দিয়ে নেতারও সকলের সঙ্গে মিশে কাজ করা উচিত। খাঁটি নেতৃত্বের তথা খাঁটি স্বয়ংসেবকত্বের এই প্রথম পাঠ ডাক্তারজী মোহিতের ধ্বংসাবশেষের ধূলির মধ্যে নিজের শ্রমের মাধ্যমে দিয়েছিলেন। সঙ্ঘের এই প্রথম 'ধূলি-অক্ষর' আজও স্বয়ংসেবকদের প্রেরণা দেয় এবং যা বাস্তবিকই সমাজে যথার্থ 'অক্ষর' হয়ে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

সঙ্ঘে নিয়মিত লাঠির শিক্ষা ১৯২৬-এর ২৮শে মে থেকে আরম্ভ হয়েছিল। তার জন্য ধীরে-ধীরে নতুন আজ্ঞা তৈরী করার প্রয়োজন হল। শ্রী আপ্পা সোহোনী অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এই কাজ সম্পন্ন করলেন। ইংরাজীর আজ্ঞা সাধারণভাবে প্রচলিত থাকলেও সেগুলিকে গ্রহণ না করে আগ্রহপূর্বক নিজ ভাষায় আজ্ঞা তৈরী করা হল। এগুলি রচনা করার সময়ে মারাঠি, হিন্দী, ও সংস্কৃত সব ভাষাকে ভিত্তি রূপে গ্রহণ করা হল। যে সময়ে ঘরে বাইরে সর্বত্রই ইংরাজী ভাষারই বাড়-বাড়ন্ত ছিল, সেই সময়ে স্বভাষায় আজ্ঞা তৈরী করার আগ্রহ ও প্রচেষ্টাকে কিছু লোক বাড়াবাড়ি বলে মনে করে থাকলে আশ্চর্যের কিছু নেই। ডাক্তারজীর স্বভাব বাস্তবিকতার সীমা লঙ্ঘন করে কোন বাড়াবাড়ি করা অথবা কল্পনা-জগতে বিচরণ করার মত ছিলনা। অতএব, শাখার কার্যক্রমে, 'সাবধান', 'দক্ষ', 'আরম্' ইত্যাদি আজ্ঞাগুলির প্রয়োগ করার সঙ্গে-সঙ্গে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজন-মত ইংরাজী আজ্ঞা-সমূহের প্রয়োগ করার ব্যাপারেও তিনি ইতস্ততঃ করেননি। বাতাসের গতি ও দিশা দেখে নৌকার

পালকে ঠিক দিকে ঘুরিয়ে দেবার দক্ষতা তাঁর ছিল, কিন্তু নিজের গন্তব্যকে বাতাসের দিশার ভিত্তিতে যে নির্ধারিণ করা যায়না, সে কথাও তাঁর অজানা ছিলনা।

এই সমস্ত শারীরিক কার্যক্রমের শেষে প্রার্থনা শুরু করা হল। তার মধ্যে একটি মারাঠি ও একটি হিন্দীর পদ ছিল। মারাঠি পদটি কোথা থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল জানা যায়নি। তবে কথিত আছে যে ঐ সময়ে প্রাথমিক পাঠশালাগুলিতে প্রার্থনা হিসাবে ঐ পদটি গাওয়া হত। হিন্দী প্রার্থনা 'আর্য সমাজে' প্রচলিত প্রার্থনার কিছুটা রূপান্তর করে গৃহীত হয়ে ছিল। প্রার্থনাটি ছিল নিম্নলিখিত প্রকার ঃ —

''নমো মাতৃভূমি জিথে জন্মলো মী
নমো হিন্দুভূমি জিথে বাঢ়লো মী।
নমো ধর্মভূমি জিয়ে চ্যাচকার্মী
পড়ো দেহ মাঝা সদা তী নমী মী।।
''হে গুরো শ্রী রামদূতা শীল হমকো দীজিয়ে
শীঘ্র সারে সদ্গুণোঁ সে পূর্ণ হিন্দু কীজিয়ে।;
লীজিয়ে হমকো শরণ মেঁ রামপন্থী হম বনেঁ
ব্রহ্মচারী ধর্মরক্ষক বীরব্রতধারী বনেঁ।।''

মোহিতের প্রাঙ্গণে শ্রী আপ্পা সোহোনী এবং তাঁর মনোনীত প্রশিক্ষিত তরুণরা স্বয়ংসেবকদের ছোট-ছোট বাহিনী ভাগ করে লাঠি ইত্যাদির প্রশিক্ষণ শুরু করে দেন। লাঠি, বর্শা ইত্যাদির হাত চালাবার সময়ে দুপায়ের উপর ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াবার কৌশল অন্যান্য আখড়া তথা ব্যায়ামশালাগুলি থেকে পৃথক সঙ্ঘের শারীরিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু তাঁর প্রচলিত 'যুদ্ধযোগ' নিজেদের আক্রামকতা, উদ্দীপনা, আত্মরক্ষার ক্ষমতা ইত্যাদির দিক থেকে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'যুদ্ধযোগ' পদ্ধতি অন্য কোথাও প্রচলিত ছিলনা।

লাঠির এই বিশেষ শিক্ষা শ্রী আপ্পা সোহোনী প্রসিদ্ধ বিপ্লবী স্বর্গীয় দামোদর বলবন্ত (ভিড়ে ভটজী)-এর কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। ভিড়ে ভটজীই সেনাপতি বাপটকে বিপ্লবের দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং তিনিই প্রচেষ্টাপূর্বক ডাঃ মুঞ্জেকে রাজনীতির ময়দানে অবতীর্ণ করার জন্য দায়ী ছিলেন। বেশী কথা না বলে শান্তভাবে ও নিষ্ঠার সহিত দেশাত্মবোধের যাঁরা প্রসার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তাঁকে অগ্রগণ্য বলে স্বীকার করতে হবে। এই ধরনের মহৎ ব্যক্তির নিকট হতে লাঠি-ভালা ইত্যাদি আয়ুধের শিক্ষাক্রম তথা কৌশল সঙ্ঘের মধ্যে প্রচলিত হল এবং পরবর্তী কালে ক্রমে-ক্রমে উন্নত হয়ে উঠতে লাগল।

সেই সময়ে সঙ্ঘের কার্যবাহ ছিলেন শ্রী রঘুনাথ পাণ্ডে। তিনি একটি পুস্তিকায় যে বিবরণ লিখে রেখেছিলেন, তার থেকে সেই কালে ডাক্তারজীর কাজকর্মের উপর উত্তম আলোকপাত হয়েছিল। উক্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে ১৯২৬-এর ২১শে জুন অনাথ বিদ্যার্থী গৃহে একটি বৈঠক হয়েছিল। বৈঠকে প্রত্যেক স্বয়ংসেবককে বলা হল সে যেন একটি কাগজে নিজের ধ্যেয়, সঙ্ঘের ধ্যেয় এবং সে যদি সঙ্ঘের চালক হয় তাহলে সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতি ও গঠন কী রূপ হবে সে সব বিষয়ে নিজের চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করে। ঠিক হল যে কাগজগুলি

যেন ২৮শে জুন পর্যন্ত ডাক্তারজীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। অন্য স্বয়ংসেবকদের চিন্তা করতে প্রবৃত্ত করার এটি যে ডাক্তারজীর একটি যোজনা ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। শুধু ডাক্তারজী বলে যাবেন আর তরুণ স্বয়ংসেবকেরা চুপচাপ শুনে যাবে, এবং 'যা বলা হবে তাই করব, যা দেওয়া হবে তাই খাব' — এই রকম দাস মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা তাঁর অনুগামী হবে — ডাক্তারজী তা চাইতেন না। ডাক্তারজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যদি স্বয়ংসেবকদের চিন্তা করার প্রেরণা দেওয়া হয় তাহলে তারা বিশুদ্ধ হিন্দু সমাজের প্রতি, এবং ঐ সৎসংকল্প পূর্ণ করার জন্য নিজ জীবন সমর্পণ করার সদিচ্ছার দিকে নিজে থেকে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে যাবে। তাঁর এ বিষয়ে এতটুকু আশংকা ছিল না যে যদি স্বয়ংসেবকদের চতুর্দিকের পরিস্থিতির জ্ঞান হয় তাহলে হিন্দু রাষ্ট্রের প্রতি তাদের বিশ্বাস বিচলিত হবে। উপরন্ত তাঁর একথাই মনে হত যে দেশের যথার্থ স্থিতির জ্ঞান যদি তরুণদের মন লাভ করে তাহলে তারা উপলব্ধি করবে যে সংগঠন ব্যতীত এই পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করার অন্য কোন পথ নেই, এবং তার থেকেই স্বয়ং প্রয়াস করার প্রেরণা তারা লাভ করবে। ডাক্তারজী এই ধরনের চিন্তাশীল তথা স্বতঃস্ফূর্ত কার্যকর্তা নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন এবং এই কারণেই তিনি স্বয়ংসেবকদের সঙ্ঘ সম্বন্ধে উল্লিখিত রচনা লিখে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বলেছিলেন।

তখন প্রত্যেক মাসের প্রথম রবিবার বৈঠক হত যাতে গত মাসের প্রতিবেদন সকলের সামনে উপস্থাপন করা হত। সেই সময়ে আগামী মাসের কার্যক্রমও ঠিক করে নেওয়া হত। তখন এরকম নিয়ম ছিল যে প্রত্যেক স্বয়ংসেবক মাসে অন্ততঃ দু-একবার ডাক্তারজীর সঙ্গে অবশ্যই দেখা করবে। ডাক্তারজী এবং অন্য অধিকারীরা সাগ্রহপূর্বক জিজ্ঞেস করতেন যে স্বয়ংসেবকরা ব্যায়ামশালায় যায় কি না।

ডাক্তারজী রক্ষাবন্ধন উৎসবও সঙ্ঘে পালন করেন। এই উৎসবে সাধারণতঃ ভগিনীরা ভাইদের এবং ব্রাহ্মণরা সমাজের অন্যান্যদের রাখী বাঁধত। তার পিছনে ভগিনীদের এবং ব্রাহ্মণদের সকলে রক্ষা করবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি অভিপ্রেত থাকত। এই অনুষ্ঠানকে ডাক্তারজী রাষ্ট্র-রক্ষা এবং ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে পরস্পরকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি তথা সংকল্প গ্রহণের উৎসবের রূপ দান করে রাষ্ট্রীয়তার সংস্কার নির্মাণের মহত্বপূর্ণ সাধনে পরিণত করলেন। সঙ্ঘের প্রথম রক্ষাবন্ধন উৎসব তুলসীবাগে বেলা দু-টার সময়ে বৈঠকের রূপে পালন করা হয়।

মসজিদের সামনে বাজনা বাজিয়ে যাওয়ার অধিকার যাতে অবাধ থাকে তার জন্য সঙ্ঘের প্রারম্ভিক দিনগুলিতে স্বয়ংসেবকেরা ডাক্তারজীর প্রেরণায় এই ধরনের মিছিলে অংশগ্রহণ করত। ১৯২৫-এর প্রথম দিকে নাগপুরে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা করার জন্য পঃ মতিলাল নেহরু, ডাঃ মহমুদ এবং মৌলানা আবুল কলাম আজাদকে নিয়ে একটি তদন্ত সমিতি বসেছিল। ঐ সমিতি রায় দিয়েছিল যে ভোঁসলে পরিবারের এবং জাগোবার যে কোন শোভাযাত্রা মসজিদের সামনে দিয়ে যে কোন সময়ে বাজনা বাজিয়ে যেতে পারবে এবং অন্য শোভাযাত্রাগুলি শহরের পাঁচ প্রধান মসজিদের সামনে দিয়ে দুপুরে ও সন্ধ্যার নমাজের আধ ঘণ্টা করে সময় বাদ দিয়ে অন্য সময়ে বাজনা বাজিয়ে যেতে

পারবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কাগজেই থেকে গিয়েছিল। মুসলমানদের হঠকারিতা ও হিন্দুদের ভীরুতাই ছিল তার কারণ। এই অবস্থায় ডাক্তারজী ঠিক করেছিলেন যে মুসলমানরা যখনই বলবে "বাজনা বন্ধ কর" তৎক্ষণাৎ তার থেকেও তীক্ষ্ণ স্বরে "বাজনা বাজাও" বলার মত সাহসী হিন্দু যেন প্রত্যেক শোভাযাত্রায় থাকে। প্রত্যাশা মত স্বয়ংসেবকেরা এই শোভাযাত্রাগুলিতে অংশগ্রহণ করার ফলে ঐগুলি নির্বিঘ্নে যেতে শুরু করল। কিছু কাল পরে সঙ্ঘ যেমন-যেমন বাড়তে থাকল, সেইরকম মুসলমানদের হঠকারিতা কম হতে লাগল এবং তাদের সদ্বুদ্ধির বিকাশ হতে দেখা গেল। "ভয় বিন হোয় না প্রীতি" — গোস্বামী তুলসীদাসের এই উক্তি মানব-স্বভাবের গভীর অধ্যয়নেরই ফলশ্রুতি। তবে ঐ সময়ে এবং পরবর্তী দু-তিন বছর হিন্দু মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণই ছিল। ঐ সময়ে হরিতালিকার পর্বের সময়ে মুসলমানদের দ্বারা মহিলাদের বিরক্ত করার প্রয়াসের দরুন তুলসীবাগ, শুক্রবার-তালাও এবং ঐ দিকে যাতায়াতের সমস্ত প্রধান পথের স্থানে-স্থানে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা যোজনাপূর্বক দাঁড়িয়ে থাকত। এই জাগরূকতা সুফলদায়ক হল এবং মায়েরা কোন বাধা ছাড়াই ঐ পর্ব পালন করতে পারলেন। নিঃসন্দেহে তাঁরা সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের এবং ডাক্তারজীকে অত্যন্ত সন্তোষপূর্বক আশীর্বাদ দিয়ে থাকবেন। ডাক্তারজী তাঁর বৈঠকগুলিতে এ বিষয়ে এ কথাই বলতেন, "আজ যোজনাপূর্বক স্থানে-স্থানে স্বয়ংসেবকদের দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়। এটা তো লজ্জাজনক অবস্থা। এটার পরিবর্তন করে যদি সম্পূর্ণ সমাজ সজাগ হয়ে চব্বিশ ঘন্টাই নিজেদের ব্যবহার করতে থাকে, তাহলে মহিলাদের দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকাবারও দুঃসাহস কেউ করবেনা। আমাদের এই রকম অবস্থাই তৈরী করতে হবে।"

সঙ্ঘের প্রথম বার্ষিক উৎসব ডাক্তারজীর গৃহেই পালন করা হল। ঐ উৎসবে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে অনাথ বিদ্যার্থী গৃহের ছাত্ররাও উপস্থিত ছিল। শ্রী বাপুরাও আম্বর্ডেকর সভাপতির ভাষণ দিলেন। সব শেষে যে গান গাওয়া হল তার পংক্তিগুলি আজও কিছু স্বয়ংসেবকদের মনে আছে। ঐ পংক্তিগুলি ছিল এই প্রকার ঃ —

"পরমপাবনা ভগব্যা ঝেণ্ডয়া, কায় দশা তব হী।
জিথেঁ জন্মলা, জিথেঁ তলপলা, তিথেঁ ঠাঁব নাহীঁ।
সুনা রায়গঢ়, সুনে পুণ্যাপুর, সুনা মহারাষ্ট্র।
উদাসবাণে তুভ্যা বির্ণে রে। শ্মশান সর্বত্র।।"
(পরমপূত হে ভগবাধ্বজ। একি দশা হল তোর।
যেথায় জন্মে চমক জাগালি, ঠাঁই নাই সেথায় তোর।
শূন্য হল রায়গঢ়, পুনা ও মহারাষ্ট্র।
বিহনে তোমার সকলই উদাস, শ্মশান বুঝি সর্বত্র।।)

এই উৎসব বিকেল চারটের সময়ে সম্পন্ন হলে সব স্বয়ংসেবকেরা রাজা বাক্ষার প্রসিদ্ধ হনুমান মন্দিরে সীমোল্লঙ্ঘনের জন্য গেল। সে সময়ে বিজয়াদশমীর দিন সঙ্ঘের আলাদা শোভাযাত্রা বের করা হতনা, কারণ তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যা ও অনুশাসন উভয়েরই

অভাব ছিল। প্রথম বার্ষিকোৎসবের উল্লেখনীয় ঘটনা ছিল ডাক্তারজী কর্তৃক স্বয়ংসেবকদের জন্য একটি গ্রন্থালয়ের প্রতিষ্ঠা। খেলার জন্য মোহিতে প্রাসাদের প্রাঙ্গণের অনেকটা জায়গা পরিষ্কার করে নেওয়া হয়েছিল। ঐ স্থানের ভূগর্ভস্থ ঘরে বৈঠকের জন্য এবং অন্য সময়েও স্বয়ংসেবকদের যাতায়াত চলত। এখন সঞ্চলনের জন্য পর্যাপ্ত স্থান উদ্ধার হয়ে যাওয়ায় ডাক্তারজী শ্রীমার্তণ্ডরাও জোগকে প্রতি রবিবার সকালে সামরিক প্রশিক্ষণ দেবার জন্য আসতে বললেন। এটা ১৯২৬ সালের ডিসেম্বরের ঘটনা। শ্রী মার্তণ্ডরাও জোগ ঐ সময়ে কংগ্রেস দলেরও প্রধান ছিলেন। তথাপি একথা বলা অতিশয়োক্তি হবেনা যে ডাক্তারজীর সৌজন্যের কারণে লোকে তাদের টুপির রং ভুলে যেত। ডাক্তার হেডগেওয়ার এবং শ্রীমার্তণ্ডরাও জোগের বাড়ী নয়ী শুক্রবারীতে কাছাকাছি ছিল। শ্রী জোগ ১৯২০ সালে সৈন্যবাহিনী থেকে ফিরে এসেছিলেন। ডাক্তারজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হওয়ার পর ক্রমে তা ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। এমন কি পরিশেষে ডাক্তারজী তাঁকে পুরোপুরি আপনার করে নেন। ১৯৪৯ সালে শ্রী মার্তণ্ডরাও পরমপূজনীয় গুরুজীকে এক পত্র লেখেন, তার একটি বাক্য উল্লেখযোগ্য। তিনি লেখেন, "আমি আপনাদেরই। আমার জীবনকে সঙ্ঘই সার্থকভাবে ক্রিয়াশীল করেছে। পরম পূজনীয় ডাক্তারজী আমাকে প্রেম-প্রীতির সাথে নিজের কাজে স্থান দিয়েছিলেন।" ডাক্তারজীর ভালবাসা এমনই প্রভাবী ছিল।

মোহিতে সঙ্ঘস্থানে সঞ্চলনের কার্যক্রম আরম্ভ হবার পর ডাক্তারজী গণবেশের আগ্রহও প্রকাশ করতে শুরু করলেন। মাঝে-মাঝে রাস্তা দিয়েও স্বয়ংসেবকদের সঞ্চলন করিয়ে নিয়ে যেতেন। প্রথম সঞ্চলনে গণবেশধারী ত্রিশ জন স্বয়ংসেবককে অনুশাসনবদ্ধভাবে সিটির শব্দে তালে-তালে পা মিলিয়ে হাঁটতে দেখে জনসাধারণের অত্যন্ত আশ্চর্য লাগল এবং বেশ কয়েকজন বালক ও কিশোর স্বয়ংসেবকদের পিছনে-পিছনে তাদেরই মত পা মিলিয়ে চলার অনুকরণ করে তেলঙখেড়ী পর্যন্ত হেঁটে গেল। এই প্রথম সঞ্চলনের পরিণাম শাখার সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ করা গেল — এতে কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নেই। বাস্তবিক নাগরিক জীবনে অনুশাসনবদ্ধ তরুণদের এই দৃশ্য অভিনব ছিল। সামরিক শিক্ষণে ডাক্তারজীর বিশেষ রুচি ছিল এবং পরাধীন রাষ্ট্রে এইরূপ শিক্ষা শুরু করার অনুকূলতা লাভ করা বাস্তবিকই আনন্দ ও উৎসাহের বিষয় ছিল। স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর ১৯০৫-৬-এর পরিস্থিতির বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "অভিনব ভারত" আরম্ভ করার সময়ে "দশ জন স্বাধীনতা-সৈনিকদের একটি ক্ষুদ্র দলেরও প্রকাশ্যে সঞ্চলন করা সম্ভব ছিলনা।" কিন্তু এখন দেশভক্তদের কুড়ি বছরব্যাপী প্রয়াসের ফলে অনেক মানুষ এই প্রকার সঞ্চলনের সুযোগ লাভ করেছে। এটা রাষ্ট্রের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল। এটা দেখে ডাক্তারজীর আনন্দ হত এবং সেই আনন্দ তাঁর বৈঠকগুলিতে প্রকাশও পেত।

গোয়ালিয়রের জনৈক সৈনিক অধিকারী শ্রীউপাসনী ছুটিতে নাগপুরে এলে ডাক্তারজী সামরিক শিক্ষায় স্বয়ংসেবকদের নিপুণ করে তোলার উদ্দেশ্যে কয়েক জন স্বয়ংসেবককে তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাঠাতেন। শ্রী উপাসনী দেশলাই-এর কাঠি সাজিয়ে নিজের ঘরের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণরাও লাম্বে প্রমুখ তরুণদের বিবিধ পথক-রচনা ও ব্যূহরচনার শিক্ষা দেন। প্রথম

দিকে এইটুকু শিক্ষণই শাখার পক্ষে অত্যন্ত লাভপ্রদ হল। এইভাবে বিন্দু-বিন্দু দিয়ে সংগঠন গড়ে উঠতে থাকল।

সামরিক শিক্ষায় রুচি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ব্যক্তি নিজেই ঘোষবাদ্যের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদেরও মনে হল যে আমাদের কাছে অন্ততঃ একটা বিউগুল তো অবশ্যই থাকা উচিত, এবং তার জন্য ছাত্র স্বয়ংসেবকরা একটা করে পয়সা বাঁচিয়ে অর্থ সঞ্চয় শুরু করে দিলেন। সেই সময়ে নাগপুরে গোকুলাষ্টমীর দিন শ্রীমন্ত বুটীর বর্ডী স্থিত নিবাস স্থানে সাত দিন ধরে মুক্তদ্বার ব্রাহ্মণ ভোজ হত। মহাল থেকে সঙ্ঘের কয়েকজন তরুণ স্বয়ংসেবক সেই ব্রাহ্মণভোজে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এই কাজে চার মাইল পথ হেঁটে যাতায়াত এবং তিন ঘন্টা সময় খরচ করতে হত। কিন্তু এইসব কিছু সহ্য করতে তাঁরা সানন্দে প্রস্তুত ছিলেন, কারণ তাঁদের সামনে সেখানে যে দক্ষিণা পাওয়া যাবে সেই প্রলোভন ছিল। সেই অর্থে সঙ্ঘের অর্থ-সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে এবং তা দিয়ে একটি বিউগুল কেনা সম্ভব হবে। এই কার্যক্রমে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রী বাবাসাহেব আপটে, শ্রী দাদারাও পরমার্থ, শ্রী বালাসাহেব দেওরস, শ্রীকৃষ্ণরাও মোহরীর প্রমুখ সকলেই। সঙ্ঘ তথা সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা উভয়েরই জন্ম হয়েছিল চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। যাই হোক, সঙ্ঘের প্রথম বিউগুল কেনা হল এবং প্রথম বার যখন স্বয়ংসেবকেরা সেই বিউগুল বাজালেন তখন তাঁদের আনন্দের সীমা ছিলনা। তার চতুর্দিকে গুঞ্জরিত ধ্বনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় এবং সঙ্ঘকার্যের প্রগতির ঘোষণা করে যেন রাষ্ট্রের পুরুষার্থকেই প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দিচ্ছিল।

ডাক্তারজী চেয়েছিলেন হিন্দু সমাজে বীরব্রতধারী তরুণরা উঠে দাঁড়াক। অতএব, সঞ্চলনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানে-স্থানে শাখাগুলিতে একটি ক্ষুদ্রাকার অশ্বারোহী বাহিনীও তৈরী করার পরিকল্পনা করা হল। এই বিষয়টি উত্থাপিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে কলকাতার চৌরঙ্গীতে 'আউটরামের' অশ্বারূঢ় প্রস্তর-মূর্তিটি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠত। তিনি ঐ বীরোদ্দীপ্ত ভঙ্গীর খুব প্রশংসা করতেন। কোন শাখার কাছে গুরুদক্ষিণার অর্থ অকারণ পড়ে থাকা তাঁর ভাল লাগতনা। তিনি বলতেন যে ঐ অর্থের প্রয়োজনীয় গুণের বিকাশ এবং কার্যবৃদ্ধির জন্য সদ্ব্যবহার করা উচিত। যেখানেই অর্থ বেঁচেছে বলে তিনি সংবাদ পেতেন, সেখানেই ঘোড়া কেনার কথা বলতেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কোথাও ঘোড়া কেনা হয়েছে এই সংবাদ পাবার পর তাঁর আনন্দের সীমা থাকতনা।

একবার রামটেক থেকে মোটরগাড়ী করে আসার সময়ে কামঠীর নিকট এক ময়দানে অশ্বারোহী সৈন্যদের প্যারেড করতে দেখা গেল। এই দৃশ্য দেখে ডাক্তারজী তাঁর পাশে উপবিষ্ট শ্রীবিঠ্ঠলরাও পাতকীকে অন্য যাত্রীদের নজর এড়িয়ে ইশারায় ঐ দৃশ্য দেখালেন, এবং সঙ্ঘের মধ্যেও এই রকম হলে ভালো হয় — এই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

সে সময়ে ডাক্তারজীর বাড়ীর অবস্থা ভাল ছিলনা। দাদার পুরোহিতের কাজে যা সামান্য রোজগার হত, তাই দিয়ে যেমন-তেমন করে সংসারের নির্বাহ হত। ডাক্তারজী নিচের তলার পূর্বদিকের অংশ ভাড়া দিয়ে আয়-ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করলেন বটে,

কিন্তু তাঁর কাছে ভোর থেকে শুরু করে রাত এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত লোকজনের অখণ্ড আসা-যাওয়া চলতে থাকত, এবং অনেককে চা দিয়ে অতিথি-আপ্যায়ন অব্যাহত থাকত। সুতরাং অভাব দূর হবার কোন উপায় ছিলনা। ডাক্তারজীর বন্ধুরা তাঁর অর্থাভাবের দরুন উৎপন্ন অসুবিধা দেখতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু ডাক্তারজীর দান বা অনুগ্রহ গ্রহণ না করার মনোভাব এমনই কঠোর ছিল যে তাঁকে সাহায্য করার কথা বলার কারো সাহস হত না। আমার জন্য অন্য কেউ কষ্ট করুক তা তিনি একবারেই চাইতেন না, বরং নিজের ভাগ্যে যে দুঃখ বরাদ্দ আছে, নিজেই তা চুপচাপ বহন করব — এই ছিল তাঁর মনোভাব। এমনকি সেই দুঃখের আভাস মাত্র প্রকাশ যেন না হয়ে পড়ে, যা শুনে আশে-পাশের মানুষদের হৃদয় সংকোচ বোধ করতে পারে — এদিকে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন।

সমাজের জন্য ডাক্তারজী কত নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছিলেন, তা রাজা লক্ষ্মণরাও ভোঁসলে প্রত্যক্ষ করছিলেন। ডাক্তারজীর সম্পূর্ণ সময় সামাজিক কাজে ব্যয় হত, সেই কারণে ব্যক্তিগত জীবনে আর্থিক দৃষ্টিতে অত্যধিক কষ্ট ভোগ করতে হত, সেকথাও তিনি জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু বন্ধু হিসাবে তাঁকে আর্থিক সাহায্য করার প্রস্তাব তাঁর সামনে রাখতে রাজা লক্ষ্মণরাও ভোঁসলেরও সংকোচ বোধ হত। তিনি তাঁর ম্যানেজার শ্রী বাসুদেব শাস্ত্রী সংগমকরের মাধ্যমে কয়েকবার ডাক্তারজীকে জানান যে রাজা সাহেব তাঁকে কিছু জমি দিতে চান। কিন্তু যখনই কথাটি উত্থাপিত হত, তখনই প্রসঙ্গটিকে চাপা দেবার জন্য ডাক্তারজী অন্য কথা উত্থাপন করতেন। একবার শ্রী সংগমকর বিষয়টি নিয়ে ডাক্তারজীকে আগ্রহ সহকারে তাঁর সম্মতি দেবার অনুরোধ করেন। এ কথা শুনে ডাক্তারজী একটু বিরক্ত হয়ে বলেন, "এই কথা যদি আবার কখনো তোলেন তাহলে আমি এখানে আসাই বন্ধ করে দেব। আমার সম্পত্তি তো সঙ্ঘই।" এই ঘটনার পর শ্রী সংগমকর বিষয়টি আর তোলেন নি এবং রাজা লক্ষ্মণরাওকে সব কথা জানিয়ে দেন।

সিন্দীর শ্রী নানাসাহেব টালাটুলে ডাক্তারজীর বিপ্লবী জীবনের সময় থেকেই তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু তথা অনুগামী ছিলেন। তাঁর ডাক্তারজীর উপর অসীম শ্রদ্ধা ছিল। ১৯২২-২৩ থেকে উনি নিয়মই তৈরী করে নিয়েছিলেন যে বছরে একবার বা দুবার ডাক্তারজী বিশ্রামের জন্য তাঁর গৃহে যেন আসেন। যদি কখনো ডাক্তারজী সিন্দী যাবার ব্যাপারে "আজ নয়, পরে যাব" বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন, তখন টালাটুলে নাগপুরে তাঁর বাড়ীতে এসে ধরণা দিয়ে বসে পড়তেন। ডাক্তারজী বিশ্রামের জন্য সিন্দীতে গেলে ওয়ার্ধা থেকে আপ্পাজী যোশীও সেখানে চলে আসতেন। ১৯২৬ সালে একবার তিনজনে বসে গল্প করছিলেন, তখন নানাসাহেব ও আপ্পাজী কথায়-কথায় ডাক্তারজীকে বললেন, "সর্বক্ষণ সর্বজনীন কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন বাড়ীর দিকে মনোযোগ দেবার আপনার সময় থাকেনা। এই কারণে আর্থিক চিন্তা সব সময়ে আপনার পিছনে ছায়ার মত লেগে থাকে। এর একটা সুরাহা হওয়া দরকার।" কিন্তু ডাক্তারজী ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিলেন না। তা সত্ত্বেও অন্য দুজন বিষয়টাকে থামিয়ে না দিয়ে কথা বলতে থাকেন। তখন ডাক্তারজী বললেন, "আমার প্রয়োজন হলে আমি চেয়ে নেব। যার কাছ থেকে টাকা-পয়সা বা কোন বস্তু গ্রহণ করলে সে উপকার করছে বলে মনে

করেনা এবং চাপও পড়েনা, তার জিনিষ ও অর্থ আমি গ্রহণ করি। কিন্তু এখন তো কোন প্রয়োজন নেই।" বন্ধুত্বকে নষ্ট হতে দেবনা এবং যাচনাও করবনা। এই নীতি অনুসরণ করে ডাক্তারজী এ রকম উত্তর দিলেন।

ডাক্তারজীর উপরিউক্ত বক্তব্যকে ভিত্তি করে শ্রী নানাসাহেব টালাটুলে আর্বীর শ্রী নারায়ণরাও দেশপাণ্ডে এবং শ্রী আপ্পাজী যোশী ডাক্তারজীর বৌদির কাছে প্রতি মাসে চুপচাপ পঞ্চাশ টাকা দিতে শুরু করে দিলেন। এর ফলে বাড়ীর দুরবস্থা কিছুটা সুধরেছে অনুভব করে ডাক্তারজীর মনে সংশয় দেখা দিল। তিনি কৌশলে বৌদির কাছ থেকে আসল ব্যাপারটা জেনে নিলেন। পরে ঐ তিনজনের সঙ্গে দেখা হলে তিনি তাঁদের বললেন, "আপনারা আমার কথার বেশ ভালো মানে করেছেন। আমার সত্যিই যখন দরকার হবে তখন আমি অসংকোচে চেয়ে নেব। এর পর আর ওরকম করবেন না।" বন্ধুদের এই চালও দু-তিন মাসের মধ্যেই ভেস্তে গেল। ডাক্তারজী যদিও বলেছিলেন যে প্রয়োজন নেই, কিন্তু তাঁর অবস্থা যাঁরা নিকট থেকে দেখতেন তাঁরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়ে থাকতে পারতেন না। কখনো তাঁর কাছে কাপড় কেনার পয়সা থাকতনা, নয় তো কখনো মূল্যবৃদ্ধির দরুন শুধু ভাত-ডাল খেয়েই অর্ধভুক্ত থাকতে হত। এই অবস্থাতেও তাঁর নিকট আগত অতিথিদের তিনি আগ্রহপূর্বক নিজের সঙ্গে ভোজনের জন্য বসিয়ে নিতেন এবং বাসি 'ভাক্‌রি' ও তেল-লঙ্কার চাট্‌নির স্বাদ বন্ধুরাও পেয়ে যেতেন। ডাক্তারজী কখনো থালায় কী পরিবেশন করা হচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য দিতেন না। ভোজন করার সময়ে তিনি বন্ধুদের সঙ্গে দেশ তথা সঙ্ঘ সম্বন্ধে কথা-বার্তায় এমনই মশগুল হয়ে যেতেন এবং অন্যদেরও হাস্য-পরিহাসে এমনই মাতিয়ে রাখতেন যে 'হ্যাঁ-হুঁ' করে খেতে-খেতে কারুর মনোযোগ ডাক্তারজীর দারিদ্রের দিকে আকৃষ্ট হতনা।

এই সময়ে ডাক্তারজীর কয়েকজন বন্ধু মিলে 'আইডিয়াল ডেমোক্রেটিক ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী' আরম্ভ করলেন এবং তার চিকিৎসা বিভাগের প্রধান হিসাবে ডাক্তারজীকে নিযুক্ত করলেন। বিচারপতি ভবানীশঙ্কর নিয়োগী, ডাঃ পরাঞ্জপে, শ্রী গোপালরাও দেব এবং শ্রী নানাসাহেব তেলঙ্গ প্রমুখ সজ্জনদের মনে ডাক্তারজীর জন্য প্রেম ছিল, সেটাই এই যোজনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই নিযুক্তির ফলে ডাক্তারজীর বছরে চার-পাঁচ শো টাকার উপার্জন হত। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৫-৩৬ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ ছিল, যার ফলে ডাক্তারজীর হাত-খরচের অভাব কিছুটা দূর হয়েছিল। এই বীমা-সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত শ্রী রাঃ জঃ গোখলে এ বিষয়ে লিখেছিলেন যে "এতে ডাক্তারজীর কী লাভ হয়েছিল, তা তিনিই জানেন। কিন্তু তাঁর নাম সংস্থার পরিচালকদের নিকট যথেষ্ট লাভজনক হওয়া সম্ভব ছিল, সন্দেহ নেই।"

সঙ্ঘ কার্য বিস্তারের প্রচেষ্টার কিছু দিন পরেই ওয়ার্ধা জেলার আর্বী নামক স্থানে বাদ্যসহ শোভাযাত্রার ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বেশ সংঘাত ঘটে গেল। এই দ্বন্দ্বে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রকাশ এমনই প্রভাবকারী ছিল যে মুসলমানদের সব নেশা ছুটে গেল। এই দাঙ্গার পূর্বে যখনই সেখানকার পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠত, তখনই ডাঃ মুঞ্জে ও ডাঃ হেডগেওয়ার সেখানে গিয়ে একদিকে সমঝোতার কথা-বার্তা চালান, অপর দিকে হিন্দুদের

সজাগ ও সতর্ক রাখার ব্যবস্থা করেন। হিন্দুরা যাতে নিজেরাই আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়ে ওঠে তার জন্য ডাক্তারজী তাঁর সহকারী শ্রী আপ্পা সোহোনীকে হিন্দুদের লাঠি চালানোর শিক্ষা দেবার জন্য সেখানে কিছু দিনের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর প্রশিক্ষণের প্রত্যক্ষ প্রতাপ উক্ত সংঘাতের সময় দেখতে পাওয়া গেল।

আর্বীর ঐ ঘটনা সম্পর্কে নাগপুরের ডাঃ এন বি খারে লেখেন যে "১৯২৬ সালে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িকতার কারণে ব্রিটিশ সরকার আর্বীতে দশহরা উৎসবের উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করে। অতএব, ঐ উৎসব বিজয়া দশমীর এক মাস পরে অনুষ্ঠিত হল। এই উৎসবের জন্য আর্বীর উদ্যোক্তারা নাগপুরের নেতাদের আমন্ত্রিত করেন। আমরা চার জন, ডাঃ মুঞ্জে, ব্যারিস্টার গোবিন্দরাও দেশমুখ, ডাঃ হেডগেওয়ার এবং আমি মোটর গাড়ীতে গেলাম। আর্বীতে আমরা চারজনই বক্তৃতা দিলাম। ডাক্তার হেডগেওয়ার ও আমার বক্তৃতা খুব জোরালো হয়েছিল। সভা শেষ করে আমরা নাগপুরে ফিরেই সংবাদ পেলাম যে আর্বীতে দাঙ্গা হয়েছে এবং চার জন মুসলমানের মৃত্যু-হয়েছে। ওয়ার্ধা জেলার ডেপুটি কমিশনার এবং মুসলমান ডি এস পি আমার ও ডাঃ হেডগেওয়ারের বিরুদ্ধে মামলা চালাবার সুপারিশ করেন। কিন্তু সেই সময়ে নাগপুর বিভাগের কমিশনার স্টন্ডন সেই সুপারিশ অগ্রাহ্য করেন।"

এই ঘটনার পরে চৌদ্দ জন হিন্দু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ডাক্তারজীর পরিচিত। তাঁদের মধ্যে ডাঃ স নী মোহরীর তো ডাক্তারজীর কলকাতা অবস্থান কাল থেকেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। অতএব, মামলা শুরু হবার পর ডাক্তারজীকে হামেশাই ওয়ার্ধা ও আর্বী যাতায়াত করতে হত। আর্বীর মামলার খরচের জন্য অর্থ-সংগ্রহের ব্যাপারেও তিনি অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং ওয়ার্ধার মামলায় সওয়াল করার জন্য ব্যাঃ ব্যাপ্টিস্টা আসার পরে তিনি স্বয়ং দেড় মাস সেখানে গিয়ে থাকেন। সেই সময়ে তিনি শ্রী বি বি দেশপাণ্ডের গৃহে থাকতেন। তাঁর উল্লেখ ডাক্তারজী 'বিনতি বিশেষ' বলে পরিহাস-ছলে করতেন। ব্যাঃ ব্যাপ্টিস্টা শ্রীদাদাসাহেব করন্দীকর এবং এলাহাবাদের শ্রী অলস্টার প্রমুখ নামী আইনজ্ঞদের প্রচুর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ডাঃ মোহরীর মুক্তি পেলেন না। এমন কি ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯২৬ তারিখে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ শুনিয়ে দেওয়া হয়। ঐ মামলার অন্য যাঁরা মুক্তিলাভ করলেন, আর্বীতে তাঁদের নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা বের করা হল ডাক্তারজীর নির্দেশ অনুসারে। এর কিছু দিন পরেই ডাক্তারজী এবং ডাঃ নারায়ণরাও সাভারকর আর্বী গেলেন এবং কারাগারে বন্দী নেতাদের পরিবারবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন। যাঁরা মুক্তিলাভ করেছিলেন তাঁদের অভিনন্দন জানাতেও তাঁরা ভোলেননি।

ডাঃ মোহরীরের শাস্তি হওয়ায় ডাক্তারজী অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। ১৯৩৪ সালে ডাঃ মোহরীরের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করার সময় পর্যন্ত জেলে গিয়ে ডাক্তারজী নিয়মিত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।

উক্ত মামলার সময়ে ডাক্তারজীকে অনবরত ওয়ার্ধা যেতে হত। সেই সময়ে তিনি শ্রী আপ্পাজী যোশীকে সঙ্ঘের বিষয়ে জানালেন এবং সেখানে শাখা শুরু করতে বলেন।

কংগ্রেসের কাজে আপ্পাজী নাগপুরে এলে ডাক্তারজীর বাড়ীতেই থাকতেন। একবার আপ্পাজী নাগপুরে এলে একটি ঘরে সঙ্ঘের বৈঠক চলছিল, ডাক্তারজী তাঁকে সেই বৈঠকে নিয়ে গেলেন। সেখানে গৈরিক পতাকা ও বীর হনুমানের মূর্তি রাখা হয়েছিল। তাঁর মনে আছে, সেদিন ডাক্তারজী ঐ বৈঠকে বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। শেষে প্রার্থনা হল। এর পর ডাক্তারজী ১৯২৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী যখন ওয়ার্ধা গেলেন, তখন সেখানেও সঙ্ঘের শাখা শুরু হয়ে গেল। নাগপুরের বাইরে সঙ্ঘ সর্বপ্রথম ওয়ার্ধায় পৌঁছল। সঙ্ঘের কেন্দ্র ছিল নাগপুরে এবং সঙ্ঘ বৃক্ষের প্রথম শাখা হল ওয়ার্ধায়। তখন থেকেই সম্ভবতঃ সঙ্ঘের কার্যক্রমকে শাখার কার্যক্রম বলা শুরু হল।

সঙ্ঘের কল্পনা থেকে শুরু করে সঙ্ঘশাখা রূপে তাকে বাস্তব স্বরূপ দেওয়া পর্যন্ত সব কাজ ডাক্তারজী নিজেই করলেন। কিন্তু তাঁর স্বভাব এমনই ছিল যে সেখানে 'আমি' মনোভাবের প্রকাশ কখনো দেখা যেত না। "আমরা সঙ্ঘ শুরু করছি" অথবা "আমাদের দ্বারা শুরু করা সঙ্ঘ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ দ্বারা তিনি সকলকে অন্তর্ভুক্ত করেই কাজের উল্লেখ করতেন। কিন্তু কাজের প্রয়োজনের দৃষ্টিতে কোন না কোন বিধান ও পদাধিকারীর শ্রেণী নির্মাণ করা অপরিহার্য হয়ে থাকে। অতএব, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৬-এর বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ডাক্তারজীকে প্রধানরূপে নির্বাচিত করা হল। সেই সময়কার প্রতিবেদন পুস্তিকায় লেখা হয় যে "রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে নিয়মপূর্বক সুচারুভাবে এবং অনুশাসনপূর্ণ রীতিতে পরিচালনা করার জন্য একজন অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তির থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। এ রকম হলে সংগঠনে বিশৃঙ্খলার আশংকা হ্রাস করা সম্ভব হয়। অতএব, আজকের সভার মতানুসারে একজন অধিকার-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা আবশ্যক এবং সেই দায়িত্বের কাজে আমরা সর্বসম্মতিক্রমে ডাক্তার হেডগেওয়ারকে নিযুক্ত করছি।"

এইভাবে দেড় বছর ব্যাপী অবিরাম প্রয়াসের পর নাগপুর ও ওয়ার্ধাতে সঙ্ঘের কাজ চলতে শুরু করল এবং হিন্দুস্থানের শত-শত বৎসরের ইতিহাসে যে সমষ্টি জীবনের অভাব দারুণভাবে অনুভূত হচ্ছিল, সেই অভাব দূরীভূত করার তন্ত্র সিদ্ধ হল। মোহিতে প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ-এর মধ্য থেকে রাষ্ট্র পুনর্নির্মাণের প্রয়াসের শুভ-সূচনা হল। ধ্বংসের মধ্যেও সৃষ্টির সামর্থ্য উৎপাদনকারী রাষ্ট্রের চৈতন্য জাগ্রত হয়েছিল। প্রাসাদের পাশের রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী লোকেরা এখন প্রতিদিন সায়ংকালে যজ্ঞের জাজ্জ্বল্যমান্ অগ্নি শিখাকে স্মরণ করিয়ে দেবার মত পরম পবিত্র ভগোয়া ধ্বজ উড্ডীন দেখতে পেত এবং 'নমো ধর্মভূমি জিয়ে চ্যাচ কামী'। পডো দেহ মাঝা সদা তী নমী মী' এই প্রার্থনার গম্ভীর স্বর কানের মধ্যে গুঞ্জরিত হত।

১৪. নাগপুরের দাঙ্গা

মোহিতে প্রাসাদে যে সঙ্ঘ শুরু হয়েছিল ১৯২৭ সালের প্রারম্ভে তার বিস্তার প্রত্যক্ষ করা গেল। সেখানে এখন বয়স অনুসারে শিশু, বালক, তরুণ ও প্রৌঢ় স্বয়ংসেবকদের পৃথক-পৃথক দল তৈরী হল এবং তাদের লব, চিলয়া, কুশ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অভিমন্যু, ভীম ও ভীষ্ম নাম উত্তরোত্তর বর্ধমান ক্রমানুসারে দেওয়া হল। 'ভীষ্ম' নামক দলে সঙ্ঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রৌঢ়, 'ভীম' দলে বড় তরুণ, 'কুশ', 'ধ্রুব' ও 'প্রহ্লাদ' দলে তরুণ, কিশোর ও বালক এবং 'লব' ও 'চিলয়া' দলে দশ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের শ্রেণী বিভাগ করা হল। এখন সঙ্ঘস্থানের কার্যক্রমগুলি নিশ্চিত স্বরূপ লাভ করেছিল এবং তরুণদের কার্যক্রমে আত্মরক্ষার ক্ষমতা উৎপন্ন করার দৃষ্টিতে যুদ্ধযোগ ও দ্বন্দ্বের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। সত্তর-আশি জন তরুণদের একসাথে লাঠির কার্যক্রমের বাতাবরণ এমন উৎসাহপূর্ণ দেখাত যে দর্শকদের মনেও বীরত্বের ভাবনা জেগে ওঠা অবধারিত ছিল। শ্রী সোহোনী বলতেন যে 'প্রহার'-এ এমন উদ্দীপনা ও বেগ থাকা উচিত যে সম্মুখে দণ্ডায়মান শত্রু মার খেয়েই যেন ভূলুণ্ঠিত হয়। তিনি স্বয়ং যখন 'প্রহার' মারতেন তখন সেই সামর্থ্য প্রত্যক্ষ করা যেত।

পরম পূজনীয় ডাক্তারজীর ঘর স্বয়ংসেবকদের আগমনে সব সময়ে পূর্ণ থাকত। ঐ দিনগুলিতে নতুন-নতুন বন্ধুদের ডাক্তারজীর কাছে নিয়ে এসে তাদের সঙ্ঘে ভর্তি করানোর জন্য বালক ও তরুণদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত। বাড়ীতে ও বিদ্যালয়ে চতুর্দিকে ছাত্রদের মধ্যে সঙ্ঘেরই আলোচনা চলত। ডাক্তারজীর বাড়ীর বৈঠকে হিন্দু সংগঠনের আবশ্যকতা, ভগোয়াধ্বজের মহত্ত্ব, স্বাধীনতা, অন্য সমাজগুলির আক্রমণ এবং তার কারণ-মীমাংসা, দৈনিক একত্রিত হওয়া এবং কার্যক্রমগুলির গুরুত্ব, অনুশাসন ইত্যাদি অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা চলত। অপেক্ষাকৃত পুরাতন স্বয়ংসেবকদের হিন্দু সংগঠনের দিক থেকে উপযুক্ত পুস্তকও পাঠ করার জন্য দেওয়া হত। এইসব পুস্তকের মধ্যে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত পুস্তকগুলিও সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করার সুযোগ পাওয়া যেত। 'হিন্দুত্ব' ও 'খতরে কী ঘণ্টী' (বিপদের ঘণ্টা) এই দুইটি বাজেয়াপ্ত পুস্তকের প্রচার স্বয়ংসেবকদের চেষ্টায় সর্বসাধারণ জনতার মধ্যেও শুরু হয়ে গিয়েছিল।

হিন্দু-মুসলমানদের বাস্তবিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ দেশেই পরিষ্কার হয়ে উঠছিল। মোপলা বিদ্রোহ থেকে শিক্ষা নিয়ে যে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হিন্দু সংগঠনের মন্ত্র জন-গণের মধ্যে উজ্জীবিত করে দিয়েছিলেন, ২৩ শে ডিসেম্বর তাঁকে অমানুষিকভাবে হত্যা করা হল। হিন্দু হয়েও যাঁরা নিজেদের 'ইণ্ডিয়ান' বলে পরিচয় দিতেন, সেই নেতারা পর্যন্ত হতবাক্ হয়ে গেলেন। কিন্তু মুসলমানরা হত্যাকারী আব্দুল রশীদকে 'গাজী' বলে সম্বোধন করতে শুরু করে দিল। তার ছবি সংবাদপত্রে মুদ্রিত করে দিল্লীতে প্রকাশ্যে বিক্রী এবং দেওয়ালে সেঁটে দেওয়া শুরু হল।

অসহিষ্ণুতার পাঠ যারা মায়ের দুধের সঙ্গেই পান করত সেই মুসলমান সমাজের পক্ষে এই সব কুকীর্তি স্বাভাবিকই ছিল। ইংরাজ লেখক জর্জ বার্নর্ড শ' মুসলমানদের মনোভাবের বর্ণনা করে এক স্থানে লিখেছিলেন, "সহিষ্ণুতার মূর্খতা মুসলমানদের মধ্যে নেই। হয় আপনি তার আল্লাকে স্বীকার করে নিন, নয়তো সে আপনার গলা কেটে ফেলবে এবং তার ফলে আপনাকে 'দোজখ' (নরক) যেতে হবে এবং সে 'বেহেস্ত' (স্বর্গ) লাভ করবে।" এই হল ইসলামের ন্যায়!

হিন্দুস্থানের নানা স্থানে মুসলমানদের আক্রমণ চলতে থাকায় হিন্দু-মুসলিম একতার যাঁরা বুলি কপ্‌চাতেন সেই নেতারা বড় অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। এইসব ঘটনার পূর্বে মহাত্মা গান্ধীও রাজনৈতিক পদ্ধতিতে স্বীকার করেছিলেন যে তোষণ-নীতি তথা হৃদয় পরিবর্তনের পথ ব্যর্থ হয়েছে। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' তে লেখা 'আমি যদি সম্রাট হই' প্রবন্ধে তাঁর এই অসহায় অবস্থা প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধে লেখেন যে আমি উভয় জাতির ওজনদার নেতাদের ডাকব এবং তাঁদের সব অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাঁদের একটি কুঠুরিতে বন্ধ করে দেব এবং তাঁদের বলব — 'আপনারা নিজেদের বিবাদের কীভাবে মীমাংসা করবেন তা ঠিক করে নিন, তখনই আমি আপনাদের ছাড়ব, তা না হলে ছাড়ব না। এইভাবে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।' অর্থাৎ হিন্দু মুসলমানদের নেতাদের অন্ন-জল বন্ধ করে কুঠুরীর মধ্যে আট্‌কে রেখে তাঁদের উপর চাপ দিয়ে তাঁদের শিক্ষা দেওয়া অথবা মরতে দেওয়ার উদ্ভট কল্পনা 'সম্রাট' গান্ধীর মনে উদয় হয়েছিল। অবস্থার এতই অবনতি হয়েছিল যে গোঁড়া 'অহিংসাবাদী'র মনেও এইরকম 'হিংস্র' চিন্তার উদয় হয়েছিল।

সে সময়ে কেউ যদি বলে ফেলত যে "অমুক স্থানে হিন্দু মুসলমানদের দাঙ্গা হয়েছে", তাহলে ডাক্তারজী তৎক্ষণাৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলতেন — "মুসলমানদের দাঙ্গা" কথাটাই সঠিক এবং এই উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ কর। কারণ যে হিন্দুরা আজ নিজেদের রক্ষা পর্যন্ত করতে পারে না, সে বেচারারা দাঙ্গা করবে কোথা থেকে? আজ তো কেবল মুসলমানরা হিন্দুদের মারছে। এটা পরিষ্কার দেখেও একে 'হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা' কেমন করে বলা যাবে?"

বিগত তিন-চার বছরের ঘটনায় নাগপুরের বাতাবরণও এইরূপ দূষিত হয়ে পড়েছিল। ১৯২৪ থেকে মুসলমানদের আর্থিক বয়কটের ফলে তাদের ক্রোধ আরো বেড়ে গিয়েছিল। তাদের দুরাগ্রহের তোয়াক্কা না করে সতরঞ্জীপুরা, হংসাপুরী ও জুম্মা মসজিদগুলির সামনে দিয়ে হিন্দুদের শোভাযাত্রা বাদ্যসহকারে বের করা অব্যাহত ছিল। এই সব ব্যাপারগুলি থেকে-থেকেই তাদের মনকে তীব্র দংশন করত। সেই কারণে তারা নানাভাবে হিন্দুদের যন্ত্রণা দিতে শুরু করল। কোন হিন্দুকে একলা বা দুজনকে বাগে পেলেই ধরে নিয়ে প্রচণ্ড মারধোর করত। হিন্দু মহল্লা থেকে মেয়েদের তুলে নিয়ে যেত। এই ধরনের ঘটনার সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়তে থাকল। কিন্তু আর এইসব বাড়াবাড়ি সহ্য করা সম্ভব হচ্ছিল না। ডাক্তার হেডগেওয়ার, গোবিন্দরাও চোলকর, রামচন্দ্র কোষ্টী, ভাউজী কাবরে, আপ্পা সোহোনী, বালাজী সখদেও এবং কৃষ্ণজী যোশী — এই সাতজন লম্বা-চওড়া ভীমকায় সপ্তর্ষি হাতে ডাণ্ডা নিয়ে মুসলমানদের মহল্লায় ঘুরতে শুরু করলেন। খদ্দরের পুরুষ্টু উঁচু কালো টুপি, সাদা কামিজ,

খাকি কোট, মালকোঁচা মারা ধুতি, আর হাতে মোটা লাঠি — এই বেশে যখন সাতজন এক সঙ্গে টহল দিতেন তখন গুণ্ডাদের হৃদ্‌কম্প শুরু হয়ে যেত। একাধবার শুধু তাঁদের যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভালদারপুরার মুসলমানরা ভাগিয়ে আনা একটি হিন্দু মেয়েকে ফিরিয়ে দিল। স্বয়ংসেবকরাও দলে-দলে ভাগ হয়ে এদিক-ওদিক টহল দিতে শুরু করল এবং কোথাও গুণ্ডামি হতে দেখলেই শঠে-শাঠ্যং নীতি গ্রহণ করতে লাগল। ডাক্তারজীর বাড়ীর উপর বেশ কয়েকদিন ইঁট-পাথর পড়তে লাগল, কখনো বা জ্বলন্ত মশালও বাড়ীর চালের উপর নিক্ষেপ করা হতে লাগল। স্বভাবতঃই স্বয়ংসেবকেরা ডাণ্ডা ও সিটি (বাঁশি) নিয়ে ডাক্তারজীর বাড়ীর চতুর্দিকে পাহারা দিতে শুরু করে দিল।

এত সব গণ্ডগোলের মাঝেও ডাক্তারজী শহীদ স্বামী শ্রদ্ধানন্দের স্মৃতিতে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'শ্রদ্ধানন্দের' জন্য শত-শত টাকা সংগ্রহ করে পাঠালেন এবং এই ব্যবস্থাও করলেন যে হিন্দু সংগঠন তথা হিন্দুদের পৌরুষের উপর বিশ্বাস দৃঢ়তর করে তোলার সংখ্যাগুলির যেন অধিকাধিক প্রচার হয়। ঐ সময়ে স্বামীজীর নামে "শ্রদ্ধানন্দ অনাথালয়" প্রতিষ্ঠাতেও তাঁর বিরাট অবদান ছিল এবং তাঁর দৈনন্দিনী থেকে জানা যায় যে ঐ সংস্থার প্রাথমিক বৈঠকগুলিতেও তিনি যেতেন।

সঙ্ঘের প্রথম দিকে যা খরচের প্রয়োজন হত তা ডাক্তারজী এবং তাঁর তদানীন্তন কংগ্রেসী বন্ধুদের আর সঙ্ঘের সহকারীদের চাঁদার মাধ্যমে পূরণ করা হত। বিভিন্ন কারণে ডাক্তারজীকে অর্থ সংগ্রহের জন্য অনেকের কাছে যেতে হত। তাঁর নিঃস্বার্থ বৃত্তি, সৌজন্য, নির্মল চরিত্র, হৃদয়ের নিষ্ঠা ইত্যাদি দেখে কেউ তাঁকে খালি হাতে ফেরাত না। অর্থ ও শক্তির দ্বারা আত্মীয়রা যতখানি প্রভাবিত হয়, তার থেকে নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ চরিত্রের প্রভাব অনেক বেশী হয়।

আপ্পা সোহোনীর স্বভাব এমন ছিল যে সংঘর্ষের কথা উঠলেই তাঁর মন লাফাতে শুরু করে দিত। সঙ্ঘে ছোট বালকদের আসা তিনি পছন্দ করতেন না। যারা সব সময়ে হাতা গুটিয়ে প্রস্তুত থাকে, এ রকম তরুণদের প্রতি তাঁর বিশেষ লক্ষ্য থাকত। "শিশুদের চীৎকার চেঁচামেচি শাখার মধ্যে কিসের জন্য? এরা শাখায় এসে বড় গোলমাল করে, তাই এদের আসা বন্ধ করা উচিত।" এই নিয়ে ডাক্তারজীর সঙ্গে তাঁর হামেশাই তর্ক চলত। ডাক্তারজী সব সময়ে "পরে দেখা যাবে" বলে তাঁর কথা এড়িয়ে যেতেন। তার কারণ, তাঁর সম্মুখে যে হিন্দু রাষ্ট্রের কল্পনা ছিল, তাকে সাকার করার জন্য সংস্কার গ্রহণের পক্ষে উপযুক্ত নতুন প্রজন্মই অধিক উপযোগী হবে — এরকম তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অতএব নাগপুর শাখায় কিশোরদের 'কুশ পথক' এবং তার নিম্নতর বয়ঃক্রমের পথকগুলির বিষয়ে বেশী চিন্তা করা হত। "বিকির"-এর আদেশ হবার পর শাখার শেষে একে-একে প্রত্যেক গটের স্বয়ংসেবকেরা ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে আসত। তখন গটের কোন্ স্বয়ংসেবকেরা আজ আসেনি সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞেস করতেন। শুধু এটুকু করেই তিনি থেমে থাকতেন না, বরং অনুপস্থিত স্বয়ংসেবকের বাড়ীতে নিজেই যেতেন, অথবা অন্য কাউকে পাঠিয়ে কারণ জেনে নিতেন। পরের দিন যাতে সে শাখায় উপস্থিত থাকে তার ব্যবস্থাও করতেন। কখনো-কখনো ডাক্তারজী শাখা শুরু হওয়ার

আগেই সঙ্ঘস্থানে জল ছেটাতেন এবং স্বয়ংসেবকদের খেলার সময়ে নিজেও অত্যন্ত উৎসাহের সহিত সম্মিলিত হয়ে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন। তিনি জানতেন সমাজের সম্মুখে যে অসংখ্য ভীষণ সমস্যা রয়েছে, সেগুলিকে চিরতরে শেষ করে দিতে হলে তার জন্য প্রয়াস করার সাথে-সাথে কয়েকটি প্রজন্ম যাবৎ রাষ্ট্রীয়তার দীক্ষা গ্রহণ করে দেশের মঙ্গলের জন্য সারা জীবন অখণ্ড রূপে যারা জাগ্রত থাকবে এ রকম নাগরিক সমগ্র দেশে বিপুল সংখ্যায় তৈরী করতে হবে এবং এই পরম্পরার প্রবাহকে সতত প্রবহমান রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। আপ্পা সোহোনীর চোখের সামনে প্রধানতঃ নাগপুরে মুসলমানদের ষড়যন্ত্রকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করার চিন্তা ছিল। তাঁর এই ধরনের চিন্তার মধ্যে কোন অন্যায় ছিলনা, কিন্তু নিঃসন্দেহে তা ছিল অসম্পূর্ণ। সোহোনীর চিন্তার মধ্যে পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া ছিল, কিন্তু ডাক্তারজীর চিন্তার মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে এ রকম দুরবস্থা যেন আর কোন দিন না হয় তার জন্য সমাজের মনের গঠনকে পরম্পরা থেকে রাষ্ট্রের অনুবর্তী করে তোলার কার্যকর দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল তাঁর মনের মধ্যে। ডাক্তারজী কেবল কাল ও আজকের চিন্তা করতেন না, তিনি সমাজের শাশ্বত স্থৈর্যের জন্য ভবিষ্যতের দিকে সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি নিয়ে দেখতেন এবং সেই কারণেই তরুণদের সঙ্গে বালক ও শিশুদের উপরেও সংস্কার প্রদান করার প্রস্তুতি তিনি গ্রহণ করেন।

নাগপুরের আবহাওয়া বেশ গরম থাকা সত্ত্বেও ডাক্তারজী কিছু তরুণদের গ্রীষ্মকালে একটি প্রশিক্ষণ বর্গের আয়োজন করেন। তিনি তাদের এমন উপযুক্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন যাতে তারা যে কোন স্থানে গিয়ে নিজেদের শক্তির ভিত্তিতেই সঙ্ঘের কাজ করতে পারে। সেই সঙ্গে এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য এও ছিল যে এতে অংশগ্রহণকারী স্বয়ংসেবকেরা যেন শাখাগুলিতে উপযুক্ত অধিকারী হিসাবে কাজ করতে পারে। এই বর্গের নাম অনেক বছর ধরে 'অধিকারী শিক্ষণ বর্গ' (অফিসার্স ট্রেনিং ক্যাম্প' বা O.T.C.) রূপে প্রচলিত ছিল। এই বর্গের কার্যক্রম মোহিতের সঙ্ঘস্থানে ভোর পাঁচটা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত চলত। বর্গকে সফল করার জন্য শ্রী আপ্পা সোহোনী এবং শ্রী মার্তণ্ড রাও জোগ খুব পরিশ্রম করেন। প্রথম বছরে কেবল সতের জন নির্বাচিত স্বয়ংসেবককে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছিল। সঙ্ঘস্থানের ভূগর্ভস্থ কক্ষে বেলা সাড়ে বারোটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কথাবার্তা, আলোচনা, মন্তব্য ইত্যাদি বিবিধ কার্যক্রম হত। এই সব কার্যক্রমে ডাক্তারজী স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন এবং স্বয়ংসেবকদের অনেক বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। সপ্তাহে তিন দিন বৌদ্ধিক বর্গ হত, যার জন্য সকলে ডাক্তারজীর বাড়ীতে সমবেত হত। সাঁতার কাটাও বর্গের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তার জন্য ডাক্তারজী চিটণীসপুরার একটি কুয়ায় প্রশিক্ষার্থীদের নিয়ে যেতেন। প্রথম কয়েক বছর এইরূপ শিক্ষাক্রমই প্রচলিত ছিল।

বর্গ চলাকালীন ডাক্তারজীর বাড়ীতে ইঁট-পাথর বর্ষণ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেল। মাঝে-মাঝে ডাক্তারজী এবং অন্য হিন্দু নেতাদের নিকট বেনামী চিঠি আসতে লাগল, যাতে হুমকি দেওয়া হত — "সাবধান! আমরা আপনাদের খুন করব।" ডাক্তারজী চিঠিগুলো পড়ে খুব

হাসতেন এবং নিকটে উপবিষ্ট স্বয়ংসেবকদের বলতেন — "ওদের যদি বাস্তবিকই সাহস থাকত তাহলে ওরা কথা না বলে কাজ করে দেখাত।" তাঁর বন্ধুরা তাঁকে পরামর্শ দিতেন, "আজকাল আপনি নিজের সঙ্গে একটু শক্ত-সমর্থ রক্ষী নিয়েই রাত-বিরেতে বেড়াতে যাবেন।" একবার 'মহারাষ্ট্র' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীগোপালরাও ওগলে তাঁকে অনুরূপ পরামর্শ দিলে তিনি বলেন, "আজকাল তো রক্ষী সঙ্গে নিয়েই ঘুরি।" "কোথায় আপনার রক্ষী?" গোপালরাও জিজ্ঞেস করলেন। ডাক্তারজী তার সঙ্গী এক কিশোর স্বয়ংসেবককে দেখিয়ে বললেন — "এই তো"— এই বলে তিনি জোরে হেসে উঠলেন। গোপালরাও নিজেও না হেসে থাকতে পারলেনা না। তাঁর সতর্ক বার্তা সেই হাসির মধ্যেই মিলিয়ে গেল। ডাক্তারজী যে হুমকিভরা চিঠি পেতেন, তার একটি ১৫ই মে তারিখের 'মহারাষ্ট্র'-এ আব্দুল করীমের স্বাক্ষর সহ প্রকাশিত হয়েছিল। তার ভাষা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে সেটা কোন মাথামোটা গুণ্ডার কারসাজি। তাতে লেখা হয়েছিল — "আপনি নাগপুরের মুসলমানদের বড় দোস্ত ('দোস্ত' বা বন্ধু শব্দটি ব্যঙ্গাত্মক ছিল)। আপনি রামটেকের মুসলমানদের সঙ্গে শয়তানি করেছেন। সে রকম করে আপনি নিজের মৃত্যুকেই কাছে ডেকে এনেছেন। খেয়াল রেখো, এক বছরের মধ্যে বেটা! তোমাকে মুর্গীর মত কাটা হবে এবং তোমার হাড়গুলো মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে চুস্‌বে।"

ডাক্তারজী বেশ বুঝতে পারছিলেন যে বর্তমান পরিস্থিতির পরিণতি ঘটবে এক সংঘর্ষের মধ্যে। অতএব, মুসলমানদের আক্রমণের পরিকল্পনার আন্দাজ নেবার জন্য মুসলমানদের মহল্লার গোপন কার্যকলাপ-এর সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। জুন-জুলাই মাস থেকেই হিন্দু পল্লীগুলিতে মুসলমানদের ছোট-ছোট দলকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল এবং মসজিদের মধ্যে বার-বার বৈঠক হওয়ার সংবাদ থেকেও আসন্ন সংকটের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। সেই সময়ে মহারাষ্ট্রের সর্বত্র ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণদের মধ্যে অত্যন্ত তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। মুসলমানদের আশা ছিল যে এই তিক্ততার সুযোগ নিয়ে হিন্দু সংগঠনের উদ্যোক্তাদের এবং মুসলমানদের আর্থিক বহিষ্কার যারা করেছে সেইসব ভদ্রলোকদের ভালো শিক্ষা দেওয়া যাবে, কারণ সেই সময়ে অন্ততঃ অব্রাহ্মণবাদী ও মুসলমানরা উভয়ই উক্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর মানুষদের বিরুদ্ধে এক জোট হয়ে উঠে দাঁড়াবে। যদিও নাগপুরে এই রকম চিন্তার ছোঁয়াচ পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু তার তীব্রতাকে শান্ত করার মত একটি শক্তিরও উদয় হয়েছিল। নাগপুরের ভোঁসলে ঘরাণার শ্রীমন্ত রঘুজীরাও এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমন্ত রাজা লক্ষ্মণরাও ভোঁসলে উভয়েই মনে এবং প্রত্যক্ষ কাজে অবিসংবাদিত ভূমিকা গ্রহণ করে সম্পূর্ণ হিন্দু-সমাজের প্রতি একত্ব ও মমত্বের মনোভাব নিয়ে সব সময়ে ব্যবহার করতেন। একই প্রকারে ডাঃ মুঞ্জে ও ডাঃ হেডগেওয়ার ইত্যাদিরাও নিজেদের উদ্যোগে সমাজের সকল শ্রেণীর ব্যক্তিদের ও নেতাদের নিজেদের প্রেমের পরিধির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। কিন্তু মনে হয় মুসলমানরা এ বিষয়ে যথাযথ অবহিত ছিলনা। তারা এমন স্বপ্নই দেখতে শুরু করেছিল যে যদি আমরা ভদ্রলোক শ্রেণীর লোকেদের উপর আঘাত হানি তাহলে কোষ্ঠীপুরার (অর্থাৎ অব্রাহ্মণ ও বস্তিবাসী) লোকেরা আনন্দের আতিশয্যে নেচে উঠবে এবং সুযোগ পেলে

আমাদের সাহায্যও করবে। যদি তারা এ রকম মনোভাব নিয়ে আত্মসন্তুষ্ট না থাকত তাহলে মুষ্টিমেয় মুসলমানরা নাগপুরের মত একটি প্রদেশের রাজধানীতে দিন- দুপুরে হামলা করার ব্যূহ রচনা তাদের পক্ষে আত্মহত্যার তথা নিজেদের মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ দেওয়ার মতই মূর্খতা হত। কিন্তু ঠিক সময়ে তাদের ষড়যন্ত্রের সংকেত পাওয়া গিয়েছিল।

ঈদের দিন ডাঃ মুঞ্জের কাছে চিঠি এল — "তোমাকে খুন করা হবে।" সেদিন ডাক্তারজী এবং কয়েকজন স্বয়ংসেবক পাহারা দেবার জন্য রাত্রে ডাঃ মুঞ্জের বাড়ীতেই রইলেন। ডাঃ মুঞ্জেও তাঁর বালিশের নিচে দুইটি বন্দুক ও পিস্তল রেখে দিয়েছিলেন। রাত্রে মুসলমান গুণ্ডাদের একটি দল তাঁর বাড়ীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। স্বয়ংসেবকরা তাদের বেশ ভালোমত শিক্ষা দিল। এই ঘটনায় পরিস্থিতি আরো উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠল এবং মহাল অঞ্চলে মুসলমান গুণ্ডারা সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের 'কট্টীচট্। লেপসট্'। বলে গাল দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মুসলমান মহল্লাগুলি থেকে নারী ও শিশুদের জুলাই মাসেই বাইরে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯২৪-এর গণ্ডগোলের সময়ে যে প্রাণ নিয়ে পলায়ন শুরু হয়েছিল, সেকথা তারা ভোলেনি। মুসলমান মহল্লাগুলিতে রাত্রে লাঠি চালনার প্রশিক্ষণও শুরু হয়ে গিয়েছিল।

স্টেশনে এবং অন্যত্র স্বয়ংসেবকদের ঘোরা-ফেরা আরো বেশী সতর্কতার সঙ্গে শুরু হয়ে গেল। ঐ সময়ে স্বয়ংসেবকেরা এবং নাগপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের কার্যকর্তারা ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন এবং তাঁদের সংগৃহীত সংবাদ তাঁকে জানিয়ে যেতেন। ডাক্তারজীও তাঁদের এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতেন যে হিন্দু সমাজের উপর যে কোন অংশেই আক্রমণ হোক না কেন সেখানে সকলের সাহায্য করতে ছুটে যাওয়া উচিত। কোষ্টীপুরা থেকে যদি কেউ সাক্ষাৎ করতে আসত, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করতেন যে "মহাল এলাকায় আক্রমণ ঘটলে তুমি কী করবে?" এবং মহালের কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে জিজ্ঞেস করতেন, "কোষ্টীপুরায় গণ্ডগোল হলে সেখানে যাবে কিনা?" সেই সময়ে আপ্পা সোহোনীর মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা যেত। তিনি লাঠির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজনকে ধনুর্বিদ্যার শিক্ষাও দিতে শুরু করলেন। সোহোনী শস্ত্র নির্মাণে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর গৃহ বাঘনখ, ছুরিকা, বরশা, তলোয়ার ইত্যাদির একটি ছোটখাট কারখানাতে পরিণত হয়েছিল। তিনি তাঁর বহু পরিচিত ব্যক্তিদের সদণ্ড ও সশস্ত্র তৈরী করেছিলেন। ডাক্তারজীর জন্মদিনে শ্রী সোহোনী তাঁকে একটি ছুরিকা উপহার দিয়েছিলেন।

ডাক্তারজী তাঁর বৈঠকে বার-বার বলতেন যে "যে কাজ করতে বলা হয়েছে সেটা করতে হবে, কিন্তু তাঁর ঢোল পেটাবার প্রয়োজন নেই। এবং একথা কখনো চিন্তা করা উচিত নয় যে একা যদি কাজ না করি, তাতে কী ক্ষতি হবে? এটা কাজ করার সঠিক পদ্ধতি নয়।" নিজের কথা পরিপুষ্ট করার জন্য উনি একটি ঘটনার দৃষ্টান্ত দিতেন। রাজা লক্ষ্মণরাও ভোঁসলের গৃহে একটি অনুষ্ঠানের সময়ে পানের বাটায় চুন ফুরিয়ে গিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ চুন আনার আদেশ করা হল। একের পর এক সকলে পরস্পরকে "চুনা লাও", "চুনা লাও" বলে আদেশ করতে লাগল, কিন্তু চুন এল না। ডাক্তারজী বাড়ীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি

ভিতরে গিয়ে চুন নিয়ে এলেন। কিন্তু তার পরেও বেশ কিছুক্ষণ ধরে একজন করে চাকরকে "চুনা লাও"-এর হুকুম করা চলতে থাকল। এই ধরনের আর একটি কাহিনীর কথা তিনি বলতেন। এক বার জনৈক রাজা তাঁর সমস্ত প্রজাকে আদেশ দিলেন যে পর দিন প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের পূর্বেই প্রত্যেকে যেন মন্দিরের কুণ্ডে এক ঘটি করে দুধ ঢালে। প্রত্যূষের অন্ধকারে রাজার আদেশ পালনের জন্য বাড়ী থেকে কুণ্ডের দিকে যাবার সময়ে প্রত্যেকেই ভাবল যে "সবাই তো দুধ ঢালবেই, আমি একা যদি এক ঘটি জল ঢেলে দিয়ে আসি, তাহলে কী ক্ষতি হবে?" প্রত্যেকে এই কথা ভেবে এক-এক ঘটি জল ঢেলে দিয়ে এল। সূর্যোদয়ের পরে দেখা গেল যে কুণ্ডের মধ্যে শুধু জলই ঢালা হয়েছে, এক ফোঁটাও দুধ কেউ ঢালেনি। এইভাবে তিনি স্বয়ংসেবকদের মনে এই কথাটি এঁকে দিতেন যে একজন ব্যক্তি যদি সঠিক কাজ না করে তাহলে তার কী পরিণাম হয়।

সঙ্ঘের আরম্ভের সময়ে এবং ১৯২৭-এর সংঘর্ষের পূর্বে ডাক্তারজী তাঁর বৈঠকগুলিতে এবং সভা-সমিতিতে বার-বার বলতেন যে "আমি একেলা" এই মনোভাব কতখানি মারাত্মক ও হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে। সেইসব দিনে লোকেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনার সময়ে বলত — "হিন্দু জাতি তো মৃত্যুপথের যাত্রী, সংস্কৃত মৃত ভাষা, আজকের পরিস্থিতিতে এই সমাজের পক্ষে মাথা তুলে উঠে দাঁড়ানো অসম্ভব, অতএব ভাগ্যে যা লেখা আছে তাই হবে।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই ধরনের কথা শুনে ডাক্তারজী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। কিন্তু তিনি কখনো এই ধরনের কথায় সায় দিতেন না। তাঁর মন বলত যে হিন্দুদের মনের "আমি একেলা" এই ধারণার মূলে আছে তাদের ভীরুতা। যদি সামগ্রিক জীবনের ব্যবহার থেকে এই বিচ্ছিন্নতার মনোভাব দূর করে দেওয়া যায় তাহলে হিন্দু সমাজের বাস্তবিক পুরুষার্থী তথা পরাক্রমী স্বরূপ আপনা থেকেই বিশ্বের সম্মুখে প্রকট হতে থাকবে। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তিনি হিন্দুর মনের উপর জোঁকের মত দৃঢ়ভাবে যে মনোভাব চেপে বসে আছে যে "আমি একেলা" তাকে উপহাসের চাবুক মেরে-মেরে একেবারে দূর করে দেবার ব্যাপারে তিনি এতটুকু ইতস্ততঃ করতেন না। এ বিষয়ে নিচের দুইটি ঘটনার কথা তিনি বার-বার উল্লেখ করতেন।

প্রথম ঘটনাটি এক জনসভা প্রসঙ্গে, যেখানে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে কী ভাবে সভাপতি, বক্তা, শ্রোতা সকলের আক্কেল গুড়ুম করে দিয়েছিল, যার ফলে সম্পূর্ণ সভাই একেবারে বানচাল হয়ে গিয়েছিল। তার বর্ণনা তখনকার 'মহারাষ্ট্র' পত্রিকায় এই রকমভাবে করা হয়েছিল ঃ — "... হঠাৎ কয়েকজন সভার মাঝখানেই উঠে দাঁড়াল। দেখতে দেখতে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পার্কের ওয়াকার রোডের দিক থেকে সমস্ত মানুষ, যেন বিদ্যুতের 'শক্' লেগে, একদম দাঁড়িয়ে উঠল এবং পিছন থেকে বুঝি বাঘে তাড়া করেছে এইরকম আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগল। সেইদিকেও শ্রোতাদের ভিড় ছিল। ঐ পলায়মান লোকেদের চাপে পিষ্ট হয়ে মারা পড়ার ভয়ে তারাও উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং 'এরা সব দৌড়ে পালাচ্ছে কেন' তার কারণ কারোরই না জানা থাকা সত্ত্বেও শুধু ভয়ের চোটে তৃতীয় দিকের লোকেরাও দাঁড়িয়ে উঠল। তাদের মধ্যে অনেকেই পলায়মান লোকেদের পায়ের নিচে সাংঘাতিকভাবে ঘায়েল হল আর যারা দৌড়াচ্ছিল তাদের অনেকেই বসে থাকা লোকেদের ঘাড়ের উপর পড়ে

গিয়ে নিজেরাও আহত হল এবং যাদের উপরে পড়ল তারাও অল্প-বিস্তর চোট পেল। সারাংশ এই যে উপরের বর্ণনায় যতখানি সময় লাগল তার এক-শতাংশ সময়ের মধ্যে, এক নিমেষে সম্পূর্ণ সভার লোকেরা বেঙ্কটেশ থিয়েটারের প্রাচীরের দিকে ছুটতে লাগল। পলায়নপর ভিড়ের ধাক্কায় কিট্‌সন লাইটের আলোগুলি সব উল্টে নিচে পড়ে নিভে গেল। সভাপতি মহাশয়ের টেবিলের উপর একটি প্রদীপ টিম্‌টিম্ করে জ্বলছিল। পলায়নপর ভিড় থিয়েটারের দেওয়ালে ধাক্কা খেল, আর এগিয়ে যাবার রাস্তা নেই দেখে কয়েকজন দেওয়াল টপ্‌কে ও কাঠের চৌখুপির উপরে লাফিয়ে অপরদিকে গিয়ে পড়ল এবং অনেকেই বেশ আহত হল। কত যে পুরুষ ও শিশু ঘায়েল হল তার ঠিক নেই। বহু লোক চাপা পড়ল। 'অনেকে পড়ে গেল, চাপা পড়ল আরো বহু মানুষ, অনেকের হাতিয়ার হল হাতছাড়া' — এমনই অবস্থা দাঁড়াল। অকস্মাৎই সামনে-পিছনে না দেখেই লোকেরা পালাতে শুরু করে দিল — এর ফলে কত লোকের হাতের ছড়ি, অনেকের জুতো, কত লোকের মাথার টুপি, গায়ের চাদর হারিয়ে গেল। অনেকের ধুতি খুলে গেল। এত হাজার মানুষের ভীত-সন্ত্রস্ত চোখের উপর যেন আকাশই ভেঙে পড়ল। ... খোঁজ-খবর নিয়ে বাস্তবিক ব্যাপারটা জানা গেল যে সভার মাঝখানে বসা একজন লোকের পায়ের তলায় একটা ব্যাঙের মত কী যেন ঠেকল। সে উঠে দাঁড়িয়ে নিচে দেখতে লাগল। সেই সময়ে আশে-পাশের আরো কয়েকজন লোকও উঠে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে একজন 'সাপ, সাপ' বলে চিৎকার জুড়ে দিল। তাই শুনে তার সঙ্গে পাশের সব লোকেরাও উঠে পালাতে শুরু করে করল। শতকরা নিরানব্বইজন লোক "আমরা কেন পালাচ্ছি, সেকথা না জেনেই পালাচ্ছিল।"

এই সভার দিন ডাক্তারজী কোন কাজে নাগপুরের বাইরে গিয়েছিলেন। 'মহারাষ্ট্র' পত্রিকায় ঘটনার বর্ণনা পড়ে তিনি সভার উদ্যোক্তাদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন — "শ্রোতাদের কথা বাদ দিন, কিন্তু আপনারা এগিয়ে গিয়ে সকলকে সামলালেন না কেন?" তিনি উত্তর পেলেন — "আমি একলা কী করতে পারতাম?" প্রত্যেকের মুখ থেকে একই সুর শোনা গেল — "আমি একলা কি করব?"

মোহিতে প্রাসাদের নিকট কালীকর গলির একটি ঘটনাও তিনি শোনাতেন। ছ-সাত জন হিন্দুকে সামনে থেকে আসতে দেখে দু জন মুসলমান জোরে হাঁক দিল — "দাঁড়া, মার শালাকে।" একথা শুনে ওরা সকলেই বিপরীত দিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটতে লাগল। তার মধ্যে থেকে একজন পলায়নকারীর সঙ্গে পথে ডাক্তারজীর দেখা হল। তিনি তাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "পালাচ্ছ কেন?" সে হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিল — "দুজন মুসলমান মারতে এল। একলা ছিলাম। কী করব? পালিয়ে প্রাণ বাঁচালাম।" এটাই ছিল সেই দ্বিতীয় ঘটনা।

এই ঘটনাগুলির বর্ণনা করার সময়ে ডাক্তারজী একথার উপরে জোর দিতেন যে জনসাধারণের মন থেকে একাকীত্বের হীন ভাবনাকে দূরীভূত করতে হবে। এই আত্মবিশ্বাসের অভাব দূর করার জন্য হিন্দুদের মনের মধ্যে "আমি"-র স্থানে "আমরা পঁয়ত্রিশ কোটি" এই রাষ্ট্রীয় অস্মিতার মনোভাব গড়ে তোলা আবশ্যক। তিনি বিশ্বাসপূর্বক প্রতিপাদন করতেন যে এই ভীরুতা তথা পলায়নী প্রবৃত্তিকে উচ্ছেদ করার জন্য সকলকে প্রতিদিন একত্র হয়ে

'আমি একাকী নই, পরন্তু আমরা অনেক'-এর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার করা প্রয়োজন। হিন্দুদের ভগ্ন ধৈর্য ও অবসাদ দূর করে তাদের পুনরায় জাগ্রত করে তোলার দিকেই তাঁর সম্পূর্ণ উদ্যম কেন্দ্রিত ছিল।

মনে হত যেন নিজের নির্ভীকতা তথা কর্তব্যজ্ঞানের কারণে সিংহগড়ে তানাজীর বীরোচিত মৃত্যুবরণের পর যখন মারাঠা সৈন্যরা প্রাণ বাঁচাতে পালাতে শুরু করেছিল তখন আশ্চর্যজনকভাবে ঐ বিষম পরিস্থিতিকে সূর্যাজী মালুসরে যেভাবে একেবারে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, ডাক্তারজীও সূর্যাজীর সেই নীতিই অনুসরণ করছিলেন। "আর পরাজয় নয়, পরাক্রম" — এইরূপ সুদৃঢ় সংকল্প তিনি নিজের কথাবার্তার মাধ্যমে তাঁর কাছে যারা আসত বা তিনি যাদের সংস্পর্শে আসতেন, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তঃকরণে অংকিত করে দিতেন। বাহ্য পরিস্থিতির উগ্রতার দরুন যারা চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছিল তাদের মনে ডাক্তারজীর কথা গভীরভাবে গেঁথে যেতে শুরু করেছিল এবং সমাজের তরুণ প্রজন্ম এখন বিজিগীষু বৃত্তি নিয়ে চিন্তা করতে আরম্ভ করে দিয়েছিল।

ডাক্তারজী যেমন একদিকে নিজের সমাজকে জাগ্রত ও সুসজ্জিত করার প্রয়াস করেছিলেন, তেমনই অপর দিকে মুসলমানরা নিজেদের পাড়ায় কীভাবে আক্রমণের ব্যূহ রচনা করছে সে বিষয়েও খোঁজ-খবর রাখছিলেন। সেই কারণেই গণেশোৎসবে মহালক্ষ্মী তথা গৌরীর প্রসাদের দিন মহাল অঞ্চলে মুসলমানদের দাঙ্গা করার পরিকল্পনার কথা তিনি আগেভাগেই জানতে পেরেছিলেন। অতএব, সংঘর্ষের সম্ভাব্য এলাকায় তিনি বিভিন্ন স্থানে লাঠি একত্র করে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন, যাতে প্রয়োজন হলে তৎক্ষণাৎ সেগুলি হাতের কাছে পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে যে অঞ্চলগুলি অসুরক্ষিত বলে মনে হল সেখানে ডাক্তারজী স্বয়ং গিয়ে জনসাধারণকে সতর্ক থাকার সূচনা দিয়ে এসেছিলেন। পটবর্ধন হাই স্কুলের পার্শ্ববর্তী ছাত্রাবাসের আবাসিক ছাত্রদের মনে হল যে তাদের নিবাস গুণ্ডাদের আক্রমণের লক্ষ্য হতে পারে। তারা প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট গিয়ে রক্ষার ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানায়। তিনি ছাত্রদের বলেন, "এটা সরকারী বিদ্যালয়, এখানে গুণ্ডারা কাউকে কষ্ট দেবেনা।" স্বয়ংসেবকদের মাধ্যমে ডাক্তারজী এই সংবাদ জানতে পারলেন। তিনি ছাত্রদের বললেন — "আক্রমণের উন্মাদনায় এই উত্তর শুনে গুণ্ডারা পরিতৃপ্ত হবে না। আপনাদের সকলকে লাঠি নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে।" ডাক্তারজীর এই নির্দেশ অত্যন্ত মূল্যবান্ প্রমাণিত হল। যখন গুণ্ডারা ঐ ছাত্রাবাসের উপর আক্রমণ করে তখন ঐ ছাত্ররা প্রচণ্ডভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে তাদের মুকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

আগষ্ট মাসের শেষে মুসলমান পাড়াগুলিতে কোন এক পুণ্যতিথির অজুহাতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর এক শোভাযাত্রা বের করা হবে বলে ইস্তাহার বিতরণ করা হয়। ইস্তাহারের উপর 'ফাতেহা রব্বানী' (পুণ্যতিথি) শীর্ষক মুদ্রিত ছিল। তাতে লেখা হয়েছিল "...... মুসলমান ভাইদের এত্তেলা দেওয়া হচ্ছে যে তিন বছর পূর্বে সৈয়দ মীর সাহেবের মৃত্যু হয়। তাঁর পুণ্যতিথি উপলক্ষে তাং ৪-৯-২৭ বেলা দুটোর সময়ে একটি শোভাযাত্রা হংসাপুরী গোরস্থানের দিকে যাবার জন্য নবাব মহল্লা থেকে মহাল, ওয়াকার রোড ও গাঁজা খেতের

রাস্তা দিয়ে যাবে। অতএব, সকল ইসলামী ভাইদের শোভাযাত্রা শুরু হবার পূর্বেই বেলা বারটার সময়ে নবাবপুরা মসজিদে সমবেত হয়ে শোভাযাত্রায় সম্মিলিত হওয়ার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এর ফলে শোভাযাত্রায় উৎসাহ ও উষ্ণতার সঞ্চার হবে এবং আপনারা সকলে পুণ্যের অধিকারী হবেন।" নিচে জনৈক হুসেন শরীফের স্বাক্ষর ছিল।

এই 'পুণ্যপ্রদ' যাত্রার জন্য মহালক্ষ্মীর দিন বেলা বারটার সময়ে নির্দিষ্ট করার পিছনে মুসলমানদের চক্রান্ত ছিল। নাগপুর-বেরার অঞ্চলে মহালক্ষ্মীর উৎসব অত্যন্ত আড়ম্বর ও সাজ-সজ্জা সহকারে পালন করা হয়। সেদিন রাস্তাঘাট খুব সাজানো হয়। উদ্যোক্তারা দুইটি দেবী প্রতিমাকে রেশম ও জরির বহুমূল্য বস্ত্র দ্বারা শৃঙ্গার করেন এবং গৃহের হীরা-মুক্তা, স্বর্ণ প্রভৃতির মূল্যবান্ অলঙ্কার দিয়ে সাজান এবং ঘরে-ঘরে দেবীর পূজা করা হয়। নৈবেদ্যর জন্য এত রকম পদ রান্না করা হয় যে 'চব্বিশ ব্যঞ্জন ছত্রিশ ভোগ' এই উক্তি আক্ষরিকভাবে চরিতার্থ হয়। বেলা দুটো থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভোগ-নৈবেদ্যের অনুষ্ঠান চলে। মুসলমান নেতারা চক্রান্ত করেছিল যে দুপুরের ভোজন-পর্বের সময়ে যদি হিন্দু মহল্লায় আক্রমণ করা হয় তাহলে ভোজন-রত ভক্তদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে এবং ঐ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে মহালক্ষ্মীকে ভাঙচুর করে তার অলংকার লুণ্ঠনের আক্ষরিক অর্থে সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া যাবে। এই ভেবে নেশাগ্রস্তের মত, বেলা বারটায় নাগপুর ও নিকটবর্তী এলাকার মুসলমানরা নবাবপুরা মসজিদে একত্রিত হতে শুরু করে।

সেই সময়ে ডাক্তারজী নাগপুরে ছিলেন না। প্রতি বছরের মত তিনি গণেশোৎসবে ভাষণ দেবার জন্য চান্দা, ওয়ার্ধা ইত্যাদি স্থানে পরিভ্রমণ করছিলেন। কিন্তু বাইরে যাওয়ার আগে তিনি সকলকে এ বিষয়ে খুব ভাল ভাবে শিখিয়ে গিয়েছিলেন যে আক্রমণ ঘটলে কী কী বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং কী করতে হবে। সমর্থ রামদাস তাঁর 'দাসবোধ' গ্রন্থে 'চাণাক্ষতা' (চাতুর্য) সম্বন্ধে যে সব লক্ষণের কথা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন — সেগুলি সমস্তই ডাক্তারজীর নিত্যকার ব্যবহারে প্রত্যক্ষ করা যেত। তিনি এই সূত্রটি উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন যে দাঙ্গাবাজ লোকেদের সঙ্গে যে যেমন তার সঙ্গে সেইরূপ আচরণ করা প্রয়োজন। সেই কারণে বাহ্যতঃ কেউ গুণ্ডাদের চক্রান্ত সম্বন্ধে কিছুই জানে না — এই রকম একটা অভিনয় করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। তিনি মুসলমানদের চক্রান্তের কথা জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে যে জাগরণ তথা প্রস্তুতি গড়ে উঠেছিল — সে বিষয়ে শত্রুপক্ষকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দেননি। মুসলমানরা দাঙ্গার তিথি নিশ্চিত করে ফেলার পরেও ডাক্তারজীর নাগপুর থেকে বাইরে চলে যাওয়া — তাঁর দিকে বাঁকা চোখে যারা তাকাতে অভ্যস্ত সেই মুসলমানরা তার এই অর্থ করল যে তাদের ষড়যন্ত্রের বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। মনে হয়, তাদের এইভাবে বিভ্রান্তির মধ্যে রাখার জন্যই ডাক্তারজী এইরূপ চাতুর্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাই তিনি নাগপুরের বাইরে প্রবাসে চলে গেলেন।

ডাক্তারজীর নির্দেশ অনুযায়ী শ্রীআপ্পা সোহোনীর নেতৃত্বে স্বয়ংসেবকেরা মোহিতে প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের আড়ালে বেলা বারটা থেকেই সমবেত হতে শুরু করে। আপ্পাজী তাদের যথাযথ দলে ভাগ করে দেন এবং ডাঃ মুঞ্জের বাড়ী থেকে মহাল পর্যন্ত সমস্ত গলি-ঘুঁজিতে

সতর্কতার সঙ্গে লুকিয়ে থাকতে বলেন। মোট ষোলটি দল গঠন করা হল। সব মিলিয়ে একশো থেকে একশো পঁচিশজন তরুণকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়।

নির্ধারিত দিনে অর্থাৎ রবিবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর দুপুর দুটোর সময়ে মুসলমানদের মিছিল বেরুল। "আল্লা হো আকবর" ও 'দীন দীন' গর্জন করতে-করতে মিছিল এগিয়ে চলল। ইংরাজদের রাজত্বে একটি প্রদেশের রাজধানীতে আয়োজিত ঐ মিছিলে সহস্রাধিক মুসলমান লাঠি, তলোয়ার, বর্শা, ছুরিকা ইত্যাদি শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অত্যন্ত উন্মত্তের মত ব্যবহার করে এগিয়ে চলছিল। তা সত্ত্বেও পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে আঙুল পর্যন্ত তোলেনি। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ হলে স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রীয় মনোভাবের যারা অভিব্যক্তি করে সেই হিন্দু সমাজকে যদি নিষ্পেষিত করা হয় সেটা ইংরেজদের পক্ষে লাভজনকই হবে — এইরূপ মনোভাব গ্রহণ করে সরকার বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের আক্রামক কার্যকলাপের দিক থেকে চোখ বুঁজে থাকার নীতি গ্রহণ করেছিল। এমনিতেই ভারতের উপর আক্রামক হিসাবে উভয়ই একই দাঁড়িপাল্লার বাটখারা ছিল এবং একথা তারা উভয়ই জ্ঞাত ছিল। মুসলমানরা ইংরাজদের পূর্বেকার 'সম্রাট' বলে নিজেদের বুক ফুলিয়ে চলত, ওদিকে বর্তমান সম্রাট্ ইংরেজরা সর্বত্র নিজেদের অহংকার জাহির করে চলত। স্যার জন স্ট্রেচী মুসলমানদের সম্বন্ধে আত্মীয়তা ব্যক্ত করে লিখেছিলেন, "ওদের রাজনৈতিক স্বার্থ আমাদের সঙ্গে একেবারে মিলে যায়" ("Whose political interests are identical with ours") "মুসলমানরা হল ইংরেজদের সুয়োরানী আর হিন্দুরা দুয়োরাণী।" — স্যার বামফীলড্ ফুল্লার-এর এই উক্তি তো প্রসিদ্ধ।

সরকারের এই পক্ষপাতিত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর দরুন মুসলমানদের ঐ সশস্ত্র মিছিল ডাঃ মুঞ্জের বাড়ীর সামনে দিয়ে অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল ও আক্রামক হয়ে এগিয়ে চলল। ইংরেজ অফিসাররা মনে-মনে মজা উপভোগ করে দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু ঐ দৃশ্য ছিল অত্যন্ত ভীতি-উৎপাদনকারী। কালীকর গলি, কেলীবাগ, সিটি হাই স্কুলের প্রধান ফটক, ডাঃ হরদাসের হাসপাতাল প্রভৃতি অঞ্চলের হিন্দুরা নিজেদের বাড়ীর মধ্যে থেকে "দীন-দীন"-এর গগনভেদী গর্জন শুনে ভয়ের চোটে কাঁপছিল। মিছিল যত কাছে এগিয়ে আসছিল ততই মনে হচ্ছিল হৃদয়ের স্পন্দন বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এইসব গলিতে লুকিয়ে থাকা স্বয়ংসেবকেরা নির্ভীকতার সহিত মিছিলের আসার প্রতীক্ষা করছিল। তারা আত্মরক্ষার জন্য সংকল্পবদ্ধ ছিল। নিজেদের পরাক্রম তথা পুরুষার্থের উপর তাদের ভরসা ছিল। উত্তেজনায় তাদের বাহুদণ্ডের মাংসপেশীগুলি টান-টান হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ পরেই মিছিল বড় রাস্তা ছেড়ে গালিগালাজ ও মার-পিট করতে-করতে ওয়াইকর গলিতে ঢুকে পড়ল। কিন্তু গলির মধ্যে এক পাশে চুপিসাড়ে যে স্বয়ংসেবকেরা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা ঐ সংকীর্ণ গলিতে গুণ্ডারা প্রবেশ করার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের উপর প্রহার মার শুরু করে দিল। মুসলমান আততায়ীরা মাথা ফেটে রক্তাক্ত শরীরে পিছন ফিরে পালাতে শুরু করে দিল। 'দীন-দীন' ধ্বনি সহকারে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে কয়েকজন গুণ্ডা মিছিল থেকে বেরিয়ে মহাল অঞ্চলের অন্য গলিগুলির মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করল এবং সেসব স্থানে রক্তাভিষেক শুরু হতেই মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং দু-একজন হিন্দুকে একাকী পেয়ে তাদের উপর মারধোর করে মুসলমানরা চিটনীস পার্কের

দিকে পালাতে লাগল। ওরা যেরকম ঘাব্‌ড়ে গিয়ে হিন্দুদের গালি-গালাজ করতে-করতে পালাচ্ছিল তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে প্রথম প্রত্যাঘাতেই ওদের আশার বেলুন ফেটে চুপ্‌সে গিয়েছিল। এত বিরাট মিছিল মাত্র কয়েকজন তরুণ একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে — এই সংবাদ বিদ্যুতের মত সমস্ত এলাকায় ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। শোনার সঙ্গে -সঙ্গে বাকি সকলেও মণ্ডা-মিঠাই-এর থালা ফেলে রেখে রেশমি বস্ত্রই মালকোঁচা মেরে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল এবং মিছিলের উপর আছড়ে পড়ল। চিটনীস পার্কের নিকট হিন্দুদের ভয়ঙ্কর মার শুরু হতেই অসংখ্য মানুষ পুলিশের তোয়াক্কা না করে অনেক বছর পরে আগত ঐ দৃশ্য দেখার জন্য একত্রিত হল।

অবশেষে অন্ধকারের আশ্রয় নিয়ে নিজেদের কালো মুখ লুকোবার জন্য ভালদাপুরার দিকে পলায়ন করা ছাড়া মুসলমানদের সামনে আর কোন উপায় ছিল না। হিন্দুদের দেবী মূর্তিগুলির উপর সজ্জিত বহুমূল্য অলঙ্কার লুণ্ঠন তথা প্রতিমাগুলিকে ভেঙে ফেলার পুণ্য অর্জনের লালসা নিয়ে যে গুণ্ডারা এসেছিল, তারা দেবীর এই প্রসাদ লাভ করল। কোমল পদ্মের পাপ্‌ড়ির উপরে রাখা লঘু পদ-চাপের মধ্যে আজ দশপ্রহরণধারিণী মহিষাসুর-মর্দিনীর শক্তি জেগে উঠেছে বলে প্রতীত হল। মহালক্ষ্মী সুবর্ণমুদ্রার ঝন্‌ঝন্‌ ধ্বনি শুনতে ভালবাসেন, কিন্তু আজ শস্ত্রের টংকার ধ্বনি শোনার আগ্রহে যেন তিনিও মেতে উঠলেন। রবিবার সারা শহরে সংঘর্ষ চলতে থাকে, কিন্তু তাতে হিন্দুদেরই আধিপত্য ছিল। সারা রাত জনসাধারণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে নিজ-নিজ এলাকায় পাহারা দিতে থাকে।

এরপর তিন দিন সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার সংঘাত চলতে থাকে। সোমবার দিন মুসলমানেরা এক শবযাত্রার উপর আক্রমণ করে। এর বদলা নেবার জন্য যেই হিন্দুরা একত্রিত হতে শুরু করে, অমনি মুসলমানরা লাঠি, তলোয়ার, বর্শা নিয়ে আবার হামলা শুরু করে। ঐ সময়ে এক মুসলমান নিজের বাড়ী থেকে বন্দুক নিয়ে গুলি চালাতে থাকে। এরফলে নয়জন হিন্দু আহত হয়। তাদের মধ্যে একজন স্বয়ংসেবক ঘুণ্ডিরাজ লেহগাঁওকরের মৃত্যুও হল। এই ঘটনায় হিন্দুরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে মুসলমানদের কয়েকটি বাড়ীতে ও একটি মসজিদে আগুন লাগিয়ে দেয়। কয়েকজন ধনুর্ধারী ব্যক্তি দূর থেকেই সকলের অলক্ষ্যে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করে এই কাজ করেছিল। সোমবার সন্ধ্যায় সেনা তলব করা হয়। গোরা সেপাইরা চারিদিকে টহল দিতে থাকে, ও স্থানে-স্থানে মেশিনগান স্থাপন করা হয়। তিন-চার দিন ধরে জাতি, পন্থ, পেশা ইত্যাদির কৃত্রিম বিভেদ ভুলে হিন্দুরা যে একতা ও জাগরূকতার প্রদর্শন করে, তার ফলে মুসলমানদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল এবং ওরা সরকারী সৈন্যদের ছত্রছায়ায় তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের গোণ্ডরাজার কেল্লায় নিয়ে গেল। কয়েকশত গুণ্ডা হাসপাতালে নিজেদের পাপের ফল ভোগ করতে লাগল। প্রায় দশ-পনের জন ইহলোক ত্যাগ করে চিরদিনের মত হিজরৎ করতে চলে গেল। হিন্দুদের মধ্যে চার-পাঁচজন বীরগতি লাভ করল। এই সংঘর্ষের দরুন নাগপুরের জীবনে হিন্দুদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হল।

ডাক্তারজী চান্দাতে নাগপুরের দাঙ্গার সংবাদ পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নাগপুর রওনা হলেন। শ্রী বালকৃষ্ণ ওয়াঘও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। পথে ডাক্তারজী কিছুক্ষণের জন্য ওয়ার্ধাতে

যাত্রা-বিরতি করলেন। সেখানে তাঁর নামে নাগপুর থেকে প্রেরিত একটি পত্র তিনি পেলেন। তাতে লেখা ছিল — "সরকার ও মুসলমান উভয়পক্ষই ডাক্তারজীর জন্য প্রতীক্ষা করছে। অতএব তিনি যেন ওয়ার্ধাতেই অবস্থান করেন।" শ্রী আপ্পাজী যোশীও নাগপুরের গুরুতর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে নাগপুরে না যাওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি এ বিষয়ে তাঁকে বিশেষ আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করেন, কিন্তু ডাক্তারজী কোন কথায় কান না দিয়ে দাঙ্গার তৃতীয় দিন দুপুরে নাগপুরে পৌঁছলেন। স্টেশনে ও আশে-পাশে অদ্ভুত স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। শহরে যাওয়ার জন্য টাঙ্গা বা কোন গাড়ী পাওয়া সম্ভব ছিলনা। পুলিশের জনৈক সেপাই বলল — "শহরে যাওয়া বিপজ্জনক।" কিন্তু ডাক্তারজী তার দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি হেসে হেঁটেই বাড়ীর দিকে রওনা দিলেন। শহরে চোরা-গোপ্তা ছুরি-ছোরা নিয়ে আক্রমণের ঘটনা অব্যাহত থাকলেও অসম সাহসী ডাক্তারজী সব জেনেও সেই পথে পা বাড়ালেন।

ডাক্তারজী বাড়ী পৌঁছে দেখলেন যে বাড়ীর ছাদের টালি ভেঙে গেছে, আর উঠোনে ইঁট-পাটকেল ও ভাঙ্গা টালি ছড়িয়ে পড়ে আছে। তিনি বুঝলেন যে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়ীতে বেশ ইঁট-পাটকেল পড়েছে। বাড়ীতে কারো আঘাত লেগেছে কিনা খোঁজ নিয়ে তিনি হাসপাতালে গিয়ে দাঙ্গার আহত মানুষদের এবং স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে দেখা করলেন ও তাদের খোঁজ-খবর নিলেন। সেইভাবে সমাজ রক্ষার প্রয়াসে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে তাঁদের পরাক্রমের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাঁদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানান। এই ধরনের সাক্ষাৎকারের সময়ে তাঁর ধৈর্য তথা আন্তরিক প্রেমের অভিব্যক্তি শোকার্ত পরিবারগুলিকে অভিভূত করে। বেশ কয়েক জনকে দাঙ্গার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে ডাক্তারজী আশ্বাস দেন যে "আপনারা চিন্তা করবেন না। তাঁদের মুক্তির জন্য সবরকম ব্যবস্থা করা হবে।" বাড়ীতে গুরুজনদের উপরে যেমন অন্য সকলের ভরসা থাকে, সেইরকম নাগপুরের সমস্ত মানুষদের ডাক্তারজীর উপর ভরসা ছিল।

নাগপুরের প্রত্যেকটি চৌমাথায় এখন সৈনিকদের সঙ্গীনের চমক প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিল। সেনারা না এলে হিন্দুদের প্রতিকারের ফলে পরাভূত মুসলমানদের অবস্থা আরো খারাপ হত। হিন্দুদের দোকান থেকে প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। 'ওদের ওপর আক্রমণ করে নিজেদের নাক কেটে যাত্রা ভঙ্গ করার' মত অনুতাপ তাদের চোখে-মুখে স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল। ডাঃ মুঞ্জে ও রাজা লক্ষ্মণরাও ভোঁসলের নেতৃত্বে নাগপুরের হিন্দু সভার পক্ষ থেকে উৎপীড়িত ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য একটি সমিতি গঠিত হল। ডাক্তারজীও সমিতির মধ্যে ছিলেন। মামলার জন্য সমিতি অর্থ ও সাক্ষ্য-প্রমাণ একত্র করল। হিন্দুদের পক্ষ থেকে মামলার সওয়াল করার জন্য কয়েকজন উকিলও সমিতির উদ্যোগে নিযুক্ত হলেন।

নাগপুরের বাতাবরণ এমন সহযোগিতাপূর্ণ চৈতন্যযুক্ত তথা গতিমান হয়ে উঠেছিল যে সেই সময়ে হিন্দুদের ক্রমবর্ধমান আত্মবিশ্বাস সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হিন্দুদের আত্মগৌরবকে ব্যক্ত করে "মহারাষ্ট্র" দিনাংক ১১ই সেপ্টেম্বর তার সম্পাদকীয় নিবন্ধে

লেখে—"একথা সত্য যে মুসলমানরা হামলা করার পর হিন্দুরা আধ ঘন্টার মধ্যেই পাড়ায়-পাড়ায় আশে-পাশের লোকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে মুসলমানদের আক্রমণের সম্মুখীন হওয়ার জন্য তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত করে নিল। এর ফলে কোষ্টীপুরার লেঠেলদের সাহায্যে মহাল অঞ্চলের ভদ্র সমাজকে অসহায় অবস্থায় আচ্ছা করে শিক্ষা দেবার ধর্মান্ধ মুসলমান গুণ্ডাদের চক্রান্ত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়। এখন নাগপুরের পুরো হিন্দু সমাজ স্বয়ং আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়ে গেছে। এর পরে আর তারা কখনো মুসলমানদের গুণ্ডামিতে আতঙ্কিত হয়ে পালাবে না। এখন ওরা নিজ স্থানেই নির্ভীক হয়ে দাঁড়িয়ে থাপ্পড়কে থাপ্পড় দিয়ে এবং ঘুসিকে ঘুসি দিয়ে জবাব দেবে।"

এই সম্পাদকীয়তে হিন্দু সমাজের যে বীরত্ব তথা আত্মানুভূতির কথা ব্যক্ত হয়েছে, তা প্রধানতঃ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মুষ্টিমেয় স্বয়ংসেবকদেরই পরাক্রমের পরিণাম ছিল। হিন্দু জাতি যে মৃত নয়, বরং তেজস্বী, পরাক্রমী তথা জীবিত আছে এই সঞ্জীবনী প্রেরণা নাগপুর ও মধ্যপ্রান্তের স্বয়ংসেবকদের শৌর্য তথা ধৈর্যের মাধ্যমে উপলব্ধি হয়েছিল। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের দ্বারা কর্তব্যনিষ্ঠার মাধ্যমে যে প্রয়াস করা হয়েছিল, তা ঐ প্রান্তের মুসলমানদের ক্রম-বর্ধমান আক্রামক প্রবৃত্তির ধারকে ভোঁতা করে দিয়েছিল। এ বিষয়ে শ্রী দাদাসাহেব পরমার্থ লেখেন, "এই প্রহার এমনই শুভ দর্শন প্রমাণিত হয়েছিল যে ১৯২৭-এর পরে আর কোন দিন নাগপুরে দাঙ্গার কথা শোনা যায়নি।"

স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং তার প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হেডগেওয়ারের নাম নাগপুর এবং মধ্যপ্রান্তের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। তরুণদের গতি এখন মোহিতে সঙ্ঘস্থানের দিকে ত্বরান্বিত হল। স্বয়ংসেবকদের সংখ্যা প্রায় এক হাজারে পৌঁছে গেল। নাগপুরের হিন্দু সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সঙ্ঘ এক সম্মান তথা গৌরবের বস্তু হয়ে পড়ল। প্রদীপের চতুর্দিকে পতঙ্গ নিজে থেকেই জুটতে থাকে। পরাক্রমও ঐ রকম আকর্ষক গুণ। এই ঘটনার পরে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ডাক্তারজী এক স্বতন্ত্র ও বিশেষ শ্রদ্ধার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং সকলেই শুভ বিবাহ, যজ্ঞোপবীত ইত্যাদি পারিবারিক মঙ্গল কার্যে তাঁকে আগ্রহপূর্বক নিমন্ত্রণ করত। এই রকম অনুষ্ঠানে ডাক্তারজী পাঁচ-সাতজন স্বয়ংসেবককে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তাঁকে বিদায় জানাবার সময়ে নিমন্ত্রণকর্তা ডাক্তারজীর গলায় মালা পরিয়ে তাঁকে নারিকেল ও টাকা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত অর্পণ করতেন। ঐ সময়ে আখড়ার প্রধানদের এইভাবেই সম্মান করা হত। সাধারণ লোকেরা সঙ্ঘকেও ডাঃ হেডগেওয়ারের অনুশাসনপূর্ণ আখড়া মনে করে এইভাবে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত। বাইরে থেকে কেবল বালকদের নিয়ে খেলাধূলা, ব্যায়ামাদি যেখানে চলে, দুই বছর বয়সের সঙ্ঘকে সাধারণ মানুষ যদি আখড়া মনে করে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

বটবৃক্ষ প্রথম দিকে আশ-পাশের ঝোপ-ঝাড় থেকেও ছোট থাকে, এবং সেই কারণে যদি অজ্ঞ লোকেরা ঝোপের তুলনায় বটবৃক্ষকে অসম্মান করে, তা অস্বাভাবিক নয়। একটি আখড়ায় ওস্তাদের মত মালা ও নারকোল উপহার গ্রহণের সময় আখড়া ও সঙ্ঘ কারুর কাছে সমান মনে হতে পারে, কিন্তু ডাক্তারজীর হৃদয়ের মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কিছু দিনের মধ্যেই সঙ্ঘ ভারতের সীমার মধ্যে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে বটবৃক্ষের মত সম্পূর্ণ ভারতকে নিজ

ছায়ার নিচে, সেই সঙ্গে সুখ ও সম্মানের জীবন যাপনের আশ্বাস অবশ্যই এনে দেবে, যেমন সঙ্ঘ মাত্র দু বছরের জীবনকালের মধ্যেই নাগপুরের হিন্দু সমাজকে এনে দিতে পেরেছে। তা সত্বেও, লোকে যদি আখড়া মনে করে এই কাজের অবমাননা করে, তাতে খিন্ন না হয়ে তাদের সদ্ভাবনাকে প্রেমের সঙ্গে স্বীকার করে তাদেরই সমর্থন নিয়ে সঙ্ঘের বিস্তার করে, তাদের ভুল ধারণা দূর করার সামর্থ্য তথা প্রভাব নির্মাণ করার দৃষ্টি সর্বদা ডাক্তারজীর আচরণের মধ্যে পরিলক্ষিত হত।

বিবেকের সাথে বিজয়, ব্যক্তি তথা সমাজের পক্ষে সুখকর ও স্বাস্থ্যকর। কিন্তু সেই বিজয় যদি বিবেকের পরিবর্তে বিকারের অধীন হয়, তাহলে সেটা পরাভবের প্রথম সোপান হয়ে দাঁড়ায়। ডাক্তারজী একথা বুঝে নিয়েছিলেন যে স্বয়ংসেবকদের মনে একবার যদি এই ভাবনা উৎপন্ন হয় যে আমরা পরাক্রম দেখিয়েছি, তাহলে 'জিতং ময়া' মনোবৃত্তির কারণে আকাশকেও ক্ষুদ্র মনে হবে এবং এই অহংকারের কারণে যে সেবাভাব ও সমষ্টি জীবন গড়ে তোলার জন্য সঙ্ঘের স্থাপনা হয়েছে ঐ লক্ষ্যকেই জলাঞ্জলি দেওয়া হবে।

অতএব নাগপুরের বায়ুমণ্ডল যখন ক্রমে স্বাভাবিক ও পরিষ্কার হতে লাগল তখন তিনি ধীরে-ধীরে স্বয়ংসেবকদের মনোভাব বোঝার চেষ্টা শুরু করে দিলেন। তিনি তাদের মনের মধ্যে এই বিশুদ্ধ ভাব অংকিত করার প্রয়াস করলেন যে সমাজের অঙ্গ হওয়ার দরুন আমরা সমাজ আক্রান্ত হলে এগিয়ে গিয়ে সেই আঘাত স্বীকার করব এবং সমাজকে রক্ষা করার জন্য আক্রমণকারীদের উপর প্রত্যাঘাত করব — তার দ্বারা আমরা আমাদের কর্তব্য মাত্র পালন করেছি বলে জানব। মা যেরকম নিজের সন্তানের জন্য চিন্তা করেন। অথবা সন্তানরা মাতা-পিতার সেবা করে — সেটা যেমন স্বাভাবিক, সমাজের প্রতি কর্তব্যপালনও সেইরূপ স্বাভাবিক মনে হওয়া উচিত। তার জন্য আত্মশ্লাঘা বা বৃথা গর্ব বোধ করা উচিত নয়। উপরন্তু নিজেদের পরাক্রমের কথা বড়াই করে জাহির না করে, অথবা স্বয়ংসেবকরা যে দুঃখ সহ্য করেছে, তার জন্য কান্নাকাটি না করে আমরা সমাজের অর্থাৎ জনতা-জনার্দনের যে অল্প-স্বল্প সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছি, তার দরুন আনন্দিত হয়ে কর্তব্য-পালনের সন্তোষমাত্রকেই মনে স্থান দেওয়া উচিত। সেই সময়ে মহাত্মাজীর মত মহাপুরুষদের মনেও এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে হিন্দু-সংগঠন শুধু 'মুসলমানদের পিটুনি দেবার জন্যই' করা হয়। তাহলে তাঁর ভক্তদের কথা বলাই বাহুল্য। তারা তো আরো কয়েক পা এগিয়ে কথা বলত। কিন্তু হিন্দু সংগঠনকে সমর্থনকারীদের এই প্রতিক্রিয়ামূলক কথা বলা হত যে মুসলমানদের পরাজিত করার জন্যই হিন্দু সংগঠন প্রয়োজন। এই কারণেই হিন্দু-মুসলিম একতার মালা জপতে-জপতে গান্ধীজীর ভ্রান্ত ধারণা দৃঢ়তর হয়ে উঠেছিল। ডাক্তারজী এইরূপ ধারণাকে কখনই আমল দেননি। তিনি দাঙ্গার পূর্বে ও পরে একই কথা সব সময়ে বলতেন যে "পরস্পরের সমস্ত কৃত্রিম, বাহ্যিক ভেদাভেদ মুছে ফেলে সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজ যদি ঐক্য ও প্রেমের ভাবনা নিয়ে আমরা সবাই 'হিন্দু জাতি-রূপী গঙ্গার বিন্দু' এই কথা অনুভব করে উঠে দাঁড়াই, তাহলে দুনিয়ার কোন শক্তি হিন্দুর দিকে বক্র দৃষ্টিতে দেখার সাহস করবেনা।" সব কিছুর মূল অনুসন্ধান করে তার উপর নিজের আস্থা গড়ে তোলাই ছিল ডাক্তারজীর বৈশিষ্ট্য।

১৫. সঙ্ঘের রচনা

সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সংখ্যা এবং সমাজের উপর তার প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধিলাভ করছিল। কিন্তু পরমপূজনীয় ডাক্তারজী কিছুটা চিন্তিত ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল যে মানুষ ভাবাবেগবশতঃ কোন কাজকে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং কিছু দিনের মধ্যে কাজের নবীনতা শেষ হয়ে গেলেই তার থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়ে ব্যক্তিগত কাজ-কর্মে সংলগ্ন হয়ে পড়ে। অতএব, ডাক্তারজী সব সময়ে এই প্রয়াস করতেন যে সঙ্ঘে যে স্বয়ংসেবকেরা আসে তাদের মনে অখণ্ড প্রেরণার স্রোত — অর্থাৎ হিন্দু রাষ্ট্রের চিন্তাধারা যেন স্থির তথা দৃঢ় হয়ে ওঠে এবং তাদের মনের মধ্যে হিন্দু রাষ্ট্রের প্রতি প্রখর ভক্তিভাব যেন সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। এই উদ্দেশ্যে তিনি বৈঠক, বৌদ্ধিক-বর্গ এবং ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার সূত্রবদ্ধ যোজনা তৈরী করলেন। সঙ্ঘস্থানে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে যে স্বয়ংসেবকেরা কাজ করত, তাদের মধ্যে কয়েকজন বিপ্লবীদের সংস্পর্শেও এসেছিল। সঙ্ঘস্থানের কার্যক্রমের পর 'কুশ পথক'-এর কয়েকজন তরুণ গোপনে নিজেদের বৈঠক করত এবং ওরা এমন কোন যোজনার কল্পনা করছিল যাতে সাধারণ লোকের উপর বেশ একটা প্রভাব বিস্তার করা যায়। কুড়ি-একুশ বছরের তরুণ কার্যকর্তা শ্যামরাও গাডগে ঐ পথকের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর বিপ্লবের কাজের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল, সেই কারণে তাঁর পথকের কিশোর স্বয়ংসেবকদের ঐদিকে টানার এবং বিপ্লবের দীক্ষা দেবার চেষ্টা করছিলেন। এছাড়া বাজেয়াপ্ত বৈপ্লবিক সাহিত্য পড়ার ঝোঁকও তরুণদের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল। অতএব, পালে অনুকূল বাতাস লাগার ফলে দ্রুতগতির নৌকার মত তরুণ হৃদয়গুলিও বিপ্লবের রঙীন স্বপ্ন অতি দ্রুত গতিতে দেখতে শুরু করে দিল।

সার্বজনিক কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে ডাক্তারজী স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে মেলামেশার জন্য যতটা সময় দেওয়া দরকার তা দিতে পারছিলেন না। অতএব, যারা শাখায় আসত, তাদের মধ্যে কিছু স্বয়ংসেবক এবং বাইরের লোকেরাও সঙ্ঘকে আপ্পা সোহোনীর সঙ্ঘ, মার্তণ্ডরাও জোগের সঙ্ঘ অথবা মহাসভার পথক ইত্যাদি বলত বলে শোনা যায়। কিন্তু ১৯২৭-এর পরে ডাক্তারজী অন্য কাজগুলি থেকে নিজেকে অনেকটা সরিয়ে নিয়ে স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে বেশী মেলা-মেশা করতে শুরু করলেন। তার ফলে স্বয়ংসেবকেরা সত্ত্বর অনুভব করল যে সঙ্ঘ কোন ব্যক্তি-বিশেষের নয়, সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজের সংগঠন। ক্রমে তারা একথাও উপলব্ধি করতে লাগল যে লাঠি ও সামরিক শিক্ষণ, যাতে তারা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে, সেটাই সঙ্ঘের লক্ষ্য নয়, বরং সমাজকে একত্র করার এবং তার অন্তঃকরণে নিজের স্বত্ব তথা পুরুষার্থের আবিষ্কার করার জন্য শাখায় গৃহীত ঐ শিক্ষণগুলি — পরিস্থিতি-সাপেক্ষ সাধন মাত্র।

স্বয়ংসেবকদের সাথে ডাক্তারজীর সম্পর্ক যতই বৃদ্ধি পেতে থাকল, স্বয়ংসেবকদের মনের মধ্যে সঙ্ঘের কল্পনা ততই সুস্পষ্ট হতে থাকল। সঙ্ঘের দুইজন কার্যকর্তা — শ্রী বাবাসাহেব আপটে এবং শ্রী বর্বে, করঞ্জকরের প্রাসাদের একটি কক্ষে থাকতেন। ডাক্তারজী তাঁদের বাসস্থানে যেতেন এবং সেখানে যে স্বয়ংসেবকেরা যেত তাদের সঙ্গে খুব খোলামেলা কথাবার্তা বলতেন। কথায়-কথায় সময় চলে যেত এবং অনেকবার আপটেজী ও বর্বের আগ্রহের দরুন তাঁদের সঙ্গে ভোজনও করতে হত। ওঁদের রুটি বেশ মোটা-মোটা হত, তাই ডাক্তারজী ওগুলোকে 'রোট' বলে অভিহিত করতেন। ভোজন করার সময়ে ঐ রুটিগুলিকে 'টনিক' বলে বেশ পরিতৃপ্তি সহকারে খেতেন এবং হাস্য-পরিহাসের মধ্যে ভোজনও এক অত্যন্ত মধুর কার্যক্রমে পরিণত হত।

ঐ বছর 'জেনারেল' শ্রী মঞ্চরসা আওয়ারী শস্ত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা দূর করার দাবী নিয়ে নাগপুরে এক আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ঐ আন্দোলনে হাতিয়ার নিষেধ আইন ভঙ্গ করে হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে মিছিল বের করা হত। পুলিশ ওদের গ্রেপ্তার করত ও মামলা চালাত। মামলায় আন্দোলনকারীরা বলত যে "আমরা বাংলার রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য এই শস্ত্র নিজেদের কাছে রেখেছি।" এই আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল ইতোয়ারী স্টেশনের বিপরীত দিকে 'গাদা ক্যাম্প' নামক পরিচিত অঞ্চলের একটি ঝুপড়িতে। ডাক্তারজী মাঝে-মাঝে কয়েকজন স্বয়ংসেবককে নিয়ে রাত্রিবেলায় ঐ ক্যাম্পে যেতেন এবং কিছুক্ষণ আওয়ারীজীর সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসতেন। ডাক্তারজীর ধারণা হয়েছিল যে পদদলিত রাষ্ট্রকে কোন-না-কোন সময়ে নিজের উত্থানের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের পথ গ্রহণ করতে হতে পারে। সেই কারণে তাঁর মনে হত যে যদিও এই আন্দোলনের ফলে প্রত্যক্ষ হাতিয়ার-নিষেধ বন্ধ হয়নি, তথাপি আমাদের মনে অন্ততঃ শস্ত্রের চিন্তা শুরু হত। এই জন-জাগরণের মূল্য কম নয়। সেই কারণে আওয়ারীজীর আন্দোলন ডাক্তারজীর নৈতিক সমর্থন লাভ করেছিল। মহাত্মাজী আওয়ারীজীকে লিখেছিলেন — "আমি আলোক স্তম্ভ। আমার কাছে এস" ("I am the light house. come to me.")। তাঁর মতে এই আন্দোলন বিপথগামী নৌকার মত হিংসার শিলাখণ্ডে ধাক্কা লেগে চূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু ডাক্তারজী তার সীমাবদ্ধ গুরুত্ব উপলব্ধি করে যথাসম্ভব তাকে সাহায্য করেছিলেন। আন্দোলনের নেতারা সভায় আগত শ্রোতাদের কাছে তলোয়ারের ব্যবস্থা করতে বলেন। তদনুযায়ী ভোঁসলে জমানার রক্ষিত কয়েকটি তলোয়ার এনেও দেওয়া হয়। আন্দোলনের নেতারা ঐ সব তলোয়ার হাতে নিয়ে মিছিল বের করার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। নিঃসন্দেহে সরকার মিছিলকারীদের গ্রেপ্তারের সঙ্গে-সঙ্গে তলোয়ারগুলিও বাজেয়াপ্ত করে নিত। ডাক্তারজীর এই ব্যাপারটা মনঃপুত হল না যে নিজেরা হাতে করে সরকারের হাতে এমন সুন্দর তলোয়ারগুলি সঁপে দেওয়া হোক। ডাক্তারজী শ্রী আওয়ারী ও মহাত্মা ভগবানদীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন, "পরাধীন দেশ না জানি কখন ও কীভাবে নিজ স্বাধীনতার জন্য সংঘর্ষ করার সুযোগ লাভ করতে পারে। নিজেরা স্বয়ং নিজেদের হাতিয়ারগুলিকে এইভাবে খুইয়ে বসা অত্যন্ত ভুল কাজ হবে।" তখন আওয়ারীজী জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে কী করা যায়?" ডাক্তারজী এ ব্যাপারে তাঁর যোজনা ব্যক্ত করেন।

আসল তলোয়ারের বদলে টিনের তলোয়ার তৈরী করিয়ে তাতে শান করিয়ে নিলেই হবে। এই যোজনা সবারই পছন্দ হল। এর পরে আন্দোলনের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত এই প্রকার তলোয়ারই মিছিলে ও সত্যাগ্রহে ব্যবহার করা হয়। ডাক্তারজীর এই পরামর্শের পূর্বে প্রায় এক হাজার আসল তলোয়ার সরকারের হস্তগত হয়েছিল। কিন্তু বাকী শস্ত্রগুলি ডাক্তারজী বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে কেউ যে কোনভাবেই উঠে দাঁড়াক না কেন, ডাক্তারজী তাকে সাধ্যমত সাহায্য অবশ্যই করতেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে তিনি অতি দূরদৃষ্টি সহকারে বিবেচনা করতেন।

নাগপুরের দাঙ্গায় হিন্দুদের সাফল্য দেশের নেতাদের কাছে খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা বলে মনে হত, কারণ সেই সময়ে ভুলেও কোথাও এমন অভিজ্ঞতা হতনা যে মুসলমানদের সুপরিকল্পিত আক্রমণের প্রতিরোধে হিন্দুরা দাঁড়াতে পেরেছে। অতএব, মুসলমানদের আক্রমণ মানেই হিন্দুদের বিনাশ — এই সমীকরণই স্বাভাবিক হয়ে পড়েছিল। সেই বছর হিন্দু মহাসভার অধিবেশন ডাঃ বাঃ শিঃ মুঞ্জের সভাপতিত্বে কর্ণাবতীতে (আমেদাবাদ) হবার কথা ছিল। ডাঃ মুঞ্জে এবং কর্ণাবতীর অভ্যর্থনা সমিতির বিশেষ আগ্রহ ছিল যে ডাঃ হেডগেওয়ার যেন অধিবেশনে অবশ্য আসেন এবং তাঁর প্রভাবশালী সংগঠনের বিষয়ে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমবেত কার্যকর্তাদের অবগত করেন। কোন কারণে ডাক্তারজীর পক্ষে অধিবেশনে যাওয়া সম্ভব হলনা। সেই জন্য তিনি শ্রী বালাজী হুদ্দার প্রমুখ সাতজন সংঘ কার্যকর্তাকে সেখানে পাঠালেন। তাঁরা নিজেদের সঙ্গে কোট, সাফা (পাগড়ি), বেল্ট, লংবুট ইত্যাদি গণবেশ নিয়ে গিয়েছিলেন।

অধিবেশনের বিভিন্ন প্রান্তের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হল। প্রত্যেক স্থানের বিষয়ে একই হতাশাজনক সুর শোনা গেল যে "আমরা মুসলমানদের সামনে দাঁড়াতে পারছিনা।" অনেকে প্রস্তাব করলেন যে এই অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য আমাদের সংগঠন তৈরী করা উচিত। মধ্যপ্রান্তের প্রতিনিধির যখন বলার সুযোগ হল তখন ডাঃ মুঞ্জের নির্দেশ অনুসারে সঙ্ঘের তরুণ কার্যকর্তা শ্রীবালাজী হুদ্দার উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর গণেবেশ পরিহিত দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ মূর্তি দেখে সংগঠনের মাধ্যমে জাগৃতির অনুমান সকলেই করতে পারলেন। কারণ তাঁর ঋজু ভঙ্গী, দাঁড়ানোর মধ্যেও আত্মবিশ্বাস পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তাঁর বক্তৃতার মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিজয়াকাঙ্ক্ষার ওজস্বিতা প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। তিনি বলেন, "আমি সেই প্রান্ত থেকে এসেছি যেখানে হিন্দুরা মুসলমানদের উদ্দণ্ডতাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। আমাদের সমাজের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা দূর করার এই জাদু ডাক্তার কেশবরাও বলিরাম হেডগেওয়ারের নেতৃত্বে গঠিত সংগঠনের দ্বারা সম্ভব হয়েছে।" ১৯২৭ সালে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে সঙ্ঘের নাম বিভিন্ন প্রান্তের নেতাদের কর্ণগোচর হল এবং হিন্দুদের যে পরিস্থিতি হতপ্রভ করে রেখেছে তার প্রতিকারের কোন প্রভাবশালী উপায়-যোজনা যে হতে পারে, তার চিন্তা তাঁদের মনে উদয় হতে থাকে।

এই বছর মধ্যপ্রান্তে সঙ্ঘের কাজ উন্নত হতে থাকে। গণেশোৎসব ও বিভিন্ন আন্দোলনের কারণে নানা স্থানের জনসাধারণ তথা বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে ডাক্তারজীর সম্পর্ক স্থাপিত

হয়েছিল। তাঁর স্বভাব অনুযায়ী এই সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও প্রেমপূর্ণ। চতুর্দিকে বিস্তৃত এই বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে তিনি সঙ্ঘের কাজকে গ্রামে-গ্রামে পৌঁছে দেবার প্রয়াস শুরু করে দেন। বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের সময়ে তিনি নিজের সাথে ভগোয়া ধ্বজ, হনুমানজীর ছবি এবং প্রতিজ্ঞার লিপি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তখনকার দিনে শাখা শুরু করার পদ্ধতি ছিল এইরকম — শহরের কিছু পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একত্রিত করে তাঁদের সামনে হিন্দু সমাজের পরিস্থিতি এবং তাকে উন্নত করার একমাত্র প্রভাবী উপায় সংগঠন — এই কথা বোঝানো হত। তাঁদের কাছে আগ্রহ করা হত যে যদি তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে এই সংগঠনের কাজ করতে চান তাহলে নাগপুরের মত সেখানেও গৈরিক ধ্বজ লাগিয়ে তার ছত্রছায়ায় প্রতিদিন হিন্দুদের সমবেত করতে হবে এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের মধ্যে অনুশাসন তথা শক্তি নির্মাণ করে সংরক্ষণ-ক্ষমতার বৃদ্ধি করতে হবে।

ইতিপূর্বেই নাগপুরে সংগঠনের বর্ধিত প্রভাব সম্বন্ধে বহু মানুষ অবগত হয়েছিলেন। সেই জন্য ডাক্তারজীর অভিজ্ঞতা লব্ধ চিন্তাধারা তাঁদের মনকে আকৃষ্ট করত। তাঁর বলার ভঙ্গী ছিল অত্যন্ত সরল। সেই সঙ্গে মানুষের হতাশাজনক পরাভূত ও স্বার্থান্ধ জীবন দেখে তাঁর হৃদয়ে যে উদ্বেগ সঞ্চারিত হয়েছিল, তাঁর প্রতিটি শব্দের মধ্যে সেই ভাবনা প্রতিফলিত হত। অনেক সময়ে ইংরেজ ও অন্য আক্রমণকারীদের বিষয়ে যখন উল্লেখ করতেন, তখন তাঁর ভাষণের মধ্যে এমন ভাবাবেগ প্রকাশ পেত যা ভগবান কৃষ্ণের কালিয় মর্দন নৃত্যের মূর্ছনার মত প্রতীত হত। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল গম্ভীর ও দৃঢ় প্রত্যয়যুক্ত। কিন্তু সমাজের বিকলাঙ্গ তার উল্লেখ করার সময়ে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যেত আর কখনো-কখনো তাঁর ও শ্রোতাদেরও চক্ষু সজল হয়ে উঠত। তাঁকে দেখে মনে হত যেন হিন্দু সমাজের প্রতি তাঁর প্রেম সাকার হয়ে উঠেছে। এই সব বৈঠকের শেষে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদের সঙ্ঘের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করার অনুরোধ করে পকেট থেকে ভগোয়া ধ্বজ বের করে প্রতিজ্ঞা দেবার ব্যবস্থা করতেন। তাঁর অনুরোধ স্বীকার করে অনেকেই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতেন। কিছুকাল পর্যন্ত ডাক্তারজীর দ্বারা শুরু করা সঙ্ঘের স্বরূপ এই ধরনের বৈঠকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিছুদিন পরে ঐ বৈঠকই দৈনন্দিন শাখায় রূপান্তরিত হত। দাঙ্গার পরে নাগপুরের ধন্তোলী অঞ্চলে দ্বিতীয় শাখা শুরু হল। এই সময়েই আজন্ম সেবাব্রত ও বীরব্রতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রতিজ্ঞার সংস্কার সঙ্ঘে আরম্ভ হল। স্বয়ংসেবকেরা এই প্রতিজ্ঞায় সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর এবং নিজেদের মহান্ পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে হিন্দু রাষ্ট্র নির্মাণের ও তার অভিব্যাপ্তির জন্য তন-মন ও ধন দ্বারা আজন্ম এবং প্রামাণিকতার সঙ্গে প্রচেষ্টারত থাকার সংকল্প প্রকাশ করত। কথিত আছে যে প্রতিজ্ঞার এই রূপটির ডাক্তারজীর বিপ্লবী দলের প্রতিজ্ঞার সঙ্গে অনেকটা মিল ছিল। সঙ্ঘের প্রতিজ্ঞার প্রথম কার্যক্রম ১৯২৮-এর মার্চ মাসে নাগপুর থেকে তিন-চার মাইল দূরে 'স্টার্কি পয়েন্ট' নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হল।

এই পার্বত্য অঞ্চল নাগপুর-অমরাবতী সড়কের সংলগ্ন ঘনবৃক্ষে পরিপূর্ণ। ডাক্তারজী নিরানব্বই জন নির্বাচিত স্বয়ংসেবককে সঙ্গে নিয়ে এখানে এলেন এবং পাহাড়ের পূর্ব দিকের ঢালে কুয়োর কাছে পবিত্র গৈরিক ধ্বজ উত্তোলন করে তার সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞার

ভাব-গম্ভীর কার্যক্রম সম্পন্ন হল। সারাদিন স্বয়ংসেবকেরা সেখানেই থেকে সন্ধ্যায় ফিরল। প্রতিজ্ঞার প্রক্রিয়ার এই রূপ ছিল যে ডাক্তারজী প্রতিজ্ঞা বলতেন এবং একজন করে স্বয়ংসেবক ধ্বজের সামনে দাঁড়িয়ে ঐ প্রতিজ্ঞা শান্তিপূর্বক এবং চিন্তা সহকারে উচ্চারণ করত। সেই নিরানব্বইজন কৃতসংকল্প স্বয়ংসেবকদের মধ্যে আজও অনেকে বর্ধিত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। ঐ সংস্কারের সফলতার এটাকেই মাপদণ্ড বলে গ্রহণ করা উচিত। সেই সময়ে প্রতিজ্ঞা গ্রহণকারী একজন কার্যকর্তা বলেন, "প্রথম দিন প্রতিজ্ঞিত তরুণদের নাম আজও — যদি গাছটি না ভেঙে পড়ে থাকে, তাহলে তার উপর অংকিত দেখা যাবে।" সেই অ-শাশ্বত নামগুলি আজও লিখিত অবস্থায় পাওয়া যাক আর না যাক, কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে সেই সময়কার হিন্দু তরুণদের হৃদয়ে ডাক্তারজী কর্তৃক অংকিত ধ্যেয়বাদ হিন্দুস্থানে শাশ্বত বর্ধিষ্ণু এবং জয়িষ্ণু বলে প্রমাণিত হবে। নিজের সার-সর্বস্ব রাষ্ট্রমাতার চরণকমলে অর্পণকারী কর্মযোগীর পুণ্য প্রতাপ তথা নিজের সামর্থ্য দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার দরুন মনুর মৎস্যের সমান বৃদ্ধি লাভ করতে-করতে হিন্দু রাষ্ট্রকে মহাপ্রলয় থেকে রক্ষার সামর্থ্য অর্জন করার জন্যই হিন্দু রাষ্ট্রের পুনরুত্থানের ঐ মহামন্ত্রের উচ্চারণ করা হয়েছিল।

এই সময়ে ডাক্তারজীর পক্ষে এক অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা ঘটল। যাঁর সঙ্গে তাঁর মন-প্রাণ সব কিছু এক হয়ে গিয়েছিল, সেই শ্রীভাউজী কাবরে ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেলেন। বিপ্লবের কাজ মন্দীভূত হওয়ার পর ভাউজী নাগপুর ও সেলুঘোরাড এই দুই স্থানেই যাতায়াত করতেন এবং কবিরাজী ও কৃষিকার্যের দ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন। ডাক্তারজীর প্রত্যেক কাজে তিনি তাঁর সঙ্গী ছিলেন। সঙ্ঘের শাখা শুরু করার জন্যও হিঙ্গনী প্রভৃতি বহু স্থানে তিনি ডাক্তারজীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মধ্যে এই কল্পনা সুদৃঢ়ভাবে স্থায়ী হয়েছিল যে বিপ্লবের জন্য পরে অনুকূল সময় যখন আসবে ততদিন পর্যন্ত শান্তিপূর্বক কালাতিপাত করা উচিত। এই কারণেই তিনি ১৯২০ সালের পূর্বে যে অস্ত্র-শস্ত্র ও অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল, সে সমস্ত নানা স্থানে নিরাপদে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। মাঝে-মাঝে বহু বিপ্লবী তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন — "এর পর কী?" মৃত্যুর পূর্বে নাগপুর থেকে যাওয়ার সময়ে শ্রী নানাজী পুরাণিক ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, "এক মাসের জন্য গ্রাম থেকে ঘুরে আসি, তারপর চিন্তা করব।" ভাউজী গ্রামে গেলেন। সেই সময়ে তাঁর দেহ জ্বরে পুড়ে যাচ্ছিল। তথাপি জনৈক অসুস্থ ব্যক্তিকে কর্তব্যের খাতিরে দেখতে হেঁটেই চলে গেলেন। এই অত্যাচার শরীর সহ্য করতে পারলনা। রোগ আরো বেড়ে গেল। দুর্বলতাও বৃদ্ধি পেল। তিনি নিজের কাছে রাখা কিছু ওষুধ খেলেন, কিন্তু তাতে কোন লাভ হল না। উল্টে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেল। ডাক্তারজী নাগপুরে এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাবরেজীর পরিবারের সকলকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে চলে গেলেন। যাওয়ার পথে তিনি ওয়ার্ধা থেকে ডাঃ দেশমুখকেও নিজের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। তিন দিন ধরে সব রকম চিকিৎসা করা হল, কিন্তু কেউ কিছুই করতে পারলনা। বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতে-দেখতে ভাউজী ডাক্তারজীর কোলে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়লেন। যাঁর জন্য ডাক্তারজী সব কিছু করতে পারতেন, তাঁর চোখের

সামনে দিয়ে যমদূত তাঁকে নিয়ে চলে গেল। ঘোরাড নদীর ধারে ভাউজীর অন্তিম সংস্কার সম্পন্ন হল। সেই সময়ে নদীর ধারে একটি টিলার উপর বসে ডাক্তারজী শিশুর মত ক্রন্দন করছিলেন। এই করুণ দৃশ্য আজও অনেকের মনে গেঁথে আছে।

সেখান থেকে ফিরে এসে বহু দিন পর্যন্ত ভাউজীর কথা স্মরণমাত্র ডাক্তারজী শোকাকুল হয়ে পড়তেন। ১৯২৮ সালে সঙ্ঘের প্রথম সৈনিক শিবিরের একটি প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রকার্যের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশভক্তিতে পরিপূর্ণ তরুণদের পথক সঞ্চলন করছিল এবং গণবেশধারী ডাক্তারজী শিবির দেখার জন্য আগত নাগরিকদের সেই দৃশ্য অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে দেখাচ্ছিলেন। এমন সময়ে স্বর্গীয় ভাউজীর এক শিষ্য সেখানে এসে উপস্থিত হল। তাকে দেখেই ডাক্তারজীর ভাউজীর কথা মনে পড়ে গেল। তিনি তাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গেলেন এবং "এই দৃশ্য দেখার জন্য ভাউজী আজ বেঁচে নেই" — এই কথা বলতে-বলতে কাঁদতে লাগলেন। এমনই আন্তরিক ছিল ডাক্তারজীর বন্ধুপ্রীতি!

সঙ্ঘের প্রচারের জন্য ডাক্তারজীকে অহরহ পরিভ্রমণে যেতে হত। সংবাদ প্রেরণের জন্যও চিঠি-পত্রের পরিবর্তে বিশ্বস্ত ব্যক্তিদেরই যাতায়াত করতে হত। সঙ্ঘ আরম্ভ হবার পর তিন-চার বছর ডাক্তারজী ডাকের মাধ্যমে চিঠিপত্র খুবই কম পাঠাতেন। কোথাও সংবাদ বা নির্দেশ পাঠাতে হলে চিঠি লিখে কারুর হাত দিয়েই পাঠাতেন। এবং খুব জরুরী বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলে মৌখিক বার্তা প্রেরণেরই পদ্ধতি ছিল। তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্ত ছিল যে সঙ্ঘকার্যের ভিত্তি বেশ শক্তপোক্ত না হওয়া পর্যন্ত সরকারের বক্র দৃষ্টি যাতে না পড়ে তার জন্য কাগজের ঘোড়-দৌড় করা উচিত নয়। সেই সময় কোন সংস্থা শুরু হলেই তার উদ্যোক্তারা নিজেদের ঢোল নিজেরাই পেটানো পছন্দ করতেন। কিন্তু ডাক্তারজী সঙ্ঘের ব্যাপারে প্রসিদ্ধি-পরাঙমুখতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। দেশের তৎকালীন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন এবং রাষ্ট্রের উজ্জ্বল পরম্পরাকে চিরন্তন রাখার বরদান নিজের তপস্যার বলের মাধ্যমে প্রাপ্ত করার উদ্দেশ্যেই সংস্থাসমূহের স্থাপনা করা হয়। কিন্তু আত্মবিস্মৃতির ফলে যে রাষ্ট্র অধোগতি লাভ করেছে সেখানে অলি-গলিতে নানা সংস্থা গজিয়ে উঠতে দেখা যায়। সেখানে কোন গঠনমূলক কাজ করার পরিবর্তে দু-চার জন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষের লোকপ্রিয়তা অর্জনের বাসনা চরিতার্থ করাই এই সব সংস্থার বাস্তবিক উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। সেই কারণে প্রচার তথা প্রদর্শনের হাস্যাস্পদ প্রচেষ্টাই দেখা যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবাসীদের এই প্রবৃত্তি সম্বন্ধে এক পত্রে লিখেছিলেন, "প্রত্যক্ষভাবে কিছু সাফল্য অর্জন না করা পর্যন্ত আমরা যেন অন্তরালেই থাকি, একথাই আমি বলতে চাই। ...... সেই সময় পর্যন্ত আমরা যেন পিছনে থেকে কেবল নিজেদের কাজ করে চলি। কিন্তু আমাদের দেশের ভাইদের প্রবৃত্তি এর ঠিক বিপরীতই দেখা যাচ্ছে। তারা নিজেদের অত্যাবশ্যক এবং সাধারণ ব্যবস্থার পরিপূরণের কাজ যা পর্দার অন্তরালে থেকেও করা যেতে পারে — তার দিকে কেউ মন দেয় না। তাদের সমস্ত লক্ষ্য বাইরে থেকে লোক দেখানো ও ঘৃণ্য প্রদর্শনের উপর কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে।" ডাক্তারজীর কার্যের উৎস রাষ্ট্রোত্থানের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নিহিত ছিল, এই কারণে প্রচার অথবা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার

পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে এক শক্তিশালী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার দৃষ্টি নিয়েই তিনি সম্পূর্ণ তন্ত্রের বিষয়ে বিবেচনা করেছিলেন।

'ব্যক্তি-নিষ্ঠার স্থানে বিশুদ্ধ তত্ত্ব-নিষ্ঠাই' জনমানসে জাগ্রত করার বিশেষ উদ্দেশ্যে এই তন্ত্রের রচনা করা হয়েছিল। এর মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য কথা হল সংগঠনের গুরুর স্থানে নিজেকে অথবা কোন ব্যক্তিবিশেষকে প্রতিষ্ঠিত না করে ডাক্তারজী পরম পবিত্র ভগোয়া ধ্বজকে ওই দিব্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই কারণেই একেবারে গোড়া থেকে এই পদ্ধতির সূচনা করা হয়েছিল যে স্বয়ংসেবকরা যে সঙ্ঘ স্থানে প্রতিদিন একত্রিত হয় সেখানে প্রথমে ধ্বজ উড্ডীন করে তাকে অনুশাসন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করা এবং তার ছত্রছায়াতেই সব কার্যক্রম করা হবে।

স্বয়ংসেবকদের মধ্যে তত্ত্বনিষ্ঠাকে দৃঢ়তর করার প্রচেষ্টার সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্তারজীর সামনে এই প্রশ্নও উপস্থিত হল যে প্রতিদিনই যে সংগঠন বৃদ্ধি লাভ করে চলেছে তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা থেকে ও কেমন করে একত্র করা যায়। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর মিশুক তথা লোকসংগ্রাহক স্বভাবের দরুন, তাঁর প্রয়োজনের কথা জানার সঙ্গে-সঙ্গেই বন্ধুদের কাছ থেকে অর্থ পাওয়া যেত এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজন পূরণ হয়ে যেত। কিন্তু তাঁর সব সময়ে মনে হত এইভাবে কোন রকমে কাজ চালিয়ে নেবার পদ্ধতির দ্বারা রাষ্ট্রব্যাপী সংগঠনের ব্যবস্থা চলতে পারেনা, এবং সেটা সঠিক পদ্ধতিও হতে পারেনা। তার জন্য এমন কোন স্থায়ী যোজনা করা দরকার যাতে আলাদা ভাবে প্রয়াস না করে ক্রম-বর্ধমান পরিমাণে অর্থ সংগঠনের ভাণ্ডারে সংগৃহীত হতে থাকে। সংগঠনের জন্য অন্য লোকের কাছে পয়সা চাইতে নিজেদের মনে সংকোচ ও হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়, এবং যারা সাহায্য করে তাদের মনেও এই ভাব জাগতে পারে যে আমরা ডাক্তারজী তথা সঙ্ঘের খুব উপকার করছি। বৃক্ষ থেকে পাকা ফল যত সহজে মাতৃভূমির কোলে পতিত হয়, অথবা শ্রাবণ মাসে পারিজাত বৃক্ষকে একটু নাড়া দিলেই সুকোমল সুরভিযুক্ত ফুলগুলির যেমন সহজেই বর্ষণ শুরু হয়ে যায়, সেইভাবে কোনো সংস্থার প্রতি মানুষের মনে আত্মীয়তার কারণে যদি অর্থ পাওয়া যায়, তবেই তা সংস্থা ও দাতা উভয়ের পক্ষে সন্তোষজনক ও কল্যাণকর হয়।

ডাক্তারজী উপলব্ধি করলেন যে আত্মীয়তা ও ভক্তির দ্বারাই এরূপ কল্যাণকর অবস্থার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এই উপলব্ধির পরিণামস্বরূপ তিনি এমন এক পদ্ধতির উদ্ভাবন করলেন যার ফলে যে অর্থ প্রদান করবে তার মনে প্রসন্নতা ও পরিতৃপ্তির সঞ্চার হবে। কাজের প্রতি সে তার আত্মীয়তা ও আন্তরিকতা ব্যক্ত করতে পারবে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্ঘের অর্থভাণ্ডারও পরিপুষ্ট হবে। এই অভিনব গুরু দক্ষিণার পদ্ধতির তিনি প্রবর্তন করলেন। এমন দুগ্ধবতী গাভী পাওয়া কঠিন যে পদাঘাত না করে কণামাত্র খেয়ে এক মণ করে দুধ দেবে। এ কাজটিও ছিল সেই রকমই কঠিন। কিন্তু নিঃস্বার্থ তথা অনন্য ভক্তি কণা-মাত্র না খেয়েও এক মণের বেশী দুধ দিতে সক্ষম কামধেনুর সমান হয়। ডাক্তারজী এই তথ্যটির সাক্ষাৎকার লাভ করেছিলেন এবং এই গভীর তথা অনন্য ভক্তি ভাবনা উৎপাদনকারী কাজই তিনি সঙ্ঘের মাধ্যমে অখণ্ডভাবে করে চলেছিলেন। সেই কারণেই যাচনা না করেও দেশব্যাপী

সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ অব্যাহত রূপে পেয়ে চলেছে। যেমনভাবে ভগোয়া ধ্বজকে সবার সম্মুখে উপস্থাপন করে হিন্দুদের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, ত্যাগ ও ভোগ, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সবার পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনকারী পরম্পরাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, সেইভাবে তিনি তরুণদের মনের উপর এই সংস্কারও অঙ্কিত করে দিলেন যে আমরা এই পতাকার সুতোর মত রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত অবয়ব, তার উৎকর্ষের মধ্যেই আমাদের কর্তব্যকে 'ইদং ন মম' বলে তার চরণে অর্পণ করাকেই জীবনের সার্থকতা বলে মনে করব।

আমাদের ধর্মের প্রথা অনুসারে আষাঢ় পূর্ণিমার দিন ব্যাসপূজন অথবা গুরুপূজন অনুষ্ঠিত হয়। স্বয়ংসেবকদের মনে গুরুর প্রতি ভক্তিভাব তথা সমর্পণবৃত্তির সংস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে ডাক্তারজী সঙ্ঘের মধ্যেও এই উৎসব পালনের প্রবর্তন করেন। এই দিন সমস্ত স্বয়ংসেবক নিজ-নিজ শ্রদ্ধা ও সামর্থ্য অনুযায়ী, পরম পবিত্র ভগোয়া ধ্বজের সম্মুখে দক্ষিণা অর্পণ করে গুরুর পূজন করে থাকে। ১৯২৮ সালে এই পদ্ধতির সূচনা করা হয়। ঐ সময় পর্যন্ত এবং তার পরেও কয়েক বছর সঙ্ঘের আবশ্যকতাগুলি চাঁদার সাহায্যেই পূরণ করা হত। কিন্তু এই নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে ধনী ও নির্ধন উভয়েই নিজ-নিজ অবস্থা অনুযায়ী যতখানি সম্ভব অর্থ অর্পণের সুযোগ লাভ করল। চাঁদার সঙ্গে যে অধিকারের মনোভাব যুক্ত থাকে, তার থেকে নিজের মনকে বিকার-মুক্ত রেখে সমর্পিত অর্থ — যে কোন প্রয়োজনীয় কাজে সদ্ব্যবহারের জন্য সঙ্ঘের হাতে আসতে লাগল। দক্ষিণা প্রদানের সময়ে যাতে কারুর উপর ভার না পড়ে এবং প্রদত্ত অর্থের পিছনে উপকারের মনোভাব যাতে যুক্ত হয়ে না পড়ে, উভয় দিক থেকেই সংগঠন দ্বারা স্বীকৃত গুরুপূজনের পদ্ধতির প্রচলন বাস্তবিকই অত্যন্ত অভিনবত্বের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে যে ডাক্তারজী সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতির বিকাশ করার সময়ে রাষ্ট্রের পরম্পরা, আমাদের সংস্কৃতির আদর্শ মানব-প্রকৃতি, তার উন্নয়ন ক্ষমতা এবং সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কত গভীরতা তথা সূক্ষ্মতার সঙ্গে বিচার বিবেচনা করে এক অত্যন্ত ব্যবহারিক তথা আদর্শোন্মুখী পদ্ধতির আবিষ্কার করেছিলেন।

ডাক্তারজী প্রথম গুরুপূজনের আগের দিন সব স্বয়ংসেবকদের সূচনা দিলেন যে "কালকে গুরু পূজনের উৎসব হবে। আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ শ্রদ্ধা অনুসারে ফুল ও দক্ষিণা নিয়ে আসবেন।" সূচনা পাবার পর স্বয়ংসেবকেরা নিজের-নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী এই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে শুরু করে। কেউ বলল — "কালকে আমরা গুরু হিসাবে ডাক্তারজীর পূজা করার সুযোগ পাব।" কেউ বলল — "পূজন আপ্পা সোহোনীর করা হবে।" পরের দিন ধ্বজোত্তলনের পর তার পূজন করার জন্য সূচনা দেবার সময়ে ডাক্তারজীর যে কথা বললেন তা শুনে সকলের ভুল ধারণার নিরসন হতে বিলম্ব হলনা। ডাক্তারজী তাঁর ভাষণে বললেন, "রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কোন ব্যক্তি-বিশেষকে গুরু বলে স্বীকার না করে পরম পবিত্র ভগোয়া ধ্বজকে গুরু বলে গ্রহণ করেছে। ব্যক্তি যত মহৎই হোক না কেন, তাঁর মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে। তা ছাড়া, এ কথাও বলা যায়না যে ব্যক্তি চিরকালই অবিচল থাকবে। তত্ত্ব সর্বদা অটল থাকে। সেই তত্ত্বের প্রতীক ভগোয়া ধ্বজও অটল। এই ধ্বজের দর্শনমাত্র রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পরম্পরা আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত

হয়ে ওঠে। যে ধ্বজকে দেখে মনের মধ্যে স্ফূর্তির সঞ্চার হয় আমাদের সেই ভগোয়াধ্বজই আমাদের তত্ত্বের প্রতীক রূপে আমাদের গুরু-স্থানে স্থিত আছে। সঙ্ঘ সেই কারণে কোন ব্যক্তিকে গুরু-স্থানে রাখতে চায়না।" ভাষণের পরে সর্বপ্রথম ডাক্তারজী স্বয়ং গুরুপূজন করেন। তার পরে সমবেত স্বয়ংসেবকেরা একে একে পূজা করে। প্রথম গুরুপূজনের দিন চুরাশি টাকা ও কয়েক আনা দক্ষিণা হল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল যে এক জন স্বয়ংসেবক মাত্র আধ পয়সা অর্পণ করেছিল। গঙ্গোত্রীতে গঙ্গার ক্ষুদ্র উৎস-ধারার মত গুরুদক্ষিণার এই স্বরূপও ক্রমে-ক্রমে বৃহৎ আকার ধারণ করতে থাকে এবং সংগঠনের আর্থিক আবশ্যকতা পূরণেরই শুধু নয়, বরং তার তাত্ত্বিক অধিষ্ঠানকে সুদৃঢ় করার পুণ্যপ্রদ এবং সক্ষম সাধন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সঙ্ঘের সূচনা হয়েছিল বিজয়াদশমীর পুণ্য লগ্নে। প্রত্যেক বছর দশহরায় নিজ জন্মদিনে সঙ্ঘ গত বছরের সীমার উল্লঙ্ঘন করে দেখিয়েছে। উক্ত বছর ২৩শে অক্টোবর ছিল বিজয়াদশমী। ডাক্তারজী ঐ দিন নাগপুরে সামরিক পদ্ধতিতে পথ-সঞ্চলন করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ঘোষ-বিভাগকেও তৈরী করার ব্যবস্থা করলেন। প্রায় পাঁচ-ছশো স্বয়ংসেবক সঞ্চলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এই সময়ে শ্রী বিট্ঠলভাই প্যাটেলের নাগপুরে আগমন ঘটল। ডাক্তারজীর নিমন্ত্রণ স্বীকার করে তিনি মোহিতে সঙ্ঘস্থানেও এলেন। স্বয়ংসেবকদের অনুশাসনবদ্ধ সঞ্চলনের পরে বিট্ঠলভাইকে সঙ্ঘ সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করে ডাঃ মুঞ্জে বললেন, "সঙ্ঘের কার্য, এমন পরিস্থিতির নির্মাণ করা যখন এই যুবকেরা 'হিন্দুস্থান কার?' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে নির্ভীকভাবে উত্তর দিতে পারে যে 'আমাদের হিন্দুদের'। এর পরে শ্রীবিট্ঠলভাই সংক্ষেপে এবং নির্বাচিত শব্দের মাধ্যমে স্বয়ংসেবকদের মার্গদর্শন করেন। তিনি বলেন, "এই কাজ আমার কাছে নতুন। কিন্তু এর দ্বারা আমার চিন্তাধারায় গতি সঞ্চারিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে এই কাজের স্থান সম্বন্ধে আমি বলব যে জগতে ঈশ্বরকে ছাড়া আর কোন-কিছুকে ভয় কোরোনা এবং নিজেদের কার্যের উপর অবিচল নিষ্ঠা রেখে বিপুল বেগে কার্য-বৃদ্ধি কর।"

বিজয়া দশমীর দিন পথ-সঞ্চলন ঐ বছরের উৎসবের বৈশিষ্ট্য ছিল। কয়েকজন সঙ্ঘ প্রেমিক নাগরিকও সাধারণ বেশে সঞ্চলনের সঙ্গে হাঁটছিলেন। ঐ দৃশ্য দেখে 'মহারাষ্ট্র' পত্রিকা লিখেছিল — "গত বিজয়া দশমীর দিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তিন বছর পূর্ণ হল। এ কথা বলায় আপত্তি নেই যে এইটুকু সময়ের মধ্যে সঙ্ঘের দ্বারা হিন্দু তরুণদের যে সংগঠন তৈরী হয়েছে, তা বেশ দৃঢ় হয়েছে।"

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পরের দু-তিন বছরে ডাক্তারজী নাগপুর ও ওয়ার্ধা জেলার স্থানে-স্থানে আগে থেকে লুকিয়ে রাখা অস্ত্র-শস্ত্র নাগপুরে এনে জমা করলেন। এই কাজ করার সময়ে তিনি এ বিষয়ে যেমন সতর্কতা অবলম্বন করলেন যে সরকার যেন ব্যাপারটা জানতে না পারে, তেমনই তিনি এ বিষয়েও লক্ষ্য রাখলেন এগুলি যেন কোন স্বয়ংসেবকের হাতে না পড়ে যায়। ডাক্তারজী এ কথা জানতেন যে যদি ইংরেজদের মত বিদেশী শাসকদের চোখের সামনে শত-শত বছর হিন্দু রাষ্ট্রের যে জিনিষ হয়নি, সেই অভেদ্য সংগঠন গড়ে তুলতে হয়

তাহলে কিছু পথ্যাপথ্য অবশ্য পালন করতে হবে। সেই কারণেই তিনি এই রূপ দক্ষতাপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। অস্ত্র-শস্ত্রের বিষয়ে তাঁর কোন বিরোধিতা ছিলনা। কিন্তু তিনি এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন যে নিজের দেশবাসীদের অন্তঃকরণ জ্বলন্ত রাষ্ট্রভক্তিতে পরিপূর্ণ করে তাদের পরস্পরের সম্পর্ক স্নেহময় এবং জীবন অনুশাসনপূর্ণ যতক্ষণ না হয়ে উঠবে, ততক্ষণ অস্ত্র-শস্ত্রে কোনও কাজের কাজ হবেনা। সেই কারণে ঐ সময়ের বিশেষ পরিস্থিতির কথা মনে রেখে তিনি স্বয়ংসেবকদের নিজেদের সম্পূর্ণ লক্ষ্য লোকসংগ্রহের উপর কেন্দ্রীভূত করার জন্য প্রস্তুত করলেন। এই বিষয়ে ১৯২৮ সালের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য, যার থেকে তাঁর বিচক্ষণ বিবেচনা-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

সঙ্ঘের বিজয়া দশমী উৎসবের দিন শস্ত্র-পূজন করা হয়। তাতে সর্বদা লোহার তরবারির পূজন করা হয়। একবার কয়েক জন পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী খুব সুন্দর ধারালো ইস্পাতের তলোয়ার ও ছোরা বিক্রী করার জন্য ওয়ার্ধায় এসেছিল। তাই দেখে সেখানকার কার্যবাহ শ্রী বুরাণ্ডের মনে ইচ্ছে জাগল যে "শস্ত্র পূজনে অন্ততঃ একটি তরবারি আসল হওয়া উচিত। অতএব, মূল্য ইত্যাদি জেনে নিয়ে তিনি সেখানকার সঙ্ঘচালকজীর কাছে ঐ তরবারি কেনার অনুমতি নিতে গেলেন। সংযোগবশতঃ সেদিন ডাক্তারজীও সেখানেই ছিলেন। স্বভাবতঃ তাঁর সামনেই বিষয়টি উত্থাপিত হল। "আমাদের সমাজ উত্তমরূপে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও পরাধীন কেন হল?" এই প্রশ্ন তিনি জিজ্ঞেস করলেন এবং নিজেই উত্তর দিলেন — "সমস্ত পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করার পর আজ যদি কোন একটি বস্তুর আবশ্যকতা আছে বলে মনে হয়, তাহলে সেটি হল প্রত্যেকটি হিন্দুর অন্তঃকরণকে রাষ্ট্রনিষ্ঠ করে তোলার। এই রকম অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ দেশে নির্মাণ হবার পরে তাদের হাতে উপকরণ নিজে থেকেই চলে আসবে এবং তারা দেশকে স্বাধীন করতে সক্ষম হবে। যেমন পাণ্ডবরা বিশেষ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে তাঁদের আয়ুধ শমী বৃক্ষের উপরে রেখে দিয়েছিলেন, সেই রকম আমরাও বর্তমানে শস্ত্রের কথা চিন্তা না করে আমাদের সংগঠনকে দেশব্যাপী, একসূত্রবদ্ধ তথা অনুশাসনপূর্ণ করে তোলারই যেন চিন্তা করি।"

ঐ বছরের আরো কয়েকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে নাগপুরে লোকমান্য তিলকের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হল। ডাঃ আন্সারীর হাতে এই আবরণ উন্মোচন করিয়ে সমিতির কয়েকজন হিন্দু-রাষ্ট্রবাদীদের উপহাস করার চেষ্টা করে। সেই সময়ে ডাঃ মুঞ্জে ও ব্যারিস্টার মোরুভাউ অভ্যংকর-এর দুইটি দল তৈরী হয়েছিল এবং তারা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত থাকত। তার খানিকটা আঁচ ডাক্তারজীর গায়ে লাগাও স্বাভাবিক ছিল। সাধারণ ভাবে সকলেই ডাক্তারজীকে ডাঃ মুঞ্জের গোষ্ঠীর লোক বলে মনে করত। অতএব, ডাঃ মুঞ্জে, ডাঃ হেডগেওয়ার এবং শ্রীভবানীশংকর নিয়োগীকে উক্ত আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিতও করা হয়নি। সেই কারণে তাঁরা অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন। ডাক্তারজী এই কথা ভেবেই অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন যে কারো হাত দিয়েই হোক না কেন লোকমান্য তিলকের মূর্তি তো প্রতিষ্ঠিত হল। লোকমান্য তাঁর জীবনে প্রেরণাদানকারী একজন রাষ্ট্রপুরুষ ছিলেন। উদ্‌ঘাটনের সময়ে তাঁকে উপেক্ষা করা হলেও, নিজ কর্তব্য-জ্ঞানে তিনি ২৭শে

অক্টোবর সঞ্চলন করে সব স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে তিলকের মূর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। ঐ কার্যক্রমে ডাক্তারজী গণবেশে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি লোকমান্যের গুণ-গৌরবের শ্রদ্ধা-পূর্বক উল্লেখ করে ভাষণও দেন। সংবাদপত্র সমূহের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে উক্ত সম্মান-জ্ঞাপক সঞ্চলন কার্যক্রমে স্বয়ংসেবকদের অনুশাসন প্রত্যক্ষ করে তখনকার পুলিশের প্রধান সরদার হরবংশ সিংহ তাদের প্রশংসা না করে থাকতে পারেননি।

অক্টোবর মাসেই ডাক্তারজী মারাঠী জ্ঞান-কোষের প্রণেতা ডাঃ কেতকরকেও সঙ্ঘ দেখাবার জন্য আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা যে কোন ক্ষেত্রেই কাজ করুন না কেন, তাঁদের সঙ্গে ডাক্তারজীর পরিচয় হলে তিনি তাঁদের সঙ্গে সঙ্ঘ সম্বন্ধে অবশ্যই আলোচনা করতেন এবং তাঁদের সঙ্ঘের কার্যক্রম দেখাতে নিয়ে আসতেন। এইভাবে তিনি সঙ্ঘের পরিচয় প্রত্যেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত করানোর সুযোগ কখনো হাতছাড়া করতেন না। সেই ব্যক্তির দল, মতবাদ, প্রান্ত, জাতি ইত্যাদির বিচার ডাক্তারজীর নিকট গৌণ ছিল। সাধারণভাবে দেখা যায় যে বেশীর ভাগ লোকই নিজের কল্পনার সঙ্গে অপরের মত পার্থক্যকে বড় করে তুলে তার সঙ্গে ভয়ে অথবা ঈর্ষাবশতঃ সম্পর্ক না রেখে দূরে-দূরে সরে থাকে। এ বিষয়ে ডাক্তারজীর স্বভাব এর একেবারে বিপরীত ছিল। তিনি হিন্দু সমাজের অন্তর্গত কোন ব্যক্তিকেই কোন কারণেই সঙ্ঘের সঙ্গে পরিচিত করানোর ব্যাপারে অপাত্র বলে মনে করতেন না। কারো সঙ্গে মতানৈক্য হলেও তাকে যদি দূরে সরিয়ে রাখা হয়, তাহলে সেই মতভেদ কখনই দূর হতে পারেনা। সেই কারণে তিনি ভিন্ন মত পোষণকারীর বক্তব্য শোনার এবং নিজের বক্তব্য তাকে শোনাবার কোন সুযোগ ছাড়তেন না। এর জন্য দুইটি জিনিষের প্রয়োজন হয়। প্রথমতঃ নিজের মত পূর্ণরূপে তর্কশুদ্ধ পদ্ধতির মাধ্যমে ভালো করে অপরকে বুঝিয়ে দেবার মত আত্মবিশ্বাস থাকা দরকার, এবং দ্বিতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি আমার বিশ্লেষণের মধ্যে যদি কোন ত্রুটি বা অভাব দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করে, তাহলে শান্তভাবে তার কথা শোনার ধৈর্য তথা সহিষ্ণুতাও থাকা আবশ্যক। হিন্দু রাষ্ট্রের উপর ডাক্তারজীর নিষ্ঠা ছিল অসামান্য পর্যায়ের এবং অপরের বক্তব্য শান্তভাবে শুনে, তার সম্মান বজায় রেখে, নিজের বক্তব্য তার হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দেবার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কুশল ছিলেন। এই কারণেই শ্রী প্যাটেল আসুন অথবা ডাঃ কেতকর, ডাক্তারজী সকলকেই সানন্দে স্বাগত জানাতেন।

গোরক্ষা ও গোসম্বর্ধনের প্রতি ডাক্তারজীর বিশেষ প্রেম ছিল। এই কারণে শ্রী গোপালরাও ভিড়ের 'গোরক্ষণ সভা' তার জন্মকাল থেকেই, ডাক্তারজীর পক্ষে যতটুকু সম্ভব, তাঁর সাহায্য লাভ করত। নাগপুরের বিগত দাঙ্গা যদিও মুসলমানদের মাথা অনেক ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল, তথাপি তারা আবার উপদ্রব করতে পারে বলে মাঝে-মাঝেই গুজব রটছিল। এই পরিস্থিতিতে যদি গরুর শোভাযাত্রা বের করা হয়, তাহলে পুনরায় গণ্ডগোল শুরু হয়ে যাবে এইরূপ আশংকা থাকায় শ্রীচৌণ্ডে মহারাজ ডাক্তারজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ বিষয়ে তিনি লেখেন, ''হিন্দুত্বে পরিপূর্ণ ডাক্তারজীকে দর্শন করা মাত্র আমি 'নির্বিঘ্নং কুরু মে দেব' বলে আমি সব বৃত্তান্ত তাঁর কাছে নিবেদন করলাম। 'হিন্দুস্থানে গোমাতার কাজে বিঘ্ন হবে কেমন করে?' এই কথা বলে সরসঙ্ঘচালকজী তাঁর এক কার্যকর্তাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে যা সূচনা দেবার

তা তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে তিনি দিলেন। আমি শোভাযাত্রার সময়ে উপস্থিত থাকব। কিছু চিন্তা করবেন না। বলে তিনি আমাদের বিদায় জানালেন। ডাঃ মুঞ্জে ও আমি নিজ-নিজ স্থানে চলে গেলাম। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই শ্রীরামন্দিরের সামনে ডাক্তার হেডগেওয়ারের রামসেনা কয়েক হাজার সংখ্যায় সমবেত থাকতে দেখে আমার তো ম্যাজিকের মত মনে হল।" এরপর বলাবাহুল্য কোন বাধা-বিঘ্ন ব্যতিরেকেই শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হল।

সঙ্ঘের কাজ সম্প্রসারিত হয়ে চলেছিল এবং তখনকার চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে ১৯২৮ সালের শেষে নাগপুর অঞ্চলে মোট আঠারটি শাখা চলছিল। সে সময়ে অনেক স্বয়ংসেবক ম্যাট্রিকের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার পরে ডাক্তারজী সঙ্ঘের কাজের কথা চিন্তা করে তাদের কলেজের শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। তিনি এ কথার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন যে সঙ্ঘের কার্যকর্তারা যেন অন্ততঃ স্নাতক হয়। এই আগ্রহের কারণে সঙ্ঘের বেশ কয়েকজন কার্যকর্তা কলেজে ভর্তি হলেন এবং তাঁরা সেখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এক পুরোহিতের পুত্রকে তিনি এম এ পড়ার জন্যও প্রস্তুত করলেন। তিনি তাকে বার বার বলতেন — "এম এ পড়া শেষ হলে তোমার ইচ্ছে হলে তুমি সত্যনারায়ণের কথকতা করতে পার। কিন্তু পড়াশুনা অবশ্য কোরো।" এ যাবৎ যুবকরা চাকুরীর জন্যই শিক্ষা গ্রহণের কথা চিন্তা করত। ডাক্তারজী সঙ্ঘকার্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা গ্রহণের নতুন দৃষ্টি প্রদান করলেন। হিন্দু সমাজকে দ্রুতগতিতে সুসংগঠিত তথা শক্তিশালী করে তোলার জন্য স্নাতক হয়ে সমাজের দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত করে নেওয়া প্রয়োজন এবং তার ভিত্তিতে সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে সঙ্ঘের চিন্তাধারা ও তার কাজকে পৌঁছে দেবার মত উত্তম কার্যকর্তা হিসাবে নিজেদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক বলে তিনি মনে করতেন। এই ধরনের স্বয়ংসেবকদের মধ্যে যাদের অন্য প্রান্তে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার মত আর্থিক দিক থেকে সুবিধা ছিল, তাদের ডাক্তারজী নাগপুরের বাইরেও পাঠালেন। শ্রী ভাইয়াজী দানী, শ্রী বাবুরাও তেলঙ্গ এবং শ্রী তাত্যা তেলঙ্গ প্রমুখ কার্যকর্তারা এই নীতি অনুসারে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলেন। প্রান্তের বাইরে এটাই ছিল সঙ্ঘের প্রথম পদক্ষেপ।

ডাক্তারজী এবং তাঁর সহকর্মীরা অত্যন্ত উৎসাহ ও প্রসন্নতার সঙ্গে সঙ্ঘকার্যের জন্য অবিরাম প্রয়াস করে চলেছিলেন। কারোর এরকম কল্পনাও ছিলনা যে তাঁর মনের মধ্যে এক আলোড়ন চলছিল। প্রত্যেক বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন তথা সংযম পালন যদি তাঁর স্বভাবগত প্রকৃতি না হত তাহলে ১৯২৮ সালে সঙ্ঘের শৈশব অবস্থাতেই ডাক্তারজী তথা সংগঠনের উপর যে প্রাণ-সংকট ঘনিয়ে এসেছিল, তার থেকে উদ্ধার লাভ করা অসম্ভব হত। ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত রোমাঞ্চকর।

বিপ্লবকালে সংগৃহীত শস্ত্রগুলিকে সকলের অজান্তে অত্যন্ত গোপনে ১৯২১ থেকেই ১৯২৬-২৭ পর্যন্ত সরিয়ে দেবার কাজ চলছিল। এই সংকটজনক কাজে ডাক্তারজীর অনুগামী শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ পাণ্ডের কার্যকলাপের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। পাঞ্জাবে কাজ শেষ করার পর গঙ্গাপ্রসাদ নর্মদা তীরে তাঁর এক সন্ন্যাসী ভাইয়ের সঙ্গে নিজেও সন্ন্যাসীর বেশে বাস করছিলেন। ১৯২৭ সালে সংবাদ পাওয়া গেল যে হুসঙ্গাবাদের নিকট তিনি অসুস্থ হয়ে

পড়েছেন। অতএব, চিকিৎসার জন্য তাঁকে ওয়ার্ধাতে নিয়ে আসা হল। সেই সময়ে তাঁর ছোট ভাই আনন্দীপ্রসাদ ওয়ার্ধাতে গোরক্ষণ সংস্থায় চাকুরী করছিলেন এবং স্টেশনের পশ্চিম দিকে দু-তিন ফার্লং দূরে বাস করছিলেন। সরকারের চোখে সন্দেহভাজন এই সজ্জন শহর থেকে দূরে থাকলেই ভাল হয়, এই কথা বিবেচনা করে গঙ্গাপ্রসাদের থাকার ব্যবস্থা তাঁর ভাইয়ের বাড়ীতেই করে দেওয়া হল। তখনও তিনি সন্ন্যাসীর বেশেই থাকতেন। উপরে সাধুর গৈরিক রং থাকলেও ভিতরে বিপ্লবের আগুন জ্বলছিল। অনেক সতর্কতা সত্ত্বেও যদি কখনো তাঁর বিষয়ে ফাঁস হয়ে যায়, তাহলে শত্রুকে খতম করে নিজে পলায়ন করবেন, এই উদ্দেশ্যে সমস্ত শস্ত্র এদিকে-ওদিকে লুকিয়ে ফেলার পরেও গঙ্গাপ্রসাদ তাঁর গেরুয়া আলখাল্লার মধ্যে পিস্তল, কারতুজ এবং ছোরা লুকিয়ে রেখেছিলেন।

অজ্ঞাতবাসে রোগশয্যায় পড়ে থাকার সময়ে গঙ্গাপ্রসাদের কাছে তাঁর এক বন্ধু মাঝে-মাঝে তাঁকে দেখতে ও সেবা শুশ্রূষা করতে আসতেন। তিনি এই পিস্তলের কথাটা জেনে ফেলেছিলেন। কৌতুহলবশতঃ পিস্তলটি হাতে নিয়ে নাড়া-চাড়াও করেছিলেন। বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও গঙ্গাপ্রসাদের পক্ষে এটা ঠিক হয়নি যে অজ্ঞাতবাসে থাকার সময়ে বন্ধুকে এই একান্ত গোপন ব্যাপারটা জানতে দেওয়া।

একদিন খবর পাওয়া গেল যে হিঙ্গনঘাট স্টেশনের কাছে কয়েকজন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে লুন্ঠন করা হয়েছে এবং লুন্ঠনকারীরা পিস্তলেরও ব্যবহার করেছে। খবরটা শুনেই গঙ্গাপ্রসাদ শংকিত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর আলখাল্লার ভিতরে খুঁজে দেখলেন যে তাঁর পিস্তল ও কারতুজ সেখানে নেই। তিনি ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন। তিনি এক মুহূর্ত দেরী না করে ঐ অবস্থাতেই ছুটলেন বন্ধুর বাড়ী এবং পিস্তল ও কারতুজ নিয়ে তৎক্ষণাৎ ফিরে এলেন। তিনি যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। তার আগে তিনি অত্যন্ত উগ্র রূপ ধারণ করে বন্ধুকে হুম্‌কি দিলেন যে "পিস্তলের বিষয়ে কারো কাছে যদি মুখ খোলো, তাহলে মনে রেখ, তুমি রেহাই পাবেনা।" এখন মনে স্বস্তি ফিরে পেলেন এবং ভাইয়ের বাড়ী পৌঁছে নিশ্চিন্ত হলেন। নিঃসন্দেহে একটা ভয়ঙ্কর অনর্থ থেকে রক্ষা পাওয়া গেল।

হিঙ্গনঘাটে সরকার যে গুলি উদ্ধার করল, তার পিস্তল কী রকম ছিল তা জানা গেল। সরকারী সব বিভাগেই ডাক্তারজীর শুভাকাঙ্ক্ষী তথা নিজের লোক ছিল। তাদের কাছ থেকে জানা গেল যে কাদের উপর কঠোর নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম ছিল ডাক্তারজীর। গঙ্গাপ্রসাদ ওয়ার্ধাতে ছিলেন। তাঁর বিপ্লবী মানসিকতার বিষয়ে ডাক্তারজী পুরোপুরি জ্ঞাত ছিলেন। হিঙ্গনঘাটের সংবাদ জানার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চোখের সামনে গঙ্গাপ্রসাদের মূর্তি ভেসে উঠল। ডাক্তারজীর মনে হল যে তাঁর এবং বিভিন্ন স্থানের সহকর্মীদের উপর গোয়েন্দারা কড়া নজর রেখেছে এবং ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করতে গিয়ে যদি গঙ্গাপ্রসাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায় তাহলে এত দিন যাবৎ অন্ধকারে লুকিয়ে রাখা হাতিয়ার ও বিপ্লবীদের সম্বন্ধে সব গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে। ডাক্তারজী এ কথাও বিশ্বাস করতেন যে অন্যান্যরা নিজের বাড়ীতে 'সন্দেহজনক জিনিষ' অথবা কাগজপত্র নিশ্চয়ই রেখে দেয়নি। কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদ ছিলেন দুঃসাহসী এবং জেদী প্রকৃতির

মানুষ, যিনি মৃত্যুকে ভয় করতেন না। তাঁর এই স্বভাবের কথা চিন্তা করে ডাক্তারজী ভাবলেন যে গঙ্গাপ্রসাদ নিশ্চিতই সম্পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করেননি। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে ডাক্তারজী একদিন নাগপুর থেকে কাউকে কিছু না বলে একলাই বেরিয়ে পড়লেন এবং তৃতীয় দিন রাত প্রায় সাড়ে আটটায় শ্রীআপ্পাজী যোশীর বাড়ীতে অকস্মাৎই এসে উপস্থিত হলেন। গোয়েন্দা তাঁর বাড়ীর সামনেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে ডাক্তার হেডগেওয়ারকে আসতে দেখে ফেলল। ডাক্তারজী প্রান্তে এত বেশী সুপরিচিত ছিলেন যে তাঁর পক্ষে লুকিয়ে কোথাও যাওয়া আসা করা সম্ভব ছিলনা।

ডাক্তারজী শান্তভাবে ওয়ার্ধার খবরাখবর এবং গঙ্গাপ্রসাদের বর্তমান ঠিকানা ইত্যাদি জেনে নিলেন। সমস্ত পরিস্থিতি জেনে নেবার পর গঙ্গাপ্রসাদ সম্পর্কে তাঁর আশংকা আরো পুষ্ট হল। তিনি আপ্পাজীকে বললেন, "আর সময় নষ্ট না করে যাই তার সঙ্গে দেখা করে আসি।" ডাক্তারজীর ব্যগ্রতা আর বাড়ীর চতুর্দিকে গোয়েন্দাদের নজরদারী — এই দুইয়ের মাঝে শ্রীআপ্পাজী দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, "আমাদের উপর নজর রাখা হয়েছে। তাই এখন তাড়া কিসের?" কিন্তু আপ্পাজীর কথা শেষ হবার আগেই তিনি বললেন, "তল্লাসির সময়ে যদি তাঁর কাছে কিছু পাওয়া যায় তাহলে কী হবে।" এই কথা বলেই ডাক্তারজী উঠে পড়লেন এবং "চলো" বলেই বেরিয়ে পড়লেন।

রাতের ঘন অন্ধকারের মধ্যে দুজনে ওয়ার্ধা স্টেশনের ওপারে গঙ্গাপ্রসাদের নিবাসের কাছে পৌঁছলেন। তাঁরা জানতেন যে তাঁদের পিছন-পিছন কেউ না কেউ খোঁজ নিতে আসবেই। কিন্তু রাষ্ট্রব্যাপী সংগঠনের স্বার্থের কথা চিন্তা করে তিনি এটা কিছুতেই হতে দিতে পারেননি যে তিনি বা তাঁর অন্য কোন সহকর্মী এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ুক। যে সংগঠনের জন্য তিনি নিজের জীবন সমর্পণ করার সংকল্প পবিত্র ধ্বজের সম্মুখে ব্যক্ত করেছিলেন, সেই সংগঠনের উপর সরকারের আঘাত আসার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় ডাক্তারজী জেনে-বুঝে এবং চিন্তা-ভাবনা করেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদের নিবাসের কুড়ি-পঁচিশ পা দূরেই একটা নিম গাছ ছিল। তার অন্তরালে ডাক্তারজী বসলেন এবং আপ্পাজীকে গঙ্গাপ্রসাদের কাছে যা হাতিয়ার আছে সব নিয়ে তাকে সঙ্গে করে আনতে তার বাড়ীর ভিতরে পাঠালেন। এমন অন্ধকার রাতে আপ্পাজীকে সামনে দেখেই গঙ্গাপ্রসাদ বুঝে গেলেন যে তিনি কেন এসেছেন। আপ্পাজী তাঁকে ডাক্তারজীর নির্দেশ জানালেন। তিনি পিস্তল নিয়ে তৎক্ষণাৎ বাইরে এলেন এবং ডাক্তারজীর হাতে সেটা তুলে দিলেন। তাঁর হাতে পিস্তল আসার সঙ্গে-সঙ্গে এক অপরিচিত ব্যক্তি তাঁর হাতের কব্জী শক্ত করে ধরে ফেলল এবং "কেমন ঠিক সময়ে ধরে ফেলেছি" বলে উল্লাস প্রকাশ করল। তার মুখ থেকে কথা খসার পর মুহূর্তে ডাক্তারজী অতীব তৎপরতার সঙ্গে এক ঝট্‌কায় নিজের হাত ছাড়িয়ে নিলেন এবং পিস্তল আপ্পাজীর হাতে দিয়ে দিলেন। তারপর শক্ত করে গোয়েন্দার দুটো হাত ধরে তাকে লাথি-ঘুঁসি মারতে-মারতে তাকে আচ্ছা করে পিট্‌তে লাগলেন। গোয়েন্দা বেচারার তো অবস্থা কাহিল। "আমাকে ছেড়ে দিন, আপনার পায়ে পড়ি, আমি ও খবর কাউকে জানাবনা।" এই কথা শুনে ডাক্তারজী নিজের দুহাত খুলে তাকে দেখিয়ে

বললেন, "দ্যাখ, দ্যাখ, আমার কাছে কিছু আছে কি?" এইভাবে হাত দেখিয়ে তিনি তাকে সেখানেই ছেড়ে চলে গেলেন।

এই মারপিট শুরু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে গঙ্গাপ্রসাদ তাঁর পুঁটলি নিয়ে সিন্দীর দিকে রওনা দিলেন। আপ্পাজীও অন্ধকারে গা-ঢাকা দিলেন। গোয়েন্দা বেচারা কাতরাতে কাতরাতে, খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ফাঁড়িতে পৌঁছল। কিন্তু তার আগেই ডাক্তারজী মনোহর পন্ত দেশপাণ্ডের বাড়ীতে পৌঁছে কড়া নাড়তে শুরু করে দিয়েছিলেন। রাত বারোটা বেজে গিয়েছিল। ভাউসাহেব দরজা খুলেই জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি আজ এখানে?" ডাক্তারজী অন্য দিনের মতই শান্ত ভাবে উত্তর দিলেন, "আনন্দী প্রসাদ অসুস্থ ছিল। তাকে দেখতে এসেছিলাম।"

নিম গাছের তলার ঘটনার পর ডাক্তারজী ইচ্ছে করেই আপ্পাজীর বাড়ী যাননি। কারণ গোয়েন্দা যদি অন্ধকারের মধ্যেও আপ্পাজীকে চিনে ফেলে থাকে তাহলে তাঁর বাড়ীতে গেলে তাঁরও সন্ধান পেয়ে যাবে। তাই, কিছু সময় মনোহরপন্তের সঙ্গে কাটিয়ে ডাক্তারজী ভোরের ট্রেনেই নাগপুরে ফিরে গেলেন। সেখানে সকাল থেকেই রোজকার মত সকলের সঙ্গে কথা-বার্তা চালাতে লাগলেন। সংগঠনের উপর থেকে এক সংকট কেটে গেল, এই আনন্দের সংবাদও সে সময় তিনি কারো কাছে ব্যক্ত করতে পারছিলেন না। প্রচণ্ড মার খেয়ে গোয়েন্দা-প্রবর ঘটনার সংবাদ ফাঁড়িতে গিয়ে জানাল। কিন্তু "হাত থেকে শিকার বেরিয়ে গেল" এই অনুশোচনা ভিন্ন তার কাছে বলার কিছুই ছিলনা।

এই ঘটনার পরে পিস্তলের সন্দেহ থাকার কারণে সরকারের সঙ্ঘ সম্বন্ধে আশঙ্কা আরো বেশী বৃদ্ধি পেল। গোয়েন্দা ও পুলিশের লোক সব সময়ে তাঁর সামনে-পিছনে ঘুর-ঘুর করতে শুরু করে দিল। তার ফলে এমন বিপদ হল যে ডাক্তারজী ও আপ্পাজীর কাছে যেতেও মানুষ ভয় পেতে লাগল। মামলা-মকদ্দমা হলেও সহ্য করা যায়, কিন্তু প্রতিদিনের এই গোয়েন্দা-পুলিশের পিছনে লেগে থাকা অসহ্য লাগে। ঐ সময়ে শ্রীতাম্বে মধ্য প্রান্তের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ছিলেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজে থেকেই তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের পিছনে পাহারা কেন লাগিয়ে রেখেছেন?" ওয়ার্ধার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গেও অনেকে সাক্ষাৎ করলেন। সেই সময়ে আপ্পাজী যোশী মধ্য প্রান্ত কংগ্রেসের সম্পাদক এবং অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কার্যকারিণী সমিতির সদস্য ছিলেন। ওয়ার্ধার অনেক সার্বজনিক সংস্থার সঙ্গেও পদাধিকারী রূপে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অতএব, পুলিশের এই পিছনে লেগে থাকা সকলের কাছেই অসহ্য মনে হওয়ায় তাঁরা স্বভাবিকভাবেই সরকারী উচ্চপদস্থ অফিসারদের কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিলেন। শ্রীগোবিন্দরাও চরডে নামক উকিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কী রকম তামাশা চালাচ্ছেন? ভালো মানুষদের পিছনে পুলিশের টিক্‌টিকি কেন লাগিয়ে রেখেছেন?" তা শুনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও একই সুরে জবাব দিলেন, "ভালো মানুষরা যদি ডাকাতি করে তাহলে কি করা যাবে?" তাই শুনে শ্রীচরডে গর্জে ওঠেন, "বাজে কথা কেন বলছেন? যদি এ কথাই সত্যি হয় তাহলে সোজাসুজি তাঁদের গ্রেপ্তার করুন আর মামলা চালান। অন্ততঃ তাঁদের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করুন।"

এর পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আপ্পাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু আলোচনার শেষে অফিসার দোষারোপ করে বলেন, "সব রকম মারাত্মক হাতিয়ার আপনাদের কাছে আছে এবং তার সংবাদও আমরা পেয়েছি।" এ কথা শুনে আপ্পাজী বলেন, "শুধু সংবাদ জেনে কী হবে? তল্লাসি নিন এবং মকদ্দমা চালান।" "এটাই তো মুশকিল। সরল মানুষদের কাছে সে সব জিনিষ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু আপনাদের কাছে পাওয়া যাবেনা।" অফিসার অসহায় স্বরে স্বীকার করেন। একথা শুনে আপ্পাজী বলেন, "এ কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে গোয়েন্দা লাগিয়ে কি আমাদের কাছে কিছু পাবেন?" তাই, এই তামাশা বন্ধ করুন।

কিছু দিন পরে গোয়েন্দাগিরির এই ঝামেলা অনেকটা কমে গেল। হিঙ্গনঘাট কাণ্ডের তদন্তের পরে মকদ্দমা চালানো হয়েছিল এবং অভিযুক্তদের শাস্তিও হয়েছিল। সেই কারণে পরিস্থিতি কিছুটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

১৬. সরসঙ্ঘচালক

পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর স্বভাব ছিল যে যদি তিনি কোন স্বয়ংসেবকের মধ্যে গুণ দেখতে পেতেন তাহলে তাকে উৎসাহিত করতেন। এই স্বভাবের কারণেই তিনি শ্রী সাবলাপুরকরকে, যিনি সে সময়ে একজন ছাত্র ছিলেন, তাঁকে "ভগোয়া ধ্বজই রাষ্ট্রীয় ধ্বজ" এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে বলেন। প্রবন্ধ লেখা হয়ে যাবার পর তিনি স্বয়ং সেটা পড়েন, কিছু ভুল সংশোধন করে দেন এবং কয়েকটি বাক্য বাদ দিতে বলেন। সঠিক লেখা হবার পর তিনি 'শ্রদ্ধানন্দ' নামক সাপ্তাহিকে প্রবন্ধটি প্রকাশনের জন্য পাঠিয়ে দেন। এই ধরনের রাষ্ট্রীয় বাঙ্ময় প্রকাশনের জন্য নাগপুরে ১৯২৮ সালে "অভিনব গ্রন্থমালা' শুরু করা হল। এটির সূচনা করা হলে ডাক্তারজী দশ টাকা চাঁদা দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করেন।

সঙ্ঘের মধ্যে বালক ও শিশুদের প্রবেশের নীতি সম্বন্ধে ডাক্তারজীর সহকর্মী শ্রীআপ্পা সোহোনী সহমত ছিলেন না। তিনি আরো আগ্রহ করেন যে সঙ্ঘের সাথে-সাথে একটা আখড়াও চালানো হোক। ডাক্তারজীর বক্তব্য ছিল আজ সমাজে অনেক আখড়া আগে থেকেই আছে। আর একটা নতুন আখড়া করার বদলে স্বয়ংসেবকেরা পুরানো চালু আখড়াতেই যাক। সেখানকার বাতাবরণকে চৈতন্যযুক্ত করে তুলুক এবং সেখানে নতুন-নতুন বন্ধু তৈরী করে সঙ্ঘে নবীন তরুণদের নিয়ে আসুক। তাছাড়া, সঙ্ঘকে সারা দেশে পরিব্যাপ্ত করতে হবে। অতএব, তার কার্যক্রমে সেই সব বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত যা সকল স্থানেই সহজে গ্রহণ করা যাবে। এই সব ছোট-খাট মতানৈক্যের দরুন আপ্পা সোহোনী ১৯২৯ সালের এক সময়ে সঙ্ঘের প্রত্যক্ষ কাজ থেকে দূরে সরে গেলেন। কিন্তু এখানে দুটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। সোহোনী সঙ্ঘকার্য থেকে বিরত হবার পরেও ডাক্তারজীর প্রতি অনুরক্ত রয়েই গেলেন। তাঁদের বন্ধুত্বে কখনো ছেদ পড়েনি। তাঁরা পরস্পরের গৃহে যাতায়াত করতেন এবং মন খুলে কথা বলতেন। দ্বিতীয় কথাটি কার্যকর্তাদের দিক থেকে উল্লেখনীয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে সংস্থার মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে তার থেকে একটা গোষ্ঠী আলাদা হয়ে বেরিয়ে যায় এবং তার পরে মূল সংস্থার সঙ্গে জোরদার প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করেনা, সেই সঙ্গে প্রাণপণে তার বিরোধিতাও শুরু করে দেয়। কিন্তু সোহোনী এই বামমার্গকে কখনো অনুসরণ করেন নি। বরং তার বিপরীত; বার্ধক্যে, অর্ধাঙ্গে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হবার পরেও ডাক্তারজীর বিষয়ে তাঁর গভীর ভালবাসা আমি স্বয়ং অনুভব করেছি। যৌবনের এক পুরাতন দৈনন্দিনী বের করে সামনা-সামনি দুটি পৃষ্ঠায় যথাক্রমে ডাক্তারজী ও সোহোনী উভয়ের লিখিত জন্মকুণ্ডলী তিনি দেখালেন। পক্ষাঘাতের দরুন জড়তাপূর্ণ জিহ্বা নিয়ে 'এই দেখ কেশবের কুণ্ডলী' বলতে-বলতে ডাক্তারজীর কথা স্মরণমাত্র তাঁর চক্ষু দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল।

প্রত্যেক মানুষের জীবনের সাধারণতঃ সর্বজনীন ও ব্যক্তিগত, এই দুটি অঙ্গ থাকে। কিন্তু ডাক্তারজীর জীবনে এই পার্থক্য খুঁজে বের করা দুষ্কর ছিল। তাঁর বাড়ীতে যে সব বৈঠক, মেলা-মেশা ও কথা-বার্তা হত, সেগুলিকে ব্যক্তিগত বলা যায় না। তাঁর জীবন সমাজের মতই ব্যাপক হয়ে গিয়েছিল, সেই কারণে তিনি বাড়ীতেই থাকুন অথবা বাইরে, তাঁর মনে সর্বক্ষণ দেশের চিন্তাই ব্যাপ্ত থাকত। সাবনেরে তাঁর বন্ধু শ্রী নানাসাহেব আম্বোকরজীর মত বন্ধুরা জেদ করলে তিনি নাটক বা সিনেমা দেখতেও চলে যেতেন। কিন্তু শুধু বন্ধুদের মন রাখার জন্যই তিনি এই কাজ করতেন। একবার আম্বোকরজী অনেক আগ্রহ করায় তিনি বলেন, "আমার এইসব ভালো লাগে না বলে তুমি মনে কর নাকি? একথা ঠিক যে এগুলি দেখলে মন খানিকটা হাল্‌কা হয়। কিন্তু একে তো কাজের দরুন সময় পাইনা, আর দ্বিতীয়তঃ সন্ধ্যার সময়টা এই ধরনের ব্যাপারে অপচয় করা উচিত নয়। এই সময়টা বড় মূল্যবান্।"

কিন্তু এই বহুমূল্য সময়টাকেও যখন কারুর আগ্রহের কারণে গান-বাজনা ইত্যাদির কার্যক্রমে নিয়োগ করতে হত, তখনও তিনি তাঁর উপস্থিতিমাত্র দিয়েই সেখানকার সম্ভাবনাময় যুবকদের সঙ্ঘানুকূল না করে ছাড়তেন না। ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে নাগপুরে 'অভিনব সঙ্গীত বিদ্যালয়', 'ভারত গায়ন সমাজ' এবং 'চতুর সঙ্গীত বিদ্যালয়' — এই তিনটি সংস্থার বিদ্যার্থীদের গায়নের কার্যক্রম 'ব্যঙ্কটেশ চিত্রপট গৃহে' অনুষ্ঠিত হয়। সেই কার্যক্রমে ডাক্তারজী গিয়েছিলেন। ঐ কার্যক্রম সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য লিখেছিলেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : "......এই তিনটি সংস্থার বালকদের গান সেখানে হল। বিশেষজ্ঞরা সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁদের মতামত দিতে পারবেন। কিন্তু আমার মত ঐ শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তির মনে শ্রী প্রভাকর ও শ্রী যাদব যোশীর গানের বিশেষ পরিণাম হল। শ্রী শঙ্কর রাও-এর কাছে শিক্ষণের যে বিশেষ কৌশল আছে, এটা তারই পরিণাম। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা গদ্যে শোনার পরিবর্তে পদ্যে শুনতে সবাই ভালবাসে এবং মানুষের অন্তঃকরণে তার পরিণামও ভাল হয়। অতএব, রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে এইরূপ সংস্থাগুলির আবশ্যকতা আছে। আমি আশা রাখি যে সংস্থার পরিচালকগণ গায়নের এই দিকটির প্রতি আরো বেশী নজর দেবেন।"

রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার প্রচারের জন্য সঙ্গীতের সদ্ব্যবহার করার বিষয়ে ডাক্তারজীর উপরোক্ত অভিমত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে দুই যুবকের গানের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করে তাঁদের রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট করার প্রয়াসও তিনি শুরু করে দেন। এই উপলক্ষে উক্ত দুই যুবকের মধ্যে শ্রীযাদবরাও যোশীর সঙ্গে ডাক্তারজীর বিশেষ পরিচয় ঘটল, এই সেই পরিচয়ের পরিণতি এমন হল যে সঙ্ঘই শ্রীযাদবরাও যোশীর জীবন-সঙ্গীতে পর্যবসিত হল। তিনি ডাক্তারজীর সুরেই চিরকালের জন্য নিজের সুরও মিলিয়ে দিলেন। যাদবরাও-এর মত যুবকদের কণ্ঠস্বর ডাক্তারজীর মধুর মনে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কালে একথাই প্রমাণিত হল যে এই ধরণের অসংখ্য গুণী শিল্পীদের মুগ্ধ করার সামর্থ্য ডাক্তারজীর প্রেমপূর্ণ ব্যবহার তথা অকৃত্রিম স্নেহের মধ্যে নিহিত ছিল।

ডাক্তারজী মধ্য প্রান্ত কংগ্রেস কার্যকারিণীর সদস্য হিসাবে ১৯২৮-এর শেষ দিকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র

বসুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল এবং দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। এই সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করার সময়ে ডাক্তারজী দুঃখ করে বলতেন যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথাকে অর্থহীন বলে মনে করেও সুভাষচন্দ্রের মত কর্তৃত্ববান্ তথা ত্যাগী দেশভক্তও সেই ঘূর্ণাবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। এই সাক্ষাৎকারের সময়ে প্রসিদ্ধ বিপ্লবী বাবারাও সাভারকরও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের দরুন উভয়ের মধ্যে নিকট পরিচয় ঘটেছিল এবং দুজনেই পরস্পরের চিন্তা-ভাবনা ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সময়ের স্নেহ-সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল।

কংগ্রেস অধিবেশনে থেকে ফিরে এসে ডাক্তারজী তাঁর খাতায় সেখানকার স্বেচ্ছাসেবকদের শৃঙ্খলা এবং সম্পূর্ণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিজের অভিমত লিখে রেখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন — "..... এই বার কলকাতা কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা তিন হাজারের বেশী ছিল। স্বেচ্ছাসেবক বিভাগের উপর পঁয়ষট্টী হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে প্রত্যাশিত শৃঙ্খলা ছিলনা। কংগ্রেসের মণ্ডপে বিশেষ ভিড় ছিলনা, তা সত্ত্বেও ওরা যথাযথ কাজ করতে অক্ষম ছিল। সেই কারণে এক সময়ে সকল স্বেচ্ছাসেবককে মণ্ডপ থেকে সরিয়ে দিতে হল।" ডাক্তারজীর এই নিরীক্ষণ শুধু এই জন্য ছিল যে তিনি যে সংগঠনের কাজ হাতে নিয়েছিলেন, তার মধ্যে ঐ দোষগুলি যেন না থাকে। শুধু অপরের ছিদ্রান্বেষণ করে অকারণ নিজেদের মান-মর্যাদার বড়াই করে দেখানোর কাজ তিনি কখনো ভুলেও করবেন না। তাঁর দৃষ্টি ছিল চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করে সমাজের প্রবৃত্তিকে যথোপযুক্ত আকার তথা উৎকর্ষ প্রদান করার জন্য কী ধরণের সংস্কার তথা বিধি-নিষেধ পালন করা আবশ্যক তারই অনুসন্ধান করা।

কলকাতা থেকে ফেরার পথে ৬ই জানুয়ারী তিনি খড়গপুরে যাত্রা-বিরতি করলেন। বন্ধুদের সাহায্যে সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বৈঠক করে সঙ্ঘের চিন্তাধারা তাঁদের সম্মুখে উপস্থাপন করলেন। সেই সময়ে সেখানে 'হিন্দী নবযুবক রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ' নামক এক সংস্থার তরুণদের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করেছিলেন। সে বিষয় তিনি তাঁর খাতায় লিখেছিলেন, "....সমগ্র পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললাম। 'নবযুবক সঙ্ঘের' অবস্থা সন্তোষজনক নয়।"

ঐ বছর সঙ্ঘের কাজের চতুর্দিকে বিস্তার ঘটছিল। ক্রমবর্ধমান সংগঠনের অনুরূপ উপকরণ সংগ্রহের জন্য ডাক্তারজী উদ্যোগী হলেন। শাখাতে স্বয়ংসেবকদের সংখ্যা বেশ ভালই থাকত এবং সঞ্চলনের কার্যক্রমও হত অনুশাসনের সঙ্গে। কিন্তু পটভূমি ব্যতীত যেমন ছবি ফুটে ওঠেনা, তেমনি ঘোষ ব্যতীত সঞ্চলনের অবস্থাও ঐ দাঁড়ায়। আর্থিক অবস্থার কারণে এই অভাব দূর করার প্রয়াসে দু বছর পার হয়ে গিয়েছিল স্বয়ংসেবকদের। তবু সন্তোষজনক উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। অনেক সময়ে স্বয়ং সেনাপতি কে বিউগুল বাজাতে হত। এই বছর ডাক্তারজী অর্থ সংগ্রহ করে ঘোষের উপকরণ কিনে আনলেন এবং ঘোষ-পথকের স্বয়ংসেবকদের নির্বাচিত করে তাদের জনৈক খ্রীষ্টান ঘোষ-বাদনে পারদর্শী শিক্ষকের কাছে পাঠাতে শুরু করলেন। এই শিক্ষকের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন শ্রী ভিভিয়ান বোস এবং ডাক্তারজীর বন্ধু ব্যারিস্টার গোবিন্দরাও দেশমুখ।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তরুণদের মধ্যে হিন্দু রাষ্ট্রের প্রতি গভীর নিষ্ঠা থাকলেও তাদের অন্য সমাজের প্রতি বিদ্বেষ শেখানো হতনা। অপরের কাছ থেকে রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় সাধন, জ্ঞান, তন্ত্র ও যন্ত্র গ্রহণ করে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলে, তাদের অগ্রগণ্য হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা তাদের মনে ছিল। জীবনোপযোগী জ্ঞান ও সাধনসমূহকে গ্রহণ করার সময়ে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য অথবা আপন-পরের ভেদাভেদ করা চলেনা — এই প্রগতিশীল তত্ত্বজ্ঞান ডাক্তারজীর ব্যবহার-সূত্রের অন্তর্গত ছিল। এই কারণেই খ্রীষ্টান শিক্ষক এবং পাশ্চাত্য স্বরলিপি উভয়কেই ডাক্তারজী স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই বিদ্যা শিখে নেবার পর তার বিকাশ সাধন করে তাকে ভারতীয় স্বরূপ প্রদানের কাজও সঙ্ঘের স্বাভিমানপূর্ণ প্রবৃত্তির মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। সঞ্চলনের তাল মেলাবার জন্য বিভিন্ন প্রয়োগ তথা রচনাগুলি প্রথমে ইংরাজী থেকে নেওয়া হলেও এখন ভারতীয় রাগ-রাগিনীর ভিত্তিতে সমান রকম চিত্তাকর্ষক রচনাসমূহ স্বয়ংসেবকেরা তৈরী করে নিয়েছেন। প্রয়োজন হলে বিশ্বের যে কোন বস্তুর সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু ততটুকুই যতটুকু শিশু নিজের পায়ে চলার শক্তি অর্জন করা পর্যন্ত গাড়ীর সাহায্য গ্রহণ করে। সঙ্ঘ তার আচরণে এই মর্যাদাকেই প্রতিস্থাপিত করেছে।

ডাক্তারজী কলকাতা থেকে ফিরে আসার অল্প কয়েকদিন পরেই লাহোরে ইংরেজ অফিসার স্যান্ডার্সকে হত্যা করে শ্রী রাজগুরু আত্মগোপন করে নাগপুরে এলেন। ডাক্তারজীর সঙ্গে তাঁর পূর্ব থেকেই পরিচয় ছিল। দুই-এক বছর আগে রাজগুরু যখন ভোঁসলে বেদশালায় বেদাধ্যয়ন করছিলেন, তখন তিনি মোহিতে শাখাতেও এসেছিলেন, সেই কারণে ডাক্তারজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। শুধু তাই নয়, আর্বীর শ্রী নারায়ণরাও দেশপাণ্ডে এবং নাগপুরের শ্রী ব্যঙ্কট নারায়ণ সখদেবের মনে আছে যে শ্রী ভাউজী কাবরের জীবিতকালে একবার শ্রী ভগৎসিংহও নাগপুরে এসেছিলেন এবং তিনি তাঁদের সঙ্গে ও ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ওয়ার্ধার শ্রী গঙ্গাপ্রসাদ পাণ্ডের পরিচয়-সূত্রেই ডাক্তারজীর সঙ্গে তাঁর এই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল।

নাগপুরে আসার আগে শ্রী রাজগুরু কলকাতাতেই কংগ্রেস অধিবেশনের সময়েই সম্ভবতঃ ডাক্তারজী ও শ্রী বাবারাও সাভারকরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ১৯২৯ সালের গোড়ার দিকে তিনি নাগপুরে এলে তাঁর থাকা ইত্যাদি ব্যবস্থায় ডাক্তারজীরই প্রধান ভূমিকা ছিল। তিনি রাজগুরুকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তিনি যেন পুনার দিকে না যান। তিনি শ্রী ভৈয়াজী দানীর একটি খামারে নিরাপদে আত্মগোপন করে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই সব ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও রাজগুরু ডাক্তারজীর নির্দেশ অমান্য করে নাগপুর ছেড়ে চলে গেলেন এবং পুনায় যাবার পর কিছু দিনের মধ্যেই ধরা পড়ে গেলেন।

ডাক্তারজীর সুনিশ্চিত মত ছিল যে রাষ্ট্রের সমস্যা একজন বা দুজনের পরাক্রমের দ্বারা সমাধান হতে পারেনা। তার জন্য রাষ্ট্রের মধ্যে তরুণদের বিশাল সংখ্যায় সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু যদি কোন দেশভক্ত আমাদের পথ অনুসরণ না করে অন্য কোন পথ ধরে অগ্রসর হতে চায়, তাহলে যতখানি সম্ভব তাকে সাহায্য করার প্রস্তুতি তাঁর সব সময়ে থাকত।

এই বছর ২০শে এপ্রিল অকোলায় 'অখিল মহারাষ্ট্র তরুণ হিন্দু পরিষদ্'-এর অধিবেশন হল। ডাক্তারজী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই পরিষদে গিয়েছিলেন। সেখানে সমবেত ব্যক্তিদের এবং অকোলার কয়েকজন সজ্জনের সঙ্গে তিনি সঙ্ঘ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রী মসুরকর মহারাজ, লোকনায়ক বাপুজী অণে, স্বামী শিবানন্দ, ডাঃ শিবাজীরাও পটবর্ধন, শ্রী পাঁচলেগাঁওকর মহারাজ, শ্রী ব্রিজলাল বিয়াণী ইত্যাদি নেতাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। সঙ্ঘের শাখার সংখ্যা ঐ সময়ে ত্রিশ-পয়ত্রিশের বেশী হয়ে গিয়েছিল এবং নতুন-নতুন শাখাগুলির মধ্যে অনুশাসন, তত্ত্বজ্ঞানের বিশ্লেষণ ও কার্যক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য ডাক্তারজীর প্রবাস নিয়মিত চলছিল। এই শাখাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখার সঙ্গে-সঙ্গে পরিষদ্ ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন-নতুন লোকের সহিত পরিচয় করা এবং তাঁদের সঙ্ঘ সম্বন্ধে পরিচিত করিয়ে দেবার কোন সুযোগও তিনি হাতছাড়া করতেন না।

শাখাসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছিল এবং সেই সঙ্গে তরুণ কার্যকর্তাদের উৎসাহও বৃদ্ধিলাভ করে চলছিল। এই উৎসাহের কারণে তাঁরা ডাক্তারজীর নিকট এই অনুরোধ করলেন যে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ যে দিন রায়গড়ে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন সেই জ্যৈষ্ঠ শুক্ল ত্রয়োদশীর দিন সমস্ত স্বয়ংসেবকদের এক বড় আকারের সম্মেলন নাগপুরে করা হোক। এই প্রকারে একত্রীকরণের ফলে স্বয়ংসেবকদের আত্মবিশ্বাস তথা উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু ডাক্তারজীর মত ছিল যে সঙ্ঘের কাজ যখন কিছুটা পরিণত স্বরূপ লাভ করেছে তখন এই ধরণের সম্মেলন করে অকারণ বিদেশী সরকার এবং সমাজে যারা সঙ্ঘের বিরোধী তাদের বিরোধীতা বাড়িয়ে দিয়ে কোন লাভ হবেনা। কিন্তু তিনি জানতেন যে তরুণদের প্রথমেই "না" বলে দিলে তারা মনঃক্ষুণ্ণ হবে। যে কাজ তিনি করতে চাইতেন না; সে সম্বন্ধেও এক কথায় "না" বলার পরিবর্তে তিনি কৌশলে এড়িয়ে যেতেন। অতএব তাঁর সহকর্মীদের প্রস্তাব সরাসরি নাকচ না করে তিনি প্রান্তের সমস্ত সঙ্ঘচালকদের কাছে এইরূপ সম্মেলনের ব্যাপারে তাঁদের মতামত জানাবার জন্য পত্র লিখলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে প্রান্ত থেকে যে উত্তরগুলি আসবে তার ভিত্তিতে নিজে থেকেই তরুণ কার্যকর্তারা বুঝতে পারবেন যে সম্মেলনের চিন্তা ত্যাগ করাই ঠিক হবে।

যথাসময়ে ডাক্তারজীর সহকর্মীরা যে উত্তর পাঠালেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশের মতে এই প্রকার পরিষদ্ করা ঠিক হবেনা। অকোলার 'প্রজাপক্ষ' পত্রিকার সম্পাদক লিখলেন — "প্রস্তাবিত সম্মেলন করা ঠিক হবেনা। সেটাকে এখন অদৃশ্যই রাখুন। তার বিপরীতে সঙ্ঘের বৃদ্ধি যতটা সম্ভব করে যাওয়া উচিত। সঙ্ঘের বিভিন্ন স্থানের সংবাদ এখনো সরকারের কানে পৌঁছয়নি মনে হয়। যা চোখে দেখা যায়নি তাকে দেখার ও বোঝার সম্ভাবনা সম্মেলন করলে বৃদ্ধি পাবে। অতএব, সম্মেলনের চিন্তা ত্যাগ করুন।" ডাক্তারজীর প্রধান সহকর্মী শ্রী আপ্পাজী যোশী ওয়ার্ধা থেকে লিখলেন--"যারা সমাজের মধ্যে এবং বাইরের শত্রু, তাদের হৃদয় ঈর্ষায় পরিপূর্ণ হবে এবং আমাদের উন্নতি না হয়ে যাতে অবনতি হয় তার জন্য তারা কোমর বেঁধে চেষ্টা করবে, তাই সম্মেলন করলে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হবে।"

পত্রে যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল, তা সঠিক ছিল। সঙ্ঘকার্যের চতুর্দিকে বিস্তার দেখে ব্রিটিশ সরকার সূক্ষ্মতার সঙ্গে তার গতিবিধির উপর নজর রাখার নীতি গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন স্থানের শাখাগুলিতে যে স্বয়ংসেবকেরা ও কার্যকর্তারা অংশগ্রহণ করে তাদের সম্বন্ধে গোয়েন্দাদের মাধ্যমে খোঁজ-খবর নেওয়া শুরু করে দেয়। কিন্তু এটাই বাস্তবিক দুঃখের কারণ ছিলনা। এই ধরণের তরুণদের সংগঠন বিদেশী সরকারের দৃষ্টিতে যে ভাল ঠেকবেনা তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে রাষ্ট্রসেবার জন্য আমাদের দেশেরই যে সব মানুষ নিজেদের সংলগ্ন রেখেছে, তারাও সরকারের মতই কুৎসিত তথা বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব নিয়ে সঙ্ঘকে ধ্বংস করার সংকল্প গ্রহণ করেছিল। সেই সময়কার পত্রালাপ থেকে জানা যায় যে কংগ্রেস ও হিন্দুস্থানী সেবাদলের কার্যকর্তারা নানাস্থানে সঙ্ঘের প্রতি এইরকম দৃষ্টিভঙ্গীই গ্রহণ করেছিলেন। সাকোলী থেকে শ্রী রামভাউ ফাটক তাঁর ২৬শে অক্টোবর পত্রে লিখেছিলেন — "রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্য নিয়েই মনে হয় প্রান্তীয় কংগ্রেস কমিটি সেবাদল গঠন করার কথা ভেবেছে। অতএব, প্রান্তের সীমার বাইরে অন্যান্য প্রান্তেও শাখা খোলার, কথা অবশ্য চিন্তা করুন। শুধু তাই নয়, বড়-বড় শহরেও শাখা প্রতিষ্ঠা করে তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করার চেষ্টা করা দরকার।" অন্য একজন কার্যকর্তা লিখলেন — "এখানে দশহরার শুভ দিনে হিন্দুস্থানী সেবা দলের শাখা শুরু হয়ে গেছে এবং তাদের শাখার অধিকারীরা এক মাসের মধ্যেই রাঃ স্বঃ সঙ্ঘের নাম পর্যন্ত মুছে ফেলার প্রতিজ্ঞা করেছেন।"

ডাক্তারজী এই দেখে বড় ব্যথিত হলেন যে কংগ্রেসের অন্তর্গত আমাদের লোকেরাই সঙ্ঘের বিরোধিতা শুরু করে দিয়েছে। যতদিন পর্যন্ত আমরা বিদেশী শাসকদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে না পারছি, ততদিন পর্যন্ত অন্ততঃ রাষ্ট্রীয় শক্তিগুলির মিলে-মিশে চলা উচিত বলে তিনি মনে করতেন। তিনি স্বয়ং এ ব্যাপারে সততার সহিত প্রয়াস করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন ঠিকই, কিন্তু অন্যরা যদি সেই প্রয়াসের মঙ্গলময় দিক তথা বিশুদ্ধতার কথা চিন্তা না করে বিরোধিতা করেই চলে, তাহলে তাঁর মত ছিল যে সেই বিরোধিতার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে শান্তভাবে তা হজম করে নিজেদের কাজ অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গে করে যাওয়া। শ্রী দাদা পরমার্থ এবং শ্রীকৃষ্ণরাও মোহরীরকে ২৪শে অক্টোবর ডাক্তারজী যে পত্র লেখেন, তাতে তিনি বলেন, "আপনারা দুজনেই আপনাদের পত্রে আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা জানিয়ে খুব ভাল কাজ করেছেন। আমি এ বিষয়ে আগেই ভেবেছি। আমাদের এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে হবে। পরমেশ্বর সকলকে সদ্‌বুদ্ধি দিন — এটাই তাঁর নিকট আমার প্রার্থনা। আমাদের সততাপূর্ণ বিবেক-বুদ্ধির সঙ্গে এবং ভগবানকে স্মরণ করে আমাদের কাজ করার দরুন যদি কারো মনে বিষাদ জন্মায় অথবা যদি তারা বিরোধিতা করার কথা চিন্তা করে, তাহলে আমাদের কী করার থাকতে পারে? এটা রাজনীতি। অতএব, এই ধরনের ব্যাপারে ভীত হয়ে কতদিন চলতে পারা যাবে?"

বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও যারা বিরোধিতা করছিল তাদের সম্বন্ধে ডাক্তারজীর মনের মধ্যে আত্মীয়তা তথা ভালবাসার ভাবনার কোন অভাব থাকত না। তিনি এই বস্তুস্থিতির প্রতি চোখ বুজে থাকতে পারতেন না যে দাঁতও আমাদের আর ঠোঁটও আমাদের। সেই

বছর গুরুপূজা উৎসবের পর 'মহারাষ্ট্রের' একই সংখ্যা সংযোগবশতঃ ডাক্তারজী এবং হিন্দুস্থানী সেবাদলের প্রধান ডাঃ নাঃ সুঃ হর্ডীকরের ভাষণ ছাপা হল। ভাষণগুলি পাঠ করার পর ডাক্তারজীর সংযমী এবং সমাজব্যাপী আত্মীয়তার উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সময়ে সঙ্ঘকার্যের বিস্তার চতুর্দিকে ঘটছিল। অপর দিকে কংগ্রেস সম্পর্কে জনসাধারণ উদাসীন হয়ে পড়ছিল। এমনই পরিস্থিতিতে ডাঃ হর্ডীকর নাগপুরে এলেন এবং সেখানে একটি সভার অবস্থা দেখে বললেন, ''নাগপুরে ডাঃ মুঞ্জে, শ্রী অভায়ঙ্করের মত সম্মানিত তথা বিশিষ্ট নেতাদের এবং শ্রী আবারীর রিপাব্লিকান আর্মীর শূরবীর সেপাইদের জীবিত থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয়ত্বের প্রতীক প্রাণবন্ত রাষ্ট্রীয় ধ্বজের বন্দনার কার্যক্রমও যদি এই প্রান্তে না হয়, সেটা বড়ই লজ্জার কথা। আমরা শুনি যে নাগপুরে তরুণদের মধ্যে কাজ আছে। কিন্তু সেই কাজের মধ্যে রাজনীতি কতটা আছে তা আমি জানিনা। যখন বিদেশী শাসনের জোঁক অবিরত আমাদের রক্ত শোষণ করে চলেছে, সেই সময়ে যদি এখানকার তরুণরা বলে বেড়ায় যে আমাদের কাজ সামাজিক, রাজনৈতিক নয়, তখন তাদের কাজ হওয়া না হওয়া দুটোই সমান।''

বিদ্বান্ পাঠকদের বলে দেবার প্রয়োজন নেই যে ডাঃ হর্ডীকরের বক্তব্যের ইঙ্গিত ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতি। কিন্তু হিন্দু রাষ্ট্রের পুনরুত্থান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণাকারী রাঃ স্বঃ সঙ্ঘ রাষ্ট্রীয় ভগোয়া ধ্বজকে বিভিন্ন স্থানে সম্মানের সহিত উড্ডীন করার এবং ভক্তির সঙ্গে তার পূজনের পদ্ধতি প্রচলন করেছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ব্যাপারটি অনেকের হৃদয়কে দগ্ধ করছিল। নাগপুরে গুরুপূজন উৎসব উপলক্ষে ডাক্তারজী কর্তৃক ব্যক্ত চিন্তাধারা এই পৃষ্ঠভূমিতে আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিভাত হয়। তিনি বলেন — ''পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় যখন সঙ্ঘস্থানে এলেন তখন তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন যে ''অন্যান্য সংস্থার নিকট বড় বড় প্রাসাদ ও বিরাট অর্থভাণ্ডার আছে। কিন্তু তোমাদের সঙ্ঘে মনুষ্যবল ভালো পরিমাণে আছে দেখে আমার আনন্দ হচ্ছে।'' আমাদের নিকট এই মনুষ্যবল থাকলেও আমাদের নিজেদের কোন জায়গা না থাকায় এই ক্রম-বর্ধমান স্বরূপকে টিকিয়ে রাখা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সঙ্ঘ-কার্যকে দ্রুতগতিতে চালাবার তথা প্রভাবী করে তোলার জন্য বাহ্য সাধনগুলির এখন অত্যন্ত অধিক আবশ্যকতা রয়েছে। গত বছর সীমোল্লঙ্ঘনের পথ-সঞ্চলনে পাঁচশো স্বয়ংসেবক খাঁকি গণবেশে সামরিক পদ্ধতিতে গিয়েছিল। সেই দৃশ্যের খুব ভাল পরিণাম হয়েছিল বলে অনেকের কাছে শোনা গেছে। এ বছরও সেই প্রকার কিন্তু তার থেকেও অনেক বড় পথ-সঞ্চলনের কার্যক্রম আগামী বিজয়াদশমীর দিন করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। সেই সময়ে নাগপুরের সমস্ত ব্যায়ামশালাগুলির নিকট আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার এবং খাকি গণবেশে ঐ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের কাজ অনেক ব্যাপক। আর আমরা চার দেওয়ালের মধ্যে একে রাখতে চাইনা। সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির রক্ষার জন্যই এই কাজ। অতএব যে কোন সংস্থার নিকট সহযোগিতা গ্রহণের জন্য আমাদের হাত সর্বদাই প্রসারিত রয়েছে। সকলের প্রেমপূর্বক সম্মিলিত সাহায্য লাভ করলে এই কাজ আরো অধিক

পরিণামকারী তথা যশোবর্ধক হবে।" এই ভাষণে নিজেদের লোকেদের দ্বারাই ভ্রান্ত ধারণা অথবা দলগত পক্ষপাতিত্বের দরুন যে বিরোধিতা করা হয়, তার কোথাও উল্লেখমাত্র নেই। উপরন্তু যে কোন সংস্থার সহিত একসঙ্গে কাজ করার জন্য হাত আমাদের সর্বদাই প্রসারিত আছে, এই প্রকার নিঃসন্দিগ্ধ শব্দে যে প্রস্তাব করা হয় তাতে ডাক্তারজী তথা সঙ্ঘের দৃষ্টিভঙ্গী পুরোপুরি ব্যক্ত করা হয়। ডাক্তারজী বিরোধিতা বুঝতেন। কিন্তু তিনি একথাও জানতেন যে এই বিরোধিতা শুধু কয়েকজন মানুষের, সমগ্র সমাজের নয়। অতএব, শঠে-শাঠ্যম্-এর ভাষা বা প্রবৃত্তি তিনি কখনো গ্রহণ করেননি। তাঁর পুরো বিশ্বাস ছিল যে আজকের বিরোধী আগামীকাল সহকর্মী হবে এবং তার আজকের গালি-গালাজ আগামীকাল স্তুতি-বন্দনায় পরিণত হবে। এই আত্মবিশ্বাসই ডাক্তারজীর সংযমের ভিত্তি ছিল।

ডাক্তারজীর উপরিউক্ত ভাষণে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় যে সঙ্ঘস্থানে পদার্পণ করেছিলেন তার উল্লেখ আছে। সেই সাক্ষাৎকার ঠিক কবে ঘটেছিল তার নির্দিষ্ট সংবাদ জানা যায়নি। কিন্তু মালবীয়জীর সঙ্গে সঙ্ঘস্থানে পরম পূজনীয় ডাক্তারজীর যে বার্তালাপ হয়েছিল প্রত্যক্ষভাবে তা শুনেছিলেন এমন কার্যকর্তা সৌভাগ্যবশতঃ বিদ্যমান আছেন। মালবীয়জী মোহিতে প্রাসাদের সঙ্ঘ-শাখায় যে সময়ে এসেছিলেন, সেই সময়ে যদিও প্রাসাদ-সংলগ্ন মাঠের কিছুটা অংশ খেলাধুলা করার মত পরিষ্কার - পরিচ্ছন্ন করা হয়েছিল, তথাপি তার বাইরে প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে পড়েছিল। মালবীয়জীর লক্ষ্য এড়ায়নি যে এই রকম ভাঙা-চোরা জায়গায় সঙ্ঘ চালাতে হয়, তার মানে সঙ্ঘের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। ডাক্তারজীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "লোকেরা আমাকে 'শাহী ভিখারী' বলে। আপনার যদি সম্মতি থাকে তাহলে সঙ্ঘের জন্য কয়েকজনের কাছ থেকে আমি কিছু অর্থ সংগ্রহ করে দেব।" ডাক্তারজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "পণ্ডিতজী, আমার পয়সার জন্য বিশেষ চিন্তা নেই। আমি শুধু আপনার মত মানুষের আশীর্বাদ চাই।" সন্দেহ নেই যে এই ধরণের উত্তর পণ্ডিতজী আশা করেননি, কারণ অন্যান্য সংস্থায় অর্থের জন্য ছটফটানির কথা তিনি ভালভাবেই জানতেন। তিনি ডাক্তারজীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে বলেন, "অন্যান্য স্থানে প্রথমে অর্থ ও তার পরে মনুষ্যবলের প্রতি নজর দেওয়া হয়। কিন্তু আপনার রীতি অভিনব। আপনার এই বৈশিষ্ট্যের কথা আমি যেখানেই যাব, উল্লেখ না করে থাকতে পারবনা।"

সঙ্ঘের শাখাগুলি স্বয়ংসেবকদের অধিক উপস্থিতির দরুন পরিপুষ্ট হচ্ছিল। এই বিষয়ে ডাক্তারজীর প্রসন্নতা তখনকার তাঁর দ্বারা লিখিত চিঠি পত্রে ব্যক্ত হওয়া স্বাভাবিকই ছিল। ব্রহ্মপুরীর সঙ্ঘচালকজীর নিকট ২২ তারিখের পত্রে তিনি লেখেন, "রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ চন্দ্রকলার মত দিন-দিন সমগ্র প্রান্তে বৃদ্ধি লাভ করছে। আজ আমাদের ছত্রিশটি শাখা হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্ঘরূপী রাষ্ট্রের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নব চৈতন্য উৎপন্ন করে যথাশীঘ্র সম্পূর্ণ প্রান্তকে আমাদের চিন্তাধারার প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।" ৭ই আগষ্ট আরেকটি পত্রে নিজের আনন্দকে শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করে তিনি লেখেন — "মনে ইচ্ছে হয় যে ছোট বালকদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, কারণ তাদের জন্যই সঙ্ঘ আজ শোভা প্রাপ্ত হয়েছে।" নতুন প্রজন্মকে হাতে নিয়ে তথাকথিত 'ইণ্ডিয়ান' রাষ্ট্রবাদের প্রবাহকে হিন্দু রাষ্ট্রের দিশায়

পরিবর্তিত করার যোজনা ডাক্তারজী করেছিলেন। সেই কারণেই ছোট বালকদের সংখ্যা দেখে ডাক্তারজী সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি 'সঙ্ঘরূপী রাষ্ট্র' শব্দ প্রয়োগ এইজন্য করেছিলেন যাতে তাঁর সহকর্মীরা একথা উপলব্ধি করতে পারেন যে সঙ্ঘের আকারে হিন্দু রাষ্ট্রই স্বরূপ পরিগ্রহ করে চলেছে।

এই প্রকার ছুটো-ছুটির মধ্যেই ডাক্তারজীর পরিবারের আয়তন বর্ধিত হয়। ১৯২৭ সালে তাঁর কাকা শ্রী আবাজী হেডগেওয়ার রামপায়লীর বসবাস গুটিয়ে নিয়ে ডাক্তারজীর আগ্রহে তাঁর গৃহেই সপরিবারে থাকতে চলে এলেন। যদিও তাঁরা একটু দূরসম্পর্কে আত্মীয় ছিলেন, কিন্তু ডাক্তারজীর ছাত্র-জীবনের অনিশ্চিত তথা কষ্টের সময়ে আবাজী তাঁকে ধৈর্য তথা উৎসাহ জুগিয়ে ছিলেন এবং যে আত্মীয়তার পরিচয় দিয়ে ছিলেন ও সাহায্য করেছিলেন, সেটা প্রকৃতই ছিল অত্যন্ত মূল্যবান্। এই কারণেই সম্পর্কের দূরত্ব ঘুচে গিয়ে অত্যন্ত নিকট-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আসলে পরস্পরের মনোভাবের ভিত্তিতেই দুই আত্মীয়ের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবহার চলে থাকে। এইরূপ সদ্ভাব না থাকলে সহোদর ভাইরাও পরস্পরের শত্রু হয়ে ওঠে। আর যদি পরস্পরের মধ্যে নির্মল তথা উদাত্ত মনোভাব থাকে তাহলে প্রচলিত অর্থে অনাত্মীয়দের মধ্যেও এমন ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে যে 'দুই দেহ, এক প্রাণ' এই বর্ণনা তাঁদের ক্ষেত্রেই আক্ষরিক অর্থেই প্রযোজ্য হয়। যদি কেউ কথাপ্রসঙ্গে আবাজী সম্বন্ধে বলত ইনি "সম্পর্কে কাকা" হন, সেটা ডাক্তারজীর ভাল লাগত না। এই মনোভাবের কারণেই হেডগেওয়ারদের দুইটি প্রবাহ একত্রে এসে মিশেছিল।

১৯২৯ সালে ডাক্তারজীর কাকিমা শ্রীমতী গঙ্গু বাঈ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে চিকিৎসার জন্য ইন্দোরে নিয়ে যেতে হল। আবাজী ও তাঁর মেয়ে শ্রীমতী ভীমা বাঈও তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। ডাক্তারজীও মাসখানেক ইন্দোরে থাকার সুবাদে সঙ্ঘের শাখা খোলার চেষ্টা করে থাকবেন, একথা বলাই বাহুল্য। অবশ্য, ইন্দোরে থাকলেও ডাক্তারজী সমস্ত শাখার সঙ্গেই চিঠি-পত্রের মাধ্যমে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। একটি পত্রে তিনি 'ভয়সূচক ঘন্টা' এবং 'আই-ওপেনার' নামক দুইটি পুস্তকের পঁচিশটি করে কপি এবং পাঁচটি ভগোয়া ধ্বজও ডাকে পাঠাবার কথা লিখেছিলেন। উক্ত অঞ্চলে সঙ্ঘ-কার্য শুরু করার ভূমিকা হিসাবেই তিনি এইগুলি আনিয়েছিলেন। স্বায়ত্ব-শাসিত রাজ্যের বায়ুমণ্ডলের কথা মনে রেখে তিনি অনেক লোকের সঙ্গে পরিচয় করে নেন এবং এই সময়ের মধ্যে ইন্দোর ও দেবাসে সঙ্ঘের কাজ শুরু করে দেন। সেখানে এক মাসের কিছু অধিক সময়ে চিকিৎসাতেও কোন সুফল লাভ না হওয়ায় শ্রীমতী গঙ্গু বাঈকে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি নাগপুরে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। পরে ডাক্তারজী সত্যাগ্রহ উপলক্ষে যখন কারারুদ্ধ হন, সেই সময়ে শ্রীমতী গঙ্গু বাঈয়ের মৃত্যু হয়।

আজকের বিশেষ বিষম পরিস্থিতিতে স্বয়ংসেবকদের সম্মেলন মঙ্গলজনক হবেনা, এই কথা সহকর্মীদের উপলব্ধি হতেই ঐ কার্যক্রম সহজেই স্থগিত করে দেওয়া হল। কিন্তু তার স্থানে কিছু নির্বাচিত কার্যকর্তাদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ১৯শে অক্টোবর ডাক্তারজী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট একটি পরিপত্র প্রেরণ করলেন। তাতে বৈঠকের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট

ভাষায় জানিয়ে তিনি লিখলেন, "অদূর ভবিষ্যতে বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের তুফানের মধ্যে সঙ্ঘের নৌকা নিরাপদে কেমন করে চলবে? সঙ্ঘের নীতি কী হবে? তীব্রতর গতিতে সঙ্ঘের বৃদ্ধির জন্য কী রকম যোজনা গ্রহণ করতে হবে? এই ধরণের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিবেচনা করার জন্য ৯ ও ১০ই নভেম্বর সমস্ত সঙ্ঘচালকদের সভা নাগপুরে করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই সভায় আপনি দু-একজন প্রমুখ ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন, সঙ্ঘের সাথে যাঁদের আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার দরুন বিচার-বিনিময়ের ব্যাপারে যাঁরা কাজে লাগবেন। অবশ্যই আসবেন।" এই পত্রক থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ভারতীয় রাজনীতিতে সম্ভাব্য আন্দোলন সম্পর্কে ডাক্তারজী পূর্বেই অনুমান করে নিয়েছিলেন। এ কথাও বোঝা যায় তিনি কার্যকর্তাদের মনকে এমনভাবে প্রস্তুত করে দিতে চেয়েছিলেন যে আন্দোলন আরম্ভ হলেও সঙ্ঘের রাষ্ট্রনির্মাণের কাজ যাতে অব্যাহতভাবে চলতে থাকে এবং তার গতি যেন কোন কারণেই বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

যোজনা অনুসারে ৯ ও ১০ ই অক্টোবর নাগপুরে ডোকে মহারাজের মঠে সঙ্ঘচালক ও কার্যকর্তাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। বৈঠকে উপস্থিত সকলেই খোলা মন নিয়ে আলোচনা করে দেশের তৎকালীন পরিস্থিতি এবং জনসাধারণের মনঃস্থিতির বিচার করে অনুশাসনের দৃষ্টিতে সংগঠনের কাঠামো একচালকানুবর্তী রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই আলোচনায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন — সর্বশ্রী বিশ্বনাথ রাও কেলকর, বালাজী হুদ্দার, আপ্পাজী যোশী, কৃষ্ণরাও মোহরীর, তাত্যাজী কালীকর, বাপুরাও মুঠাল, বাবাসাহেব কোলতে, চান্দার দেবইকর এবং মার্তণ্ডরাও জোগ।

বৈঠকের দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় মোহিতে সঙ্ঘস্থানে নাগপুরের সমস্ত স্বয়ংসেবকদের এবং বৈঠকের জন্য সমাগত কার্যকর্তাদের সম্মিলিত কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হল। এই সময়ে সঙ্ঘস্থানের পিছনে আজও উত্তম অবস্থায় অবস্থিত প্রস্তর-নির্মিত সুদৃশ্য তোরণের দিকে পিঠ করে সঙ্ঘচালক ও কার্যকর্তারা দণ্ডায়মান ছিলেন। ডাক্তারজী ধ্বজের কাছে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখছিলেন। এমন সময়ে বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করার ইচ্ছায় শ্রী আপ্পাজী যোশী পূর্বেই যে সূচনা সকলকে দিয়ে রেখেছিলেন, তদনুযায়ী বেশ জোরালো কণ্ঠে আজ্ঞা দিলেন — "সরসঙ্ঘচালক প্রণাম ঃ ১,২,৩।" সমবেত সকল স্বয়ংসেবকেরা সরসঙ্ঘচালক ডাক্তার কেশবরাও হেডগেওয়ারকে প্রণাম করলেন। এরপর একচালকানুবর্তিত্ব সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করে শ্রী বিশ্বনাথ কেলকরের ওজস্বী ভাষণ হল।

পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর এই ব্যাপারটা মনঃপুত হয়নি। কার্যক্রম শেষ হবার পর তিনি বললেন, "আপ্পাজী, আজ আপনি আগে থেকে নিশ্চিত না করা যে কাজ করলেন, তা আমার পছন্দ হয়নি। কারণ, আমার থেকে জ্যেষ্ঠ তথা সম্মানীয় সহকর্মীদের প্রণাম আমি গ্রহণ করলাম, এটা ঠিক হয়নি।" তাঁর কথা শুনে আপ্পাজী নিজের কাজকে সমর্থন করে বললেন, "কাজের সুবিধার জন্য আমরা সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনাকে অপ্রসন্ন করার মত এই কাজ করেছি।" সঙ্ঘচালকদের এই বৈঠকে সরসঙ্ঘচালকজীর সহায়ক হিসাবে সরকার্যবাহ এবং সরসেনাপতি এই দুই অধিকারীও নিশ্চিত করা হল। তদনুযায়ী শ্রী বালাজী

হুদ্দার সরকার্যবাহ এবং শ্রীমার্তণ্ডরাও জোগ সরসেনাপতি নিযুক্ত হলেন। এর সঙ্গে অন্য অধিকারীদের শ্রেণীও নির্দিষ্ট করা হল।

বৈঠকে স্থির হল যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এক চালকের আজ্ঞা অনুসারে চলবে। বিধানের এই একমুখী তথা একতন্ত্রীয় গঠনের স্বরূপ দেখে সঙ্ঘের বাইরের কিছু লোক তার তুলনা মুসোলিনির ফাসিস্ট দলের সঙ্গে করতে শুরু করে। যাঁরা ডাক্তার হেডগেওয়ারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থেকে তাঁর উদাত্ত, সহিষ্ণু, সংগ্রাহক তথা সেবাময় জীবনের স্নিগ্ধ ছায়া লাভের সৌভাগ্য পেয়েছেন, তাঁদের উক্ত বিকৃত কল্পনা, কত ভিত্তিহীন তা বলার প্রয়োজন নেই। ডাক্তারজীর অন্তঃকরণ এতই দেশভক্তিপূর্ণ, সততাযুক্ত তথা নিরহংকারী ছিল যে কোন গঠনতন্ত্রের দোষ তাঁর কাজের মধ্যে বজায় থাকতে পারতনা। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে লোকতন্ত্রের বিচার-বিনিময় এবং একতন্ত্রের অনুশাসন উভয়েরই পরিপূর্ণ সমাবেশ ছিল। সরসঙ্ঘচালকের পদমর্যাদার পিছনে একটি পরিবারের কর্তার ভূমিকাই ব্যক্ত হয়। এই ভূমিকার মধ্যে সব রকম কষ্ট সহ্য করেও পরিবারের পালন-পোষণের দায়িত্ববোধই প্রধান কথা। গোস্বামী তুলসীদাসজী এইরূপ প্রধানের বর্ণন করে বলেছেন ঃ

"মুখিয়া মুখ সোঁ চাহিয়ে, খান পান কহুঁ এক ।
পালৈ পোসৈ সকল অঙ্গ, তুলসী সহিত বিবেক।।"

বিবেকের সহিত পালন-পোষণ-এর সঙ্গে-সঙ্গে সকলকে যথাযোগ্য পথে চালিত করার জন্য কখনো মায়ের মমতা নিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে সঠিক জ্ঞানে দু-চারটি কথা বুঝিয়ে বলার কৌশল, এবং তাতে কাজ না হলে কান ধরে ধমক দেবার পাত্রতাও কর্তার মধ্যে থাকা দরকার। ডাক্তারজীর সম্পর্কে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি একথা স্বীকার করবেন যে এই ধরনের সকল কর্তব্য নির্বাহ করার উপযুক্ত মনঃস্থিতি এবং কর্তব্যের সুযোগ্য সংযোগ সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হেডগেওয়ারজীর চরিত্রে ছিল।

ডাক্তারজীর মনঃস্থিতি যার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছিল, সৌভাগ্যক্রমে তাঁর নিজের হাতে লেখা সেই শব্দগুলি আজও অক্ষুণ্ণ আছে। এই মন্তব্যগুলি ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বরের হলেও আলোচ্য বিষয়ের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় সেগুলিকে এখানে উদ্ধৃত করা উপযুক্ত হবে। তিনি লেখেন ঃ

১। এই সঙ্ঘের জন্মদাতা তথা প্রতিষ্ঠাতা আমি নয়, আপনারা সবাই। এ বিষয়ে আমার পূর্ণ ধারণা আছে।

২। আপনাদের দ্বারা সৃষ্ট সঙ্ঘের, আপনাদের ইচ্ছা ও আজ্ঞায়, আমি ধাত্রীর কাজ করছি।

৩। এর পরেও (যতদিন) আপনাদের ইচ্ছা ও আজ্ঞা হবে, ততদিন এই কাজ আমি করে যাব এবং এই কাজ করার সময় যতই সংকট আসুক এবং মান-অপমান সহ্য করার প্রসঙ্গ আসুক, তথাপি আমি কখনো পিছু হটবনা।

৪। কিন্তু আমার এই কাজের যোগ্যতা না থাকায় আমার দ্বারা সঙ্ঘের ক্ষতি হচ্ছে বলে যদি আপনাদের মনে হয়, তাহলে অন্য যোগ্য মানুষকে এই পদের জন্য খুঁজে নেবেন।

৫। আপনাদের আদেশে যত আনন্দের সহিত আমি এই পদ স্বীকার করেছি, ততটাই

আনন্দের সহিত আপনাদের দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তির হাতে সমস্ত অধিকার সমর্পণ করে সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁর আজ্ঞাবহ স্বয়ংসেবক হিসাবে চলব।

৬। কারণ, আমার কাছে আমার ব্যক্তিত্বের মূল্য নয়, সঙ্ঘকার্যেরই মূল্য আছে এবং সঙ্ঘের মঙ্গলের জন্য কোন কাজ করতেই আমার কোন প্রকার অপমান কখনো মনে হবেনা।

৭। সঙ্ঘচালকের আদেশ যে কোন পরিস্থিতিতে স্বয়ংসেবকের নির্দ্বিধায় পালন করা কর্তব্য। তাছাড়া, 'দেহের থেকে মাথা ভারি' এই অবস্থা সঙ্ঘে কখনই যেন সৃষ্টি না হয়, তার মধ্যেই সঙ্ঘকার্যের রহস্য নিহিত।

৮। অতএব, নিজেই সে আদেশ পালন করে অন্য স্বয়ংসেবককে দিয়ে সেই আদেশ পালন করানো--এটা প্রত্যেক স্বয়ংসেবকের কর্তব্য।"

কর্তব্য জ্ঞানে ভরতের মত সকল কার্যের বোঝা বহন করার মত মনের প্রস্তুতি এবং সেই সঙ্গে নেতৃত্বের রত্নখচিত সিংহাসনকে নিজের বলে মনে না করে, তার উপর হিন্দু-রাষ্ট্রপুরুষের পাদুকা-যুগলকে স্থাপন করার বৈরাগ্য তথা সেবাভাব ডাক্তারজীর রূপে মূর্তিমান হয়েছিল। এইরূপ কর্তব্য-কঠোর তথা কার্যের প্রতি উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিত্ব এই বৈঠকে সরসঙ্ঘচালকের পদে আরূঢ় হয়েছিলেন। সময় একথা প্রমাণ করেছে যে এই গঠনতন্ত্রের মধ্যেই সঙ্ঘের অনুশাসনপূর্ণ বিকাশের রহস্য নিহিত আছে।

বৈঠকশেষে কার্যকর্তারা নিজ-নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করার কিছু কাল পরেই পরম পূজনীয় ডাক্তারজী কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানাবার জন্য সমস্ত সঙ্ঘশাখাগুলিকে ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩০ তারিখে সভার আয়োজন করার আদেশ দিলেন। সেই সময়ে কংগ্রেস ও হিন্দুস্থানী সেবাদল ভ্রান্তিবশতঃ সঙ্ঘের বিরোধিতা করতে শুরু করেছিল। কিন্তু ডাক্তারজী জানতেন যে ভুল দিয়ে ভুল সংশোধন করা যায় না। সেই কারণে অন্যের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহারের অনুরূপ প্রতিক্রিয়া নিজেদের দিক থেকে ব্যক্ত করা তাঁর অভিপ্রেত ছিলনা। কংগ্রেসের মধ্যে দোষ-ত্রুটি তিনি অবশ্যই দেখেছিলেন, কিন্তু সেই কারণে কংগ্রেসের সবকিছুই একেবারে খারাপ ও বর্জনীয় বলে তিনি কখনো মনে করেননি। বিশেষতঃ ইংরেজদের বিরোধিতা করার জন্য যে কেউ উঠে দাঁড়ালে তাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে তিনি কখনো পিছ্-পা হতেন না। কংগ্রেস ও সঙ্ঘের ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য ও সাম্য কী তা ডাক্তারজী জানতেন। মতভেদ থাকা সত্ত্বেও যে সব বিষয়ে সমানতা ছিল, সে গুলির ব্যাপারে সহযোগিতা করার তৎপরতা তিনি সব সময়ে দেখাতেন। সেই সময়ে সংস্থাগুলির সম্বন্ধে তিনি তাঁর আলোক-পুস্তিকায় লেখেন ঃ

"হিন্দু সংস্কৃতি হিন্দুস্থানের প্রাণ। অতএব, হিন্দুস্থানকে রক্ষা করতে হলে হিন্দু সংস্কৃতির রক্ষণই প্রথম কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। যদি হিন্দুস্থানের হিন্দু সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে যায়, হিন্দুসমাজের চিহ্ন মাত্র যদি দেশে না থাকে, তাহলে অবশিষ্ট ভূমি খণ্ডকে হিন্দু রাষ্ট্র অথবা হিন্দুস্থান বলা শোভনীয় হবেনা। কারণ, রাষ্ট্র কেবল ভূমির টুকরো নয়। একথা সত্য হলেও হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতিকে রক্ষা করার প্রতি এবং হিন্দু সমাজের উপর ধ্বংসাত্মক আক্রমণের প্রতি দুর্ভাগ্যক্রমে কংগ্রেস সম্পূর্ণ উদাসীন থাকার ফলে, এই অত্যাবশ্যক কাজ করার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা আছে। তা সত্ত্বেও সঙ্ঘ কংগ্রেসের একেবারেই বিরোধী

নয়। আমাদের রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির পথে স্বাধীনতা লাভের যে কার্যক্রম বাধা সৃষ্টি করবেনা তাতে সঙ্ঘ কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করবে, এবং আজ পর্যন্ত তাই করে এসেছে।'' এই উদাত্ত ভূমিকা নিয়ে ডাক্তারজী সব শাখাগুলির নিকট এক পরিপত্রক প্রেরণ করলেন। তাতে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রচেষ্টায় স্বীকৃত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবকে স্বাগত জানানো হয়েছিল। সঙ্ঘের পূর্ণ স্বাধীনতার ধ্যেয় তথা সহযোগিতার নীতির উপর এই পরিপত্রকটি আলোকপাত করেছিল, সেই কারণে এটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাতে লেখা হয়েছিল, ''এই বছর কংগ্রেসের ধ্যেয় পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার দরুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করেছে যে রবিবার, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩০ সমগ্র হিন্দুস্থানে ''স্বাধীনতা দিবস'' রূপে পালন করা হবে। অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সভা আমাদের স্বতন্ত্রতার ধ্যেয় স্বীকার করেছে। তা দেখে আমাদের অত্যন্ত আনন্দিত হওয়া স্বাভাবিক। এইরূপ ধ্যেয় নিজেদের সামনে যে সংস্থাই রাখবে, তার প্রতি সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য। অতএব, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সমস্ত শাখা রবিবার, দিনাঙ্ক ২৬ জানুয়ারী, ১৯৩০ সায়ংকাল ঠিক ছটার সময়ে নিজেদের সঙ্ঘস্থানে শাখার সকল স্বয়ংসেবকদের মধ্যে সভা করে রাষ্ট্রীয় ধ্বজ অর্থাৎ গেরুয়া পতাকার বন্দনা করবে। বক্তৃতায় স্বাধীনতার কল্পনা এবং প্রত্যেকের নিজের সম্মুখে এই ধ্যেয় কেন রাখা উচিত একথা বিশদ করে বলে এবং কংগ্রেস যে স্বাধীনতার ধ্যেয়কে স্বীকার করেছে তার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে যেন সমারোহ সম্পূর্ণ করা হয়।''

এই আদেশ অনুসারে সব শাখায় 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করা হয়। সমবেত সঙ্গীত, শোভাযাত্রা, বক্তৃতা, 'শ্রদ্ধানন্দ' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত স্বাধীনতা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি পাঠ এবং বন্দে মাতরম্-এর উদ্‌ঘোষ ইত্যাদি বিবিধ কার্যক্রম এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

দেশের মধ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। এই আন্দোলনে সঙ্ঘ কী ভূমিকা গ্রহণ করবে তা সঠিক কল্পনা না থাকায় পুলিশ বিভিন্ন স্থানে স্বয়ংসেবকদের কষ্ট দিচ্ছিল। 'তোমাদের প্রধান কে?' সঙ্ঘের টাকা-পয়সা কার কাছে থাকে?' এই ধরনের নানা প্রশ্ন সঙ্ঘের ছোট-ছোট স্বয়ংসেবকদের জিজ্ঞেস করে তাদের বিরক্ত করার সংবাদ শোনা যেতে লাগল। এইসব ব্যাপারকে ঠিক মত সামাল দেবার জন্য ডাক্তারজী স্বয়ংসেবকদের উপরে শহরের ব্যবহার-কুশল, ওজনদার প্রৌঢ় ব্যক্তিদের সঙ্ঘচালক রূপে নিযুক্ত করার প্রতি লক্ষ্য দিলেন এবং এরকম ব্যবস্থা করলেন যাতে শাখার কাজের ব্যাপারে আর্থিক আয়-ব্যয়ের হিসাবও যেন ঐ প্রৌঢ় ব্যক্তিই রাখেন। ডাক্তারজী তাঁর নিজের আচরণের দ্বারা এই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে সার্বজনিক কাজের জন্য সংগৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহার যেন অত্যন্ত উপযুক্ত কারণে এবং মিতব্যয়িতার সঙ্গে করা উচিত। দক্ষতার সহিত কাজে লাগানো অর্থ সংগঠনের পক্ষে লাভজনক হয়, কিন্তু যদি যেমন-তেমন করে তার ব্যবহার হয়, তাহলে সেই অর্থই সংগঠনের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে। সেই কারণে তিনি এ বিষয়ে বিশেষ জোর দিতেন যে সংগঠনের প্রতিটি পাই-পয়সার হিসাব যথাযথভাবে এবং ঠিক সময়ে লেখা দরকার। এই কাজে তিনি তাঁর কাকা শ্রী আবাজী হেডগেওয়ারের কাছ থেকে অনেক সাহায্য লাভ করেছিলেন। তাঁর স্বভাবের মধ্যে অত্যন্ত দক্ষতা তথা নিয়মনিষ্ঠা থাকার ফলে কার্যালয়

এবং আয়-ব্যয়ের তিনি অতি সুন্দর ব্যবস্থা বজায় রাখতেন। ১৯৩০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী এই বিষয়ে ডাক্তারজী যে কথা লিখে রেখেছিলেন, তার থেকে তাঁর আয়-ব্যয় বিষয়ক ধারণার উপরে চমৎকার আলোক-পাত হয়। তিনি লেখেন, ‘‘সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার দিন থেকে ১৯৩০ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত হিসাব, এমনভাবে পরীক্ষা করে ঠিকমত তৈরী করা হয়েছে, যাতে কোন সমালোচক যেন তার মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি না বের করতে পারে। কারণ, পরবর্তীকালে এইরূপ সুব্যবস্থার অত্যন্ত আবশ্যকতা থাকবে।’’ টাকা-পয়সা সম্বন্ধে তাঁর সততা কয়েকজন যাচাই করেও দেখেছিলেন। একবার ডাক্তারজী ‘অল ইণ্ডিয়া রিপোর্টারের’ সম্পাদক রাও সাহেব দাতারের নিকট অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন, তখন তিনি ডাক্তারজীর কাছে তাঁর আয়-ব্যয়ের হিসাবের খাতা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তদনুযায়ী ডাক্তারজী তাঁর কাছে উক্ত হিসাবের খাতা পাঠিয়ে দিলেন। অতি সূক্ষ্মভাবে খাতা নিরীক্ষণ করার সময়ে শ্রী দাতার দেখলেন যে তার মধ্যে সঙ্ঘস্থানে কুড়িয়ে পাওয়া এক পয়সা আয় হিসাবে দেখানো হয়েছে দেখে তিনি অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করলেন। এবং তিনি মুক্ত হস্তে চাঁদা দিলেন। ডাক্তারজী সকলকে বলতেন যে আর্থিক ব্যবহারের বিষয়ে এইরূপ দক্ষতা রাখা আবশ্যক।

সংগঠনের তন্ত্রের অনেক ছোট-খাট খুঁটি-নাটি বিষয় ধীরে-ধীরে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই নিশ্চিত করা হয়েছে। সঙ্ঘের ঘোষ (ব্যাণ্ড) বাদন-কলায় এত দক্ষ হয়ে গিয়েছিল যে জন-সাধারণ সহজেই তার প্রতি আকৃষ্ট হত। তার ফলে সঙ্ঘকে যাঁরা ভালবাসতেন তাঁরা নিজেদের উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য ডাক্তারজীর কাছে ঘোষের ব্যবস্থা করে দেবার দাবী করতে থাকেন। নিজেদের লোকদের ‘না’ বলাও মুশকিল, আবার ‘হাঁ’ বলাও সম্ভব নয়। তাই ডাক্তারজী বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। কয়েকজন সহকর্মী বললেন যে যদি পয়সা পাওয়া যায় তাহলে ঘোষ দিলে ক্ষতি কী? কিন্তু শুধু পয়সার কথা ভেবে ঘোষ-বাদক স্বয়ংসেবকদের মধ্যে হীনমন্যতার ভাব সৃষ্টি করা ডাক্তারজীর মনঃপুত ছিল না। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, সঙ্ঘের ঘোষ স্বাধীনতা তথা বৈভবের লক্ষ্য পথে যে তরুণরা এগিয়ে চলেছে তাদের সঙ্গ দেবার জন্যই শুধু গর্জনা করে যাবে। অতএব, একজন বন্ধু যখন তাঁর ঘরোয়া অনুষ্ঠানের জন্য ঘোষ দেবার বিষয়ে অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করলেন, তখন ডাক্তারজী তাঁকে বললেন, ‘‘তোমার ছেলে যদি দেশের জন্য দিগ্বিজয় করে আসত, তাহলে তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আমি স্বয়ং ঘোষ নিয়ে যেতাম এবং দেশের গৌরব বৃদ্ধিকারী ঐ সুসন্তানের আগমনের আনন্দ বার্তা দশ দিকে ধ্বনিত করে দিতাম। কিন্তু তার বিবাহের জন্য তুমি যত টাকাই দেবার কথা বল না কেন, তাও এই ঘোষ দেওয়া যাবে না। তারপর একজনকে দিলে অনেকেই চাইবে। যদি একই সময়ে অনেকে চায় — যাদের দেওয়া যাবে না, তারা অসন্তুষ্ট হবে।’’ এতে সঙ্ঘকার্যে বাধার সৃষ্টি হবে দেখে ডাক্তারজী স্থির করলেন যে সঙ্ঘের ঘোষ কেবল রাষ্ট্রীয় কাজের জন্যই বাজানো হবে।

পয়সা যেখান থেকেই পাওয়া যাক, তা নিতে হবে — এই নীতি সার্বজনিক সংস্থাগুলির পরিচালকদের নিরুপায় হয়ে গ্রহণ করতে হয়, কেননা বেশীর ভাগ তাঁদের কোন সুনিশ্চিত

ও সংগতিসম্পন্ন অর্থাগমের উৎস থাকেনা, এবং কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজন আয়ের চেয়ে অনেক বেশী থাকে। কিন্তু এটুকু মনে রাখা দরকার যে পয়সা নেবার সময়ে অঙ্গীকৃত কাজের পবিত্রতায় যেন কোন প্রকার ন্যূনতা না ঘটে। কিন্তু কখনো কখনো অর্থের অনিবার্যতা, সংস্থার কাজের থেকেও বেশী জরুরী বলে মনে হয় এবং সাধারণ লোকেরা অর্থকেই সব জিনিষ লাভ করার একমাত্র চাবি বলে মনে করে তার খুব গুণগান করে থাকে। ১৯৩০ সালের পূর্বে সঙ্ঘের বাল্যাবস্থায় অর্থের অভাব দেখে নাগপুরের 'মহাল অ্যামেচার ক্লাব' এবং বর্ডীর সমবায় সংস্থা প্রস্তাব করে যে তাদের নাটকের টিকিট যদি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা বিক্রী করে, তাহলে সেই অর্থের একটা অংশ ওরা সঙ্ঘকে দেবে। কার্যকর্তারা যখন এই প্রস্তাবের কথা বৈঠকে উত্থাপন করেন, তখন ডাক্তারজী তাতে সম্মতি দেননি এবং দু-তিন দিন পরে স্পষ্ট ভাষায় তা অস্বীকার করেন।

এই ঘটনার কিছু কাল পরেই নাগপুরে 'তারাবাঈ সার্কাস' এল। তার পরিচালকরা শ্রীমার্তণ্ডরাও জোগের অনুরোধে একটি খেলার পাঁচ ছয় শো টাকা সঙ্ঘকে দিলেন। সেই অর্থ স্বীকার করার পরেই কয়েকজন ডাক্তারজীকে প্রশ্ন করলেন – "আপনি এই পয়সা কেমন করে নিলেন।" এর উত্তরে ডাক্তারজী যা বললেন তা ভাববার মত। তিনি বললেন, "সার্কাস ও নাটকের মধ্যে তফাৎ আছে। তা ছাড়া এই পয়সা গ্রহণ করলেও এই ধরণের অর্থের ভরসায় সঙ্ঘের কাজ চলুক, এই কল্পনা আমার অসহ্য মনে হয়। সঙ্ঘের কাজ স্বয়ংসেবকদের এবং সঙ্ঘ-হিতৈষী মানুষদের সানন্দ সমর্পিত দক্ষিণার উপরেই নির্ভর করা উচিত।"

আন্দোলনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ডাক্তারজী অর্থের অভাব বেশী করে অনুভব করতে লাগলেন। সঙ্ঘ কার্যের জন্য ব্যয়-বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে মনে হয় ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি স্বয়ংসেবকদের ও সঙ্ঘ হিতৈষীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। হিতচিন্তকদের প্রতি প্রকাশিত আবেদন-পত্রে তিনি লিখেছিলেন — "আজ পর্যন্ত আমরা বিনা পয়সায় কীভাবে কাজ চালিয়েছি, তা আমরাই জানি। কিন্তু এর পরে সঙ্ঘের পক্ষে বিনা পয়সায় কাজ করা অত্যন্ত কষ্টকর। সে কথা আমি অত্যন্ত বিনম্রতার সাথে আপনাদের জানাতে চাই। এর জন্য উদার-হৃদয় মানুষদের নিকট হতে অংশদান গ্রহণ করে একটি বৃহত্তর নিধি সংগ্রহের কথা বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু এখন আমরা মাসিক চাঁদার জন্য আপনাদের নিকট উপস্থিত হয়েছি। এবং আপনাদের নিকট অত্যন্ত বিনম্র নিবেদন এই যে আপনার আয়ের থেকে এক দিনের আয় আমাদের মাসিক চাঁদা হিসাবে দিয়ে উপকৃত করুন। যদিও এটাই আমাদের প্রার্থনা, তথাপি আপনি সানন্দে যা দেবেন, তাই আমরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করব।"

স্বয়ংসেবকদের কাছ থেকেও ঐ বছর অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। তাদের বয়স ও সঙ্গতির পরিপ্রেক্ষিতে যে নিয়ম ডাক্তারজী একটি কাগজে লিখেছিলেন, তার শেষে দুটি সূচনাও লিখিত আছে দেখা যায়। এই সূচনা থেকে একটি কথা স্পষ্ট যে যদিও চাঁদা প্রদান অনিবার্য ছিলনা, তথাপি শ্রদ্ধা ও আত্মীয়তার দরুন কেউ যতটুকুই দিক তাও অপর্যাপ্তই হবে, এইরূপ আবশ্যকতা তখন অনুভূত হচ্ছিল। তিনি লেখেন--"উপরে লিখিত অনুসারে চাঁদা

দেওয়া কোনরূপে সম্ভব না হলে স্বয়ংসেবকদের অভিভাবকরা বললে তাঁদের কাছ থেকেও চাঁদা একেবারেই নেওয়া হবেনা। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হওয়ার দরুন চাঁদা দেওয়া আবশ্যিক নয়।" তার নিচে বিশেষ দ্রষ্টব্য হিসাবে লেখা হয়েছিল, 'উপরে চাঁদার সর্বনিম্ন হার লেখা হয়েছে। সেই পরিমাণেই সীমিত থাকার প্রয়োজন নেই। শুধু তাই নয় এই মহৎ কাজের জন্য যথাসাধ্য অধিক আর্থিক ত্যাগ করার নিমিত্ত প্রস্তুত হয়ে যত অধিক চাঁদা দেওয়া সম্ভব, ততখানি দেওয়া আবশ্যক।" এই অর্থ সংগ্রহ করার সময়েও ডাক্তারজী লক্ষ্য রাখতেন যে অর্থ প্রদানকারীর প্রসন্নতাও যেন বজায় থাকে। তাঁর লোক-সংগ্রাহক স্বভাব তাঁকে অন্য প্রকার আচরণ করতে দেয়নি।

হিঙ্গনঘাটের পিস্তল-কাণ্ডের পরে সঙ্ঘকার্যের প্রতি সরকারের সন্দেহের মাত্রা বৃদ্ধি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিল, আর এখন তো সরকার বিরোধী আন্দোলনই শুরু হতে চলেছিল। সরকারের অনুমান ছিল যে ডাক্তারজী সঙ্ঘ চালাচ্ছেন বটে, কিন্তু তাঁর অতীত ইতিহাসের কথা স্মরণ করলে, আন্দোলন শুরু হলে তিনি হয়তো তাঁতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, অতএব তাঁর নীতি সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেওয়ার প্রতি সরকার বেশী প্রয়াসী হতে আরম্ভ করে। সরকারের এই তৎপরতার কথা ডাক্তারজীও জানতে পেরেছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল যে আন্দোলন শুরু হবার পর সরকার কোন-না-কোন ছুতোয় তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠাবে, এবং তখন তাঁর বাড়ীতে সঙ্ঘের বৈঠক করা এবং কার্যালয় রাখা সম্ভব হবেনা। সেই পরিস্থিতিতে যাতে কোন গণ্ডগোল না হয় তার জন্য তিনি মোহিতে প্রাসাদের নিকট ওয়াকার রোড সংলগ্ন দশোত্তরের ভবনে কার্যালয়ের জন্য একটি পৃথক স্থান ভাড়া নিলেন। ভাড়ার জন্য মাসে কুড়ি টাকা জমা করার ব্যবস্থাও তিনি করে দিলেন। বাইরে থেকে এটা দেখাবার জন্য যে এটা ছাত্রদের নিবাস-স্থান, তিনি শ্রী তুম্বড়ে ও শ্রীবাটবে নামক দুইজন ছাত্রেরও থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

১৯৩০ সালের গোড়া থেকেই মহাত্মা গান্ধীজী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' সাময়িক পত্রের মাধ্যমে সত্যাগ্রহের প্রচার বেশ ধূমধাম করে শুরু করে দিয়েছিলেন। তাতে এই নীতিও ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল যে "সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হবার পর দেশের কোন অংশে অত্যাচার চললেও আন্দোলন বন্ধ হবেনা।" এই ঘোষণার কথা জেনে সরকার আরো বেশী চাপে পড়ে গেল। গান্ধীজী ও ভাইসরয়ের মধ্যে পত্রালাপও শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাঁর দাবী সরকার মেনে নেবেনা, এর আভাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ১২ই মার্চ সাবরমতী আশ্রম থেকে ৭৯ জন সত্যাগ্রহীকে সঙ্গে নিয়ে লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য সমুদ্র তীরবর্তী দাণ্ডীর উদ্দেশে যাত্রা করবেন বলে ঘোষণা করে দিলেন। দুশো মাইল পদযাত্রা করে এবং প্রচারের ধ্বনি সহকারে 'দাণ্ডী যাত্রা' ৫ই এপ্রিল সম্পূর্ণ হল এবং ৬ই এপ্রিল সকালে মহাত্মাজী সমুদ্রে স্নান করে লবণ সংগ্রহ শুরু করে সত্যাগ্রহের রণশিঙা বাজিয়ে দিলেন। এর পর দেশের সর্বত্র ধর-পাকড় শুরু হয়ে গেল এবং সরকারের দমন-চক্র চালু হয়ে গেল। কিন্তু লক্ষাধিক জনতা স্বাভিমানের সঙ্গে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে উঠে দাঁড়াল এবং "রাখবো না, রাখবো না - অত্যাচারী সরকার রাখবো না" স্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।

১৭. জঙ্গল সত্যাগ্রহ

পরমপূজনীয় ডাক্তারজী দেখে আনন্দিত হলেন যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। তাঁর লেখায় ও কথা-বার্তায় এই আনন্দ ব্যক্তও হত। কিন্তু অপর দিকে তাঁর মনে এই আশংকাও উঁকি মারত যে আন্দোলনের ধাক্কায় চিরন্তন রাষ্ট্রোত্থানের যে কাজ তিনি হাতে নিয়েছেন তার যেন উপেক্ষা না ঘটে, কারণ তার বিস্তার ও শক্তি তখনও খুব কম ছিল। সাধারণতঃ যারা ভাবুকতার বশে কাজ করে, তারা শুধু ক্ষণস্থায়ী বর্তমানের কথাই চিন্তা করে। কিন্তু সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে পাঁচ বা পঞ্চাশ বছরেরই নয়, বরং ভবিষ্যতের শত-সহস্র বর্ষের ইতিহাসকে বৈভবসম্পন্ন, স্বাভিমানপূর্ণ এবং আনন্দময় করার সংকল্প নিয়ে যাঁরা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাজের নিত্য তথা নৈমিত্তিক স্বরূপের বিবেচনা অবশ্যই করতে হয়। এই বিবেকের ভিত্তিতেই ডাক্তারজী নিজের সম্পূর্ণ জীবনের গতিবিধি নির্ধারিত করেছিলেন।

আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর সহকর্মীদের পক্ষ থেকে সত্যাগ্রহের প্রতি সঙ্ঘের নীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা আরম্ভ হয়ে গেল। সেই কারণে ডাক্তারজী এক পত্রক প্রকাশ করে সকলকে জানালেন — "সঙ্ঘ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত এখনো গ্রহণ করেনি। ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি তাতে অংশ নিতে চান, তাহলে নিজের সঙ্ঘচালকের অনুমতি নিয়ে অংশগ্রহণে কোন বাধা নেই। সঙ্ঘের কাজের দিক থেকে যে রীতি অনুকূল মনে হবে, সেই রীতি সহ তিনি যেন ঐ কাজ করেন।"

আন্দোলনের এই পরিবেশের মধ্যেও প্রতি বছরের মত এই বছরও অধিকারী শিক্ষণ বর্গ অধিকতর সংখ্যায় শুরু হল। ডাক্তারজীর বিশেষ সাহচর্যে থাকা অনেক যুবক কার্যকর্তা সঙ্ঘের সম্পূর্ণ ক্রমিক শিক্ষণ সম্পূর্ণ করে এখন নিজ যোগ্যতা-বলেই যে কোন স্থানে সঙ্ঘ-কার্য চালানোর বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে নিয়েছিলেন। এই বর্গের সময়ে ডাক্তারজী একটি শুশ্রূষা-গণ আরম্ভ করার পরিকল্পনা করেন এবং তাকে কার্যকর করার পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। সেই সময়কার কাগজপত্রগুলি থেকে জানা যায় যে ডাঃ পরাঞ্জপের পরিকল্পনা অনুসারে নাগপুর, বিলাসপুর, ভাণ্ডারা, চান্দা, ওয়ার্ধা, হিঙ্গনী, সেলু, আঁজী, আলিপুর, নাটনগাঁও, সালোভ-ফকীর, আর্বী, খাপা ও ধনোডী নামক স্থানগুলিতে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য স্বয়ংসেবকদের গণ তৈরী করা নিশ্চিত হয়। এই স্থানগুলির মধ্যে উক্ত পরিকল্পনা কোথায়-কোথায় কার্যকর হয়েছিল তা বলা আজ কঠিন, কিন্তু এ বিষয় নিশ্চিতরূপে জানা গেছে যে নাগপুর থেকে এক শত তরুণদের একটি অনুশাসনবদ্ধ বাহিনীকে শিক্ষা দিয়ে তৈরী করার ব্যাপারে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়েছিল।

ডাক্তারজীর বিশেষ আগ্রহ ছিল যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রত্যেক পথ-সঞ্চলন এবং

বড়-বড় কার্যক্রমে তার নিজস্ব শুশ্রূষা-পথক থাকা প্রয়োজন। তাঁর মতে কোন নির্দিষ্ট ও অনুশাসনবদ্ধ কার্যক্রমের মাঝখানে যদি কেউ মূর্ছিত হয়ে পড়ে যায় অথবা যদি কারোর প্রাথমিক চিকিৎসা করার প্রয়োজন হয়, তখন সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ অথবা আনাড়ি মানুষেরা ঘাবড়ে গিয়ে বৃথা দৌড়ঝাঁপ করে সব শৃঙ্খলা নষ্ট করে দেয়। এই জন্য অকুস্থলে এই ধরণের গণ্ডগোলের পরিবর্তে শিক্ষিত 'গণ'এর মাধ্যমে শান্তিপূর্বক উপযুক্ত উপচারের ব্যবস্থা করা তিনি আবশ্যক বলে মনে করতেন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা তিনি উল্লেখ করতেন। দিল্লীতে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা ফেলার পর শোভাযাত্রার মধ্যে সেখানেই তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন যে সঙ্ঘের মধ্যেও এইরূপ আদর্শ ব্যবস্থা রাখা হোক। এই ইচ্ছাকে কার্যকর করার জন্য এই গণ তৈরী করা হয়েছিল। এই সময়ে শ্রী বোস সঙ্ঘকে কিছু 'ওয়াটার ব্যাগস্' প্রদান করেন, যার ফলে শুশ্রূষা 'গণ'-এর উপকরণের একটি অভাব অনায়াসে দূর হয়েছিল।

অধিকারী শিক্ষাবর্গ শেষ হবার পর কয়েকজন ব্যক্তিগতভাবে সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেন ডাক্তারজীর কাছে। উৎসুক ব্যক্তিদের আন্দোলনে অংশ নিতে আপত্তি না করার নীতি ডাক্তারজী গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সঙ্ঘ-কার্য অব্যাহত রাখার জন্য কিছু তরুণ কার্যকর্তা বাইরে থাকাও আবশ্যক ছিল। অতএব, তাদের মধ্যে থেকে যদি কেউ অনুমতি নিতে আসত, তাহলে ডাক্তারজী তাকে জিজ্ঞেস করতেন, ''কত দিনের প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছ?'' 'ছ মাসের' সাধারণভাবে এই রকম উত্তর আসত। তখন ডাক্তারজী জিজ্ঞেস করতেন, ''ছ মাসের বদলে, যদি দু বছরের শাস্তি হয়, তাহলে?'' এই প্রশ্নের উত্তর হত — ''ভোগ করব।'' কেউ এ রকম প্রস্তুতি দেখালে ডাক্তারজী তাকে বলতেন, ''মনে কর তোমার শাস্তি হয়ে গেছে। এই সময়টা সঙ্ঘ-কার্যের জন্য দাওনা কেন?'' এই প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পেরে অনেক বুদ্ধিমান্ তরুণ সে রকমই করল। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। অবশিষ্ট কয়েক শত তরুণদের ডাক্তারজী অনুমতি দিয়েছিলেন। এই অনুমতি দেবার সময়ে তাঁর এই কথা ভেবে কষ্ট হচ্ছিল যে এই তরুণদের মনে আমাদের কাজের তথা ধ্যেয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার পরিবর্তে 'আমরাও কিছু করেছি' এই দেখাবার মনোভাবই প্রবল ছিল। এই সব তরুণদের নিকট উপরিউক্ত প্রশ্ন করার পর ডাক্তারজী তাদের পরামর্শ দিতেন যে তারা শুধু ভাবাবেগবশতঃ আন্দোলনে না ঝাঁপিয়ে বিচার-বিবেচনাপূর্বক যেন তাতে অংশগ্রহণ করে।

আন্দোলনের সময়ে সঙ্ঘের শুশ্রূষা-গণ ছোট-বড় সব শোভাযাত্রার সঙ্গে-সঙ্গে থাকত। অনেক স্বয়ংসেবক ব্যক্তিগতভাবে সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। ডাক্তারজী চিন্তা করে দেখলেন যে এই সময়ে সম্পূর্ণ সমাজের মন্থন হয়ে দেশভক্তিপূর্ণ যথার্থ কার্যকর্তারা কারাগারের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একত্রিত হবেন। যদি এই রকম সম্ভাবনাময় তথা দেশভক্তির ভাবনাযুক্ত তরুণ কার্যকর্তাদের ঘনিষ্ঠতা লাভের সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে সঙ্ঘের দিক থেকে গ্রামে-গ্রামে গিয়ে এক-এক জনকে খুঁজে বেড়াবার থেকে অধিক লাভজনক কাজ হবে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যখন চতুর্দিকে ক্ষোভ তথা অসন্তোষের আগুন জ্বলতে শুরু

করেছিল, তখন এমনিতেই এই পাবনযজ্ঞে নিজেরও কিছু অর্ঘ্য সমর্পণের ইচ্ছা ডাক্তারজীর মত অভিজাত দেশপ্রেমিকের মনে না ওঠাই আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল। সঙ্ঘের দৈনন্দিন কার্য অবাধে চলতে থাকার যোজনা করার পর তিনি দেশোদ্ধারের প্রত্যেক কাজেই সব সময়ে যোগদান করতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যখন আলন্দীর পালকি পন্ঢরপুর যায়, তখন কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে যাওয়া সম্ভব না হলে দিন্ডীর পতাকা নিয়ে নিজের শহরের এক দ্বার থেকে অন্য দ্বার পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যাঁরা যোগদান করতেন, তাঁদের মতই ডাক্তারজীও অবশ্যই অংশগ্রহণ করতেন।

হিঙ্গনঘাটের স্টেশনে যে লুটের ঘটনা ঘটেছিল, তার মামলা শেষ হবার পর সঙ্ঘের অধিকারীদের পিছনে গোয়েন্দাদের ঘোরাঘুরি গত দেড়-দু বছরে কিছুটা কমেছিল। তা সত্ত্বেও কিছু সরকারী অধিকারী সঙ্ঘের প্রতি সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে — সে অভিজ্ঞতা মাঝে-মাঝে হত। এই অবস্থায় আপ্পাজী চিন্তা করে দেখেলেন যে কিছুদিন যদি সরকারী অধিকারীদের চোখের সামনে না থাকা যায় তাহলে উক্ত ঘটনার দরুন অকারণে যে দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে, সেটা আপনা থেকেই অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেই কথা ভেবে তিনি ডাক্তারজীকে মার্চ মাসেই দু একবার বলেন যে "আমার মনে হয় আমার সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করা উচিত।" বর্গ শেষ হলে এ বিষয়ে চিন্তা করা যাবে — এই উত্তর দিয়ে ডাক্তারজী সেই সময় কথাটা এড়িয়ে গেলেন। বর্গের সময়ও আপ্পাজী যোশী বিষয়টি পুনরায় উত্থাপন করেন। সেই সময় আপ্পাজীর স্বাস্থ্য এবং সঙ্ঘ-কার্যের বৃদ্ধি এই দুটি কারণ দেখিয়ে ডাক্তারজী তাঁর অসম্মতি ব্যক্ত করেন। বর্গ শেষ হয়ে যাবার পর আবার একবার ডাক্তারজীর সম্মতি লাভের উদ্দেশ্যে আপ্পাজী তাঁর নিকট পত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্রের উত্তরে ডাক্তারজী জানান, "আমিও আপনার সঙ্গে সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করতে আসছি।" এই উত্তর পেয়ে আপ্পাজীর মনে হল যে ডাক্তারজী সম্ভবতঃ একটু বিরক্ত হয়েছেন, এবং সোজাসুজি 'না' বলার পরিবর্তে তিনি স্বয়ং নিজের যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। সেই কারণে তিনি ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে নাগপুরে এলেন। সেখানে ডাক্তারজীর মনোগত ভাবনা আপ্পাজী জানতে পারলেন।

সত্যাগ্রহ শুরু হওয়ার পর তিন মাস অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। সমুদ্র থেকে পাঁচ-ছ'শো মাইল দূরে মধ্যপ্রান্তের সত্যাগ্রহীদের পক্ষে লবণ-আইন অমান্য করার জন্য এত দূরে আসা ক্রমেই কষ্টকর হয়ে পড়ছিল। সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল এটুকুই যে কোন-না-কোন প্রকারে সামগ্রিক রূপে একথা সরকারকে জানিয়ে দেওয়া যে আমরা ইংরেজদের আইন মানিনা। অতএব, এই চিন্তা জোরদার হয়ে উঠতে লাগল যে মধ্যপ্রান্তের জন্য জঙ্গল-আইন ভেঙে সত্যাগ্রহ করার পদ্ধতি অধিকতর উপযুক্ত হবে। এমনিতেই, ১৯১৭ সাল থেকে সরকার গবাদি পশুর চারণ-ভূমি রূপে ব্যবহৃত জঙ্গল গুলিকে সংরক্ষিত বন ঘোষণা করে সেগুলিকে বন-বিভাগের হাতে অর্পণ করার ফলে জনসাধারণের মধ্যে ভারী ক্ষোভ তথা অসন্তোষ ছিল। সেই ক্ষোভ ব্যক্ত করার জন্য লোকমান্য তিলকের প্রধান সহকর্মী তথা অনুগামী শ্রী মাধবরাও অণে সেই সময় থেকেই আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি এই বিষয়ে সরকারের নিকট বহু আবেদন ও স্মারকলিপি দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল — "জঙ্গলের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থা

সংক্রান্ত সরকারী নীতির ভিত্তি কোষ-বৃদ্ধির পরিবর্তে প্রধানতঃ কিষানদের প্রয়োজন ও সুবিধাই হওয়া উচিত। কিষানদের গবাদি পশু যেন পেটভরার মত জাব্না পায় এবং তাদের প্রয়োজনমত ঘাস-পাতা, কাঠ ইত্যাদি যেন তারা নাম-মাত্র মূল্যে পায়। এরপর যা বাঁচবে, সেই উৎপাদন সরকারের নিজের জন্য নেওয়া উচিত।'' কিন্তু এই সব প্রার্থনায় সরকার কর্ণপাত করেনি। পরিণামে, এই সমস্ত প্রচেষ্টা আক্ষরিক অর্থেই অরণ্য-রোদনে পরিণত হয়।

১৯১৭ সাল থেকে প্রারব্ধ এই আন্দোলনকে এখন আরো বেশী তীব্র করার উদ্দেশ্যে শ্রী মাধবরাও অণে জঙ্গল-সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ডাক্তারজী এবং আপ্পাজী যোশীও একই সময়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তিলক-পন্থার অনুগামী হওয়ার ফলে চিন্তা-ভাবনার দিক থেকেও তিনজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নিজ প্রান্তের মধ্যেই সত্যাগ্রহ করা অনেক কারণে লাভপ্রদ ছিল। অতএব, তাঁরা সমুদ্র তীরে গিয়ে লবণ-আইন ভঙ্গ করার পরিবর্তে জঙ্গল-সত্যাগ্রহেই অংশগ্রহণ করার সংকল্প নিলেন। এই সিদ্ধান্তের পিছনে দুইটি প্রধান কারণ ছিল। লোকনায়ক অণে ছাত্রাবস্থায় ডাক্তারজীকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছিলেন। এখন তাঁর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছেন, এটা তাঁর কাছে সন্তোষের বিষয় ছিল। তাছাড়া বিদর্ভে তখনও সঙ্ঘের কাজ প্রসারিত হয়নি। ডাক্তারজীর মনে হল, কারাগারে যাঁরা আসবেন তাঁদের সাহায্যে সেখানে অবস্থানকালে তিনি সঙ্ঘের বিস্তারের ভূমিকাও তৈরী করে ফেলবেন।

সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর ডাক্তারজী তাঁর অনুপস্থিতিকালে সঙ্ঘ-কার্যের সমুচিত পরিচালনার যোজনা তৈরী করেন এবং সেই যোজনা তাঁর সমস্ত সহকর্মীদের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। নাগপুরের কাজের দায়িত্ব শ্রী বাবাসাহেব আপটে ও শ্রী বাপুরাও ভেদীর উপর অর্পণ করা হয় এবং ডাঃ পরাঞ্জপেকে সরসঙ্ঘচালক নিযুক্ত করা হয়। ১৯৩০ সালের ১২ই জুলাই গুরুদক্ষিণা মহোৎসবের দিন তাঁর ভাষণে তিনি উপরিউক্ত যোজনা সার্বজনিকভাবে ঘোষণা করেন এবং সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকার বিষয়ও বুঝিয়ে বলেন।

এই উৎসবের সভাপতি ডাঃ লঃ বাঃ পরাঞ্জপে তাঁর ভাষণে বলেন যে ডাক্তার হেডগেওয়ার তাঁর কয়েকজন সহযোগীর সঙ্গে সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, ''যাঁরা অংশগ্রহণ করতে চান, তাঁরা সানন্দে যান, কিন্তু অবশিষ্ট সকলকে এই তরুণ সংগঠনের কাজে এগিয়ে আসতে হবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে বর্তমান আন্দোলন রাষ্ট্রকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবে, কিন্তু সেটা স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রথম সোপান মাত্র হবে। রাষ্ট্রের স্বাধীনতার জন্য নিজের সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করার মত মানুষদের সংগঠিত করাই হল বাস্তবিক কাজ।''

উৎসবের শেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ডাক্তারজী নিজের ভূমিকা সুস্পষ্ট করেন। তিনি বলেন, ''কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বসার পরে আমি সঙ্ঘের চালক থাকব না। ডাঃ পরাঞ্জপে সঙ্ঘের চালকত্ব গ্রহণের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। এর জন্য আমি সঙ্ঘের পক্ষ থেকে তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা যারা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছি, সকলেই

নিজেদের ব্যক্তিগত দায়িত্বে তা করছি। সঙ্ঘের চিন্তাধারা ও কার্যপদ্ধতির মধ্যে কোন রকম পরিবর্তন হয়নি অথবা ঐগুলির উপর আমাদের শ্রদ্ধাও টলেনি। দেশের মধ্যে যত আন্দোলন চলে সেগুলির অন্তর্বাহ্য জ্ঞান প্রাপ্ত করা এবং তার সদ্ব্যবহার আমাদের কাজের জন্য করে নেওয়া দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রয়াসী প্রত্যেক সংস্থার কর্তব্য। সঙ্ঘের যাঁরা এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন, আজ আমরা যারা যাচ্ছি, সকলেই এই কারণেই অগ্রসর হয়েছি।"

"জেলে যাওয়া আজ দেশভক্তির লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি দু বছর জেলে গিয়ে থাকতে প্রস্তুত, তাকে যদি বলা হয় বাড়ী-ঘর থেকে দু বছরের ছুটি নিয়ে দেশের মধ্যে স্বাধীনতায় ব্রতী সংগঠনের কাজ কর, তার জন্য প্রস্তুত নয়। এরকম কেন হবে? মনে হয় এরা একথা উপলব্ধি করতে প্রস্তুত নয় যে দেশের স্বাধীনতা এক বছর বা ছ মাস কাজ করে নয়, বরং বছরের পর বছর অবিরাম সংগঠন করে তবেই পাওয়া যাবে। এই মরশুমি দেশভক্তি না ছাড়লে এবং দেশের জন্য মৃত্যু-বরণের প্রস্তুতি যদিচ অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু তার থেকেও বেশী, সংগঠনের স্বাধীনতার জন্য সংগঠনের কাজ করা অব্যাহত রেখে বেঁচে থাকার সংকল্প ব্যতীত দেশের ভাগ্য পরিবর্তিত হবে না। এই মনোভাব যুবকদের মনে উৎপন্ন করা এবং তাদের সংগঠন করাই সঙ্ঘের ধ্যেয়।"

এই ভাষণের পর সঙ্ঘের সরসেনাপতি শ্রী মার্তণ্ডরাও যোগ ডাক্তারজী এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা যাচ্ছেন সেই সব কার্যকর্তাদের পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

এইরূপ ব্যবস্থা হবার পর ১৪ই জুলাই সন্ধ্যায় ডাক্তারজীর দল নাগপুর থেকে রওনা হয়। তাঁদের বিদায় জানাতে স্টেশনে দুই-তিনশো মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সরসঙ্ঘচালক ডাঃ পরাঞ্জপে, শ্রী ঢবলে এবং ব্যারিস্টার গোবিন্দরাও দেশমুখ প্রভৃতি ডাক্তারজীর স্নেহভাজনদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেকে ডাক্তারজীকে মাল্যভূষিত করে তাঁকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, "বর্তমান আন্দোলনই স্বাধীনতার শেষ লড়াই এবং তার ফলেই স্বাধীনতা লাভ করা যাবে — এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করবেন না। এর পরে আসল লড়াই লড়তে হবে এবং তাতে সর্বস্বের বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন। আমরা এবং অন্য যাঁরা এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছি, তার কারণ এই যে আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের এই পদক্ষেপ স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।" সে দিন ট্রেনে তিনি এবং অন্যান্যরা ওয়ার্ধা গেলেন।

পর দিন ১৫ই জুলাই সকালে ডাক্তারজী এবং তাঁর সহকর্মীদের শ্রীরাম মন্দিরে সম্বর্ধনা দেওয়া হল এবং স্টেশন পর্যন্ত শোভাযাত্রা বের করা হল। পথে অনেক জায়গায় তাঁদের মাল্যভূষিত করা হল, মহিলারা আরতি করলেন। ডাক্তারজী যখন ট্রেনে উঠলেন তখন আর্বীর শ্রীনারায়ণরাও দেশপাণ্ডে ও শ্রী ত্র্যম্বকরাও দেশপাণ্ডে প্রমুখ তাঁর বন্ধুরা তাঁকে সাদরে বিদায় জানাতে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তারজী তাঁদের 'চলুন' বলতেই তাঁরাও তাঁর সঙ্গে ট্রেনে উঠে পড়লেন। এইভাবে অকস্মাৎ জেলে চলে গেলে পরিবার-পরিজনদের কী ব্যবস্থা হবে তার জন্য চিন্তা মাত্র না করে নির্দ্বিধায় নেতার কথাকে আদেশ বলে মেনে নেওয়াতেই কৃতার্থ তথা সার্থক বলে মনে করার মত বন্ধু ও অনুগামী ডাক্তারজী তৈরী করেছিলেন — যেটা তাঁর

চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। ওয়ার্ধার পরে পুলগাঁও, ধামণগাঁও ইত্যাদি স্থানেও সম্বর্ধনা গ্রহণ করে সত্যাগ্রহীর দল পুসদ পৌঁছলেন। ডাক্তারজীর সঙ্গে শ্রীআপ্পাজী যোশী, 'মহারাষ্ট্র' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী বালাসাহেব ঢবলে, শ্রী দাদারাও পরমার্থ, শ্রী বিট্ঠলরাও দেব, শ্রীবেখণ্ডে, শ্রী ঘরোটে, শ্রী ভাইয়াজী কুম্বলওয়ার, আর্বীর শ্রী অম্বাডে, শ্রী নারায়ণরাও দেশপাণ্ডে, সালোড-এর শ্রী ত্র্যম্বকরাও দেশপাণ্ডে এবং চান্দার শ্রীপালেওয়ার ছিলেন। সত্যাগ্রহ শিবিরে ভোজন করার সময়ে তরকারিতে লঙ্কা বেশী থাকায় কয়েকজন যখন ঝালের চোটে 'উঃ আঃ' করতে লাগলেন, তখন ডাক্তারজী হাসতে হাসতে বললেন, "এখানে যখন ভালো করে খেতে পারছনা, তখন জেলে কী হবে?"

সত্যাগ্রহের জন্য পুসদে যাবার পর সেখানকার কেন্দ্র-সঞ্চালক বললেন যে ঐ দলের সকলে এমন স্তরের নেতা যাঁরা পৃথকভাবে কয়েকটি গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করতে পারেন। অতএব এই দলের সকলের এক সঙ্গে সত্যাগ্রহ করা ঠিক হবে না। কিন্তু ডাক্তারজীর সঙ্গে আইন-ভঙ্গ করে বিশেষ তৃপ্তি লাভ হবে মনে করে সকলে বললেন যে আলাদা-আলাদা গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করার বদলে তাঁরা ডাক্তারজীর দলের অনুগামী হয়ে সত্যাগ্রহ করা বেশী পছন্দ করবেন। সুতরাং ঠিক হল যে এই দল ২১ শে জুলাই যবতমালে সত্যাগ্রহ করবে। পুসদের সত্যাগ্রহ লোকনায়ক অণের নেতৃত্বে শুরু হয়ে গিয়েছিল। যবতমালের সত্যাগ্রহ কোন বিখ্যাত ব্যক্তির নেতৃত্বে সূচনা করা আবশ্যক মনে হল। অতএব, সত্যাগ্রহের সঞ্চালকরা মনে করলেন যে ডাক্তারজীর মত নেতা পুসদে সাধারণভাবে সত্যাগ্রহ না করে যবতমালে তার বীজারোপণ করুন। সত্যাগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট তিথির তখনো পাঁচ-ছ দিন বাকি ছিল। এই কদিন সত্যাগ্রহ আশ্রমে অকারণ বসে থাকা ডাক্তারজীর ভাল লাগল না। অতএব, তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে দারহ্বা-পুসদ অঞ্চলে প্রচারের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে তিনি জেলে গিয়ে লোকনায়ক অণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁর সত্যাগ্রহ করার কথা তাঁকে বললেন। সেই সময়কার স্মৃতি রোমন্থন করে লোকনায়ক অণে বর্তমান লেখককে বলেন, "প্রয়োজন হলে দুষ্ট ব্যক্তির মাথা ফাটাবার মত ক্ষমতাধর হৃষ্ট-পুষ্ট তরুণদের ডাক্তার হেডগেওয়ারের দলের মধ্যে দেখে আমার খুব আনন্দ হল।"

পুসদের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সেখানে পৌঁছবার পর দিন প্রাতঃকালে যখন ডাক্তারজী নদী থেকে শৌচাদি সমাপ্ত করে ফিরে আসছিলেন, তখন তিনি দুজন মুসলমানকে এক হৃষ্ট-পুষ্ট জোয়ান গরুকে ধরে নিয়ে যেতে দেখলেন। ঔৎসুক্যবশতঃ ডাক্তারজী জিজ্ঞেস করলেন, "গরু কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?" তারা উত্তর দিল, "নিয়ে যাচ্ছিনা কোথাও। একটু পরেই এখানে আমরা এর কুরবানি করব।" সকালবেলায় হিন্দু বস্তীর মধ্যে প্রকাশ্য রাস্তার উপরে এইভাবে গোহত্যা করার কথা শুনে ডাক্তারজী ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি ঐ ছেলেদের গরুর দাম জিজ্ঞেস করলেন। ওরা বলল, "বারো টাকায় কিনেছি, কিন্তু আমাদের কসাই-এর ব্যবসা, তাই এটা আমরা বিক্রী করব না।" তখনই বুড়ো কসাইও সেখানে এসে উপস্থিত হল। "এরকম খোলা জায়গায় গোহত্যা করবে?" ডাক্তারজীর প্রশ্ন শুনে বুড়ো উদাস সুরে বলল, "বহু বছর ধরে আমরা এখানেই গরু কাটি আর মাংস বিক্রী করি।" ডাক্তারজী জিজ্ঞেস

করলেন, ''মাংস বিক্রী করে কত টাকা পাবে?'' আরো বললেন, ''সেই পয়সা আমি দিচ্ছি, একে মেরো না।'' ততক্ষণে আরো বেশ কয়েকজন মুসলমান সেখানে এসে উপস্থিত হল। মাংস বেচে পঁচিশ-ত্রিশ টাকা পাওয়া যাবে জেনে ডাক্তারজী সেই টাকা দিতে রাজি হলেন। কিন্তু কসাই গরু দিতে চাইছিল না। ''আমি পয়সা নিয়ে কী করব? আমি এখনই আপনার সামনে এর কুরবানি করছি।'' তার দম্ভভরা উক্তি শুনে ডাক্তারজী গরুর দড়ি নিজের হাতে নিয়ে নিলেন এবং কঠোর তথা গম্ভীর স্বরে বললেন, ''আমার প্রাণ থাকতে তোমরা এর চুল পর্যন্ত বাঁকাতে পারবে না।'' তাঁর এই উগ্র রূপ দেখে কয়েকজন মুসলমান গ্রামে গিয়ে কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে ডেকে আনল। তাঁরা ডাক্তারজীকে খুব বোঝাবার চেষ্টা করলেন — ''এখানে গরু কাটা একটা প্রথাগত ব্যাপার। অতএব, আপনি গরুকে রক্ষা করার জেদ ছেড়ে দিন।'' বহু বছরের কুসংস্কারের দরুন সংকীর্ণ, স্বাভিমানশূন্য তথা স্বকীয়তা-বর্জিত মানুষদের নেতা হতে দেখে ডাক্তারজী অত্যন্ত বেদনা বোধ করলেন। এই সময় জনৈক সজ্জন এগিয়ে এসে বললেন, ''আপনারা জঙ্গল-সত্যাগ্রহের জন্য এসেছেন। তাহলে এই সব ফাল্‌তু ব্যাপারে কেন নাক গলাচ্ছেন?'' তাই শুনে ডাক্তারজী একটু গরম হয়ে বললেন, ''হিন্দুদের পূজ্য গরুকে রক্ষা করা কি ফাল্‌তু ব্যাপার? জঙ্গল-সত্যাগ্রহ করা অথবা গরুর জন্য সত্যাগ্রহ করা আমার কাছে দুটোই সমান।''

এমন সময়ে পুলিশ অফিসারও সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং ডাক্তারজীকে অনুরোধ করল, ''ঝগড়া লেগে যাবে, তাই এসব করবেন না।'' তাই শুনে ডাক্তারজী বললেন, ''পঁচিশ-ত্রিশ টাকা দেব বলেছি, তা সত্ত্বেও আমার চোখের সামনে গরু কাটার জেদ ধরেছে কেন? তাই আর একবার স্পষ্ট কথায় জানাচ্ছি যে আমি এবং আমাদের দলের লোকেদের বেঁচে থাকতে গরু কাটা যাবে না।'' ব্যাপারটা এত জটিল হয়ে পড়ায় পুলিশ অফিসার বলল — কেউ যখন হার মানবে না, তখন ঝগড়া হয়ে যাবে। সেই কারণে আমি দুজনকেই গ্রেপ্তার করছি।'' এই হুম্‌কিতে ডাক্তারজীর ভয়ের কোন কারণ ছিল না। তিনি তো প্রাণের মোহ ত্যাগ করে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখানোর অর্থ বীরকে ভূতের ভয় দেখানোর মত হাস্যাস্পদ ব্যাপার ছিল। এই হুম্‌কি শুনে কিন্তু মুসলমানদের মাথা ঠাণ্ডা হল। ডাক্তারজী ত্রিশ টাকা দিয়ে গরুটা কিনে স্থানীয় গোরক্ষণ-সংস্থাকে উপহার দিলেন।

সকালের এই ঘটনার কথা জেনে সকলের মুখেই ডাক্তারজীর বিষয়ে আলোচনা সর্বত্র শুরু হয়ে গেল। তার পরিণামে দেখা গেল যে বিকেলের সার্বজনিক সভায় নগরের সমস্ত জনতা ভেঙে পড়ল। সভার সভাপতি কানডে শাস্ত্রী ডাক্তারজীর দেশভক্তির মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করলেন এবং এক বিপ্লবী হিসাবে তাঁর পরিচয় করালেন। শ্রী আপ্পাজী যোশী এবং শ্রী দাদারাও পরমার্থও এই সভায় বক্তৃতা দেন। তারপরে ডাক্তারজী বক্তৃতা দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। সেদিন তাঁর ভাষণ শুনে মনে হচ্ছিল বুঝি জ্বলন্ত আগুনেরই বর্ষা হচ্ছে। সেদিনের তাঁর কয়েকটি কথা আজও অনেকের মনে আছে। তিনি বলেছিলেন, ''.... স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের বুট পালিশ করা থেকে শুরু করে তাদের বুট পা থেকে খুলে নিয়ে তাই দিয়ে ওদেরই মাথাকে রক্তাক্ত করে তোলা পর্যন্ত সমস্ত উপায় আমার স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাধন হতে

পারে। কোন পথ সম্বন্ধেই আমার মনের মধ্যে কোন রকম সংকোচের ভাব নেই। আমি শুধু একটা কথাই জানি যে ইংরাজদের তাড়িয়ে দেশকে স্বাধীন করতে হবে।"

পুসদ থেকে সকলে যবতমাল গেলেন। সেখানে কয়েকজন জেদ ধরলেন যে তাঁদের সঙ্ঘের গণবেশ পরেই সত্যাগ্রহ করা উচিত। এ বিষয়ে অনেক আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হল এবং দু-একজন বাড়ীতে 'তার' পাঠিয়ে গণবেশ আনাবার জন্য প্রস্তুতও হলেন। টেলিগ্রাম লেখা পর্যন্ত ডাক্তারজী কোন কথা না বলে সমস্ত বাদ-বিবাদ চুপ করে শুনে গেলেন। কিন্তু সেটি লেখা হবার পরে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি বললেন, "আমি ভেবেছিলাম আপনারা সঙ্ঘের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চিন্তা করবেন। আমরা গণবেশ পরে সত্যাগ্রহ করলে তার অর্থ কী দাঁড়াবে? আমরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছি, কিন্তু সেই সঙ্গে দেশের সম্পূর্ণ পরিস্থিতির উপর সঙ্ঘের যে কাজ অত্যন্ত পরিণামকারক বলে প্রমাণিত হবে সেই মূলগামী তথা অগ্রগণ্য কাজ যাতে অখণ্ডরূপে চলতে থাকে, সে বিষয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে।" যাঁরা জেদ ধরেছিলেন, তাঁরা গণবেশের চিন্তা ত্যাগ করলেন।

যোজনানুসারে ২১ শে জুলাই সকাল সাড়ে ছটায় যবতমালে রণশিঙ্গা নিনাদিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সত্যাগ্রহ শিবির থেকে আইন ভঙ্গকারী দলের শোভাযাত্রা বিপুল আড়ম্বরের সহিত বেরিয়ে পড়ল। নগর ভবন এর মাঠে শোভাযাত্রা পৌঁছবার পরে সেখানে ধ্বজ-বন্দনা হল এবং সংরক্ষিত বনে ঘাস কাটার জন্য সকলকে কাস্তে দেওয়া হল। দলের প্রধান হওয়ার দরুন ডাক্তারজীকে রূপোর কাস্তে দেওয়া হল। শোভাযাত্রা প্রথমে রুইমণ্ডী পর্যন্ত গেল। শোভাযাত্রায় তিন-চার হাজার মানুষ সম্মিলিত হল। সেখানে শোভাযাত্রা শেষ হল এবং পরে হেঁটে, সাইকেলে, গরুর গাড়ীতে, মোটরগাড়ী ইত্যাদিতে জঙ্গলের নির্দিষ্ট স্থানে সকলে গিয়ে পৌঁছলেন। সত্যাগ্রহের এই স্থান যবতমাল থেকে ছ মাইল দূরে লোহারা জঙ্গলে ধামণগাঁও-এর রাস্তার নিকটেই ছিল। সেখানে সত্যাগ্রহ দেখার জন্য প্রায় দশ হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিল। তখনকার দিনে সত্যাগ্রহের স্থান, সময় এবং তারিখের পূর্ব-সূচনা সরকারী অফিসারদের দেওয়ার পদ্ধতি ছিল। সেই কারণে সেখানে বন-বিভাগের অফিসার ও পুলিশের লোকেরা আগে থেকেই উপস্থিত ছিল।

ঠিক নটার সময়ে ডাক্তারজী তাঁর দলের সঙ্গে পৌঁছলেন। সমবেত জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের জয়ধ্বনি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। তখনই বন-বিভাগের অফিসার তাঁদের জিজ্ঞেস করল — "আপনারা কাস্তে নিয়ে এখানে এসেছেন। আপনাদের কাছে অনুমতিপত্র আছে কি?" এই কথা বলে তাঁদের পথ আটকালো। কিন্তু অফিসারকে উপেক্ষা করে সকলে কাস্তে দিয়ে ঘাস কাট্‌তে শুরু করে দিলেন। একটু পরেই পুলিশ অফিসার এগিয়ে এল এবং সকলকে গ্রেপ্তার করার কথা ঘোষণা করল। তখন ডাক্তারজী উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে বলেন, "আমাদের বিশ্বাস আছে যে আমাদের বন্দী করার পরেও আপনারা এই আন্দোলনকে ভালোভাবে চালিয়ে যাবেন।" এরপর সকলকে মোটর গাড়ীতে তুলে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হল।

সেই দিনই যবতমাল কারাগারে শ্রীভরূচার আদালতে সত্যাগ্রহীদের মামলা পেশ করা

হল এবং তৎক্ষণাৎ সকলকে দণ্ডও দেওয়া হল। ডাক্তার হেডগেওয়ারকে ধারা ১১৭-এর অন্তর্গত ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ধারা ৩৭৯-এর অন্তর্গত তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল। অবশিষ্ট সত্যাগ্রহীদের চার মাস করে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। হাজতে থাকার সময়ে সাব-ইন্‌স্পেক্টর শ্রী ধোঙ্গডে বন্ধুর মত সকলকে ভাল করে জলপান করালেন এবং যবতমালের সিভিল সার্জেন শ্রী সম্মনওয়ার তাঁদের জেলে পাঠাবার আগে সকলকে মিষ্টান্ন ভোজন করান। ডাক্তারজীর বন্ধু-মণ্ডলী এইভাবে সারা প্রদেশে সকল শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। ভোজনে বসার সময়ে ডাক্তারজী হাসতে হাসতে বলেন, "আরম্ভটা ভালই হল।"

সন্ধ্যার সময়ে তাঁদের রেলগাড়ীতে অকোলা-কারাগারের উদ্দেশে রওনা করা হল। পথে প্রায় সমস্ত স্টেশনে সত্যাগ্রহীদের দর্শন করার জন্য ভিড় জমেছিল এবং প্রত্যেক স্থানে ডাক্তারজীকে দশ-পাঁচ মিনিট কিছু বলতেও হচ্ছিল। যবতমাল-মূর্তিজাপুর রেলপথে দারহ্বা একটি বড় স্টেশন। ওখানে প্ল্যাটফর্মের উপরেই মঞ্চ তৈরী করে সত্যাগ্রহীদের সম্বর্ধনা জানাবার বিরাট ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রায় সাত থেকে আটশো মানুষ সেখানে সমবেত হয়েছিল। গাড়ী ঐ স্টেশনে থামতেই ডাক্তারজীর জয়ধ্বনিতে বাতাবরণ মুখরিত হয়ে উঠল। দারহ্বা পর্যন্ত ডাক্তারজী কামরার দরজায় দাঁড়িয়েই জনতার সম্বর্ধনা গ্রহণ করছিলেন। কিন্তু এখানে শ্রী ডাউ উকিল এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সজ্জনদের আগ্রহের ফলে তাঁকে মঞ্চ পর্যন্ত যেতে হল। সেখানে ট্রেন বেশ কিছুক্ষণ থামত। সেই কারণে ডাক্তারজীর পনের-কুড়ি মিনিটের বক্তৃতাও হল। গাড়ীর কামরায় যখন ফিরলেন তখন সেখানকার লোকেরা ফল ও মিষ্টির ঝুড়ি গাড়ীতে এনে রেখে দিল এবং গাড়ী ছাড়তেই সকলের 'বন্দেমাতরম্'-এর জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস গুঞ্জরিত হয়ে উঠল।

স্টেশন ছেড়ে গাড়ী এগিয়ে চলল এবং জয়ধ্বনির শব্দও স্তিমিত হয়ে গেল। সেই সময়ে পুলিশ অফিসার বৃদ্ধ রামসিংহকে আদেশ দিল "রাম সিংহ, হাতকড়া বের কর।" ডাক্তারজী জিজ্ঞেস করলেন, "হাতকড়া কেন?"

"আমি কী করব? ডি এস পি আমাকে ফোনে বলেছেন। আমি চাকর মাত্র, যেমন হুকুম হবে, সেইরকম করতে হবে।" অফিসার উত্তর দিল।

"ডি এস পি-র যদি সেরকম ইচ্ছা থাকত তাহলে সত্যাগ্রহের পর এতক্ষণ হাতকড়া পরানো হয়ে যেত। কিন্তু আপনি দেখেছেন যে তিনি তা করেননি," ডাক্তারজী অফিসারের কথার প্রতিবাদ করে বলেন।

"কিন্তু এখন তাঁর সেরকমই আদেশ", অফিসার বলল।

একথা শুনেই ডাক্তারজী বুঝতে পারলেন যে সে মিথ্যা কথা বলছে। সেই কারণে তিনি অনুত্তেজিত স্বরে বললেন, "এটা আমার প্রথমবার জেলযাত্রা নয়। তাছাড়া আমরা স্বেচ্ছায় সত্যাগ্রহ করেছি। সেই কারণে আমরা পালাবার মানুষ নই। সুতরাং হাতকড়া লাগাবার ফন্দী কোরো না।" কিন্তু পুলিশ অফিসার কোন কথা শুনতে রাজি হলনা। সে কঠোর স্বরে হাঁক দিল, "রামসিং, হাতকড়া আনছনা কেন?" এই কথা শুনে ডাক্তারজী গরম হয়ে বললেন,

"মনে হচ্ছে আপনি নম্রতার ভাষা বোঝেন না। আপনি যদি হাতকড়া পরাবার সংকল্প করে থাকেন তাহলে আমাকেও আমার সংকল্প দেখাতে হবে।"

"তার মানে আপনি হাতকড়া পরাতে দেবেন না?" গলা চড়িয়ে তরুণ অফিসার বলল।

তার কঠোর বাক্য যেন বারুদে আগুন ধরিয়ে দিল।

ডাক্তারজী একদম গর্জে উঠে বললেন — "পরা দেখি কেমন করে হাতকড়া পরাস। তুই আমাদের কী মনে করছিস? বেশী ট্যাঁ-ফোঁ করলে পুঁটুলি বেঁধে কামরার বাইরে ছুড়ে ফেলে দেব। কী আর হবে, শাস্তি আরো বাড়বে। কিন্তু আমরা এই ভেবে বেরুইনি তো যে শুধু নয় মাসের কারাদণ্ড হবে।"

ডাক্তারজীর আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ দেখে পুলিশের লোকগুলো ভয়ে কুঁকড়ে গেল। তখন আপ্পাজী পুলিশ অফিসারকে বুঝিয়ে বললেন, "আপনি এই প্রদেশে নতুন এসেছেন মনে হচ্ছে। এ কথা মিথ্যে যে ডি এস পি এরকম আদেশ দিয়েছেন। বিভিন্ন স্থানে অভ্যর্থনা দেখে আপনি খুব বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু এরকম ফন্দী করবেন না। ভেবেছেন, ডি এস পি মুসলমান বলে তাকে এইভাবে খুশি করবেন — এরকম চিন্তা করা বেকার। হাতকড়া পরানো দেখলে ঐ ডি এস পি আপনারই কান ছিঁড়ে দেবেন। তখনই আপনি টের পাবেন যে ডাক্তারজীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী রকম। আমরা পালিয়ে যাব না কি?"

আপ্পাজীর কথায় তাল মিলিয়ে সঙ্গের পুলিশ সেপাইরাও হাতকড়া না পরাবার পরামর্শ দিল। এবার অফিসারের পারা অনেক নেমে গেল। সে বলল, "আমি গরীব মানুষ। নানা স্টেশনে আপনারা নামছেন, সেই সময়ে আপনাদের কেউ পালিয়ে যান তাহলে আমার ফাঁসি হয়ে যাবে। অন্যথা, আপনাদের মত মানুষদের হাতকড়া পরাবার জন্য আমার মাথাব্যথা কেন হবে?"

তাই শুনে আপ্পাজী বললেন, "পালাবার হলে দারহ্বা পর্যন্ত পালাতে পারতাম না? আপনি চিন্তা করবেন না। আমাদের বারো জনকে ঠিকমত জেলে পৌঁছে দেবার কীর্তি আপনারই থাকবে, নিশ্চিন্ত থাকুন।" এরপর কামরার উত্তেজনা শান্ত হয়ে গেল।

আবহাওয়াকে হাল্‌কা করার উদ্দেশ্যে ডাক্তারজী হাঃ হাঃ হাসতে হাসতে বললেন, "হয়েছে আপানার বিশ্বাস? আপনাকে বোঝাবার কৃতিত্ব আপ্পাজীর ভাগ্যে ছিল, তাই আমার কথা আপনার পছন্দ হল না।" ডাক্তারজীর এই কথা শুনে সকলের মুখে হাসি খেলে গেল। আর ডাক্তারজী মিষ্টির ঝুড়ি এগিয়ে দিয়ে সকলকে কাছে ডাকলেন এবং পুলিশ সহ সকলকে মিষ্টি খাওয়ালেন। কিছুক্ষণ আগেই আগ্নেয়গিরির মত জ্বলন্ত মনে হয়েছিল যাঁকে, সেই ডাক্তারজীরই এমন শান্ত, স্নিগ্ধ তথা প্রসন্ন মুখ দেখে অফিসারের অত্যন্ত আশ্চর্য লাগল।

রাত দশটার সময় গাড়ী মূর্তিজাপুর পৌঁছল। সেখানে গাড়ী বদল করে রাত বারোটায় সত্যাগ্রহীর দল অকোলো পৌঁছলেন। স্টেশনেই সরকারী মোটরগাড়ী দাঁড়িয়েছিল এবং রাতারাতি সকলকে কারাগারে পৌঁছে দেওয়া হল। সে রাতে সকলকে একটি ঘরেই রাখা হল।

ডাক্তারজীর দ্বিতীয় কারাবাস শুরু হয়ে গেল।

১৮. দ্বিতীয় কারাবাস

পরমপূজনীয় ডাক্তার হেডগেওয়ার যেদিন সত্যাগ্রহ করেন, তার পরের দিন মঙ্গলবার, ২২শে জুলাই নাগপুরের সমস্ত স্বয়ংসেবকদের এই সংবাদ জানাবার জন্য সঙ্ঘস্থানে সম্মিলিত করা হল। ঐ কার্যক্রমে সরসঙ্ঘচালক ডাঃ লঃ বাঃ পরাঞ্জপে, শ্রী নানাসাহেব টালাটুলে, শ্রী কালীকর, ব্যারিস্টার দেশমুখ ইত্যাদি বিশিষ্ট সজ্জনরাও উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ে একজন স্বয়ংসেবক সত্যাগ্রহের সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত পাঠ করে শোনাল। এরপর ডাঃ পরাঞ্জপে ডাক্তারজী যে ঘাস কেটে সত্যাগ্রহ করেছিলেন, তা সকলকে দেখিয়ে ধ্বজের নিকট অর্পণ করেন। পরিশেষে ডাঃ মুঞ্জে বলেন, "এই সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে যে সাহস আমাদের সঙ্ঘের ডাক্তার হেডগেওয়ার ইত্যাদিরা দেখিয়েছেন, সেইরূপ সাহসই হিন্দু সমাজ তথা হিন্দু রাষ্ট্র রক্ষার জন্য পরবর্তীকালের সমস্ত সংঘর্ষেই সকলকে দেখাতে হবে।"

অকোলা জেলে পৌঁছবার পর ডাক্তারজীর দলের বন্দীদের সরকারী নিয়ম অনুসারে 'বি' ও 'সি' শ্রেণীতে বিভক্ত করা হল। এই শ্রেণীবিভাগ জেলের প্রধান অফিসার শ্রী ফোর্ডের সামনে সকলকে হাজির করিয়ে করা হল। কিন্তু সেই সময়ে ফোর্ড ডাক্তারজীকে তাঁর পাশের চেয়ারে বসিয়ে নিয়েছিলেন। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে ডাক্তারজী যখন নাগপুর জেলে ছিলেন, সেই সময়ে শ্রী ফোর্ড ঐ জেলের অফিসার ছিলেন। সেই সময়েই তাঁদের দুজনের মধ্যে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। এবার সংযোগ বশতঃ পুনরায় তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটল। এতে দুজনেই আনন্দিত হলেন। শ্রী ফোর্ড আয়ার্ল্যাণ্ডের নাগরিক ছিলেন, এবং তাঁর সুন্দর ব্যবহারে একথা ব্যক্ত হচ্ছিল যে তাঁর মনে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি আছে।

ডাক্তারজীর দলকে চার ভাগে বিভক্ত করা হল। ডাক্তারজীকে 'বি' শ্রেণী দেওয়া হয়েছিল, অবশিষ্ট সকলকে 'সি' শ্রেণী দেওয়া হয়েছিল। এঁদের তিনভাগে ভাগ করে আলাদা-আলাদা ব্যারাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। দ্বিতীয় ব্যারাকে বালাসাহেব ঢবলে, বেখণ্ডে, আপ্পাজী যোশী ও ত্র্যম্বকরাও দেশপাণ্ডে ছিলেন। পঞ্চম ব্যারাকে দাদারাও পরমার্থ, বিট্‌ঠলরাও দেব, নারায়ণরাও দেশপাণ্ডে এবং অম্বাডে ছিলেন। ষষ্ঠ ব্যারাকে ভৈয়াজী কুম্ভলওয়ার, মারুতরাও পালেওয়ার এবং ঘরোটে ছিলেন। এই শ্রেণীবিভাগে যদিও কয়েকজনকে সরকারী নিয়মানুসারে 'সি' শ্রেণীতে পাঠাতে হয়েছিল, কিন্তু শ্রী ফোর্ডের সেটা ভাল লাগেনি। সেইজন্য তিনি ডেপুটি কমিশনারের নিকট তাঁদের মধ্যে আট জনকে 'বি' শ্রেণী দেবার জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু সেখান থেকে তাঁদের সরাসরি 'বি' শ্রেণীতে প্রেরণ করার আদেশ দেওয়ার পরিবর্তে তাঁর উত্তর এল যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যদি লিখিত ভাবে এইরূপ প্রার্থনা করেন, তাহলে এ বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ার ফলে আরো কয়েকজন 'বি' শ্রেণী লাভ করেন।

অকোলা কারাগারে 'হেলা গোডাউন' নামক বিখ্যাত ভবনে 'বি' শ্রেণীর সত্যাগ্রহীদের রাখা হয়েছিল। তার উদ্‌ঘাটন ডাক্তারজীই করলেন। একশো ফুট দীর্ঘ ও ত্রিশ ফুট প্রস্থ ঐ বিশাল কক্ষে প্রথম এক সপ্তাহ ডাক্তারজীকে একেবারে একাকীই কাটাতে হল। তারপরে যবতমালের শ্রী সঃ হঃ বল্লালকে সেখানে পাঠান হল। সাত দিন একাকী থাকার পর একজন সঙ্গী পাওয়াতে দুজনেরই অত্যন্ত আনন্দ হল। সাত দিন পরে ডাক্তারজী কথা বলার সুযোগ পেলেন। এরপর ক্রমে ক্রমে অমরাবতী জেলা ব্যতীত অন্যান্য জেলার সত্যাগ্রহীদেরও অকোলা জেলে পাঠানো শুরু হল। জঙ্গল-সত্যাগ্রহে সর্বপ্রথম অংশগ্রহণের ফলে এই সমস্ত নবাগত বন্দীদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের সুযোগ ডাক্তারজী লাভ করলেন। ১৮ই আগস্ট মেহকরের শ্রী রাজেশ্বররাও দেশমুখ এবং শ্রী দাদাসাহেব সোমণ 'বি' শ্রেণীতে প্রবেশ করলেন। একবার রেলগাড়ীতে ভ্রমণের সময়ে এই দুজনের ডাক্তারজীর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। অকোলা কারাগারে পরমপূজনীয় সরসঙ্ঘচালকের সঙ্গে থাকার সুযোগ ঘটবে জেনে তাঁদের খুব আনন্দ হয়েছিল। উক্ত সাক্ষাতের বর্ণনা করে শ্রী দেশমুখ লেখেন — "....শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের সোমবার। সেদিন আমার জীবনের এক অত্যন্ত শুভক্ষণ এল। যেতেই দেখি সামনেই আমার পরমপূজনীয় সরসঙ্ঘচালক ডাঃ কেশবরাও হেডগেওয়ার বসে রয়েছেন। একেবারে 'দক্ষ'-তে এসে প্রণাম করলাম। ডাঃ ঠোসর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে ও শ্রী দাদাসাহেব সোমণকে ডাক্তারজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পূর্বের পরিচয়ের কথা স্মরণ করে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি উঠে আমাকে আন্তরিক আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন এবং মেহকরের সঙ্ঘশাখার সংবাদ ও কুশল-বার্তা জিজ্ঞেস করেন। ....সঙ্ঘের জন্মদাতার চরণপ্রান্তে অনেক দিন বসে শিক্ষালাভের সুযোগ পাওয়া যাবে; এই কথা চিন্তা করে আমার খুবই আনন্দ হল এবং নিজের পরিজন, বৃদ্ধ মাতা-পিতা এবং ছোট-ছোট সন্তানদের ছেড়ে জেলে আসার দুঃখ একেবারে ভুলে গেলাম। সেই আনন্দের বর্ণনা করা সম্ভব নয়।"

'বি' শ্রেণীর সত্যাগ্রহীদের সংখ্যা বাড়তে-বাড়তে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত হয়ে গেল। মেহকরের শ্রী দেশমুখ বলেন যে "তাঁদের ভিন্ন-ভিন্ন প্রবৃত্তি, রুচি এবং রাজনৈতিক মতের কারণে এমন এক মিশ্র বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল যে তা দেখে একটি চিড়িয়াখানার কথা মনে পড়ছিল।" কারুর চায়ের প্রয়োজন হলে তার নাম করলেই অন্য কারুর মাথা ঝন্-ঝন করে উঠত। কারো পাউরুটি ভাল লাগত, তাতে অন্য কেউ সেটাকে 'অব্রহ্মণ্যম্' বলে তার থেকে শত হস্ত দূরে সরে যেত। ভোজনেরও অনেক প্রকার ছিল। কিছু লোক নিজ হাতে তার খাবার রান্না করে নিত। তারা অন্যের ভ্রষ্টাচার সহ্য করতে পারতনা। অন্য কিছু লোক পরিস্থিতি অনুসারে দেশকালের কথা চিন্তা করে সকলের সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করত। এমনও অনেকে ছিল যাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। লঙ্কা, তেল, রসুন, পেঁয়াজ খাওয়ার এবং না-খাওয়ার মধ্যেও বিভেদ ছিল। 'বি' শ্রেণীর বন্দীদের জন্য আলাদা রান্নাঘর ছিল। সেখানে 'সি' শ্রেণীর বন্দীরা কাজ করতে আসত। কয়েকজন 'সি' শ্রেণীর বন্দীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবার জন্য তাদের খাবার নিজেরা গ্রহণ করে 'বি' শ্রেণীর খাবার তাদের দিতে

শুরু করল। শ্রী সঃ হঃ বল্লাল 'সি' শ্রেণীর খাদ্যবস্তুর বর্ণনা করে বলেছিলেন, "সি-বর্গে ক্লেশ বাহুল্যং খাদ্যং চাপি পশুচিতম্" ('সি' শ্রেণী ক্লেশে পরিপূর্ণ, খাদ্য পশুদের উপযুক্ত)। অনেকের এই কষ্ট সহ্য হতনা। যাদের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল, তাদের চরখা চালাতে হত। কিন্তু বিনাশ্রম দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্তদের শুধু জিহ্বাই সক্রিয় থাকত। ভোজন ও স্নানের সময়ে উভয় শ্রেণীর বন্দীরা একস্থানে আসতেন। কেউ-কেউ এমন পরিহাস-প্রিয় ছিলেন যে প্রতি পদেই তাঁরা হাস্য-পরিহাস করতেন, আবার কেউ এমন চট্‌তেন যে তাঁদের বদরাগী বলা যেতে পারে। আকোটের শ্রী দাজী সাহেব বেদরকরের চার দিকে তাঁর খেলোয়াড়ী তথা পরিহাস-প্রিয় স্বভাবের দরুন সারা দিন কেউ-না-কেউ তাঁর সঙ্গে ঘুরতে থাকত। সেখানে সব সময়ে হাসির ফোয়ারা ছুটত। শ্রী সঃ হঃ বল্লাল কারাগারে তাঁর সঙ্গীদের বর্ণনা করে যা লিখে রেখেছেন, তা থেকে তাঁর স্বভাবের কল্পনা করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন ঃ—

"আকোটবাসী নটনাটকী চ গোষ্ঠিপ্রিয়ঃ শ্রেষ্ঠ উদারধ্যশ্চ।
আনন্দমগ্নঃ স সুখী করোতি বাগ্‌বৈজয়ন্ত্যা প্রিয়দাজিপন্তঃ।।"
(আকোটবাসী নটনাটকী গোষ্ঠীপ্রিয় শ্রেষ্ঠ উদারধী সর্বদাই।
আনন্দে মগ্ন থেকে সুখী করেন বাণীপতাকা উড্ডীন রাখেন দাজিপন্ত")

এই প্রকার ভিন্ন-ভিন্ন প্রকৃতির কার্যকর্তারা পনের-কুড়ি দিন ধরে একের পর এক আসছিলেন। ডাক্তারজী তাঁদের সকলের সঙ্গে পরিচয় করে নিতেন। 'বি' শ্রেণীতে এখন অনেক কার্যকর্তা সমবেত হয়েছিলেন। সেই কারণে ডাক্তারজী কিছু সুব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। সকলের সম্মতিক্রমে ডাঃ ঠৌসর সেনাপতি নিযুক্ত হলেন এবং ঠিক হল যে সকলকে তাঁর অনুশাসনে চলতে হবে। বিকেলে হাঁটা-চলা করার জন্য সকলের বাইরে ময়দানে যাওয়ার অনুমতি ছিল। এই সময়ে কেউ যাতে মনে না করে যে আমার উপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এমনভাবে ডাক্তারজী সঞ্চলনের কার্যক্রম শুরু করে দিলেন। 'আমি নেতা, অন্যের কথায় কেন চলব?' এইভাবে ভিন্ন পথে হাঁটার প্রবৃত্তি পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে কিছু দিনের মধ্যেই বিলুপ্ত হল।

'বি' শ্রেণীর বন্দীরা সকলে এক সঙ্গে থাকতেন, তবে তাঁদের মধ্যে তিন-চারটি গোষ্ঠী তৈরী হয়ে গিয়েছিল। একটি গোষ্ঠী ছিল সঙেঘর স্বয়ংসেবকদের, দ্বিতীয়টি ছিল সঙেঘর প্রতি সহানুভূতিশীলদের, তৃতীয়টি ছিল উদাসীন এবং চতুর্থটি ছিল যারা সঙেঘর চিন্তাধারাকে হিংসাশ্রয়ী, সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণ বলে মনে করত। ডাক্তারজী এই সব গোষ্ঠীর মানুষদের এবং তাদের মানসিক গঠনকে বেশ ভালভাবে পরখ করে নিয়েছিলেন। তিনি সকলের সঙ্গেই খোলা মনে আলাপ-আলোচনা করতেন। ছাত্রজীবন থেকেই যে ডাক্তারজী রাষ্ট্রকার্যকেই জীবনকার্য বলে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর সুব্যবস্থিত, অনুশাসনপূর্ণ, গম্ভীর অথচ প্রসন্নচিত্ত ব্যবহার সেখানকার সকলের মনেই তাঁর প্রতি এক স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি করেছিল। নিজের কাজ নিজেই করার প্রতি ডাক্তারজীর বিশেষ লক্ষ্য থাকত। অন্য কারুর সেবা তিনি কখনই গ্রহণ করতেন না। নিজের কাপড় কাচা থেকে শুরু করে সেগুলি শুকোবার পর ভাল করে পাট করে বালিশের নিচে গুছিয়ে রাখা পর্যন্ত তাঁর সব কাজ এমন পরিপাটি ও আকর্ষক

ছিল যে কয়েকজন তাঁর অনুকরণও করতে শুরু করে দিল। নিঃসন্দেহে, দেশপ্রেম ও ত্যাগের ব্যাপারে ডাক্তারজী সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন, কিন্তু তাঁর আচরণে অংহকারের লেশমাত্র দেখা যেতনা। এর বিপরীতে নিজের মুখেই যারা আপন পুরুষার্থের সরস বর্ণনা করত তিনি তাদের কথা শান্তিপূর্বক শুনতেন।

ডাক্তারজীর সঙ্গে সত্যাগ্রহী দলের কয়েকজন 'বি' শ্রেণী দাবী করায় তা পেয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু পনের দিন ধরে শ্রী ফোর্ডের আগ্রহ করা সত্ত্বেও শ্রী আপ্পাজী যোশী এ বিষয়ে কোন দাবী জানাননি। সেই সময়ে তিনি কংগ্রেসের প্রান্তীয় সম্পাদক ছিলেন এবং দলের নীতি ছিল সরকারের কাছ থেকে কোন প্রকার সুবিধা লাভের জন্য দাবী করা হবেনা। তাঁর সামনে উভয়-সংকট সৃষ্টি হল যে উক্ত দাবী করলে দলের নীতি উল্লঙ্ঘন করা হবে এবং না করলে শ্রী ফোর্ডের মত ব্যক্তির আগ্রহকে উপেক্ষা করা হবে। শ্রী ফোর্ড যখন আপ্পাজীকে জিজ্ঞেস করতেন "কী খবর?" তখন আপ্পাজীর নিশ্চিত উত্তর ছিল—" 'সি' শ্রেণীতে সব ঠিক আছে।" কিন্তু এই উত্তর শ্রী ফোর্ডের ভাল লাগতো না।

একদিন শ্রী ফোর্ড আপ্পাজীকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি জেলে নেতা হয়ে এসেছেন না অনুগামী হয়ে?"

আপ্পাজী উত্তর দিলেন, "অনুগামী হয়ে।"

"তাহলে ডাক্তারজী যা বলবেন তাই করবেন তো?"

"হ্যাঁ, তবে তিনি আমাকে কখনো, অমুক কাজ কর, একথা বলবেন না।"

"সেটা আমি দেখব।"

এই কথা-বার্তার পর এক দিন শ্রী ফোর্ড আপ্পাজীকে ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। আপ্পাজীকে তাঁর ব্যারাকে আসতে দেখে ডাক্তারজী তাঁর কাছ থেকে 'সি' শ্রেণীর সব সংবাদ জেনে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কেন এসেছেন?"

"ফোর্ড আমাকে বরাবর আগ্রহ করছে যে আমি 'বি' শ্রেণীর জন্য আবেদনপত্র যেন পাঠিয়ে দিই। এই বিষয়ে আপনার মত জানার জন্য সে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে।"

"কিন্তু আপনি কংগ্রেসের সম্পাদক, অতএব এ বিষয়ে যা সিদ্ধান্ত নেবার তা আপনিই নেবেন। আমি কী বলব? আপনি গান্ধীবাদী নন, সেই কারণে আবেদনের ফলে কোন ক্ষতি হবেনা। কিন্তু যে আন্দোলনে আপনি এখানে এসেছেন তার সম্মান আপনাকেই রক্ষা করতে হবে। আপনি প্রান্তীয় কংগ্রেসের সম্পাদক, সুতরাং আপনি সিদ্ধান্ত নিন এবং আপনি যা ঠিক করবেন সে কথাই আমি আপনাকে বলেছি — এবং তাই আমি ফোর্ডকে জানিয়ে দেব। আপনি তো সবই জানেন।"

যে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা হয়, তার বিধি-নিষেধ এবং নির্দেশ যথাযথ পালন করার উপর ডাক্তারজী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। ডাক্তারজী জানতেন যে শৃঙ্খলায় ঢিলেমির পরিণামে আন্দোলনে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। সেই কারণে তিনি আপ্পাজীর পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেননি। এই সাক্ষাৎকারের পরে আপ্পাজী 'বি' শ্রেণীর দাবী জানাতে অস্বীকার করে দেন। ফোর্ড অনেক কিছু বলেও সে সাফল্য লাভ করল না। তাতে সে আপ্পাজীর উপর

অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পনের-কুড়ি দিন বেশ শক্ত কাজ করার আদেশ দিল এবং সে কাজ ঠিকমত না করতে পারার জন্য শাস্তি দিয়ে সে আপ্পাজীকে নত হতে বাধ্য করার চেষ্টা করল। পরিণামে আপ্পাজীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল এবং দুর্বলতার দরুন একদিন তিনি মুর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। তা সত্ত্বেও তিনি নিজ সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্যুত হলেন না। তাঁর এই দৃঢ়তা দেখে ফোর্ডের মনও নরম হল এবং একদিন সে নিজে থেকেই তাঁকে 'বি' শ্রেণীতে পাঠিয়ে দিল। আপ্পাজীর এইরূপ দৃঢ়তার কথা যখন, 'বি' শ্রেণীর বন্দীরা শুনলেন, তখন তাঁরা তো বটেই, ডাক্তারজীও, সহ্যশক্তি তথা নিগ্রহের পরীক্ষায় আপ্পাজীকে সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

জেলের 'সি' শ্রেণী সাধারণ ভদ্রলোকদের পক্ষে বেশ কষ্টপ্রদ। নিকৃষ্ট ধরণের চাল, গোণা-গুণ্তি রুটি, লোহার বাসন এবং এই ধরণের অন্যান্য ব্যবস্থা সেখানে থাকে। এ বিষয়ে সেই সময়ে সার্বজনিক সভা-সমিতি ও সংবাদপত্রে বেশ শোরগোলও তোলা হয়েছিল। নাগপুরের 'তরুণ ভারত'-এর বর্তমান সম্পাদক শ্রী গঃ ত্র্যঃ মাডখোলকর একটি প্রবন্ধে 'বি' শ্রেণীর ব্যবস্থাও অত্যন্ত কষ্টদায়ক বলে বর্ণনা করে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশিত করেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন ঃ "... গান্ধীজীর নির্দেশ যে সেখানকার নিয়ম ও শৃঙ্খলা পালন করা উচিত। এই নির্দেশ যতই উপযুক্ত তথা ব্যবহারিক হোক না কেন, জেলের সম্পূর্ণ অবস্থা এমনই দুঃসহ যে যাদের মানবিকতার গৌরব তথা স্বাভিমানের ভাবনা নষ্ট হয়নি, তাদের মনে প্রতিকারের ভাব উদয় না হয়ে থাকতে পারে না।"

ডাক্তারজীর সঙ্গে সত্যাগ্রহী দলের শ্রী দাদারাও পরমার্থ 'সি' শ্রেণীতে ছিলেন। তিনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হলেন এবং দিনের পর দিন তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে লাগল। কারাগারের অধিকারী শ্রী ফোর্ড ও শ্রী পাণ্ডের সঙ্গে ডাক্তারজীর এমন ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল যে তাঁরা দিনের মধ্যে দু-একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এবং হাস্য-পরিহাসে অংশগ্রহণ করতে অবশ্যই আসতেন। এই পরিচয়ের সূত্রে তিনি দাদারাওকে 'সি' শ্রেণী থেকে 'বি' শ্রেণীতে নিয়ে এলেন এবং 'এ' শ্রেণীর ডাঃ টেম্ভের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসাও শুরু হয়ে গেল। নিজেদের কক্ষে একজন অসুস্থ ব্যক্তির আসা এবং দিন-রাত তার কাসির শব্দের দরুন কয়েকজন অপ্রসন্ন হলেন। কিন্তু ডাক্তারজীকে স্বয়ং তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতে দেখে কেউ কিছু বলতে পারত না। দাদা জেদী ও খিট্‌খিটে স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি অনেক সময়ে তাঁর যা খাওয়া বারণ, তা খেয়ে ফেলতেন, তাই ডাক্তারজীকে সারা রাত জেগে থাকতে হত। শ্রী দাজী সাহেব বেদরকর মাঝে-মাঝে দাদাজীর সঙ্গেও হাসি-ঠাট্টা করে ফেলতেন। একে তো খিট্‌খিটেই ছিলেন, তার উপর অসুস্থতার দরুন দুর্বল হয়ে পড়ায়, তখন এমনই অবস্থা হত যেমন পাথর-চুনের উপর জল পড়লে হয়, সেই রকম একেবারে রেগে উঠতেন। তখন ডাক্তারজী বেদরকরকে বকুনি দিয়ে দাদাজীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করতেন। দাদা পরমার্থ সুস্থ হয়ে ওঠার পর ডাক্তারজী তাঁর কী রকম সেবা-যত্ন করতেন সে বিষয়ে শ্রী রাজেশ্বর রাও ও শ্রী ভাউরাও দেশমুখ তার বর্ণনা এইভাবে করেন "... যদি ডাক্তার কেশবরাও উদ্বিগ্ন না হয়ে উঠতেন তাহলে দাদার কী হত বলা যায় না। ডাক্তারজী তাঁকে মৃত্যুর করাল গ্রাস

থেকে টেনে বের করে এনেছিলেন।" কারাগারে বেরারের এক প্রসিদ্ধ কংগ্রেসী নেতা এবং পরবর্তীকালে সঙ্ঘের কার্যকর্তা শ্রী দাদাসাহেব সোমণ ডাক্তারজীকে এমন কথাও বলেছিলেন, "ডাক্তারজী, আমরা সংসারী মানুষ। কিন্তু আপনি যে রকম সেবা করছেন, তা আমাদেরও লজ্জিত করে এবং মনে হয় যেন দাদা আপনার মানস-পুত্র।" একবার যাকে আপন বলে গ্রহণ করতেন, তার জন্য ডাক্তারজী একটুও বিরক্ত না হয়ে কতখানি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতেন এবং তা করার সময়ে কারোর উপর উপকার করছি এমন চিন্তামাত্র মনে আনতেন না, তা দেখে মানুষের আশ্চর্যের অবধি থাকত না।

প্রথম-প্রথম সকলের মনে হত ডাক্তারজীও আমাদের মতই সাধারণ মানুষ। কিন্তু কয়েক মাস পরে যেমন-যেমন ডাক্তারজীর কোমল অন্তঃকরণ তথা উজ্জ্বল চরিত্রের অভিজ্ঞতা হতে লাগল, সকলের অহংকার দূর হতে লাগল। 'দূরের বাদ্যি শুনতে মধুর' — এই প্রবাদ-বাক্য অনুযায়ী অনেক সময়ে দেখা যায় যে দূর থেকে কোন নেতার খুব খ্যাতির কথা শোনার পর তাঁর কাছে গেলে তাঁর আসল চেহারা তথা ফাঁকি ধরা পড়ে যায়। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদিনী রাতে তার শোভা দেখার জন্য যদি কেউ দূরবীন চোখে দিয়ে চাঁদকে কাছে এনে দেখে তাহলে সুন্দর শশাঙ্কের উপর কালো-কালো পাহাড়ের দাগ দেখে গ্লানি বোধ হয়। তার কাছে চন্দ্রের সকল সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। তার শুধু থেকে-থেকে এই অনুতাপ হবে যে দূরবীনে চাঁদকে না দেখে যদি খালি চোখেই তার সৌন্দর্য-সুধা পান করতাম, তাহলে ভালো হত। স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর তাঁর একটি কবিতায় এই ভাবটিকে বড় সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ঃ —

"আহ্লাদক কিতি চন্দ্রবিম্ব হে নন্দসুধা ঝরতেঁ।
ফুটো ভিঙ্গ তেঁ ভিকার ত্যা জেঁ মসণাসম করতেঁ।।
ত্যাচেঁ রিঝবো রূপ জনাঁ কীঁ, আহ্লাদক কোলেঁ।
ফুটোত তে ত্যা বিদ্রূপ করিতে দুর্বীণীচে ডোলে।।"
("শশী-বিম্ব বড় আনন্দদায়ক, যেন সুধা ঝরে পড়ে।
দূরবীন তাকে একেবারেই বিসদৃশ করে তোলে।
সুন্দর কাচের পাত্র ভেঙে টুক্‌রো হয়ে গেলে যেমন হয়।
শশীকেও তেমনই সে শ্মশানের রূপে প্রতিভাত করে।")

এইভাবেই, কোন ব্যক্তির কাছে গেলে, মনের মুকুরে অঙ্কিত তার দিব্য চিত্র একেবারেই কুৎসিত রূপে পরিণত হয়। কিন্তু ডাক্তারজীর সম্বন্ধে ঠিক বিপরীত অভিজ্ঞতাই হত। তাঁর যত নিকটে আসা যেত, চুম্বকের মত তিনি মনকে আকৃষ্ট করতেন এবং তাঁর একেবারে নিকটবর্তী হলে তাঁর শ্যামল কান্তির পিছনে অটল ধ্যেয়নিষ্ঠা, উজ্জ্বল চরিত্র এবং স্বাধীনতার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার দর্শন লাভ করে অত্যন্ত আনন্দ অনুভূত হত।

ডাক্তারজীর ব্যক্তিত্বে কারাগারের প্রধান শ্রী পাণ্ডে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ডাক্তারজী শ্রী পাণ্ডের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন যে শ্রীপাণ্ডে তাঁর কাছে এসে নিজের ঘর-সংসারের কথাও বলতে লাগলেন। শ্রীপাণ্ডে নিজের কন্যার বিবাহের ব্যাপারে খুব চিন্তিত ছিলেন। ডাক্তারজী তাঁর চিন্তার কথা বুঝতে পেরে কন্যার কোষ্ঠী দেখে

দুই-একজন উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান তাঁকে দিলেন। শুধু তাই নয়, নিজের কয়েকজন বন্ধুর নিকট কন্যার কোষ্ঠী তাঁদের দেখার জন্য পাঠালেন। যতদিন ডাক্তারজী কারাগারে ছিলেন, নাগপুর থেকে কখনো ডাঃ পরাঞ্জপে, আবার কখনো শ্রী ভাউরাও কুলকার্ণী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এবং সঙ্ঘ-শাখাগুলির প্রতিবেদন দেবার জন্য আসতেন। ভাউরাও তখন সদ্য-সদ্য স্নাতক হয়েছিলেন। ডাক্তারজী তাঁর নাম শ্রীপাণ্ডেকে প্রস্তাব করলেন। ফল হল এই যে এখন ভাউরাও ডাক্তারজীর সঙ্গে বেশ সময় নিয়ে অনেকক্ষণ গল্প-গুজব করতেন এবং ফেরার পথে পাণ্ডেজীর বাড়ীতে আতিথ্যও গ্রহণ করতেন। একথা পরিষ্কার করে দেওয়া প্রয়োজন যে বেশ খানিকটা সময় যাতে কথা-বার্তার জন্য পাওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যেই ডাক্তারজী যুক্তি হিসাবে শ্রীভাউরাওয়ের নাম শ্রীপাণ্ডেজীকে সুপারিশ করেছিলেন। তাঁর যুক্তি সফলও হয়েছিল। কিন্তু জেল থেকে মুক্ত হবার পর ডাক্তারজী শ্রী পাণ্ডের কন্যার জন্য পাত্র খোঁজার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন।

ইংরাজ সরকারকে শত্রু মনে করে সত্যাগ্রহ করার পর ডাক্তারজী কারাগারে সুযোগ-সুবিধার দাবী করা উপযুক্ত বলে স্বীকার করেন নি। তাঁর বক্তব্য ছিল — "এই ধরণের চেয়ে নেওয়া সুখ-সুবিধার দ্বারা আমাদের ভাবনা কুণ্ঠিত তথা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।" মাঝে-মাঝে জেলের অফিসার জিজ্ঞেস করতেন, "কোন অভিযোগ আছে কি?" এর উত্তরে ডাক্তারজী নিয়মিতভাবে "না, কিছু নেই" বলতেন। 'বি' শ্রেণীর কয়েকজন বন্দী অভিযোগ করেছিলেন যে তাঁদের যে ঘি দেওয়া হয় তাতে ভেজাল থাকে। কিন্তু তাঁদের অভিযোগে কোন লাভ হয়নি। ডাক্তারজীর জেলের অফিসারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় সকলে ভাবল যে যদি ডাক্তারজী এই অভিযোগটি তাঁদের জানান তাহলে সুফল পাওয়া যাবে। এরজন্য তাঁকে অনুরোধ করা হল, কিন্তু ডাক্তারজী হেসে কথাটা এড়িয়ে যেতেন। একদিন খুব বেশী আগ্রহ করা হলে ডাক্তারজী বললেন, "আমার এটা দ্বিতীয় কারাবাস। শত্রুপক্ষের কাছে প্রার্থনা করা এবং সে দয়া করে আমাদের কিছু দেবে — সেটা আমার ভাল লাগেনা। অফিসারদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাল, সেই কারণে তাঁরা আমার কথা শুনবেন ঠিকই। কিন্তু আমি দুঃখিত, এরকম আমি করতে পারব না।"

একথা শুনে অন্যরা একটি যুক্তি বের করলেন। তাঁরা ভাবলেন যে আমরা অফিসারের কাছে অভিযোগ জানাব এবং বলব যে "আমাদের কথা সত্য কিনা তা আপনি ডাক্তারজীকে জিজ্ঞেস করুন। তাহলে তো আপনাদের বিশ্বাস হবে?" পরের দিন তাই করা হল এবং তাতে সাফল্যও লাভ করা গেল। তারফলে 'বি' শ্রেণীর বন্দীরা শুদ্ধ ঘি পেতে লাগলেন। তবে ঘি-এর জন্য এই সব কার্যকলাপের প্রতি ডাক্তারজীর মনে সব সময়ে বিতৃষ্ণা ছিল।

কারাগারে ডাক্তারজী 'গাড়োয়াল দিবস' উপলক্ষ্যে অনশনও করেছিলেন। আবার 'সি' শ্রেণীর বন্দীরা যখন লোহার বাসন ও নিকৃষ্ট খাদ্যের প্রতিবাদে অনশন-ধর্মঘট করেন, তখন 'বি' শ্রেণীর বন্দীরা তাঁদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করার জন্য একদিন উপবাস করেন। কিন্তু কয়েকজন রাজবন্দী মাঝপথেই ক্ষমা প্রার্থনা করায় 'সি' শ্রেণীর অন্ন-সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হল।

তাঁদের এই দুর্বল মনোবৃত্তি দেখে ডাক্তারজী অত্যন্ত দুঃখ বোধ করলেন। তিনি বলতেন, উত্তম সংস্কার ছাড়া এই বৃত্তির পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

সকলের সঙ্গে যথাযথ পরিচয় করে তাঁদের স্বভাবের পরখ করে না নেওয়া পর্যন্ত ডাক্তারজী কারাগারের মধ্যে সঙ্ঘের বিষয়টি উত্থাপন করেন নি। এর পরে তিনি ক্রমে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সঙ্ঘের তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেন। আপ্পাজী যখন 'সি' শ্রেণীতে ছিলেন, তখনই সঙ্ঘের বিষয় চর্চা শুরু করে দিয়েছিলেন এবং সেখানে প্রতিদিন প্রার্থনাও আরম্ভ হয়েছিল। এখন অবসর-সময়ে এবং রাত্রিবেলায় অনেককেই ডাক্তারজী ও আপ্পাজীর কাছে বসে বিচার-বিনিময় করতে দেখা যেতে লাগল। ডাক্তারজী তাঁদের সামনে দেশের পরিস্থিতির নিদান ও তার প্রতিকারের বিষয়ে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ সূত্র উত্থাপন করেন। "সঙ্ঘের নাম রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কেন রাখা হল? রাষ্ট্র ও দেশের মধ্যে পার্থক্য কী? পরাধীন রাষ্ট্রে স্বাধীনতার সংগ্রামই রাজনীতি। স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য শক্তির প্রয়োজন, তার জন্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক চিন্তাগুলিকে রাষ্ট্রমুক্তির একমাত্র চিন্তার মধ্যে লয় করে দিতে হয়; শক্তি ব্যতীত সংরক্ষণ হতে পারে না; শক্তি শুধু সংগঠনের মধ্যেই নিহিত, কিন্তু এই সংগঠন আভ্যন্তরীণ বিভেদ হতে অলিপ্ত এবং বহিরাক্রমণগুলির সঙ্গে সংঘাতে সক্ষম হওয়া চাই", ইত্যাদি অনেক বিষয়ের প্রতিপাদন তিনি নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে করতেন। তাঁর প্রতিটি শব্দের মধ্যে হিন্দু রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে চিন্তা ব্যক্ত হত, তা শ্রোতাদের বিবেককে নাড়া দিত এবং ক্রমে-ক্রমে তাঁদের মনের উপর দৃঢ়ভাবে একথা মুদ্রিত হয়ে যেত যে সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ ও বিকাশই হিন্দুদের একমাত্র ভরসা। কখনো-কখনো অবসর সময়ে ক্রমে প্রশ্নোত্তরও চলত এবং এরজন্য ডাক্তারজীর কত বিনিদ্র রাত কেটে যেত। কিন্তু তার জন্য তাঁর কোন চিন্তা ছিল না। তাঁর তত্ত্বজ্ঞান বিদর্ভের চিন্তাশীল মানুষদের মনে ক্রমবর্ধমান প্রভাব ফেলছিল দেখে নিদ্রাও তাঁকে সে তৃপ্তি দিতে পারছিল না। তিনি সর্বদা নিজেকে প্রধান স্থানে স্থাপিত না করে, কাজকেই প্রাধান্য দিয়ে নিজের কথা চিন্তা করতেন। এই কারণে, যত কষ্টই হোক না কেন, তাঁর মুখে সর্বক্ষণ প্রসন্নতাই প্রতিভাত হত।

এই বিচার-মন্থনের মধ্য থেকে সঙ্ঘ-শাখার নবনীত উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিকই ছিল। ডাক্তারজী একথা কাউকে বিস্মৃত হতে দিতেন না যে সঙ্ঘ কেবল শব্দের খেলা নয়, তা একটি আচরণীয় জীবন-পদ্ধতি এবং সেই পদ্ধতির অভ্যাস যাতে মন ও শরীরের সঙ্গে সর্বদা যুক্ত থাকে তার জন্য সঙ্ঘের দৈনন্দিন কার্যক্রম অত্যন্ত প্রভাবী সাধন। কিছু লোকের মনের মধ্যে সঙ্ঘের কার্যক্রমের প্রতি আগ্রহ জেগে ওঠার পর ডাক্তারজী প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাঁদের সকলকে সঙ্ঘের পদ্ধতিতে দাঁড় করিয়ে প্রার্থনা শুরু করে দিলেন। বিজয়াদশমীর দিনেই প্রার্থনার এই কার্যক্রমের সূচনা করা হল।

জেলের মধ্যে ডাক্তারজী প্রায়ই লোকমান্য তিলকের 'গীতারহস্য' পাঠ করতেন এবং রাত্রে মাঝে-মাঝে তাঁর সঙ্গীদের উন্মুক্ত আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দিতেন। তিনি বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের দূরত্ব প্রভৃতির কথা অত্যন্ত আকর্ষকভাবে বোঝাতেন। এ বিষয়ে

ডাঃ ঠৌসর লিখেছেন যে "ডাক্তারজী এমন মজা করে এ বিষয়ে বলতেন যে প্রথমে আমাদের মধ্যে অনেক অরসিক ব্যক্তিরও পরে নক্ষত্রাদির বিষয়ে আরো জ্ঞানার্জনের নেশা ধরে গেল। অন্ধকার রাত্রে আমাদের এ এক নির্দিষ্ট কার্যক্রম ছিল। এর আগে কেউ খেয়ালই করেনি যে আকাশে সূর্য-চন্দ্র ছাড়া আর কিছু আছে।" রাত-বিরেতে অজানা প্রদেশে প্রবাসের প্রসঙ্গ এলে জ্যোতির্বিজ্ঞান তথা নভোমণ্ডলের দিশা ও সময়ের জ্ঞান বড় প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সেই কারণেই ডাক্তারজী তাঁর বিপ্লবী জীবনকালে এ বিষয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন।

• একে তো ডাক্তারজী নিজেই অত্যন্ত আমোদ তথা পরিহাস প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন, তার ওপর শ্রী বেদরকরের সঙ্গ লাভ হয়েছিল। ফলে তাঁদের মধ্যে খুব হাসি-ঠাট্টা চলত। একটি অত্যন্ত মজার ঘটনা অনেকেরই এখনো মনে আছে। শ্রী জগন্নাথ শাস্ত্রী অগ্নিহোত্রীর হাত দেখার খুব শখ ছিল। মানুষের মধ্যে অজ্ঞাত কথা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানার স্বাভাবিক ইচ্ছা থাকে। সেই কারণে অনেকেই নিজেদের ভাগ্য-রেখা দেখাবার জন্য শ্রী অগ্নিহোত্রীকে ঘিরে থাকতেন। কিন্তু এ বিষয়ে ডাক্তারজীর বিশেষ আকর্ষণ ছিলনা। "রেখা তিতুকী পুসলী জাতে। হেঁ তো সদৈব প্রত্যয়া য়েতেঁ।" ("রেখাও মুছে যায়, অভিজ্ঞতায় এটাই দেখা যায়")। সমর্থের এই কর্মযোগ তাঁর শিরায়-শিরায় পরিপৃক্ত ছিল। সেই কারণে ভবিষ্যৎ জানার মধ্যে কোন সারবত্তা তিনি খুঁজে পেতেন না। অগ্নিহোত্রীজীর ধারণা ছিল ডাক্তার হেডগেওয়ারও অন্যান্য গৃহস্থ ডাক্তারের মতই সংসারী মানুষ। সেই কারণে তাঁর আশ্চর্য লাগত যে ইনি হাত কেন দেখান না। একবার শ্রীবেদরকর ডাক্তারজীর সঙ্গে যোজনা তৈরী করে জ্যোতিষী মহারাজকেই নবগ্রহের চক্রে ফাঁসাবার ফন্দী আঁটলেন। অগ্নিহোত্রী যাতে শুনতে পান এমনভাবে শ্রী বেদরকর ডাক্তারজীকে মাঝে-মাঝে জিজ্ঞেস করতেন, "বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে? ছেলে-মেয়েদের কী খবর? আপনার জগন্নাথ কোন ক্লাসে পড়ছে?" পূর্ব-যোজনা অনুযায়ী ডাক্তারজী গম্ভীর ভাবে উত্তর দিতেন এমনভাবে যাতে শাস্ত্রীজী শুনতে পান। এই ভাবে এক দিকের সব প্রস্তুতি করে অপর দিকে তিনি ডাক্তারজীর কাছে আগ্রহ করতে শুরু করলেন—"ডাক্তারজী, একবার আপনি হাতটা দেখিয়ে নিন।" অনেক করে আগ্রহ করার পর ডাক্তারজী নিজের হাত জ্যোতিষী মহাশয়ের সামনে এগিয়ে দিলেন। অগ্নিহোত্রীজী খুব মনোযোগ সহকারে ডাক্তারজীর হস্তরেখা দেখছিলেন। ডাক্তারজী ও বেদরকর গম্ভীর মুখে হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করছিলেন। রেখা অধ্যয়ন করা শেষ হলে শাস্ত্রীজী বললেন, "ইনি আপনার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নিশ্চয়ই? আপনার চারটি সন্তান থাকা উচিত।" ডাক্তারজী হাত দেখাচ্ছেন দেখে অনেকেই চার দিকে একত্র হয়ে গিয়েছিলেন। জ্যোতিষীর উক্ত বাক্য শুনে সকলে হো হো করে জোর হাসতে শুরু করে দিলেন। ডাক্তারজী নিজের হাত টেনে নিলেন এবং বললেন, "অনেক হয়েছে। বাকিটা ভেবে বলবেন।" বেদরকর অনেক দিন পর্যন্ত এই ঘটনা নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতেন এবং শ্রোতারা তাঁর কথা শুনে হেসে লুটোপুটি খেতেন। কিন্তু ডাক্তারজী তার পরে আর কোন দিন এই ঠাট্টা-তামাসায় যোগ দেননি। তিনি কোন ব্যাপারকে সীমার বাইরে যেতে দিতেন না।

এই সময়ে বুলঢানা জেলার লোণার নামক তীর্থস্থানে মুসলমানরা দাঙ্গা বাঁধাল। এতে খুব মারদাঙ্গা হল এবং মুসলমানদের শাস্তিও হল। সেই সময়ে হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-

অব্রাহ্মণবাদের ব্যাপারে বেশ বাড়াবাড়ি শুরু হয়ে গিয়েছিল। এর সুযোগ নিয়ে দুজন ইংরেজ অফিসার শ্রীক্রোমী ও শ্রী ব্রাম্‌লে মুসলমান ও অব্রাহ্মণদের উস্‌কানি দিলেন যে, "শেঠজী ও ভট্টজী উভয়ই আপনাদের আসল শত্রু।" এই অপপ্রচারের পরিণামে নানাস্থানে লুটতরাজ ও আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটতে লাগল। এক সপ্তাহের মধ্যে পনের-কুড়ি মাইল বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ইংরেজদের ছত্রছায়ায় খেত, খামার, ঘর-বাড়ী, দোকান-সর্বত্র লুটপাট চলল, ঘর-বাড়ী আগুনে ধ্বংস করা হল এবং নারীদের শ্লীলতাহানিরও ঘটনা ঘটল। এই সময়ে মেহকরের সঙ্ঘ-কার্যকর্তা শ্রীরামাধার অবস্থী জনসাধারণের ধৈর্য্য বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হলেন এবং ইংরেজ অফিসারদের ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিয়ে ভাইসরয়ের কাছেও সোজা তার পাঠালেন। এই ঘটনার সংবাদ পাবার পর ডাক্তারজীও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি বলতেন যে যদি আমরা যথাসময়ে আমাদের সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ না করতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে ইংরেজ ও মুসলমানরা জোটবদ্ধ হয়ে হিন্দুদের কী দুর্গতি করবে, এটা তার নমুনা মাত্র দেখা গেল। যদি হিন্দু সমাজকে এমন শক্তিশালী তথা সক্ষম করে তোলা যায় যাতে তারা স্বাভিমানের কারণে অন্যদের অপপ্রচারের শিকার না হয়ে ঘোরতর বিপদের মধ্যেও ধৈর্য্যের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করে আক্রামক শক্তিকে চূর্ণ করতে পারবে, তাহলে সঙ্ঘের পথে অনুশাসনবদ্ধ সংগঠিত শক্তির নির্মাণ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই—এই চিন্তাকে তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সকলের মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গেঁথে দিতেন। ভবিষ্যতে হিন্দু সমাজের সম্ভাব্য শোচনীয় চিত্র তুলে ধরার সময়ে তাঁর হৃদয়ের ঘোরতর বেদনা আশপাশের মানুষদের দৃষ্টি এড়াত না এবং ঐ সম্ভাব্য দুরবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার একটাই উপায় যে একমাত্র সঙ্ঘ — এ কথা ঘোষণা করার সময়ে তাঁর দৃঢ় আত্মবিশ্বাস অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠত। এই আত্মবিশ্বাস এমনই প্রভাবী ছিল যে অন্যদের হৃদয়েও কাজের প্রেরণা অপরিহার্যভাবেই সৃষ্টি করে দিত।

এদিকে যেমন কারাগারের মধ্যে ডাক্তারজী সঙ্ঘের চিন্তাধারা বিস্তারের জন্য প্রয়াসী ছিলেন, তেমনই বাইরে তাঁর অনুগামীরাও কার্যবৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টার পরাকাষ্ঠা করছিলেন। ডাক্তারজীর পরে সরসেনাপতি শ্রী মার্তণ্ডরাও জোগও সত্যাগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নাগপুরের জেলা সঙ্ঘচালক শ্রীআপ্পাজী হল্‌দেকে সত্যাগ্রহের ডিক্টেটরই নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তিনিও কিছু দিন পরে জেলে চলে গেলেন। তলেগাঁওয়ের সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণের জন্য শ্রীরামভাউ বখরে এবং শ্রীবিট্ঠলরাও গাডগেও নাগপুর ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁদের বিদায় জানাবার জন্য নাগপুর শাখায় কার্যক্রম হয়েছিল। চিমূরের জঙ্গল-সত্যাগ্রহে সেখানকার দশ-পনেরজন স্বয়ংসেবক ধরা পড়ে, সেই কারণে কিছুদিন শাখা ঠিকমত চালানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। নাগপুরে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের শুশ্রূষা-বাহিনীর কাজেরও জনসাধারণ যথেষ্ট প্রশংসা করছিল। সঙ্ঘের গণবেশের খাকি শার্টের পরিবর্তে সাদা শার্ট পরে জামার হাতায় ভারতীয় সংস্কৃতির 'স্বস্তিক' দিগ্‌দর্শক প্রতীক লাগিয়ে স্বয়ংসেবকদের এই বাহিনী প্রত্যেক শোভাযাত্রার সঙ্গে এবং প্রধান-প্রধান কার্যক্রমের সময় উপস্থিত থাকত। লাঠির আঘাতে আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা এবং অচৈতন্য হয়ে

যারা পড়ে যেত তাদের চৈতন্য ফিরিয়ে বাড়ী পৌঁছে দেবার কাজ করত এই বাহিনী। ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে কয়েকজন সত্যাগ্রহীর উপর বেত্রাঘাত করে অমানুষিক শাস্তি দেওয়া হয়। বেত এমন নৃশংসভাবে মারা হত যে চামড়া ছিঁড়ে দেহের মাংসের মধ্যে বেত ঢুকে যেত এবং রক্তে শরীর ভেসে যেত। কিন্তু সত্যাগ্রহীরা হাসতে-হাসতে এই যন্ত্রণা সহ্য করতেন। স্বয়ংসেবকেরা এই সব সত্যাগ্রহীদের গলায় মালা পরিয়ে তাঁদের শোভাযাত্রা বের করতেন। আহতদের চিকিৎসা সরসঙ্ঘচালক ডাঃ পরাঞ্জপে নিজের ঔষধালয়ে নিয়ে গিয়ে করতেন। ৮ই আগষ্ট 'গাড়োয়াল দিবস'-এর দিন সরকার ১৪৪ ধারা জারী করে দেয়। কিন্তু সে দিনও মিছিল বের করা হয়। সেদিন শুশ্রূষা-বাহিনীকে বেলা একটা থেকে রাত্রি একটা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে হয়।

আন্দোলনে এই রকম সহযোগিতা দিতে থাকলেও স্বয়ংসেবকরা দৈনন্দিন শাখার কাজে অবহেলা করেননি। বার-বার গুজব রটত যে সঙ্ঘ-কার্যালয়ের খানা-তল্লাসি করা হবে। সেই কারণে সব কাগজ-পত্র সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্বয়ংসেবকদের আসা-যাওয়া নিয়মিত চলছিল। সে সময়ের অবস্থা অনুসারে কার্যালয়ের মধ্যে চরখা ও তক্‌লিও চলত এবং সুতো কাটতে-কাটতে স্বয়ংসেবকেরা সঙ্ঘ-কার্যের বিষয়ে আলোচনা করতেন। সমস্ত স্বয়ংসেবকদের মনে এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে ডাক্তারজী জেল থেকে ফিরে এলে আমরা যেন তাঁকে দেখাতে পারি যে আমরা শুধু সঙ্ঘ-কার্য টিকিয়ে রাখিনি, বরং তার বৃদ্ধিও করেছি। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য তাঁরা খুব সচেষ্ট ছিলেন। তার ফলে শাখাগুলির বৃদ্ধিও হতে থাকে। মাঝে-মাঝে ডাঃ পরাঞ্জপে অকোলা গিয়ে ডাক্তারজীর নিকট এই সংবাদ জানিয়ে আসতেন। সেই বছর রক্ষা-বন্ধনের দিন ডাঃ পরাঞ্জপে কারাগারে ডাক্তারজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর হাতে রাখী বাঁধেন এবং অন্য স্বয়ংসেবকদের বাঁধার জন্য তাঁকে রাখী দিয়ে আসেন। প্রান্তের অন্য শাখাগুলির সহিত পত্র-ব্যবহার এবং স্বয়ং সে সব স্থানে গিয়ে সম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়াস কার্যকর্তারা বরাবর করতেন।

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ-আন্দোলন চলাকালীন ডাঃ মুঞ্জে গোল-টেবিল বৈঠকের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ইংল্যাণ্ড যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সরকারের সঙ্গে অসহযোগবাদী ব্যক্তিদের এই ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি। তাঁরা ডাঃ মুঞ্জের প্রবল সমালোচনা করেন, কিন্তু এই সব সমালোচনা হজম করার সহনশীলতা ডাঃ মুঞ্জের ছিল। এর বিরুদ্ধে কিছু লোক ঠিক করল যে কংগ্রেসের ডাঃ মুঞ্জে বেপরোয়া লোক, সেই কারণে তাঁকে গুণ্ডার হিসাবে চিত্রিত করে সেই ছবি নিয়ে তারা মিছিল বের করল। কিন্তু মিছিল কিছু দূর এগিয়ে যেতেই কয়েকজন আচম্‌কা ঝাঁপিয়ে পড়ে, কেউ কিছু বোঝার আগেই ছবি লোপাট করে সেটা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। রাজনীতিতে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তার প্রদর্শন এরকম অপমানজনক পদ্ধতিতে করার নীচ প্রবৃত্তি কখনই সমর্থন করা যায়না। ডাক্তারজীর অভিমত ছিল যে মতভেদ থাকলেও পরস্পরের দেশভক্তি তথা বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সকলের নিজ-নিজ পদ্ধতিতে প্রয়াস করা উচিত। অতএব, যখন এই ব্যঙ্গচিত্রের ঘটনা ডাক্তারজী জেলের মধ্যে বসেই জানতে পারলেন,

তখন তাঁর একথা জেনে সন্তোষ হল যে সাধারণ মানুষেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অনুচিত ব্যাপারটাকে প্রতিহত করেছে।

'সামঞ্জস্য' ডাক্তারজীর শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল। একবার তর্ক শুরু হল যে গান্ধীজী শ্রেষ্ঠ অথবা স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর। সংযোগবশতঃ ডাক্তারজীও সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। উভয় পক্ষের তরফ থেকে তাঁদের নিজ-নিজ বক্তব্য ডাক্তারজীকে জানানো হল এবং ডাক্তারজীর সিদ্ধান্ত জানার জন্য সকলে উন্মুখ হলেন। সেই সময়ে ডাক্তারজী যে ভূমিকা গ্রহণ করলেন তার থেকে তাঁর স্বভাবের মূলগত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বললেন, "এই বিতর্ক এমনই যে গোলাপ শ্রেষ্ঠ, না পদ্ম শ্রেষ্ঠ। পদ্ম যেমন গোলাপের সমান নয়, সেইরকম গোলাপও পদ্মের সমান নয়। একথা সত্য হলেও, সৌন্দর্য, কোমলতা ও সুগন্ধ তিন দিক দিয়েই দুটির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে মতভেদ হতে পারে। এইরূপ অবস্থায় অন্য ফুলটিকে পিষে ফেলার বদলে নিজ-নিজ অভিরুচি অনুসারে নিজের ফুলের আনন্দ গ্রহণ করা উচিত।" ডাক্তারজীর এইরূপ চিন্তাধারার পরিণামেই স্বয়ংসেবকদের মধ্যে কখনো অপরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ তথা মাৎসর্যের মনোভাব সৃষ্টি হয়না। এরই ভিত্তিতে কংগ্রেসের সঙ্গে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও ১৯৩০ সালের আন্দোলনের সময়ে স্বয়ংসেবকেরা কংগ্রেসের সহযোগিতা করেছিলেন।

ডাক্তারজী যখন কারাগারে ছিলেন, সেই সময়ে সঙ্ঘ-বিরোধী কিছু লোক মোহিতের ভগ্ন প্রাসাদের স্থানে গৃহ-নির্মাণের জন্য খরিদ করার নাম করে সঙ্ঘের কার্যক্রম বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করে। সেই সময়ে রাজা লক্ষ্মণরাও ভোঁসলে স্বয়ং এগিয়ে এলেন এবং বললেন, "বেলবাগ, তুলসীবাগ, হাতিখানা ইত্যাদির মধ্যে যে স্থান পছন্দ, সেই স্থানের সদ্ব্যবহার কর।" তাঁরই ইচ্ছানুসারে হাতিখানায় সঙ্ঘের শাখা চলতে লাগল। ডাক্তারজীর সঙ্গে রাজা লক্ষ্মণরাও ভোঁসলের গভীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। এই আত্মীয়তার কারণে সঙ্ঘ-কার্যের সঙ্গে সহযোগিতা করতে তাঁর খুবই ভাল লাগত। সেই কারণেই ঐ বছর বিজয়া দশমী উৎসবে সভাপতির অভিভাষণে তিনি সমস্ত স্বয়ংসেবকদের এই বলে উৎসাহিত করেন যে "ডাক্তার হেডগেওয়ার যে পবিত্র কার্য আরম্ভ করেছেন, আপনারা সকলে পরিশ্রম করে সেই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান।" নিজেদের লোকেরাই এই কাজে কী রকম বাধা সৃষ্টি করে, তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, "সঙ্ঘের বিরোধীরা যদি এই কাজের ক্ষতি করার ঘৃণ্য প্রয়াস না করত, তাহলে আজ আপনারা যা দেখছেন, তার থেকে অনেক বেশী প্রগতি হত। আজও সেই রকম প্রয়াস চলছে।" এই বিজয়া দশমী উৎসবে গ্রামে-গ্রামে সঙ্ঘ-শাখাগুলিতে 'রে মন! তুঝে সুখ কা অধিকার নহীঁ' ('ওরে মন! তোর সুখের অধিকার নেই') এই শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করা হয়েছিল। এই ভাবোদ্দীপক তথা প্রেরণাদয়ক প্রবন্ধে এই চিন্তা ব্যক্ত করা হয়েছিল যে "দেশের পরাধীনতার অবসান ঘটিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র সমাজ শক্তিশালী তথা আত্মনির্ভর না হয়ে ওঠে, ততক্ষণ 'ওরে মন! তোর ব্যক্তিগত সুখের আকাঙ্ক্ষা করার কোন অধিকার নেই।" বিজয়া দশমীর পথ-সঞ্চলনে ঐ বছর নাগপুর কারাগার এবং নরকেশরী অভ্যঙ্করের নিবাস-স্থানের সামনে দিয়ে যাবার সময়ে স্বয়ংসেবকেরা মান-বন্দনা করেছিল।

অকোলা জেলে ইতিমধ্যে সঙ্ঘ-চিন্তাধারার অনুকূল একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী তৈরী হয়ে গিয়েছিল। জেল থেকে মুক্তিলাভের পর কীভাবে কাজ করতে হবে, সে বিষয়েও আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। যে সব কার্যকর্তা জেল থেকে মুক্তিলাভ করতেন, তাঁদের ডাঃ ঠৌসরের নেতৃত্বে সকলে প্রণাম করতেন এবং এইভাবে তাঁদের বিদায় দেওয়া হত। বুলঢানা, অকোলা এবং যবতমালের কার্যকর্তারা ডাক্তারজীকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন যে "জেল থেকে মুক্ত হবার পর আমাদের শহরে আসবেন। আমরা সঙ্ঘ শুরু করব।" ডাক্তারজীর নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করার সময়ে সকলেরই হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত এবং অনেকের তো আক্ষরিক অর্থেই চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠত।

একজন-একজন করে সঙ্গীরা মুক্ত হচ্ছিলেন। ভর্তি ব্যারাক ক্রমেই রিক্ত হয়ে পড়ছিল। মানুষে পরিপূর্ণ আনন্দের বাতাবরণও বদলে যাচ্ছিল। এই সময়ে ডাক্তারজীর মনোকষ্ট বৃদ্ধির আরো একটি সংবাদ এল। নাগপুরের ধনাঢ্য সজ্জন তথা ডাক্তারজীর বন্ধু শ্রী ডি লক্ষ্মীনারায়ণের লোকান্তরের দুঃসংবাদ কারাগারে পৌঁছল। বন্ধুর পরলোকগমনে সঙ্ঘেরও বিপুল ক্ষতি হল। সত্যাগ্রহের পূর্বে ঐ উদারমনা বন্ধু সঙ্ঘকার্যের জন্য এক লক্ষ টাকা প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এই আকস্মিক মৃত্যুর ফলে ঐ ইচ্ছা রূপায়িত হতে পারেনি।

গোল-টেবিল বৈঠকের সংবাদও চিন্তাজনক ছিল। মুসলমানেরা সেখানে নিজেদের আসল স্বরূপ প্রকাশ করে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের পরিচয় দিল। এসব দেখে ডাক্তারজীর গভীর মর্মবেদনা হল যে তেত্রিশ কোটির হিন্দু সমাজ থাকা সত্ত্বেও হিন্দুস্থানকে খণ্ডিত করার পাকিস্তানী চক্রান্ত চোখের সামনেই প্রত্যক্ষ হতে চলেছে। কিন্তু এই হিন্দু সমাজ সব কিছু দেখেও জড়বৎ তার দিক থেকে চোখ বুজে গভীর নিদ্রা উপভোগ করছে। সেই ভয়ানক বাস্তবতার অতি গুরুতর সম্ভাবনা নিয়ে তাঁর চোখের সামনে নৃত্য করতে লাগল। আরো একটি বজ্রাঘাত হল। শ্রী বালাজী হুদ্দার ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে 'বালাঘাট রাজনৈতিক ডাকাতি মামলায়' গ্রেপ্তার হলেন। শ্রী হুদ্দার ডাক্তারজীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তথা বিশ্বস্ত কার্যকর্তা ছিলেন। তিনি সঙ্ঘের সরকার্যবাহও ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে এই ধরণের অভিযোগের অর্থ ছিল এই যে ইংরেজদের চক্ষুশূল রাঃ স্বঃ সঙ্ঘের উপরেও রাহুর দশা আসতে পারে। বিগত শত-শত বৎসর ব্যাপী অখণ্ড যুদ্ধরত এবং বিদেশীদের আক্রমণ ও নিজেদের সমাজের আত্মবিস্মৃতির কারণে যে রাষ্ট্রীয় ভাবনা পরিপুষ্ট হওয়ার সুযোগই পাওয়া যায়নি, সেই কাজই বিপরীত পরিস্থিতিতেও অত্যন্ত সাবধানে আরম্ভ করার পাঁচ বছরের মধ্যেই এই প্রকার বিপত্তির সম্ভাবনা ডাক্তারজীর নিকট সেইরূপ কষ্টকর যেমন বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে চেয়ে বনে নিয়ে গেলে রাজা দশরথের হয়েছিল। নিজের সম্পূর্ণ জীবন দিয়ে ডাক্তারজী সঙ্ঘের চারাটিকে সিঞ্চন করছিলেন। তিনি এই ধ্যেয়দেবতার আরতির জন্যই নিজের পঞ্চপ্রাণকে নিত্য প্রদীপ্ত রাখতেন। যার জীবনে এইরূপ সমর্পণের ভাবনা আছে, শুধু সেই সম্ভবতঃ এই দুঃখকে উপলব্ধি করতে পারবে। আর এখন কারাগারের মধ্যে এমন কোন সঙ্গীও অবশিষ্ট নেই, যাঁর কাছে মন খুলে হৃদয়ের বেদনা ব্যক্ত করতে পারেন এবং

অন্তরের ভার কিঞ্চিৎ লাঘব করতে পারেন। চিন্তা চিতার থেকেও বড় হয়ে ওঠে। এর ফলে ডাক্তারজীর স্বাস্থ্যের ভীষণ অবনতি হল।

এইরূপ চিন্তা ও উদ্বিগ্ন মনঃস্থিতির মধ্যেই শাস্তির মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বেই ১৯৩১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তাঁর মুক্তির আদেশ এল। অকোলা ও ওয়ার্ধায় কিছু সময় থেকে সেই সব স্থানে অভ্যর্থনা-সম্বর্ধনায় অংশগ্রহণ করার পর ১৭ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় তিনি নাগপুর পোঁছলেন। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বিশাল জনতা সমবেত হয়েছিল। "ডাক্তার হেডগেওয়ার কী জয়"—এর গগনভেদী জয়ধ্বনিতে সমস্ত নাগপুর নিনাদিত হতে থাকল। বহু সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁর কণ্ঠে মাল্য অর্পণ করা হল। নানা বাদ্যধ্বনি সহকারে বিরাট শোভাযাত্রা তাঁকে নিয়ে সব প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করল। ডাঃ পরাঞ্জপে ডাক্তারজীকে স্বাগত সম্বর্ধনা জানিয়ে একটি ভাষণ দিলেন এবং সেখানেই তাঁকে সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালকের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পুনরায় গ্রহণ করার অনুরোধ জানান।

ডাক্তারজীকে ঘিরে মণ্ডল করে দণ্ডায়মান স্বয়ংসেবকদের মুখগুলি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ডাক্তারজী সকলের কুশল-বার্তা জিজ্ঞেস করলেন এবং নিজের বাড়ী না গিয়ে অসুস্থ স্বয়ংসেবকদের দেখতে আগে তাদের বাড়ী গেলেন।

১৯. বিদর্ভ প্রবেশ

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১, ডাক্তার হেডগেওয়ার অকোলা কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করলেন। নাগপুরে ফিরে আসার পর তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে সঙ্ঘকার্য সম্বন্ধে তিনি সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করেন। প্রধান নেতারা কারাগারে বন্দী থাকা সত্ত্বেও সঙ্ঘকার্যে কোন রকম ন্যূনতা যেন না আসে সে বিষয়ে স্বয়ংসেবকরা সংকল্প গ্রহণ করেছিল। কার্যবৃদ্ধি এ কথাই প্রমাণ করেছে যে তাঁরা নিজ সংকল্পে দৃঢ় ছিল। যদিও ডাক্তারজীর চতুর্দিকে একত্রিত স্বয়ংসেবকেরা স্কুলে পাঠরত বালক তথা কিশোর শ্রেণীভুক্তই ছিল, কিন্তু সঙ্ঘকার্যের ব্যাপকতাকে সামলানো এবং তার বৃদ্ধির জন্য যে সামর্থ্য ও অধ্যবসায়ের তারা পরিচয় দিয়েছিল, তা অনেক বয়স্কদেরও লজ্জা দেবার মতই ছিল। ধ্যেয়নিষ্ঠা তথা সুসংস্কারের ফলে আপাত দৃষ্টিতে যাদের অকিঞ্চন মনে হয়, সেই সব মানুষও যে কত সমর্থ ও কর্তৃত্বশালী হয়ে উঠতে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। সঙ্ঘের কার্যক্রমগুলির সংস্কার-ক্ষমতা একটি-একটি স্বয়ংসেবকের রূপে সাকার হয়ে উঠছিল।

নাগপুরের সমগ্র পরিস্থিতির বিষয় জেনে নিয়ে পাঁচ-ছয় দিন সেখানে থাকার পর ডাক্তারজী বম্বে গেলেন। তাঁর মনে এই চিন্তা উঠছিল যে বম্বেতে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে মহারাষ্ট্র অঞ্চলেও সঙ্ঘকার্যের বীজ বপন করতে হবে। বিলেতের গোল-টেবিল বৈঠকে যে হিন্দু বিরোধী সুর শোনা গিয়েছিল, তার সংবাদ তিনি পেয়েছিলেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন ভবিষ্যতে হিন্দুদের সম্মুখে সংকটের তীব্র বিভীষিকা ঘনিয়ে আসছে এবং তার থেকে নিস্তার লাভের অভ্রান্ত পথও তাঁর জানা ছিল। সেই পথে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলার প্রয়োজন ছিল।

বম্বেতে ডাক্তারজী শ্রী বাবারাও সাভারকর এবং ডাঃ নারায়ণরাও সাভারকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁদের সঙ্গে মহারাষ্ট্রে সঙ্ঘকার্যের বিস্তারের বিষয়ে আলোচনা হল। এই সময়ে সংযোগ-বশতঃ শ্রী বিট্‌ঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গেও সাক্ষাৎ ঘটল। বিট্‌ঠলভাই-এর স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় সরকার তাঁকে চিকিৎসার জন্য ভিয়েনায় প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে বম্বেতে নিয়ে এসেছিল। সরকার খুবই গোপনে এই কাজ করছিল। কথিত আছে যে যাতে তাঁকে চেনা না যায়, তার জন্য তাঁর দাড়িও কামিয়ে ফেলা হয়েছিল। বম্বেতে তাঁকে শেঠ গোকুলদাস তেজপাল চিকিৎসালয়ে রাখা হয়েছিল। সেই সময়ে ডাঃ হেডগেওয়ারের ভাগ্নে ডাঃ ভাস্কররাও কৃষ্ণরাও বিঞ্চুরে ঐ চিকিৎসালয়ে হাউস-সার্জেন ছিলেন। তিনি বিট্‌ঠলভাইকে দেখে চিন্‌তে পারলেন। বিট্‌ঠলভাই ডাঃ বিঞ্চুরেকে বললেন, "তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ, একথা কাউকে না বলে, আমি যাঁদের কথা বলছি, তাঁদের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দাও।" ডাঃ বিঞ্চুরের কাছ থেকে ডাক্তারজীও বিট্‌ঠলভাই-এর অসুস্থতার

সংবাদ জানতে পারলেন। সঙ্ঘের মৌলিক কাজের বিষয়ে যে সব নেতৃবর্গের ভালবাসা ছিল, তাঁদের মধ্যে বিট্‌ঠলভাই ছিলেন অন্যতম এবং কয়েক বছর পূর্বে নাগপুরে সঙ্ঘস্থানে পদার্পণ করে তিনি তাঁর আশীর্বাদও দিয়ে গিয়েছিলেন। অতএব, ডাক্তারজী বাবারাও সাভারকরের সঙ্গে ডাঃ বিঞ্চুরের সাহায্যে বিট্‌ঠলভাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিলেন।

নাগপুর থেকে বম্বে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই শ্রী বাবারাও সাভারকরের শ্রীক্ষেত্র কাশীতে যাবার আবশ্যক বার্তা ডাক্তারজী জানতে পারলেন। কাশীতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার আশংকার সৃষ্টি হয়েছিল। স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় শ্রী বাবারাও সাভারকরকে বিশ্রামের জন্য কাশীতেই অবস্থান করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর পক্ষে ছুটোছুটি করা সম্ভব ছিল না। তাঁর মনে হল হিন্দুদের জাগ্রত করে তাদের সংগঠন গড়ে তোলার এটাই উপযুক্ত সুযোগ। অতএব, সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি ডাক্তারজীকে যথাশীঘ্র কাশীতে আসার বার্তা পাঠালেন। ১১ই মার্চ ডাক্তারজী কাশীতে পৌঁছলেন। তিনি সেখানকার স্থানীয় কার্যকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে, সংঘর্ষের সৃষ্টি হলে কীভাবে তার মোকাবিলা করতে হবে সে বিষয়ে মার্গদর্শন করলেন। পরে স্বর্গীয় বাবারাও সাভারকরের জীবন-চরিত্রে এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায় যে ''দাঙ্গার সময়ে হিন্দুদের রক্ষা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা ডাক্তারজী করেছিলেন।''

ডাক্তারজীকে কাশীতে আসার জন্য বাবারাও-এর জরুরী তারবার্তা এসেছিল। বাবারাও-এর তাড়াহুড়া করার অভ্যাসের ব্যাপারে তিনি পরিচিত ছিলেন। অতএব, তিনি পরিহাস-ছলে এই উত্তর পাঠালেন — ''অপেক্ষা কর, লক্ষ্য রাখ, প্রার্থনা কর ও আশা রাখ।'' — কিন্তু তার দু-এক দিনের মধ্যেই তিনি কাশী পৌঁছে গেলেন। কোন্ ট্রেনে যাচ্ছেন, তার সংবাদ পূর্বেই জানিয়ে দেওয়ার ফলে কয়েকজন স্টেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলেন। তাঁরা তাঁকে শ্রী ভাউরাও দামলের বাসস্থানে নিয়ে গেলেন। বাবারাও সেখানেই তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। ডাক্তারজীর টাঙ্গার শব্দ শুনে বাবারাও ইচ্ছে করেই দরজা বন্ধ করে দিলেন। যখন ডাক্তারজী দরজার কড়া নাড়লেন তখন তিনি ভিতর থেকে বললেন, "Wait, watch, pray and hope." তাঁর এই রকম অভ্যর্থনায় অট্টহাস্য ও খুশির বাতাবরণ চারিদিকে ছেয়ে গেল।

১লা এপ্রিল পর্যন্ত ডাক্তারজী কাশীতে অবস্থান করলেন। হিন্দু সমাজের মধ্যে জাগৃতি, সংগঠন এবং আত্মরক্ষার সামর্থ্য নির্মাণের যে উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁকে 'তার' করে ডেকে পাঠান হয়েছিল, সে বিষয়ে অস্থায়ী রূপে যেটুকু করা সম্ভব ছিল, তা তিনি করলেন, কিন্তু সমাজের মধ্যে স্থায়ী সংগঠনের পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পরিচয় এবং তার কাজের সূচনা করার জন্যও তিনি প্রয়াস করলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়জী ইতিপূর্বেই সঙ্ঘের পরিচয় লাভ করেছিলেন। ডাক্তারজী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর সহায়তা ও প্রেরণায় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়-এর মধ্যে সঙ্ঘ শাখার স্থাপনা করেন। তাঁর ২৬ মার্চের পত্রে তিনি লেখেন, ''হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তথা শ্রী কাশী নগর, উভয় স্থানেই একটি করে শাখা শুরু হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পাঁচ-ছয় বার গেলাম। ঐ সময়ে তিনটি বৈঠকে

বক্তৃতা ও তিন বার আলোচনা বৈঠক হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে এর পরে শাখার কাজ ভালভাবে চলবে এরকম আশাজনক অবস্থা দেখা যাচ্ছে। নগরের মধ্যেও শাখার কাজ ভালভাবে চলছে এবং ক্রমে বড়রাও সঙ্ঘের মধ্যে সম্মিলিত হচ্ছেন।"

কাশীতে বিশ্বনাথ মন্দিরের নিকটস্থ মসজিদ হিন্দুদের উপর আক্রমণ তথা অপমানের কথা বার-বার স্মরণ করায়। ডাক্তারজীর হৃদয়কে এই বিষয়টি সর্বদাই ব্যথিত করত। হিন্দু সমাজের সেই সময়কার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, "কাশী বিশ্বেশ্বরের সন্নিকটে মসজিদ, গঙ্গার ঘাটের উপর মিনার কেন দাঁড়িয়ে আছে? হিন্দুদের মনে এই প্রশ্ন পর্যন্ত ওঠেনা এবং তার জন্য পীড়ার অনুভূতি পর্যন্ত হয়না? ভুলে যাবেন না যে সঙ্ঘ এই অবস্থার পরিবর্তন চায়।"

একটি বৈঠকে সঙ্ঘ সম্বন্ধে পর্যাপ্ত আলোচনা হয়ে যাবার পর উপস্থিত প্রৌঢ় সজ্জনদের নিকট ডাক্তারজী প্রতিজ্ঞা গ্রহণের আবেদন জানালেন। প্রতিজ্ঞার স্বরূপ ব্যক্ত করে তিনি বলেন যে তার মধ্যে এই কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে যে "আমি দেশ ও ধর্মের জন্য 'তন-মন-ধনপূর্বক' আজন্ম কাজ করব।" সেই সময়ে জনৈক সজ্জন প্রস্তাব করেন যে 'তন-মন-ধনপূর্বক'-এর স্থানে 'যথাশক্তি' শব্দ প্রয়োগ অধিক সমীচীন হবে। একথায় ডাক্তারজী বলেন, "শক্তির বাইরে তো কোন মানুষ কাজ করতে পারেনা। তবে হ্যাঁ, শক্তি থাকা সত্ত্বেও হাত বাঁচিয়ে আর নামমাত্র কাজ করে সে অন্যদের একথা বোঝাবার চেষ্টা করতে পারে যে "আমি যথাশক্তি কাজ করছি।" এই কারণেই প্রতিজ্ঞায় 'তন-মন-ধনপূর্বক' শব্দগুলি যোজনা করেই সন্নিবেশিত করা হয়েছে।"

(তন-মন-ধনপূর্বক - এর অর্থ হল — 'দেহ-মন এবং অর্থ সহকারে' — অনুবাদক।)

ডাক্তারজীর এই সুস্পষ্ট বক্তব্য শুনে উপস্থিত সজ্জনরা অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। দুই-তিন দিন যাবৎ ডাক্তারজীর কথাবার্তায় সকলের মনের উপর প্রথম থেকেই এই পরিণাম হয় যে তিনি রাষ্ট্রকার্যের জন্য পূর্ণ সমর্পণ ভাবযুক্ত ব্যক্তিদের আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্যই সচেষ্ট ছিলেন। অতএব, অনেকের এই ধরনের কথার মার-প্যাঁচের চেষ্টা ভাল লাগেনি। জনৈক উকিল এগিয়ে এসে বললেন, "ডাক্তারজী প্রতিজ্ঞার মধ্যে পরিবর্তন করার প্রশ্ন আমাদের সামনে রাখেননি। সঙ্ঘের প্রতিজ্ঞা যে রকম, সেই রকমই যদি আমরা স্বীকার করে নিই, তাহলে তা গ্রহণ করার কথা বলেছেন। তদনুসারে আমি সর্বপ্রথম প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত।" উকিল সাহেবের প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পরে অন্য সজ্জনরাও বাক্য-ব্যয় না করে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন।

বাবারাও সাভারকর অনেক বছর যাবৎ হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার ব্যাপারে ডাক্তারজীর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর মনের উপর ডাক্তারজীর নিজ কার্যের প্রতি একাগ্রতা, নিঃস্বার্থ বৃত্তি, প্রখর ভাবনা এবং সংগঠনের অপূর্ব কুশলতার গভীর ছাপ অংকিত হয়েছিল। তিনি স্বয়ং 'তরুণ হিন্দু মহাসভা' নামে তরুণদের সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই সংস্থার যুবকদের এবং সঙ্ঘের সুসংস্কার প্রাপ্ত তরুণদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করলেন। তাঁর মাঝে-মাঝে একথাও মনে হত যে ভারতের মত বিশাল

দেশের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার সামর্থ্য আর তাঁর নেই। সেই সঙ্গে সমস্ত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার মত কাজ নির্মাণ করার উপযুক্ত তথা আবশ্যক কর্তব্য, দক্ষতা এবং গতিশীলতার দর্শন তিনি ডাক্তারজীর আচার ও বিচারের মধ্যে প্রত্যক্ষ করছিলেন। সেই কারণে তিনি নিজের মনেই সংকল্প করলেন যে নিজের ঢোল আলাদা না পিটিয়ে 'তরুণ হিন্দু মহাসভা'কে সঙ্ঘের মধ্যে বিলীন করে দিয়ে সমবেত কণ্ঠে রাষ্ট্রবন্দনা করাই উপযুক্ত কাজ হবে। নিজের মনোগত ইচ্ছা তিনি ডাক্তারজীর নিকট ব্যক্ত করার উপযুক্ত সুযোগ খুঁজছিলেন এবং একদিন সেই সুযোগ পেয়ে গেলেন। একদিন ডাক্তারজী বাবাসাহেবের পাশে বসে আলাপ-আলোচনা করছিলেন, সেই সময়ে বাবাসাহেব বললেন, "ডাক্তার আজ আমি আমার তরুণ হিন্দু মহাসভার বিসর্জন করছি। আপনি একে সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। এর পরে আমার যতটুকু শক্তি আছে, তা আমি সঙ্ঘের জন্যই ব্যয় করব। আপনার সঙ্ঘ চিরঞ্জীবী তথা যশস্বী হোক — এই আমার আশীর্বাদ।"

নিজ সংস্থা সম্বন্ধে অভিমান না রেখে তাকে সমান ধ্যেয়ের জন্য প্রচেষ্টারত সংস্থার মধ্যে বিলীন করে দেবার দৃষ্টান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে আজ খুব কমই দেখা যায়। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ও মৃতপ্রায় সংস্থাগুলির প্রতিও তাদের কর্ণধারদের মোহ থেকে যায় এবং সেগুলি সময়ে-কুসময়ে, পথে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করে থাকে। বাবারাও-এর সিদ্ধান্ত যতটা তাঁর সংস্থাভিনিবেশ-বিরহিত উচ্চ ধ্যেয়বাদের দ্বারা প্রেরিত ছিল, ততটাই ডাক্তারজীর লোক-সংগ্রাহক বৃত্তি তথা কার্যকুশলতারও পরিণাম ছিল।

ডাক্তারজী লোক-ব্যবহারের ছোট-ছোট বিষয়গুলির প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। এটাই ছিল তাঁর লোক সংগ্রহের কুশলতার রহস্য। কাশীতে থাকাকালীনই তিনি নরকেশরী ব্যারিস্টার মোরোপন্ত অভ্যঙ্করের কারামুক্তির সংবাদ পেয়েছিলেন। বর্ষ-প্রতিপদের দিন তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে ডাক্তারজী একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি লেখেন, "আজ বর্ষ প্রতিপদের দিন। এই মঙ্গলময় দিনে যদি আমি প্রত্যক্ষভাবে আপনাকে দর্শন করতে পারতাম, তাহলে কত আনন্দ হত। বিশেষতঃ আপনার কারাবাসের কারণে আপনার সঙ্গে দীর্ঘদিন সাক্ষাৎ হয়নি। জেল থেকে মুক্ত হবার পর আপনার দর্শনলাভের প্রতীক্ষায় ছিলাম, এমন সময় কিছু আবশ্যক কাজে আমাকে শ্রীক্ষেত্র কাশীতে আসতে হল। আজ আপনার কাছ থেকে দূরে থাকার কারণে যদিও আমি প্রত্যক্ষভাবে আপনাকে দর্শন করতে পারছিনা, তবু নিজের মনশ্চক্ষুতে আপনাকে দর্শন করে এই পত্রের মাধ্যমে আপনার সঙ্গে মিলিত হচ্ছি। সন্দেহ নেই যে তাঁর সঙ্গে যাঁরা মতভেদ পোষণ করতেন এবং নাগপুরের বিবাদগ্রস্ত রাজনীতিতে ব্যারিস্টার অভ্যঙ্করের মত অত্যন্ত স্পষ্টভাষী ব্যক্তিকেও ডাক্তারজী কখনো দূরে সরিয়ে রাখেননি। সমাজের সংগঠনের রথের রশি টানার জন্য জগন্নাথদেবের রথের মতই লক্ষ লক্ষ হাতের প্রয়োজন হয়। এই অনুভূতির কারণেই নানা মানুষের দোষ-ত্রুটিগুলিকে জেনেও তাঁদের কাছে টেনে নেবার স্বভাব ডাক্তারজী আত্মস্থ করেছিলেন। তাঁর প্রত্যাশামত এই রকম অনেক মানুষের সাহায্য সঙ্ঘকার্যের জন্য পাওয়াও গিয়েছিল।

১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ লাহোর জেলে সরদার ভগৎ সিংহ, সুখদেব ও রাজগুরুকে

ফাঁসি দেওয়া হয়। ডাক্তারজী যখন এই সংবাদ জানতে পারেন, তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। ভগৎ সিংহ ও রাজগুরুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। শুধু তাই নয়, রাজগুরুর সঙ্গে নাগপুরে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। তিনি জানতেন যে এই ধরণের মহান আত্মাহুতি ঘন অন্ধকারে তীব্র বিদ্যুৎ ঝলকের মত নিষ্প্রাণ রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষণিক চৈতন্যের সঞ্চার করে তাকে প্রবল ঝাঁকুনি দেয়। তবু রাষ্ট্রকে স্থায়ীভাবে নিজ অস্মিতার সুরক্ষা ও অভিব্যক্তির জন্য জাগিয়ে তুলে তার মধ্যে চির চৈতন্যের আবির্ভাব যেখানে করতে হবে, সেখানে এইরকম কর্তৃত্ববান্, শূর, নির্মোহি তথা দেশভক্তিতে পরিপূর্ণ যুবকদের ফাঁসির মঞ্চে নিজেদের প্রাণোৎসর্গ করার ঘটনা তাঁর নিকট অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। 'মেরা রঙ্গ দে বসন্তী চোলা' গান গাইতে গাইতে এই তরুণরা ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পড়ল। ডাক্তারজী এই বিষম আঘাতকে এই সংকল্পের সঙ্গে সহ্য করলেন যে এইরকম বসন্তী চোলার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অগ্রগামী তরুণদের এমন সুদৃঢ় পরম্পরা দেশের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে যারা দেশের জন্য জীবন অতিবাহিত করে 'যে রঙে রাঙিয়ে নিজেকে, বীর শিবাজী মায়ের শৃঙ্খল ভেঙেছিল' — সেই প্রেরণা গ্রহণ করে ছত্রপতি শিবাজীর যশস্বী জীবনের অনুকরণে মায়ের শৃঙ্খল মোচন করে দেশের মধ্যে বসন্তের আনন্দ-হিল্লোল বইয়ে দেবে, আর সমবেত কণ্ঠে সকলে গেয়ে উঠবে — "এস এস বসন্ত ধরাতলে।"

হিঙ্গনঘাটের ডাকাতিতে গঙ্গাপ্রসাদের পিস্তলের প্রয়োগ এবং বালাজি হুদ্দারের গ্রেপ্তারী ও মামলার কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। এই ধরণের ঘটনায় ডাক্তারজী যথেষ্ট চিন্তিত ছিলেন। সব সময়ে এই আশংকা থাকত যে যদি এইরকম একটি ঘটনার সঙ্গেও সঙ্ঘকে জড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তিলকে তাল করে সরকার তার চোখে কাঁটার মত বিঁধে থাকা এই সংগঠন-কার্যের উপর কুঠারাঘাত করার সুযোগ ছাড়বে না। বিধবার একমাত্র সন্তানের মত এই কাজকে রক্ষা করার চিন্তা সর্বক্ষণ ডাক্তারজীর মনকে ঘিরে থাকত। সেই কারণে তিনি ঠিক করলেন যে বিপ্লবী আন্দোলনের সময় সংগৃহীত শস্ত্রগুলিকে নষ্ট করে ফেলতে হবে। যাতে এই আশংকা চিরতরে শেষ হয়ে যায়। তদনুসারে ১৯৩১-এর কোন এক সময়ে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা ও সাফল্যের সঙ্গে ঐ কাজটি সম্পন্ন করে ফেলেন।

ভারতের রাষ্ট্রীয় ধ্বজ সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে সুষ্ঠু জ্ঞানের বড় অভাব দেখা যাচ্ছিল। ১৯০৬ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন নিজ নিজ কল্পনা অনুসারে নানা প্রকার পতাকাকে রাষ্ট্রীয় ধ্বজ রূপে গ্রহণ করেছিল। এরই মধ্যে তেরঙ্গা ঝাণ্ডারও ভারতের রাজনীতিতে আবির্ভাব ঘটল। এই সমস্ত প্রয়াসই ভারতীয় রাষ্ট্রজীবনের বিষয়ে অজ্ঞানতা ও বিস্মৃতির ফলশ্রুতি। ডাক্তারজীর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে ভারত অত্যন্ত প্রাচীন কাল থেকে এক রাষ্ট্ররূপে নিজ জীবন অতিবাহিত করে আসছে, এবং এই কারণে রাষ্ট্রজীবনের সকল প্রতীক এখানে চিরকাল বিদ্যমান ছিল। ফলে, আমাদের রাষ্ট্রীয় আকাঙ্খাসমূহ, জীবনের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি এবং সম্পূর্ণ ইতিহাসের গৌরবকে আমাদের সামনে উন্মোচনকারী ভগবাধ্বজ তথা গৈরিক পতাকা চিরকাল রাষ্ট্রের সম্মান-চিহ্ন রূপে আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার কেন্দ্র রূপে বিরাজিত ছিল।

করাচী কংগ্রেসে রাষ্ট্রধ্বজের প্রশ্নটি আলোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়। এ পর্যন্ত হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্যদের প্রতিনিধিকারী তিনটি রং পতাকার মধ্যে রাখা হত। কিন্তু শিখরা তাদের পৃথক হলুদ রং এর সঙ্গে যুক্ত করার আগ্রহ করল। অবশেষে রাষ্ট্রধ্বজ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি সমিতি গঠিত হল। এই সমিতিতে সরদার বল্লভভাই প্যাটেল, পঃ জওহরলাল নেহরু, ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়া, ডাঃ নাঃ সুঃ হর্ডীকর, আচার্য কাকা কালেলকর, মাস্টার তারা সিংহ ও মৌলানা আজাদ — এই সাতজন সদস্যকে গ্রহণ করা হল। সমিতি রাষ্ট্রধ্বজ সম্পর্কে অনেক গবেষণা করে সর্ব সম্মতিক্রমে এই প্রতিবেদন উপস্থাপন করে যে "ভারতের জাতীয় পতাকা" হবে এক রঙের, এবং তার রং হবে কেসরিয়া, এবং তার দণ্ডের দিকে নীল রঙের চরখার চিহ্ন থাকবে। কেসরিয়া রঙ তাঁরা ভারতীয় পরম্পরার ভিত্তিতে চয়ন করেছিলেন। তাঁদের প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল — "আমাদের সর্বসম্মত অভিমত এই যে আমাদের রাষ্ট্রীয় ধ্বজ এক রঙেরই হওয়া উচিত। ভারতের সমস্ত মানুষের এক সাথে উল্লেখ করতে হলে কেসরিয়া রংই সকলের সর্বাধিক স্বীকৃত হতে পারে। অন্য সব রঙের থেকে এই রং অধিক স্বতন্ত্র স্বরূপ ব্যক্ত করে এবং ভারতের অতীত পরম্পরার অনুকূল।" একটি রং স্বীকার করার ফলে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব এবং তা ব্যক্ত করার জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজ-নিজ পৃথক রং গ্রহণের এবং অপরকে তা গ্রহণ করতে বলার বিবাদ চিরতরে শেষ হয়ে যেত। যে সময় এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, তখন ডাক্তারজী যবতমালে ছিলেন। সমিতির ঐক্যমতে আসার পরেও তার উপর কংগ্রেস কার্যসমিতির সিদ্ধান্ত আবশ্যক ছিল। ডাক্তারজী তৎক্ষণাৎ লোকনায়ক বাপুজী অণের নিকট গেলেন, কারণ তিনি কার্যসমিতির বৈঠকের জন্য যাওয়ার প্রস্তুতি করছিলেন। তিনি বাপুজীকে বললেন, "আমার মনে হয় না, রাষ্ট্রধ্বজ কেসরিয়া ও ভগবা দুটি পৃথক। এই দুই রং-এর মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। অতএব, একটি রং কেসরিয়া অর্থাৎ ভগবাধ্বজেরই আপনার সমর্থন করা উচিত। যদিও যথেষ্ট গবেষণা তথা অনুসন্ধানের পরে সমিতি কেসরিয়া রং-এর প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু গান্ধীজীর সামনে সবাই মৌন হয়ে যাবে। যদি গান্ধীজী কেসরিয়াকে অস্বীকার করে তেরঙ্গাকেই বজায় রাখার আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহলে এই নেতারা মুখ খুলবেন না। অতএব, আপনার এগিয়ে এসে নির্ভীকতার সঙ্গে নিজের অভিমতকে প্রতিপাদন করা উচিত।"

লোকনায়ক অণে নিজে কেসরিয়া রং-এর পক্ষপাতি ছিলেন না। কিন্তু ডাক্তারজী যখন বোঝালেন যে কেসরিয়া ও ভগবার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই, তখন তিনি তা মেনে নিলেন এবং তিনি কার্যসমিতিতে এই বিষয়টি সমর্থনের আশ্বাস দিলেন। কিন্তু ডাক্তারজী এটুকু করেই থেমে থাকেননি। তিনি দিল্লীতে গেলেন এবং লোকনায়ক অণের বাসস্থানে ঘাঁটি গেড়ে বসলেন। অণেজীর কথায়, "তিনি সারা দিন দিল্লীতে নানা স্থানে ঘুরে বেড়ালেন। অতএব, নিশ্চিতই তিনি কার্যসমিতির অন্য সদস্যদের সঙ্গেও ঐ বিষয়ে কথা বলেছেন।"

কিন্তু এত দৌড়াদৌড়িতেও কোন ফল হল না। অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে যখন ধ্বজ সমিতির প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হল, তখন কমিটি ঐ প্রতিবেদন গ্রহণ না করে তেরঙ্গাকেই বজায় রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তবে ধ্বজ সমিতির সুপারিশের

ভিত্তিতে এটুকু অবশ্য করল যে ঘন লাল রং-এর পরিবর্তে কেসরিয়া রং গ্রহণ করা হল এবং তার স্থান হল সবার উপরে। ইতিপূর্বে লাল রং-এর পট্টি থাকত সবার নীচে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা হল যে তিনটি রং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতীক না হয়ে বিভিন্ন গুণের প্রতীক বলে স্বীকার করা হবে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত কেউ মন থেকে গ্রহণ করেনি। এই ভাবে সমিতির সমস্ত পরিশ্রম জলে গেল এবং রাষ্ট্রধ্বজের প্রশ্নটি ইতিহাস ও পরম্পরার ভিত্তিতে নিশ্চিত না হয়ে ব্যক্তি-বিশেষের ইচ্ছা ও ধারণার ভিত্তিতে গৃহীত হল।

প্রথম গোল টেবিল বৈঠকের সমাপ্তির পরে ডাঃ মুঞ্জে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ভারতে ফিরলেন। গোল টেবিল বৈঠকে ইংরেজ ও মুসলমানদের চক্রান্তের পরিণাম স্বরূপ হিন্দু বিরোধী তথা বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা অত্যন্ত প্রবল রূপে প্রকাশ করা হয়েছিল। ডাঃ মুঞ্জের কাছ থেকে পুরো সংবাদ শোনার জন্য ডাক্তারজী অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। ডাঃ মুঞ্জে ছিলেন গোঁড়া হিন্দু এবং নির্ভীক প্রকৃতির লোক। সেই সঙ্গে তিনি গভীরতা ও দূরদৃষ্টি সহকারে ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণও করতে পারতেন। ৯ই এপ্রিল বোম্বাই-এর এক সার্বজনিক সভায় গোলটেবিল বৈঠকের পশ্চাদ্‌ভূমিতে ভাষণ দেবার সময়ে তিনি গর্জন করে বলেন, "হিন্দুস্থানের সকল জাতি ও সব ধর্ম এখানকার রাষ্ট্রীয় অভিধান 'হিন্দু'র অন্তর্গতই হতে হবে। হিন্দু হিন্দুস্থান, মুসলিম হিন্দুস্থান, পার্শী হিন্দুস্থান, এই ধরণের হিন্দুস্থানকে খণ্ড খণ্ড আমি কখনও হতে দেবনা।"

১৬ই এপ্রিল যখন ডাঃ মুঞ্জে নাগপুরে এলেন, তখন ডাক্তারজী এবং সঙ্ঘের অনেক কার্যকর্তা স্টেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। সেই দিনই সন্ধ্যায় সঙ্ঘস্থানে গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে ডাঃ মুঞ্জের দেড় ঘন্টা ভাষণ হল। এই ভাষণের পূর্বে ডাক্তারজী ডাঃ মুঞ্জেকে স্বাগত জানিয়ে একটি ছোট বক্তৃতা দিলেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি বাস্তবিক নেতার কল্পনা উপস্থাপিত করেন। ঐ কল্পনা তাঁর নিজের জীবনের উপরেও পর্যাপ্ত আলোকপাত করে। "নাগপুরে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী যত নেতা আছেন, তাঁদের সবাই ডাঃ মুঞ্জের চরণপ্রান্তে বসেই শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।" এইভাবে ডাঃ মুঞ্জের প্রশংসা করে তিনি বলেন, "সস্তা জনপ্রিয়তার পিছনে গিয়ে জনমতের প্রবাহে ভেসে যাওয়া সহজ, কিন্তু প্রকৃত নেতার কাজ হল নিজের বিবেক-বুদ্ধি যদি জনমতের অনুকূল না হয়, তাহলে জনমতের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে নিজের অভিমত বুকে বুক ঠুকে জনতার সামনে ব্যক্ত করা। প্রবাহের সঙ্গে বয়ে যাওয়া — নেতার নয়, অনুগামীদের লক্ষণ। প্রকৃত নেতারা নিজ মতের অনুযায়ী পরিস্থিতি তৈরী করে জনমতকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে। নেতৃত্বের কষ্টিপাথর হল নেতা জনমতের অনুগামী না হয়ে জনমতের নিয়ন্তা হবে। প্রয়োজন হলে জনমতের বিরুদ্ধে যেতেও দ্বিধা না করাই সত্যনিষ্ঠা, এবং যদি এই কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখা হয়, তাহলে ডাঃ মুঞ্জের মত সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি সমগ্র নাগপুরে দ্বিতীয় কাউকে পাওয়া যাবেনা।"

ডাক্তারজী কাশী থেকে ফিরে আসার পর শ্রীমসুরকর মহারাজের সঙ্গে হিন্দু সংগঠনপন্থী সংস্থাগুলির একীকরণের বিষয়ে তাঁর আলোচনা হয়। সেই সময়ে শ্রী মসুরকর মহারাজের

বর্তী বিভাগে প্রবচন চলছিল। মসুরকর মহারাজ হিন্দু সমাজের মধ্যে জাগৃতি তথা শুদ্ধি-সংগঠনের ক্ষেত্রে সেই সময়ে অনেক কাজ করেছিলেন। ডাঃ মুঞ্জে এবং ডাক্তারজী বিকেল চারটের পর মাঝে-মাঝে ঐ প্রবচন শুনতে যেতেন। ডাক্তারজী কর্তৃক প্রস্তাবিত হিন্দুত্ববাদী সংস্থাগুলির একত্রীকরণ সম্বন্ধে মসুরকর মহারাজ নীতিগতভাবে একমত হলেও ঐ সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আলাদা-আলাদা কাজ করাই উপযুক্ত মনে করেছিলেন।

জঙ্গল-সত্যাগ্রহে যাবার আগে ওয়াকার মার্গের দশোত্তর প্রাসাদে সঙ্ঘের কার্যালয় চলে এসেছিল এবং কয়েকজন স্বয়ংসেবকও সেখানে থাকতে আরম্ভ করেছিল। ডাক্তারজীও রাত্রে শয়ন করার জন্য সেখানেই আসতে শুরু করলেন। স্বভাবতঃ রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত সেখানে আগত স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলত। এই বৈঠকগুলি এমনই আনন্দময় হত যে সময় কেমন করে কেটে যেত তার হুঁশই থাকতনা। ডাক্তারজী চাইতেন যে বৈঠকে আরো বেশী স্বয়ংসেবক আসুক। একজন স্বয়ংসেবকের কুকুর পোষার ভারী শখ ছিল। একদিন সে একটা ছোট্ট সুন্দর কুকুরের বাচ্চা কোলে নিয়ে বৈঠকে এসে উপস্থিত হল। কুকুরের বাচ্চা স্বভাবতঃই সকলের খেলা ও আনন্দের বিষয় হয়ে পড়ল। কিন্তু ডাক্তারজী তাকে পরদিন কুকুর সঙ্গে নিয়ে আসতে মানা করে দিলেন। তিনি দেখলেন যে একজন সজ্জন কার্যালয়ের মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র কুকুর তার স্বভাব অনুযায়ী চীৎকার শুরু করে দিল। ডাক্তারজীর পক্ষে ঐ জিনিষ সহ্য করা সম্ভব ছিলনা যে একজন সঙ্ঘকে ভালবেসে এখানে এলে তাঁকে এইভাবে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে। তিনি এই স্বয়ংসেবককে বললেন, "এরকম শখ ভাল নয়। যদি এখানে যাঁরা আসেন তাঁদের দেখে কুকুর চীৎকার করতে থাকে, তাহলে কেউ এখানে আসতে চাইবেনা। সংগঠনের দিক থেকেও এটা মঙ্গলজনক নয়।"

কার্যালয়ের ভবনটি ছিল পুরানো ধরনের, সিঁড়ি ছিল সরু এবং নড়বড়ে। দরজা খুব নিচু থাকায় যে আসত তাকেই মাথা নিচু করে ঢুকতে হত। নম্রতার পাঠ সে সহজেই শিখে নিত। ডাক্তারজী যে সব স্বয়ংসেবক সেখানে আসত তাদের গুণগুলির বিকাশ এবং পারস্পরিক ব্যবহারকে লোকসংগ্রহের অনুকূল করে তোলার জন্য সর্বদা চেষ্টা করতেন। ব্যক্তির স্বভাব-বৈচিত্রই দশজন লোকের সঙ্গে তার একাত্ম হয়ে ওঠার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কোন স্বয়ংসেবকের মধ্যে যদি এমন কোন ত্রুটি থাকে যার ফলে সে অন্যের সঙ্গে মিশতে পারেনা -- সেটাকে তিনি সব থেকে বড় দোষ বলে মনে করতেন। এই ধরণের দোষ দূর করার প্রতি তিনি সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন। কার্যালয়ে শোবার জন্য একজন স্বয়ংসেবক আসত, সে একাকী সেপাই-এর মত সবার থেকে আলাদা থাকত। সবার থেকে আলাদা এক কোণে গিয়ে শুয়ে পড়ত। একদিন ডাক্তারজী তার বিছানার কাছে উল্টো করে একটা হাঁড়ি রেখে দিলেন। যখন সে ঘরে ঢুকল, তখন সকলের সামনে তাকে জিজ্ঞেস করলেন--"সবার থেকে আলাদা এই জিনিষ কোথা থেকে এল?" সকলে হেসে লুটিয়ে পড়ল। সেই স্বয়ংসেবকও তার ভুল বুঝতে পারল।

অকোলা কারাগার থেকে ফিরে আসার পর বিভিন্ন স্থানে শাখাগুলি বিকাশ লাভ করছিল। ডাক্তারজীর দিক থেকে সে ব্যাপারে বিশেষ প্রয়াসও চলছিল। সঙ্ঘের পরিকল্পিত কাজের

মধ্যে ফাঁক না রেখেও ডাক্তারজী সমাজের চতুর্দিকে যে সব অন্যান্য কাজ চলত, সেগুলির দিকেও লক্ষ্য রাখতেন এবং সেই সব স্থান থেকে সঙ্ঘকার্যের জন্য উপযুক্ত ও নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিদের নিয়ে এসে সঙ্ঘের কাজে নিযুক্ত করে নিতেন। ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে তিনি শুদ্ধি সমারোহে নিজে এগিয়ে গিয়ে অংশ গ্রহণ করেন।

বিদর্ভে সঙ্ঘকার্যকে প্রসারিত করার উদ্দেশ্যেই ডাক্তারজী নাগপুরের পরিবর্তে যবতমাল গিয়ে সত্যাগ্রহ করেছিলেন। এই জন্য তিনি কারাগারের মধ্যে বিদর্ভের অনেক ব্যক্তিকে সঙ্ঘের বিচারধারায় দীক্ষিত করে এই অঞ্চলে কাজ আরম্ভ করার বিষয়ে তাঁদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিও পেয়েছিলেন। সঙ্ঘের চিন্তাধারার সঙ্গে-সঙ্গে তাকে ব্যবহারিক রূপ দেবার উদ্দেশ্যে সং-সংস্কার প্রদানকারী কার্যক্রমের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে শাখা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইতিমধ্যে ৮ ও ৯ আগষ্ট অকোলায় হিন্দু মহাসভার অধিবেশনের কথা ঘোষণা করা হয়। এই সুযোগে বিদর্ভের কার্যকর্তারা সেখানে আসবেন। অতএব, এই অধিবেশনে কার্যকর্তাদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য ডাক্তারজী অকোলা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। অকোলাতে তিন-চার বছর আগেই সঙ্ঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ডাক্তারজী স্বয়ং গিয়ে তার ব্যবস্থা করেন এবং তাকে এমন সুন্দর স্বরূপ প্রদান করলেন যাতে শাখা পরিদর্শন করে হিন্দুত্বনিষ্ঠ মানুষদের মধ্যে আপনা থেকেই উৎসাহ তথা কাজের প্রেরণার সৃষ্টি হয়। অধিবেশনের সভাপতি শ্রী বিজয়রাঘবাচার্যের শোভাযাত্রার উপর মসজিদ থেকে ইঁট-পাথর ছোঁড়া হয়, কিন্তু সে সময়ে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা যে ধৈর্যের পরিচয় দেয়, তা সকলের পক্ষে গৌরবের বিষয় ছিল। হিন্দু মাত্রই একথা অনুভব করছিল যে স্বয়ংসেবকেরাই তাদের সম্মান রক্ষা করেছে।

এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের ঘোষ-বাদনরত অবস্থায় এক সজ্জন তাদের ছবি তুলছিলেন। ডাক্তারজীর অভিমত ছিল যে রাষ্ট্রসেবায় রত ব্যক্তির মধ্যে যদি প্রসিদ্ধিলাভের কামনা জেগে ওঠে, তাহলে তার দৃষ্টি সেবা থেকে সরে যায়। সেই কারণে তিনি লক্ষ্য রাখতেন যে সঙ্ঘের কোন কার্যক্রমের আলোকচিত্র যেন তোলা না হয়। ফটো তুলতে উদ্যত সজ্জনকে ডাক্তারজী নম্র-ভাবে ফটো তুলতে বারন করেন। কিন্তু ঐ সজ্জন জেদী প্রকৃতির ছিলেন এবং তিনি ডাক্তারজীর কথা অগ্রাহ্য করেন। তখন ডাক্তারজী নিজের ছাতা খুলে ক্যামেরার সামনে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং স্বয়ংসেবকদের সব পথক চলে যাওয়া পর্যন্ত ঐ ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন। অনুরোধে কাজ না হওয়ায় ডাক্তারজী কৌশলে কাজ হাসিল করলেন। ফটোগ্রাফার সজ্জন হতাশ হয়ে বসে পড়লেন।

অধিবেশনের সময়ে বিদর্ভের জনসাধারণ সঙ্ঘের গঠনমূলক কাজ প্রত্যক্ষ করল। ডাক্তারজীরও অনেক নতুন-নতুন কার্যকর্তার সঙ্গে পরিচয় হল। অধিবেশন শেষ হতেই ডাক্তারজী বর্ধা, যবতমাল, দারহ্বা, উমরখেড, খামগাঁও, অকোট, ওয়াশীম, পুসদ ইত্যাদি স্থানের প্রবাস করে সেই সব স্থানে শাখা আরম্ভ করে দিলেন। ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৩১ এ লিখিত এক পত্রে ডাক্তারজী উক্ত স্থানগুলির প্রতিবেদন নাগপুরে প্রেরণ করে লেখেন — "বড়-বড় উকিল ও ডাক্তাররাও সঙ্ঘে প্রবেশ করেছেন।" এই তথ্যটি লেখার তাঁর তাৎপর্য

ছিল এই যে নাগপুরের কার্যকর্তারা যাতে আরো বেশী কাজের প্রেরণা লাভ করে। সেই পত্রেই তিনি আরো লেখেন — "বিদর্ভের কাজ সরল নয়। পাহাড় ভেঙে সুড়ঙ্গ তৈরী করে তার মধ্যে দিয়ে পথ তৈরী করার মতই কঠিন এই কাজ। কিন্তু এই কাজ পরমেশ্বরীয় এবং তাঁর কৃপাতেই এই কাজে সাফল্য লাভ করা যাচ্ছে। কিন্তু এর ফলে নাগপুর শাখার দায়িত্ব বহুগুণ বর্ধিত হচ্ছে। নাগপুরের ছোট-বড় সব স্বয়ংসেবকদেরই এই দায়িত্ব উপলব্ধি করতে হবে। আমি সম্পূর্ণরূপে আপনাদের ভরসাতেই কাজ করে চলেছি।" ডাক্তারজীর এইরূপ মনোভাবের কারণেই বহু যুবক কাজের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। এই কথাগুলি একটি ষোল বছরের তরুণকে লেখা হয়েছিল। তার মনের উপর এই বাক্যের কী পরিণাম হয়েছিল তা কল্পনা করা যেতে পারে।

এই প্রবাসকালে ২রা সেপ্টেম্বর ওয়াশীমে তিনি শ্রী বজরঙ্গবলী হিন্দু আখড়ায় যান। সেখানকার কাজ দেখার পর তিনি অভিমত লিখে আসেন, তা অত্যন্ত স্মরণীয়। তিনি লেখেন — "যে সঞ্চালক এই আখড়ার পুনরুদ্ধার করে একে আজকের অবস্থায় এনেছেন, তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া আমি নিজের কর্তব্য বলে মনে করি। যে কোন সৎকার্য আরম্ভ করার পর তাকে সহজে নষ্ট হতে না দিয়ে চিরকাল সতত চালিয়ে যাওয়ার সাত্ত্বিক উচ্চাকাঙ্খা প্রত্যেকের নিজ হৃদয়ের মধ্যে রাখা উচিত।"

গণেশোৎসবের সময়ে তাঁর তিন সপ্তাহাধিক কালের ভ্রমণ শেষ করে তিনি বিদর্ভ থেকে নাগপুরে ফিরে এলেন এবং বিজয়া দশমী পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। এই বছর বিজয়া দশমী উৎসবে তাঁর ভাষণে ডাক্তারজী হিন্দু জনতার সম্মুখে সঙ্ঘ হিন্দু রাষ্ট্রের পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে কতটা পথ অতিক্রম করতে পেরেছে, সে বিষয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ইংরাজদের শাসনকালে সরকারী সেনা ও পুলিশদের বাদ দিলে কোথাও স্বতন্ত্ররূপে এত তরুণদের অনুশাসনবদ্ধ এবং একই গণবেশে জনসাধারণ দেখেনি। সঙ্ঘের এই স্বয়ংসেবকদের দেখে অনেকের মনে কৌতুহলের সৃষ্টি হল। কয়েকজন এসে ডাক্তারজীকে একথাও বললেন, "ডাক্তারজী এখন তো আপনার প্রচণ্ড সংগঠন তৈরী হয়ে গেছে, এবার কিছু করে দেখান।" এই ধরণের বক্তব্যের পিছনে জনসাধারণের প্রত্যাশা নিহিত ছিল। কিন্তু ডাক্তারজীর সম্মুখে বিরাট হিন্দুরাষ্ট্রের ব্যাপক চিত্র ছিল। সেই দিক থেকে তখনকার কাজ তো সমুদ্রে এক বিন্দু জলের মতই ছিল। যে সমস্ত মানুষ নিজ গৃহ বা নগরের পরিধির বাইরে কিছুই দেখতে সক্ষম ছিলনা, তাদের চোখে নিঃসন্দেহে এটা খুব বড় সংগঠন ছিল। কিন্তু তাদেরও সঠিক দৃষ্টি প্রদান করা আবশ্যক ছিল। অতএব ডাক্তারজী তাঁর ভাষণে বলেন, "আজ সঙ্ঘের ষাট শাখা হয়ে গেছে। কিন্তু এটুকু কাজ খুবই কম। এ তো সিন্ধুতে বিন্দুর সমান।" তাঁর মনশ্চক্ষুর সম্মুখে হিন্দুরাষ্ট্রের অতল মহাসাগরের ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। যতক্ষণ না সঙ্ঘের বিস্তার ততখানি ব্যাপক হচ্ছে, ততক্ষণ তার শক্তির যতই বৃদ্ধি হোক না কেন, তা অসম্পূর্ণই থাকবে।

বিদর্ভের পরে ডাক্তারজী ছত্তিশগড় এবং মধ্যপ্রান্তের অন্য হিন্দী ভাষা-ভাষী ক্ষেত্রে সঙ্ঘের বিস্তারের জন্য প্রবাস শুরু করলেন। ৯ই ডিসেম্বরের 'মহারাষ্ট্র' সংবাদপত্রে

নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয় ঃ "রাঃ স্বঃ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হেডগেওয়ার সঙ্ঘকার্যের বিস্তারের জন্য ছত্তিসগড় বিভাগে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে তিন সপ্তাহ পরিভ্রমণ করেন। এখন সেখানে সমস্ত জেলা-কেন্দ্রগুলিতে শাখা শুরু হয়ে গেছে। এই বিভাগের কাজ সম্পূর্ণ করে তিনি বিদর্ভ গেছেন।"

বিদর্ভে ইতিমধ্যেই সঙ্ঘের প্রবেশ ঘটেছিল। কিন্তু সেখানকার অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির দরুন ঐ কাজ মাঝে-মাঝে দোদুল্যমান হয়ে পড়ত। তখন পর্যন্ত স্থিরতা আসেনি। ডাক্তারজী তাঁর প্রথম প্রবাসকালেই কাজের এই অসুবিধাজনক অবস্থা লক্ষ্য করেছিলেন। অতএব, সেখানকার কার্যকর্তাদের হতাশায় পূর্ণ পত্র তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত ছিলনা। ১৯৩২-এর গোড়ার দিকেই জনৈক কার্যকর্তা লিখেছিলেন, "বর্তমান আন্দোলনের প্রভাব সঙ্ঘকার্যের উপরেও পড়েছে, সেই কারণে সঙ্ঘের সদস্যরা প্রতি দিন সঙ্ঘস্থানে উপস্থিত থাকার কথা চিন্তা করেনা।" যবতমালের ডাঃ টেম্ভে লিখেছিলেন, "আমার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তিনবার ফিরে গেছে। কেন? তা জানিনা। এখন একটুও মুখ খুললে দ্বিতীয় দিনেই কৃষ্ণ মন্দিরে যেতে হবে। আপাততঃ রাঃ স্বঃ সঙ্ঘের কাজ অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। এ বিষয় দুঃখ হয়।" এই পরিস্থিতিতে ডাক্তারজী নবাগত স্বয়ংসেবকদের নিকট পত্র-ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাশ না হয়ে পরিস্থিতির মধ্য থেকে পথ খুঁজে বার করার জন্য উৎসাহিত করতেন। এরই পরিণামে বিদর্ভে পুনরায় উৎসাহের সঞ্চার হল এবং আন্দোলনের কারণে পরিস্থিতি অস্থির থাকা সত্ত্বেও সঙ্ঘের কাজে স্থিরতা প্রতিষ্ঠিত হল।

ডাক্তারজীর অখণ্ড পরিশ্রম, কাজ সম্পর্কে মানসিক চিন্তা, অর্থের চিরন্তন টানাটানি এবং নতুন-নতুন বিপত্তির পরিণাম তাঁর স্বাস্থ্যের উপরেও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। কিন্তু তিনি নিজের শরীরকে তাঁর ধ্যেয়নিষ্ঠ তথা বজ্র-কঠোর মনের দাস করে রেখেছিলেন। সেই কারণে, তাঁর স্বাস্থ্যের বিষয়ে কেউ প্রশ্ন করলেই তিনি হেসে উত্তর দিতেন, "আমার আবার কী হবে? আমার স্বাস্থ্য ঠিক আছে।" আসলে অকোলার কারাগারেই তাঁর শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বাইরে আসার পর নিজ অনুপস্থিতির অভাব পূরণ করার জন্য তিনি যে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেন, তাতে তাঁর সঙ্গে কার্যরত বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট তরুণদেরও দম ফুরিয়ে যেত।

প্রাতঃকাল থেকে রাত্রি প্রায় একটা পর্যন্ত তিনি কাজে ব্যস্ত থাকতেন। রাত্রে যদিও তিনি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তেন, কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তার প্রবাহের ফলে ভাল করে ঘুমোতে পারতেন না। পকেটে পয়সা না থাকার দরুন, সকালে সেই যে মহাল (নাগপুরের একটি পাড়া) থেকে বেরিয়ে পড়তেন, তারপর বেলা একটা পর্যন্ত অনেকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার পর ধন্তোলি পর্যন্ত হেঁটেই যেতেন এবং ভর-দুপুরে ঘর্মাক্ত দেহ নিয়ে বাড়ী ফিরতেন। স্নানাহার সেরেই আবার বৈঠক, পত্র-ব্যবহার, শাখা ইত্যাদির যে অবিরাম পরিশ্রম চলত, তাতে রাত বারোটা-একটা বেজে যেত। নাগপুরের তাপমাত্রার তুলনা গনগনে জ্বলন্ত উনুনের সঙ্গেই করা চলে। কিন্তু ডাক্তারজীর তপস্যার দহনের সম্মুখে সেই তাপই জল হয়ে সর্বদাই স্বেদবিন্দু রূপে দেখা দিত। মানুষের সঙ্গে ডাক্তারজীর সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ ছিল এবং তাঁর স্বভাব এত মধুর ছিল যে সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেখানেই যেতেন, সেখানেই চা

উপস্থিত। নিজের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা না করে তিনি সেই চা গ্রহণ করতেন। না জানি সারা দিনে কত কাপ চা তাঁকে পান করতে হত। চা তাঁর ভাল লাগত, তা নয়, কিন্তু চায়ের পিছনে আত্মীয়তার মনোভাবকে তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না। এই আত্মীয়তাকে আত্মস্থ করেই তিনি অনেক মানুষকে সঙ্ঘের সঙ্গে একাত্ম করে তুলেছিলেন। ডাক্তারজীর জীবনে এত বেশী অনাড়ম্বর আকর্ষণ-শক্তি ছিল যে মানুষদের অজ্ঞাতসারেই তাদের কোন কষ্টের অনুভব হতে না দিয়েই, তাদের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ থেকে বাইরে বের করে বিশাল সমাজের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে বিচরণ করতে শিখিয়ে দিতেন। যে তাঁর সঙ্গে আসত, তার কর্তৃত্বশক্তি অনায়াসেই বিকশিত হয়ে যেত।

২০. উৎকণ্ঠা

কাশীতে ১৯৩১ সালে পরমপূজনীয় ডাক্তারজী সঙ্ঘকার্যে সুন্দর গতি সঞ্চার করেছিলেন। তিনি প্রায় এক মাস সেখানে ছিলেন, সেই কারণে কাজের সূচনা থেকেই সঙ্ঘকার্য উত্তম গতি ও উপযুক্ত দিশা লাভ করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখায় স্বয়ংসেবকেরা ছাত্রদের অতিরিক্ত কয়েকজন তরুণ অধ্যাপককেও সঙ্ঘে আকৃষ্ট করতে শুরু করেছিল। এই অধ্যাপকদের মধ্যে শ্রী মাধবরাও গোলওয়ালকর তথা 'গুরুজী'ও ছিলেন অন্যতম। তিনি সঙ্ঘের কাছে এসে কাজে রুচি নিতে শুরু করেন। ডাক্তারজী এই সংবাদ স্বয়ংসেবকদের পত্রের মাধ্যমে পেয়েছিলেন। এই ধরণের বুদ্ধিমান কার্যকর্তা সেখানকার শাখা লাভ করছে জেনে তিনি আনন্দিত হলেন। তিনি নাগপুরে শ্রীমাধবরাও-এর সঙ্গে পরিচিত স্বয়ংসেবকদের নিকট তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির সময়ে যখন গুরুজী নাগপুরে এলেন, তখন একদিন রাস্তায় যেতে যেতে ডাক্তারজী গুরুজীকে দেখলেন। তিনি গুরুজীকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার নাম মাধবরাও গোলওয়ালকর না?" ডাক্তারজী মাধবরাও সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে যা জেনেছিলেন, তারই ভিত্তিতে অনুমানে তিনি তাঁকে চিনে নিয়েছিলেন। গুরুজী "হ্যাঁ" বলার পর ডাক্তারজী তাঁকে বললেন, "আপনার সুবিধামত একদিন আমার বাড়ীতে আসবেন। তদনুসারে গুরুজী ডাক্তারজীর বাড়ীতে গেলেন। এটাই ছিল পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর সঙ্গে আজকের সরসঙ্ঘচালক পরমপূজনীয় শ্রীগুরুজীর প্রথম সাক্ষাৎকার।

নাগপুরের গ্রীষ্ম শুরু হয়ে গিয়েছিল। মে মাসের শিক্ষণবর্গের প্রস্তুতি নিয়ে ডাক্তারজী ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময়ে বাবারাও সাভারকরের পত্র এল, "মে মাসের গোড়ার দিকে করাচীতে 'অখিল ভারতীয় তরুণ হিন্দু পরিষদ'-এর অধিবেশনে আপনি অবশ্যই আসবেন।" বিভিন্ন স্থান থেকে সমাগত শত-শত তরুণদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ ডাক্তারজী হাতছাড়া করতে চাইছিলেন না। কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে নাগপুরে সঙ্ঘের শিক্ষা বর্গ হবে। তাকে সফল করার জন্য ডাক্তারজীর নাগপুরে থাকা আবশ্যক ছিল। সেই সঙ্গে করাচী যাওয়া-আসার খরচেরও প্রশ্ন ছিল। সেটা কোথা থেকে আসবে? অতএব ডাক্তারজী তাঁর সমস্যার কথা বাবারাওকে পরিষ্কার লিখে জানালেন। এই বিষয়ে দুজনের মধ্যে যে পত্রালাপ হয়, তা দুই দেশভক্তের পারস্পরিক হৃদ্যতা এবং কর্তব্য-কঠোর জীবনের উপর উত্তম আলোকপাত করে। ডাক্তারজীর মতই বাবারাও সাভারকরের কাছেও করাচী যাওয়ার মত পয়সা ছিলনা। কিন্তু তাঁর অসুবিধা উপলব্ধি করে ভাই পরমানন্দজী তাঁর আসা-যাওয়ার ব্যয়ভার বহন করার প্রতিশ্রুতি তাঁকে দিলেন। এর ভিত্তিতে বাবারাও ডাক্তারজীকে লিখলেন, ".....ঐ অর্থ থেকে আমরা দুজনে অর্ধেক ভাগ করে নিয়ে নিজেদের ভার কিছুটা

হাল্কা করে নিতে পারব।" এমনই ছিল দুজনের মধ্যে স্নেহ-সম্পর্ক।

ডাক্তারজী তাঁকে পরামর্শ দেন যে আপনিই ঐ পরিষদে যে তরুণরা আসবে তাদের সঙ্গে সঙ্ঘ সম্বন্ধে কথা বলে নেবেন। এর উত্তরে বাবারাও লিখলেন, ".....আমি যদিও সঙ্ঘের কাজ স্বীকার করে নিয়েছি, তথাপি আমার মন বলছে আমি পুরোপুরি প্রচারে সক্ষম হয়ে উঠিনি। সম্ভবতঃ আমি আচারের কাঁচা আমের টুকরো অবশ্য হয়েছি, কিন্তু এখনও ভাল মজিনি। আপনি সিদ্ধ হয়েছেন। আপনিই এ সময়ে আসুন। তাঁরও (ভাইজীর) আপনার সম্বন্ধে পত্র এসেছে, জিজ্ঞেস করেছেন — "তিনি (ডাক্তার হেডগেওয়ার) আসছেন কি না? তিনি লিখেছেন যে আপনাকে যেন অবশ্যই নিয়ে আসি।" ২০ শে এপ্রিলের পত্রেও তিনি একই ভাবে লিখেছিলেন যে "আমি সঙ্ঘের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে গিয়েছি ঠিকই, কিন্তু তার উদ্দেশ্য উপস্থাপনার পদ্ধতি, বিভিন্ন প্রশ্নের যথাযথ উত্তর, কার্য-পদ্ধতির পূর্ণ জ্ঞাতব্য তথ্য ইত্যাদির স্পষ্ট চিত্র এখনও আমার মানস-পটে অংকিত হয়নি। অতএব এই পরিষদে আপনিই আসুন, যাতে নানা শংকা-প্রতিশংকার উত্তর, বিষয়ের প্রতিপাদন, পদ্ধতির বর্ণনা, কার্যাক্রম ইত্যাদির আমূল বিচার-বিশ্লেষণ আপনি করলে তার থেকে আমি পুরোপুরি জ্ঞানলাভ করতে পারব।"

অবশেষে করাচী যাওয়ার কথা পাকা হল। ২রা মে ডাক্তারজী নাগপুর থেকে বোম্বাই এবং সেখান থেকে বাবারাও-এর সঙ্গে ৩রা মে রাত্রে করাচী যাত্রা করলেন। করাচী থেকে ৬ই মে তাঁর কাকা শ্রী আবাজী হেডগেওয়ারকে লেখা পত্রে ডাক্তারজী তাঁদের যাত্রার কিছু বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা জানান। সেগুলি তাঁর সূক্ষ্ম নিরীক্ষণের পরিচায়ক। সেগুলি এখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় হবে। রাত্রে ট্রেনে স্থান পাবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করার সময়ে যে অভিজ্ঞতা হয়, সে বিষয়ে তিনি লেখেন, 'মুসলমানদের গুণ্ডামি, সুযোগ পেলে প্রথমে হুমকি, তারপর চীৎকার-চেঁচামেচি, অতঃপর অনুনয়-বিনয় এবং সবশেষে শরণাগতি — এই সব ঢংই দেখতে পাওয়া গেল।" তাঁর এই পর্যবেক্ষণ কত সূক্ষ্ম ছিল, তার অভিজ্ঞতা একজন মুসলমানের ব্যক্তিগত আচরণ থেকে নিয়ে সামূহিক ব্যবহার পর্যন্ত চারিদিকেই দেখা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে যুগে মুসলমানদের হুমকি ও গলাবাজিতেই বিচলিত হয়ে আত্মবিশ্বাসহীনতার দ্বারা গলিতগাত্র হিন্দু সমাজের অহিংসার উদাত্ত তত্ত্বজ্ঞানের পর্দার পিছনে স্বয়ং শরণ গ্রহণ করার লজ্জাজনক উদাহরণ দেখা যায়, সেখানে ডাক্তারজী দ্বারা অনুভূত মুসলমানদের 'অনুনয়-বিনয়' তথা 'শরণাগতি'র আশা ছাড়া আর কী করা যেতে পারে? তাদের হুমকি ও গলাবাজিকে উপেক্ষা করে যদি তাদের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো যায়, তবেই তাদের আচরণে ডাক্তারজীর কথানুসারে নিশ্চিত পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা যাবে।

কর্ণাবতী স্টেশনেরও একটি অভিজ্ঞতার কথা তিনি তাঁর পত্রে লিখেছিলেন, "এই স্থানেও মুসলমানদের জোর-জুলুম এবং হিন্দুদের ঢিলে-ঢালা মনোবৃত্তির ভালো অভিজ্ঞতা হল। ব্যতিক্রম-স্বরূপ জনৈক গুজরাতি মহিলার নির্ভীকতা ও তেজস্বী মানসিকতার পরিচয় পেয়ে আনন্দ হল। কিন্তু তাঁর স্বামীর মধ্যে সেই গুণ একেবারেই দেখা গেলনা।" এই সব দেখার পর তাঁর সামনে গুজরাত, মহারাষ্ট্র অথবা সিন্ধু সম্বন্ধে ভিন্ন-ভিন্ন মত ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজকে একাত্মভাবে দেখতেন এবং এই বিশাল হৃদয় ও মমত্বের কারণেই বিভিন্ন দৃশ্য

দেখে তাঁর বেদনা অথবা আনন্দের অনুভূতি হত। হায়দরাবাদ (সিন্ধ) স্টেশনের যাত্রার বর্ণনায় তিনি লেখেন, "হায়দরাবাদ স্টেশনে ট্রেনে উঠেই মনে হল আমরা যেন কোন মুসলমান দেশে এসে পড়েছি। হায়দরাবাদ থেকে করাচী পৌঁছনো পর্যন্ত আমাদের কামরায় একজন হিন্দুকেও দেখতে পেলাম না। কামরায় সকলেই ছিল মুসলমান। ভিতরে তাদের খানা-পিনার নোংরামি আর বাইরে বালিয়াড়ি, এই দৃশ্য দেখতে-দেখতে আমরা করাচি পৌঁছলাম।"

করাচিতে ডাক্তারজী ছয় দিন ছিলেন। সেখানে পাঞ্জাব ও সিন্ধ থেকে আগত অনেক তরুণ কার্যকর্তাদের সঙ্গে পরিচয় করে তাঁদের সম্মুখে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উদয়োন্মুখ সংগঠনের চিত্র তুলে ধরেন। এই প্রান্তগুলির কার্যকর্তারা মুসলমানদের অবিরাম আঘাতে পীড়িত হওয়ায় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বরাবর অনুভব করতেন। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না যে সংগঠন করবেন কী ভাবে। প্রস্তাব, ভাষণ, সম্মেলন ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতির বোধ তাঁদের ছিলনা। ডাক্তারজী অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে তাঁদেরও সংগঠন-তন্ত্র বোঝালেন। ডাক্তারজীর বক্তব্য বুঝে নেবার পর পরিষদ এই সদিচ্ছা ব্যক্ত করে যে সঙ্ঘ-কার্যের বিস্তার সম্পূর্ণ দেশে করা আবশ্যক। কিন্তু শুধু এরূপ সদিচ্ছামূলক প্রস্তাবে ডাক্তারজীর পক্ষে সন্তোষ লাভ করা সম্ভব ছিলনা। তিনি করাচির কয়েকজন কার্যকর্তাকে নিয়ে প্রত্যক্ষ শাখা শুরু করে দিলেন। শ্রী ডিঃ ডিঃ চৌধরীকে সঙ্ঘচালক নিযুক্ত করারও উল্লেখ পাওয়া যায়। আবাজীকে লেখা পত্রে ডাক্তারজী এ কথাও উল্লেখ করেছিলেন যে "আচার্য রামসহায়ের মত ব্যক্তিও সঙ্ঘে প্রবেশ করেছেন।"

ডাক্তারজীর করাচি নগর বেশ ভাল লাগল। এ বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন, "....যাঁরা বোম্বাই ও কলকাতা শহর দেখেছেন, করাচি দেখে তাঁদের আশ্চর্য লাগবেনা ঠিকই, কিন্তু এ কথা বলতেই হবে যে এই নগর উক্ত দুই শহরের থেকে ভাল। এখানকার সৌন্দর্য, সুব্যবস্থা, স্বচ্ছতা, পাকা ও পরিষ্কার প্রশস্ত রাজপথ, বিদ্যুতের আলোকের বিশেষ ব্যবস্থা, স্থানে-স্থানে বিদ্যমান বাগান ও পার্কগুলির কারণে নগরের উন্মুক্ত ভাব — এই সবের দরুন করাচি অন্য শহরগুলি থেকে শ্রেষ্ঠতর। ...আমার মনে হয়, আজ পর্যন্ত যত শহর দেখেছি, সেগুলির মধ্যে করাচিকে প্রথম স্থান দেওয়া উচিত।" কিন্তু আজ ঐ সর্বোৎকৃষ্ট নগরের কী দুর্দশা হয়েছে, তা দেখে যে কোন স্বাভিমানী তথা সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ হবে।

করাচি থেকে ফিরেই ডাক্তারজী সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে পড়লেন। বর্গের সমাপ্তির পরের একটি ঘটনার উল্লেখ বাঞ্ছনীয় হবে। ডাক্তারজী বলতেন যে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক যেখানেই যাক, সঙ্ঘের বাতাবরণ তার সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। সে যেখানে গেছে সেখানে যদি সঙ্ঘের শাখা থাকে তাহলে সেই স্বয়ংসেবকের নিয়মিত শাখায় যাওয়া উচিত। যদি সেখানে শাখা না থাকে, তাহলে শাখা খোলার চেষ্টা করা উচিত। ডাক্তারজীর এই প্রেরণার কারণেই স্কুলে পাঠরত ছোট-ছোট স্বয়ংসেবকদের দ্বারা সঙ্ঘের অনেক বিস্তার ঘটেছে। নাগপুরের স্বয়ংসেবক মাধব মুলের এই বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে কোঙ্কণের চিপলুণ অঞ্চলে গিয়ে বসবাস করার কথা ছিল। ডাক্তারজী তাকে ডাকলেন এবং কোঙ্কণে কাজ শুরু

করার ব্যাপারে তার সঙ্গে আলোচনা করেন। শুধু তাই নয়, নাগপুরের ঘোষ শাখার পক্ষ থেকে যখন শ্রী মাধবরাও মুলেকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হল, সেই কার্যক্রমে তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। স্টেশনেও তিনি তাঁকে পৌঁছে দিতে এলেন। তাঁর এই ব্যবহার নিশ্চিত করে দিল যে শুধু একজন স্বয়ংসেবক নাগপুর থেকে নিজের বাড়ীতে থাকার জন্য চলে যাচ্ছেনা, বরং সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে কোঙ্কণ অঞ্চলে সংগঠন-মন্ত্রের দীক্ষা দিতে চলেছে। কিছু দিনের মধ্যেই উক্ত অঞ্চলের সর্বত্র সঙ্ঘের জাল বিস্তৃত হল।

একই সময়ে শ্রী কৃষ্ণরাও লাম্বে ডাক্তারজীর যোজনা অনুসারে দিল্লী গেলেন। আপাতদৃষ্টিতে সেখানে একটি 'মারাঠা হাই স্কুল' প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এর মূলে ছিল কার্য-বিস্তারের যোজনা। কিন্তু শ্রী লাম্বে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না এবং বিরস-বদনে নাগপুরে ফিরে এলেন। ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা না করেই তাঁর বাড়ী উমরেড চলে গেলেন। যখন তাঁর সঙ্গে ডাক্তারজীর দেখা হল, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন- - "তুমি দিল্লী থেকে ফিরে এলে কেন? পয়সা ছিল না তো আমি দিতাম। আমি দিল্লীতে শাখা খোলার জন্য ভাই পরমানন্দজী প্রভৃতির সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে এ বিষয়ে আলোচনাও শুরু করেছিলাম। তুমি ফিরে আসায় সব বেকার হয়ে গেল।" না বলে ফিরে আসা ডাক্তারজীর মতে উপযুক্ত ছিলনা। এই মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য, কথিত আছে, শ্রী লাম্বের উপর পাঁচ টাকা জরিমানা ধার্য হয়েছিল!

ডাক্তারজীকে এখন প্রবাসের জন্য দীর্ঘ সময় যাবৎ বাড়ীর বাইরে থাকতে হত। তাঁর অনুপস্থিতি কালে আবার আশে-পাশের অহিন্দুরা তাঁর বাড়ীতে মাঝে-মাঝে ইঁট-পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। ডাক্তারজী জানতেন কারা ইষ্টক-বর্ষণ করে, কিন্তু তাঁদের ক্ষমতার কথাও তিনি জানতেন। তিনি জানতেন কয়েক দিনের মধ্যেই এই নষ্টামি নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এই সংবাদ নাগপুর এবং প্রান্তের মধ্যেও ছড়িয়ে পরে। স্বভাবতঃই অনেক মানুষ কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁরা ডাক্তারজীর নিকট সঠিক সংবাদ জানার জন্য পত্র লেখেন। তার উত্তরে ডাক্তারজী লেখেন, "......বাড়ীতে ইঁট পাথর পড়ছিল, যে সমাজের পক্ষ থেকে সেটা সম্ভব, সেখান থেকেই আসছিল। তাতে হিন্দু সমাজের কোন ব্যক্তি বা জাতির হাত নেই। যখন বর্ষার জোর বাড়ে তখন পাথর পড়া বন্ধ হয়ে যায়। বর্ষা বন্ধ হতেই বেশী করে পাথর পড়ে। পাথর পড়া থেকে একথা পরিষ্কার যে যাঁরা পাথর ছোঁড়ে তাদের সামনে আসার পুরুষত্ব অবশিষ্ট নেই। এ বিষয়ে আপনারা একটুও চিন্তা করবেন না।" ডাক্তারজীর অনেক আত্মীয়বন্ধু তাঁর মানা করা সত্ত্বেও তাঁর বাড়ীতে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে প্রস্তর নিক্ষেপকারীদের মুখ লুকোতে হয়। ১৯৩২-এর জুন মাসে এই পাথর ছোঁড়া সাত-আট দিন পর বন্ধ হয়ে গেল।

এই সময় ডাক্তারজী তথা রাঃ স্বঃ সঙ্ঘের উপরে এক বজ্রাঘাত হল। রাজা লক্ষ্মণ রাও ভোঁসলের পুনাতে আকস্মিক লোকান্তর ঘটল। সঙ্ঘের এক আধার স্তম্ভ, হিন্দুত্বের গোঁড়া অভিমানী এবং ডাক্তারজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু চলে গেলেন। ৯ই জুন যখন এই দুঃখজনক বার্তা পৌঁছল, তখন সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমারোপের কার্যক্রমের জন্য স্বয়ংসেবকগণ ও শত-শত

নাগরিক সমবেত হয়েছিলেন। ডাক্তারজী তৎক্ষণাৎ কার্যক্রম স্থগিত করে সেখানে শোক-প্রস্তাব গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। এই প্রস্তাবে ডাক্তারজীর ভাবনা প্রতিবিম্বিত হয়। প্রস্তাবে লেখা হয়েছিল — "শ্রীমন্ত রাজা লক্ষ্মণ রাও ভোঁসলের মৃত্যুর হৃদয়-বিদারক সংবাদ শুনে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের বজ্রাঘাতের দুঃখ অনুভূত হচ্ছে। রাঃ স্বঃ সঙ্ঘ রাজাসাহেবের ছত্রছায়াতেই জন্মলাভ করে ও বিকশিত হয়। আজকে তার যে স্বরূপ, তাঁরই প্রেমপূর্ণ প্রোৎসাহনের পরিণাম। হিন্দু ধর্ম তথা হিন্দু সংস্কৃতির উপর তাঁর হার্দিক তথা অসীম প্রেমের কারণে তিনি সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজের গৌরব ছিলেন।" ডাক্তারজী সেই সময়কার পত্রাবলীতে রাজা লক্ষ্মণ রাও ভোঁসলের মৃত্যুর বিষয়ে লেখেন, "তাঁর মৃত্যুর ফলে আমাদের যে ভীষণ ক্ষতি হল, তার বর্ণনা করা সম্ভব নয়।"

আঘাতগুলিকে ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে অবিচল ধ্যেয়নিষ্ঠা সহকারে ডাক্তারজী দৃঢ় পদক্ষেপে সঙ্ঘের পথে এগিয়ে চললেন। মধ্যপ্রদেশের অনেক স্থানে শাখা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এবার ডাক্তারজী মহারাষ্ট্রের দিকে দৃষ্টি দিলেন। ১৯৩২ সালে বাবারাও সাভারকরের সঙ্গে তিনি বোম্বাই, পুনা, সাতারা, সাংলী, কোল্হাপুর, জমখিণ্ডী এবং কহ্লাডের পরিভ্রমণ করলেন। এই সফরে বাবারাও-এর ব্যাপক পরিচিতির জন্য খুবই সুফল লাভ করা গেল। ডাক্তারজীর অভিজ্ঞতা প্রসূত প্রভাবী বাণী এবং বাবারাও-এর বৈঠকসমূহে সরলভাবে সঙ্ঘের চিন্তাধারা বুঝিয়ে দেবার দক্ষতা, উভয়ের মণিকাঞ্চন সংযোগে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে মহারাষ্ট্রে কাজের সূচনা হল। ১৯৩২-এর ৬ই আগষ্ট ডাক্তারজী সঙ্ঘের সরসেনাপতি মার্তণ্ডরাও জোগকে সঙ্গে নিয়ে পরিভ্রমণে বেরুলেন। নাগপুর থেকে খামগাঁও পর্যন্ত প্রত্যেক স্টেশনে কার্যকর্তারা ডাক্তারজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ধামনগাঁও ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে স্বয়ংসেবকেরা গণবেশে এসে সামরিক পদ্ধতিতে তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়।

অকোলায় সেখানকার কার্যকর্তারা এক অনাথা মহিলাকে বোম্বাই-এর 'শ্রদ্ধানন্দ অনাথ মহিলাশ্রম'-এ পৌঁছে দেবার জন্য ট্রেনে বসিয়ে দিয়েছিলেন। বোম্বাই পৌঁছবার পর ডাক্তারজী তাকে আশ্রমে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন। এই ধরণের নানা কাজ তিনি সর্বদাই সহজভাবে করতেন। শুধু তাই নয়, তিনি সফরে বেরুলে অনেক বন্ধু তাঁকে নানা রকম কাজের ফরমাস করতেন। সেগুলি করে দিতে তিনি কখনো দ্বিধা করতেন না। এই সফরের সময়ই তিনি জনৈক স্বয়ংসেবকের ঘি-এর বয়ামও বোম্বাই পৌঁছে দিয়েছিলেন। একথার উল্লেখ তাঁর চিঠিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ লোক-সংগ্রহ একটি কঠোর তপস্যা। চব্বিশ ঘন্টা নিরলস, নিরপেক্ষ ও সহজ সেবাভাবই লোকসংগ্রহ রূপে প্রতিফলিত হয়।

পুনা, সাতারা, সাংলী ইত্যাদি স্থানে তরুণদের বৈঠক, প্রৌঢ়দের সভা, প্রতিজ্ঞা-বিধি, শাখা প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রমের মাধ্যমে শত-শত মানুষের নিকট রাঃ স্বঃ সঙ্ঘের চিন্তাধারা পৌঁছে গেল। পুনাতে সাহিত্য সম্রাট শ্রীতাত্যা সাহেব কেলকরের গৃহে প্রৌঢ় সজ্জনদের বৈঠক হল। ঐ বৈঠক সম্বন্ধে ডাক্তারজী লিখেছেন, "চুলচেরা বিচারের জন্য বিখ্যাত পুনা নগরের বিদ্বানদেরও প্রশ্নোত্তরের শেষে সঙ্ঘের কল্পনা মনঃপুত হল।" এই ঝটিকা সফরে মহারাষ্ট্রের প্রধান-প্রধান স্থানে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠিত স্বয়ংসেবক

অনেকে হলেন, কিন্তু দৈনন্দিন শাখার কার্যক্রম শুরু করা যায়নি। পরে দু-এক বছর বাদে মধ্যপ্রদেশ থেকে যোজনাপূর্বক প্রেরিত বিদ্যার্থী ও প্রচারকদের মাধ্যমে ঐ কাজ শুরু হয়।

এই প্রবাসের সময়ে যে সজ্জনদের সঙ্গে সম্পর্ক হল, তাঁদের ডাক্তারজী নাগপুরে বিজয়া দশমী উৎসব দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলেন। এই ধরনের আমন্ত্রণের পিছনে তাঁর দ্বিবিধ উদ্দেশ্য থাকত। নাগপুরের দৃশ্যে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সঙ্ঘের কল্পনার সাকার রূপ দেখার সুযোগ হত। সেই সঙ্গে বহিরাগত ব্যক্তিদের আসার ফলে নাগপুরের স্বয়ংসেবকদের মনেও উৎসবকে যথাসম্ভব দর্শনীয় করার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠত। কার্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রেরও অধিক শক্তিশালী হওয়া উচিত, এ বিষয়ে ডাক্তারজীর সর্বদাই লক্ষ্য থাকত। ১লা সেপ্টেম্বর নাগপুরের সকল স্বয়ংসেবকের নিকট প্রেরিত পত্রে তিনি লিখেছিলেন, "আমাদের নাগপুরের বিজয়া দশমী উৎসব রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জীবনীশক্তির মাপদণ্ড। এই থেকেই জনসাধারণ আমাদের শক্তির অনুমান করে থাকে। উৎসবের দৃশ্য দেখে আমাদের কাজকে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁদের মন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠবে। জনসাধারণের এই আনন্দপূর্ণ অন্তঃকরণ সঙ্ঘের দৃঢ় স্তম্ভ। আমাদের সর্বদা একথা স্মরণ রাখতে হবে। এই উৎসব দেখার জন্য এ বছর শুধু আমাদের প্রান্ত থেকেই নয়, অন্যান্য প্রান্ত থেকেও বিশিষ্ট মহানুভব সজ্জনরা নাগপুরে আসছেন। আমাদের ধ্যেয় অনুসারে যদি আমরা চাই যে হিন্দুস্থানের অন্যান্য প্রান্তেও সঙ্ঘ-শাখা সমূহের বিস্তার হোক, তাহলে এই অতিথিদের মনে উৎসব দেখে কাজের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক।"

প্রবাস থেকে ফেরার পথে তিনি আট দিন বোম্বাই-এ অবস্থান করেন। এবং সেখানে সঙ্ঘকার্যের সূচনা করে ১৪ই সেপ্টেম্বর নাগপুরে পৌঁছলেন। পথে তিনি অকোলা, ওয়ার্ধাতেও যাত্রাবিরতি করেন। এই পাঁচ সপ্তাহব্যাপী প্রবাসকালেই ডাক্তারজী পুনাতে শ্রী ভাউরাও দেশমুখকে এবং সাংলীতে শ্রী কাঃ ভাঃ লিময়েকে সঙ্ঘচালক রূপে নিযুক্ত করেন।

গান্ধী-ইরউইন চুক্তির পরে যদিও এক বছর অতিবাহিত হয়েছিল, তথাপি দেশের রাজনৈতিক বাতাবরণের মধ্যে অস্থিরতা ও উত্তেজনা বজায় ছিল। এই কারণে, যদি কোথাও কিছু তরুণ একত্রিত হত, সেখানে তাদের উপর সরকারের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি পড়ত। গমের সঙ্গে যেমন ঘুণও পিষে যায়, সেইরূপ যাদের প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে কোন সংস্রব নেই, এরকম সংস্থার পিছনেও সরকারের কুটিল নজর থাকত। তাছাড়া, সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ও শত-শত কার্যকর্তা তো আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেই ছিলেন, এবং সমগ্র প্রদেশে যোজনাপূর্বক সঙ্ঘের কাজ বিস্তার লাভ করে চলেছিল। সুতরাং তার দিকে সরকারের বক্র দৃষ্টি না থাকলেই আশ্চর্য হত। ডাক্তারজীর মহারাষ্ট্র সফর শেষ হবার পর বোম্বাই-এর সরকার মধ্যপ্রান্ত সরকারকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "এ কোন ঝামেলা আপনাদের প্রান্ত থেকে আমাদের প্রান্তে আসছে?" মধ্যপ্রান্ত ও বোম্বাই-এর গোয়েন্দাদের সঙ্ঘকার্যের উপর বিশেষ নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া স্বাভাবিকই ছিল। সরকারের এই নীতির কথা বিবেচনা করে ডাক্তারজী নাগপুরের মোহিতে বাড়া, বর্ডী, ধরমপেঠ এবং কেন্দ্রের শাখাগুলিকে বর্ধিত করে এমন অনেক কার্যকর্তা তৈরী করলেন যারা বিভিন্ন স্থানে শাখা চালাতে পারে।

সঙ্ঘের উপর সরকারের দিক থেকে বিপত্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধির সাথে-সাথে স্বয়ংসেবকেরা বিচলিত না হয়ে তার সম্মুখীন হবার জন্য আরো বেশী উৎসাহের সঙ্গে শক্তি-বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করতে থাকে। ফলে এই বিপদ-সম্ভাবনা সঙ্ঘের পক্ষে শাপে বর বলে প্রমাণিত হল। ডাক্তারজী তাঁর এক বক্তৃতায় এই সময়ের পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, "১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের ১৯৩২ সালে দ্বিতীয় দফা শুরু হয়েছিল। সে সময়ে সরকারের ভয় ছিল যে প্রত্যেকটি সংগঠিত সংস্থা আন্দোলনে সাহায্য করবে। সেই কারণে সরকার এই ধরনের সংস্থাগুলিকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। নাগপুরে রাঃ স্বঃ সঙ্ঘই একটি শক্তিশালী সংস্থা হওয়ার দরুন সরকার তার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করবে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ আসছিল। আমাকে কাউন্সিলের কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য বলেন যে এই সংবাদ সরকারের আভ্যন্তরীণ মহল থেকে পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে মধ্যপ্রান্ত সরকার এমন মূর্খ নয় যে ওরা রাঃ স্বঃ সঙ্ঘের মত সংগঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা আনবে। কারণ সঙ্ঘের মধ্যে অত্যন্ত শান্তি ও অনুশাসনের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাকে নিষিদ্ধ করে সরকার অকারণে নিজের মাথায় সমস্যা কী কারণে ডেকে আনবে? আমি সে সময়ে সর্বদা বলতাম যে 'সরকার সঙ্ঘকে বন্ধ করতে পারবেনা, কারণ তাহলে তারা নিজেদের পায়েই কুড়ুল মারবে। যে দিন সরকার সঙ্ঘকে বেআইনি ঘোষণা করে বন্ধ করবে, সেদিনই নাগপুরে দুশো শাখা হয়ে যাবে। সঙ্ঘের মধ্যে যত স্বয়ংসেবক আছে, সঙ্ঘ বন্ধ করার পরে ততগুলি শাখা তৈরী হয়ে যাবে।' আমি এসব কথা সমস্ত স্বয়ংসেবকদের ভরসায়, তাদের কর্তৃত্বের উপর বিশ্বাস করে বলতাম।

"মনে করুন, কাল হিন্দুস্থানের সরকারের ইচ্ছা হল সঙ্ঘকে বন্ধ করে দেবে। কিন্তু সঙ্ঘ কেমন করে বন্ধ হবে? দৃশ্যমান শাখাগুলি বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু অদৃশ্য শাখা বহু গুণ বৃদ্ধি পাবে। লোকেরা বাইরে থেকে যা দেখতে পায়, সেই দৃশ্য সরকার বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু ভাবনাময় অন্তঃকরণে যে দৃশ্য দেখা যায়, তাকে সরকার কেমন করে অদৃশ্য করে ফেলবে? সোজা কথা, সরকার জেনে-বুঝে সংগঠনের উপর আঘাত হানতে পারবেনা। যদি তা করে, তাহলে যেমন আমি বলেছি, প্রত্যেক স্বয়ংসেবক হিসাবে শাখা তৈরী হয়ে যাবে। যদি সরকার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারির পর যত খুশি শাখা খুলতে পারে, তাহলে সেই চেষ্টা আমরা এখন থেকেই শুরু করিনা কেন। এই চিন্তা তখন এল এবং শাখাগুলির বিস্তারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। প্রতিটি মহল্লায় খোলা স্থান দেখে সেখানেই শাখা শুরু করে দেওয়া হল। এইভাবে আজ আপনারা নাগপুরে ষোলটি শাখা দেখতে পাচ্ছেন।"

এই কার্যবিস্তারের জন্য ডাক্তারজী তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে নাগপুরের প্রতিটি কোণা খুঁজে বেড়িয়েছিলেন। তিনি নিজের সমস্ত কার্যকর্তাদের মনে এ কথা গেঁথে দিয়েছিলেন যে সঙ্ঘের কাজের প্রসার কোন বাহ্য পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেনা, স্বয়ংসেবকদের আত্মবিশ্বাসপূর্ণ প্রচেষ্টার উপরেই অবলম্বন করে। তিনি সব সময় স্বয়ংসেবকদের বলতেন যে সঙ্ঘকার্য পরিস্থিতি-নিরপেক্ষ। যদি অনুকূল বাতাসের কারণে নৌকার সবকটা পাল তুলে দেওয়া যায় ভাল, কিন্তু বাতাস যদি বিপরীত দিকে বইতে থাকে এবং নদীর স্রোতও প্রতিকূল হয়, তবু

নিজের হাতে লগি ধরে নৌকাকে নির্দিষ্ট স্থানে সেই গতিতেই দাঁড় বাইবার প্রস্তুতি ও সামর্থ্য আমাদের মনে ও বাহুতে থাকা চাই। বিপরীত পরিস্থিতির কাঁদুনি গেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকা সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের শোভা দিতে পারেনা। সঙ্ঘকে পরিস্থিতি নিরপেক্ষ বলার পিছনে তাঁর এইরূপ মনোভাব ছিল এবং এই সংস্কারই তিনি নিজ আচরণের মাধ্যমে অন্যদের উপর দিতেন। ডাক্তারজী তাঁর দৈনন্দিনীতে ২৯শে জানুয়ারী ১৯৩৪ তারিখে যে সূক্তি লিখে রেখে ছিলেন সেটা তাঁর সতত প্রযত্নবাদী চরিত্রকে পুরোপুরি ব্যক্ত করে। সেই সূক্তি ছিল — "অকর্মণ্যরাই কালকে দোষ দেয়।"

সঙ্ঘের ক্রমবর্ধমান কাজের পরিচয় বিজয়া দশমী উৎসবে ভালভাবে প্রত্যক্ষ করা যাবে, এই কথা চিন্তা করে ডাক্তারজী এই বছর কাশী শাখার শ্রী সদগোপাল এবং শ্রী মাধবরাও গোলওয়ালকরকে উৎসব দেখার জন্য ডেকেছিলেন। প্রত্যাশা অনুসারে ১৯৩২ সালের বিজয়া দশমী উৎসব বিরাট আকারে সম্পন্ন হল। বারো শো গণবেশধারী স্বয়ংসেবক সঞ্চলনে অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের অনুশাসন ও দক্ষতা প্রত্যক্ষ করে নাগপুরের প্রত্যেক নাগরিকের মুখ থেকে 'বাঃ! বাঃ!' ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছিল। উৎসবের সময়ে ডাক্তারজী শ্রী সদ্‌গোপাল ও অধ্যাপক মাধবরাও গোলওয়ালকরের কাশী শাখার উৎসাহী কার্যকর্তা হিসাবে পরিচয় করান এবং তাঁদের পুষ্পমাল্য সমর্পণ করেন।

ভাষণের পূর্বে ডাক্তারজী বলেন যে বারাণসী, ইন্দোর, করাচি, বোম্বাই, সাতারা, কোল্‌হাপুর প্রভৃতি সকল স্থানে সঙ্ঘকার্যকে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে স্বাগত জানানো হয়েছে, এবং অন্যান্য স্থান থেকেও কাজ শুরু করার জন্য নিমন্ত্রণ আসছে। এর পরে তিনি সংক্ষেপে সঙ্ঘের উদ্দেশ্য জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। তাঁর ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "...সঙ্ঘের ধ্যেয় আমাদের ধর্ম, সমাজ তথা সংস্কৃতির সংরক্ষণ। কিছু লোক স্বধর্মের সংরক্ষণের মধ্যে পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ দেখতে পান। কিন্তু নিজের ধর্ম-রক্ষণের মধ্যে অন্যের ধর্মের বিরোধ কেমন করে হতে পারে, একথা আমি বুঝতে পারিনা। সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতির মধ্যে পন্থ তথা জাতি-ভেদ ইত্যাদির স্থান নেই। সঙ্ঘ সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজের একত্বভাবে বিচার করে। সঙ্ঘের মধ্যে সকল জাতির হিন্দুদের একই পতাকার ছত্রছায়ায় কাজ করার দরুন অস্পৃশ্যতা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য কারোরই আমরা পক্ষ নিইনা। নাগপুর প্রান্তের বাইরে সঙ্ঘের প্রচার কার্যে কংগ্রেস ও হিন্দু সংগঠনের মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, অনেক স্থানে কংগ্রেস ভক্তরাই এই কাজে সাহায্য করেছেন। কিন্তু নাগপুরে তা হয় না। আমার মনে হয় এর কারণ তাত্ত্বিক না হয়ে ব্যক্তিগত। কিন্তু তাঁদের কাছে আমার বিনম্র নিবেদন যে এখন অন্ততঃ আমাদের ভূমিকা পরিষ্কার বুঝে নিয়ে এই রাষ্ট্রকার্যকে সফল করার জন্য সহযোগিতা করুন। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হিন্দু জাতিকে মারাত্মক আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রস্তুত রাখার উদ্দেশ্যে হয়েছে।"

এই ভাষণেই ডাক্তারজী কংগ্রেসীদের সঙ্ঘের প্রতি পরকীয়তার মনোভাবের দিকে সংকেত করেন এবং বিচ্ছেদের বীজগুলি অংকুরিত হবার পূর্বেই সেগুলিকে বিনষ্ট করার জন্য বিনম্র প্রার্থনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাষ্ট্রীয়ত্বের অশাস্ত্রীয় তথা বিভ্রান্ত মনোভাব এবং দলীয়

অভিনিবেশের কারণে অনেক কংগ্রেসী ব্যক্তি কুশের মূলোচ্ছেদ করার পরিবর্তে সার ও সেচ দিয়ে তাকে আরো বর্ধিত করে তোলেন, এবং এই কারণে হিন্দুদের এক অভেদ্য সংগঠন নির্মাণের কাজে অত্যন্ত বিঘ্নের সৃষ্টি হয়।

ডাক্তারজী ঠিক করেছিলেন যে শ্রীসদ্‌গোপালজী ও শ্রী গোলওয়ালকরজীর নাগপুরের পরে উমরেড, ভাণ্ডারা ইত্যাদি স্থানের শাখাগুলিকেও দেখাতে নিয়ে যাবেন, যাতে তাঁরা সঙ্ঘের কার্য্যপদ্ধতি উত্তম রূপে উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে পারলেন না।

একথা সত্য যে শরীর ধ্যেয়নিষ্ঠ তথা তপস্বী ব্যক্তিদের মনের দাস। কিন্তু দেহের শ্রম ও কষ্টেরও একটি সীমা থাকে। শ্রান্ত-ক্লান্ত ও দুর্বল গরু গোয়ালার ডান্ডার ভয়ে কিছু দূর পর্যন্ত চলতে পারে, কিন্তু এমন একটা সময় আসে যখন ডান্ডা খাবার পরেও তার উঠে দাঁড়াবার অথবা হাঁটার ক্ষমতা থাকেনা। এমতাবস্থাতেও গোয়ালার ডান্ডার প্রহারের করুণ দৃশ্য মাঝে-মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। ডাক্তারজীর শরীরও এই রূপ অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। তাঁর মন হিন্দুদের শক্তিশালী ও ঐশ্বর্যসম্পন্ন জীবন গড়ে তোলার জন্য ছট্‌ফট্ করছিল, সেই কারণে ক্ষণেকের তরেও বিশ্রাম না নিয়ে এবং বাধা-বিপত্তিতেও না থেমে নিজ হৃদয়ের ধ্যেয়নিষ্ঠার জ্যোতি দিয়ে বহু হৃদয়ের দীপ প্রজ্জ্বলিত করার প্রচেষ্টার পরাকাষ্ঠা করে চলেছিলেন। জেলের জালে ধরা পড়া মাছ, পাখী শিকারীর জালে ধরা পড়া পাখী এবং ঘুর্ণিতে আট্‌কে পড়া মানুষ যেমন বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য ছট্‌ফট্ করে, তার থেকেও বেশী ব্যাকুলতা ডাক্তারজীর জীবনে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিল। তাঁর হৃদয়ে হিন্দু সমাজের অতিরিক্ত অন্য কিছুর স্থান ছিল না। মন্দিরের নন্দাদীপের মত তাঁর হৃদয়ের অভ্যন্তরে ধ্যেয়ের অনির্বাণ দীপশিখা প্রত্যেক পরিস্থিতিতে উৎসাহের আলোক চতুর্দিকে বিকীরণ করে নিরাশার অন্ধকারকে বিনষ্ট করার নিমিত্ত সতত প্রজ্জ্বল্যমান থাকত।

তাঁর মন কার্যবৃদ্ধির জন্য বিজিগীষু তথা পুরুষার্থী ভাবনা নিয়ে ছুটে চলেছিল, কিন্তু শরীর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে একরকম অস্বীকার করে দিল। নাগপুরের বিজয়াদশমী উৎসব তিনি প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে, কাউকে তার অনুমান করার সুযোগ পর্যন্ত না দিয়ে, সম্পূর্ণ করেন। ভাণ্ডারার জনৈক কার্য্যকর্তাকে, সেখানে যাওয়ার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে চিঠিতে লেখেন, "প্রচণ্ড জ্বর সত্ত্বেও এখনো শয্যা গ্রহণ করিনি, সম্ভবতঃ এটাই আমার দোষ। আমার অবস্থা এইরকম দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় বারাণসীর অতিথিদের নিয়ে আমি উমরেড ও ভাণ্ডারা যেতে না পারলেও আমাকে রামটেক যেতেই হল, এবং স্বাস্থ্যের উপর তার অনিষ্ট পরিণাম হল। সম্ভবতঃ মোটরগাড়ীতে সফর আমার সহ্য হয়নি।" অবস্থার এইরকম অবনতি হওয়ার পরেও নাগপুরে তাঁর ছুটোছুটি অব্যাহত ছিল, কিন্তু ডাক্তারজীর স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতি তাঁর সহকর্মীদের নজরে পড়ল। অতএব ডাঃ হরদাসের চিকিৎসা আরম্ভ করে দেওয়া হল। ডাঃ হরদাসের পরামর্শে হাওয়া বদলের জন্য ডাক্তারজীকে ডাঃ হরদাসেরই ধন্তোলী-স্থিত বাংলোতে নিয়ে যাওয়া হল।

নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে ডাক্তারজীকে ধন্তোলী নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং স্বয়ংসেবকেরা লক্ষ্য রাখলেন যাতে তিনি যতখানি সম্ভব বিশ্রাম লাভ করেন। ডাক্তারজীর নিজের বাড়ীর কাছে নোংরা নর্দমা বয়ে যেত। শীতজ্বরের প্রতি অবহেলার দরুন তাঁর ফুসফুসের প্রদাহ অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠেছিল। সেই কারণে অনেক চিকিৎসার পরেও কাসি কিছুতেই কমছিলনা। কিন্তু ধন্তোলী অঞ্চলের উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ আবহাওয়ায় ডাক্তারজীর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করা গেল। অসুখ একটু কম হতেই সেখানে স্বয়ংসেবকদের আসা যাওয়া শুরু হয়ে গেল এবং বাড়ীর মতই বৈঠক ও চর্চা (আলোচনা) আরম্ভ হয়ে গেল। বিছানায় বসে-বসে পত্রালাপ আগে থেকেই চলছিল। ডাক্তারজী ডাঃ হরদাসের বাড়ীতে দু মাস ছিলেন। সেই সময় অত্যন্ত আত্মীয়তার সঙ্গে ডাঃ হরদাস তাঁর সব রকম সুব্যবস্থা করেন। কথাবার্তা চলার তোড়ে মাঝে-মাঝে ডাক্তারজীর ঔষধ গ্রহণের দেরী হয়ে যেত এবং রাত্রি জাগরণ চলছিল। ডাঃ হরদাস জোর দিয়ে বলতেন, "এটা ঠিক হচ্ছেনা, আপনার পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।" একথা শুনে ডাক্তারজী খুব হাসতেন। হরদাস মহাশয়ের অবস্থা ছিল অসহায়ের মত। সেই বিষয়ে তিনি বলেছিলেন, "অনেকে আলস্য ও বিলাসিতার কারণে অনিয়ম করে, কিন্তু ডাক্তারজীর অনিয়মের কারণ ছিল কর্মব্যস্ততা। সেকথা আমি জানতাম।"

এই তথাকথিত বিশ্রামের সময়ও অর্থের সমস্যা তাঁকে চিন্তামুক্ত হতে দিতনা। এই হেতু তিনি ডাঃ হরদাসের বাড়ীতেই ডাঃ পরাঞ্জপে, 'মহারাষ্ট্র' সম্পাদক শ্রী ওগলে, ডাঃ চোলকর, শ্রী বিশ্বনাথরাও কেলকর, অ্যাডভোকেট বোবড়ে, শ্রী মণ্ডলেকর প্রমুখ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি বৈঠক করলেন। সেই সময়ে প্রকাশিত একটি পত্রকে লেখা হয় — "সঙ্ঘের পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রয়োজন।" এই দাবী তিনি সঙ্ঘস্থান, কার্যালয়, আখড়া এবং অন্য প্রবাস-ব্যয়ের জন্য করেছিলেন। ঐ পত্রের প্রারম্ভে তিনি লেখেন ঃ

"আজকের সঙ্ঘের কার্য এবং ভবিষ্যৎ রূপরেখা তথা ব্যাপ্তির প্রচণ্ড সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখে সঙ্ঘের আর্থিক ভিত্তিকে আজই সুদৃঢ় করে তোলা আবশ্যক। সমগ্র হিন্দুস্থানে আমাদের কাজের জাল বিস্তৃত করে সম্পূর্ণ দেশকে সুসংগঠিত করার আকাঙ্খা নিয়ে সঙ্ঘ চলেছে।" এই বৈঠকের পূর্বেই ১৩ তারিখে সমস্ত সঙ্ঘপ্রেমী সজ্জনদের নিকট অর্থের জন্য আহ্বান জানিয়ে ডাক্তারজী এক পরিপত্র পাঠিয়েছিলেন। সেখানে এই মনোভাবই ব্যক্ত করা হয়েছিল। ডাক্তারজী লেখেন — 'আজ পর্যন্ত কারুর কাছে অর্থ না চেয়ে সঙ্ঘ যে সেবা কাজ করেছে, তা আপনাদের সামনে রয়েছে। কিন্তু আপনাদের নম্রতাপূর্বক বলতে চাই যে সঙ্ঘের ব্যাপকতা এত বৃদ্ধি লাভ করেছে যে এখন মানুষের কাছ থেকে অর্থ না চেয়ে আর করে যাওয়া সম্ভব হবেনা। ....অতঃপর ধনী-মানী ব্যক্তিদের দ্বারা আমাদের অর্থের অসুবিধা দূর না করা হলে আমাদের কাজ দূর পর্যন্ত আমরা স্বাধীনভাবে বিস্তৃত করতে পারবনা।"

যোজনা অনুযায়ী ১৭ তারিখে বৈঠক হল। সেই বৈঠকে সঙ্ঘের কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সে বিষয়ে আলোচনার সময়ে দেবীর মন্দিরের নিকট একটি স্থান ক্রয়ের কথা বলা হল। তখন বিতর্ক শুরু হল যে সঙ্ঘের এই ভাবে জমি নেওয়া উচিত কি না। এই আশংকা

প্রবলরূপে ব্যক্ত করা হয় যে সঙ্ঘ যদি এই জায়গাটা আজ গ্রহণ করে, তাহলে সরকার আগামী কালই তা বাজেয়াপ্ত করতে পারে। এই কথা ডাক্তারজীর একেবারেই পছন্দ হল না। তিনি কিছুটা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সম্পূর্ণ দেশ অপরের দখলে চলে গেল, তার জন্য কোন দুঃখ নেই, আর এই জমির জন্য প্রয়োজন পাঁচ-দশ হাজার টাকার জন্য এত চিন্তা হচ্ছে !"

কার্যবৃদ্ধির জন্য পরিস্থিতি অনুকূল ছিল, কিন্তু একদিকে অর্থের টানাটানি, অন্যদিকে শরীর সহযোগিতা করছিলনা। এই সময়ে মধ্য প্রান্ত সরকার তাঁর চিন্তা আরো বাড়িয়ে দিল। ১৫ই ডিসেম্বর সরকারের মুখ্য সচিব শ্রী ইঃ গর্ডন-এর পক্ষ থেকে একটি পরিপত্র জারি করে বলা হল — রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক হওয়ার দরুন সরকারী কর্মচারীদের সঙ্ঘে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হল। ঐ পত্রকে লেখা হয়, "সরকারী কর্মচারীদের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি ভূমিকার বিবরণ -- সরকারী কর্মচারীদের আচার সংহিতার ২১ নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে। তদনুসারে তাঁদের এই ধরণের সব কাজ থেকে আলাদা থাকা উচিত। সরকারের সুনিশ্চিত মত হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নামক সংগঠনের স্পষ্টতঃ সাম্প্রদায়িক স্বরূপ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিতে তাদের বেশী করে অংশগ্রহণ করার কারণে সরকারী কর্মচারীদের ঐ সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা তাঁদের নিরপেক্ষ কর্তব্যপালনের সহিত অসংগতিপূর্ণ হয়েছে অথবা হতে পারে।

"অতএব, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কোন সরকারী কর্মচারীকে রাঃ স্বঃ সঙ্ঘের সদস্য হওয়ার অথবা তার কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবেনা।"

সঙ্ঘের প্রগতিকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই এই পরিপত্র জারি করা হয়েছিল। সেভাবে সঙ্ঘে সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যা বিশেষ ছিলনা। কিন্তু যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে সঙ্ঘের বালক ও তরুণদের ভর্তি করা হত, তাদের অনেক পরিবারের প্রধান ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী ছিলেন। অভিভাবক-বর্গের উপর এই আতংকের পরিণাম হওয়া স্বাভাবিক ছিল। এবং সরকারের অনুমান ছিল যে এর ফলে সঙ্ঘের বিরাট বৃদ্ধির গতি রুদ্ধ হবে। তৎকালীন হিন্দু সমাজের ভীরুতার ব্যাপারে পরিচিত সরকারের এই প্রকার অনুমান ভুল ছিলনা। বাল-শিবাজীর বিদ্রোহকে বন্ধ করার জন্য যেভাবে বিজাপুরের শাহ শাহাজীকে কারাবন্দী করার কৌশল গ্রহণ করেছিল, সেই নীতিই ইংরাজ শাসকরা নিয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ যে নীতিজ্ঞতা তথা চাতুর্যের মাধ্যমে ছত্রপতি শিবাজী তাঁর পিতাকে কারামুক্ত করাতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই পরম্পরা ভারতে শেষ হয়ে যায়নি। ডাক্তারজী শিবাজী মহারাজকে রাষ্ট্রপুরুষ রূপে স্বীকার করে শুধু তাঁর গুণাবলীকেই অঙ্গীকৃত করে নেননি, বরং তিনি স্বয়ং সেই উদাত্ত ধ্যেয়বাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজকে যশস্বী করার পথে চালিত করেছিলেন যে মহাপুরুষরা, সেই মালিকার তিনি অন্যতম মণি ছিলেন। সেই কারণে মধ্যপ্রান্ত সরকারকে শুধু যে নিজেদের ঐ পরিপত্র প্রত্যাহার করে নিতে হল, তাই নয়, ঐ অবিবেচনাপূর্ণ কৃত্যের জন্য পশ্চাত্তাপও করতে হল। সরকারের প্যাঁচ এমনই কৌশলের সঙ্গে ডাক্তারজী উল্টে দিয়েছিলেন।

২১. সরকারের পরাভব

সঙ্ঘে সরকারী কর্মচারীদের অংশগ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হল। পরমপূজনীয় ডাক্তারজী এই আদেশ বাতিল করানোর জন্য নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। সঙ্ঘের উৎসবগুলিতে বেছে-বেছে এমন ব্যক্তিদের সভাপতি করা হতে লাগল, যাঁদের প্রতি সরকারী-মান্যতা (স্বীকৃতি) ছিল। তাঁরাই ঘোষণা করতে থাকেন যে সঙ্ঘ না তো সাম্প্রদায়িক, আর না রাজনৈতিক, অর্থাৎ সরকারের মুখপাত্ররাই সরকারের বিরুদ্ধে বলতে শুরু করলেন।

মধ্যপ্রান্তের ভূতপূর্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার মোরোপন্ত জোশী ১৯৩৩ সালের মকর সংক্রান্তি উৎসবের সভাপতিত্ব করার সময়ে মুক্তকণ্ঠে সঙ্ঘের প্রশংসা করেন। সরকারের পরিপত্র এবং এই ধরনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরস্পর-বিরোধী অভিমতের কারণে সঙ্ঘের বিরুদ্ধে সরকারের তোলা পদক্ষেপ হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হল।

সরকার যাই বলে থাকুক এবং তাদের চালকে কার্যকর করার জন্য যে নীতিই গ্রহণ করুক, কিন্তু ডাক্তারজী সঙ্ঘের দৃঢ় ভূমিকায় কিছুমাত্র পরিবর্তন করেননি। এ সময়ে তিনি অত্যন্ত নির্ভীকতা তথা সুস্পষ্টভাবে নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিপাদন করে সরকারের অবস্থা কাহিল করে তোলেন। তাঁর ভাষণে যুক্তিবাদের সঙ্গে আত্মবিশ্বাসের দৃঢ় ছাপ দেখা যেত। ভাষণের সূচনায় তিনি সঙ্ঘের এক শত শাখা ও দশ হাজার স্বয়ংসেবকের উল্লেখ করে বলেন, "সঙ্ঘ রাজনীতি থেকে অলিপ্ত এবং কারুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করে হিন্দু সমাজকে সুসংগঠিত তথা শক্তিশালী করে তোলার জন্য যত্নশীল।" এর পরে তিনি সরকারী পরিপত্র সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, "এই পরিপত্রক পাঠ করে এবং শুনে অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ হল। প্রথমে তো বিশ্বাসই হয়নি যে মধ্যপ্রান্তের সরকার এরকম অবিবেচনাপূর্ণ কাজ করতে পারে। কিন্তু সরকার যদি নিজের ধারণাকে সত্য বলে মনে করে, তাহলে ওদের প্রতি আমাদের আহ্বান যে ওরা যেন প্রমাণ করে দেখায় যে সঙ্ঘ আজ পর্যন্ত প্রচলিত আন্দোলনগুলির মধ্যে কোন্-কোন্ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে এবং হিন্দুস্থানের কোন অহিন্দু সমাজের উপর কোথায় কোথায় আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে। যদি 'ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন', 'ইউরোপিয়ান চেম্বার অফ কমার্স' এর মত সংস্থাগুলি 'কমিউনাল' না হয় এবং সেগুলিতে যখন যে কোন সরকারী কর্মচারী অংশগ্রহণ করতে পারে, তাহলে হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা কেমন করে 'কমিউনাল' হতে পারে এবং তাতে সরকারী কর্মচারীরা কেন অংশ গ্রহণ করবেনা? একটি সমাজ কর্তৃক অন্য সমাজের বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে তাকে সাম্প্রদায়িক বলা যেতে পারে, কিন্তু কারো প্রতি বিদ্বেষ অথবা তিরস্কার না করে কেবল নিজ সমাজের কল্যাণের জন্য যে কাজ চালান হয়, সেই কাজকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিয়ে তাকে নিষ্পেষণ করা

নিঃসন্দেহে আশ্চর্যজনক। সরকারের যদি এই কাজ ভাল না লাগে, সেই কারণে তাকে যদি দাবাতে চায়, তাহলে আমরা বিনম্রতার সঙ্গে জানিয়ে দিতে চাই যে আমাদের কাজকে দাবানো যাবেনা। আমরা ভগবানের স্মরণ করে আমাদের কাজে রত আছি এবং আমাদের পথে যত সংকটই আসুকনা কেন, তার সম্মুখীন হয়ে নিজেদের কাজকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি না করে আমরা থামবনা।"

পুনার 'কেশরী' এবং নাগপুরের সংবাদপত্রগুলিও ডাক্তারজীর দৃষ্টিকোণকে সমর্থন করে অভিমত ব্যক্ত করে। ইংরাজী 'হিতবাদ' এই প্রশ্নও উত্থাপন করে যে "ব্রাহ্মণেতর সংস্থা সাম্প্রদায়িক কিনা? যদি তা হয়, তাহলে সরকার কি স্বীকার করবেন যে কোন মন্ত্রী তার সভাপতিত্ব করবেন এবং অন্য জাতির বিরুদ্ধে বিষবমন করবেন?" কিন্তু নানা ফন্দি ফিকির করে হিন্দু সমাজকে অসংগঠিত, দুর্বল এবং নিদ্রামগ্ন রেখেই ইংরাজ সরকার ভারতে কিছু কাল স্থায়ী হয়ে থাকতে পারে। অতএব, সরকার এই প্রকার তীক্ষ্ণ সমালোচনার দিকেও যোজনাপূর্বক দৃষ্টি দিলনা। হিন্দু স্বার্থ-বিরোধী কোন কাজে সরকারের আপত্তি ছিলনা, বরং সেটাই তাদের পছন্দ ছিল। নিম্নলিখিত ঘটনা সরকারের সেই মনোভাবের নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। সেই বছর ভারত সরকারের কার্যকারিণীর সদস্য স্যার ফজলে হুসেন উত্তর হিন্দুস্থানের মুসলমানদের মধ্যে একটি উত্তেজনামূলক পত্রক বিরাট পরিমাণে গোপনে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই পত্রকে লেখা হয়েছিল — "সাবধান থাক। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জালে আটকে যেওনা। ভিখারী হিন্দুদের সঙ্গে ভাব করে আমাদের কী লাভ? আমাদের তো ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজেদের লাভ করে নিতে হবে।" এই প্রকার কুমতলবযুক্ত এবং কুৎসিত মনোভাব ব্যক্তকারী পত্রকের কথা ফাঁস করে দিয়েছিল পাঞ্জাবের একটি সংবাদপত্র এবং সে বিষয়ে অ্যাসেমব্লীতে প্রশ্নও তোলা হয়। কিন্তু ফজলে হুসেন যাদের ইশারায় নেচে এই খেলা খেলেছিল, তারা ইংরেজ ভিন্ন অন্য কেউ নয়। অতএব, ঐ পত্রক সম্বন্ধে তারা আপত্তি করবে কেমন করে?

সংক্রান্তির দু মাস পরেই বর্ষ-প্রতিপদের উৎসব এসে গেল। উৎসবের সভাপতিত্ব করার জন্য ডাক্তারজী মধ্যপ্রান্তের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল মাঃ শ্রীঃ বঃ তাম্বেকে আমন্ত্রিত করলেন। সেই সঙ্গে ডাক্তারজী তাঁর পত্র-ব্যবহারের মাধ্যমে এবং অন্য কার্যক্রমের দ্বারা সর্বদা এই চেষ্টা করতেন যাতে পরিপত্রকের কোন অনিষ্টকর পরিণাম শাখাগুলির উপরে না হয়। ঐ সময়ের পত্রগুলি থেকে জানা যায় যে তাঁর স্বাস্থ্য ঠিক ছিল না। ২৫শে মার্চে লেখা পত্রে তিনি লেখেন যে "...একটু পরিশ্রমেই ক্লান্তি ও হাঁপ ধরার কষ্ট এখনও বজায় আছে।" কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর বর্ষ প্রতিপদের ভাষণ অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ছিল, তাঁর স্বাস্থ্যের পরিণাম তাঁর মনের উপর হয়েছে বলে মনে হয়নি। "হিন্দু ধর্ম তথা সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য যে প্রয়াস করা হয় হিন্দুস্থানে তা কখনো সাম্প্রদায়িক হতে পারেনা," এই কথা বলে ডাক্তারজী সমস্ত জনসাধারণের নিকট আহ্বান জানান যে "আপনাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অভিমতকে নিজের কাছে রেখে দিয়ে হিন্দু সংগঠন হেতু আপনারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।" সভাপতির অভিভাষণে শ্রী তাম্বেও মুক্তকণ্ঠে সঙ্ঘকার্যের স্তুতি করে সরকারের পরিপত্রক

সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব এইভাবে ব্যক্ত করেন, "যদিও সরকার সঙ্ঘের বিরুদ্ধে আদেশ জারি করেছে, তথাপি যাঁদের হিন্দু জাতির সেবা করার ইচ্ছা আছে, তাঁদের সঙ্ঘে অংশগ্রহণ ভিন্ন অন্য কোন পথ নেই, কেননা এই সংস্থা সম্পূর্ণভাবে হিন্দু বৃত্তিমূলক এবং প্রচলিত রাজনীতি থেকে অলিপ্ত।"

প্রত্যক্ষ কাজের বৃদ্ধির মাধ্যমে ডাক্তারজী সরকারী পত্রকের অনিষ্টকর পরিণামের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেন। তাঁর দৌড়াদৌড়ি এত বেশী বেড়ে গেল যে দিনের চব্বিশ ঘন্টাও, কম বলে মনে হতে লাগল। ডাক্তারজী নাগপুরের কাজের অবস্থার বর্ণনা করে লিখেছিলেন যে "এখানকার কাজ এত বেড়ে গেছে যে বাইরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।" কার্যবৃদ্ধির কারণে এই বছরের অধিকারী শিক্ষণ বর্গ নাগপুর ও মেহকর দুইটি স্থানে করতে হল। কার্যের এই বৃদ্ধির জন্য ডাক্তারজী তাঁর সহকর্মীদের প্রেরণা ও উৎসাহদানের জন্য কীভাবে বিবিধ পথ অবলম্বন করেছিলেন, তাঁর দৃষ্টান্ত তাঁর পত্র-ব্যবহার থেকে জানা যায় এবং তাঁর অসাধারণ সংগঠন-কুশলতার অনুমান করা যেতে পারে। কখনো পিঠ ঠুকে, আবার কখনো কাজের প্রতি ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য অত্যন্ত কঠোর অনুশাসনপূর্ণ শব্দ-প্রয়োগ করে, কখনো আত্মীয়তার সঙ্গে অন্তরের ভাবনা উজাড় করে দিয়ে, আবার কখনো প্রত্যাশা পূর্ণ না করার জন্য বকুনি দিয়ে তিনি বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ব্যক্তি অনুসারে আমাদের কাজের প্রতি গভীর আন্তরিকতাকে নানা ভাবে ব্যক্ত করতেন। ঐ সব পত্রে ডাক্তারজীর যে স্বরূপই ব্যক্ত হোক না কেন, সেগুলির পরিণাম সব সময়ে অনুকূলই হত। এই দিক থেকে তাঁর ১২ই আগষ্ট, ১৯৩৩ এ লিখিত একটি পত্র উল্লেখনীয়। এই পত্রে সংগঠনের কেন্দ্র হওয়ার দরুন নাগপুরের কাজ অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়া উচিত, এ কথার উপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি লেখেন, "...ভবন যত বিশাল ও সুন্দর নির্মাণ করতে হবে, সেই হিসাবেই তার ভিত্তিও বিস্তৃত, মজবুত ও শক্ত-পোক্ত হওয়া চাই। আজ সঙ্ঘের একশো পঁচিশটি শাখা ও বারো হাজার স্বয়ংসেবক আছে। নাগপুর জেলা যদি অসংগঠিত থাকে, তাহলে এত বিশাল অট্টালিকা ভেঙে পড়তে বেশী সময় লাগবেনা। মনের এই আশংকার কথা ভেবে যে দুঃখ হয়, তার বর্ণনা চিঠিতে করা সম্ভব নয়।

"সংক্ষেপে এটুকু বলতে পারি যে আমি আমার সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে সঙ্ঘের ভবনটিকে নির্মাণ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু একজন ব্যক্তি যত কাজই করুক না কেন, তথাপি রাষ্ট্রের কাজ হওয়ার দরুন সেটা তার একার হাত দিয়ে পুরো হতে পারেনা। অতএব, আপনাদের নিকট আমার আন্তরিক প্রার্থনা এই যে আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া এই কাজ আমার দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়।

"... আমি একথা একেবারেই বলতে চাইনা যে কাজ করার ক্ষেত্রে বাধা-বিপত্তি থাকেনা, কিন্তু আমার মনে হয় যে মানুষ যদি একবার সংকল্প গ্রহণ করে তাহলে বাধা-বিপত্তির সন্মুখীন হতে পারেনা। অতএব, আপনাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিবেদন যে সমস্ত উপস্থিত বাধা-বিঘ্নের মোকাবেলা করে, নিজেদের ব্যক্তিগত কাজগুলিকে একটু এক পাশে সরিয়ে রেখে এই বছর (উমরেড) তহশীলে সুদৃঢ় তথা মজবুত ভিত্তিতে শাখা স্থাপন করুন।

"যদি এই কাজ আপনাদের দ্বারা সম্ভব না হয়, তাহলে আপনাদের নিকট আমার অন্তিম প্রার্থনা এই যে আপনারা আমাকে সঙ্ঘকার্য ত্যাগ করে বিশ্রাম গ্রহণের অনুমতি প্রদান করুন।"

নাগপুর অঞ্চলে সরকারের রক্তচক্ষু ব্যর্থ হল। কিন্তু বোম্বাই অঞ্চলে সঙ্ঘকার্য সে রকম বৃদ্ধি লাভ করেনি। সেখানে সঙ্ঘকার্যে নিমগ্ন তথা একাগ্রচিত্ত কার্যকর্তাদের অভাব তো ছিলই, সেই সঙ্গে শাসনযন্ত্রের দমনের রূপও ছিল উগ্রতর। কড্রাড-এর সঙ্ঘচালক শ্রী গণপৎ রাও আল্‌তেকর উকিলের এক পত্র থেকে জ্ঞাত হওয়া যায় যে তখন মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতি কী রকম ছিল। তিনি লেখেন, ".... এই অঞ্চলে শাখার কাজ ব্যবস্থিত রূপে চলবে বলে মনে হয়না। রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব না রাখলেও এই ক্ষেত্রের বাতাবরণ এমন নোংরা হয়ে গেছে যে সরকারের কাছে সমস্ত রকম সামাজিক কাজই আপত্তিজনক বলে মনে হয়। এখানকার নীতি হল শ্মশানের শান্তি কায়েম করে রাখা। সাধারণ ব্যায়ামশালাগুলিকে পর্যন্ত বেআইনি বলে ঘোষণা করা হয়েছে।" তবু এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে এই ধরণের বিরোধিতা ও চাপের পরিস্থিতির মধ্যেও মহারাষ্ট্রের কাজের গতি মন্দীভূত হলেও তা বন্ধ করা যায়নি।

সরকারী কর্মচারীদের সঙ্ঘে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ হবার পর এক বছরের মধ্যেই স্থানীয় স্বশাসিত-সংস্থাগুলির পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হল। ঐ আদেশে লেখা হয়েছিল যে "সরকার জানতে পেরেছে যে জেলা কাউন্সিল স্কুলগুলির কতিপয় শিক্ষক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সদস্য হয়েছেন। এই সংগঠনের সাম্প্রদায়িক স্বরূপের কারণে সরকারী কর্মচারীদের উপরে তার সদস্য হওয়া অথবা তার কার্যক্রমগুলিতে অংশগ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়েছে। মধ্য প্রদেশ সরকার (স্থানীয় স্বশাসিত মন্ত্রালয়)-এর মতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মচারীদেরও এই সংগঠনের সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা অবাঞ্ছনীয়। তাঁরা সমাজের সমস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাসমূহের দ্বারা নিযুক্ত কর্মচারী। সাধারণ ভোটদাতার ভিত্তিতে সরকারের নিকট হতে স্থানীয় সংস্থাগুলি করের অংশলাভের অধিকারী। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে তাদের কর্মচারীদের কোন রকম সাম্প্রদায়িক সংগঠনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া উচিত হবেনা। আমার নিবেদন এই যে আপনারা নিজেদের বিভাগের স্থানীয় সংস্থাগুলির নিকট এই দৃষ্টিভঙ্গী ভালো করে বুঝিয়ে দিন এবং তাঁদের কর্মচারীদের এ বিষয়ে সুস্পষ্ট আদেশ প্রদানের জন্য উৎসাহিত করুন।"

১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এই পরিপত্রক জারি করা হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিমূলক সংস্থাসমূহের নিকট এই পদক্ষেপ কদাপি রুচিকর হওয়া সম্ভব ছিলনা। অতএব স্থানে-স্থানে জন-প্রতিনিধিদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। এই সব সংস্থার সকল সদস্যই সঙ্ঘের চিন্তাধারার সমর্থক ছিলেন না। উপরন্তু, একথা বলাও ভুল হবেনা যে তাদের অধিকাংশ মানুষ সঙ্ঘ ছাড়া অন্য সংস্থাগুলির প্রতি নিষ্ঠা তথা নৈকট্য রাখতেন। কিন্তু সকলেই এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ ছিলেন যে আমাদের হাতে এই যে ক্ষুদ্রাকার কাজের ভার ন্যস্ত হয়েছে তাতেও বিদেশী সরকার এভাবে হস্তক্ষেপ করবে। ডাক্তারজী এই অসন্তোষকে যোজনাপূর্বক কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন স্থানে উক্ত আদেশের জবরদস্ত বিরোধিতা ব্যক্ত করাবার প্রয়াস করেন। এর জন্য তিনি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের নিকট সঙ্ঘের বিশুদ্ধ রাষ্ট্রীয় ভূমিকা

বুঝিয়ে সরকারের অভিযোগগুলির অসারতা প্রমাণ করে দেন। বিভিন্ন স্থানের কার্যকর্তারাও এই মেলামেশার কাজ করেন।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে নাগপুরে 'অখিল মহারাষ্ট্র সাহিত্য সম্মেলন'-এর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে সঙ্ঘের শিরিরও চলছিল। ডাক্তারজী এই অধিবেশনের সুযোগ নিয়ে শত-শত বিদ্বানদের সঙ্ঘের কার্য প্রত্যক্ষরূপে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন। সহস্রাবধি তরুণদের সামরিক গণবেশে অনুশাসনপূর্ণ সঞ্চলন এবং নিজেদের হাতে গড়ে তোলা তাঁবুতে সজ্জিত শিবির যে কোন দেশভক্তকে আকৃষ্ট তথা আনন্দিত করতে সক্ষম ছিল।

লোকমান্য তিলকের এক সময়ের সহকর্মী এবং 'নব কাল' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী কৃষ্ণজীপন্ত অর্থাৎ কাকাসাহেব খাদিলকর ছিলেন সম্মেলনের সভাপতি। সর্বশ্রী দত্তোপন্ত পোতদার, বাঃ মঃ জোশী, যঃ রঃ দেশপাণ্ডে, বাবুরাও গোখলে, ধুলিয়ার শঙ্কররাও দেব, সরদার কিবে, শাহীর খাদিলকর প্রমুখ সজ্জনদের সঙ্গে তিনি শিবির পরিদর্শন করতে এলেন। স্বয়ংসেবকদের অনুশাসিত জীবন এই সমস্ত দর্শকের উপর যে প্রভাব সৃষ্টি করল তা শ্রী কাকাসাহেব খাদিলকরের ভাষণে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হল। সঞ্চলন দেখে তো তিনি তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন যে "এই প্রসঙ্গের বর্ণনা করা কঠিন। প্রত্যক্ষ কাজই এর প্রকৃত বর্ণনা।" স্বয়ংসেবকদের সম্মুখে বক্তৃতায় তিনি ডাক্তারজীর সংগঠন-কুশলতার প্রশংসা করে বলেন, "....আমরা সাহিত্যিক মানুষেরা তো বাক্যবীর। কিন্তু এখানে শক্তির প্রত্যক্ষ উপাসনা চলছে। এ হল শক্তির দৃশ্য স্বরূপ। শত-সহস্র ব্যাখ্যান দিয়ে এবং প্রবন্ধ লিখে আমরা যে কাজ সিদ্ধ করতে পারিনা, যে ভাবনা মানুষের মনের উপর অংকিত করতে পারিনা, তা সঙ্ঘের এই দৃশ্য দর্শনের মাধ্যমে সম্ভবপর। প্রত্যক্ষ দৃশ্য স্বরূপের দ্বারাই মহান্ তত্ত্বসমূহের বোধ হতে পারে — সঙ্ঘ তার অত্যন্ত প্রভাবী উদাহরণ।"

শ্রী কাকাসাহেব খাদিলকরের মত সাহিত্যিককে ডাক্তারজী এই জীবন্ত সাহিত্যের দর্শন করালেন। তাঁর মন এই সাক্ষ্যই প্রদান করল যে এই সাহিত্যই হিন্দুস্থানে হিন্দু রাষ্ট্রের 'নতুন যুগ'-এর নির্মাণ করবে। যার সম্মুখে হাজার হাজার প্রবন্ধ ও ব্যাখ্যান পঙ্গু হয়ে যায়, তরুণদের সংগঠনের সেইরূপ প্রভাবী দৃশ্য সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে নির্মাণ করার কাজে ডাক্তারজী সাধনামগ্ন ছিলেন। একথা বলাই যুক্তিসঙ্গত হবে যে সাহিত্যিক হওয়ার স্থানে তিনি সাহিত্যের প্রেরণা কেন্দ্র নির্মাণ করতে চাইছিলেন।

এই বছর তিনি মাঃ শ্রীঃ বঃ তাম্বেকে আলিপুরে ওয়ার্ধা জেলার শিবিরের পুনরায় সভাপতি করলেন এবং তাঁর মুখ থেকে সঙ্ঘ যে রাজনৈতিক অথবা সাম্প্রদায়িক সংগঠন নয় তাঁর ঘোষণা করিয়ে নেন এবং ঐ বিষয়ে সরকারের ভুল ধারণাকে ঠিকমত ধিকৃত করিয়ে নেন। মুসলমানেরা পাকিস্তান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে দুষ্ট প্রচার শুরু করেছিল, সে বিষয়ে ডাক্তারজী এই শিবিরের ভাষণে সর্বপ্রথম সার্বজনিক ভাবে উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষণ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে হিন্দুরাষ্ট্র বিরোধী ষড়যন্ত্র সমূহের অগ্রগতি এবং সেগুলিকে ব্যর্থ করে দেবার নিমিত্ত হিন্দু জাগৃতির কার্যের মধ্যে গতির পার্থক্য দেখে তিনি কতখানি ব্যথিত ছিলেন। অনেকে তো সংকট দেখতেই পায়না, কিন্তু যাঁরা তাঁর আভাস পান, তাঁরাও

যদি যথা সময়ে সংকটগুলিকে প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে সংকটের জ্ঞান হওয়া না হওয়া সমান। এমন যেন না হয় তার জন্য ডাক্তারজী প্রাণপণে সচেষ্ট ছিলেন। সেই কারণে স্বভাবতঃ তাঁর ভাষণে তাঁর হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকট হয়ে পড়ত। আলিপুরের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "পূর্বের গান্ধার দেশ আজ আফগানিস্তান হয়ে গেছে, সেইভাবে আজকের হিন্দুস্থানকে ভবিষ্যতে যেন আমাদের ইস্লামিস্তান রূপে দেখতে না হয় — এই আশংকা সর্বক্ষণ মনে হয়। 'ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বিক্রী করে স্বরাজ্য নাও' — এই ভাষা যদি আগামী কাল বলা হয়, তাহলে আপনারা চিন্তা করুন এই ধরণের সংস্কৃতিবিহীন স্বরাজ্যের কী লাভ? একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না যে এ ধরণের অবস্থার উদ্ভব হবেনা। বিগত গোল-টেবিল বৈঠকে উত্তরের হিন্দুস্থানকে 'পাকিস্তান' বানাবার প্রস্তাব তোলা হয়েছিল। হাওয়া কোন দিকে বইছে, তার অনুমান আপনারা করতে পারেন। আজ হিন্দুসমাজে সব থেকে বড় অভাব হল পরস্পরের সাহায্য করার মনোভাবের। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এই অভাবই দূর করতে চায়।"

ডাক্তারজীর অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু শ্রীমন্ত রাজা লক্ষ্মণরাও ভোঁসলের মৃত্যুর পরে সরকারের পরোক্ষ চাপের কারণে হাতিখানার সঙ্ঘ শাখা সেখান থেকে সরিয়ে নিতে হল। রাজা লক্ষ্মণরাও-এর জীবিতকালেও তাঁর উপর বার-বার চাপ আসত যে তিনি যেন সঙ্ঘকে সমর্থন না করেন। "সঙ্ঘের রাজনীতির ঝামেলায় পড়ছেন কেন?" এই রকম প্রশ্ন করে তাঁকে মাঝে-মাঝে ভয় দেখাবার চেষ্টা করা হত। কিন্তু তিনি সর্বদা স্পষ্ট ভাষায় মুখের মত জবাব দিতেন "এটা ধর্মের কাজ, এবং যেখানে ধর্ম সেখানে আমি অবশ্যই থাকব।" এই দৃঢ়তার সামনে সরকারের সব কৌশল ব্যর্থ হয়ে যেত। কিন্তু রাজা লক্ষ্মণরাও-এর মৃত্যুর পর হাতিখানার দখল নেবার এবং সঙ্ঘকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করার সুযোগ গ্রহণ করা হল। ফলে শাখা তুলসীবাগে চালানো হতে লাগল। ঐ স্থানটিও ভোঁসলেদের পরিবারের অধিকারভুক্ত ছিল। ডাক্তারজী জানতেন যে আজ নয়তো কাল এখান থেকেও সরে যেতে হবে। এই কারণে ডাক্তারজী নাগ নদীর ওপারে রেশমবাগে প্রায় সোয়া দুই একর স্থান জনৈক চাষীর কাছে থেকে সাত শো টাকা দিয়ে কিনে নিলেন। ১৯৩৩-এর শেষে সঙ্ঘের অনেক কার্যক্রম এই উন্মুক্ত তথা বিস্তৃত মাঠে অনুষ্ঠিত হতে শুরু হল।

ডিসেম্বর মাসেই ডাক্তারজীর বিপ্লবী সহকর্মী শ্রী রামলাল বাজপেয়ী সতের বছর পরে বিদেশ থেকে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে দেশে এলেন। নাগপুরে তাঁদের দুজনের মধ্যে অনেকবার দেখা-সাক্ষাৎ হল এবং দেশের সমগ্র পরিস্থিতি নিয়ে দুজনের মধ্যে খুব মন খুলে আলোচনা হল। ডাক্তারজী তাঁর বন্ধুকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শারীরিক তথা সৈনিক শিক্ষণ, প্রার্থনা, বৌদ্ধিক বর্গ ইত্যাদি সব কার্যক্রম দেখালেন। বিশ্বের রাজনৈতিক টানাপোড়েনে এমন সুযোগও আসে যখন পরাধীন দেশ অনুশাসিত তথা আজ্ঞা পালনের শক্তির সদ্ব্যবহার করে বিদ্রোহ করতে পারে। কিন্তু এইরূপ বিদ্রোহের সামর্থ্যের সিদ্ধতা যদি পূর্ব-যোজনানুসারে না হয়, তাহলে আগুন লাগার পর কূপ খননের মত যথাসময়ে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইতিহাসের এই অভিজ্ঞতা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে ডাক্তারজী যে

অত্যন্ত সতর্কতা ও চাতুর্যের সঙ্গে প্রচেষ্টা করছিলেন, তা দেখে তাঁর বন্ধু শ্রীবাজপেয়ীর মনে অত্যন্ত আনন্দ হল।

রাজনৈতিক আন্দোলনের অস্থির পরিস্থিতির এখন কিছুটা পরিবর্তন ঘটছিল এবং নেতারা নিজ দলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অবলোকনের সুযোগ ও সময় পেতে শুরু করেছিলেন। সেই সময়ে মধ্যপ্রান্তে দেখা গেল কংগ্রেসের অনেক প্রমুখ কার্যকর্তা বিভিন্ন স্থানে সঙ্ঘের কাজে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সংলগ্ন আছেন। কংগ্রেস নেতাদের এটা ভালো লাগেনি। মহাত্মাজীর কেন্দ্র ওয়ার্ধায় শ্রী আপ্পা জোশী প্রান্তীয় কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু গত দু-চার বছর যাবৎ তিনি সঙ্ঘের কাজে সংলগ্ন ছিলেন, এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের কারণে সমগ্র জেলার স্বরূপই বদলে যাচ্ছিল। সেই কারণে কয়েক জন চেষ্টা শুরু করে দিলেন যাতে সঙ্ঘের কাজ কংগ্রেসের পরিপূরক হয়ে উঠে অথবা যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে অন্ততঃপক্ষে তার পথে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি যেন না করে।

ওয়ার্ধার শেঠ যমুনালাল বাজাজ, ডাঃ মুঞ্জে ও ডাঃ হেডগেওয়ারের কাছে সঙ্ঘ, মহাসভা ও কংগ্রেসের লক্ষ্য ও নীতির পারস্পরিক সম্পর্ক জানার উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্নাবলী প্রেরণ করলেন। তার মধ্যে অস্পৃশ্যতা নিবারণ, খাদি, কংগ্রেসের কার্যক্রম, মহাসভা ও সঙ্ঘের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন ছিল। দাদা ধর্মাধিকারীর এ কথাও স্মরণ আছে যে একই সময়ে শ্রী যমুনালাল বাজাজ ব্যারিস্টার মোরোপন্ত অভ্যঙ্করের নিকট সঙ্ঘ ও মহাসভার সম্পর্কের বিষয় তদন্ত করার জন্য পত্র লিখেছিলেন। ডাক্তারজী শ্রী যমুনালাল বাজাজকে উত্তরে লেখেন যে আপনার পত্রের লিখিত উত্তর প্রেরণ করা কঠিন। আপনার সুবিধামত দেখা করতে আসুন, অথবা আদেশ করেন তো ওয়ার্ধাতে গিয়ে দেখা করি। সঙ্ঘের বিষয়ে সাধারণের মনে কী কী প্রশ্ন এবং সে গুলি সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত বক্তব্য কী একথা বলার জন্য ডাক্তারজী তাঁর কাছে যে স্বয়ংসেবকেরা আসতেন তাঁদের উক্ত প্রশ্নাবলীর প্রতিলিপি পাঠিয়ে উত্তর লিখতে বলতেন। ডাক্তারজী সর্বদাই বলতেন যে স্বয়ংসেবকেরা যেন তাত্ত্বিক বাদ-বিবাদে কখনই না জড়িয়ে পড়েন, যা কখনই শেষ হয় না। কিন্তু তাঁর প্রত্যাশা থাকত যে স্বয়ংসেবকদের যেন আমাদের বিশুদ্ধ ভূমিকার এতখানি জ্ঞান অবশ্যই থাকে যে তাঁরা অন্যের বুদ্ধি ভেদ করার উদ্দেশ্যে উত্থাপিত প্রশ্নের সামনে হতপ্রভ না হয়ে পড়েন। এই কথা চিন্তা করেই তিনি উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর স্বয়ংসেবকদের কাছে চেয়েছিলেন।

ডাক্তারজীর পত্র পাওয়ার পর বুধবার, ৩১ জানুয়ারী ১৯৩৪ তারিখের সকালে শেঠ যমুনালাল বাজাজ নাগপুরে এসে ডাঃ মুঞ্জে ও ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্গে পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করলেন। শেঠজীর সঙ্গে শ্রীগণপতরাও টিকেকর ও কুমারী তারাবেনও ছিলেন। এই সাক্ষাৎকারে ডাক্তারজী পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে সঙ্ঘ রাজনীতি থেকে অলিপ্ত এবং কোন সংস্থার বিরোধী নয়। খাদির সঙ্গে তাঁর বিরোধিতা নেই এবং অস্পৃশ্যতাকে সঙ্ঘ পুরোপুরি অস্বীকার করে। খাদি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলেন, "যাঁরা খাদির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা পোষণ করেন এবং খাদি ছাড়া অন্য কোন বস্ত্র স্পর্শও করেন না, তাঁদের গণবেশে খাকি খাদি ব্যবহারের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। খাদির মাধ্যমে স্বরাজ্য লাভ করা যাবে, অথবা অর্থনীতির

দিক থেকে সেটা বাজারে টিকে থাকতে পারবে, তা আমরা মনে করিনা। সেই সঙ্গে স্বদেশী মিলের বস্ত্রের বহিষ্কার করা মারাত্মক হবে, কারণ এর ফলে বিদেশী বস্ত্র এবং স্বদেশী মিলের বস্ত্রকে একই মানদণ্ডে ওজন করা হয়। বস্তুতঃ মিলের কাপড় পনের আনাই স্বদেশী হয়। সঙ্ঘ স্বদেশীর পৃষ্ঠপোষক হওয়ার দরুন বিদেশী বস্ত্রের খাকি গণবেশকে স্বীকার করেনা।''

এই সাক্ষাৎকারে সঙ্ঘের ভূমিকা পরিষ্কার বুঝিয়ে দেবার জন্য ডাক্তারজী সঙ্ঘের লিখিত বিধান পাঠ করে শোনান, সেই কারণে অনেক প্রশ্নের আপনা থেকেই সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু শেঠজীর দেড় ঘন্টা ব্যাপী সম্ভাষণে একটি কথা ঘুরে ফিরে আসছিল যে ''সঙ্ঘ কংগ্রেসের বিরোধিতা করে।'' একথায় ডাক্তারজী আলোচনা সমাপ্ত হবার পূর্বে, কংগ্রেস কার্যকর্তারা কীভাবে সঙ্ঘের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে মানুষের মনকে কলুষিত করেন, সে বিষয়ে একের পর এক প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা শুরু করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন করেন, ''আপনারা নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন যে দু-তিন দিন পূর্বেই আপনাদের মীরাবেন বা তারাবেন সঙ্ঘের বিষয়ে কোন ধারণা না থাকা সত্ত্বেও যা খুশি তাই বলেছেন।'' এ কথা শুনে যমুনালালজী বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন যে ডাক্তারজী এ কথা এত দ্রুত কীভাবে জানতে পারলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কুমারী তারাবেনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তখন ডাক্তারজী তাঁকে নমস্কার করেন। এই সাক্ষাৎকারের পর ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪ তারিখের পত্রে তিনি লেখেন, ''আমি শেঠজীকে সঙ্ঘের বিধান সম্পূর্ণ পাঠ করে শুনিয়ে দিলাম। এর ফলে তাঁর প্রশ্ন অনেক কমে গেল। শুধু এটুকু কথাই অবশিষ্ট রইল যে সঙ্ঘ কংগ্রেসের বিরোধিতা করে। কিন্তু আমি প্রমাণ সহ তাঁর নিকট এই তথ্য উপস্থাপন করলাম যে সঙ্ঘ কংগ্রেসের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেনা, বরং কংগ্রেসের বড়-বড় ব্যক্তিরাই সঙ্ঘের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন, এবং পরে যাতে এরকম না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে বললাম।''

ডাঃ মুঞ্জে শেঠজীকে পরিষ্কার বলে দেন যে সঙ্ঘ ও মহাসভা দুইটি পৃথক সংস্থা। তিনি একথাও বলেন যে সঙ্ঘ কংগ্রেসের বিরোধিতা করে এটা আপনাদের ভুল ধারণা এবং তাঁকে পরামর্শ দেন যে কংগ্রেসের বিশাল দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে কাজ করা উচিত। একটি পত্রের দ্বারা একথাও জানা যায় যে সাক্ষাৎকারের পরে ডাক্তারজী শ্রী বাজাজকে তাঁর প্রশ্নগুলির উত্তর লিখে শ্রী আপ্পাজী জোশীর মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার কোন প্রতিলিপি আজ আর কোথাও পাওয়া যায়না।

এই বছর ডাক্তারজী মহারাষ্ট্রে প্রচারের জন্য সাংলীতে শ্রী গোপালরাও য়েরকুন্টওয়ার, পুনাতে শ্রী দাদারাও পরমার্থ এবং খান্দেশে শ্রী বাবাসাহেব আপ্‌টেকে পাঠান। এ পর্যন্ত শুধু সঙ্ঘেরই কাজ করার জন্য প্রচারক-বর্গ তৈরী করা হয়নি। এটা ছিল তার সূত্রপাত। শ্রী পরমার্থ তাঁর ভাবুকতাপূর্ণ এবং ওজস্বী বক্তৃত্বের দ্বারা পুনাতে ভাল প্রভাব স্থাপন করেন এবং শ্রী বাবা সাহেব আপ্‌টের মননশীল প্রচারের কারণে খান্দেশে সঙ্ঘকার্যের প্রগতি হতে থাকে। ডাক্তারজী এ কথা উপলব্ধি করেছিলেন যে হিন্দুস্থানের মত পদদলিত দেশের পুনরুদ্ধার শুধু মাত্র অবসর সময়ে সমাজকার্য করার মানুষদের ভরসায় সম্পন্ন হতে পারে না। এই দৃষ্টি নিয়ে তিনি নিজের চতুর্দিকে একত্রিত তরুণদের মনের উপর সর্বদা এই উদাত্ত

সংস্কার দিতে থাকেন যে সমাজের জন্য ঈশ্বর-প্রদত্ত গুণসমূহ তথা সামর্থ্যকে বর্ধিত করে তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রোদ্ধারের জন্য আত্মোৎসর্গের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নিহিত। এই সংস্কারের শক্তিতেই এমন তরুণরা এগিয়ে আসতে থাকল যারা নিজেদের সম্পূর্ণ সামর্থ্য ও জীবন সঁপে দিয়ে সঙ্ঘকার্য করার মধ্যেই আনন্দ লাভ করত।

এই সব কাজ করার সময়েও ডাক্তারজীর দৃষ্টি সরকারী পরিপত্রকের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করার দিকে নিবদ্ধ ছিল। ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে মধ্যপ্রান্ত কাউন্সিলের অধিবেশন হবার কথা ছিল। তার পূর্বেই কাউন্সিলের বিভিন্ন সভাসদদের সঙ্গে দেখা করে ডাক্তারজী তাঁদের এজন্য প্রস্তুত করলেন যাতে তাঁরা সঙ্ঘের প্রতি সরকারের নীতির জবরদস্ত প্রতিরোধ করেন। সেই সঙ্গে সরকারের যোজনাকে ব্যর্থ করার ব্যাপারে তিনি অনেক উকিলদের সঙ্গে আইন-সংক্রান্ত পরামর্শও গ্রহণ করেন। এই সমস্ত প্রয়াসের সুফল ক্রমশঃ দেখা যেতে থাকে। মার্চ মাসের পূর্বেই অকোলার জেলা কাউন্সিলের এবং ওয়ার্ধা, উমরেড, সাবনের, কাটোল, ভাণ্ডারা ইত্যাদি স্থানের নগরপালিকাগুলি সরকারের নীতির বিরোধিতা করে এবং সঙ্ঘের বিরুদ্ধে জারি করা অন্যায়মূলক পরিপত্রক প্রত্যাহার করার দাবী সম্বলিত প্রস্তাব গ্রহণ করে।

১৯৩২-এর ডিসেম্বর মাসে নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত সরকারী পরিপত্রক জারি করা হয়েছিল। সংবাদপত্র সমূহে এবং জনসভাগুলি কর্তৃক এর কঠোর বিরোধিতা এবং সমালোচনার এমন পরিণাম সরকারের উপর হল যে ১৯৩৩ সালে উক্ত পরিপত্রক পুনরায় প্রচার করার সময়ে সঙ্ঘের উপর থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিযোগ প্রত্যাহার করে শুধু সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগের উল্লেখ করা হয়। এ সম্বন্ধে ডাক্তারজী একটি পত্রে লেখেন, "সরকারকে রাজনৈতিক আন্দোলন সংক্রান্ত নিজেদের বিধান প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছে, এবং এখন সঙ্ঘ 'কমিউনাল' এটুকুই তাদের শিশু-সুলভ বক্তব্য। সঙ্ঘকে ওরা পছন্দ করেনা এবং তার উপর দোষারোপও করতে পারেনা। আমাদের অহিত চিন্তাকারীদের আজ বিচিত্র অবস্থা হয়েছে।"

ডাক্তারজী এব্যাপারে ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন যে মধ্যপ্রান্ত বিধানসভার অধিবেশনে সরকারের সম্মুখে তার সঙ্ঘ-বিরোধী পরিপত্রকের কারণে বিক্ষুব্ধ জনমত যে পরিব্যক্ত হয়, তদনুসারে ৩রা মার্চ, ১৯৩৪-এর বিধানসভায় উত্তেজিত প্রশ্নোত্তর পাঠ চলল। কোন সরল সাদাসিধা ব্যক্তিকে যখন কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক চারদিক থেকে ঘেরাও করে নির্যাতন করতে শুরু করে দেয়, তখন তার যে রকম করুণ অবস্থা হয়, ঐ রকম অবস্থা হল সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী রাও-এর। "সাম্প্রদায়িক সংস্থার ব্যাখ্যা কী?" কোনও মুসলিম সংস্থা কি সাম্প্রদায়িক? "এই পরিপত্রক কোন্ বিভাগের পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে?" ইত্যাদি নানা প্রশ্ন একের পর এক জিজ্ঞেস করা হতে লাগল। প্রশ্নের এই ঝঞ্ঝাবাত্যার মাঝে সিহোরার শ্রী কাশীপ্রসাদ পাণ্ডে জিজ্ঞেস করলেন, " এ কথা কি সত্য যে মধ্যপ্রান্তের জনৈক প্রাক্তন মন্ত্রী রাঃ স্বঃ সঙ্ঘের সভাপতি হয়েছিলেন?"

"আমি তো একথা এখনই জানতে পারলাম," স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী রাও উত্তর দিলেন।

"সরকারের নিকট কি সিঃ আইঃ ডিঃ রিপোর্ট পাঠায়নি?"

"সিঃ আইঃ ডিঃ-র রিপোর্ট এসে থাকতে পারে। কিন্তু আমার কাছে এটাই বিচিত্র মনে হচ্ছে যে মধ্যপ্রান্ত সরকারের কোন ভূতপূর্ব মন্ত্রী তাঁর কার্যকালের মধ্যেই সঙ্ঘের উপর সরকারী বহিষ্কার থাকা সত্ত্বেও উক্ত সংস্থার সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন।"

"সরকার সঙ্ঘকে কবে থেকে বহিষ্কার করে?"

"এই প্রশ্নের আমাকে আগাম নোটিশ দিতে হবে।"

'বহিষ্কার' শব্দটি আপনারা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করবেন না। আমি ব্যাপক অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করেছি।"

শ্রীরাও যখন এই ধরণের শাব্দিক সার্কাস করছিলেন, তখন শ্রী বাবাসাহেব খাপর্ডে জিজ্ঞাসা করলেন, "সঙ্ঘের কোন নীতি অথবা কার্যক্রম সরকার আপত্তিজনক মনে করে?" এই প্রশ্ন নিয়ে যে বাদ-বিসম্বাদ চলে, তা থেকে সে সময়ের বাতাবরণের পর্যাপ্ত ধারণা লাভ করা যায়।

"সঙ্ঘের সূত্রধরদের ভাষণগুলি থেকে প্রতীত হয় যে তারা নিজেদের সম্মুখে জার্মাণীর হিটলার শাহী তথা নাজিবাদের ধ্যেয় ও কার্যপদ্ধতিকে আদর্শ রূপে স্বীকার করেছেন।"

"সঙ্ঘের সঞ্চালক কারা?"

"একজন তো ডাক্তার হেডগেওয়ার, এবং দ্বিতীয় জন, আমার মনে হয়, ডাঃ মুঞ্জে হবেন।"

"আচ্ছা। সঙ্ঘের কাজের কোন অংশ আপনাদের কাছে আপত্তিকর বলে মনে হয়েছে?"

"সঙ্ঘের চালকরা হিটলার তথা নাজীবাদকে অনুকরণ করতে চান, তাঁদের ভাষণ শুনেই তা মনে হয়না কি?"

"এই অভিযোগ আপনি তাঁদের ভাষণগুলি থেকে প্রমাণ করতে পারেন কি?"

"ডাক্তার হেডগেওয়ারের নাগপুরের একটি ভাষণের উদ্ধৃতির ভিত্তিতেই আমি এ কথা বলেছি।"

"সেই উদ্ধৃতি একটু আমাদের পাঠ করে শুনিয়ে দিন।"

এই দাবী শুনে শ্রীরাও অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। তখন সভাপতি মহাশয় বললেন, "এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে।" এইভাবে প্রশ্নটিকে পরবর্তীকালের জন্য এড়িয়ে গিয়ে সরকারের লজ্জা রক্ষার বিফল প্রয়াস করা হল।

তখনই আর একটা প্রশ্ন করা হয়, "এই সঙ্ঘ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?"

শ্রী রাও, "১৯১৮ সালে।"

"তাহলে সরকারের সঙ্ঘকে বহিষ্কার করতে এত বছর কেন লাগল?"

"কারণ সঙ্ঘের কাজ যে আপত্তিজনক সে কথা সরকারের এখন নজরে এসেছে।"

"সরকার কি স্থানীয় স্বায়ত্ব সংস্থাগুলির উপর এই পরিপত্রক পালনের জন্য চাপ দেবে?"

"আমরা পরিপত্রকের দ্বারা স্থানীয় স্বায়ত্ব-সংস্থাগুলিতে পরামর্শ দিয়েছি। সেটা আদেশ নয়।"

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে একথা স্বীকার করিয়ে নেওয়া হল যে পরিপত্রক পরামর্শ মাত্র, আদেশ নয়, একথাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে সরকার সঙ্ঘের উৎপত্তি, সঞ্চালক ইত্যাদি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানেনা এবং নাজীবাদ সম্বন্ধে ডাক্তার হেডগেওয়ারের ভাষণে তাহা মিথ্যা উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেকে হাস্যকর প্রমাণিত করা ভিন্ন আর কিছু করতে পারেননি। ডাঃ রাও-এর মত আজও সত্য ও অহিংসার কথা উল্লেখকারী অনেক কংগ্রেসী নেতা ডাঃ গোয়েবল্‌সের পদাঙ্ক অনুসরণ করে 'ডাক্তার হেডগেওয়ার জার্মানী গিয়েছিলেন'—এই অপ-প্রচার করতেও পিছপা হন না।

এই প্রশ্নোত্তর চলার সময়ে ডাক্তারজী দর্শকাসনে বসে ভবনের মধ্যে মাঝে-মাঝে যে অট্টহাস্যের ফোয়ারা উঠছিল তার আনন্দ উপভোগ করছিলেন। সভার কাজ শেষ হবার সঙ্গে -সঙ্গে ডাক্তারজী সেই সমস্ত সদস্যদের অভিনন্দন জানান যাঁরা সরকারের দুরভিসন্ধিপূর্ণ নীতির মুখোস ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেন।

৭ই মার্চ তারিখে ডাক্তার হেডগেওয়ারের এক সময়ের শিক্ষক ভাণ্ডারার শ্রী বাবাসাহেব কোলতে সরকারী পরিপত্রকের বিরুদ্ধে একটি ছাঁটাই প্রস্তাব (কাট্-মোশন) উত্থাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাম্প্রদায়িকতার ব্যাখ্যা করতে পারেননি একথার উল্লেখ করে বলেন, ''সমাজের সুস্থিতি, তরুণদের শারীরিক বিকাশ এবং অনুশাসন — এই তিনটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কাজ করে চলেছে। হিন্দুস্থানে যখন সকল জাতি নিজেদের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়েছে তখন হিন্দুদের প্রচেষ্টার উপর সরকার কেন আঘাত হানছে? এটা তো প্রত্যেক সমাজের জন্মসিদ্ধ অধিকার। সরকারী কর্মচারীদের গতিবিধি এবং স্বাধীনতার উপর এইভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আপনারা তাদের একেবারে ক্রীতদাস করে রাখতে চাইছেন।''

এই ছাঁটাই প্রস্তাবের সমর্থনে অনেকগুলি আবেগপূর্ণ বক্তৃতা হল। বক্তাদের মধ্যে অ্যাডভোকেট শ্রী তুঃজঃ অর্থাৎ নানাসাহেব কেদার, শ্রীমতী রমাবাঈ তাম্বে, বাবাসাহেব খাপর্ডে, উম্মেদসিংহ ঠাকুর, মঙ্গলমূর্তি, সিঃ বিঃ পারেখ, রহমান ও ফুলের বক্তৃতা ছিল উল্লেখযোগ্য। সবগুলি বক্তৃতাই উপযুক্ত ও চিত্তাকর্ষক হওয়া সত্ত্বেও বিস্তারের আশংকায় সেগুলির কিয়দংশমাত্র এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হবে। এর থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে সরকারের বিরোধিতা করার জন্য ডাক্তারজী কীভাবে, পরস্পর-বিরোধী চিন্তাধারার ব্যক্তিদেরও নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্য দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে এ কথাও দেখা যাবে যে সঙ্ঘের অনেক সমর্থকেরও সঙ্ঘ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল না। কিন্তু ডাক্তারজীর প্রতি ভালবাসার কারণে তাঁরা সরকারের বিরোধিতা করার জন্য উদ্যত হয়েছিলেন।

শ্রী কোলতের বক্তৃতার পর মধ্যপ্রান্তের মুখ্য সচিব শ্রী রফ্‌টন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা করে বলেন, ''সঙ্ঘের উদ্দেশ্য 'হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান' অত্যন্ত সংকুচিত ও সাম্প্রদায়িক।'' এর উত্তরে শ্রীনানা সাহেব কেদার বলেন, ''হিন্দু ধর্ম সর্বাধিক সহিষ্ণু। যদি কোন হিন্দু বলে যে হিন্দুস্থান কেবলমাত্র হিন্দুদের জন্য, তাহলে নিশ্চয়ই তাকে টাক্‌লি লাইনের কাছে পাঠানো উচিত।'' টাক্‌লি লাইনের কাছে নাগপুরের পাগলা গারদ অবস্থিত। সেই

অর্থেই শ্রী কেদার একথার উল্লেখ করেছিলেন, অর্থাৎ শ্রী কেদারের দৃষ্টিতে 'হিন্দুদের হিন্দুস্থান' বলাটা পাগলের প্রলাপের অনুরূপ বক্তব্য।

শ্রী কেদারের এই চিন্তা তৎকালীন সর্বসাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিদের ধারণার অনুরূপই ছিল। হিন্দুস্থানে বসবাসকারী হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ইত্যাদি সকলেরই এই হিন্দুস্থান — এইরূপ রাষ্ট্রঘাতক তথা বিকৃত ধারণা ইংরেজরা জনসাধারণের মাথায় এমনভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে তাদের কাছে 'হিন্দুদের হিন্দুস্থান' কথা নেহাতই পাগলের প্রলাপ বলে মনে হত। শ্রী কেদার তাঁর বক্তব্য সঙ্ঘের স্তুতি করার পরিবর্তে তার নিন্দাই করেন, সে কথা সভাগৃহে উপস্থিত ডাক্তারজী এবং সঙ্ঘের তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে সুপরিচিত দু-চার জন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারোর মনে হয়নি। এর থেকে ঐ সময়ের সমাজের আত্ম-বিস্মৃতির সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। শ্রী কেদারের বক্তব্য শুনে অন্যদের সঙ্গে দর্শকাসনে উপবিষ্ট ডাক্তারজীও হেসে থাকবেন। কিন্তু দুইটি হাসির মধ্যে কত পার্থক্য ছিল।

শ্রী রহমান সঙ্ঘের সমর্থনে তাঁর বক্তৃতায় এই পরামর্শ দিয়েছিলেন যে "রাজনৈতিক সংগঠনগুলির দিকে মনোনিবেশকারীদের একথা মনে রাখা উচিত যে তাঁদের সংগঠন যেন আক্রামক তথা সামরিক মনোভাব সম্পন্ন না হয়ে পড়ে।" শ্রী ফুলে প্রশ্ন করেন, "প্রান্তের ব্রাহ্মণেতর এবং মুসলমানদের কাজের উপর এই পরিপত্রক কেন লাগু করা হয়না?" তিনি আরো দাবী করেন, "অসংগঠিত হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ হবার সুযোগ দিতে হবে।" বাবা সাহেব খাপর্ডেই শুধু সুস্পষ্ট তথা সুষ্ঠুভাবে একথা প্রতিপাদন করেন যে 'হিন্দুদের হিন্দুস্থান' সম্বন্ধে সঙ্ঘের চিন্তাধারা কী রকম তর্কশুদ্ধ এবং উপযুক্ত। ডাক্তার হেডগেওয়ার-এর সঙ্ঘের হিটলারের নাজী সংগঠনের সঙ্গে সরকার যে কষ্টকল্পিত সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে তাকে পরিহাসের সুরে তিনি বলেন, "ডাক্তার হেডগেওয়ারের একটি স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ আছে এবং হের হিটলারেরও একটি স্বয়ংসেবক দল আছে। অতএব ডাক্তার হেডগেওয়ার হলেন হের হিটলার। এ বিচিত্র ও বিভ্রান্তকারী যুক্তি। আমি কটু শব্দ-প্রয়োগ করতে চাইনা। কিন্তু ডাক্তার হেডগেওয়ারের যেমন একটি স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ আছে, তেমনই খিলাফৎ পন্থীদেরও স্বয়ংসেবক দল আছে। তাহলে খিলাফৎপন্থীদের হেডগেওয়ার বা হিটলার বলা হবেনা কেন?"

নাগপুরের 'মহারাষ্ট্র' যে সংবাদ প্রকাশিত করে তদনুসারে খাপর্ডে সরকারের আরো তিক্ত ভাষায় উপহাস করেছিলেন বলে মনে হয়। সরকারের যুক্তিকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করে দেবার জন্য শ্রী খাপর্ডে বলেন, "....আমার মুশকিল হল এই যে আমি আমার তর্কশাস্ত্রের জ্ঞান ভুলে যাইনি, কিন্তু সরকারের তর্কশাস্ত্রের দিকে একটু তাকিয়ে দেখুন। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে তোর বাবার লম্বা গোঁফ ছিল, আর আমারও লম্বা গোঁফ অতএব আমি তোর....।"

দিনাংক ৭,৮,৯ তিন দিন যাবৎ এ বিষয়ে বিতর্ক চলে এবং পরিশেষে শ্রী কোলতের ছাঁটাই প্রস্তাব গৃহীত হল। সরকারের জবরদস্ত পরাজয় ঘটল। সরকারের পরিপত্রকের কোন পরিণাম সঙ্ঘের প্রতিদিনের কাজে, আগেই হয়নি, কিন্তু সরকারের বক্র দৃষ্টির দরুন সর্বসাধারণের মনে যেটুকু ভয় ও দ্বিধার সৃষ্টি হয়েছিল, তার জন্য সরকারের এই পরাভবের পর আর কোন স্থান

অবশিষ্ট রইলনা। এই ঘটনার পরে রাও মন্ত্রিমণ্ডলের পতন ঘটল। সঙ্ঘের দৃষ্টিতে এরও অনুকূল পরিণাম হল।

এই ভাবে মধ্যপ্রান্তে সঙ্ঘের উপর যে সংকট এসেছিল তার অবসান ঘটল ঠিকই, কিন্তু ডাক্তারজীর একটি পত্রে এই চিন্তা অবশ্য প্রকাশ পায় যে সম্পূর্ণ দেশে সরকারী কর্মচারীদের উপর যে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে, তার প্রতিকার করা যাবেনা। এর থেকে সেই সময়ে তিনি যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন, "...কাউন্সিলের বিগত অধিবেশনে বিতর্কের সময়ে সরকার সঙ্ঘের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি এবং সার্কুলারের বিরুদ্ধে যে ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল, তাতে সরকারের পরাজয় ঘটায় সার্কুলারের কোমর পুরোপুরি ভেঙে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে কারোরই নিজেদের ছেলেদের সঙ্ঘে পাঠাবার ব্যাপারে ভয়ের কোন কারণ নেই। তা সত্ত্বেও যদি কেউ ভয় পায়, তাহলে আমরা ও আপনারা কী করতে পারি?

"মধ্যপ্রান্ত সরকার যদি কিছু গণ্ডগোল করে, তাহলে কাউন্সিলে তার খবর নেবার কিছুটা ব্যবস্থা আমরা করতে পারি। কিন্তু হিন্দুস্থান সরকার সরকারী কর্মচারীদের জন্য যে নিয়ম তৈরী করেছে, তাতে পরিবর্তন কীভাবে করা যাবে? দিল্লী পর্যন্ত আমাদের কথা কেমন করে পৌঁছবে? সম্পূর্ণ ভারতের বড় বড় নেতাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করে তাঁদের দ্বারা এই বিষয়ে বিরোধিতা করানো প্রয়োজন, কিন্তু তাঁদের মনোযোগ তো এখন পারস্পরিক সংঘর্ষে নিবদ্ধ রয়েছে। সরকারী কর্মচারীরা একত্রিত হয়ে এই নিয়মের বিরোধিতা করতে পারেন, কিন্তু তাঁদের কোন ব্যাপারের সঙ্গেই সংস্রব নেই বলে মনে হয়। তাঁদের নিজের পেটটুকু ভরে গেলে বিশ্বের কোন ব্যাপারেই তাঁদের মাথা ব্যথা নেই। খাবার মত দু মুঠো অন্ন পেলেই, সব পাওয়া হয়ে গেছে — এই হল তাদের মনোবৃত্তি। আজ আমরা শুধু এটুকুই করি যে সকলকে পরিষ্কার জানিয়ে দিই যে সঙ্ঘের সঙ্গে ভারত সরকারের নিয়মের কোন প্রকার সম্পর্ক নেই।"

এই পরিস্থিতিতে স্বয়ংসেবকদের বেশী করে উৎসাহিত করার জন্য ডাক্তারজী অনেক পত্র-ব্যবহার করেছিলেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত ভাষণগুলিতেও তিনি সরকারের উপর বিরোধীতা করার ব্যাপারে এতটুকু ফাঁক রাখেননি। নাগপুরে বর্ষ-প্রতিপদ উৎসবে তাঁর ভাষণ এই দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। তাতে তিনি বলেন, ".... শ্রী কোলতে যখন ছাঁটাই প্রস্তাব রাখেন, তার উত্তরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বক্তৃতার সময়ে ১৯৩২ এর পরিপত্রকের সমর্থনে ডাঃ মুঞ্জে এবং স্যার মোরোপন্ত জোশীর ১৯৩৩ সালের বক্তৃতা পড়ে শোনান, তাতে মনে হয় ভূতপূর্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথাও বুঝতে পারেননি যে আপত্তিজনক কী আছে বা কী নেই। সেটা শুধু বর্তমান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীই বুঝতে সক্ষম। মনে হয় যেন ১৯৩২ সালেই সরকার অন্তর্দৃষ্টিতে জানতে পেরে গিয়েছিল যে এক বছর পরে ডাঃ মুঞ্জে ও স্যার মোরোপন্ত জোশী বক্তৃতায় কী বলবেন। এইভাবে সঙ্ঘ ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও তার উল্লেখ ১৯১৮ সালেই সরকারের কাগজে করা হয়ে যায়। ঐ সময়ে নাগপুরে হিন্দু-মুসলমানদের

মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটাও সরকারের বক্তব্য। ১৯১৮ সালে সঙ্ঘের অস্তিত্বই ছিল না এবং সেই বছরে নাগপুরে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনাও ছিল না।

এই সব উল্টো পাল্টা কথা শুনে মনে হয় মধ্যপ্রান্ত সরকারের বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। বলা হয়েছে যে সরকারের উদ্দেশ্য সঙ্ঘের কাজে বাধা সৃষ্টি করা নয়। এর থেকে সরকারের মুখ থেকেই ব্যক্ত হয়েছে যে সঙ্ঘকার্য বেআইনি নয়। তাহলে সরকার তার পরিপত্রক প্রত্যাহার করে নিচ্ছেনা কেন?"

এই প্রশ্নের উপর যে ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয়, তার ফলে যদিও মন্ত্রিমণ্ডল ভেঙে যায় : কিন্তু সরকার তার মিথ্যা মর্যাদার দোহাই দিয়ে পরিপত্রক প্রত্যাহার করেনি। কিন্তু এই ঘটনার পরে ঐ পরিপত্রকের অবস্থা এমনই হয়ে পড়ে যেমন দিনের আকাশে চাঁদের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তা নিষ্প্রভ হয়ে থাকে।

২২. গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

পরমপূজনীয় ডাক্তারজী এক ধরনের সর্বদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি থাকত চতুর্দিকে এবং তার মধ্যে তিনি নিজ কর্তব্য সম্পর্কে সংকল্প গ্রহণ করে তীব্র গতিতে সেই কাজে আত্মনিয়োগ করতেন। ১৯২৪ সালে আর্বীর দাঙ্গার কারণে তাঁর কলকাতার এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মিত্র ডাঃ সঃ নীঃ মোহরীর নাগপুর জেলে আজীবন কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। সব রকম ব্যস্ত জীবনের মধ্যেও ডাক্তারজী নিয়মিত ডাঃ মোহরীরের সঙ্গে দেখা করার সময় করে নিতেন। তাঁর অন্য আত্মীয় ও বন্ধুদেরও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা তিনি করে দিতেন। যাঁকে তিনি 'আপন' বলে গ্রহণ করতেন তার প্রতি নিজ কর্তব্যে কোনরূপ ব্যবধান তিনি আসতে দিতেন না। এই কর্তব্য-দক্ষতার ফলেই যখন ২৮শে ফেব্রুয়ারী ডাঃ মোহরীর কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করলেন, তখন জেলের বাইরে তিনি পা রাখার সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্তারজী তাঁকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে গভীর আলিঙ্গনে জাপটে ধরলেন। তিনি তাঁকে আন্তরিকতার সঙ্গে বাড়ী নিয়ে গেলেন এবং পরের দিন নাগপুরে বহু বিশিষ্ট সজ্জনদের আমন্ত্রিত করে তাঁকে যথাযোগ্যভাবে আপ্যায়িত করলেন। বিভিন্ন শাখাতেও ডাক্তারজী তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। নাগপুরের বর্ষ-প্রতিপদ উৎসবেও ডাক্তারজী তাঁকে অভিনন্দন জানান এবং নিজ বক্তৃতায় তিনি ডাঃ মোহরীরকে যথাসময়ে মুক্তি না দেবার জন্য সরকারের তীব্র ভর্ৎসনা করেন। তিনি বলেন, "…. ডাঃ মোহরীর মোট সওয়া আট বছর দণ্ডভোগের পর সম্প্রতি মুক্তিলাভ করেছেন। জেলের নিয়মানুযায়ী তাঁর মুক্তি আরো পূর্বেই হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আজকাল মধ্যপ্রান্ত সরকারের চক্র কী রূপ বক্রগতিতে ঘোরে একথা সকলেই জানে।"

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দৃষ্টিতে এই সময়ে এক মহত্ত্বপূর্ণ ব্যক্তি ডাক্তারজীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসছিলেন, এবং তিনি ছিলেন বর্তমান সরসঙ্ঘচালক শ্রী মাধবরাও গোলওয়ালকর। ১৯৩৩-এর জুনে তিনি কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে নাগপুরে বসবাস শুরু করেছিলেন। এখানে তিনি তাঁর মামা শ্রী বালকৃষ্ণ পন্ত রায়করের গৃহে থাকতেন। তাঁর মাতা-পিতা তখন রামটেকে ছিলেন।

ডাক্তারজীর অনুপ্রেরণায় শিক্ষা গ্রহণের জন্য শ্রীভাইয়াজী দাণী, বাবুরাও তেলঙ্গ এবং তাত্যারাও তেলঙ্গ ইত্যাদি প্রমুখ কার্যকর্তারা কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন, এবং তাঁদেরই চেষ্টায় কাশীতেই শ্রী গোলওয়ালকর সঙ্ঘের সম্পর্কে এসেছিলেন এবং ক্রমে সেই সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়ে উঠেছিল। অধ্যাপক গোলওয়ালকর যে কোন বিষয়ে অত্যন্ত সহজবোধ্য পদ্ধতিতে অধ্যাপনায় কুশলী ছিলেন। সেই সঙ্গে অর্থের মোহ তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি। এর ফলে অনেক ছাত্র তাঁর উপর নির্ভরশীল ছিল। তাঁর প্রীতিপূর্ণ মিশুক স্বভাব সহজেই সকলকে

আকৃষ্ট করে নিত। নিজ মিষ্ট স্বভাব ও গুণের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গুরুজী' নামে বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীগুরুজীর কুশাগ্র বুদ্ধি, অনলস সেবার মনোভাব এবং সকল কাজকর্মে তীক্ষ্ণধী চটপটে স্বভাব ও দক্ষতা তাঁর সান্নিধ্যে আগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে মুগ্ধ করে তুলত। তিনি যে বিষয়টি হাতে নিতেন তার গভীরে প্রবেশ করতেন। সেই কারণে কাশীতে থাকাকালীনই তিনি সঙ্ঘের মর্ম উপলব্ধি করে তার কাজের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে এই সময়ে ডাক্তারজী তাঁকে কী ভাবে নাগপুরে ডাকিয়ে আনেন এবং নাগপুর, ভাণ্ডারা, উমরেড, রামটেক প্রভৃতি শাখা পরিদর্শন করিয়ে সঙ্ঘের সুস্পষ্ট ধারণা তাঁকে অবগত করাবার চেষ্টা করেন।

এইভাবে এক সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত পঁচিশ-ছব্বিশ বছর বয়স্ক তরুণ কার্যকর্তা নাগপুরে থাকতে এলেন, এটা ডাক্তারজীর পক্ষে আনন্দের বিষয় ছিল। শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সহজেই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর তখন স্নাতকরা সমাজের বিশেষ সম্মান লাভ করত। আর এ ধরণের তরুণ যদি নিজ আচার-আচরণের মাধ্যমে সঙ্ঘকে নিজ জীবনে ব্যক্ত করতে শুরু করে, তাহলে ডাক্তারজীর আশা ছিল, সমাজও দ্রুততার সঙ্গে এই কার্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকবে। সেই কারণে শ্রী মাধবরাও-এর প্রতি তিনি বিশেষ আশার দৃষ্টি নিয়ে দেখতেন। নাগপুরে আসার পর শ্রী গুরুজী মাতা-পিতা ও বন্ধুদের আগ্রহে এল এল বি পড়তে শুরু করে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি সঙ্ঘেরও কাজ করতেন। সঙ্ঘ-কার্যের নিমিত্ত ডাক্তারজীর বাড়ীতে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত চলত এবং মাঝে মাঝে সঙ্ঘের তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে আলোচনাও হত। ১৯৩৪-এ জুন মাসে ডাক্তারজী অকোলার জেলা সঙ্ঘচালক শ্রী বাবাসাহেব চিতলে এবং শ্রী গুরুজীকে বোম্বাই-তে সঙ্ঘের প্রচার কার্যের জন্য পাঠালেন। তাঁরা সেখানে প্রায় এক মাস থেকে সঙ্ঘের কাজ শুরু করে দিলেন। পরেও যাতে কাজ সুষ্ঠুভাবে চলে, তারজন্য তাঁদের দুজনের ফিরে আসার পূর্বেই ডাক্তারজী শ্রী গোপালরাও এরকুন্টবারকে প্রচারক রূপে নিযুক্ত করেন। অকোলার শিক্ষণ বর্গ এবং বোম্বাই-এ শ্রীগুরুজী সঙ্ঘের কাজ এবং সমাজের অবস্থা, দুয়েরই নিকট থেকে পরিচয় লাভ করেন। এর পর তাঁকে নাগপুরের মুখ্য শাখার কাজ তথা দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ডাক্তারজীর স্বাস্থ্য এখন আর তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করছিল না। ডাক্তাররা বিশ্রামের পরামর্শ দিলেন। সহকর্মীরাও আগ্রহ করলেন, কিন্তু ডাক্তারজী কারো কথাই কানে তুলছিলেন না। অবশেষে অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে পড়ায় নিরুপায় হয়ে তাঁকে সহকর্মীদের যোজনা অনুসারে নাগপুর শহরের বাইরে অম্বাঝরী মার্গে শ্রীকৃষ্ণরাও পাণ্ডুরঙ্গ বৈদ্যের বাংলোতে বিশ্রামের জন্য যেতে হল। সেখানে মুক্ত জলবায়ু এবং সুব্যবস্থা ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁর স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি দেখা গেলনা, কারণ বিশ্রাম ছিল শুধু নামেই। পরিভ্রমণের দৌড়াদৌড়ি না থাকলেও এবং নিয়মানুসারে ঔষধ উপচারও চলছিল। কিন্তু তাঁর মন তাঁকে নিশ্চিন্ত থাকতে দিতনা। বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত চিঠি পত্রের উত্তর দেওয়া এবং নাগপুরের স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে কাজের ব্যাপারে, আলোচনার প্রসঙ্গে কোন ছেদ পড়েনি। প্রায় দু-তিন মাস তিনি শ্রীবৈদ্যের বাংলোতে ছিলেন। এই সময়ে বহু কার্যকর্তা সেখানে আসতেন, তা দেখে অনেকের

বেশ আশ্চর্যই লাগত। শুধু ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে ও তাঁর মুখ থেকে দু-চার কথা শোনার জন্য এত দূর স্বয়ংসেবকেরা হেঁটে আসত, এটা সকলের কাছেই অভূতপূর্ব মনে হত। কিন্তু ডাক্তারজীর সাহচর্যের মধ্যে এমনই আকর্ষণ ছিল যে যারা সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত তারা তার কল্পনাও করতে পারবেনা।

সেখানে কথা-বার্তা কী রকম চলত, তার অনুমান নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে করা যেতে পারে। একদিন বেশ রাত্রে নাগপুরের বাইরে থেকে আগত জনৈক স্বয়ংসেবক ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, "ডাক্তারজী আছেন কি?" দরজার কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তির মনে হল কেউ বোধহয় কোন রোগীকে দেখাবার জন্য ডাক্তার ডাকতে এসেছে। সে উত্তর দিল, "এখানে একজন ডাক্তার আছেন, কিন্তু তিনি কাউকে ওষুধ দেননা, শুধু কথা বলেন।" কত সত্য ছিল এই বর্ণনা !

বিশ্রামের ঐ অবস্থার মধ্যেও তাঁর সর্বক্ষণ কাজের চিন্তা থাকত। ১৫ই আগষ্ট এক পত্রে তিনি লেখেন, "....সঙ্ঘের কাজ ধীরে-ধীরে করার নয়। যত শীঘ্র সম্ভব সম্পূর্ণ মহারাষ্ট্রকে সংগঠিত করে, অন্যান্য প্রান্তের সম্মুখে তাকে দৃষ্টান্তের আকারে রেখে দশ-পনের বছরে সমস্ত ভারতকে সংগঠিত করতে হবে।" ডাক্তারজীর মনের এই অভিলাষ ছিল। কিন্তু সেই সময়ে সঙ্ঘকার্যের সম্মুখে বাধা-বিঘ্নের পাহাড় সৃষ্টি করার জন্যও কিছু মানুষ মগ্ন ছিল। সঙ্ঘকার্যের বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে "হিন্দুদের হিন্দুস্থান" — এই নীতির প্রতি জনমন অধিকাধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিল। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের বহু কার্যকর্তাও এই সম্মোহন মন্ত্রের বশীভূত হয়ে পড়েছিলেন। এই অবস্থা দেখে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতারা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কারণ ছিলনা। ১৯৩৪-এর জুন মাসে কংগ্রেসের সদস্যদের মহাসভা, লীগ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকেই 'হিন্দী রাষ্ট্রবাদের' শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। তার কুপ্রভাবের ফলে কংগ্রেসের নেতারা রাষ্ট্রীয়তার মূলেই কুঠারাঘাত করে আত্মহননের মধ্যেই নিজেদের ধন্য মনে করতেন। 'হিন্দু' শব্দের উচ্চারণ মাত্র তাঁদের মাথা ঝন্ঝন্ করতে শুরু করে দিত। 'হিন্দুত্ব' কে 'কূপমণ্ডুকতা' মনে করে তাকে তাঁরা হেয় করতেন। সেই কারণেই আজ পর্যন্ত তাঁরা ভবিষ্যতের পথকে প্রশস্ত তথা আলোকিত করার উজ্জ্বল ইতিহাসের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং যুগনির্মাতা শিবাজীর মত রাষ্ট্রপুরুষকেও ভ্রমবশে 'পথভ্রষ্ট' বলে নিজেদের গৌরবশালী বলে মনে করেন। তাঁরা এক জগাখিচুড়ি রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখেন এবং এই উদ্দেশ্য-পূরণের হেতু রাষ্ট্র-বিরোধীদের তুষ্টিকরণের জন্য 'ব্ল্যাংক চেক' এর নামে দেহের অন্তর্বাসটুকুও অর্পণ করতে তাঁদের কখনো লজ্জা বোধ হয়নি। যেমন বীজ বুনবে তেমনি ফসল কাটতে হবে। ইংরেজরা বিকৃত রাষ্ট্রীয়তার যে বীজ বপন করেছে সেটাই এঁদের আত্মহননকারী নীতি রূপে নানা শাখা প্রশাখায় ফলতে লেগেছে।

কংগ্রেসের উক্ত নিষেধাজ্ঞার কথা জেনে ডাক্তারজী এতটুকু আশ্চর্য হননি। ভিতরে-ভিতরে এরকম একটা কিছু চলছে, এ অনুমান তাঁর হয়েছিল। কিন্তু একথা জানিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে কংগ্রেস তার সদস্যদের সঙ্ঘে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে বলে বিরক্ত হয়ে

একই ধরনের নিষেধাজ্ঞা নিজেদের সদস্যদের উপর আরোপ করতে হবে এরকম চিন্তা কখনও ডাক্তারজীর মনে উদয় হয়নি। ডাক্তারজী একথা জানতেন যে পরাধীনতার কারণে অনেকে পরানুকরণে প্রবৃত্ত হয়ে সেই রকম কাজ করেই নিজেদের ধন্য মনে করে। এই প্রকার আত্মবিস্মৃতির ফলে যারা আত্মহননের পথ বেছে নেয়, তাদের দেখে ডাক্তারজীর অপরিমিত দুঃখ হত। কিন্তু তাদের যথেচ্ছ রূঢ় কথা শুনিয়ে দিয়ে দূরে সরিয়ে দেবার মত বিচ্ছিন্নতার আচরণ তিনি কখনো করেননি। তিনি একথাই মেনে চলতেন, যে হিন্দু রাষ্ট্রের কল্পনা নিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন, সেখানে সকল হিন্দুই তার অঙ্গীভূত। অতএব, আজ যদিও কোন হিন্দু অন্যথা ব্যবহার করেও, আগামী কাল সে অবশ্যই সংগঠনের পাবন গঙ্গায় অবগাহন করে পবিত্র হবে। তাকে আমাদের সংগঠনে সমাবিষ্ট করার জন্য যত্নশীল থাকা আমাদের কর্তব্য। এই কর্তব্যবোধের কারণে তাঁর জীবনে সর্বদাই অ-বৈরী মনোভাবই ব্যক্ত হত।

এই বছর অক্টোবর মাসে সন্ত পাচলেগাঁওকরজী মহারাজ তাঁর 'মুক্তেশ্বর দল'কে সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সঙ্গমনের রথযাত্রার সময়ে মুসলমানদের আক্রমণের দরুন ১৯২৩-২৪ সালে বিরাট দাঙ্গা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এই দলটির প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এই সময় পর্যন্ত যবতমাল, খামগাঁও, ওয়াশীম, জুন্নর, সিন্নর ও নগর ইত্যাদি স্থানে এর প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি শাখা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। তখন ছিল মুসলমানদের দাঙ্গার যুগ। সেই সময়ে হিন্দুদের সজাগ ও সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজ যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পাচলেগাঁওকরজী মহারাজ ছিলেন অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তিনি মহারাষ্ট্রে নিয়মিত প্রবাস করতেন এবং তাঁর 'নরসিংহ সঞ্চারেশ্বর' নাম সে সময়ে পূর্ণরূপে সার্থক হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত ওজস্বী তথা প্রখর বক্তা ছিলেন এবং আগুনের উপরে হাঁটা এবং সর্পাঘাত সহ্য করার ক্ষমতা সাধারণ জনতাকে তাঁর দিকে সহজেই আকৃষ্ট করে নিত।

১৯৩১ সালে শ্রীবাবারাও সাভারকর কর্তৃক 'তরুণ হিন্দু সভাকে' সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করার সকল প্রয়াস যেন একই সূত্রে সঞ্চালিত হয়। এরই ভিত্তিতে শ্রী বাবারাও সাভারকর এবং শ্রীবাবাসাহেব চিতলে শ্রী পাচলেগাঁওকর মহারাজের সঙ্গে কথা বলেন এবং তারই পরিণামে এই একীকরণের কাজ সম্পন্ন হয়। এই আলোচনা মে মাসে, ১৯৩৪ সালেই সম্পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু ব্যবহারিক রূপে অন্তর্ভুক্তির কাজ অক্টোবর-নভেম্বরে সম্পন্ন হয়।

কয়েকটি ক্ষেত্রে সঙ্ঘের ভাল প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল। ডাঃ নাঃ সুঃ হর্ডীকর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরী করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৩৩ সালে কাকিনাড়া কংগ্রেসের সময়ে তিনি 'হিন্দুস্তানী সেবা দল' গঠন করেন। তিনি যতই সঙ্ঘের প্রগতি তথা প্রভাবের সংবাদ পেতে থাকলেন, ততই তিনি সঙ্ঘ কার্যের মর্ম এবং তাঁর বৃদ্ধির রহস্য জানার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন। অতএব, ১০ই ডিসেম্বর তিনি ডাক্তারজীর নিকট এ বিষয়ে পত্র লেখেন। সেই পত্রের প্রতিলিপি পাওয়া না গেলেও, ডাক্তারজী তার যে উত্তর পাঠান, তা থেকে ডাঃ হর্ডীকরের পত্রের সারমর্মের অনুমান করা যেতে পারে। ডাক্তারজী লেখেন,

"...আপনার ১০-১২-৩৪ এর পত্র এইমাত্র আমি পেলাম। পত্র পাঠ করে অত্যন্ত আনন্দ হল। আপনি স্বয়ং এসে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ নিকট থেকে অধ্যয়ন করতে চান, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দ ও সন্তোষের ব্যাপার। অকোলা পরিষদের পরে আমি নাগপুরে থাকবনা, অতএব আপনি পরিষদের পূর্বেই যদি সঙ্ঘকার্য দেখতে ও বুঝতে নাগপুরে আসেন তাহলে ভাল হয়। এটা করা আবশ্যকও। দৈবযোগে এই সময়ে সঙ্ঘের জেলা শীত শিবিরও চলে, অতএব অনায়াসেই আপনি এই শীত শিবিরগুলি দেখারও সুযোগ পাবেন।"

ডাক্তারজী ডাঃ হর্ডীকরকে আগ্রহপূর্বক অকোলা অধিবেশনের পূর্বেই ডেকেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে তাঁর ফুসফুসের বিকারের কারণে তিনি আসতে পারেননি। ১৯৩৫-এর ১৮ই জানুয়ারী তিনি তাঁর পত্রে লেখেন "আমি নাগপুরে আসতে পারিনি, কারণ ফুসফুসের বিকারে আমি পীড়িত। কিন্তু যথাসম্ভব শীঘ্রই আমি নাগপুরে আসব।" পত্রের শেষে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "নাগপুরে শ্রী পৈ নামক তরুণ গেলে তাঁকে আপনি সঙ্ঘের শিক্ষণ দেবেন ত?" স্বাস্থ্যের কারণে ডাঃ হর্ডীকর নাগপুরে যেতে না পারলেও বোম্বাইতে সেখানকার প্রচারক শ্রী গোপালরাও য়েরকুন্টবারের সঙ্গে দুদিন থেকে সঙ্ঘকার্যকে নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা তিনি অবশ্য করেন।

ডাক্তারজী তাঁর পত্রে যে শিবিরের কথা উল্লেখ করেন, সেই শিবির বড়দিনের ছুটিতে অনুষ্ঠিত হত। এখনও সেই পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ১৯৩৪ সালে ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত শীত-শিবির গান্ধীজীর আগমনের কারণে যথেষ্ট চর্চার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। এই শিবির ওয়ার্ধার সেগাঁও (বর্তমানে সেবাগ্রাম নামে বিখ্যাত) স্থানে রাস্তার ডানদিকে শেঠ যমুনালাল বাজাজের এক ফাঁকা মাঠে তৈরী করা হয়েছিল। সামরিক পদ্ধতিতে রচিত সঙ্ঘের এই স্থানটি একদিক থেকে সামূহিক শ্রম তথা অনুশাসনের একটি দৃষ্টান্ত ও বিকাশ-কেন্দ্র ছিল। সঙ্ঘের এই সব শিবিরে অনেক স্থান থেকে স্বয়ংসেবকেরা নিজ ব্যয়ে গণবেশ ইত্যাদি তৈরী করে বিছানা ইত্যাদি জিনিষপত্র নিয়ে একত্রিত হয় এবং তিন-চারদিন এক সঙ্গে অত্যন্ত উৎসাহ তথা দক্ষতাপূর্বক সামরিক পদ্ধতিতে সঞ্চলন ইত্যাদি কার্যক্রম করে। শিবিরের সম্পূর্ণ খরচ স্বয়ংসেবকদের প্রদত্ত শুল্ক অথবা অন্ন দিয়ে চালান হয়। এই শিবিরগুলি হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ। ১৯৩৪ সালের ওয়ার্ধা শিবিরে এক হাজার পাঁচশত স্বয়ংসেবক অংশগ্রহণ করেছিল। শিবিরের ব্যবস্থা এবং তাঁবু প্রভৃতি লাগাবার জন্য পনের-কুড়ি দিন আগে থেকেই স্বয়ংসেবকেরা সেখানে যাওয়া-আসা শুরু করে দিয়েছিল।

এই স্থানটির নিকটেই মহাত্মাজীর ঐ সময়কার সত্যাগ্রহ আশ্রম ছিল। তিনি সেখানে একটি দুতলা বাড়ীতে থাকতেন। প্রতিদিন ভ্রমণে যাওয়ার সময়ে তিনি শিবিরের কাজে সংলগ্ন স্বয়ংসেবকদের দেখতে পেতেন। তাঁর মনে উৎসুকতা জেগেছিল যে এখানে কোন পরিষদ বা সম্মেলন হবে। দিনাংক ২২শে ডিসেম্বর শিবিরের উদ্বোধন হল। সেই সময়ের পদ্ধতি অনুসারে নগরের প্রধান ও বিশিষ্ট সজ্জনদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে তাঁদের মধ্যে মহাত্মাজী এবং সত্যাগ্রহ-আশ্রমবাসী অন্যান্য সজ্জনকেও আমন্ত্রণ জানান হয়।

শিবিরে গণবেশধারী স্বয়ংসেবকদের কার্যক্রম শুরু হয়ে গেল। ঘোষের গর্জনও শোনা যেতে লাগল। মহাত্মাজী তাঁর নিবাস-স্থান থেকে সহজেই সব কার্যক্রম দেখতে পেতেন। সেসব দেখে তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন এবং তিনি মহাদেবভাই দেশাই-এর নিকট শিবির পরিদর্শনে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। একথা শুনে মহাদেবভাই দেশাই ওয়ার্ধা জেলার সঙ্ঘচালক শ্রী আপ্পাজী জোশীকে পত্র লিখলেন যে "আপনাদের শিবির আশ্রমের সামনেই হওয়ার দরুন স্বাভাবিকভাবেই মহাত্মাজীর দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তিনি শিবির পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অতএব, আপনি অনুগ্রহ করে জানান যে কোন সময় আপনাদের পক্ষে সুবিধাজনক। তিনি অত্যন্ত কর্মব্যস্ত, তবু তিনি সময় করে আসবেন। যদি আপনি এসে সময় নিশ্চিত করতে পারেন তাহলে আরো ভাল হয়।" পত্র পেয়েই আপ্পাজী আশ্রমে গেলেন এবং মহাত্মাজীকে বললেন, আপনি আপনার সুবিধামত সময় বলে দিন। আমরা সেই সময়ে আপনাকে স্বাগত জানাব। মহাত্মাজীর সেদিন মৌনব্রত ছিল। তাই তিনি লিখে জানালেন, "আমি কাল দিনাংক ২৫শে প্রাতঃ ছটার সময়ে শিবিরে যেতে পারি। সেখানে দেড় ঘন্টা থাকতে পারব।" আপ্পাজী সময়ের স্বীকৃতি দিয়ে বিদায় নিলেন। পর দিন সকাল ঠিক ছটার সময়ে মহাত্মাজী শিবিরে এলেন। সেই সময় সমস্ত স্বয়ংসেবকেরা অনুশাসনপূর্বক তাঁর মান-বন্দনা করলেন। তাঁর সঙ্গে শ্রী মহাদেবভাই দেশাই, মীরাবেন এবং আশ্রমের অন্য ব্যক্তিরাও ছিলেন। ঐ ভব্য দৃশ্য দেখে মহাত্মাজী আপ্পাজীর কাঁধে হাত রেখে বললেন, "আমি বাস্তবিকই আনন্দিত হয়েছি। সম্পূর্ণ দেশে এইরূপ প্রভাবী দৃশ্য আমি আজ পর্যন্ত কোথাও দেখিনি।" এর পরে তিনি পাকশালা নিরীক্ষণ করেন। তাঁর একথা জেনে আশ্চর্য হল যে দেড় হাজার স্বয়ংসেবকদের ভোজন একঘণ্টায় নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে যায় এবং এক টাকা ও কিছুটা অন্নের দ্বারা ন বার ভোজন দেওয়া হয় এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে স্বয়ংসেবকরাই অভাব পূরণ করে দেয়। এর পরে তিনি চিকিৎসালয় এবং স্বয়ংসেবকদের বসতি-স্থানও পরিদর্শন করেন। চিকিৎসালয়ে রোগীদের খোঁজখবর নেবার সময়ে তিনি জানতে পারেন যে সঙ্ঘে গ্রামের কিষান ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বয়ংসেবকরাও আছে। ব্রাহ্মণ, মাহার, মারাঠা প্রভৃতি সকল জাতির স্বয়ংসেবকেরা একসাথে মিলে-মিশে থাকে এবং একই পংক্তিতে বসে ভোজন করে। একথা জেনে তিনি এই তথ্য যাচাই করার জন্য কয়েকজন স্বয়ংসেবকের সঙ্গে কথাও বলেন। স্বয়ংসেবকেরা তাঁর প্রশ্নের যে উত্তর দেয় তা থেকে তিনি জানতে পারেন যে "ব্রাহ্মণ, মারাঠা, দর্জী, ইত্যাদির ভেদাভেদ আমরা সঙ্ঘের মধ্যে স্বীকার করি না। আমার পাশে কোন্ জাতের স্বয়ংসেবক বসে আছে তা আমরা জানিনা এবং জানার ইচ্ছাও কখনো হয়না। আমরা সবাই হিন্দু এবং এই কারণে আমরা সবাই ভাই। এর পরিণামে ব্যবহারে উচ্চ-নীচের কল্পনাই আমাদের বোধগম্য হয়না।"

একথায় মহাত্মাজী আপ্পাজীকে প্রশ্ন করেন, "আপনারা জাতিভেদের মনোভাব কেমন করে মিটিয়ে দিয়েছেন? এর জন্য তো আমরা এবং অন্য কয়েকটি সংস্থা প্রাণপণে চেষ্টা করে চলেছি, কিন্তু লোকেরা ভেদাভেদ ভুলতেই চায় না। আপনি তো জানেনই যে অস্পৃশ্যতাকে বিনষ্ট করা কত কঠিন কাজ। তা সত্ত্বেও আপনারা সঙ্ঘের মধ্যে এই কঠিন কাজকে কেমন

করে সমাধান করেছেন?”

এই কথা শুনে আপ্পাজী উত্তর দিলেন, “সকল হিন্দুদের মধ্যে ভাই-ভাই-এর সম্পর্ক আছে” এই মনোভাব জাগ্রত করার ফলে সব ভেদাভেদ নষ্ট হয়ে যায়। ভ্রাতৃভাব শুধু কথায় নয়। আচরণের দ্বারাই এই জাদু সম্ভব হয়। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ডাক্তার হেডগেওয়ারের।” ঠিক এই সময়ে ঘোষবাদন হল এবং সমস্ত স্বয়ংসেবক ‘দক্ষ’তে দাঁড়িয়ে পড়ে ও ধ্বজোত্তোলন হয়। ধ্বজারোহণ হবার পর মহাত্মাজীও সঙ্ঘের পদ্ধতিতে ভগোয়া ধ্বজকে প্রণাম করেন।

ধ্বজপ্রণামের পরে মহাত্মাজী শিবিরের বস্ত্র-ভাণ্ডারে গেলেন। সেখানে একদিকে সূক্তি সমূহ, আলোক-চিত্র, ঘোষ বাদ্য, আয়ুধ ইত্যাদির একটি ক্ষুদ্র প্রদর্শনী সাজানো হয়েছিল। তার মধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণকারী একটি চিত্র মাঝামাঝি স্থানে লাগানো হয়েছিল। মহাত্মাজী অভিনিবেশ সহকারে ছবিটি দেখে জিজ্ঞেস করেন, “এ কার ছবি?”

“ইনি হলেন পূজনীয় ডাক্তার কেশবরাও হেডগেওয়ার।” আপ্পাজী উত্তর দিলেন।

“অস্পৃশ্যতা বিনষ্ট করার ব্যাপারে যাঁর কথা আপনি উল্লেখ করেন, তিনিই তো ডাক্তার হেডগেওয়ার? তাঁর সঙ্ঘের সঙ্গে কী সম্পর্ক?” মহাত্মাজী জিজ্ঞেস করলেন।

“তিনি সঙ্ঘের প্রধান। তাঁকে আমরা সরসঙ্ঘচালক বলি। তাঁর নেতৃত্বেই সঙ্ঘের সব কাজ চলছে। তিনিই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন।” আপ্পাজী বললেন।

“ডাক্তার হেডগেওয়ারজীর সঙ্গে কি দেখা করা যাবে? যদি সাক্ষাৎ হয় তাহলে তাঁর কাছ থেকে সঙ্ঘ সম্বন্ধে জানার ইচ্ছে আছে।” মহাত্মাজী বললেন।

“আগামীকাল ডাক্তারজী এই শিবিরে আসবেন। আপনার ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই আপনার দর্শন করবেন।” আপ্পাজী বললেন।

এই প্রকার কথা-বার্তার পর মহাত্মাজী নিজের আশ্রমে ফিরে গেলেন। যাবার সময়ে তিনি এই মন্তব্য করতে ভুললেন না যে “এই কার্য শুধু হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এতে সকলের অবাধ প্রবেশ থাকলে বেশি ভাল হত।” এ বিষয়ে খানিকটা আলোচনা হল এবং তিনি একথা স্বীকার করলেন যে “অপরের প্রতি বিদ্বেষ না রেখে শুধু হিন্দুদের সংগঠন করা রাষ্ট্র বিরোধী কাজ নয়।”

পরের দিন সকালে ডাক্তারজী ওয়ার্ধা এলেন। সেই সময়ে ওয়ার্ধা স্টেশনেই তাঁকে সামরিক পদ্ধতিতে অভিবাদন প্রদান করা হয় এবং তারপর সমস্ত স্বয়ংসেবক পথ-সঞ্চলন করে শিবিরে আসে। ডাক্তারজী শিবিরে পৌঁছতেই স্বামী আনন্দজী এসে মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ডাক্তারজীকে আমন্ত্রণ জানান এবং রাত্রি সাড়ে আটটায় সময় নির্দিষ্ট হল। সেই দিন সন্ধ্যায় পুনার ধর্মবীর শ্রী আণ্ণাসাহেব ভোপটকরের সভাপতিত্বে শিবিরের সমারোপ কার্যক্রম অত্যন্ত সমারোহের সহিত সম্পন্ন হল। তারপরে ডাক্তারজী, আপ্পাজী ও ভোপটকরজী তিনজনেই মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আশ্রমে গেলেন। মহাত্মাজী দুতলায় তাঁর বৈঠকখানায় ছিলেন। শ্রী মহাদেব দরজার সামনে এসে সকলকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁদের উপরে নিয়ে গেলেন। মহাত্মাজীও এগিয়ে এসে সকলকে ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর পাশেই গদির উপর সকলকে নিয়ে বসলেন। প্রায় এক ঘন্টা মহাত্মাজী ও ডাক্তারজীর মধ্যে আলোচনা চলল।

শ্রী আপ্পাসাহেব ভোপটকরও মাঝে মাঝে আলোচনায় সামান্য অংশগ্রহণ করেন। এই সম্ভাষণের কিছুটা প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই রকম ঃ —

মহাত্মাজী ঃ আপনি জেনেছেন নিশ্চয়ই যে গতকাল আমি শিবিরে গিয়েছিলাম।

ডাক্তারজী ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি শিবিরে গিয়েছিলেন, এটা স্বয়ংসেবকদের মহা সৌভাগ্য। আমি সেই সময়ে উপস্থিত থাকতে পারিনি বলে দুঃখিত। মনে হয় আপনি অকস্মাৎই শিবিরে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমি যদি আগে জানতে পারতাম, তাহলে সে সময়ে আসার অবশ্যই চেষ্টা করতাম।

মহাত্মাজী ঃ একদিকে ভালই হল যে আপনি ছিলেন না। আপনার অনুপস্থিতির কারণেই আপনার বিষয়ে সঠিক তথ্য জানতে পেরেছি। ডাক্তার, আপনার শিবিরে সংখ্যা, শৃঙ্খলা, স্বয়ংসেবকদের মনোভাব, স্বচ্ছতা ইত্যাদি বহু জিনিষ দেখে অত্যন্ত তৃপ্তি হল। আপনাদের ব্যাণ্ড আমার সবচেয়ে বেশী পছন্দ হয়েছে।

এই ধরণের প্রাস্তাবিক সম্ভাষণের পর মহাত্মাজী ''সঙ্ঘ দু-তিন আনায়, ভোজন কেমন করে দেয়, আমাদের কেন বেশী খরচ হয়? কখনো স্বয়ংসেবকদের কি পিঠে বোঝা নিয়ে কুড়ি মাইল সঞ্চলন করিয়েছেন?'' ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। শ্রী আপ্পাসাহেব ভোপটকরের সঙ্গে মহাত্মাজীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সম্পর্ক থাকার দরুন ডাক্তারজী প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই তিনি বলেন, ''আপনাদের বেশী খরচ হয়, তার কারণ হল আপনাদের ব্যবহার। নাম রাখেন 'পর্ণকুটির', কিন্তু ভিতরে থাকে রাজসিক ব্যাপার। আমি এইমাত্র সকলের সঙ্গে বসে ডাল-রুটি খেয়ে এলাম। আপনাদের মত ওখানে কোন ভেদাভেদ নেই। সঙ্ঘের মত চললে আপনাদেরও দু-তিন আনা খরচই পড়বে। এতে ডাক্তার হেডগেওয়ার কী করবেন? আপনাদের তো ঠাটও বজায় রাখা চাই, আবার খরচও কম চাই। এ দুটো একসঙ্গে কী করে চলবে?'' আপ্পা সাহেবের এই বক্তব্যে সকলে অট্টহাস্যে ডুবে গেল।

এর পরে মহাত্মাজী সঙ্ঘের বিধান, সংবাদ পত্রে প্রচার ইত্যাদির বিষয়ে জানার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। এই সময়ে মীরাবেন গান্ধীজীকে ঘড়ি দেখিয়ে বললেন, নটা বেজে গেছে। তখন ডাক্তারজী ''আপনার শোবার সময় হয়ে গেছে'', বলে বিদায় চাইলেন। কিন্তু মহাত্মাজী বললেন, ''না, না, আপনারা আরো কিছুক্ষণ বসতে পারেন। অন্ততঃ আধ ঘন্টা আমি সহজেই জেগে থাকতে পারব।'' অতএব, আলোচনা অব্যাহত রইল।

মহাত্মাজী ঃ ডাক্তার, আপনাদের সংগঠন বেশ ভাল। আমি জানতে পারলাম আপনি অনেক দিন কংগ্রেসে কাজ করেছেন। তাহলে কংগ্রেসের মত জনপ্রিয় সংস্থার মধ্যেই এই ধরণের স্বয়ংসেবক-সংগঠন কেন চালালেন না? অকারণে ভিন্ন সংগঠন কেন গড়লেন?

ডাক্তারজী ঃ আমি প্রথমে কংগ্রেসেই এই কাজ আরম্ভ করেছিলাম। ১৯২০ সালের নাগপুর কংগ্রেসে আমি স্বয়ংসেবক বিভাগের কার্যবাহ ছিলাম এবং আমার বন্ধু ডাঃ পরাঞ্জপে ছিলেন সভাপতি। এর পরে আমরা দুজনেই চেষ্টা করলাম যাতে কংগ্রেসের মধ্যে এরকম সংগঠন গড়ে তোলা যায়, কিন্তু সাফল্য লাভ করা যায়নি। সেই কারণে এই স্বতন্ত্র প্রয়াস শুরু করি।

মহাত্মাজী ঃ কংগ্রেসে আপনার প্রচেষ্টা সফল হয়নি কেন? পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা পাওয়া যায় নি?

ডাক্তারজী ঃ না, না। অর্থের কোন অসুবিধা ছিল না। অর্থ দিয়ে অনেক কাজই হয়। কিন্তু অর্থের ভরসাতেই সব কাজ সফল হতে পারেনা। এখানে প্রশ্ন অর্থের নয়, অন্তঃকরণের।

মহাত্মাজী ঃ আপনি কি বলতে চান যে উদাত্ত অন্তঃকরণের মানুষ কংগ্রেসে ছিলেন না, অথবা নেই?

ডাক্তারজী ঃ আমি একথা বলতে চাইনি। কংগ্রেসে অনেক ভাল লোক আছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল মনোবৃত্তির। কংগ্রেসের মানসিক গঠন এক রাজনৈতিক কাজকে সফল করার জন্য হয়েছে। কংগ্রেসের কার্যক্রম এ কথার দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়, এবং সেই কার্যক্রমগুলি করার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের প্রয়োজন হয়। স্বয়ং প্রেরণায় যারা কাজ করে, তাদের শক্তিশালী সংগঠনের মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে, একথা কংগ্রেস বিশ্বাস করেনা। স্বয়ংসেবক সম্বন্ধে কংগ্রেসের লোকদের ধারণা হল সভা-সমিতিতে বিনা পয়সায় টেবিল-চেয়ার তোলার মজুর হিসাবে। এই ধারণা দিয়ে রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করার মত স্বয়ংস্ফূর্ত কার্যকর্তা কেমনভাবে তৈরী হবে? এই কারণে কংগ্রেসে কাজ করা যায়নি।

মহাত্মাজী ঃ তাহলে স্বয়ংসেবক সম্বন্ধে আপনাদের কী রকম কল্পনা?

ডাক্তারজী ঃ দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য আত্মীয়তার সঙ্গে নিজের সার-সর্বস্ব অর্পণ করার জন্য সিদ্ধ নেতাকে আমরা স্বয়ংসেবক মনে করি, এবং সঙ্ঘের লক্ষ্য হল এই ধরণের স্বয়ংসেবক তৈরী করা। এই সংগঠনের মধ্যে স্বয়ংসেবক ও নেতা এই বিভেদ নেই। আমরা সকলেই স্বয়ংসেবক, একথা জেনেই আমরা একে-অপরকে সমান বলে মনে করি এবং সকলের সঙ্গে সমানরূপে প্রেম-প্রীতির বিনিময় করি। আমরা কোন রকম বিভেদকে প্রশ্রয় দিইনা। এত অল্প সময়ের মধ্যে অর্থ ও অন্য সাধনের ভিত্তি না থাকা সত্ত্বেও সঙ্ঘকার্যের এতখানি বৃদ্ধির রহস্য এটাই।

মহাত্মাজী ঃ খুব ভালো। আপনাদের কাজের সাফল্যের মধ্যে নিশ্চিতই দেশের কল্যাণ সন্নিহিত। শুনেছি, আপনাদের সংগঠনের ওয়ার্ধা জেলায় ভাল প্রভাব আছে। আমার মনে হয় এটা প্রধানতঃ শেঠ যমুনালাল বাজাজের সহায়তাতেই হয়ে থাকবে।

ডাক্তারজী ঃ আমরা কারো কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিনা।

মহাত্মাজী ঃ তাহলে এত বড় সংগঠনের খরচ কী ভাবে চলে?

ডাক্তারজী ঃ নিজেদের পকেট থেকে অধিকাধিক অর্থ গুরুদক্ষিণা রূপে অর্পণ করে স্বয়ংসেবকেরাই এই ভার বহন করে।

মহাত্মাজী ঃ এটা নিশ্চিতই অভিনব। আপনারা কি কারো কাছ থেকে অর্থ নেবেন না?

ডাক্তারজী ঃ যখন সমাজ তার বিকাশের জন্য এই কার্য আবশ্যক বলে স্থির করবে তখন আমরা অবশ্য আর্থিক সহায়তা স্বীকার করব। এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হলে আমরা না চাইলেও জনসাধারণ সঙ্ঘের সামনে অর্থের রাশি জমা করে দেবে। এ ধরনের আর্থিক সহায়তা গ্রহণে আমাদের কোন বাধা নেই। কিন্তু সঙ্ঘের পদ্ধতিকে আমরা স্বাবলম্বীই রেখেছি।

মহাত্মাজী ঃ এই কাজের জন্য আপনাকে নিজের সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করতে হয় মনে হয়। তাহলে আপনি আপনার ডাক্তারীর ব্যবসা কেমন করে করেন?

ডাক্তারজী ঃ আমি ব্যবসা করি না।

মহাত্মাজী ঃ তাহলে আপনার পরিবারের নির্বাহ কেমন করে হয়?

ডাক্তারজী ঃ আমি বিবাহ করি নি।

এই উত্তর শুনে মহাত্মাজী কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। সেই কথার খেই ধরে তিনি বললেন, "আচ্ছা, আপনি বিবাহ করেননি? খুব ভালো। এই কারণেই অল্প সময়ের মধ্যে আপনি এতখানি সাফল্য লাভ করেছেন।" এর পর ডাক্তারজী এই কথা বলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন যে "আমি আপনার অনেকখানি সময় নিয়েছি। আপনার আশীর্বাদ থাকলে সব কাজ মনের মত চলবে। এবার অনুমতি দিন।" মহাত্মাজী তাঁকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এলেন এবং বিদায় জানিয়ে বলেন, "ডাক্তারজী, আপনার চরিত্র এবং কাজের প্রতি অটল নিষ্ঠার শক্তিতে আপনার অঙ্গীকৃত কার্যে আপনি নিশ্চিত সফল হবেন।"

ডাক্তারজী মহাত্মাজীকে নমস্কার করে বিদায় গ্রহণ করলেন।

২৩. প্রচণ্ড পরিশ্রমের দু বছর

পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর প্রচেষ্টার সফল পরিণামস্বরূপ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রগতির পথে বিস্তার লাভ করে চলছিল। সঙ্ঘকার্যকে আমাদের নিজস্ব কাজ মনে করে তার জন্য পরিশ্রম করার মনোভাব স্বয়ংসেবকদের জীবনে দৃষ্টিগোচর হতে দেখা গেল। ১৯৩৫-এর প্রথম দিকেই মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রান্তের বিভিন্ন স্থান থেকে নতুন-নতুন শাখা খোলার সংবাদ কেন্দ্রের নিকট ক্রমাগত আসছিল। কাজের চৈতন্য সর্বত্র প্রস্ফুটিত হতে দেখা যাচ্ছিল। কার্যবিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে তাকে সুদৃঢ় করে তোলার দিকে ডাক্তারজীর সজাগ দৃষ্টি ছিল। অতএব, বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে নতুন-নতুন ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে তাদের উপর কাজের দায়িত্ব দিয়ে তাদের মাধ্যমে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করিয়ে নেবার দায়িত্বভার তাঁর উপর এসে পড়ল। নিজের সম্বন্ধে এতটুকু চিন্তা না করে অত্যন্ত নিরলসভাবে তিনি তাঁর এই কর্তব্য সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করলেন। সেই সময়ে তাঁর পত্রালাপ থেকে এ বিষয়ের সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি বিদর্ভের অনেক শাখা পরিদর্শনের জন্য গেলেন। পরিভ্রমণ শেষে ফিরে আসার পর তিনি একটি পত্রে লেখেন, "...মনে হচ্ছে বিদর্ভের প্রবাস স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হয়নি। ওখান থেকে ফিরে আসার পর প্রতিদিন অল্প জ্বর হচ্ছে এবং দুর্বলতা বেশ বেড়ে গেছে। কিন্তু কাসি একেবারে নেই। তা সত্ত্বেও ফুসফুসে যথেষ্ট দুর্বলতা অনুভব করছি। অতএব, তীব্র ইচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে কানপুরের ভ্রমণ স্থগিত করতে হচ্ছে।" কিন্তু এই অবস্থাতেও নাগপুরে তাঁর ঘোরা অব্যাহত ছিল। নানা সভায় 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' (Communal Award)-এর বিরুদ্ধে ভাষণ, অবিরাম পত্রালাপ এবং লোকমান্য তিলকের স্নেহধন্য শ্রী দাদাসাহেব করন্দীকরের নাগপুর আগমন উপলক্ষে তাঁকে বিভিন্ন শাখা পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়ার কার্যক্রম নিয়মিত করে চলেছিলেন। শুধু তাই নয়, উপরোক্ত পত্র লেখার একমাস পরে তিনি মহারাষ্ট্রের কয়েকটি শাখা পরিদর্শনে গেলেন এবং সেইসব স্থানের কর্মব্যস্ত তথা কষ্টসাধ্য কার্যক্রমগুলিতেও অংশগ্রহণ করেন।

নাগপুরের সঙ্গে এবছর পুনাতেও অধিকারী শিক্ষণ বর্গ আরম্ভ হল। তার জন্য ডাক্তারজী ১৬ই এপ্রিল নাগপুর থেকে রওনা হন এবং প্রায় এক মাস মহারাষ্ট্রে অতিবাহিত করে প্রত্যাবর্তন করেন। এর মধ্যে আট দশ দিন তিনি বর্গে ছিলেন, এবং বাকি সময় নাসিক, ঠাণে, বোম্বাই, সাংলী ইত্যাদি শাখাস্থানগুলিতে ভ্রমণ করেন। এই সময়ে তিনি কোঙ্কণেরও ভ্রমণ করবেন বলে ঠিক ছিল, কিন্তু স্বাস্থ্য সায় না দেওয়ায় অনিচ্ছাপূর্বক ফিরে আসতে হল।

ডাক্তারজী এই প্রবাসের যে বর্ণনা করেন, তা তাঁর সহনশীল স্বভাব এবং সহজ লেখন-কুশলতার উপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করে। তিনি লেখেন, "...আমরা সাংলীর উদ্দেশে রওনা হলাম। রেলগাড়ীতে রাত্রে শোবার মত যথেষ্ট জায়গা পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু স্থানটি ধরে রাখতে গিয়ে আমার কোমরে হঠাৎ ফিক্ ব্যথা শুরু হল। গাড়ীতে সারা রাত শুয়ে প্রবাস করার পরেও ব্যথা একটুও কমেনি। সকালে সাংলী স্টেশনে সঙ্ঘের দিক থেকে স্বাগত অভ্যর্থনার কার্যক্রম রাখা হয়েছিল। কিন্তু আমার পক্ষে উঠে বসা ও দাঁড়ানো পর্যন্ত অসম্ভব ছিল। এই পরিস্থিতিতে সকাল ৬ টায় সাংলী স্টেশনে গাড়ী পৌঁছল। যে সাংলী সঙ্ঘশাখার কীর্তি আজ পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছিলেন, সেই শাখা এটি। স্টেশনে গণবেশে সুসজ্জিত স্বয়ংসেবকেরা প্ল্যাটফর্মে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়েছিল। নগরের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও সেখানে এসেছিলেন। আমি কোমরের ব্যথা কোন রকমে সহ্য করে, কেউ যাতে টের না পায় এইভাবে, স্টেশনে নেমে পুষ্পমাল্য ইত্যাদি অভ্যর্থনা স্বীকার করলাম। স্টেশন থেকে যেতেই সঙ্ঘস্থানে প্যারেডের কার্যক্রম রাখা হয়েছিল। যেমন-তেমন করে সেই কার্যক্রমও পূর্ব-নিয়োজিত পদ্ধতিতে পুরো করলাম। কিন্তু এই পরিশ্রমের ফলে কোমরের ব্যথা অত্যধিক বৃদ্ধি পেল। দুপুরের পর ওঠা-বসাও একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ল। সেই কারণে বিকেলের কার্যক্রম বাতিল করতে হল।

"কোমরে ব্যথার দরুন যদিও আমি বিছানাতেই শুয়ে থাকি, তবু শরীরে জ্বর না থাকায় এখানকার সঙ্ঘচালক শ্রী কাশীনাথরাও লিময়ের বাড়ীতে স্বয়ংসেবকদের এবং নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আসা-যাওয়া অব্যাহত ছিল। মনে হচ্ছে আমার অসুখ সাংলীর লোকেদের জন্য লাভজনকই হয়েছে। এই কারণে সাংলীতে পাঁচ-সাত দিন থাকতে হল। সাংলীবাসীদের এর জন্য আনন্দ হওয়ার দরুন আমার অসুখকে ওরা 'বোলতী বীমারী' (অর্থাৎ কথা বার্তার অসুখ) নামকরণ করল।"

এই অসুস্থ অবস্থায় তিনি সাংলী কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের বিদ্যার্থী স্বয়ংসেবকদের একটি বৈঠক নিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন যে স্বয়ংসেবকের জীবনে যদি কোন আনন্দের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় তাহলে তার পরিণাম সঙ্ঘকার্যের বৃদ্ধিতে হওয়া উচিত। এর পরে তিনি স্বয়ংসেবকদের জিজ্ঞেস করেন, "পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আপনারা সঙ্ঘকে কী কী দেবেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যেকে টাকার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে সঙ্ঘকে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। একথায় ডাক্তারজী হাসতে হাসতে বলেন, "আনন্দ হবার পর সঙ্ঘকে কী কী দেবেন, তার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটা মনে রাখবেন। কিন্তু অনুত্তীর্ণ হলে দণ্ড দিতে হবে, একথাও ভুলবেন না।" তাঁর এই প্রভাব-উদ্দীপক বাণী আজও অনেকের স্মৃতি-মানসে গুঞ্জন তোলে।

কোমরে ফিক্ ব্যথার দরুন সাংলীতে প্রথমে নির্দিষ্ট ভাষণ হতে পারেনি। কিন্তু সেখান থেকে যাওয়ার আগে ২রা মে এই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হল। এই ভাষণে ডাক্তারজী সঙ্ঘের পৌনে দুশো শাখা চলার বৃত্তান্ত শোনান। হিন্দু সমাজের অসংগঠিত স্থিতির মারাত্মক পরিণাম এবং রাজনৈতিক বাতাবরণে ব্যাপ্ত 'সত্য ও অহিংসা' তত্ত্বের যথাযথ রক্ষণ কেমন করে করা যাবে, তারও আলোচনা তিনি এই ভাষণে জোরদার ভাষায় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "...

আত্ম-সংরক্ষণ প্রত্যেককেই করতে হবে। অপরের প্রতি হিংসা না করা তো উত্তম কথাই, কিন্তু তার জন্য আত্মনাশ করা উচিত নয়। এই তত্ত্বের দ্বারা হিন্দু সমাজের বিরাট ক্ষতি হবে। আমাদের এথেকে নিস্তার পেতে হবে। হিন্দুস্থানে এক সময়ে সকলেই হিন্দু ছিল, কিন্তু আজ শুধু পঁচিশ কোটি হিন্দু অবশিষ্ট আছে। বাকি দশ কোটি পরমতাবলম্বী হয়ে আছে। এদের রক্ত পরীক্ষা করলে এদের অধিকাংশই হিন্দু বলে আমরা দেখতে পাব। এর থেকে আমরা কল্পনা করতে পারি যে আমাদের সমাজের হ্রাস কী ভাবে হয়েছে। নিজেদের সমাজের প্রতি অনাস্থার দৃষ্টিতে না দেখে আমাদের বল সম্বর্ধন করতে হবে যাতে আমরা সমগ্র জগতের নিকট ওজনদার হয়ে উঠি। একবার আমাদের হাতে শক্তি এলেই অন্তঃকরণ ও আচরণে 'সত্য ও অহিংসা'র তত্ত্বের ছাপ এঁকে দিতে কতটুকু সময় লাগবে?"

ডাক্তারজী সর্বদা বলতেন যে বলহীন ও অসংগঠিত থেকে শুধু 'সত্য ও অহিংসা'র তত্ত্বের উদ্‌ঘোষ করতে থাকলে আত্মনাশ অনিবার্য। কিন্তু আজ দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে জনসাধারণ ঐ সময়ের এই উদাত্ত তত্ত্বের শাব্দিক শোরগোলের মধ্যে ডাক্তারজীর কথাগুলির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেনি। রাত্রির গহন অন্ধকারে প্রহরী গলা চিরে চিৎকার করে, নিদ্রিতদের দরজার কড়া জোরে নাড়া দিয়ে তাদের সচেতন করার ও জাগাবার চেষ্টা করে। এ সত্ত্বেও যদি কুম্ভকর্ণের ঘুমে আচ্ছন্ন জনতার ঘুম না ভাঙে এবং চোর যদি সিঁধ কেটে যথাসর্বস্ব লুটপাট করে পালিয়ে যায়, তাহলে দোষ কার?

সাংলীর এই কার্যক্রমের সময়ে ডাক্তারজীর সঙ্ঘের গণবেশ পরিহিত আলোকচিত্র গৃহীত হয়। এর জন্য শ্রী কাশীনাথপন্তকে বেশ জেদাজেদি করতে হয়েছিল এবং ডাক্তারজী শুধু এই শর্তে ফটো তোলাতে রাজি হয়েছিলেন যে ছবির নেগেটিভ ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে এবং ছবিগুলির প্রচার করা হবেনা। এই পরিস্থিতিতেই ডাক্তারজীর গণবেশে একমাত্র ছবিটি পাওয়া সম্ভব হয়।

মহারাষ্ট্র থেকে ফেরার পথে ডাক্তারজী চান্দুরে শ্রী মহসুরকর মহারাজের দর্শন করেন। বলা বাহুল্য যে হিন্দু সমাজের মধ্যে শক্তি ও আত্মবিশ্বাস অত্যন্ত প্রবলভাবে জাগরিত করার তীব্র ইচ্ছা নিয়ে চলেছিলেন এই দুইজন মহাপুরুষ। তাঁদের এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারে তদানীন্তন দেশের চিন্তাজনক পরিস্থিতির বিষয়ে পারস্পরিক ভাব-বিনিময় হয়েছিল নিশ্চয়ই। হিন্দুত্বের জাগরণের ধ্যেয় নিয়ে যে সকল ব্যক্তি বা সংগঠন চেষ্টা করে চলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সব সময়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব বজায় থাকুক এবং এইরূপ সকল প্রবাহ একাত্মরূপে যাতে অগ্রসর হয় এই চিন্তা ও উদ্দেশ্য নিয়ে ডাক্তারজী বহু ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। চাঁদুরের পরে ডাক্তারজী অকোলার শিক্ষাবর্গে গেলেন। এই বর্গের দায়িত্ব শ্রী গুরুজীর উপর অর্পণ করা হয়েছিল। বর্গে প্রভাবী সংস্কার উৎপন্ন করার দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি যে অত্যন্ত তেজস্বী বাতাবরণ গড়ে তুলেছিলেন, তা দেখে ডাক্তারজীর আন্তরিক আনন্দ হল। বর্গ শুরু হবার আগেই শ্রী গুরুজীর এল এল বি-র প্রথম পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছিল এবং তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। শ্রী গুরুজীর কৃতিত্ব লক্ষ্য করে যদি ডাক্তারজীর তাঁর প্রতি আশা বর্ধিত হয়ে থাকে তাহলে তা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয়।

নাগপুরের কাজের জন্য এক কুশাগ্রবুদ্ধি তথা নিরলস কার্যকর্তা পাবার প্রত্যাশা তাঁর ছিল। কিন্তু একটি ব্যাপারে তাঁর সংশয় সব সময়ই থাকত। সেটা ছিল শ্রী গুরুজীর বৈরাগ্য বৃত্তি সম্বন্ধে।

শ্রী গুরুজীর নাগপুরে আসার পর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগের কথা সকলেই অবহিত ছিলেন। ডাক্তারজী একথাও জানতেন যে শ্রীগুরুজী আধ্যাত্মিক গ্রন্থসমূহ পাঠ ও আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণাতেও মগ্ন থাকতেন। এই অবস্থায় ডাক্তারজীর সব সময়ে আশংকা থাকত যে এইরূপ ব্যক্তি যদি একদিন "সুহৃদা মজ সদন কশালা। সামাবুঁ শকে কা মজলা, তেঁ কদা। বঘ পাখেঁ বর আকাশ। হিরবল হী শয্যা খাস, মজ অসে।" (ঘর আমাকে বেঁধেছে কি কভু। ঘরের কথা কি বলিব প্রভু। উপরে অনন্ত নীল আকাশ। শয্যা সবুজ দুর্বা ঘাস) — এই কথা বলে বিবাগী হয়ে চলে না যান। তিনি নিজে বৈরাগ্যের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। ডাক্তারজীর নিজের জীবনই ছিল চলমান্ মূর্তিমান বৈরাগ্যের। কিন্তু সমাজ থেকে দূরে পলায়ন করে কেবল আত্মসুখে লীন বৈরাগ্যের স্বরূপের প্রতি ডাক্তারজীর রুচি ছিলনা। তিনি এমনই বৈরাগ্য চাইতেন যেখানে দেশ-কাল পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে সমাজের মধ্যে বাস করেও পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত অনাসক্ত কর্মযোগীর জীবন অতিবাহিত করা যাবে। কোমরে হাত রেখে শ্রী সমর্থ যেমন বিঠ্ঠলকে প্রণাম করে বলেছিলেন ঃ

য়েথে উভা কাঁ শ্রীরামা
মনমোহন মেঘ শ্যামা?
ধনুষ্যবাণ কায় কেলে?
কর কটাবরী ঠেবিলে?

(এখানে দাঁড়িয়ে কেন, মনমোহন মেঘশ্যাম?
ধনুর্বাণ কোথায় গেল, কোমরে হাত কেন হে রাম?)

তিনিও শ্রী সমর্থের মত একথাই জিজ্ঞেস করেছিলেন বলে মনে হয়।

কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে এই প্রকার দেশকালের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এই কারণেই লোকমান্য তিলক একবার এই রকম কঠোর শব্দ বলেছিলেন ঃ — "আমাদের দেশের হাজার হাজার বালকদের বিপন্ন অবস্থায় দেখেও যারা নাক ধরে বাড়ীতে বসে আছে, তারা ভণ্ড।" সেইভাবে ডাক্তারজী চেয়েছিলেন যে শ্রীগুরুজীর মনোভাব যেন বনাভিমুখী না হয়ে জনাভিমুখী হয়।

ডাক্তারজী অকোলা থেকে নাগপুরে ফিরে আসার পর ২৪শে মে মধ্যপ্রান্ত সচিবালয়ের অনেক দলিল-পত্র অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। এই ঘটনায় ডাক্তারজী বেশ খুশী হয়েছিলেন। কারণ ছাত্র-জীবন থেকে শুরু করে তাঁর বিপ্লবী জীবন পর্যন্ত বহু বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারী মন্তব্য তথা বিজ্ঞপ্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই বিষয়ে তিনি তাঁর বন্ধুদের বলেছিলেন, "ভালই হল, ঐ সব কাগজ-পত্র পুড়ে গেছে। এখন আমার স্লেটে আর কোন দাগ নেই।"

এই সময়ে উত্তর ভারতের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মনে ভবিষ্যতের ভীষণ অবস্থা সম্পর্কে আশংকার সৃষ্টি হচ্ছিল, এবং তাঁদের মনে হচ্ছিল এই ভবিতব্য থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র সম্ভাব্য উপায় হল ডাক্তারজীর কার্যকে বিস্তৃত ও তেজস্বী করে তোলা। তাঁরা উপলব্ধি করছিলেন যে হিন্দু সমাজের উপর কোথাও আক্রমণ হলে তার নিন্দা করে জোরদার প্রস্তাব গ্রহণ এবং প্রচণ্ড গরম-গরম ভাষণ দেওয়া ছাড়া সভা-সমিতি করেও কোন গঠনমূলক পরিণাম লাভ করা যাবেনা। তাঁদের সম্মুখে এই বিকট সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল যে মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের আক্রামক মনোভাব দিনের পর দিন বেড়েই চলছিল এবং তার প্রতিকার এই রূপ শব্দ বা হুংকার দিয়ে করা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতির কারণে কলকাতার বাবু পদ্মরাজ জৈন বার-বার পত্র লিখে ডাক্তারজীর নিকট পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশ পরিভ্রমণের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। লাহোর থেকে ভাই পরমানন্দের জামাতা শ্রী ধর্মবীরজীর পত্রগুলিতেও সমাজের এই বিষম অবস্থা এবং সংগঠনের বিশেষ আবশ্যকতার সংকেত পাওয়া যায়। ১৯৩৫ সালের ৩রা অক্টোবরের চিঠিতে তিনি লেখেন, "হিন্দুদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সামগ্রিক আত্ম সংরক্ষণের কলা সম্পর্কে অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গে থাকতে চাই। অন্য একজন সজ্জনও আমার সঙ্গে যাবেন।"

এই পত্রের অব্যবহিত পরেই ভাই পরমানন্দজীর আদেশে শ্রী ইন্দ্রপ্রকাশ ডাক্তারজীকে জানুয়ারী ১৯৩৬ এ অনুষ্ঠিতব্য অখিল ভারতীয় হিন্দু যুবক পরিষদে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহপূর্বক আমন্ত্রণ জানান। এর সঙ্গে তিনি পত্রে লিখলেন, "আপনি সংগঠন করার জন্য আমাদের খরচে অন্ততঃ এক বছরের জন্য পাঞ্জাবে এসে অবশ্যই থাকুন।" এই ধরণের বহু পত্র সে সময়ে তাঁর কাছে আসছিল। অতএব ডাক্তারজী এমন স্বয়ংসেবকদের খুঁজতে লাগলেন, যাঁরা পড়াশুনা করার উদ্দেশ্যে নাগপুরের বাইরে নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে যেতে পারবেন। কিন্তু অন্য প্রান্তে অজানা বাতাবরণেও দৃঢ়তার সঙ্গে সংলগ্ন থেকে কাজ করতে সক্ষম হবেন; এই ব্যাপারটিকে দৃষ্টিপথে রেখে তিনি স্থানে-স্থানে স্বয়ংসেবকদের তেলুগু, হিন্দী, বাংলা ইত্যাদি ভাষা শেখার আগ্রহ করলেন। সৌভাগ্যক্রমে নাগপুর মারাঠী ও হিন্দী ভাষা-ভাষী অঞ্চলের সীমান্তবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ার দরুন নাগপুরে দুটি ভাষাই সমানরূপে ব্যবহৃত হত। অতএব, মারাঠী-ভাষী স্বয়ংসেবকরা একটু চেষ্টা করলেই ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে নিজেদের মনোভাব সহজেই প্রকাশ করতে পারত। কিন্তু অন্য প্রান্তে গিয়ে কাজ করার উপযুক্ত আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ডাক্তারজী কয়েকজনকে হিন্দীর বেশী করে অভ্যাস করার জন্য যোজনানুসারে উৎসাহিত করতে শুরু করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং মাঝে মাঝে নাগপুরের শাখাগুলিতে হিন্দীতে তাঁর চিন্তাধারা প্রকাশ করতে লাগলেন। মাঝে-মাঝে তিনি মহাকোশলে বিস্তারক হিসাবে কয়েকজন স্বয়ংসেবককে পাঠাবার যোজনা প্রস্তুত করলেন। যদি কোন স্বয়ংসেবক বলত যে আমাকে মারাঠী অঞ্চলেই পাঠান, তাহলে তিনি তাকে বলতেন, "ভাষা জানোনা বলে ভয় পেলে কেমন করে কাজ চলবে? সেই অঞ্চলে যাও, ভাষা নিজেই শিখে যাবে। জলে না নেমে সাঁতার শিখবে কেমন করে?" এই যুক্তি শোনার পর আর কে কী বলতে পারে?

এই নতুন উপক্রমের কারণে বেশ মজার প্রসঙ্গও উপস্থিত হত। মারাঠী শব্দের সঠিক পর্যায়-বাচক শব্দ জানা না থাকা সত্ত্বেও বক্তা আন্দাজে নিজের মত এমন বাক্য-রচনা করত এবং তাতে এমন মনোরঞ্জনের অবস্থার সৃষ্টি হত যে চারদিকে হাসির ধূম পড়ে যেত। "ঘোলে আদা দিয়েছ?" (তাকাঁত আলেঁ ঘাতলেঁ?)-এর অনুবাদ করে যখন বর্গে এক কার্যকর্তা "তক্কা মেঁ অল্লা ডালা?" এইরূপ অনুবাদ করলেন, তখন বহু দিন পর্যন্ত এই বাক্যটি মনোবিনোদের বিষয় হয়ে রইল। কিন্তু বিভিন্ন ভাষা শেখার ব্যাপারে ডাক্তারজীর আগ্রহ ও প্রোৎসাহ দানের ফলেই এমন কার্যকর্তারা তৈরী হলেন যাঁরা যে কোন প্রান্তে গিয়ে সাফল্য তথা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম হলেন। ১৯৩৫ সালে শ্রী দাদারাও পরমার্থ, শ্রী বাবাসাহেব আপটে এবং শ্রী য়েরকুন্টবারের মত কয়েকজন নতুন কার্যকর্তাদের তিনি খান্দেশ ও মহাকোশল অঞ্চলে প্রচারের জন্য পাঠালেন। দূরের প্রদেশগুলিতে প্রচারের জন্য স্বয়ংসেবকদের প্রেরণের যোজনার এটা ছিল প্রথম সোপান।

সঙ্ঘকার্যের বিস্তার ঘটছিল। সেই সঙ্গে তাকে সামলে রাখার উপযুক্ত নিষ্ঠা ও অনুশাসনও দৈনন্দিন কার্যক্রমের মাধ্যমে দৃঢ়তর হচ্ছিল। সাধারণতঃ লিখিত বিধান দিয়েই সংস্থাসমূহের কাজের সূচনা হয়। কিন্তু ডাক্তারজী সঙ্ঘের মধ্যে লিখিত নিয়ম তথা বিধানের উপর গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তার সুনিশ্চিত স্বরূপ গড়ে তোলার চেষ্টা করতেন। অর্থাৎ সঙ্ঘের পদাধিকারী, তার দায়িত্ব, দৈনন্দিন শাখায় স্বয়ংসেবকদের জন্য আচার-পদ্ধতি ইত্যাদি সব কিছুই ক্রমে-ক্রমে বিকশিত করে ডাক্তারজী এইগুলিকে সমানভাবে প্রসারিত হতে দিয়েছিলেন। সঙ্ঘের বিধি-নিয়মের প্রসারে কাগজ-কলমের ব্যবহার না করেও সর্বত্র অত্যন্ত সুশৃঙ্খল রীতিতে তা প্রবর্তিত হল। এই বিষয়টি তখনকার মত আজও আশ্চর্য করে সকলকে। এই কার্য যাতে সততার সঙ্গে চলতে থাকে, তার জন্য ডাক্তারজী গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে অধিকারী শিক্ষণ বর্গের যোজনা করেছিলেন। সর্বপ্রথম ১৯২৭ সালে ডাক্তারজী তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে পরামর্শ করে কয়েকটি নিয়মের প্রবর্তন করেন। ১৯৩৫-এর অক্টোবর মাসে তখন পর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়েছিল, তার ভিত্তিতে সেই সব নিয়মের কিছু সংশোধন করা হল। তাঁর একটি পত্র থেকে জানা যায় যে তিনি শ্রী আপ্পাজী জোশী, শ্রী দাদাসাহেব দেব এবং শ্রী কৃষ্ণরাও মোহরীরকে শারীরিক শিক্ষাপদ্ধতি এবং আচার পদ্ধতির পুনর্বিন্যাসের জন্য সিন্দীতে শ্রীনানাসাহেব টালাটুলের নিবাসস্থানে ডেকেছিলেন। তাঁরা সাত-আট দিন সেখানেই ছিলেন। ডাক্তারজী অবিরাম ভ্রমণ থেকে কিছুটা বিশ্রামও পেলেন। শ্রী টালাটুলে এই ব্যবস্থাও করলেন যাতে তাঁর পিঠের ব্যথার স্থানে মালিশ করা হয়।

এই বছরই সঙ্ঘের হিতাকাঙ্ক্ষী সাতারার প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ শ্রী দাদাসাহেব করন্দীকরের নাগপুরে দেহাবসান হল। নাগপুরে তাঁর নিবাসকালে ডাক্তারজী তাঁকে সঙ্ঘের শাখা দেখিয়েছিলেন। স্বয়ংসেবকদের কাজ দেখে তিনি এমন প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তিনি একশত টাকার 'ঢাল' সঙ্ঘকে দেবার সংকল্প করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তার সুপুত্র ব্যারিস্টার বিট্‌ঠলরাও করন্দীকর ১৯৩৫-এর অক্টোবর মাসে 'ঢাল' এর জন্য একশত টাকা ডাক্তারজীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। স্বর্গীয় করন্দীকরের ইচ্ছা ছিল যে ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শিতা প্রাপ্ত

স্বয়ংসেবককে যেন ঐ ঢাল দেওয়া হয়। ডাক্তারজী সবসময়ে লক্ষ্য রাখতেন, যে অর্থ যে কাজের জন্য পাওয়া যাবে বা সংগৃহীত হবে, সেই কাজেই তার সদ্ব্যবহার করতে হবে। একটি কারণ বলে অর্থ গ্রহণ করে তার পর অন্য কাজে তা খরচ করা তিনি পছন্দ করতেন না। এ ব্যাপারে তিনি লেখেন, "সঙ্ঘে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। আমরা এই শিক্ষার বিভাগ খোলার কথাও চিন্তা করলাম। কিন্তু আগে থেকেই সঙ্ঘের কার্যক্রম নিয়ে টানাটানি চলছে। তার মধ্যে এই নতুন বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় আপনার প্রেরিত টাকা আপনার নির্দেশিত উদ্দেশ্যে খরচ করা সম্ভব হচ্ছেনা, সেই কারণে ঐ টাকা আমাদের নিকট আমানত হিসাবে জমা রইল। আপনি যেমন বলবেন, সেইভাবে তার ব্যবস্থা করা হবে।" এই অর্থে পরবর্তীকালে সাতারা শাখার কার্যালয়ের স্থান ক্রয় করা হয়। চারিদিকে যখন অর্থের গণ্ডগোল সাধারণ নিয়মে দাঁড়িয়েছিল, সেই সময়ে আর্থিক দৃষ্টিতে এই সততা অসাধারণ ছিল সন্দেহ নেই।

এই বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর মধ্যে শ্রী আবাজী হেডগেওয়ারের খান্দেশ পরিভ্রমণ অন্যতম। রামপায়লী থেকে নাগপুরে এসে তিনি ডাক্তারজীর বাড়ীতে থাকতে আসার পর তিনি সঙ্ঘকার্যের দিকে মনোযোগ দিতে শুরু করেছিলেন। মাঝে-মাঝে বাইরে প্রচারের জন্য ভ্রমণও করতেন। এই সময় তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় সত্তর বছর। কিন্তু তা সত্ত্বেও শরীর ও মন উভয় দিক থেকেই তিনি যুবকদের মত শক্ত-সমর্থ ও উৎসাহী ছিলেন। কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রত্যক্ষ করা যেত। তিনি ভুসাবল, ধুলিয়া, পরোলা, এরণ্ডোল, ধরণগাঁও, য়াবল, পিঁপলনের, রনালে, নন্দুরবার, দোঁড়াঈচেঁ, শিরপুর এবং শহাদেঁ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন এবং সঙ্ঘশাখার ব্যাপারে বহু লোকের সঙ্গে কথা বলেন।

বৃদ্ধ আবাজীর সঙ্গে কোন তরুণ কার্যকর্তাকে প্রেরণ করা আবশ্যক ছিল। এই কথা ভেবে একদিন ডাক্তারজী অকস্মাৎ শ্রী কৃষ্ণরাও বডেকরের নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আবাজী প্রবাসে যাচ্ছেন। তুমি কি দু মাসের জন্য তাঁর সঙ্গে যেতে পারবে?' শ্রী কৃষ্ণরাও বললেন, "হ্যাঁ, যেতে পারি।" তিনি নাগপুরের একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু ডাক্তারজীর কথা তাঁর কাছে এতই মূল্যবান্ ছিল যে তিনি চাকুরীর কথা চিন্তা করলেন না। ডাক্তারজীও সেখানেই কথা পাড়তেন, যেখানে তিনি ভালমত জানতেন যে তাঁর কথা ব্যর্থ হবে না। সেই সঙ্গে যে ব্যক্তি সমর্পণের মনোভাব নিয়ে তাঁর কথা শিরোধার্য করত, তার বিষয় সব রকম চিন্তা করার ব্যাপারে তিনিও কোন ত্রুটি থাকতে দিতেন না। দু মাসের জন্য বাইরে যাবার পর শ্রীবডেকর বহু বছর সঙ্ঘকার্যই করতে থাকেন। কিন্তু যখন ডাক্তারজী জানতে পারলেন যে তিনি তাঁর অসম্পূর্ণ শিক্ষার কথা অনুভব করছেন, তখন তাঁর পরবর্তী শিক্ষার জন্য তাঁকে প্রোৎসাহিত করলেন, শুধু তাই নয়, সাহায্য করারও ব্যবস্থা করলেন। তার ফলে আজ তিনি এক শিক্ষক থেকে এগিয়ে একজন আইনজ্ঞ হয়েছেন।

১৯৩৫-এর ডিসেম্বর মাসে পুনাতে মহামনা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের সভাপতিত্বে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হবার কথা। যে সব স্থানে দেশের কথা চিন্তা করার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একত্রিত হতেন, সেখানে ডাক্তারজী তাঁদের সঙ্ঘকার্যের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেবার

উপযুক্ত সুযোগ বলে মনে করতেন। এই সময়েও পুনার সঙ্ঘ শাখা আগন্তুক ব্যক্তিদের সামনে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট শারীরিক কার্যক্রম প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত হল। সেখানকার অধিকারীদের আগ্রহ ছিল যে প্রদর্শন-কার্যক্রমের সময় যেন ডাক্তারজীও সেখানে উপস্থিত থাকেন। অসুস্থতা এবং পায়ের ঘা-এর জন্য নড়া-চড়া সম্ভব ছিল না বলে ডাক্তারজী প্রথমে সেখানে উপস্থিত থাকা সম্ভব নয় জানালেন। কিন্তু অবশেষে ঐ অবস্থা নিয়েই তিনি ২৮শে ডিসেম্বর পুনায় পৌঁছে গেলেন।

মহাসভার অধিবেশনের জন্য আগত প্রতিনিধিদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে ৩০শে ডিসেম্বর পাঁচ শো গণবেশধারী স্বয়ংসেবকদের সামরিক সঞ্চলন এবং মানবন্দনার কার্যক্রম হল। এর পর সঙ্ঘের ভূমিকার উপর আলোকপাত করে ডাঃ মুঞ্জে এবং বাবু পদ্মরাজ জৈনের ভাষণ হল। স্বাস্থ্যের কারণে ডাক্তারজী বক্তৃতা দেননি। তবে অনুষ্ঠান শেষে তিনি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা অবশ্য প্রকাশ করেন। সমাগত সজ্জনবৃন্দের উপর কার্যক্রমের উত্তম প্রভাব তথা পরিণাম হল। এ সম্বন্ধে ডাক্তারজী লেখেন, "....এই কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে পরিণামকারী হয়েছিল। সকলেই মুক্ত কণ্ঠে সঙ্ঘের প্রশংসা করলেন। বাবু পদ্মরাজ জৈন তো সর্বত্র সঙ্ঘের স্তুতিগানই আরম্ভ করে দিলেন। বিভিন্ন স্থান থেকে সঙ্ঘ শাখা শুরু করার দাবী আসছে। এই ক্রমবর্ধমান কাজের জন্য প্রয়োজনীয় লোকবলের পূর্তি করার দায়িত্ব নাগপুরের উপরেই বর্তাচ্ছে। ..."

অধিবেশনের পর ভোর, বোম্বাই এবং অকোলা হয়ে ১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে ডাক্তারজী নাগপুর প্রত্যাবর্তন করলেন। প্রবাসে অত্যধিক হাঁটা-চলা করার ফলে পায়ের উপর বেশী চাপ পড়ার দরুন ঘা সারার বদলে আরো বেড়ে গেল। আর প্রবাসের সময়ে এক-এক স্থানে এক-এক রকম ওষুধ লাগানোর ফলে কষ্ট আরো বৃদ্ধি পেল। এ বিষয়ে ডাক্তারজী নিজের কষ্ট এইভাবে ব্যক্ত করেন, "হাঁটা-চলার পরিশ্রম এবং ডাক্তারদের পৃথক-পৃথক ড্রেসিং-এর কারণে ঘা ভাল হতে খুব বেশী সময় লাগছে।" পায়ের এই পীড়া প্রায় দু মাস স্থায়ী হয়েছিল।

এই সময় আবার অর্থের অসুবিধা দেখা দিল। সেই কারণে ডাক্তারজীর বাইরে যাওয়ার কার্যক্রম স্থগিত রেখে অর্থ সংগ্রহের জন্য পায়ের কষ্ট সত্ত্বেও ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছিল। কয়েকজন বন্ধুর চিঠির পর চিঠি আসছিল যে "বিশ্রামের জন্য কিছু দিন আমাদের এখানে এসে থাকুন।" ডাক্তারজী এই সব পত্রের কোন উত্তর দেননি। এই কারণে অকোলার শ্রী বাবা চিতলে কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে লেখেন, "না তো আমাদের কোন চিঠির আপনি উত্তর দিচ্ছেন, আর না বিশ্রামের জন্য অকোলায় আসছেন।" অবশেষে নিরুপায় হয়ে ডাক্তারজীকে তাঁর অবস্থা স্পষ্ট করে জানাতে হল। তিনি লিখলেন, "অর্থ একত্র করে সঙ্ঘকে দেবার আগে আমি নাগপুর ছাড়তে পারছিনা এবং বাইরে গিয়ে বিশ্রামের জন্য যেতে না পারায় আমার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। এই বিষম অবস্থায় কী করা যায় বুঝতে পারছিনা।" কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট যে নিজের স্বাস্থ্যের অবনতির কথা চিন্তা না করে তিনি সঙ্ঘকার্যের জন্য অর্থ সংগ্রহকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

পুনাতে অস্পৃশ্যতা নিবারক মণ্ডলের পক্ষ থেকে এক শত বক্তৃতার এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছিল। আয়োজনকারীরা ডাক্তারজীকেও লিখলেন যে আপনি কতগুলি বক্তৃতা এবং কোন ক্ষেত্রে দেবেন? কিন্তু মনে হয় যে অসুস্থতার কারণে ডাক্তারজী এই বিষয়ে তাঁর অসমর্থতার কথা তাঁদের জানিয়েছিলেন। আবার এও হতে পারে যে সঙ্ঘের প্রয়াসের ফলে স্বয়ং হিন্দুদের অন্তর্গত এই কৃত্রিম ভেদাভেদ দূর হচ্ছে দেখে পৃথকভাবে তার জন্য কোন কার্যক্রম করার প্রয়োজনীয়তা তাঁর মনে হয়নি।

এই সময়ে কয়েকজন ডাক্তারজীর সম্মুখে সঙ্ঘের পতাকার আকার বদল করে তার মধ্যে কিছু অভিনবত্ব আনার প্রস্তাব রাখেন। এই প্রস্তাবের যে উত্তর ডাক্তারজী দিয়েছিলেন, তা থেকে ধ্বজ সম্বন্ধে তাঁর মনে কীরূপ নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট কল্পনা ছিল তা জানা যায়। তিনি লেখেন, "ভগোয়া ধ্বজের ইতিহাস তিনশত বৎসরের নয়, অনেক প্রাচীন। অন্ততঃ আদ্য শঙ্করাচার্য তাঁর দিগ্বিজয় এই ধ্বজের ছত্রছায়াতেই করেছিলেন। এ বিষয়ে কারো কোন শঙ্কা থাকার কারণ নেই। তারও কত পূর্ব পর্যন্ত এই ধ্বজের ইতিহাস যেতে পারে গবেষকরা তার বিচার অবশ্য করতে পারেন। হিন্দু রাষ্ট্র অতি প্রাচীন রাষ্ট্র। আর তার পতাকা ভগোয়া-ধ্বজও ততটাই প্রাচীন। হিন্দু রাষ্ট্রের উৎপত্তি নতুন হয়নি, সেই কারণে তার নতুন ধ্বজের আবশ্যকতা নেই। সার কথা এই যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রাচীন জয়িষ্ণু ভগোয়াধ্বজকে ত্যাগ করে কোন অভিনব ধ্বজ গ্রহণ করবেনা।"

সঙ্ঘ কার্যের বাহ্য স্বরূপ, গণবেশ, সঞ্চলন এবং অনুশাসন প্রভৃতি সামরিক প্রকৃতির হওয়ার কারণে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির মনে এই আশাবাদ ও বিশ্বাস জেগে উঠছিল যে একদিন না একদিন এই শক্তি দেশের উপর উড্ডীন পরকীয় পতাকাকে সরিয়ে দিয়ে তার স্থানে ভারতের স্বত্ব তথা স্বাধীনতার উদ্‌ঘোষকারী ধ্বজাকে উত্তোলিত করবে। এই মনোভাবের কারণে সঙ্ঘকে প্রোৎসাহন দানকারী বহু মানুষের বলয় তাঁর চতুর্দিকে গড়ে উঠছিল। ১৯৩৬-এর মে মাসে বৈশাখ শুক্ল পঞ্চমীতে জগদ্‌গুরু আদ্য শঙ্করাচার্যের জয়ন্তীর দিনে নাসিকের শ্রী শঙ্করাচার্য বিদ্যাশঙ্কর ভারতী স্বামী অর্থাৎ ডাঃ কুর্তকোটি ডাক্তারজীকে 'রাষ্ট্র সেনাপতি' পদবীতে বিভূষিত করেন। এই সংবাদ যখন সংবাদপত্র গুলিতে প্রকাশিত হল তখন ডাক্তারজীর কয়েক জন বন্ধু এবং অনুগামী তাঁর ঠিকানায় নামের সাথে 'রাষ্ট্র সেনাপতি' পদবী যোগ করে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র লেখেন। কিন্তু ডাক্তারজীর এই সব ভাল লাগেনি। তিনি তো হিন্দু রাষ্ট্রের পুনরুদ্ধারের কাজে সাফল্য চাইছিলেন এবং তার জন্য সতত কাজে নিমগ্ন থাকতেই তিনি সন্তোষ বোধ করতেন। তাঁর আনন্দ ছিল লক্ষ-লক্ষ সহকর্মী নির্মাণে। হিন্দু সমাজের উপর ক্রমাগত আঘাত হতে থাকবে এবং তাকে প্রতিহত করার মত প্রভাবশালী সামর্থ্য না থাকলেও নামের পিছনে 'রাষ্ট্র সেনাপতি' শব্দ যুক্ত করাকে তিনি অসংগত ও বিড়ম্বনাপূর্ণ বলেই মনে করতেন। তিনি প্রদর্শন অপেক্ষা গঠনমূলক কাজ করতে এবং তার মধ্যে ডুবে থাকার ব্যাপারেই বিশ্বাসী ছিলেন। অতএব তিনি একটি পত্রে পরিষ্কার লিখে দিলেন, "শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যজীর প্রদত্ত পদবী আমাদের পক্ষে ব্যবহার করা ঠিক হবে না। একথা মনে রেখে সূচনা দিন যে আমাদের মধ্যে কেউ

এবং কখনো এই পদবী ব্যবহার করবেনা। সংবাদপত্রগুলিতেও এই পদবীর যত কম প্রচার হয়, ততই ভাল।''

পুনার অধিকারী শিক্ষণ বর্গের উদ্দেশে ডাক্তারজী ১৯৩৬-এর এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে নাগপুর থেকে রওনা হলেন। তার পূর্বে তিনি শ্রী কৃষ্ণরাও বডেকরকে ধুলে-জলগাঁও বিভাগে সঙ্ঘকার্যের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি দিনাংক ২৪ মার্চ-এ 'সঙ্ঘ স্থাপনা বিধি' শীর্ষকের অন্তর্গত এক গুরুত্বপূর্ণ সূচনাত্মক পরিপত্র লিখে তাঁকে দিলেন। পত্রক ক্ষুদ্র হলেও স্বয়ংসেবকের বিষয়ে তাঁর কল্পনা ও প্রত্যাশার উপর সুন্দর আলোকপাত করে। তার চার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ-এর উল্লেখ এখানে বাঞ্ছনীয় হবে। তিনি লেখেন, ''(৯) শিবাজীর প্রত্যেক অধিকারী যেমন রণকুশল ছিলেন, তেমনই সঙ্ঘের প্রত্যেক অধিকারী সঙ্ঘের সম্পূর্ণ শিক্ষায় পারদর্শী হওয়া চাই। (১০) হিন্দু স্বার্থ বিরোধী নয় এমন যে কোন সার্বজনীন কার্যে, চালকের অনুজ্ঞা প্রাপ্তির পরে যে কোন স্বয়ংসেবক নিজ দায়িত্বে অংশগ্রহণ করতে পারে। (১২) রাষ্ট্রীয় বৃত্তি সহ স্বদেশীব্রত পালন করা চাই। (১৩) আচার-শূন্যতা তথা কর্মকাণ্ড উভয়েরই অতিরেক ব্যতিরেকে সামগ্রিক বল-সম্পাদন-এর 'স্বর্ণিম মধ্যপন্থা' সঙ্ঘের কার্যক্রমে গ্রহণ করা উচিত। ক্ষণিকের জন্য উৎসাহবর্ধক তথা তাৎক্ষণিক বীরত্ব প্রকাশের কার্যক্রম হতে সঙ্ঘ যেন অলিপ্ত থাকে, কারণ তার দ্বারা সংগঠনের দৃঢ়তার উপর আঘাত লাগতে পারে।''

পুনার অধিকারী শিক্ষণ বর্গে কিছু দিন থাকার পর ডাক্তারজী নাগপুরে ফিরে এলেন। ফেরার সময়ে গাড়ীতে অত্যধিক ভিড় থাকার দরুন তাঁকে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যাত্রা করতে হল। কিন্তু অর্থাভাবের দরুন এই ধরনের কষ্টকে তিনি সর্বদা হাসিমুখে সহ্য করতেন এবং কাউকে জানতে দিতেন না যে তাঁর কোন কষ্ট হচ্ছে। অর্থ সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে তিনি সেইকালে মাঝে-মাঝে প্রবর্তিত 'জোন টিকিট' কিনে অল্প দিনে অধিকাধিক স্থানে ভ্রমণ করে শাখা-কার্য পরিদর্শন করে আসতেন। বলা বাহুল্য যে এই রূপ দৌড়া দৌড়িতে তাঁর অতিশয় কষ্ট হত।

পুনাতে বর্গে তাঁর থাকার সময়ে 'সোন্যামারুতি' মন্দিরের প্রশ্নে মুসলমানদের পক্ষ থেকে বিবাদ সৃষ্টির চেষ্টা চলছিল। তাদের অভিযোগ ছিল পার্শ্ববর্তী মসজিদে নমাজ পড়ার সময়ে মন্দিরের ঘন্টায় তাদের অসুবিধা হয়। এই বিষয় নিয়ে মুসলমানরা দাঙ্গা করারও অপচেষ্টা করে। কিন্তু তাদের আন্দাজে ভুল ছিল। এ সময়ে হিন্দুদের শক্তি যে বেশী তা ওরা বুঝতে পারেনি। এই সময়ে ডাক্তারজী হিন্দু সংগঠন সম্বন্ধে কথা বলার সময়ে এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন যে ''আমাদের এমন অবস্থা সৃষ্টি করা উচিত যাতে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে অন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণের দুঃসাহস যেন কেউ না করতে পারে। ঘন্টা বাজানোর মত নগণ্য প্রশ্ন তুলে আজও মুসলমানেরা এখানে আক্রমণ করার ধৃষ্টতা করতে পারে। এর থেকে একথা পরিষ্কার, এখনও আমাদের শক্তি অত্যন্তই অল্প।''

এইসময়ে লোণাবলার জনৈক সজ্জন ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। দাঙ্গা সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়ে তিনি বলেন, ''মুসলমানরা দেশদ্রোহী, অতএব তাদের এর জন্য শাস্তি দেওয়া উচিত।'' এর উত্তরে ডাক্তারজী বললেন, ''মুসলমানদের দেশদ্রোহী বলা একেবারে ভুল।'' ডাক্তারজীর এই উক্তি শুনে সেখানে উপস্থিত সকলেই ডাক্তারজীর দিকে

তাকিয়ে থাকেন। তাঁরা এ কথার অর্থ বুঝতে পারলেন না। তখন ডাক্তারজী ব্যাখ্যা করে বলেন, "মুসলমানদের দেশদ্রোহী বলার মধ্যে এই মনোভাব নিহিত যে এই দেশ ওদের। তাদের কাজই যেখানে দেশের পক্ষে ধ্বংসাত্মক, সেখানে তাদের দেশের শত্রু বলাই অধিক উপযুক্ত হবে।" দেশদ্রোহী এবং দেশের শত্রু, এই দুটি কথার পার্থক্য উপর থেকে বোঝা যাবেনা। কিন্তু বিগত এক হাজার বছরের ইতিহাস থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ভারতের সনাতন হিন্দু পরম্পরাকে বিনষ্ট করে বলপূর্বক এখানে বিদেশী পরম্পরা চাপিয়ে দিতে তৎপর মুসলমানরা এদেশের মালিক নয়, আক্রমণকারী। অতএব তাদের শত্রুই বলতে হবে। জয়চন্দ, সূর্যাজী পিসাল এবং বালাজীপন্ত নাতু — এরা দেশেরই লোক ছিল, কিন্তু ওরা স্বজনদ্রোহিতা করে দেশকে গহ্বরে নিক্ষেপ করার প্রয়াস করে। অতএব ওদের দেশদ্রোহী বলতে হবে। কিন্তু যারা স্পষ্টভাবে নিজেদের বাইরের লোক বলে স্বীকার করে এখানে তাদের প্রভুত্ব স্থাপন করার চেষ্টা করছে, তাদের জন্য শত্রু ছাড়া অন্য কোন শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু ডাক্তারজী একথাও পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে যদি এই লোকেরা বিদেশীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং তাদের আক্রামক মনোভাব পরিত্যাগ করে এখানকার রাষ্ট্র জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তদনুরূপ আচরণ করতে শুরু করে, তাহলে তাদের এখানে বসবাস অব্যাহত রাখার ব্যাপারে কিঞ্চিৎমাত্র আপত্তি থাকতে পারেনা। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই পরিবর্তনের কোন চিহ্ন দেখা যাবেনা, ততদিন তাদের 'দেশদ্রোহী' বলাও ডাক্তারজীর নিকট উপরিউক্ত কারণে অনুপযুক্ত বলে মনে হত।

রাষ্ট্রীয়তা সম্বন্ধে ডাক্তারজীর দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার পূর্বেই নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রাজনীতির মধ্যে মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রয়াসের প্রতি তিনি অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তা দেখে তাঁর অভিমত অধিকতর পরিপুষ্ট হত। মুসলমান নেতাদের স্পষ্ট ভাষায় পাকিস্তানের দাবী এবং সে ব্যাপারে তাঁদের প্রচারিত বক্তব্যগুলির তিনি মাঝে-মাঝে উল্লেখ করতেন তাঁর বৈঠকগুলিতে। ১৯৩৫-এর জুলাই মাসে 'পাকিস্তান ন্যাশনাল মুভমেন্ট'-এর সভাপতি শ্রী সি রহমৎ আলি পাকিস্তানের দাবী করে কেম্ব্রিজে যে পত্রক প্রকাশ করেন, এবং মুসলমান সমাজ কর্তৃক হিন্দুদের গিলে ফেলার যে ষড়যন্ত্র চলছিল, সেগুলি সংক্রান্ত গুপ্ত পরিপত্রকগুলিও তাঁর হস্তগত হয়েছিল। এইগুলির উল্লেখ করে তিনি সকলকে আসন্ন সংকট সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক করে দিতেন।

এই সময়ে মিরজের শ্রী দামোদরপন্ত ভট্ট ডাক্তারজীর নিকট পত্র পাঠিয়ে তাঁর জীবন সম্বন্ধে কিছু তথ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের আলোক চিত্র চেয়ে পাঠান। কর্মব্যস্ততার দরুন ডাক্তারজী এই পত্রের উত্তর দিতে পারেননি। শ্রী ভট্ট পুনরায় তাঁকে স্মরণ করিয়ে আর একটি পত্র পাঠান। কিন্তু তাঁর জীবনচরিত ছাপা হোক, একথা ডাক্তারজীর স্বভাবের সঙ্গে একটুও মিলতনা। তাঁর মতে শুধুমাত্র কাজের প্রচার হোক এবং তাও তার বর্ধমান শক্তির দ্বারা। ডাক্তারজী অসম্মতিসূচক পত্র পাঠিয়ে দিলেন। এই উত্তরের মাধ্যমে ডাক্তারজীর প্রসিদ্ধি-পরাঙ্মুখতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কাউকে মানা করতে গিয়ে তার মনে যাতে দুঃখ না হয়, এ বিষয়ে তাঁর শালীনতা তথা কুশলতাও তাঁর উত্তরের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি

লেখেন, "আপনার মনে আমার প্রতি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জন্য যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা রয়েছে তার জন্য আমি হৃদয় থেকে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনার ইচ্ছা আমার জীবনচরিত প্রকাশ করার। কিন্তু আমার মনে হয়না যে আমি এত বড় অথবা আমার জীবনে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আছে, যা মুদ্রিত করা যায়। সেই প্রকার আমার অথবা সঙ্ঘের যে ধরণের ফটো আপনি চেয়েছেন, তাও নেই। সংক্ষেপে এটুকুই বলতে পারি যে লেখার উপযুক্ত জীবন চরিতের মালিকার মধ্যে আমার জীবন-চরিত একেবারেই বেমানান।" এই পত্র লেখা হয় ১২ই জুলাই।

১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে ডাক্তারজী একদিন অকস্মাৎ সংবাদ পেলেন যে "শ্রীগুরুজী হঠাৎ বাড়ী থেকে কোথায় চলে গেছেন।" এই বার্তা ডাক্তারজীর নিকট অপ্রত্যাশিত ছিলনা, কিন্তু সংবাদ শুনে তাঁর অত্যন্ত দুঃখ হল। ডাক্তারজীর একান্ত ইচ্ছা ছিল যে দেশের এই গম্ভীর তথা ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কর্তৃত্ববান্ ও সুশিক্ষিত তরুণরা নিজেদের সর্বস্ব উৎসর্গ করে, আকাশকেও অবনত করার আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রাণপণে দেশের জন্য প্রয়াসের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন। কিন্তু তার বিপরীত যখন এক সুযোগ্য কর্তৃত্বশালী তরুণ উকিল নিজের শক্তি বিনিয়োগ করে সংগঠনের প্রয়োজন পূরণ করার পরিবর্তে বাড়ী ছেড়ে অজ্ঞাত স্থানে চলে যায়, তখন ডাক্তারজীর কত দুঃখ হয়েছিল অনায়াসে তার অনুমান করা যেতে পারে।

শ্রী গুরুজী যেমন-তেমন করে এক বছর ওকালতি করেছিলেন। ব্যবসায়ে তাঁর সহকর্মী শ্রী দত্তোপন্ত দেশপাণ্ডেও সঙ্ঘের ভাল কার্যকর্তা এবং ডাক্তারজীর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে ডাক্তারজী শুধু এই টুকু জানতে পারলেন যে গুরুজী কোন আশ্রমে[১] চলে গেছেন। শ্রী দেশপাণ্ডের সঙ্গে দেখা হলেই ডাক্তারজী জিজ্ঞেস করতেন — "বলুন, আপনার বন্ধু কবে ফিরছেন?" বৈঠকে যখনই শ্রী গুরুজীর কথা উঠত, তখন ডাক্তারজী মুক্ত কণ্ঠে তাঁর প্রশংসা করতেন।

গুরুজী এই ভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পর তাঁর পূজ্য মা-বাবা রামটেকে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে তাঁর ফিরে আসার পথ চেয়ে বসে থাকতেন। একইভাবে ডাক্তারজী এবং গুরুজীর অন্য বন্ধুরাও অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। অপরদিকে গুরুজী নিশ্চিন্ত মনে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দের কৃপাধন্য স্বামী অখণ্ডানন্দজীর সেবায় এমনই নিমগ্ন ছিলেন যেন তাঁর অনন্ত জন্মের পুণ্যফলই ভোগ করছেন। "আনন্দ আনন্দাশীঁ ঘোটী। বোলতাঁ পরেসি পড়ে মিঠী" ("আনন্দ মহা আনন্দ ছায় গো। মিষ্ট যাহাই বল সকলই ভাল লাগে গো")। এই প্রকার যে সমাধিসুখের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সুখে স্বামী অখণ্ডানন্দজী বিভোর থাকতেন। এই প্রকার মহাপুরুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য অত্যন্ত দুর্লভ প্রাপ্তি। তিনি যেরূপ নিরলস ভাবে স্বামী অখণ্ডানন্দের সেবা করতেন, তাতে তাঁর আনন্দ দ্বিগুণ বর্ধিত হত। সেবার মধ্যে অভুতপূর্ব সামর্থ্য থাকে। সেই ভাব সেবকের মন থেকে অহংকারকে সমূলে উচ্ছেদ করে সেব্যকে কৃপার মহাসাগরে পরিণত করে। সেবার এই সামর্থ্য সারগাছি আশ্রমের মধ্যে প্রকটিত হচ্ছিল।

---

(১) এই সময়ে গুরুজী বাংলার সারগাছি নামক স্থানে স্বামী অখণ্ডানন্দের আশ্রমে ছিলেন।

পাঞ্জাব প্রান্ত থেকে কার্যকর্তা প্রেরণের দাবী আসতে থাকায় ডাক্তারজী ঐ বছর শ্রী জনার্দন চিঞ্চালকর, শ্রী রাজাভাউ পাতুরকর, শ্রীনারায়ণরাও পুরাণিক প্রমুখ কার্যকর্তাদের সেখানে পাঠালেন। নিজেদের বিদ্যাভ্যাস অব্যাহত রেখে এই কার্যকর্তারা লাহোর ভাগে সঙ্ঘ-কার্যের জাল বিস্তার করতে শুরু করে দিলেন। শ্রী বাবা সাহেব আপটে এবং শ্রী দাদারাও পরমার্থকে যেখানে যখন প্রয়োজন, সেখানেই পাঠিয়ে দেওয়া হত। সেই কারণে কখনো মহারাষ্ট্রে, কখনো পাঞ্জাবে, আবার কখনো উত্তরপ্রদেশ অথবা মহাকোশলে তাঁরা ক্রমাগত বিচরণ করতেন। ডাক্তারজী তাঁর পত্রের মাধ্যমে এই সমস্ত কার্যকর্তাদের মার্গদর্শন এবং উৎসাহ বৃদ্ধি করতেন। কার্যকর্তাদের আচরণ সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে সূত্ররূপে তিনি যা লিখেছেন, সেগুলি সব যদি সংগ্রহ করা যায়, তাহলে সংগঠন-শাস্ত্রের এক অপূর্ব আচার-সংহিতা সংকলিত করা যায়। পাঞ্জাবে কাজ করতে যে কার্যকর্তা গিয়েছিলেন, তাঁকে তিনি লিখেছিলেন, "অন্য প্রান্তে সঙ্ঘের কাজ করতে গিয়ে সম্পূর্ণ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সেখানকার মানুষদের পরখ করে চাতুর্যের সঙ্গে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে। কাজকে ত্বরান্বিত করার অহেতুক ব্যস্ততায় আমাদের হাত দিয়ে যেন কোন ভুল-ত্রুটি না হয়।" এই ধরনের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত উপদেশ তাঁর নানা পত্রে পাওয়া যায়।

এই বছরই ডাঃ মুঞ্জে একটি সৈনিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস শুরু করেন। তরুণদের সামরিক শিক্ষা দানের যোজনা তাঁর মনে অনেক দিন থেকেই ছিল। তাঁর এইরূপ চিন্তার কারণে সরদার বিট্ঠলভাই প্যাটেল তাঁকে ঠাট্টা করে 'কর্নেল মুঞ্জে' অথবা 'জেনারেল মুঞ্জে' বলে ডাকতেন। সে সময়ে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে ইংরেজরা চলে যাবার পর হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে হিন্দুদের মধ্যে এমন তরুণ সৈনিক অবশ্য তৈরী রাখতে হবে যারা ঘুষির জবাব ঘুষি দিয়ে এবং গুলির জবাব গুলি দিয়ে দিতে পারবে। এই উদ্দেশ্যেই এই রূপ বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ডাঃ মুঞ্জে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ডাক্তারজীকে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতিতে রেখেছিলেন, কারণ ডাঃ মুঞ্জে ভাল করেই জানতেন যে তিনি প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও পথ সন্ধান করে নিতে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। সঙ্ঘের কাজ তাঁর এইরূপ গুণের জীবন্ত প্রমাণ ছিল। ১৯৩৬ সালে পরিচালক-সমিতির যে বৈঠক বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হল, ডাক্তারজী তাতে উপস্থিত ছিলেন। থানে, পুনা ইত্যাদি শাখাগুলিও পরিদর্শন করেন। তখন তাঁর গলা ভেঙে গিয়েছিল, তা সত্ত্বেও পুনার হুসবনীসের প্রাঙ্গণে তাঁর ভাষণ হল। তরুণদের উদ্দেশ্য করে ঐ ভাষণে তিনি বলেন, "আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি মনের মধ্যে সর্বদা স্বাভিমান থাকা উচিত। কিন্তু নিজেদের বাড়ীতেই যদি আমরা পিতা ও ঠাকুর্দার প্রতি সম্মান না করি, তাহলে পূর্বপুরুষদের সম্মান কেমন করে রক্ষা করতে পারব।" ডাক্তারজীর তত্ত্ব-প্রতিপাদন সর্বদাই দৈনন্দিন আচরণের সঙ্গে সংলগ্ন থাকত।

পুনা থেকে রওনা হয়ে নগর, জুন্নর, নাসিক, ভুসাবল, অকোলা, মূর্তিজাপুর, ওয়ার্ধা প্রভৃতি শাখা পরিদর্শনের পর ডাক্তারজী ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ নাগপুর প্রত্যাবর্তন করেন। নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন। এই সময়ে তিনি সঙ্ঘের তত্ত্বজ্ঞান ও

ব্যবহারের বিষয়ে বিশদ করে পর-পর দশটি ভাষণ সেখানকার অধিকারীদের সম্মুখে প্রদান করেন। এই সব ভাষণ চলা কালে অন্য এক নগর থেকে জনৈক উকিল ভদ্রলোক নাগপুরে আসেন। তিনি কিছু দিন পূর্বেই সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। তিনি জানতে পারলেন যে বক্তৃতামালা চলার সময়ে ডাক্তারজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যাবে। একদিন যখন ডাক্তারজীর ভাষণ চলছিল তখন তিনি সাক্ষাতের জন্য এলেন। নাগপুরের অধিকারীবর্গ কাজ করার সময়ে কোথায়-কোথায় ভুল করেন, ডাক্তারজী তখন সে বিষয়ে বিশ্লেষণ করছিলেন। কিন্তু দূর থেকে এক নতুন সজ্জনকে আসতে দেখে ডাক্তারজী ভেবে দেখলেন যে তাঁর সামনে নাগপুরের কার্যকর্তাদের সমালোচনা করা ঠিক হবেনা। সেই কারণে তিনি হঠাৎই তাঁর বিষয় পরিবর্তন করে অত্যন্ত সরল ও নতুন ব্যক্তির বোধগম্য হবার মত ভাষায় সঙ্ঘের তত্ত্বজ্ঞান উপস্থাপন করতে শুরু করলেন। বুদ্ধিমান্ স্বয়ংসেবকেরা সেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন, তাঁরা ডাক্তারজীর এরূপ সচেতনতা দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন।

সঙ্ঘের শাখাগুলিতে হিন্দুত্বের যে প্রভাবী সংস্কার প্রদান করা হয় তাঁর প্রতিধ্বনি ক্রমে এখন ঘরে ঘরে শোনা যেতে থাকল। হিন্দু মহিলাদের উপর মুসলমানদের অত্যাচারের মর্মান্তিক সংবাদ অনেক সময়েই শোনা যাচ্ছিল। যে সব মহিলারা সঙ্ঘকার্যকে জেনেছিলেন এবং দেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে এই মনোভাব জাগ্রত হচ্ছিল যে সঙ্ঘের মাধ্যমে শুধুমাত্র হিন্দু তরুণদের জাগ্রত করলেই চলবেনা। নারীদেরও আত্ম-সংরক্ষণে সক্ষম করে তুলতে হবে। যতদূর সঙ্ঘের সম্পর্ক, ডাক্তারজী আমাদের সমাজের পরম্পরা, মনের গঠন এবং ঐ সময়ের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে, তার কার্যক্ষেত্র পুরুষদের মধ্যেই নির্দিষ্ট করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে জনৈক স্বয়ংসেবকের মা শ্রীমতী লক্ষ্মীবাঈ কেলকর ওয়ার্ধায় ডাক্তারজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি মহিলাদেরও আত্ম-সংরক্ষণে সক্ষম করে তাদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁর সম্মুখে উপস্থাপন করেন। এই সাক্ষাৎকারটি শ্রী আপ্পাজী জোশীর গৃহে হয়েছিল। এ বিষয়ে শ্রীমতী কেলকর বলেন, "তিনি (ডাক্তারজী) আমাকে দেখা করার কারণ জিজ্ঞেস করেন। আমি বললাম, "আপনি তরুণদের যে রকম শিক্ষিত করেন এবং ধ্যেয়বাদের শিক্ষা দেন, মেয়েদের সেরকম কেন শেখান না?" তিনি বললেন, 'এখন তো আমরা পুরুষদের জন্যই এই কার্যক্রম রেখেছি।' একথা শুনে আমি বললাম, 'আপনাদের শিক্ষণ আমাকে শেখাবার অনুমতি আপনি আমার পুত্রকে দিন। সে যদি আমাকে শিখিয়ে দেয়, তাহলে আমি অন্য মহিলাদের শিখিয়ে দেব।' ডাক্তারজী একথাতেও রাজি হলেন না। তখন শ্রীমতী লক্ষ্মীবাঈ বললেন, "মহিলারাও পরিবারের মতই রাষ্ট্রের অঙ্গ। আপনাদের সংগঠনের চিন্তাধারা যদি মায়েদের কাছেও পৌঁছে যায়, তাতে সঙ্ঘেরও উপকার হবে।" এইভাবে পুনরায় অনুরূপ কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ডাক্তারজী বললেন, "কাজের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে যদি আপনারা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকেন তাহলে আপ্পাজী জোশী আপনাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।"

এর পরে দু মাসের মধ্যে তিনি ডাক্তারজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং কাজের সম্পূর্ণ রূপরেখা স্থির করেন। এ সম্বন্ধে তিনি লেখেন, "তিনি এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেন যে সংস্থার নাম

সঙ্ঘ থেকে ভিন্ন, কিন্তু সমানার্থক হওয়া উচিত। তিনি একথাও বলেন যে রেল লাইনের মত দুটি সংগঠনই সমান্তরাল চলবে এবং পরস্পর থেকে পৃথক থাকবে। মহিলাদের সম্মুখে কী কী অসুবিধা আসতে পারে, সে বিষয়েও তিনি আভাস দিলেন। প্রত্যেক বৈঠকে তিনি যাচাই করতেন যে আমি আমার সংকল্পে কতটা দৃঢ়। আমার সংকল্পে আমি দৃঢ় থাকার কারণে আমি তাঁকে বলতাম, "আপনার আশীর্বাদ ও ঈশ্বরের কৃপা থাকায় আমার মনে হয়না যে আমার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। আমার মনে হল যে আমি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি, কেননা ডাক্তারজী যথাশীঘ্র সাহায্য করতে স্বীকৃত হলেন। ২৫শে অক্টোবর ১৯৩৬-এর বিজয়া দশমীর শুভ মুহূর্তে 'রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি'-র জন্ম হল।"

নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকেই ডাক্তারজীর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটল। তা সত্ত্বেও তিনি মনে করলেন যে পূর্ব নির্ধারিত কার্যক্রম পুরো না করলে অনেকেরই প্রত্যাশা পূরণ না হলে কষ্ট হবে। সেই কথা বিবেচনা করে তিনি ১৩ থেকে ২৩শে নভেম্বর পর্যন্ত কাটোল তালুকা পরিভ্রমণে রওনা হলেন। সে সময়ে তাঁর দেহে জ্বর ছিল, এবং মাঝে-মাঝে কাসিও হচ্ছিল। এরকম অবস্থাতেও কোন রকম ইতঃস্তত না করে তিনি সব কার্যক্রম আনন্দপূর্বক নির্বাহ করেন।

ডাক্তারজীকে লোকসংগ্রহের জন্য কত মূল্য দিতে হয়েছিল, সে বিষয়ে এই পরিভ্রমণকালের একটি ঘটনা উল্লেখনীয়। মুক্তাপুরের এক তরুণ স্বয়ংসেবক ডাক্তারজীকে ভোজনের জন্য আমন্ত্রিত করে। ডাক্তারজীর ক্বচিৎ আগমন ঘটে, একথা চিন্তা করে, তাঁর জন্য পুরি ও শ্রীখণ্ড তৈরী করা হয়। থালায় শ্রীখণ্ড-পুরি পরিবেশন করা হয়েছে দেখে ঐ তালুকার সঙ্ঘচালক শ্রী ভাউসাহেব ঘাটে ক্রুদ্ধ হয়ে ঐ স্বয়ংসেবককে জিজ্ঞেস করেন, "ডাক্তারজী অসুস্থ জেনেও তাঁর জন্য এই ক্ষতিকর শ্রীখণ্ড কেন তৈরী করিয়েছ?" একথা শুনে স্বয়ংসেবকটি ঘাবড়ে গেল। তাই দেখে ডাক্তারজী হাসতে হাসতে বলেন, "না, না। এতে আমার কোন কষ্ট হবেনা।" এক তরুণ কার্যকর্তার মনে যাতে কষ্ট না হয়, তার জন্য ডাক্তারজী সানন্দে সেখানে ভোজন করেন এবং পরবর্তী কার্যক্রমে কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পুরো প্রবাসকালে কাউকে কিছু জানতে না দিয়ে সহ্য করেন। ঐ পরিভ্রমণ থেকে ফিরে এসেই দু দিন পরে বিদর্ভ ভাগে প্রবাসের জন্য বেরিয়ে পড়েন। মাঝের দু দিনে শ্রী আপ্পাজী জোশীকে লিখিত পত্রে তিনি জানান, "রোজই জ্বর হচ্ছে, মাথায় ব্যথা হয় এবং দুর্বলতা বোধ হয়।" লোকসংগ্রহ নিছক কথার কথা নয়। ক্ষণে-ক্ষণে জীবনের প্রতি কণিকাকে জল করে গলিয়ে দিয়ে লোকসংগ্রহ করতে হয় এবং তার মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মত উন্নতিশীল সংগঠনের নির্মাণ সম্ভব হয়।

কাটোলের পর বিদর্ভে তের দিনের প্রবাসে তিনি একুশটি স্থান পরিদর্শন করেন। শত-শত ব্যক্তিদের সম্মুখে তিনি সঙ্ঘের চিন্তাধারা উপস্থাপন করেন। এই পরিভ্রমণ হয় মোটরগাড়ীতে। ডাক্তারজীর সঙ্গে শ্রী গোপালরাও চিতলে, শ্রী তাত্যাসাহেব সোহোনী, শ্রাবণে মাস্টার এবং দাদারাও পরমার্থও ঐ গাড়ীতেই ভ্রমণ করতেন। এই ভ্রমণ যে কীরকম ঝড়ের গতিতে চলেছিল এবং কার্যক্রম যে কত পরিশ্রম সাপেক্ষ ছিল, তার বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রী

তাত্যাসাহেব সোহোনী বলেন, "সন্ধ্যায় শাখা ও রাত্রে বৈঠকের কার্যক্রম থাকত। কার্যকর্তাদের এই বৈঠক চলত রাত বারোটা পর্যন্ত, এবং তারপর চলত নানাবিধ গল্প-সল্প, লৌকিকতা-বর্জিত আলাপ-আলোচনা — যা রাত তিনটে পর্যন্ত চলত। ডাক্তারজীর বৈঠকগুলি ছিল প্রাণবন্ত, সহজ-সরল। প্রবাসকালে মোটরে বসে-বসেই একটুক্ষণ চোখ বুজে আসত। সেটুকুই ছিল ডাক্তারজীর ঘুম। তারপর সারা দিন নানা লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, তাঁদের সঙ্গে সঙ্ঘের বিষয়ে কথাবার্তাতেই কেটে যেত।" এই প্রবাসকালে ডাক্তারজী প্রত্যেক জেলায় জেলা সঙ্ঘচালক হিসাবে কার্যকর্তাদের মধ্যে থেকে কয়েক জনকে নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ বিদর্ভ প্রান্তের সঙ্ঘচালক হিসাবে অকোলার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীবাপুসাহেব সোহোনীকেও এই প্রবাসকালে মনোনীত করেন।

১৯৩৬ এর ডিসেম্বর মাসে ডাক্তারজী নাগপুর ও চান্দার শিবিরগুলিতে যান। দু জায়গার ভাষণেই তিনি সঙ্ঘের কাজ মহারাষ্ট্র থেকে আরম্ভ করে সুদূর করাচী ও লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে চলেছে - একথা বলে আনন্দ ব্যক্ত করেছিলেন। চারি দিকে অহিংসার প্রচার হওয়ার কারণে আগেই দুর্বল ও ধৈর্যহীন হিন্দু সমাজের কী অবস্থা হবে এ বিষয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। নাগপুরে ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "অহিংসা পরমো ধর্মঃ" এই তত্ত্ব হিন্দু সমাজে ওতপ্রোত থাকার ফলে সমস্ত সমাজকে এ বিষয়ে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব হিন্দুদের উপর রয়েছে। কিন্তু আমাদের যদি এই ইচ্ছা থাকে যে অন্য সকলে যেন আমাদের সদুপদেশ শোনে, তাহলে আমাদের কাছে সামর্থ্য থাকা আবশ্যক। হিন্দু সমাজ আজ দুর্বল। হিংস্র প্রবৃত্তির লোকেরা দুর্বল সমাজকে আদৌ গ্রাহ্য করেনা। যদি অহিংসার অনুপান আমরা হিংস্র সমাজকে সেবন করাতে চাই, তাহলে আমাদের এত বেশী শক্তিশালী হতে হবে যাতে আমাদের উপদেশ ফলপ্রদ হয়। হিন্দুস্থানে অহিংসার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে হিন্দু সমাজকে, তার দুর্বলতা দূরীভূত করে, শক্তিশালী করে তুলতে হবে। কিন্তু সংগঠন ব্যতীত এই কাজ হতে পারেনা। অতএব, হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করে শক্তিশালী করে তোলা প্রত্যেক হিন্দুর কর্তব্য। সঙ্ঘ শুধু এই কাজই করতে চায়।"

চান্দার ভাষণে ডাক্তারজী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ধর্মরক্ষণের উদ্দেশ্যের উপর আলোকপাত করেছিলেন। সঙ্ঘের সামরিক স্বরূপকে দেখে অহিংসার পূজারীরা যেমন একে হিংসক বলে মনে করে, তেমনই কিছু কর্মকাণ্ডী সজ্জন সঙ্ঘের বিরুদ্ধে এই অভিযোগও উত্থাপন করেন যে সঙ্ঘে সন্ধ্যা করা শেখানো হয় না, ফোঁটা-তিলক ইত্যাদি লাগানো হয় না এবং সকলে এক সঙ্গে বসে ভোজন করে, অতএব "সঙ্ঘের ধর্ম-রক্ষার ভাষা মিথ্যা।" সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা যে অর্থে নিজেদের ধর্মরক্ষক বলে, তা পরিষ্কার করে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। সেই উদ্দেশ্যে ডাক্তারজী চান্দার ভাষণে বলেন, "আমরা হিন্দুধর্মনিষ্ঠ, এর জন্য আমরা অত্যন্ত গর্ববোধ করি। কিন্তু আমরা একথা বুঝি না যে ধর্ম-রক্ষণ ও ধর্ম-পালনের মধ্যে পার্থক্য আছে। স্নান সন্ধ্যা ইত্যাদি ব্যক্তিগত ধার্মিক আচারগুলি শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে করা ধর্মরক্ষণ নয়। যারা ধর্মের রক্ষা করতে চায় তাদের কাছে ধর্মের উপর আক্রমণকারীদের প্রতিহত করার ক্ষমতা থাকা চাই। আমাদের করুণ অবস্থার জন্য আমরাই দায়ী। আজ হিন্দুস্থানে

যদি ধর্মপ্রচেষ্টা ব্যাপ্ত হয়েছে, তার জন্য আমাদের পূর্ব-পুরুষরা দায়ী। তাঁরা কি বিদেশীদের আক্রমণ দেখতে পাননি? পরদেশীদের মধ্যে আক্রমণের পাশবিক বৃত্তি বর্ধিত হচ্ছে, একথা জেনে রাখুন। হিন্দুস্থানে হিন্দু সমাজ স্বাধীন থাকতে পারে, তারা সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে, বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারে, এটা সঙ্ঘের বিশ্বাস। এর জন্য আবশ্যক অনুশাসন, শীল ও সংগঠনের শিক্ষা আজ পঁচিশ হাজারের অধিক তরুণ গ্রহণ করে চলেছে। সঙ্ঘের বীজ গ্রামে-গ্রামে তথা প্রান্তে-প্রান্তে পৌঁছে গেছে। সমাজের মধ্যে শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও স্বাভিমান উৎপন্ন হয়ে গেলে পঁচিশ কোটি সংগঠিত মানুষের দেশের মধ্যে সম্মানপূর্বক জীবন-যাপন করা অসম্ভব নয়। এই দেশ হিন্দুস্থান নামে বিখ্যাত। হিন্দুত্বই এখানকার রাষ্ট্রের প্রাণ। অতএব, এই দেশ, ধর্ম ও সংস্কৃতির সব থেকে অধিক দায়িত্ব হিন্দুদেরই নির্বাহ করতে হবে। সঙ্ঘের ইচ্ছা এটাই।"

ডাক্তারজী আগ্রহপূর্বক এ কথা প্রতিপাদন করেছিলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ভাবনা অনুসারে আচার-ধর্ম অবশ্যই পালন করতে পারে, কিন্তু ধর্ম-রক্ষণের জন্য তো সম্পূর্ণ সমাজের ধারণা করতে পারে এমন বীরব্রতধারীদেরই আবশ্যকতা আছে।

২৪. কিছু টক ঃ কিছু মিষ্টি

নাগপুরের শীত শিবির শেষ করে পরমপূজনীয় ডাক্তারজী ১লা জানুয়ারী ১৯৩৭ পুনায় এলেন এবং সেখানকার শীত-শিবিরে দু দিন রইলেন। মহারাষ্ট্রে এটা প্রথম শিবির হওয়ার দরুন সেখানে বিপুল উৎসাহের বাতাবরণ ছিল, তার উপর ডাক্তারজীর আগমনের কারণে তা আরও বর্ধিত হয়। ডাক্তারজী শিবিরের কার্যক্রমে গণবেশে উপস্থিত থেকে প্রত্যেকটি বিষয় অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সঙ্গে নিরীক্ষণ করতেন। একদিন রাত্রে শংকা-সমাধানের কার্যক্রম হল। ডাক্তারজী অত্যন্ত সুবোধ্য তথা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় স্বয়ংসেবকদের শংকাসমূহের নিরসন করলেন। এই প্রশ্নোত্তরের সময়ে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ যে চিন্তাধারা ব্যক্ত করেন, তা দ্রুত স্বয়ংসেবকদের অনুপ্রাণিত করে। ঘটনা ছিল এই রকম — একবার তিনি ডাঃ মুঞ্জের সঙ্গে ঔরঙ্গাবাদের শুক্লযজুর্বেদীয় কণ্ব শাখার ব্রাহ্মণ পরিষদে গিয়েছিলেন। সেখানে ডাঃ মুঞ্জেকে নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। ডাক্তারজীও ডাঃ মুঞ্জের মোটর গাড়ীর পিছনের একটি গাড়ীতে বসেছিলেন। মিছিল ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছিল। পথে স্থানে-স্থানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য মিছিল থেমে-থেমে চলেছিল। এক স্থানে জনৈক সজ্জন পাশে দাঁড়ানো এক মুসলমান ব্যক্তিকে ডাঃ মুঞ্জের পরিচয় জানার জন্য জিজ্ঞেস করলেন, ''মোটরগাড়ীতে যে নেতা বসে আছেন, উনি কে? একথা শুনে মুসলমান লোকটি তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, ''ও তো ছারপোকার ঠাকুরদা।''

এই ঘটনা বিবৃত করে ডাক্তারজী বললেন, ''আমাদের সমাজের এক প্রধান নেতা সম্বন্ধে অন্য সমাজের এক সাধারণ ব্যক্তি যদি এই ধরণের বাজে কথা বলে, তাহলে তার অর্থ এই যে আমাদের সমাজ এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে ওরা মনে করে একে ছারপোকার মত পিষে মেরে ফেলা যায়। অতএব, আমাদের সমাজকে আমাদের দেশ হিন্দুস্থানে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগঠিত প্রয়াস করে যেতে হবে।''

পুনা শিবিরের পরে ডাক্তারজী পণ্ঢরপুর ও শোলাপুর হয়ে সাংলী গেলেন। সেখান থেকে মহারাষ্ট্রের প্রান্ত সঙ্ঘচালক শ্রী কাশীনাথপন্ত লিময়েকে সঙ্গে নিয়ে মিরজ, জয়সিংহপুর, হরিপুর, কোল্হাপুর, কাগল, নিপানী, চিকোডী, সৌঁদলঙ্গে, চিপলুণ, গুহাগর, দাভোল, মাখন, কহ্লাড, সাতারা প্রভৃতি ছাব্বিশটি স্থানে গিয়ে সেই সব স্থানের শাখাগুলি পরিদর্শন করেন। প্রত্যেক স্থানের বৃত্তান্ত স্থানাভাবের কারণে দেওয়া সম্ভব হবেনা। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ প্রসঙ্গের উল্লেখ অবশ্য করতে হবে।

যে সময় ডাক্তারজী কোল্হাপুরে যান, সেই সময় সেখানকার সঙ্ঘ কার্য ''রাজারাম স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'' এই নামে চলত। কারণ সরকারী চাপের কারণে সেখানকার দেশীয় রাজ্যের

অধিকারীরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ছিল। সেখানকার প্রসিদ্ধ অম্বাবাঈয়ের মন্দির প্রাঙ্গণে ডাক্তারজীর ভাষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সভায় শ্রোতারা এসে আসন গ্রহণ করলেন, কিন্তু সভাপতি মহাশয় সরকারের ভয়ে উপস্থিত হলেন না। তাই দেখে ডাক্তারজী ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের ছবি সভাপতির আসনে রাখতে বললেন, এবং তাঁর সভাপতিত্বেই নিজের ভাষণ শুরু করে দিলেন। দুই-তিন হাজার সংখ্যক শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধিত করে ডাক্তারজী বললেন, ''কোল্হাপুরের মত নগরে আমার ভাষণের জন্য প্রত্যক্ষ ছত্রপতি উপস্থিত থাকায় অন্য কোন সভাপতির কী দরকার? আমি শিবাজী মহারাজকে সভাপতি রূপে লাভ করেছি, এ আমার অহোভাগ্য।''

এই প্রবাসকালে মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র পরিচালক তথা লেখক শ্রীভালজী পেণ্ঢারকর ডাক্তারজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। এই সাক্ষাৎকারের পরিণাম হল এই যে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হয়ে গেলেন। পরবর্তীকালে ১৯৪০ সালে পুনায় এক জনসভায় বক্তৃতা করার সময়ে ডাক্তারজীর সঙ্গে তাঁর উক্ত সাক্ষাৎকার সম্পর্কে কয়েকটি নির্বাচিত শব্দে বর্ণনা করে বলেন, ''নাগপুর থেকে একজন ডাক্তার হেডগেওয়ার এসেছেন শুনে আমি এমনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শ্রী দাভোলকর অ্যাডভোকেটের গৃহে গেলাম। কিন্তু আধ ঘন্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর যখন বাইরে বেরুলাম, তখন আমি চিরকালের জন্য তাঁর অনুগামী হয়ে গিয়েছিলাম।'' কৃষ্ণবর্ণ, মুখে বসন্তের দাগযুক্ত ডাক্তার হেডগেওয়ারের বৈঠকে সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে যে কী অদ্ভুত যাদু ছিল!

কোল্হাপুরের ডাক্তাররা তাঁদের সমিতির পক্ষ থেকে ডাক্তারজীকে সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন করেন। সভায় ডাক্তারজী সংক্ষেপে সঙ্ঘের আদর্শের কথা বলার পর কিছুক্ষণ মুক্ত আলোচনাও চলে। আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক ডাক্তার মহোদয় এক নিরাশ্রয় হিন্দু মহিলার করুণ কাহিনীর বর্ণনা করে জিজ্ঞাসা করেন, ''সঙ্ঘ তার জন্য কী করতে পারে?'' ডাক্তারজী উত্তর দিলেন, ''এখন সঙ্ঘ কিছু করতে পারবেনা। হ্যাঁ, আপনি যদি নিজে এই কাজ হাতে নেন, তাহলে আমি ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত।'' ''তাহলে আপনার সঙ্ঘ কী করবে?'' এই বলে ঐ সজ্জন তাঁর অসন্তোষ ব্যক্ত করেন। একথা শুনে ডাক্তারজী মুচ্‌কি হেসে বললেন, ''আপনিও বেশ কথা বলছেন। ধরুন এক বাড়ীতে আগুন লেগেছে এবং কয়েকজন বাড়ীর লোকদের বাঁচাবার চেষ্টা করছে। সেই সময়ে যদি কেউ বলে, 'বারান্দার খুঁটিগুলোতেও আগুন লেগেছে। সেগুলোকে যদি আপনারা বাঁচাতে না পারেন তাহলে আপনাদের চেষ্টার কী লাভ?' তার একথা বলা কি ঠিক হবে? আজ দেশের অবস্থাও এই রকম। সঙ্ঘ সমাজ জাগরণের কাজ হাতে নিয়েছে। যারা অন্য অংশ জ্বলছে দেখে কষ্ট পাচ্ছে, তারা ঐ অংশে কাজ করুক। কিন্তু সংগঠিত সমাজ যতক্ষণ না তৈরী হয়ে উঠছে, ততক্ষণ সঙ্ঘই সবকিছু করবে, এরকম প্রত্যাশা কারুর রাখা উচিত নয়। আমরা এমন পরিস্থিতি নির্মাণ করার চেষ্টা করে চলেছি যার পর 'সঙ্ঘ কী করবে?' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনই যেন না থাকে।'' এই উত্তর শুনে সকলেই সন্তুষ্ট হলেন। কার্যক্রম শেষ হবার পর ডাক্তারজী ঐ কাজের জন্য চাঁদাও দিলেন।

এই প্রবাসকালে তিনি সাতারাতেও গিয়েছিলেন। সেই সময়ের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ডাক্তারজী সাতারায় আসছেন জানতে পেরে বিগত দিনের প্রবীণ বিপ্লবী শ্রী দামোদর বলবন্ত ভিড়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্মের এক পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। ডাক্তারজী যখন এলেন, তখনই তিনি ভিড়েজীকে দেখতে পেলেন এবং তাঁকে তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলেন। ধ্বজ প্রণাম হওয়ার পরেই তিনি তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত জনসাধারণের সামনেই তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। ভিড়েজী আনন্দে গদ্‌গদ্ হয়ে উঠলেন। ডাক্তারজীর আত্মীয়তা এমনই উৎকৃষ্ট ছিল।

অন্যান্য প্রবাসের মতই এবারও দৌড়াদৌড়ির দরুন বিশ্রামের কোন নাম-গন্ধ ছিলনা। এ সম্বন্ধে এক পত্রে তিনি লেখেন, "বহু ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের মানুষ দেখা করতে আসতেন, চলে যেতেন। ঝড়ের গতিতে ভ্রমণ চলছিল। প্রতিদিন বেলা দুটোয় ভোজন এবং রাত্রি ২টো পর্যন্ত জাগরণ চলত। এইরূপ কার্যসূচী অখণ্ডরূপে অব্যাহত ছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ প্রবাসে বাতাবরণ অত্যন্ত উৎসাহপূর্ণ ছিল। প্রত্যেক শাখায়, বিশেষতঃ তরুণ শ্রেণীর মধ্যে সঙ্ঘকার্যের জন্য আন্তরিক নিষ্ঠা তথা একাগ্রতা দেখা যাচ্ছিল এবং চতুর্দিকেই এক নব চৈতন্য ব্যাপৃত ছিল।"

মহারাষ্ট্রের কার্যকর্তাদের আগ্রহ ছিল যে তিনি আরো কয়েকটি শাখা পরিদর্শন করুন, কিন্তু ডাক্তারজীর স্বর্গীয় মাতা ও পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন এসে পড়েছিল। তাঁর নিয়ম ছিল যে ঐ শ্রাদ্ধের দিন তিনি নাগপুরে অবশ্যই উপস্থিত থাকতেন। সেই কারণে জানুয়ারী মাসের শেষে তিনি নাগপুরে ফিরে এলেন।

এই বছর তিনি একশো টাকা শুল্ক দিয়ে ২২শে ফেব্রুয়ারী ডাঃ মুঞ্জের 'দি সেন্ট্রাল মিলিটারী এডুকেশন সোসাইটির' আনুষ্ঠানিক সদস্য হলেন এবং এই সংস্থার প্রবন্ধক সমিতির বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য ২১ ও ২২শে মার্চ, ১৯৩৭ নাসিকে গেলেন। সেখানে তিনি সঙ্ঘশাখাও পরিদর্শন করেন। সেই সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এইরকম ঃ

একদিন শাখার কার্যক্রম শেষ করে ডাক্তারজী শ্রী রাজাভাউ সাধে উকিলের বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন। তখন পথে "হিন্দু কলোনি" লেখা একটি বোর্ডের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নাসিকে একটি নতুন বসতি তৈরী হচ্ছিল এবং সেখানকার কিছু উৎসাহী মানুষ তাঁর নাম রাখে 'হিন্দু কলোনি'। এটা ডাক্তারজীর অদ্ভুত মনে হল। তিনি রাজাভাউ-এর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, "আমাদের দেশের কোন বসতির 'হিন্দু কলোনি' নাম দেওয়া ঠিক নয়। গতবারে বোম্বাইতে গিয়ে দাদরে 'হিন্দু কলোনি' নাম দেখে শ্রী বাবারাও সাভারকর ও ডাঃ সাভারকর কে বলেছিলাম যে বোম্বাইতে 'পারসী কলোনি' হতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশেই 'হিন্দু কলোনি' নাম দিয়ে আমরা এ কথাই প্রমাণ করব যে আমরা যেন বিদেশী। যদি আমরা ইংল্যাণ্ড বা অন্য দেশে যাই এবং সেখানে আমাদের বসতি স্থাপন করি, তবে তার নাম 'হিন্দু কলোনি' রাখা যুক্তিসঙ্গত হবে। ডাক্তারজীর এই যুক্তিপূর্ণ কথা সকলে উপলব্ধি করল এবং 'হিন্দু কলোনি' বোর্ড অপসারিত হল। আজ নাসিকের ঐ বসতি 'গোলে কলোনি' নামে বিখ্যাত।

ভোঁসলা সৈনিক বিদ্যালয়ের জন্য গঙ্গাপুর মার্গের উপর একটি নতুন স্থান কেনা হয়েছিল। ডাঃ মুঞ্জে, শ্রী প্রতাপ সেঠ এবং ডাক্তারজী তিনজনেই ২১শে মার্চ স্থানটি পরিদর্শন করেন। কার্যকারিণীর ঐ বৈঠকে শুল্ক ও পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট করা হল। এ ব্যাপারে ডাক্তারজীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। নাসিক থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়ে ডাক্তারজী ধুলে, অমলনের, জলগাঁও ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণে গেলেন। তারপর বিদর্ভে প্রৌঢ় কার্যকর্তাদের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য অকোলা গেলেন। নাসিকে আসার পূর্বে এক পত্রে তিনি এক আনন্দ ও দুঃখের ঘটনার সংবাদ পেয়েছিলেন। ১৯২৬-এ কংগ্রেসের ফৈজপুর অধিবেশনে পঃ জওহরলাল নেহরু যখন পতাকা উত্তোলন করছিলেন তখন মাঝখানেই পতাকার দড়ি চাকা থেকে খুলে যায়। তার ফলে পতাকা মাঝপথেই ঝুলতে থাকে। অনেকে আশি ফুট উঁচু ধ্বজদণ্ডে ওঠার চেষ্টা করে, কিন্তু কয়েক ফুট উঠেই সাহসে না কুলানোয় নেমে পড়ে। সেখানে শিরপুর শাখার কিসন সিংহ পরদেশী নামক স্বয়ংসেবকও উপস্থিত ছিল। পতাকার ঐ অবস্থা দেখে সে এগিয়ে আসে এবং দেখতে-না-দেখতে সে তৎপরতার সঙ্গে ধ্বজদণ্ডে আরোহণ করতে থাকে। তাঁকে ঐ অনায়াস ভঙ্গীতে উঠতে দেখে সকল দর্শকের হৃদয় উদ্বেলিত হয় ওঠে। সে উপরে উঠে পতাকার দড়ি ঠিক করে দিয়ে নেমে আসে। এইভাবে অধিবেশনের সূচনাতেই 'প্রথম গ্রাসে মক্ষিকাপাতঃ' এই দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হল। সকলে তাকে বাহবা দিল। সে নেমে আসার পর সেখানে উপস্থিত নেতারা তাকে কাঁধে তুলে নিলেন এবং জনতা আক্ষরিক অর্থে তার উপর টাকা বর্ষণ করল।

এই ঘটনার পরে তাকে প্রকাশ্য অধিবেশনে অভিনন্দন জানাবার কথা ঠিক হয়। কিন্তু যখন জানা গেল যে সে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক, তখন অভিনন্দন জানাবার কার্যক্রম রদ করে দেওয়া হল। ডাক্তারজী যখন এই সংবাদ জানতে পারলেন তখন নাসিক প্রবাসের পরে ধুলে শাখায় তিনি কিসনসিংহকে কাছে ডেকে নিলেন এবং দেবপুরা শাখায় তাকে অভিনন্দন জানিয়ে তার হাতে একটি রূপোর বাটি উপহার দিলেন। তিনি কিসনসিংহকে ডেকে নিজের পাশের চেয়ারে বসালেন। ডাক্তারজী সেই সময়ে যে কথা বলেন তা অত্যন্ত মননীয়। তিনি বলেন, "দেশের কাজ যেখানেই বাধা-প্রাপ্ত হবে, সেখানেই দলের কথা চিন্তা না করে এগিয়ে এসে তাতে হাত লাগাতে হবে।" কিসনসিংহ এই প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়েছিল, তাই তিনি তার পিঠ ঠুকে তাকে বাহবা দিলেন। একদিকে সঙ্ঘের নাম শুনেই অসহিষ্ণুতার প্রদর্শন, অপর দিকে ডাক্তারজীর অভ্রান্ত দেশভক্তি সঞ্জাত 'বয়ং পঞ্চাধিকং শতম্' এর উদাত্ত ভাবনা।

অকোলার প্রৌঢ় কার্যকর্তাদের সম্মেলনে ২৮শে মার্চ তিনি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত ইতিহাস বিবৃত করেন। এই ভাষণ ছিল অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক। ভাষণের শেষে ডাক্তারজী বলেছিলেন, ".... যদি আমাদের হিন্দুস্থানের কল্যাণের জন্য যে কোন পরিকল্পনা এই সংগঠনের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহলে তাকে কার্যকর করার ব্যাপারে আমাদের যেন এমন কথা মনে না হয় যে আমাদের সংগঠন অল্প অথবা দুর্বল, অতএব কিছু করতে পারবে না। এ রকম বলার অবকাশ যেন না আসে। এইরূপ পবিত্র, উজ্জ্বল তথা তেজস্বী ভাবনা হৃদয়ে গ্রহণ করে এই সংগঠন আরো অধিক প্রভাবী কেমন করে হয়ে উঠবে, সে দিকেই আমাদের

লক্ষ্য দিতে হবে। লৌকিক জগতে হিন্দু রাষ্ট্র যাতে স্বাভিমানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে তার জন্য যা কিছু করা আবশ্যক, সেই সব কিছু করার সংকল্প গ্রহণ করেছে আমাদের সংগঠন। এই কাজ কত বড় এবং এর জন্য কত পরিশ্রম করতে হবে, একথা আমার বলার প্রয়োজন নেই। আমার এই আত্মবিশ্বাস আছে যে উদ্যমশীল, বিবেকবান্, বুদ্ধিমান্ হিন্দু তরুণগণ এই কাজ করার জন্য এগিয়ে আসবে।"

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে শ্রীগুরুজী সারগাছি আশ্রমে স্বামী শ্রী অখণ্ডানন্দজীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শ্রী গুরুজীর সাধনা এক মহাপুরুষের সান্নিধ্যে চলছিল। কিন্তু স্বামীজীর স্বাস্থ্যের মধুমেহ এবং হৃদ্-বিকারের রোগে ক্রমাগত অবনতি ঘটছিল। এই সময়ে শ্রী গুরুজী এমন আন্তরিক তথা অক্লান্তভাবে তাঁর সেবা করেন যে অনেক সময়ে সারাদিন আহার-নিদ্রারও তিনি সময় পেতেন না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে এই সেবা স্বামীজীর কৃপায় সফল হল। একদিন সারগাছি আশ্রমের 'বিনোদ কুটিরে' তিনি শ্রীগুরুজীকে দীক্ষা দিলেন। একটি দীপ হতে আর একটি দীপ প্রজ্জ্বলিত করে তিনি তাঁর অনাসক্ত জীবনকে সংক্রামিত করে দিলেন। মনে হয় যেন তাঁর এই 'জীবনকার্যের' জন্যই তাঁর প্রাণ দেহের মধ্যে আটকে ছিল। তার পরেই তাঁর রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সারগাছি থেকে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হল। গুরুজী সর্বদা তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। বেলুড় মঠে তাঁর সর্বপ্রকার আধুনিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা তথা উপচারের ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হল। ১৯৩৭-এর ৭ই ফেব্রুয়ারী দুপুরে স্বামী অখণ্ডানন্দজী চিরসমাধিতে লীন হলেন।

শ্রীগুরুজীর পক্ষে এ এক নিদারুণ মর্মান্তিক ঘটনা ছিল। অত্যন্ত বেদনাহত চিত্তে তিনি প্রায় পনের দিন বেলুড় মঠে রইলেন। সেখানে অনেক সাধু-সন্তের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটল। অবশেষে ১৯৩৭-এর মার্চ মাসে তিনি নাগপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর অজ্ঞাতবাস যেমন আকস্মিক ছিল, তাঁর পুনরাগমনও ছিল তেমনই আকস্মিক। একমাত্র পুত্রের বাড়ী ফিরে আসায় যত আনন্দ হল তাঁর মাতা-পিতার, তার থেকে কয়েক গুণ বেশী আনন্দ হল ডাক্তারজীর। গুরুজীর সারগাছি আশ্রমে যাওয়ার আগেই তাঁর মা-বাবা জেনে গিয়েছিলেন যে তাঁদের পুত্র ঘর-সংসারের জালে নিজেকে জড়াবে না। ডাক্তারজীও সে কথা জানতেন। আশ্রম থেকে ফিরে আসার পর গুরুজীর মনের অবস্থা গার্হস্থ জীবনের একেবারেই অনুকূল ছিলনা। ব্যক্তিগত জীবন থেকে তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। যে ব্যক্তির নিকট কর্তব্য, বুদ্ধিমত্তা তথা বৈরাগ্যের মনোভাব থাকে, সেই ব্যক্তিই রাষ্ট্রজীবন চালাতে সক্ষম হয়। একথা ডাক্তারজীর থেকে ভাল আর কে জানত। সেই কারণে শ্রীগুরুজীর প্রত্যাবর্তনে তাঁর এত আনন্দ হয়েছিল।

এই সময়ে বিভিন্ন প্রান্তে সঙ্ঘের কাজ সম্প্রসারিত হচ্ছিল। ডাক্তারজীর উপর কাজের ভার এতই বৃদ্ধি পেল যে দিনের চব্বিশ ঘন্টাও কম বলে মনে হতে লাগল। এতৎসত্ত্বেও তাঁর মনের উল্লাস তথা মুখের হাসিখুশি ভাব এতটুকু কম হয়নি। এপ্রিল ১৯৩৭, নাগপুর থেকে পুনা শিক্ষণবর্গে যাবার সময়ে এক মজার ঘটনা ঘটল। ডাক্তারজী প্রবাসে বেরুলেই পথের সর্বত্র সূচনা পাঠিয়ে দিতেন যাতে স্টেশনে কার্যকর্তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এই সময়

সিন্দী, ওয়ার্ধা, অকোলা ইত্যাদি স্থানে সূচনা পাঠানো হয়েছিল। এই প্রবাসের সময় শ্রী শ্রীকৃষ্ণ পুরাণিকও ডাক্তারজীর সঙ্গে ছিলেন। সিন্দী স্টেশনে পৌঁছতেই ওয়ার্ধা তালুকার সঙ্ঘচালক শ্রী নানাসাহেব টালাটুলে এবং কয়েকজন স্বয়ংসেবক এদিক-ওদিক ডাক্তারজীকে খুঁজতে লাগলেন। ডাক্তারজী এবং শ্রী পুরাণিক উভয়ে ট্রেন থামতেই তাঁদের কামরার সামনে প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু সে দিকে কারো দৃষ্টি ছিলনা। তাঁরা সবাই কামরায়-কামরায় ডাক্তারজীকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। ডাক্তারজীকে কোথাও না পেয়ে সকলে প্ল্যাটফর্মের একধারে হতাশ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন সময়ে ট্রেনের ছাড়ার বাঁশি! ডাক্তারজী প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেনে উঠে তাঁর কামরার দরজার সামনে দাঁড়ালেন। গাড়ী যখন ধীরে-ধীরে কার্যকর্তাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলল, তখন ডাক্তারজী বেশ জোরে নানাসাহেবকে নমস্কার জানালেন। সকলেই ডাক্তারজীকে দেখতে পেলেন। ডাক্তারজী গাড়ীতে থাকা সত্ত্বেও তাঁকে খুঁজে না পেয়ে যে দুঃখ হয়েছিল, তাঁকে দেখতে পেয়েই সেই দুঃখ হাসিতে পরিণত হল। ডাক্তারজী খাদির পাঞ্জাবী ও পাজামা পরেছিলেন এবং মাথায় ছিল সাদা টুপি। সেই বেশেই শ্রী পুরাণিকও ছিলেন। তাঁদের ঐ বেশে দেখে সবাই না হেসে থাকতে পারেনি। ডাক্তারজীকে খুঁজতে একই হাল অন্য স্টেশনগুলিতেও হল এবং ট্রেন চলতে আরম্ভ করলে ডাক্তারজীর উচ্চৈস্বরে নমস্কার শুনে সকলের সেই অনাবিল হাসি। এই ছিল সেবারকার প্রবাসের মজা। হাস্য-পরিহাস ডাক্তারজীর স্বভাবের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

কোন কাজের জন্য ২১শে এপ্রিল ডাক্তারজী বোম্বাই এলেন। তখন সেখানে খুব 'ইনফ্লুয়েঞ্জা' হচ্ছিল। ডাক্তারজীও জ্বরে আক্রান্ত হলেন। এমনকি বোম্বাই-এর সঙ্ঘচালক শ্রী দাদাসাহেব নাইক, যাঁর গৃহে ডাক্তারজীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেই গৃহের অনেকেই জ্বরে পড়েছিলেন। ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন শ্রী কাশীনাথ পন্ত। তাঁকেও শয্যাগ্রহণ করতে হল। এইভাবে এক সপ্তাহ কেটে গেল। এ বিষয়ে ডাক্তারজী লেখেন, "বোম্বাই-এর এই সপ্তাহ কোন কাজেই লাগল না। এটা "ইনফ্লুয়েঞ্জা উইক" বলেই গণ্য হল। যে সব কাজ নিয়ে বোম্বাই এসেছিলাম, তার সবই পড়ে রইল।" জ্বর ছাড়ার পর দু দিন তাঁকে শুধু তরল পানীয় দেওয়া হল। এর পর 'হোম্‌লী ক্লাব' থেকে দু-তিন দিন ভোজন আনানো হল। এক দিন ভোজনের কৌটায় নুন না আনার জন্য শ্রী দাদাসাহেব নাইক সংশ্লিষ্ট স্বয়ংসেবকের উপর ক্রুদ্ধ হলেন। তখন ডাক্তারজী দাদাজীকে শান্ত করে বললেন, "নুন ছাড়া ভোজন কি থেমে থাকে? মনে রাখবেন, অনেকে ভোজনের জন্যই বেঁচে থাকে। আবার কিছু লোক বেঁচে থাকার জন্য ভোজন করে। আমাদেরও বেঁচে থাকার জন্য খেতে হবে।" জ্বর ছেড়ে যাবার পর ডাক্তারজী 'হোম্‌লী ক্লাব'-এর মালিকের সঙ্গেও পরিচয় করে নিলেন। ঐ সজ্জন গোয়ার নিবাসী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, আজ নয়তো কাল, এই পরিচয় অবশ্যই উপযোগী প্রমাণিত হবে।

বোম্বাই-এর পর ডাক্তারজী পুনায় এলেন। তাঁর আসার পর শ্রীবাবারাও সাভারকরও সেখানে এলেন এবং উপহার গৃহে এসে উঠলেন। ঐ সময়ে তাঁর পায়ে ব্যথা ছিল এবং মূত্রবিকারও বৃদ্ধি লাভ করেছিল। ডাক্তারজী যখনই জানতে পারলেন যে বাবারাও পুনায়

এসেছেন তখনই তাঁকে আগ্রহপূর্বক 'প্রশিক্ষণ বর্গের' বসতিগৃহে নিয়ে এলেন। অন্যকে নিজের জন্য কষ্ট দেব কেন, এই সংকোচের কারণে বাবারাও বর্গে আসছিলেন না। কিন্তু ডাক্তারজী এটা কেমন করে দেখবেন যে আমাদের বন্ধু এক স্থানে কষ্টের মধ্যে পড়ে রয়েছেন, আর তিনি তাঁর জন্য চিন্তা করবেন না। তিনি বাবারাওকে 'ভাবে বিদ্যালয়ে' নিয়ে এলেন এবং একটি ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করলেন। যতদিন তিনি সেখানে ছিলেন, স্বয়ং তাঁর দেখাশুনা করতে থাকলেন। এইরকম ছিল তাঁর ভালবাসা।

ডাক্তারজী যখন পুনায় এলেন, তখন সেখানকার সোন্যামারুতি মন্দিরের ঘন্টা বাজাবার ব্যাপারে আপত্তির প্রশ্নে জনমত অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ছিল। সরকার ২৪শে এপ্রিল থেকে ১৪ই মে পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল যে সোন্যামারুতি মন্দিরের পশ্চিম, দক্ষিণ এবং উত্তরে নব্বই ফুট পর্যন্ত রাস্তার উপর অথবা কোন প্রকাশ্য স্থানে এবং লক্ষ্মী পথের উপর তাম্বোলি মসজিদ পর্যন্ত কোনরকম বাজনা কেউ বাজাতে পারবে না। এর কারণ ছিল এই যে সোন্যামারুতির ক্ষুদ্র ঘন্টার ধ্বনিতেও মুসলমানদের নমাজে বাধার সৃষ্টি হয়। সন্দেহ নেই যে কারণটি ছিল একান্তই হাস্যাস্পদ। গত বছরের মত যাতে মুসলমানরা এবছরও ঝগড়া-বিবাদ না করে তার জন্য তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা না লাগিয়ে সরকার হিন্দুদের উপরেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এইভাবে তারা অন্যায়পূর্ণ ও পক্ষপাতিত্বমূলক নীতি গ্রহণ করে। সাহিত্য-সম্রাট শ্রী নঃ চিঃ কেলকর সুস্পষ্টভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে "এই আদেশ মূর্খতাপূর্ণ তথা অপমানজনক।"

এই প্রকার দমনমূলক তথা অন্যান্য আদেশ উল্লঙ্ঘন করে ২৫শে এপ্রিল হনুমান জয়ন্তীর শুভ দিনে মন্দিরে ঘন্টা বাজিয়ে সত্যাগ্রহ শুরু করে দেওয়া হল। ১৩ তারিখ পর্যন্ত প্রায় একহাজার মানুষ সত্যাগ্রহ করে সরকারী আদেশটিকে অর্থহীন করে দিল। এই সত্যাগ্রহে ছোট-বড় সকলেই অংশগ্রহণ করে। স্বয়ং শ্রী তাত্যা সাহেব কেলকর সত্যাগ্রহ করার সময়ে যে পত্রক তিনি বিতরণ করেন, তাতে ক্ষুদ্র ঘন্টাকে সম্বোধন করে লেখা হয় ঃ

"বয়ে চিমুকলে ঘন্টে কাটী মঞ্জুল অপুলা ধ্বনী।
তুঝ্য়া গুণে জানার, জাউঁ তরি হুকুমশাহি উলথুনী।"
("হে ক্ষুদ্র ঘন্টে, কী ভীষণ বল তোমার যন্ত্রের। কাঁপিয়ে দিলে ভিৎ আমলাতন্ত্রের।")

এই সত্যাগ্রহের কারণে পুনায় প্রচুর উত্তেজনা ছিল। সেই সময়ে সঙ্ঘের শিক্ষণ বর্গ চলছিল। মহারাষ্ট্রের কয়েক শত তরুণ সেখানে একত্রিত হয়েছিল। ডাক্তারজীর সম্পূর্ণ মনোযোগ ছিল বর্গের দিকে। তিনি কাউকে এই আদেশ দেননি যে "তুমি সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ কর।" কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল যে সঙ্ঘের বুদ্ধিমান্ তথা সংস্কারপ্রাপ্ত স্বয়ংসেবকেরা সঙ্ঘকার্য থেকে সময় পেলে স্বয়ং প্রেরণায় এই ধরনের অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্য এগিয়ে না এসে থাকতে পারবেনা। ডাক্তারজী সেকথা জানতেন। অতএব, যারা সময় করে উঠতে পারল, এরকম অনেক স্বয়ংসেবক সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করল। তবু, কেউ যদি তাঁকে এসে প্রশ্ন করত, "এই সত্যাগ্রহে সঙ্ঘ কী করবে?" তখন তিনি অত্যন্ত শান্ততার সঙ্গে এই উত্তর দিতেন, এই

সত্যাগ্রহ সমস্ত নাগরিকদের, এবং স্বয়ংসেবকেরাও নাগরিক হিসাবেই শত-শত নাগরিকের সঙ্গে এতে অংশ নিচ্ছে।" এই উত্তর শুনে কয়েকজনের সমাধান হল না। তারা চেয়েছিল যে সঙ্ঘের পক্ষ থেকে পরিষ্কার ঘোষণা করে সঙ্ঘ হিসাবে সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করা উচিত। ডাক্তারজী চাইতেন যে সঙ্ঘের অস্তিত্ব মাত্র দিয়ে সমাজের অনেক আবশ্যক কাজ সংঘটিত হোক, কিন্তু তার কৃতিত্ব ও শ্রেয় সঙ্ঘ লাভ করুক, তার তিনি বিরোধী ছিলেন। কারণ এই অভিলাষ থেকেই আমরা সমাজ থেকে আলাদা বিশেষ কেউ, এরকম মনোভাবের সৃষ্টি হয় এবং তার থেকে একটি সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে। একবার ডাক্তারজীর অত্যন্ত নিকটের কয়েকজন ব্যক্তি এ বিষয়ে আগ্রহ করলে ডাক্তারজী ঘরের দেওয়ালে লাগানো বন্য পশুদের শিং-এর প্রতি সঙ্কেত করে বলেন "সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণকারী স্বয়ংসেবকদের চেনার জন্য প্রত্যেকের মাথায় এই শিং লাগিয়ে দিচ্ছি।"

পুনা বর্গে তাঁর কাজ শেষ হবার পর ডাক্তারজী নিজেও সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণের কথা বলেছিলেন। ডাক্তারজী অবশ্য নিশ্চিত জানতেন যে সত্যাগ্রহ ইত্যাদি হিন্দু সমাজের রোগগ্রস্ত শরীরের মূলগত উপচার নয়, বরং বাইরে থেকে মলম লাগানো বা ব্যাণ্ডেজ বাঁধার মতই সাময়িক চিকিৎসার ব্যবস্থা মাত্র। সমাজের সামগ্রিক সমস্যাসমূহের সমাধান হতে পারে একমাত্র জাগ্রত, স্বাভিমানী, এবং শৃঙ্খলা পরায়ণ কোটি-কোটি মানুষ যদি সেইরকম জীবনকে অঙ্গীকার করে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি গড়ে তোলে তবেই। এই সামগ্রিক শক্তি নির্মাণ করার জন্য তিনি নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করে সঙ্ঘের কাজকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এই সঙ্গে ডাক্তারজী একথাও জানতেন, যতদিন পর্যন্ত এই কাজ সম্পূর্ণ না হবে, রক্ত-বিকারের কারণে সমাজ-শরীরে ফোড়া মাঝে-মাঝেই দেখা দেবে, এবং তাৎকালিক ব্যবস্থা হিসাবে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে মলম-পট্টিও লাগাতে হবে। এই কথা ভেবেই সত্যাগ্রহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি ১৩ই মে বেলা চারটের সময় সত্যাগ্রহ করেন। তাঁর সঙ্গে শ্রী আপ্পাসাহেব লিময়ে, শ্রী মহাদেব শাস্ত্রী দিবেকর এবং যবতমালের 'রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে' তাঁর শিক্ষক তথা প্রসিদ্ধ ইতিহাস গবেষক শ্রী দত্তোপন্ত আপটে ইত্যাদি সজ্জনরাও একই দিনে ঐ সত্যাগ্রহীদলে অংশগ্রহণ করেন।

সত্যাগ্রহের পর পুলিশ সকলকে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করে আধ ঘন্টা পরে চালান করে মুক্ত করে দেয়। পর দিন তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। ডাক্তারজীর পক্ষ থেকে শ্রী নঃ গোঃ অভ্যঙ্কর উকিল ছিলেন। তিনি আদালতে বলেন, "পরমপূজনীয় ডাক্তারজী আমাদের ধর্মগুরু। তাঁকে এখানে আসতে বাধ্য করা তাঁর মর্যাদার অনুকূল নয়। অতএব, আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে মামলা চালানোর অনুমতি প্রদান করা হোক।" আদালত তাঁকে অনুমতি প্রদান করে।

১৭ মে তারিখে মামলার নিষ্পত্তি হয়। ডাক্তারজীকে পঁচিশ টাকা জরিমানার শাস্তি দেওয়া হয়। সেই সময় ডাক্তারজী ছোট একটি লিখিত বক্তব্য দিয়েছিলেন, যা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, "শ্রী সোন্যামারুতির মন্দির সম্বন্ধে পুনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বাদ্য-নিষেধের আদেশ সম্বন্ধে আমি গভীরভাবে চিন্তা করি। আমার মনে হল এই অবস্থায় মন্দিরে গিয়ে ঘন্টা

বাজানো আমার কর্তব্য। এই আদেশের দরুন আমাদের রাষ্ট্রের যে অপমান করা হয়েছে তার বিরোধিতা করার — আজকের পরিস্থিতিতে — এটাই একমাত্র উপায় বলে মনে হওয়ায় এরকম আমি করেছি।" ডাক্তারজী ভাল করেই জানতেন যে শক্তিশালী রাষ্ট্রের সম্মুখে অপমানের প্রতিবিধান করার অন্য পথও থাকে, অতএব, বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি নরম উপায় অবলম্বন করতে হচ্ছে। এটা যে কত দুঃখজনক, তার দরুন তাঁর মনের বেদনা — এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়।

এই সময়ে সঙ্ঘ-কার্যের প্রতি প্রচুর সমর্থন অথবা প্রবল বিরোধিতা দুটোই বিভিন্ন স্থানে পরিলক্ষিত হয়। একদিকে বণী, যবতমাল ইত্যাদি এলাকার কংগ্রেস-পন্থীদের দ্বারা স্বয়ংসেবকদের মারপিট করার সংবাদ আসছিল, অপর দিকে বিভিন্ন স্থানে সঙ্ঘশাখা শুরু করার জন্য প্রচারক দাবী করেও নাগপুরে পত্র আসছিল। কোথাও-কোথাও স্থানীয় লোকেরা নিজ উদ্যোগেই সঙ্ঘের শাখা শুরু করে দিয়েছিল। এই ধরণের একটি শাখার আলোকচিত্র ১৯৩৭ সালে 'কেশরী'তে ছাপা হয়েছিল। মজার কথা এই যে সঙ্ঘে মহিলা-সদস্যদেরও এতে উল্লেখ করা হয়েছিল। সঙ্ঘের বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে, শুধু উৎসাহবশতঃ 'আমাদের গ্রামেও সঙ্ঘের শাখা হওয়া চাই' এই মনোভাব নিয়ে যে শাখাগুলি খোলা হয়, সেসব স্থানে এ রকম দৃশ্য দেখা গেলে, আশ্চর্যের কি আছে? এটুকুই বলা যায় যে সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের প্রচেষ্টার ফলে এরূপ বাতাবরণ গড়ে উঠেছিল যে প্রত্যেকেরই মনে সঙ্ঘের শাখার আকাঙ্খার সৃষ্টি হচ্ছিল।

স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর যিনি রত্নগিরি জেলায় অন্তরীণ ছিলেন, তাঁকে ১৯৩৭ সালে মুক্তি দেওয়া হয়। জুন-জুলাই মাস জুড়ে সমগ্র মহারাষ্ট্রে তাঁর স্বাগত-সম্বর্ধনার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্দিকে এই কার্যক্রমের ধূম পড়ে গিয়েছিল। স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর ছিলেন হিন্দুত্বনিষ্ঠ। তাঁর মুক্তি নিঃসন্দেহে, ডাক্তারজী হিন্দুরাষ্ট্রের পুনরুদ্ধারের জন্য যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন, সেই কাজেই সহায়ক হয়ে উঠবে। অতএব, তাঁর মুক্তি ডাক্তারজীর নিকট অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার ছিল। ডাক্তারজীর মতে সাভারকরজী একজন ব্যক্তিমাত্র নয় বরং এক উদ্দীপক শক্তি ছিলেন। পুনাতে সাভারকরজীর সম্বর্ধনার সময়ে ডাক্তারজীর লেখা একটি পত্রে তাঁর মনোভাব এইভাবে ব্যক্ত হয়, ".... এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আপনারা বাস্তবিকই অত্যন্ত ভাগ্যবান্ যে ব্যারিস্টার সাভারকরের মত অতুল স্বার্থত্যাগী তথা অসীম দেশভক্তের সান্নিধ্য আপনারা লাভ করেছেন এবং তাঁর অমূল্য বাক্যসুধার রসাস্বাদন আপনারা করতে পেরেছেন। আমরাও ঐ রূপ শুভদিনের জন্য আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি ...।"

এই বছর ডাক্তারজী উত্তর হিন্দুস্থানে দশজন কার্যকর্তাকে পড়াশুনার জন্য অথবা প্রচারক হিসাবে প্রেরণ করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় পাঞ্জাব, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্য ভারতে সঙ্ঘের জাল বিস্তার লাভ করতে থাকে। শ্রী দাদারাও পরমার্থ এবং শ্রী বাবাসাহেব আপটে এই সব কার্যকর্তাদের কাজ দেখাশুনা এবং তাঁদের উৎসাহ দেবার জন্য নিয়মিত ভ্রমণ করতেন। স্বয়ং ডাক্তারজীও কিছুদিনের জন্য দিল্লী ও বারাণসী যান এবং সেখানে কিছুদিন থেকে কাজে গতি প্রদান করেন। দিল্লীতে থাকার সময়ে তিনি পাঞ্জাবের কাজের ব্যাপারেও বিশেষ প্রয়াস

করেন। এই সময়ে শেঠ যুগলকিশোর বিরলার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে এক উৎসবে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রিত করা হয়। সঙ্ঘের যুক্তিপূর্ণ চিন্তাধারা ও কার্যের বিস্তারের কথা জেনে যুগলকিশোরজী সঙ্ঘকে পাঁচশত টাকা দান দেবার প্রস্তাব করেন। তখন ডাক্তারজী তাঁকে বললেন, "সঙ্ঘ আপনার দান নয় আপনাকেই চায়।" ডাক্তারজীর মনোভাব বুঝতে পেরে বিরলাজী উত্তর দিলেন, "এটা দান নয়, সমর্পণ।" একথা শুনে ডাক্তারজী ঐ অর্থ স্বীকার করেন।

দিল্লীর পরে ডাক্তারজী কাশী গেলেন। সেখানে প্রায় তিন সপ্তাহ রইলেন। ১৯৩৭-এ কাশীতে সঙ্ঘকার্যের বেশ ভাল উন্নতি হয়েছিল। তা দেখে নিজেদের সমাজবাদী বলে অভিহিত করে এক দল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্ঘের বিরুদ্ধে বিরাট অপপ্রচার শুরু করে। তাঁরা সঙ্ঘের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা এবং হিটলারের নাজি বাহিনীর মত একনায়কতন্ত্রী হওয়ার দোষারোপ করে। এই ধরণের অপপ্রচার যখন ব্যাপক আকারে চলছিল, সেই সময়ে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতার কাশী আগমনের সংবাদ পাওয়া গেল। তারা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আরো বড় ধরণের বিরোধিতার ঝড় তুলতে চাইছিল। তারা পরিকল্পনা করল সঙ্ঘের নেতার আগমনের পূর্বেই সঙ্ঘের বিরুদ্ধে নিবিড় প্রচার করে ছাত্রদের কাছে সঙ্ঘকে এমন ঘৃণাস্পদ করে দিতে মনস্থ করল যাতে তারা কেউ সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতার দিকে তাকিয়েও না দেখে। এই নীতি অনুযায়ী সমাজবাদী ছাত্রদের পক্ষ থেকে একটি পত্রক বিতরণ করা হয়। তাতে বলা হয় যে সঙ্ঘ পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত হয়েছে এবং তাদের অর্থেই সঙ্ঘের কাজ চলে। স্বয়ংসেবকদের উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে ডাক্তারজীকে 'সঙ্ঘের পয়গম্বর' বলে উল্লেখ করা হয়।

ডাক্তারজী কাশী আগমন করলে এই পত্রকের একটি প্রতিলিপি তাঁকেও দেওয়া হয়। ডাক্তারজী স্বয়ংসেবকদের বলেন যে এই ধরনের অপপ্রচারকে উপেক্ষা করা উচিত। তাঁর তিন সপ্তাহ কাশী অবস্থানকালে যত বক্তৃতা- বৈঠক হয়, কোথাও ভুল করেও উক্ত পত্রকের কথার উল্লেখ করা হয়নি। এতে সঙ্ঘ-বিরোধিরা অত্যন্ত হতাশ হয়। ডাক্তারজীর ব্যবহার কুশলতা এবং বিষয় প্রতিপাদনের সুসংগতি তথা তর্ক-শুদ্ধতার ফলে পত্রকের দ্বারা উত্থিত সব ধুলো-ময়লা সবার অলক্ষেই শান্ত হয়ে গেল। সঙ্ঘের দৃষ্টিতে উক্ত পত্রক অপকারী না হয়ে উপকারী বলেই প্রমাণিত হল। এ বিষয়ে ডাক্তারজী লেখেন, "....সঙ্ঘের তত্ত্বজ্ঞান তথা চিন্তাধারা শোনার পর সকলেই একথা উপলব্ধি করল যে পত্রকের উদ্যোক্তারা একান্ত মূর্খের মত কাজ করেছে। যারা সাধারণভাবে সঙ্ঘের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন না, তাঁরাও উক্ত পত্রকের কারণে সঙ্ঘের প্রতি ঔৎসুক্য সহকারে স্বয়ং সঙ্ঘের প্রতি আকৃষ্ট হল।..... এই পত্রকে ক্ষতির পরিবর্তে আমাদের লাভই হল।"

এই ঘটনার পরের মাসে ডাক্তারজীর লেখা চিঠি-পত্রে সঙ্ঘ এবং তার সমালোচনাকারীদের নীতি-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের পত্র তিনি পুনার সঙ্ঘচালক শ্রী বিনায়করাও আপটে এবং মহারাষ্ট্রের প্রান্ত সঙ্ঘচালক শ্রী কাঃ ভাঃ লিময়েকে লিখেছিলেন। সঙ্ঘের চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে একটি মারাঠি সাপ্তাহিক প্রকাশ করার

বিষয় সেই সময় পুনাতে চলছিল। পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি দিয়ে ডাক্তারজী লিখেছিলেন, "…..এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই যে এই পত্রিকার মাধ্যমে সব সময় সঙ্ঘের চিন্তাধারারই প্রতিপাদন হবে। কিন্তু সঙ্ঘের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যক্তিরা যে অভিযোগ উত্থাপন করে এবং তার উত্তর-প্রত্যুত্তরের বিবাদের মধ্যে আপনারা মোটেই যাবেননা। আজকাল আপনাদের এখানকার পত্র-পত্রিকায় সঙ্ঘের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা অভিযোগ দেখতে পাওয়া যায়। এই সব অভিযোগ সংবাদপত্রে থাকুক অথবা জনসভাতে, সেগুলির উত্তর না দিয়ে, সেগুলির প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখানো উচিত।"

ডাক্তারজীর সংগঠন-শাস্ত্রের এই এক অভিজ্ঞতা সঞ্জাত নীতি ছিল যে আমরা হাতির মত শান্ত ভঙ্গীতে যেন নিজ পথ ধরে এগিয়ে চলি, পিছনে যারা ঘেউ-ঘেউ করে, তাদের চীৎকারকে যেন গ্রাহ্য না করি। সমালোচকদের দিকে মনোযোগ না দিলে আমাদের শ্রম ও সময় বেঁচে যায়, সেই সঙ্গে এই ধরনের কোলাহলে বিচলিত না হয়ে এগিয়ে যেতে থাকলে আমাদের সমালোচকরা যতই আমাদের আত্মবিশ্বাস ও ধৈর্য অনুভব করতে থাকে, ততই তারা হতপ্রভ হয়ে বসে পড়ে। ডাক্তারজী সমালোচকদের বক্তব্য শুনতেন বা পড়তেন অবশ্যই, এবং স্বয়ংসেবকরা যাতে সেগুলির যথাযথ উত্তর দিতে পারে, তার জন্য তাদের বৌদ্ধিক স্তরকে উন্নত করার চেষ্টাও করতেন, কিন্তু তাঁর নিশ্চিত মত ছিল যে মুখের মত উত্তর দেবার এবং বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সর্বজনীন বাদ-বিবাদের ঝামেলায় গিয়ে কোন লাভ হয়না। যাঁরা এই সংঘাতময় ও নানা মতবাদে পূর্ণ এই সমাজে প্রত্যক্ষভাবে কিছু নির্মাণ করতে চান, তাঁদের সমর্থ গুরু রামদাসের এই উক্তি মনে রাখতে হবে "তুটে বাদ সম্বাদ তো হীতকারী" ("বাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে চলাই উত্তম"), কিন্তু সেই সঙ্গে চারদিকের এই অভিজ্ঞতাও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে নিজের ভুল স্বীকার করে বাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে নেবার মত মানুষ খুব কমই দেখা যায়। আজও এই অভিজ্ঞতাই হয় (বাদী তো ন বলে, ন বাদহি খলে, হোতী খুলে আঁধলে) "বাদী মানেনা কখনো, বাদ-বিবাদ হয়না শেষ। বাদী অবিরাম করে বিবাদ, যেন পাগল সবাই, অন্ধ বিশেষ"। সেই অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখে ডাক্তারজী বাদানুবাদ থেকে দূরে থাকার নীতিকে দক্ষতার সঙ্গে পালন করে গিয়েছিলেন। অতএব, ১৯৩৭ সালে যখন মহারাষ্ট্রে সঙ্ঘের বিরোধীরা নিজেদের লেখনী থেকে যথেচ্ছ কাদা ছিটিয়ে চলেছিল, তখন ডাক্তারজী শ্রী কাঃ ভাঃ লিময়েকে একথাই বলেছিলেন যে "……আপনাদের ওদিকের সংবাদপত্রগুলিতে সঙ্ঘের বিরুদ্ধে যে ঝঞ্ঝা তোলা হচ্ছে, সেগুলি আমাদের সকলের খুব বিনোদনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের মনে এই সব জিনিষের কোন পরিণাম হবেনা। এবিষয়ে আপনি শংকাহীন থাকুন। তবে আপনি এবিষয়ে অবশ্য চিন্তা করবেন যে এই ধরনের অপপ্রচার আপনাদের কাজকে যেন কোনভাবেই আঘাত করতে না পারে। এই ধরনের কথায় আমাদের কাজ নিশ্চিত বৃদ্ধি লাভ করবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

কাশীতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় যাবার পূর্বে ডাক্তারজী মহামনা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের দর্শনার্থে তাঁর নিবাসস্থানে গেলেন। এটা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ছিলনা। তিনি

ভিতরের একটি ঘরে মালিশ করাচ্ছিলেন। কিন্তু চাকরের কাছ থেকে ডাক্তারজীর আগমন-বার্তা শুনেই মালবীয়জী তাঁকে ভিতরে ডেকে আনালেন। ডাক্তারজী ভিতরে যেতেই তিনি উঠে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে স্বাগত জানালেন এবং নিজের পাশে বসালেন। তাঁদের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে প্রাণ খুলে কথাবার্তা চলে। ডাক্তারজীর দ্বারা হিন্দু রাষ্ট্রের উদ্ধারের জন্য প্রারব্ধ অসাধারণ কাজের দরুন বড় মাপের মানুষদের মনে তাঁর প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে উঠেছিল। মালবীয়জীর ব্যবহার এই তথ্যেরই দ্যোতক ছিল।

বারাণসী থেকে রওনা হয়ে প্রয়াগ, হুশঙ্গাবাদ, বৈতুল ইত্যাদি শাখাগুলি পরিদর্শন করে বিজয়া দশমীর পূর্বেই ডাক্তারজী নাগপুরে ফিরে এলেন। নাগপুরের বিজয়া দশমী উৎসবের সঞ্চলন কার্যক্রমে সম্পূর্ণ নগর মুখরিত হয়ে উঠত। সঞ্চলনকারী স্বয়ংসেবকদের পদতালের সঙ্গে-সঙ্গে শত-সহস্র নাগরিকদের হৃদয়ের মধ্যেও ভাবনার উত্তাল তরঙ্গ হিল্লোলিত হত। সঞ্চলনের সঙ্গদানকারী বাদন-পথকের শঙ্খধ্বনির বর্ণনা প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক 'সাবধান' লিখেছিল যে "নিরপেক্ষদের মনে কৌতুহল, বন্ধুদের হৃদয়ে গর্ববোধ এবং শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চারকারী ঐ ধ্বনি। এ হল আশার আবাহন, পরাক্রমের হুংকার, বিজিগীষু বৃত্তির নাদ। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে অগ্রগামী পদধ্বনি এবং উজ্জ্বলতর পরম্পরার অমূল্য আশীবর্ণী।"

ডাক্তারজীর অখণ্ড কর্মযোগের কারণে ভারতের বহু স্থানেই এই ধ্বনি মুখরিত হচ্ছিল, কিন্তু তাঁর পাশেই অবস্থানকারী এবং তাঁর সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত কংগ্রেসের কার্যকর্তাদের কর্ণকুহরে সে ধ্বনি প্রবেশ না করা আশ্চর্যজনক হলেও দুর্ভাগ্যক্রমে সত্য ছিল। কারণ, ১০ই নভেম্বর ১৯৩৭ তারিখে মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডাক্তারজী একটি চিঠি পেয়েছিলেন যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিষয়ে কংগ্রেসের নীতি নিশ্চিত করতে হবে, এর জন্য "সঙ্ঘের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও নীতি সম্বন্ধে অধিকৃত তথ্য প্রেরণ করা হোক।" বস্তুতঃ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই বহু কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে ডাক্তারজীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অতএব, সঙ্ঘের সম্বন্ধে এরকম আনুষ্ঠানিক জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে, তাঁদের এতখানি অজ্ঞানতা সম্ভব ছিল না। অতএব, ডাক্তারজী কংগ্রেস সম্পাদককে লিখলেন, "......আপনি আমাদের বিষয়ে তথ্য জানতে চেয়েছেন দেখে আশ্চর্য লাগল। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছে আজ বারো বছর হয়ে গেছে। এর মাঝে বিভিন্ন উৎসবে প্রতি বছর প্রধান-প্রধান অধিকারীরা সঙ্ঘের সম্বন্ধে অধিকৃত বক্তব্য জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। আমার মনে হয়না এর থেকে বেশী আপনাকে জানাবার মত আর কিছু আছে। কষ্টের জন্য ক্ষমা করবেন।"

এই পত্রের পরে ডাক্তারজী কাটোল ও অকোলা বিভাগের পরিভ্রমণে চলে গেলেন। এর মাঝে কংগ্রেসের সম্পাদক তিনটি পত্র লেখেন। সেগুলিতে তিনি লেখেন যে ডাক্তারজীর উত্তর যেন এড়িয়ে যাবার মত ছিল। যাতে তাঁর সমস্যার সমাধান হয়নি। সেই সঙ্গে তিনি এক দীর্ঘ প্রশ্নাবলীও ডাক্তারজীর কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। প্রবাস থেকে ফিরে আসার পর ডাক্তারজী এই সবগুলি পেলেন। পত্র পাঠ করে ডাক্তারজী কংগ্রেস-অধিকারীদের আসল মনোভাবটি

বুঝতে পারলেন। জেনে-বুঝেও অজ্ঞ হবার ভান করে অবান্তর প্রশ্ন উত্থাপনকারী কংগ্রেস সম্পাদককে তিনি তার ভাষাতেই উত্তর দেবেন ঠিক করলেন। তিনি প্রান্তের কয়েকজন নির্বাচিত অধিকারীদের ঐ পত্রগুলি দেখিয়ে তাঁদের সঙ্গে নীতি-বিষয়ক পরামর্শ করেন। ১লা ডিসেম্বর পূর্ণ বিচার-বিমর্শের পরে তিনি তাঁর উত্তর পাঠালেন। এই পত্র তাঁর স্বভাবের নানা দিকের উপর আলোকপাত করে। এতে যেমন প্রশ্নকর্তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার মত সরস চুটকি ছিল, তেমনি সদিচ্ছাও যথেষ্ট ছিল। তাঁর লেখনীর তীক্ষ্ণতা তথা স্পষ্টবাদিতার একটি নমুনাই ছিল এই পত্র।

তিনি লেখেন, "আপনার কৃপা পত্র পেয়েছি। কাটোল মহকুমা ভ্রমণের পরে ফিরেই অকোলার অধিবেশনের জন্য রওনা হতে হল। অতএব, উত্তর দিতে বিলম্বের জন্য ক্ষমা চাইছি।

"আমার দ্বারা প্রেরিত উত্তরগুলিকে আপনি কথা এড়িয়ে যাবার মত উত্তরের প্রমাণপত্র দিয়েছেন। আপনি আমাদের বিষয় লেখার সময়ে ভাল ভাষা ব্যবহার করলে ঠিক হত। আমাদের দুঃখ এই যে আমরা আপনাদের মত ভাষা ব্যবহার করতে পারি না। আমাকে একজন পরীক্ষার্থী ছাত্র মনে করে প্রেরিত প্রশ্ন-পত্রিকা পেয়েছি। কিন্তু এখন আমার বয়স পরীক্ষা দেবার উপযুক্ত নয়, সেই কারণে আপনার ইচ্ছাপূরণ করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে আমি আন্তরিক দুঃখিত। বস্তুতঃ আপনি এই প্রান্তে তথা এই নগরেরই নিবাসী। শুধু তাই নয়, আমার ধারণা আপনি নগরে যে সমস্ত কাজ চলে সেগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে এবং চৌকস বুদ্ধি দিয়ে নিরীক্ষণ করে থাকেন। তা সত্ত্বেও, এই শহরে এত দীর্ঘকাল যাবৎ ধূমধাম সহকারে জনসাধারণের সম্মুখে যে কাজ চলছে সে বিষয়ে আপনার জানা নেই, এটা বাস্তবিক একটি গূঢ় রহস্য বলে মনে হয়। জনতার নামের আবরণ নিয়ে আপনি অভিযোগ করেছেন যে 'সঙ্ঘ কংগ্রেস বিরোধী' । আমরা আপনার সাহসের প্রশংসা করি। আমরা আপনাকে জানাতে চাই যে সঙ্ঘ কখনই কংগ্রেস-বিরোধী ছিলনা, না এখন আছে। আমরা একথাও জানি যে কংগ্রেসের কার্যকর্তা এবং কংগ্রেসের মুখপত্র বলে কথিত কয়েকটি সংবাদপত্রে খোলাখুলি সঙ্ঘকে গালিগালাজ করে সঙ্ঘের বিরোধিতা করে বলেন যে কেউ যেন সঙ্ঘে না যায় এবং অভিভাবকরা যেন তাঁদের ছেলেদের সঙ্ঘে না পাঠান। কিন্তু একথাও আপনাকে নম্রতাপূর্বক বলতে চাই যে এই সব লোকের সৃষ্ট কাদার মধ্যে যেন আমরা কখনো না পড়ি। আমি মনে করি না যে উপরিউক্ত কার্যকর্তারা এবং কয়েকটি সংবাদপত্র যদিও তারা আমাদের এইভাবে বিরোধিতা শুরু করেছে, তবু আমাদের একথা মনে হয়নি যে কংগ্রেস আমাদের বিরোধিতা করছে। কংগ্রেস যদি আমাদের বিরোধিতা করত এবং আমরা যদি কংগ্রেসের বিরোধিতা করতাম, তাহলে আজ অনেক স্থানে কংগ্রেসের প্রমুখ কার্যকর্তাদের সঙ্ঘে এবং সঙ্ঘের প্রমুখ কার্যকর্তাদের কংগ্রেসে কাজ করতে দেখা যেতনা। সারাংশ এই যে আমাদের মতে সর্বজনীন কাজ যাঁরা করেন তাঁদের পরস্পরের প্রতি দ্বেষ তথা বিরোধিতা না করে নিজ-নিজ ক্ষেত্রে সাত্ত্বিক অন্তঃকরণে কাজ করাতেই আনন্দলাভ করা উচিত। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে বেশী আর কী লেখা যায়।"

সংগঠনের বিশাল কাজে এরূপ তিক্ত প্রসঙ্গও আসে, কিন্তু ডাক্তারজীর মনের ভারসাম্য কখনই নষ্ট হয়নি। কোন বিরোধী যদি তিলকে তাল করার চেষ্টা করত, তখনও তিনি ব্যাপারটিকে গুটিয়ে ফেলে শান্ত করারই চেষ্টা করতেন। কোন সময়ই তাঁর মনে স্থায়ী রাগ-দ্বেষ সৃষ্টি হতনা।

১৯৩৭-এর ডিসেম্বরে স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরের বিদর্ভ প্রান্তে পরিভ্রমণ হল। এই পরিভ্রমণকালে নাগপুর, চান্দা, ওয়ার্ধা, ভাণ্ডারা, অকোলা, উম্‌রেড প্রভৃতি স্থানে ডাক্তারজী স্বয়ং তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ১২ই ডিসেম্বর নাগপুরের শাখায় সাভারকরজীকে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হল। অন্যান্য স্থানেও তাঁকে শাখা দেখাবার ব্যবস্থা করা হল। সঙ্ঘ-রূপে হিন্দু সমাজের চৈতন্য জাগ্রত হচ্ছে দেখে ব্যারিস্টার সাভারকর ডাক্তারজীর মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করে সঙ্ঘের বৃদ্ধি হোক এই কামনা করেন।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ডাক্তারজী কাটোল, নাগপুর, ওয়ার্ধা, চান্দা ও যবতমালের শীতকালীন শিবিরগুলি পরিদর্শন করেন। নাগপুর শিবিরের উদ্বোধন করেছিলেন ঔন্ধ নরেশ। এক হাজার বালক স্বয়ংসেবকদের অত্যন্ত অনুশাসনবদ্ধ কার্যক্রম দেখে মহারাজ এত প্রসন্ন হলেন যে তিনি সঙ্গে আসা ফটোগ্রাফারকে তাদের ছবি তুলতে বলেন। কয়েকটি ছবি তোলা হয়ে যাবার পর ডাক্তারজীর দৃষ্টি ওদিকে গেল এবং তিনি সঙ্ঘের নিয়মের বিপরীত হওয়ার দরুন সেখানেই তা বন্ধ করিয়ে দিলেন। এই কয়েক মুহূর্তের ছবিতে ডাক্তারজী ধ্বজারোহণ করছেন দেখা যায়। এটা বাস্তবিক এক আনন্দময় সংযোগই ছিল যে সমগ্র ভারতে পরম পবিত্র ভগোয়াধ্বজ উত্তোলনে ডাক্তারজীর মঙ্গলাকাঙ্খা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কয়েক মুহূর্তে চিত্রায়িত হয়ে গিয়েছিল।

২৫. হিন্দু যুবক পরিষদ্

স্বাতন্ত্র্যবীর ব্যারিস্টার তাত্যারাও সাভারকরের বিদর্ভ পরিভ্রমণ সর্বত্র বিশেষ ধূমধামের সঙ্গে সম্পন্ন হল। এর ফলে রাঃ স্বঃ সঙ্ঘ কর্তৃক অঙ্গীকৃত হিন্দু রাষ্ট্রের অখণ্ড সাধনাও যথেষ্ট শক্তি লাভ করল। পরিভ্রমণের পরিণাম সম্পর্কে পরমপূজনীয় ডাক্তারজী লেখেন, "তাঁর এই পরিভ্রমণের ফলে এমনই অবস্থা প্রান্তের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে — যে রকম সমুদ্র-মন্থনের সময় হয়েছিল মনে হয়। চতুর্দিকে মানুষের মধ্যে নব-চৈতন্যের সঞ্চার হয়েছে।" একদিকে এই রকম উৎসাহপূর্ণ বাতাবরণ ছিল, আর অপর দিকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রঘাতক ঝঞ্ঝার ছবি কল্পনার দিগন্তে সুস্পষ্ট দেখা দিতে শুরু করেছিল। তৎকালীন পরিস্থিতি বড় বড় কংগ্রেস-নেতাদেরও পুনর্বিবেচনায় অনুপ্রেরিত করে সঙ্ঘ-কার্যের সত্যতা উপলব্ধি করার আহ্বান জানাচ্ছিল। চতুর্দিকে তথাকথিত 'হিন্দী রাষ্ট্রের' ঘোষণা চলছিল, এও অনুভূত হচ্ছিল যে এইরূপ ঘোষণাকারী বাক্য-বীরেরা সম্পূর্ণ পরিস্থিতিকে জয় করে পাকিস্থানের কল্পনার সম্মুখীন হতে অক্ষম। ঘটনা চক্রের সংকেতও সেই রকম ছিল। ১৯৩৮-এর ১লা জানুয়ারী কাটোলে নাগপুর জেলা শিবিরের সমারোপ উৎসবে ভাষণ দেবার সময়ে লোকনায়ক শ্রী বাপুজী অণে যে কথা বলেন তা থেকে বোঝা যায় কংগ্রেসের চিন্তাশীল কার্যকর্তারা সঙ্ঘের বিষয়ে কী রূপ মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি বলেন, "প্রভাবী আন্দোলনের নির্ঝরিণী একদিকে উদাসীনতার প্রস্তর খণ্ডগুলিকে চূর্ণ করে, অপরদিকে বিরোধীতার মৃত্তিকা রাশিকে বিদীর্ণ করে এগিয়ে চলে। এর পর সকলের সঙ্ঘের সঙ্গে সহযোগিতা করেই কাজ করা উচিত।" এর পর তিনি বলেন, "এই সংগঠন রাষ্ট্রের বর্ম। ডাক্তার হেডগেওয়ার হিন্দু রাষ্ট্রকে এই প্রকার বর্মের দ্বারা সুরক্ষিত করার কাজ হাতে নিয়েছেন, এর জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আমার ইচ্ছা এই যে এই সংগঠন রাষ্ট্রের সর্বদিকে বিস্তার লাভ করুক।"

এই সময় স্বাভাবিকভাবেই ডাক্তারজীর লক্ষ্য নতুন-নতুন কার্যকর্তাদের নির্মাণ করে নবীন ক্ষেত্রসমূহে কার্যবিস্তার করার দিকে নিবদ্ধ ছিল। সেই সঙ্গে কোন না কোন উপলক্ষ্য নিয়ে অন্য প্রান্তের প্রভাবশালী ও প্রতিষ্ঠিত সজ্জনদের নাগপুরে এনে সেখানকার অনুশাসনপূর্ণ এবং উৎসাহবর্ধক কাজের প্রত্যক্ষ তথা পরিণামকারী স্বরূপ প্রদর্শনেরও তিনি প্রয়াস করছিলেন। বছরের গোড়াতেই পাঞ্জাব থেকে শ্রীধর্মবীরজী নাগপুরে এলেন। সেই সময়ে ডাক্তারজীর ঘনিষ্ঠতা লাভ করে তিনি কী পরিমাণে উৎসাহিত হয়েছিলেন, তার বর্ণনা করে তিনি লেখেন, "আমি অত্যধিক আনন্দিত যে আমি নাগপুরে গিয়েছিলাম। যদি আজ আমার মৃত্যু আসে, তথাপি সন্তুষ্ট চিত্তে আমি তাকে স্বাগত জানাব। এর কৃতিত্ব আপনারই প্রাপ্য।"

ডাক্তারজী এই সময়ে তাঁর পত্রসমূহের মাধ্যমে কার্যকর্তাদের এগিয়ে চল এই আহ্বানই জানিয়ে চলেছিলেন। দিল্লীতে যে কার্যকর্তারা সঙ্ঘের কাজ করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের তিনি লেখেন, "সত্যই পরমেশ্বর তোমাদের অত্যন্ত উত্তম ক্ষেত্র দিগ্বিজয়ের জন্য দিয়েছেন এবং সকলের বিশ্বাস তোমরা নিজেদের পরাক্রমের দ্বারা সেখানে নিশ্চিতই বিজয়ী হবে।" নগরের শ্রী বাবুরাও মোরেকে তিনি লিখলেন, "এখন আমাদের সংকটের দিন শেষ হয়ে অনুকূল দিন আসছে, এ কথা স্বীকার করে নিতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এ সবই আপনার এবং আপনার সহকর্মীদের অধ্যবসায় তথা নিষ্ঠারই পরিণাম।"

১৬ই জানুয়ারী ডাক্তারজী ভোঁসলে সৈনিক বিদ্যালয়ের কাজে নাসিকে গেলেন। জানা গেছে যে এই যাত্রাকালে তিনি ডাঃ মুঞ্জের পত্র অনুসারে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য নাগপুর থেকে একশত লাঠি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই ধরনের ছোট-ছোট ব্যাপারগুলিও তিনি চিন্তা করতেন এবং এগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ করার বিষয়ে কখনো তাঁর সংকোচ হতনা। নাসিক থেকে ফেরার পথে তিনি ধুলেঁ, ভুসাওয়ল, অকোলা ইত্যাদি শাখাগুলি পরিদর্শন করে ২১ শে জানুয়ারী নাগপুর এলেন। ১২ই ফেব্রুয়ারী নাগপুরে প্রমুখ অধিকারীদের বৈঠক আহ্বান করে সেখানকার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রী রামচন্দ্র নারায়ণ অর্থাৎ শ্রী বাবাসাহেব পাধ্যেকে প্রান্ত-সঙ্ঘচালক নিযুক্ত করেন। এর পাঁচ দিন পরেই নাগপুর, বিদর্ভ ও মহারাষ্ট্রের প্রান্ত-সঙ্ঘচালকদের বৈঠকে ডাক্তারজী কার্যবৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেন।

এই তিন প্রান্তের কাজের ব্যবস্থার জন্য ভাল কার্যকর্তা নির্মাণে ডাক্তারজী যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। ডাক্তারজী ভাল করেই জানতেন যে যদি সুদৃঢ়রূপে কাজের বিস্তার ঘটাতে হয়, তাহলে কার্য বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে একটি অনুশাসনসূত্রও নির্মাণ করা আবশ্যক। তিনি কাজের সম্পূর্ণ জাল এই ভিত্তির উপরেই বিস্তৃত করেছিলেন। মার্চের প্রথম দিকে তিনি মহাকোশল প্রান্তের ভ্রমণও করে এসেছিলেন। এই পরিভ্রমণে তিনি সিবনী, নরসিংহপুর, সাগর, দমোহ ইত্যাদি শাখা স্থানগুলি পরিদর্শন করেন। ডাক্তারজীর কাকা শ্রী আবাজী হেডগেওয়ারও ইতিমধ্যে খান্দেশের পরিভ্রমণ শেষ করে প্রায় একই সময়ে নাগপুরে ফিরে আসেন। এই সময়ে চতুর্দিক থেকে কাজের উন্নতির সংবাদ আসছিল। বিশেষতঃ পাঞ্জাবে বিপুল গতিতে রাওয়ালপিণ্ডী, মণ্ডী বহাউদ্দীন, শিয়ালকোট, লাহোর, জলন্ধর, অমৃতসর, সুনাম, হিসার প্রভৃতি স্থানে সঙ্ঘের শাখা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং তার প্রতি অধিকাধিক হিন্দু তরুণরা আকৃষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু ডাক্তারজী এই প্রগতি দেখেই সন্তুষ্ট না হয়ে সমগ্র দেশকে সঙ্ঘময় করে তোলার কামনা নিয়ে সচেষ্ট ছিলেন। সামনে এত বড় কাজ থাকা সত্ত্বেও নাগপুরে 'হিন্দু ধুনুরি' পাওয়া যায়না এটা তাঁর ভাল লাগত না এবং এই অভাব কেমন করে পূরণ করা যায়, তার জন্য তিনি চেষ্টা করতেন। একই সঙ্গে সঙ্ঘ-প্রেমী সজ্জনদের গৃহে বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য তিনি যেমন করে হোক সময় করে নিতেন।

সাধনা, অখণ্ড সাধনাই ডাক্তারজীর জীবন ছিল। বিশ্বের মধ্যে হিন্দু সমাজকে অজেয় করে তোলার আকাঙ্ক্ষাই বুঝি 'ডাক্তারজী' রূপে দেহ ধারণ করে তপস্যা করে চলেছিল।

পরিস্থিতিসমূহের পর্বতশ্রেণীকেও অবনমিত করার মত পৌরুষ ও পরাক্রম তাঁর জীবনের প্রতিটি ব্যবহারের মধ্যেই প্রতিফলিত হত। অনেকেই হয়তো তারুণ্যের আকাঙ্ক্ষা, অধ্যবসায় এবং আত্মবিশ্বাসের আকর্ষক চিত্র কল্পনার দ্বারা মানসপটে অথবা লেখনীর তুলির দ্বারা কাগজে অংকিত করে থাকতে পারে, কিন্তু সেই চিত্রগুলিকে জীবন্ত-জাগ্রত অস্থি-মাংসের মানুষ রূপে পরিণত করার প্রয়াস কে করেছে? ডাক্তারজী তাঁর প্রচেষ্টার পরাকাষ্ঠা করে অসম্ভবকেও সম্ভব করে দিয়েছিলেন এবং তদনুরূপ তরুণদের দর্শন সঙ্ঘের শাখাসমূহে স্থানে-স্থানে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিল। ডাক্তারজীর সংগঠন-কুশলতার প্রশংসা কেউ প্রকাশ্যে করছিল, আবার কেউ মনে-মনেই তাঁর কাজকে অভিনন্দিত করছিল, কিন্তু সন্দেহ নেই যে ১৯৩৮-এর কাছাকাছি সময় সঙ্ঘকার্যের অগ্রগতি শত্রু-মিত্র সকলকেই আশ্চর্য-চকিত করে তুলছিল। সংগঠনকে মূর্ত স্বরূপ প্রদানের জন্য ডাক্তারজীর আকাঙ্ক্ষা ও দক্ষতা বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রের সকল তরুণ শ্রেণীকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। অতএব, যখন ১৯৩৮-এর মে মাসে পুনাতে 'অখিল মহারাষ্ট্র হিন্দু যুবক পরিষদ্' আয়োজিত করার কথা চিন্তা করা হল, তখন তার সভাপতি পদের জন্য সকলের দৃষ্টি ডাক্তারজীর দিকে গেল।

ভোঁসলা মিলিটারি স্কুলের উদ্বোধনের জন্য ডাক্তারজী ২৫ শে মার্চ নাসিকে গেলেন। সেই সময়কার একটি ছোট্ট ঘটনা উল্লেখযোগ্য। যে ট্রেনে ডাক্তারজীর যাবার কথা ছিল, তার জন্য তিনি যখন স্টেশনে গেলেন, তখন দেখা গেল যে গাড়ীতে এত বেশী ভীড় ছিল যে আক্ষরিক অর্থে কোথাও তিল ধারণেরও জায়গা ছিল না। যে সব কার্যকর্তা তাঁকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন, তাঁরা প্রস্তাব করলেন যে তৃতীয় শ্রেণীতে যাত্রা করা যখন সম্ভব নয়, তখন দ্বিতীয় অথবা প্রথম শ্রেণীতে যাত্রা করা উচিত। কিন্তু ডাক্তারজী পরিষ্কার 'না' বলে দিলেন এবং ঐ ট্রেনের পরিবর্তে পরের ট্রেনে নাসিকে গেলেন। ঐ সময়ে আর্থিক দিক দিয়ে সঙ্ঘের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল এবং ডাক্তারজী প্রত্যেক কার্যকর্তাকে মিতব্যয়িতার জন্য আগ্রহ করতেন। কিন্তু যে নিয়ম তিনি অন্যদের জন্য তৈরী করতেন, স্বয়ং নিজেকে তার ব্যতিক্রম করা তাঁর পক্ষে স্বীকার্য ছিল না। অন্যরা হয়তো আচরণের এই সরল সূত্রটিকে সর্বদা তথা সহজেই উপেক্ষা করত, কিন্তু ডাক্তারজী সারা জীবন সতর্কতার সঙ্গে সেই নিয়ম পালন করে গেছেন। ('ইতরাঁ সাঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান, পণ আপণ কোরডা পাষাণ") "অপরকে দিই ব্রহ্মজ্ঞান, নিজে থাকি নিরেট পাষাণ" — এইরূপ দুর্ভাগ্যপূর্ণ ঘটনা যেন সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের জীবনে দেখা না যায়, এর জন্য ডাক্তারজী স্বয়ং নিজের জীবনে নিজের সম্পূর্ণ আচরণ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিচালিত করেছিলেন এবং 'আপনি আচরি ধর্ম' এই নীতি-বাক্য তাঁর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হতে দেখা গিয়েছিল। বহুবার তাঁকে তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রেলযাত্রা করতে হত। কিন্তু সব কষ্ট সহ্য করে তিনি তাঁর সঙ্গে রাতদিন যে কার্যকর্তারা থাকতেন, তাঁদের খুব ভালভাবে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে সর্বজনীন অর্থের সদ্ব্যবহার কত সাবধানে করা উচিত।

নাসিক থেকে ডাক্তারজী ২রা এপ্রিল নাগপুর ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে শ্রী লঃ বঃ ভোপটকরের ২৮ শে মার্চ লেখা পত্র তাঁর নামে এসে পৌঁছেছিল, যাতে লেখা ছিল যে, 'হিন্দু

যুবক পরিষদ্'-এর সভাপতি পদে তাঁকে নির্বাচিত করা হয়েছে। তার পরেই স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর তার পাঠালেন যে, "সভাপতি পদ অবশ্য স্বীকার করবেন।" মহারাষ্ট্রের শত-শত তরুণদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ, ব্যাঃ সাভারকরের আগ্রহ ইত্যাদি সব কথা বিবেচনা করে ডাক্তারজী সভাপতিত্ব গ্রহণের সম্মতি জানিয়ে দিলেন। এপ্রিলের প্রথম দিকে তিনি বোম্বাই এবং উপনগরের শাখাগুলি পরিদর্শন করে নাগপুরে এলেন। সেখানে অধিকারী শিক্ষণ বর্গের প্রাথমিক ব্যবস্থা দেখে এপ্রিলের শেষে 'হিন্দু যুবক পরিষদ'-এর জন্য পুনা রওনা হলেন। যাবার পথে তলেগাঁও ও লোণাবলা শাখাগুলি পরিদর্শন করেন।

এই সময় লোণাবলার একটি ঘটনা স্মরণীয়। রাত্রে ডাক্তারজীর বৈঠকে বহু বিশিষ্ট সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন শুধু ডাক্তারজীর সঙ্গে তর্ক করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের কথা-বার্তার ধরন দেখে প্রথমেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। অতএব, প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হতেই তাঁরা একটি-একটি শব্দ ধরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। কোন শব্দের শ্লেষ-সূচক অর্থকে ভিত্তি করে অসংগত প্রশ্নও, এমনকি অশালীন ভাষাও তাঁদের কেউ-কেউ ব্যবহার করলেন। এই সব দেখে সেখানকার নতুন স্বয়ংসেবকদের মনে আশংকা হল যে এর ফলে বৈঠকের উদ্দেশ্যই না পণ্ড হয়ে যায়। এই লোকদের ওপর অনেকে ক্রুদ্ধও হয়ে উঠল। কিন্তু ডাক্তারজী প্রত্যেক প্রশ্নের অত্যন্ত শান্তভাবে উত্তর দিচ্ছিলেন। তাঁর মনের ভারসাম্য কয়েকজনের উল্টোপাল্টা কথাতেই নষ্ট হয়ে যাবে — এরকম ছিল না। তাঁর উত্তর হত নির্বাচিত শব্দে এবং তার পিছনে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস প্রতিফলিত হত। প্রায় দেড় ঘণ্টা এই রকম আলোচনা চলে এবং অবশেষে প্রশ্ন শেষ হয়ে যায়। বৈঠক কিছুটা উত্তেজনার বাতাবরণে শেষ হয়। গাড়ীতে বসার জন্য সকলের সঙ্গে ডাক্তারজী বাইরে রাস্তায় এলেন। তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন মুদ্রায় হাসতে-হাসতে বলেন, "বাহ্! লোণাবলার হাওয়া তো বেশ ঠাণ্ডা!" এই বাক্যের মধ্যে নিহিত অর্থ বুঝে নিতে কারো বিলম্ব হল না, এবং সকলেই প্রাণ খুলে হেসে ওঠেন। সম্পূর্ণ বাতাবরণ একেবারে পালটে গেল। অন্যমনস্কতা তথা মনের উপর জমে ওঠা চাপ না জানি কোথায় মিলিয়ে গেল, এবং সকলেই যা কিছু ঘটে গেল, তার আনন্দে মশগুল হলেন।

'হিন্দু যুবক পরিষদ্'-এর জন্য ডাক্তারজী ৩০ শে এপ্রিল সকালে পুণা পৌঁছলেন। সেই সময় স্টেশনে তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জানানো হল। শত-শত তরুণদের সঙ্গে শ্রী গণপত রাও নলাবড়ে, 'কেশরী' সম্পাদক শ্রী জঃ সঃ করন্দীকর, শ্রী লঃ বঃ ভোপটকর, আচার্য প্রঃ কেঃ অত্রে, শ্রী রামভাউ রাজওয়াড়ে ইত্যাদি প্রমুখ ব্যক্তিরা স্বাগত অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তারজীর গাড়ী প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করতেই হিন্দু ধর্ম ও ডাক্তারজীর জয়ধ্বনিতে স্টেশন মুখরিত হয়ে উঠল। গাড়ী থেকে নামতেই পুষ্পমাল্যে তিনি প্রায় আচ্ছাদিত হয়ে পড়লেন। কিছু পরে তাঁকে আচার্য অত্রের নিবাস স্থানে নিয়ে যাওয়া হল। আচার্য অত্রে এটুকু সময়ের মধ্যে ডাক্তারজীর ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় লাভ করলেন, তা তিনি এইভাবে ব্যক্ত করেন — "হিন্দু যুবক পরিষদের সভাপতি রূপে ডাক্তারজী পুনায় এসেছিলেন। পরিষদের ব্যবস্থাপকরা কার্যক্রমের পূর্বে প্রায় দেড় ঘণ্টার জন্য আমার গৃহে তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা

করেছিলেন। এক প্রখর রাষ্ট্রীয় বৃত্তির গোঁড়া দেশভক্ত হিসাবে আমি তাঁর নাম শুনেছিলাম। সে সময়ে সঙ্ঘের বিশেষ খ্যাতি হয়নি। কিন্তু ডাক্তারজীর মত মহান্ ব্যক্তি আমাদের এখানে আসছেন সে কারণে স্বাভাবিকভাবেই মনের মধ্যে একটু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। বহুবার এমনও দেখা যায় যে আগমনকারী 'বড় নেতা' মনের এই উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দেন।

"সকালবেলায় ডাক্তারজী আমাদের এখানে এলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত ভব্য, গম্ভীর এবং শান্ত ছিল। কিন্তু তিনি গৃহে প্রবেশ করতেই মনে হল যেন পরিবারেরই কোন গুরুজন আমাদের বাড়ীতে এসেছেন। তাঁর কথা-বার্তায়, ওঠা-বসায় এতটুকু অস্বাভাবিকতা অথবা লৌকিকতা ছিল না। তাঁর কথা বলার ধরণ ছিল অত্যন্ত সৌম্য, কিন্ত তা ছিল আত্মবিশ্বাস তথা দৃঢ়-নিশ্চয়ে পরিপূর্ণ। তার মধ্যে কোনরকম দম্ভ বা লোক-দেখানোর আভাস মাত্র ছিল না। তিনি সহজ তথা সরলভাবে কথাবার্তা শুরু করতেই বাতাবরণের লৌকিকতা একেবারে উবে গেল এবং চার দিকে আনন্দ ছেয়ে গেল।"

চা-পানের কার্যক্রমের পর সকাল আটটায় সমর্থ-মন্দির থেকে ডাক্তারজীর শোভাযাত্রা অত্যন্ত ধূমধাম সহকারে বেরুল। মানুষের স্বভাব তার প্রতিদিনের ব্যবহারেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। ডাক্তারজীর শালীনতাও এই সময়ে রথে আরূঢ় অবস্থাতেও গোপন থাকেনি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাক্তারজীকে নিয়ে রথের নিকট উপস্থিত হতেই ডাক্তারজী এক দিকে সরে গেলেন এবং প্রথমে ক্ষাত্রজগৎগুরুকে আগ্রহপূর্বক রথে বসিয়ে তারপর নিজে উঠলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিকেও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন — এটাও ছিল ডাক্তারজীর ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য।

শোভাযাত্রায় দশ-বারো হাজার মানুষ সম্মিলিত হয়েছিল। মাঝে মাঝে বাদকবৃন্দের আট-দশ সারি তাদের সুরলহরী দিয়ে বায়ুমণ্ডলকে আপ্লুত করে তুলছিল। মিছিলের সম্মুখে পতাকা উত্তোলিত ছিল এবং তার পিছনে দুন্দুভি বাজছিল। এরপরে ছিল যোগচাপের পথক। প্রায় পৌনে এক মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রার মধ্যভাগে এক সুসজ্জিত রথে ডানদিকে ডাক্তারজী, মধ্যখানে ক্ষাত্রজগৎগুরু এবং বাঁদিকে শ্রীভোপটকর বিরাজমান ছিলেন। এ বিষয় "কেশরী" তার প্রতিবেদনে লেখে, "রথে দুইটি সুন্দর অশ্ব জোতা হয়েছিল এবং দুই দিকে স্বেচ্ছাসেবকেরা গৌরবের সঙ্গে চামর দোলাচ্ছিল। পথের দুধারের ভবন ও অট্টালিকাগুলিতে অসংখ্য দর্শক দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রা দেখছিল। 'স্বরাজ্যের ক্ষুধা সুরাজ্য দিয়ে মেটেনা', 'জিন্নার দাবী রদ কর' ইত্যাদি ধ্বনি আকাশে গুঞ্জিত হচ্ছিল। স্থানে-স্থানে পুষ্পমাল্য প্রদান ও আরতির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছিল।"

মিছিলের এই ভীড়ের মধ্যেও ডাক্তারজী দেখলেন যে তাঁদের পিছনে-পিছনে এক খঞ্জ তরুণ হাতের লাঠির সাহায্যে অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে লাফাতে-লাফাতে এবং ধ্বনি দিতে-দিতে সঙ্গে চলেছে। এক চৌরাস্তায় অভ্যর্থনার জন্য মিছিল থামতেই ডাক্তারজী তাকে কাছে ডাকলেন এবং স্নেহভরে তাকে কোলে নিয়ে রথে বসালেন। সত্যি বলতে কি, ডাক্তারজীর লক্ষ্য পুষ্প-মাল্যের দিকে ছিল না। লৌকিকতার খাতিরে তিনি ঐগুলি গ্রহণ করছিলেন। কিন্তু তাঁর মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে এই চিন্তাই চলছিল যে ফুলমালা পরাচ্ছে যে হাতগুলি, হিন্দু

রাষ্ট্রের রক্ষার জন্য সেগুলি কেমন করে শক্তিতে ভরে উঠবে এবং অভ্যর্থনাকারী হৃদয়গুলি কেমন করে দেশভক্তির ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। যদি ফুল ও মালার মধ্যে তিনি নিজেকে ভুলে যেতেন তাহলে এক খোঁড়া মানুষকে রথে বসাবার কথা তাঁর মাথাতেই আসতনা।

তাঁর মন সমাজের মঙ্গলচিন্তায় রঞ্জিত ছিল। শুধু একজন খঞ্জ ব্যক্তিকে কষ্ট পেতে দেখে তার দিকে তাঁর মমতা-ভরা হস্ত প্রসারিত হয়নি, বরং তাঁর মন তো দুর্বল ও পরাবলম্বী হিন্দু সমাজের অবস্থা দেখে ব্যথিত ছিল। সমাজের এই দুরবস্থা দূর করে তাকে বলশালী, স্বাবলম্বী এবং বিজয়ী করে তোলার জন্য তিনি নিজের হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। ডাক্তারজীর কণ্ঠে যে মধুর গন্ধে ভরা মোহ সৃষ্টিকারী পুষ্পমাল্যের শীতলতা ছিল, তার নীচে পরাধীনতাকে দগ্ধ করার আকাঙ্খার আগ্নেয়গিরি জ্বলছিল। তাঁর পুষ্পমাল্য নয়, ভক্তিতে পরিপূর্ণ মাতৃভূমির শ্রীচরণে জীবন সমর্পণকারী যুবকদের উপহারের আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাঁর চতুর্দিকে মৃদু দীপের আরতির কামনা নয়, মাতৃভূমির যশঃ গৌরবকে যারা প্রজ্জ্বলিত করে তুলবে নিজ প্রাণের দীপশিখা জ্বালিয়ে এবং ভীষণ পরিস্থিতির ঝঞ্ঝাবাতেও ধৈর্য ও তারুণ্যের ঘৃতাহুতি দিয়ে তাকে প্রদীপ্ত করে তুলবে এমন দেশভক্তের দলই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য।

পুনা নগরের প্রধান পথগুলি দিয়ে চলেছিল এই শোভাযাত্রা। অসংখ্য নাগরিক ডাক্তারজীকে মালা পরালেন এবং স্থানে-স্থানে পুষ্পবৃষ্টিও হচ্ছিল। যে সোন্যামারুতি মন্দিরে এক বছর পূর্বে ডাক্তারজী সত্যাগ্রহ করেছিলেন, তার নিকটে শোভাযাত্রা পৌঁছতেই তিনি রথ থেকে নেমে শ্রীহনুমানজীর চরণে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে তাঁর দর্শন করলেন। মণ্ডীর সামনে দিয়ে রথ এগিয়ে গেলে তিনি রথ থেকে নেমে লোকমান্য তিলকের মর্মর মূর্তিতে মালা অর্পণ করেন। পুনা পৌরসভার নিকট পৌরপ্রধান সম্পূর্ণ শহরের পক্ষ থেকে ডাক্তারজীকে অভ্যর্থনা জানান। শোভাযাত্রা চলে তিন ঘন্টা ধরে। বেলা প্রায় এগারটায় শোভাযাত্রা 'লোকমান্য তিলক স্মারক মন্দির' প্রাঙ্গণে উপনীত হলে ধ্বজারোহণ তথা ধ্বজ বন্দনার পরে এই কার্য্যক্রম সমাপ্ত হয়।

বেলা তিনটের সময়ে তিলক স্মারক মন্দির প্রাঙ্গণে নির্মিত প্রশস্ত মণ্ডপে পরিষদ্ আরম্ভ হয়। প্রায় ছয় শত প্রতিনিধি এবং সাত-আট হাজার শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। মন্দিরের চাতালের উপরেই সুউচ্চ ও সুসজ্জিত মঞ্চে স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর, সেনাপতি বাপট, ডাঃ মুঞ্জে, তপস্বী বাবাসাহেব পরাঞ্জপে, বাবারাও সাভারকর প্রমুখ নেতারা বসেছিলেন। ডাক্তারজীকে সভাপতির আসন গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে যে বক্তৃতা হয়, তার মধ্যে দু-একটি কথা উল্লেখযোগ্য। জনৈক বক্তা বলেন, "আজকের সভাপতি মহাশয় 'কথনশাস্ত্র' অপেক্ষা 'কৃতিশাস্ত্রে' অধিক নিপুণ।" আরেক জন ডাক্তারজী সম্পর্কে অত্যন্ত সমীচীন বর্ণনা করে বলেন, "আইসবার্গের সমান ডাক্তার হেডগেওয়ারের শুধু এক অষ্টমাংশই বাইরে দেখা যায়, তাঁর সাতভাগই থাকে ভিতরে অদৃশ্য।"

পরিষদের সম্মুখে তাঁর যে ভাষণ হল, তা চিরকালের মত সরল ও সুবোধ্য ছিল। তিনি নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা সমূহের মন্থন করে 'আত্ম-সমর্পণের' যে নবনীত পেয়েছিলেন, সেটাই ডাক্তারজী তরুণদের সামনে উপস্থাপন করলেন। ভাষণের সূচনায় তিনি বলেন,

"স্টেশনে পা রাখতেই এখানকার মানুষেরা আমার যে বিরাট স্বাগত ও সম্বর্ধনা শুরু করেন, তাতে আমি খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছি।" এর পরে তিনি হিন্দু রাষ্ট্রের পতনের কারণ মীমাংসা করে বলেন যে এই অবস্থার পরিমার্জন করার জন্য উপায়-যোজনার চিন্তা করাই এই পরিষদ্ আয়োজনের উদ্দেশ্য হতে পারে। এর পরে তিনি বলেন, "একথা সকলেই জানেন যে ইংরেজরা আমাদের রাজ্য হস্তগত করে রেখেছে। মুসলমানেরা আমাদের রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিল, তা আমরা উদ্ধার করেছিলাম। কিন্তু সে সময়ে আমাদের মনের মধ্যে যে ভাবনা কাজ করছিল, তা আর পরে রইলনা। সেই কারণেই আমরা পুনরায় পরাধীন হলাম। এই ভাবনা ও তত্ত্বই রাষ্ট্রীয়তা তথা সমষ্টিভাব।

"আমি সমাজের জন্য" — এই মনোভাব বিস্মৃত হয়ে 'সমাজ আমার জন্য' এই মনোভাবের আমরা শিকার হয়ে পড়েছি। এই ভাবটি আমাদের মনে গভীরভাবে গেঁথে গেছে। যে মানুষ স্বয়ং নিজের মোক্ষের জন্য প্রয়াস করে, জপ-তপ করে, যে কখনো কারো সঙ্গে বিবাদ করেনা, কারুর ব্যাপারে নাক গলায়না, শুধু নিজের বাড়ী, চাকুরীকেই সব কিছু মনে করার সংকীর্ণ ভাবনা নিয়ে সব রকম আচরণ করে, তারই আমরা প্রশংসা করি প্রাণভরে। এই স্তুতিপাঠ আমাদের ছেলে-মেয়েরা শোনে এবং এই রকম স্বার্থ সর্বস্ব ব্যক্তিকেই আদর্শ মনে করে তদনুরূপ আচরণ করার চেষ্টা করে। যতদিন আমরা এই প্রকার চিন্তাভাবনা নিয়ে চলব, ততদিন হিন্দু রাষ্ট্র এইভাবে বিনষ্ট হতেই থাকবে। আজ তরুণ প্রজন্মের মনে এই ভাবই জাগেনা যে সমাজ বাঁচলে আমিও বাঁচব। আমরা নিজ পরিবারের আনুগত্যের বা নিষ্ঠার রোগে আক্রান্ত। যাদের অন্তঃকরণে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কিঞ্চিৎ মাত্র স্থান নেই, এমন বিশুদ্ধ দেশভক্ত কতজন পাওয়া যাবে? খুবই অল্প। হিন্দু রাষ্ট্রের বিষয় চিন্তা করার সময়ে ব্যক্তির চিন্তা মন থেকে তাড়িয়ে দিন। যে মানুষ 'আমি ও রাষ্ট্র এক' এই মনোভাব নিয়ে রাষ্ট্র তথা সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, সেই প্রকৃত রাষ্ট্রসেবক। অনেকে বড় গর্বের সঙ্গে বলে — "আমি রাষ্ট্রের জন্য এত ত্যাগ করেছি"--কিন্তু এ কথা বলার সময়ে তাদের এ কথা মনে থাকেনা যে এইভাবে তারা দেখিয়ে দেয় যে তারা রাষ্ট্রের থেকে ভিন্ন এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধ নেই। যদি উদাহরণ দিতে হয় তাহলে এ কথা বলা কি ঠিক হবে যে পিতা তার পুত্রের উপনয়নে যা খরচ করেছে, সেটা তার বিরাট ত্যাগ? 'আমি আমার ছেলের জন্য এত ত্যাগ করেছি'—এ রকম কথা বলা কতখানি যুক্তিসঙ্গত? পরিবারের জন্য ব্যয় করা যেমন স্বার্থত্যাগ নয়, তেমনই রাষ্ট্ররূপী পরিবারের সেবায় যা ব্যয় করা হয়, সেটাও স্বার্থত্যাগ নয়। রাষ্ট্রের জন্য খরচ করা, কষ্ট সহ্য করা তো প্রত্যেক মানুষের পবিত্র কর্তব্য। তার মধ্যে স্বার্থত্যাগ কোথায়?

এরপর হিন্দুস্থান হিন্দুরাষ্ট্রই কেন থাকবে, এ বিষয়ে তাঁর অভিমত প্রকাশ করে ডাক্তারজী বলেন, "আমাদের দেশের নাম 'হিন্দুস্থান', 'হিন্দীস্থান', নয়। আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে হিন্দুস্থান — 'হিন্দীস্থান',' ইসলামীস্তান' না হয়ে যায়। হিন্দুস্থান হিন্দুদের, এবং ভবিষ্যতেও সেই প্রকারই রাখতে হবে। এই দেশ কোন ধর্মশালা নয় যে যার ইচ্ছা এখানে এসে বিছানা পেতে স্থায়ী আসন গেঁড়ে বসবে। যাদের ইতিহাস, পরম্পরা, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি, চিন্তাধারা

এবং হিত-সম্পর্ক সমান হয়, তারাই রাষ্ট্র বলে অভিহিত হয়। তার বিপরীত, কোন পরিস্থিতির জন্যে একত্রে আসা লোকেরা রাষ্ট্র হতে পারেনা। এটা স্বতঃসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের তরুণদের আজ উল্টো শিক্ষা দেওয়া হয় যে যারা হিন্দুস্থানের বিনাশ-সাধনের উদ্দেশ্যে অথবা যারা 'বন্ধুত্বের ভেক-ধারী' হয়ে এখানে এসেছে, তাদের সকলকে রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত মনে করতে হবে। যারা একে-অন্যের নাম ও সব চিহ্নই মুছে দেবার জন্য লড়াই করে মৃত্যুবরণ করে, তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সম্ভব নয়। ইঁদুর ও বেড়ালের বন্ধুত্ব অসম্ভব। এই বন্ধুত্ব শুধু তখনই সম্ভব হবে যখন ইঁদুর বেড়ালের পেটের মধ্যে চলে যাবে।"

রাষ্ট্রীয়ত্বের এই কল্পনাকে বিশদ করে ডাক্তারজী তরুণদের পরামর্শ দিলেন যে কোন ব্যক্তিকে ভয় না করে অথবা দাক্ষিণ্য না দেখিয়ে যে তত্ত্ব বুদ্ধির নিরিখে খাঁটি প্রমাণিত হবে তাকেই স্বীকার করতে হবে। তিনি বলেন, "এ বিষয়ে যত বড় নেতা যাই বলুন না কেন, তাকে প্রথমে আপনার বুদ্ধির কষ্টিপাথরে ঘষে দেখে নেবেন। বড় নেতার বচন, অতএব অন্ধ শ্রদ্ধায় গ্রহণ করবেন না। লোকমান্য তিলক দেশের মধ্যে একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা মানুষের পছন্দ হয়েছিল, সেই কারণে তিনি অনেক অনুগামী লাভ করেছিলেন। কিন্তু পরে কী হল? ৩১শে জুলাই রাত্রে লোকমান্য তিলকের মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে -সঙ্গে ১লা আগষ্ট সম্পূর্ণ রংই পাল্‌টে গেল। পুরাতন চিন্তাধারার স্থানে নূতন চিন্তাধারা এল। বুদ্ধির কষ্টি পাথরে তাকে যাচাই না করে আমরা ভেড়ার মত তার পিছনে চলতে শুরু করে দিলাম। এইভাবে যদি প্রত্যেক নেতার ইচ্ছানুযায়ী আমরা যদি পথ হারিয়ে ফেলি, তাহলে স্বাধীনতা কবে এবং কেমন করে অর্জন করব?"

তরুণদের বুদ্ধিবাদী হবার উপদেশ দেবার পর ডাক্তারজী তাঁর ভাষণে এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন যে এক শ্রেণীর নেতারা কীভাবে সমাজের সঙ্গে ছলনা করছেন। তিনি বলেন, "আমি আমাদের কথা বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সামনে উপস্থাপন করি। তাঁদের তা পছন্দও হল। কিন্তু তাঁরা বললেন, 'কী করি ডাক্তারজী? আপনার কথা তো আমাদের ভালই লাগে, কিন্তু আজকাল আমরা অন্য সংস্থার সদস্য হওয়ার কারণে আপনার কথা খোলাখুলি মেনে নিতে পারিনা। তবু ভিতর থেকে আমরা আপনাকে সাহায্য করব।' এইরূপ উত্তর দিয়ে ঐ নেতারা নিজেদের এবং অন্যদেরও প্রবঞ্চনা করেন। আপনারা এই ধরণের ধাপ্পা দেবেন না। আমাদের প্রত্যেকের হিন্দু সমাজের কল্যাণ সাধনে সত্যিকার আনন্দ হওয়া উচিত। আমাদের কারো প্রতি ঈর্ষা-দ্বেষ নেই। কারো সঙ্গে লড়াই করার নেই, কাউকে আল্‌টিমেটমও দেবার নেই। আমাদের শুধু নিজ সমাজকে সংগঠিত ও অজেয় করে তুলতে হবে।"

ভাষণের শেষে তিনি ঘোষণা করেন যে "এই পরিষদ্ প্রান্তীয় নয়, বরং পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে।"

পরিষদের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে আঠারটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সেগুলির মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা, সৈনিক শিক্ষার প্রসার, জাত-পাতের বিরোধিতা ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রস্তাব ছিল প্রধান। পরিষদের সম্মুখে ভাষণ দিতে উঠে স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর বলেছিলেন, "সঙ্ঘ ভাবী হিন্দুরাষ্ট্রের আশা এবং ভাবী প্রজন্মের নির্মাণের একমাত্র স্থান।"

দুই দিন পরিষদের কাজকর্ম অত্যন্ত ধূমধাম তথা উৎসাহের সঙ্গে চলে। পরিষদের সমারোপ করার সময়ে ডাক্তারজী যে ভাষণ দেন তা বাস্তবিকই ছিল অবিস্মরণীয়। ভাষণে তিনি প্রস্তাব অনুসারে আচরণ করার উপর গুরুত্ব প্রদান করে স্বাধীনতার কল্পনাকে বিশদ করেছিলেন। তিনি বলেন, "স্বাধীনতা ছাড়া কোন রাষ্ট্র জীবিত থাকতে পারেনা। যতদিন আমাদের রাষ্ট্র পরাধীন, ততদিন আমরা সকল মানুষ মৃতের সমান। কিন্তু স্বাধীনতা এমন বস্তু যে সেটা যত মিষ্ট, ততই দুর্মূল্যও। সেটা অর্জন করার জন্য আমাদের বিরাট মূল্য দিতে হবে। এই মূল্য দেবার মত সামর্থ্য যখন আপনারা অর্জন করবেন, তখনই স্বাধীনতার দাবী করার অধিকারও আপনারা লাভ করবেন। তার জন্য আমাদের সকলকে স্বয়ং নিজের, নিজেদের অর্থ-সম্পদের, শক্তির এবং পুরুষার্থের আহুতি দিতে হবে। স্বাধীনতা শুধু অর্থের বিনিময়ে লাভ করা যায় না। তাকে অর্জন করার একমাত্র উপায় হল সংগঠন ও সামর্থ্য। সংগঠন করার, সামর্থ্য সম্পাদনের যে পথ আপনার পছন্দ, সেই পথে চলুন। কিন্তু একবার পথ স্বীকার করে নেবার পর, একবার পদক্ষেপ গ্রহণের পর পিছনে ঘুরে দেখার চিন্তা পর্যন্ত মনে আনবেন না। বরাবর সামনের দিকেই এগিয়ে চলুন। আপনাদের ভিতর পর্যাপ্ত সামর্থ্য গড়ে উঠলেই সব প্রশ্নের সহজেই সমাধান হয়ে যাবে।" ভাষণের শেষে ডাক্তারজী সব তরুণদের ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করার অনুরোধ করেন।

অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পরিষদ্ সম্পন্ন হয়। সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্তারজী পুনার অধিকারী শিক্ষণ বর্গে নিমগ্ন হয়ে পড়লেন। পরিষদের সমাপ্তির পরে 'কেশরীর' পক্ষ থেকে গায়কওয়াড প্রাসাদে স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর, ক্ষাত্রজগদ্‌গুরু এবং ডাক্তারজীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়, সেই সময়ে উক্ত তিনজনের একটি সম্মিলিত আলোকচিত্রও পাওয়া যায়। সম্বর্ধনার সময় ক্ষাত্রজগদ্‌গুরু বলেন, "আপনারা আমাকে যে সম্মান জানালেন আমি তার পাত্র নই, কারণ আমি শুধু বলতে পারি, যে দেশভক্ত সাভারকর এবং ডাক্তার হেডগেওয়ারই তো প্রত্যক্ষ কর্মরত রয়েছেন।"

পরিষদের বিষয় "কেশরী" ৩রা মে সংখ্যায় লিখেছিল যে "পরিষদের সভাপতি ডাঃ হেডগেওয়ারকে যুবকদের চেয়ে প্রৌঢ় ব্যক্তিদের মধ্যেই গণ্য করতে হয়। তথাপি তাঁকে সভাপতি করা হয়। তার অর্থ এই যে পরিষদ্ বয়সে নয়, মনের দিক থেকে ছিল তরুণদের। ডাক্তার হেডগেওয়ার নিজ কর্তৃত্বের দ্বারা মহারাষ্ট্রে এক বৃহৎ শক্তির নির্মাণ করেছেন। তিনি মহারাষ্ট্রের বাস্তবিক অর্থেই সেনাপতি।"

পরিষদ্ ইত্যাদি কার্যক্রমে উৎসাহের সৃষ্টি হয় ঠিকই, কিন্তু সেই উৎসাহকে স্থায়ী রূপ দেবার প্রয়াস সাধারণতঃ দেখা যায়না। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ডাক্তারজীর মত কুশল নেতার দক্ষতার কারণে 'হিন্দু যুবক পরিষদ্' হতে উৎপন্ন উৎসাহকে সঙ্ঘের রূপে স্থায়িত্ব প্রদানের চেষ্টা হয়। এর ফলে, অধিকারী শিক্ষণ বর্গের পরে সারা বছর মহারাষ্ট্রের চতুর্দিকে সঙ্ঘকার্যের অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উন্নতি হল। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার জন্য সভাপতির পদ গ্রহণের কল্পনা ডাক্তারজীর মনে স্বপ্নেও আসা সম্ভব ছিল না। ডাক্তারজী শুধু সেই কাজেই অংশগ্রহণ করতেন যার দ্বারা সঙ্ঘের স্থায়ী, মূলগামী, গঠনমূলক এবং সর্বাগ্রগণ্য কাজের প্রত্যক্ষ লাভ

হতে পারে। পরিষদের মাধ্যমে ডাক্তারজী এই উদ্দেশ্য উত্তমরূপে সিদ্ধ করেছিলেন। সঙ্ঘ, সঙ্ঘের প্রধান এবং তার দ্বারা উৎপন্ন মনোবৃত্তির প্রতি পরিষদে সমাগত সকলের মনেই ডাক্তারজীর ব্যক্তিত্বের কারণে শ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল, এবং জনমতের এই ভাবনা পরবর্তীকালে বিভিন্ন স্থানে সঙ্ঘকার্যের পক্ষে সহায়ক প্রমাণিত হয়েছিল। পরিষদের সাফল্য, প্রদেশে সঙ্ঘকার্যের সুস্থিতি তথা তার ভাবী প্রগতির সংকেত বহন করেছিল।

পুনার 'হিন্দু যুবক পরিষদ্' এর পরে নাগপুরে ফিরে আসার আগে ডাক্তারজী সাতারা জেলার ঔন্ধে গেলেন। সেখানকার নরেশ শ্রী বালাসাহেব পন্ত-প্রতিনিধি নাগপুরের শাখা পরিদর্শনের পর থেকেই ডাক্তারজীকে ঔন্ধে আসার এবং সেখানে সঙ্ঘের বীজ বপন করার অনুরোধ বহুদিন থেকে করে আসছিলেন। তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ডাক্তারজী এখন সেখানে গেলেন। রাজপ্রাসাদে তিনি দু-তিন দিন ছিলেন। একদিন রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন এক দেবী মন্দিরে ডাক্তারজী ও মহারাজ দুজনেই দর্শনের জন্য গেলেন। মহারাজের শিল্পীমনের তুলিকা দ্বারা সম্পূর্ণ মন্দির চিত্রিত ছিল। দেবী দর্শনের পরে দুজনেই এক-একটি চিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে ঐ পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক রেখাঙ্কনগুলি অবলোকন করছিলেন। কয়েকটি ছবি দেখে ডাক্তারজীর অত্যন্ত আনন্দ হল। সে কথা তিনি মাঝে-মাঝে ব্যক্তও করলেন।

ঘুরতে-ঘুরতে একটি ছবির সামনে তাঁরা থামলেন। ঐ ছবিতে রাজমাতা জিজাবাঈয়ের যে চিত্রণ করা হয়েছিল সেখানে প্রত্যক্ষ ভগবান শঙ্কর যেন তাঁর গর্ভ হতে অবতার রূপে জন্ম নিতে চলেছেন এরূপ কল্পনা করা হয়েছিল। ছবিটি দেখে ডাক্তারজী মহারাজের দিকে ঘুরে বললেন, "মহারাজ, এই অবতারের কল্পনা আমাদের সমাজের সর্বনাশ করেছে। নিজের অসামান্য প্রয়াস তথা অতুল পরাক্রম দ্বারা সমাজে যিনি নব চৈতন্য সৃষ্টি করেছিলেন, সেই ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের উপর এই দেবত্বের শীলমোহর কেন লাগাচ্ছেন?"

এ কথা শুনে মহারাজ কিছুক্ষণ বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "ডাক্তারজী, আপনি যে কথা বলছেন, তা ঠিক।"

মহান্ পুরুষদের দিকে দেখার এই রকম ছিল ডাক্তারজীর দৃষ্টিভঙ্গী। যেখানেই হোক না কেন, তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতেন।

২৬. কার্যবিস্তার

সারগাছি আশ্রম থেকে শোকাকুল শ্রী গুরুজী নাগপুরে ফিরে এলেন। এখানে শনৈঃ শনৈঃ পরম পূজনীয় ডাক্তারজীর সঙ্গে তাঁর অধিক সম্পর্ক হতে লাগল। ডাক্তারজীর স্নেহভরা আকর্ষক ব্যক্তিত্বের প্রভাবে শ্রীগুরুজী সঙ্ঘের দৈনন্দিন কাজের দিকে আরো বেশী মনোযোগ দিতে আরম্ভ করলেন। মাঝে-মাঝে রামটেক এবং তাঁর মামাজী অথবা বন্ধুদের কাছে চলে যেতেন। কিন্তু যেখানেই থাকুন, শাখার সঙ্গে তাঁর নিকট সম্পর্ক থাকছিল। শ্রীগুরুজীর মা-বাবা পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন যে তিনি ঘর-সংসারের ঝামেলায় নিজেকে জড়াবেন না। এর ফলে তাঁদের জীবনেও এক উদাসীনতার ছায়া বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু শ্রীগুরুজীর সঙ্গে ডাক্তারজীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হতে থাকায় এবং সঙ্ঘকার্যের জন্য কখনো স্বাধীনভাবে, আবার কখনো ডাক্তারজীর সঙ্গে প্রবাসে যেতে শুরু করলেন এবং তাঁর কর্তৃত্বের এক-একটি দিক যেমন-যেমন উন্মোচিত হতে থাকল, তাঁর মা-বাবার মনের উদাসীনতার ভাবও অপসৃত হতে থাকে। পরবর্তীকালে শ্রীগুরুজীর জীবন সম্পূর্ণরূপে সঙ্ঘকার্যে সমর্পিত হতে দেখে উভয়েই আনন্দলাভ করেছিলেন এবং পুত্রের এইরূপ উৎসর্গীকৃত জীবন তাঁদের প্রশংসারও বিষয়ে পরিণত হয়েছিল।

পুনার 'হিন্দু যুবক পরিষদে' যাওয়ার পূর্বে ১৯৩৮-এর মে মাসেই ডাক্তারজী নাগপুরের অধিকারী শিক্ষণ বর্গের দায়িত্ব শ্রী গুরুজীর উপর সঁপে দিয়েছিলেন। বর্গে আগত শত-শত স্বয়ংসেবকদের মনোভাব যাতে সঙ্ঘময় হয়ে ওঠে, তার জন্য চব্বিশ ঘন্টার কার্যক্রমগুলির মধ্যে অনুশাসন এবং সংবেদনা থাকা আবশ্যিক। এর জন্য বর্গের সর্বাধিকারীকে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতে হয়। এবং সেই সঙ্গে নিয়োজিত সকল কার্যক্রমকেই সংস্কারক্ষম তথা প্রভাবী করে তোলার জন্য কার্যকর্তাদেরও উৎসাহ-উদ্দীপনাকে সজীব রাখতে হয়। এই কুশলতা এবং কষ্টসাধ্য সকল কাজ গুরুজী কর্তৃক সুচারুরূপে সম্পাদিত হতে দেখে ডাক্তারজী অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করলেন।

অধিকারী শিক্ষণ বর্গে ডাক্তারজী উপস্থিত হওয়া মাত্রই, প্রচণ্ড শীতে আরামদায়ক আগুনের উত্তাপের মতই অত্যন্ত উৎসাহের সঞ্চার হত। ডাক্তারজীর নাগপুরে আসার আগে পর্যন্ত সেখানকার বর্গের সম্পূর্ণ দেখাশোনা শ্রীগুরুজীই করছিলেন। কিন্তু ডাক্তারজীর অনুপস্থিতি সব সময়ে তিনি অনুভব করতেন। আকোলার শ্রীবাপুজী সোহোনীকে ১লা মে লিখিত তাঁর চিঠিতে তিনি নিজের এই মনোভাব ব্যক্ত করে লিখেছিলেন, "...সরসঙ্ঘচালক ডাক্তার হেডগেওয়ার পুনা গেছেন। তাঁর সর্বদাই সুলভ ও আনন্দময় সাহচর্যের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করি।" শ্রী গুরুজী ডাক্তারজীর অভাব অনুভব করছিলেন। কিন্তু তাঁর

দ্বারা নাগপুর বর্গের কাজ অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালিত হতে দেখে ডাক্তারজীর অবশ্যই প্রতীতি জন্মাচ্ছিল যে শ্রী গুরুজী আগামী দিনে তাঁর অভাব নিঃসন্দেহে পূরণ করতে পারবেন।

পুনার অধিকারী শিক্ষণ বর্গে কিছুদিন থাকার পর ডাক্তারজী নাগপুরে এলেন। তাঁর পুনা যাওয়ার কিছু দিন পরেই কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু পুনায় এলেন। সুভাষবাবু কংগ্রেসে ছিলেন, তা সত্ত্বেও ডাক্তারজী তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজের প্রতি তাঁর মনে শ্রদ্ধা ছিল। সঙ্ঘের অনুশাসন, তরুণদের সংখ্যা, ডাক্তারজীর মত বিপ্লবী দেশভক্তের নেতৃত্ব তাঁর দৃষ্টিতে ছিল সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য। পুনায় আসার পর সেখানকার সঙ্ঘচালক সুভাষবাবুকে বর্গ পরিদর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। তিনি সানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, কিন্তু বর্গে আসতে পারেন নি। এ বিষয়ে পুনার সঙ্ঘচালক ডাক্তারজীকে চিঠিতে লেখেন, "কিন্তু মহারাষ্ট্র কংগ্রেস কমিটির সঙ্ঘ-বিরোধী নেতারা তাঁকে পরিষ্কার বলে দেন যে সঙ্ঘ ছাড়া অন্য যেখানে খুশি যান, কিন্তু সঙ্ঘে যাবেন না। সেই কারণে তিনি আসতে পারেন নি।" সেই চিঠি পড়ে ডাক্তারজীর দুঃখ হল, তবে তাঁর আশ্চর্য লাগেনি। কারণ তিনি জানতেন যে গত দুই-তিন বছর যাবৎ কংগ্রেসের লোকেরা সঙ্ঘ সম্বন্ধে কী রকম অসহিষ্ণু মনোভাব নিয়ে চলেছিল।

এই বছর জুলাই-আগষ্ট মাসে গুজরাট, বিহার এবং কর্ণাটক প্রদেশ থেকে সঙ্ঘকার্য বৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া গেল। শ্রী পদ্মরাজ জৈন সঙ্ঘ-প্রচারের কাজে অন্য সব কিছুই বুঝি ভুলে গিয়েছিলেন। ডাক্তারজী বিদর্ভের কার্যকর্তাদের নিকট আগ্রহ প্রকাশ করলেন যে তাঁরা যেন প্রতিবেশী অন্ধ্রপ্রদেশেও প্রবেশ করেন। ইতিমধ্যে অকোলা থেকে একটি পত্রে ডাক্তারজীকে জানানো হয় যে এ বছর গণেশোৎসবের সময় যুবকদের বক্তৃতার যোজনা করা হয়েছে। এই পত্রের ডাক্তারজী যে উত্তর দেন, তার থেকে বোঝা যায় যে সঙ্ঘকার্যের ছোট-ছোট বিষয়ের প্রতি তাঁর কতখানি নজর থাকত। তিনি লিখলেন, "আপনারা যে সব ব্যক্তির বক্তৃতার যোজনা করেছেন, তারা সবাই বয়সে খুব তরুণ। সর্বজনীন ক্ষেত্রে বক্তৃতা দেওয়ার নেশা যদি এই বয়সে পেয়ে বসে, সেটা ওদের পক্ষে ঠিক হবেনা। এ রকম হলে তাদের মনোবৃত্তির মধ্যে আমাদের দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটতে পারে। অতএব, এই কাজে প্রৌঢ়, অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন এবং পুরাতন ব্যক্তিদের সদ্ব্যবহার করা কাজের দৃষ্টি থেকে উপযুক্ত এবং সুফলদায়ী হবে।" অকারণে বেশী স্তুতি-প্রশংসায় সামগ্রিক জীবনে সুসঙ্গত স্বভাব বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ডাক্তারজী এই দিকেই সংকেত করেছিলেন।

প্রতি বছরের মত ওবছরও গরমের ছুটিতে নাগপুর ও পুনাতে অধিকারী শিক্ষণ শিবির হল অবশ্যই, কিন্তু পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে কাজের অগ্রগতির কথা চিন্তা করে লাহোরেও একটি বর্গের আয়োজন করা হল। এই বর্গে দেবতাস্বরূপ ভাই পরমানন্দ ভাষণ করার সময়ে মুক্তকণ্ঠে ডাক্তারজীর ত্যাগপূর্ণ জীবনের প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "মাননীয় ডাক্তার হেডগেওয়ারজী বিগত কয়েক বছর যাবৎ ঘরবাড়ীর কথা আদৌ চিন্তা না করে সঙ্ঘময় হয়ে গেছেন। তিনি চাঁদা গ্রহণ করেন না। তাঁকে কেউ জানে না পর্যন্ত, আর এসব কথাও লোকে জানেনা যে সি.পি.(মধ্যপ্রান্তে) সঙ্ঘের পঁয়ত্রিশ হাজার স্বয়ংসেবক আছে। ....

কোন সংস্থা শুধু কথা দিয়ে চলে না, আর না তো প্রস্তাব পাশ করে। যখন কোন পুরুষ সংগঠন করার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেয় এবং নিজের মত যথেষ্ট মানুষ তৈরী করে নেয়, তখনই সেই সংস্থা চলতে পারে।"

লাহোরের এই বর্গ আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় পর্যন্ত সেখানে যে শাখাগুলি শুরু করা হয়েছিল, সেখানের স্বয়ংসেবকেরা ডাক্তারজীর শুধু নামটুকু শুনেছিল। সেই কারণে ভাই পরমানন্দজী তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন যে "তাঁকে কেউ জানেনা পর্যন্ত।" পাঞ্জাবে সঙ্ঘের শাখা শুরু করার জন্য যে কার্যকর্তারা গিয়েছিলেন, তারা যাঁর অনুপ্রেরণায় গিয়েছিলেন, তিনি স্বয়ং পাঞ্জাবে আসুন এবং তাঁর মুখ থেকেই সঙ্ঘের চিন্তাধারা শোনার প্রবল ইচ্ছা সেখান থেকে আসা চিঠি-পত্রে ব্যক্ত হচ্ছিল। ডাক্তারজীরও এরূপ ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিকই ছিল যে পাঞ্জাবের মত উদ্দীপনাময় এবং হিন্দুত্বভাব-প্রধান প্রদেশের কাজ নিজে গিয়ে পরিদর্শন করি এবং কার্যকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের উৎসাহ বর্ধন করি। অতএব, ডাক্তারজী লাহোরের বর্গে যাওয়ার কার্যক্রম নিশ্চিত করে ১৫ই আগষ্ট নাগপুর থেকে রওনা হবেন বলে ঠিক করলেন। তাঁর সঙ্গে শ্রী বাবাসাহেব আপটে এবং শ্রীগুরুজীও গেলেন।

প্রথমে গোন্দিয়া হয়ে তাঁরা কাশীতে গেলেন। পথে গোন্দিয়া, জবলপুর, মোগলসরাই প্রভৃতি স্থানে স্বয়ংসেবকেরা স্টেশনে ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কাশীর স্বয়ংসেবকদের মনে এমন উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল যে তারা রাত সাড়ে নটার সময়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে মোগলসরাই স্টেশনে উপস্থিত হয়েছিল। এদের মধ্যে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ফুলদেব সহায় বর্মা, শ্রী কুলকর্ণী প্রমুখ অধ্যাপকরাও সম্মিলিত হয়েছিলেন। ১৭ই থেকে ২০শে আগষ্ট ডাক্তারজী কাশীতে ছিলেন। এই সময় কাশীর নগর শাখায় ডাক্তারজী স্বয়ং ভাষণ না করে শ্রীগুরুজীকে ভাষণ দিতে বলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈঠকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শঙ্কা-সমাধানের কার্যক্রম হল। বৈঠকে চর্চা হিন্দীতে হয়েছিল, সেই কারণে মাদ্রাজের দিকের কয়েকজন ছাত্র মনের মধ্যে জিজ্ঞাসা থাকা সত্ত্বেও তাতে অংশগ্রহণ করতে পারল না। তাদের মনের ইচ্ছার কথা জানার পর ডাক্তারজী আর একটি বৈঠকের আয়োজন করেন। এই বৈঠকে শ্রীগুরুজী ইংরাজীতে তাদের জিজ্ঞাসার অত্যন্ত সুন্দর সমাধান করেন। ডাক্তারজীর বৈঠক চলে তিন ঘণ্টা ধরে। বৈঠকের পরিবেশ এমনই আনন্দময় হয়ে উঠেছিল যে স্বয়ংসেবকেরা টেরই পায়নি যে এতখানি সময় কেমন করে কেটে গেছে। ডাক্তারজীর কাশীতে অবস্থানকালে স্বয়ংসেবকদের তাঁর কাছে আসা-যাওয়া অবিরাম চলত। মন খুলে আলোচনা করার এবং সংগঠনের তন্ত্র বুঝে নেবার এক সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। স্বয়ংসেবকেরা এই সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে।

এই তিন দিনের মধ্যেই গোকুলাষ্টমীর উৎসব এসে পড়ল। এই উপলক্ষ্যে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণোৎসবে শ্রী বাবাসাহেব আপটে এবং শ্রীগুরুজী উভয়ের ভাষণ হল। এই বিষয়ে নাগপুরে ফেরার পর কেন্দ্র শাখায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করার সময়ে শ্রী গুরুজী বলেন, "..... অপ্রত্যাশিতরূপেই আমাকে বলতে হল। সেখানকার

অধ্যক্ষ আমার দাড়ী ও জটা দেখে খুব খুশি হলেন এই ভেবে যে আমার বোধ হয় ধর্ম সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান আছে। আমি প্রায় পনের মিনিট বক্তৃতা দিই। আমার ভাষণে ভাব ছিল 'আমরা সব ব্রাহ্মণ নই, চণ্ডাল।' কারণ, আমাদের ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে তিন দিন ম্লেচ্ছদের গৃহে বাস করলে মানুষ চণ্ডাল হয়ে যায়। অতএব, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সকলের ক্ষত্রিয় ধর্মেরই পালন করা উচিত।" প্রবাসে শ্রীগুরুজীর ভাষণগুলি ডাক্তারজী অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনতেন। তাঁর আত্মবিশ্বাস দেখে ডাক্তারজীর খুবই আনন্দ হত। কিন্তু তরুণ স্বভাবের কারণে তাঁর শব্দগুলির তীক্ষ্ণতা তথা উষ্ণতাও ডাক্তারজীর দৃষ্টি এড়ায়নি।

কাশী থেকে দিল্লী হয়ে ডাক্তারজী লাহোরে গেলেন। পথে প্রয়াগ, কানপুর ইত্যাদি স্টেশনে স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে দেখা হয়। দিল্লীতে শুধু একদিন থেমে ছিলেন। সেখানকার শাখায় স্বয়ংসেবকদের জন্য ভাষণ হল। রাত্রে লাহোর রওনা হলেন। ২২শে আগষ্ট সকালে তাঁরা লাহোর পৌঁছলেন। অধিকারী শিক্ষণ বর্গে ২৩শে আগষ্ট ডাক্তারজীর প্রথম ভাষণ হল। পর দিন শ্রী গুরুজীর ভাষণ হল। চতুর্থ দিনে পুনরায় ডাক্তারজীর ভাষণ হবার কথা ছিল, কিন্তু অকস্মাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অতএব, সেই দিনও শ্রীগুরুজীর ভাষণ হল। ২৭শে আগষ্ট সামরিক পদ্ধতিতে ডাক্তারজীকে অভিবাদন জানানো হল। এই উপলক্ষে প্রদর্শনের যে কার্যক্রম হল, তা দেখে রাজা নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, "সঙ্ঘ কার্য খুব শীঘ্রই সারা প্রান্তে বিস্তৃত করতে হবে।" তিনি আরো দাবী করেন যে ভারত সরকার ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে 'মিলিটারি' ও 'নন-মিলিটারি' ট্রাইবের যে বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে, তা সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত। এই কথা আমাদের ব্যবহারের দ্বারা সরকারকে উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিতে হবে। ডাক্তারজীর স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় তিনি মাত্র আধ ঘন্টা ভাষণ দেন। কিন্তু তাঁর এই ছোট ভাষণও অত্যন্ত ওজস্বী এবং যুক্তিপূর্ণ ছিল। শ্রীগুরুজী তাঁর পত্রে লেখেন, "সঙ্ঘের এমন তর্কশুদ্ধ তথা সূত্রবদ্ধ, সর্বাঙ্গীণ বিশ্লেষণ কদাচিৎই শুনতে পাওয়া যায়। আর খানিকটা সময়ের প্রয়োজন ছিল। ভাষণ এমন মধুর ও আকর্ষক ছিল যে ইচ্ছা হচ্ছিল আরো আধ ঘন্টা বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ভাষণ চলতে থাকুক।" দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ভাষণের প্রতিলিপি ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের সময়ের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় নষ্ট হয়ে যায়।

এই কার্যক্রম থেকে ফেরার পর ডাক্তারজীর কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়। কিন্তু সেই অবস্থাতেও, ব্যথার কষ্ট সহ্য করে তিনি ডাঃ গোকুলচন্দ নারঙের গৃহে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন এবং তাঁকে নাগপুরের বিজয়া দশমী উৎসবে সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। ডাঃ নারঙ তাঁর প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন। ২৯ শে আগষ্ট ডাক্তারজী রাজা নরেন্দ্র নাথের গৃহেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন।

২৮শে আগষ্ট লাহোরের 'মহারাষ্ট্র মণ্ডলের' গণেশোৎসবে ডাক্তারজীর ভাষণের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু কোমরের ব্যথা সেদিন এত বেশী বেড়ে গেল যে তাঁর স্থানে ভাষণ দেবার জন্য শ্রীগুরুজীকেই পাঠাতে হল। শ্রীগুরুজী সেখানে 'ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক' এই বিষয় ভাষণ দেন। কার্যক্রমের শেষে 'মহারাষ্ট্র মণ্ডলের' কার্যবাহ ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন "আপনি যে বক্তাকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর ভাষণ

অত্যন্ত সুন্দর ও ওজস্বী হয়েছে।'' ডাক্তারজী হেসে জিজ্ঞেস করলেন, ''উনি ভাষণে কী বললেন?'' এই প্রশ্ন শুনে ঐ সজ্জন বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। তারপর একটু সাহস করে বললেন, ''ডাক্তারজী, একথা জিজ্ঞেস করবেন না যে উনি কী বললেন, কিন্তু একথা ঠিক যে উনি খুবই ভাল বলেছেন।'' এই উত্তর বহু দিন যাবৎ ডাক্তারজীর হাসির বিষয় হয়ে ছিল। তিনি স্বয়ংসেবকদের সব সময় বলতেন যে ভাষণ শুধু আনন্দের জন্য হয়না। খুব মন দিয়ে শুনে পরে সে বিষয়ে চিন্তা করতে হয়। এই কথা প্রমাণ করার জন্য তিনি উপরিউক্ত উদাহরণ দিতেন এবং সমবেত সকলেই প্রাণ খুলে হেসে উঠত।

২৯শে আগষ্ট রাত্রে ডাক্তারজী লাহোর থেকে বিদায় নিলেন। এই সময় একজন স্বয়ংসেবক ডাক্তারজীর গৌরবগান করে একটি কবিতা আবৃত্তি করে। ৩০শে আগষ্ট সকালে তাঁরা দিল্লী পৌঁছলেন। এই প্রবাসকালে তাঁর ব্যথা খুবই বেড়ে গিয়েছিল। দিল্লী থেকে তাঁর গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে যাবার কথা ছিল। গুজরাটে সঙ্ঘকার্য প্রায় দেড় বছর পূর্বে আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু তখন পর্যন্ত তিনি সেখানে যেতে পারেননি। সেই কারণে সেখানকার কার্যকর্তারা অনুরোধ করেছিলেন যে লাহোরের পরে তিনি বরোদা ও কর্ণাবতীর গণেশোৎসব কার্যক্রম উপলক্ষে আসুন। ডাক্তারজী তাঁদের কার্যক্রম স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এখন স্বাস্থ্য এত বেশী খারাপ হয়ে গেল যে তাঁর সেখানে যাওয়া অসম্ভব ছিল। এর ফলে, গুজরাটে তাঁর শারীরিক অক্ষমতার কারণে যেতে না পারার জন্য তিনি 'তার' পাঠিয়ে ক্ষমা চাইলেন এবং সেখানকার কার্যক্রমের জন্য শ্রীগুরুজীকে পাঠালেন। বোম্বাই, পুনা, সাংলী ইত্যাদি মহারাষ্ট্রের শাখাগুলির কার্যক্রমও স্থগিত করতে হল। ৩১শে আগষ্ট দিল্লী থেকে লেখা পত্রে শ্রীগুরুজী জানান, ''পূর্ব-নির্দিষ্ট কার্যক্রমগুলি স্থগিত করতে হল বলে পরম পূজনীয় ডাক্তারজী অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন, কিন্তু 'ঈশ্বরেচ্ছা বলীয়সী'। এখানে আসার পর থেকেই মালিশ, সেঁক ও ওষুধ নিয়মিত চলছে। সেই কারণে এখন কিছুটা সুস্থ বোধ করছেন। কিন্তু এখনো স্বাস্থ্য এতটা উন্নত হয়নি যে নির্দিষ্ট কার্যক্রমের ছুটোছুটি সহ্য করতে পারবেন। এবং দু-এক দিনের মধ্যে সেই অবস্থা আসবে বলেও মনে হয় না।'' রবিবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর ডাক্তারজী অসুস্থ অবস্থাতেই নাগপুরে ফিরে এলেন। এর পর বহুদিন তাঁকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়।

৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীগুরুজী নাগপুর শাখায় তাঁদের লাহোর যাত্রার বর্ণনা করেন। এই বিবরণ দেবার সময় শ্রীগুরুজী তাঁর অভিজ্ঞতা এবং ডাক্তারজীর প্রতি তীব্র ভক্তিভাবনার সঙ্গে যে আত্ম-বিশ্লেষণ করেন তার সার মর্ম উন্মুক্ত হৃদয়ে সকলের সামনে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ''এই সম্পূর্ণ প্রবাসে একটি বিষয় আমার মনে দৃঢ় ভাবে গেঁথে গেছে যে লোকসংগ্রহের জন্য মনের ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। অপরের মনকে চিনে নিয়ে একটি বাক্যেই সংক্ষেপে আমাদের তত্ত্ব বুঝিয়ে দেওয়া এবং ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তিদের বিরোধিতা সমাপ্ত করে দিয়ে তাদের সকলকে এক সূত্রে গাঁথার কলা ডাক্তারজী খুব ভালভাবে জানেন। আমাদের অন্য সকলের মধ্যে সেই গুণ দেখা যায়না। এই কারণে আমাদের সকলকে পরমপূজনীয় সরসঙ্ঘচালকের আদর্শ সব সময়ে আমাদের সম্মুখে রাখতে হবে।''

ডাক্তারজীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু তাঁর দেহের স্থূলতা এবং প্রত্যেক পরিস্থিতিতে হাসিখুশি স্বভাবের কারণে তাঁর সঙ্গে যাঁরা থাকতেন তাঁরাও তাঁর গভীর অসুস্থতার কথা উপলব্ধি করতে পারতেন না। যাঁরা বুঝতে পারতেন, তাঁদের এমন সাহস হতনা যে ডাক্তারজীকে বিশ্রাম করার আগ্রহ করেন। অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও সঙ্ঘকার্যের জন্য ডাক্তারজী যত পরিশ্রম করতেন তা এত বেশী পরিমাণে হত, যা দেখে অন্যদের লজ্জা বোধ হত। কয়েক জন ডাক্তারজীর সঙ্গে পুরানো ও স্নেহপূর্ণ সম্পর্কের কারণে তাঁর সামনে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম গ্রহণের প্রস্তাব রাখার সাহস করলেও, ডাক্তারজী মুচকি হেসে তাঁদের কথা এড়িয়ে যেতেন।

সঙ্ঘকার্যের অগ্রগতি হচ্ছিল। সেই সঙ্গে প্রশংসক ও বিরোধীদের সংখ্যারও বৃদ্ধি ঘটছিল। স্তুতি ও নিন্দা, অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা সকল প্রকার সংবাদই প্রতিদিন কেন্দ্রে এসে পৌঁছচ্ছিল। ১৯৩৮-এর অক্টোবরে সংবাদ পাওয়া গেল যে কোল্হাপুরের মহারাজা প্রসন্ন হয়ে সেখানকার 'রাজারাম স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে' পাঁচ শত টাকা দান করেছেন। এর কিছু পূর্বেই এই সংবাদও প্রকাশিত হয়েছিল যে নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের আদেশ দেয় যে তারা যেন সঙ্ঘের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করে এবং উৎসবে সভাপতি হিসাবেও না যান। ডাক্তারজী স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে সহজভাবে সকল পরিস্থিতিতে সঙ্ঘকার্য বৃদ্ধির চিন্তা এবং তার উপায়-যোজনাতেই নিমগ্ন থাকতেন। এ বিষয়ে তিনি লেখেন, ".....একদিকে যখন সঙ্ঘকার্যের উপর এইরূপ প্রশংসার পুষ্প-বর্ষণ চলছিল, তখন অন্যদিকে ঐ কার্যের বিরোধিতাও করা হচ্ছিল। কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আজ পর্যন্ত এই অভিজ্ঞতাই হয়েছে যে সব সৎকাজেই এইসব জিনিষ চলে। কিন্তু এটা সন্তোষজনক যে এই সময় জনসাধারণ এটাও দেখতে পাচ্ছে যে স্বয়ংসেবকদের নিষ্ঠার শক্তির উপর নির্ভর করে সঙ্ঘকার্য কোনরকম বিরোধিতার কথা চিন্তা না করে নিরন্তর উত্তরোত্তর প্রগতি করে চলেছে।"

এই সন্তোষের কারণেই তিনি নিজের অসুস্থতার কথা বিস্মৃত হয়ে কর্মব্যস্ত ছিলেন। তাঁর ব্যথার সংবাদ যখন জানাজানি হল তখন অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে বিশদ জানার জন্য পত্র লেখেন। এ বিষয়ে ডাক্তারজী বোম্বাই-এর শ্রী দাদা নাইককে যে উত্তর দেন, সেটা তাঁর সেই সময়কার মনঃস্থিতিকে পূর্ণ মাত্রায় প্রতিফলিত করে। তিনি লেখেন, "এ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নিতে পারতাম, কিন্তু সঙ্ঘকার্যে লিপ্ত মানুষের পক্ষে আরাম লাভ করা কঠিন। আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তা করার মত কিছুই নেই, এ কথা জেনে নিশ্চিন্ত থাকুন।" এই প্রকার মূর্তিমান কর্মযোগই সম্পূর্ণ সঙ্ঘের কথা চিন্তা করছিল।

ইতিমধ্যে হায়দরাবাদ (দক্ষিণ)-এ সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে গিয়েছিল। নিজামের হিন্দু-বিরোধী এবং নির্যাতনের নীতির কারণে তার রাজ্যে হিন্দুদের স্বাভিমান ও শান্তিপূর্বক জীবনযাপন অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। অতএব, 'ভাগানগর' নিঃশস্ত্র প্রতিকার মণ্ডল-এর প্রতিষ্ঠা করা হল এবং অক্টোবর, ১৯৩৮-এ নিজামের এই নীতিসমূহের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ সংগ্রামের ভেরী বেজে উঠল। এই আন্দোলনে স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা এবং আর্য

সমাজ উভয়ই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নিজামের রাজ্য বিদর্ভ এবং মহারাষ্ট্র উভয় অঞ্চলের সংলগ্ন ছিল এবং মহারাষ্ট্রের অধিবাসীদের মনে নিজামের বিরুদ্ধে পেশোয়াদের সময় থেকেই প্রচণ্ড ক্ষোভ জমা হয়েছিল। সেই কারণেই সত্যাগ্রহের জন্য এখানকার তরুণদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও আকর্ষণ ছিল। তার ওপর বিগত পাঁচ-সাত বছরে এই সম্পূর্ণ ক্ষেত্রে সঙ্ঘকার্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল। সঙ্ঘ তরুণদের মনে হিন্দু সমাজের প্রতি একান্ত প্রেম ও কর্তব্য-নিষ্ঠা জাগিয়ে তুলেছিল। স্বাভাবিক ভাবেই এই মনোভাব এই ধরনের আন্দোলনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হয়ে দাঁড়াল।

আন্দোলন আরম্ভ হবার পরে যে সমস্ত স্বয়ংসেবক এবং কার্যকর্তা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাতে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলেন, ডাক্তারজী সানন্দে তা প্রদান করলেন। কিন্তু যাঁদের উপর কোন বিশিষ্ট ক্ষেত্রের সঙ্ঘ কার্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল, তাঁদের তিনি নির্দিষ্টভাবে আন্দোলনের বাইরে থাকতে বললেন। মহারাষ্ট্র প্রান্তের সঙ্ঘচালকের পত্রের উত্তরে তিনি একটি মাত্র বাক্যে এই বিষয়ে সঙ্ঘের নীতি ব্যক্ত করেছিলেন। সেটা ছিল — "সত্যাগ্রহে যারা অংশগ্রহণ করতে চায়, তারা ব্যক্তিগতভাবে তা করতে পারে।" সঙ্ঘের সূচনা থেকেই ডাক্তারজী প্রত্যেক রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে এই সুসঙ্গত নীতিই পালন করেছিলেন যে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা যেমন সঙ্ঘের সদস্য, তেমনই তারা হিন্দু সমাজেরও সজাগ এবং কর্তব্য-পরায়ণ নাগরিক। অতএব, তাদের এই ভূমিকা নিয়েই রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যক্তিগতভাবে যোগদান করা উচিত। ১৯৩০-৩১ সালের জঙ্গল-সত্যাগ্রহের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার পূর্বে এই নীতি অনুসারে ডাক্তারজী সরসঙ্ঘচালক পদের দায়িত্ব ডাঃ পরাঞ্জপের উপর অর্পণ করেছিলেন, এবং তাঁর সহকর্মীদের দ্বারাও অনুরূপ নীতির পালন করিয়েছিলেন। একদিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের তাৎকালিক, নৈমিত্তিক এবং সংঘর্ষময় স্বরূপ ছিল, আর অন্য দিকে ছিল সঙ্ঘের নিত্য, অখণ্ড এবং গঠনমূলক কাজ। দুটির পার্থক্যের বিষয়টি উত্তমরূপে মনে রেখে আন্দোলন সমূহের সাফল্যের সঙ্গে-সঙ্গে সঙ্ঘের চিরন্তন কার্যও অবাধরূপে চলতে থাকুক — এই উদ্দেশ্য নিয়েই ডাক্তারজী দূরদর্শিতা তথা বিবেচনাপূর্বক এই নীতি নির্ধারিত করেছিলেন। তাৎকালিক ভাবপ্রবণতার কারণে কিছু লোকের অপ্রসন্নতা সহ্য করেও ডাক্তারজী এই নীতি পুরোপুরি পালন করেন।

যদিও স্বয়ংসেবকদের সঙ্ঘ হিসাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণের অনুমতি ছিল না, তথাপি ডাক্তারজীর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে নাগরিক হিসাবে স্বয়ংসেবকরা যথেষ্ট সংখ্যায় তাতে অংশগ্রহণ করবে। ১৯৩৮ সালে ডাক্তারজী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সূত্রধার শ্রী গজাননরাও কেতকরকে এক পত্রে আন্দোলনে মনোযোগ দেবার বিষয় লিখেছিলেন। ঐ পত্রে তিনি লেখেন, "......উপরিউক্ত কার্য (সত্যাগ্রহ) সম্বন্ধে যা করা সম্ভব, আমি করছি। সত্যাগ্রহের ব্যাপারে কোন রকম অবহেলা হবেনা।" এই সময়ে ডাক্তারজী যখন পুনায় এলেন তখন শ্রী শঃ রাঃ অর্থাৎ শ্রী মামা দাতে এবং সাতারার শ্রী ভাউরাও মোডক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উক্ত সাক্ষাৎকার সম্পর্কে শ্রী মামা দাতে লেখেন, "....আমাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে তিনি বিশ্বাসপূর্বক বলেন, 'পাঁচশো লোককে সত্যাগ্রহে পাঠাতে হবে, এটুকুই

তো ? এ বিষয় আপনারা চিন্তা করবেন না। বাকি ব্যাপার আপনারা দেখে নেবেন।' যে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি এই কথা বলেন এবং যে আন্তরিকতা ব্যক্ত করেন, আজ পর্যন্ত আমার তা স্মরণে আছে।''

শুধু পাঁচ শো নয়, তার তিনগুণ বা চারগুণ সংখ্যক স্বয়ংসেবকেরা সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনকেও ডাক্তারজী অথবা সঙ্ঘের কোন অধিকারী ''তুই যা'' এরকম আদেশ দেননি। যাদের নিজ হৃদয়ের জ্বলন্ত হিন্দুত্বের জ্যোতির নিকট হতে আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল, তারাই গিয়েছিল। কিন্তু আমরা এ কথা ভুলতে পারিনা যে সেই জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল সঙ্ঘের সংস্কারেরই পরিণাম স্বরূপ।

ডাক্তারজীর খুড়তুতো ভাই শ্রী বামন হেডগেওয়ার একদিন সত্যাগ্রহে চলে গেল। সেই সময়ে সে স্কুলের এক দুরন্ত ছাত্র ছিল শুধু। কিছুদিন পরে সে নিজামের কারাগার থেকে ডাক্তারজীকে এক পত্রে লেখে, ''অনুমতি না নিয়েই আমি সত্যাগ্রহে অংশ নিয়েছি, এরজন্য ক্ষমা করবেন।'' তার উত্তরে ডাক্তারজী লেখেন, ''আমি তোমার জায়গায় থাকলে তাই করতাম যা তুমি করেছ। অতএব, সংকোচ না করে দণ্ডের মেয়াদ পূর্ণ হবার পর বাড়ী চলে যেও।'' শ্রী ভাইয়াজী দাণী, যিনি পরবর্তীকালে সঙ্ঘের সরকার্যবাহ হয়েছিলেন, সত্যাগ্রহে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ডাক্তারজীকে জানালেন। নাগপুরে তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনার কার্যক্রমে ডাক্তারজী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, এবং পরিশেষে যখন শ্রীভাইয়াজী তাঁকে প্রণাম করলেন, তখন তিনি বললেন, ''তোমার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল - 'যাব কি?' এখন নিজের প্রেরণায় যাচ্ছ, তখন অবশ্য যাও। আমি তোমাকে আশীর্বাদ দিচ্ছি।'' অত্যন্ত স্নেহপূর্বক অনুশাসনের কথা স্মরণ করিয়েও তিনি ভুলেও কখনো কারো উৎসাহে জল ঢেলে দেননি। তাঁর কোন ব্যাপারেই 'অতি' থাকত না। তাঁর আচরণে সর্বদা লোক-সংগ্রহের মর্যাদাই সূচিত হত।

সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে ডাক্তারজীর এই নীতি সঙ্ঘের বাইরের কতিপয় তথাকথিত হিন্দুত্ববাদী সজ্জনদের পছন্দ হয়নি। অতএব, তারা ডাক্তারজী তথা সঙ্ঘের সমালোচনা করে কুৎসিত ভাষায় লেখা প্রবন্ধ কোন-কোন স্থানে প্রকাশ করে। কিন্তু তার ফলে ডাক্তারজীর শান্তি লেশমাত্র বিঘ্নিত হয়নি।

আন্দোলনের এই আবহাওয়ার মধ্যেও ডাক্তারজীর ভগ্ন স্বাস্থ্যের অবস্থার এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। তখনকার এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন, ''কোমরের ব্যথা পিঠের পুরানো ব্যথার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিয়েছে।'' নাগপুরের বিজয়াদশমী মহোৎসবের জন্য পাঞ্জাব থেকে ডাঃ গোকুলচন্দ নারং সভাপতি হিসাবে আসছিলেন। সেই কারণে ডাক্তারজী কার্যক্রমের জন্য অত্যধিক পরিশ্রম করলেন। যে কোন কার্যক্রম সফল করার জন্য নিজেকে কতখানি ভুলে যেতে হয়, তার প্রমাণ ডাক্তারজীর তখনকার প্রয়াস থেকে পাওয়া যায়। তিনি নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে উৎসবের প্রস্তুতিতে সংলগ্ন ছিলেন। বিজয়াদশমীর দিন নাগপুরে তিন হাজার গণবেশধারী স্বয়ংসেবক সঞ্চলনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে স্বয়ং ডাক্তারজী নিজেও সম্মিলিত হয়ে ছিলেন। ডাঃ নারঙের ব্যবস্থার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপারের প্রতিও

ডাক্তারজীর পুরোপুরি মনোযোগ ছিল। তাঁর শুধু এই কথাই মনে হচ্ছিল যে সঙ্ঘকার্যের এই মহত্ত্ব এবং অত্যধিক আবশ্যকতার প্রতি কীভাবে সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা যায়। অন্য সমস্ত সহকর্মীরাও চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু নিঃসন্দেহে তাঁর মনে হচ্ছিল যে এই সব প্রচেষ্টার দ্বারা কালের উপর জয়লাভ করা দূরের কথা, তিনি তার সঙ্গও দিতে পারবেন না। তাঁর মনের এই উদ্বেগ মাঝে-মাঝে শব্দরূপে ব্যক্ত হত। বিজয়া দশমী উৎসব সম্বন্ধে পুনার সঙ্ঘচালককে লেখা পত্রে তিনি বলেন, ''বিজয়াদশমী মহোৎসবে অংশগ্রহণ করার মত আমার স্বাস্থ্য ঠিক ছিলনা। তা সত্ত্বেও তিন দিন পর্যন্ত নিজেকে অসুস্থ না মনে করে সাধারণ মানুষের মত উৎসাহের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সীমোল্লঙ্ঘনের শোভাযাত্রায় আমি গণবেশে ছিলাম। এই সব পরিশ্রম আবশ্যক ছিল বলে আমি করলাম, কিন্তু তার পরিণাম স্বাস্থ্যের উপর না হয়ে থাকেনি।''

ইতিমধ্যে ডাক্তারজীর পরিবারে দারিদ্র্যের সঙ্গে একটি নতুন চিন্তার কারণ উপস্থিত হল। তাঁর ভাগ্নে শ্রী দিনকর সদাশিব পট্টলওয়ার বেশ কয়েক বছর যাবৎ কলেজের শিক্ষার জন্য তাঁর বাড়ীতেই বসবাস করছিল। সে হঠাৎ একেবারে পাগল হয়ে গেল, যার ফলে বাড়ীতে ভীষণ উপদ্রব শুরু হল। ডাক্তারজী আশা করছিলেন সে আর এক বছরের মধ্যে স্নাতক হয়ে কোন কাজে লেগে যাবে এবং তাকে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দেবার তাঁর কর্তব্য সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু এই ঘটনায় তাঁর আশার উপর বজ্রাঘাত হেনে দিল। ডাক্তারজীর বাড়ী সব সময় সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের দ্বারা ভর্তি হয়ে থাকত। ঐ সময়ে তাঁর ভাগ্নে পাগলামির উন্মত্ততায় এমন কিছু করে বসত, যা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়ে উঠত। রোগজীর্ণ দেহ এমনিতেই দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে পড়ছিল, তার উপর এই মানসিক যন্ত্রণার আরো ক্ষতিকর পরিণাম হল এবং তাঁর মত সংযমী তথা সহনশীল মানুষের মেজাজও কখনো-কখনো খিট্‌খিটে হতে দেখা যেত।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভাগানগর সত্যাগ্রহের কয়েক জন পরিচালক যে পত্রক প্রকাশ করলেন, তাতে লেখা হয় যে ''সঙ্ঘ ভাগানগর আন্দোলনে সঙ্ঘ হিসাবেই অংশগ্রহণ করে।'' এই বক্তব্য অসত্য তথা বিভ্রান্তিকর ছিল। এই সজ্জনরা আসলে এইভাবে সঙ্ঘকে রাজনীতির মধ্যে টেনে নামাতে চাইছিলেন। অতএব, ডাক্তারজী তাঁদের একটি পত্র লিখে পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে ''রাঃ স্বঃ সঙ্ঘের বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার মত সংবাদ আপনাদের পত্রকে প্রকাশ করা আপনাদের কাজের দৃষ্টিতে কখনই কল্যাণকর হবেনা। অতএব, আপনাদের প্রকাশন বিভাগকে অবিলম্বে কড়া নির্দেশ দিন যে এর পরে যেন রাঃ স্বঃ সঙ্ঘের উল্লেখ আপনাদের পত্রকে না করা হয়।''

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ডাক্তারজীর এক সময়ের স্নেহভাজন শ্রী বালাজী হুদ্দার স্পেনের গৃহযুদ্ধ থেকে মুক্তিলাভ করে বহু বছর পরে নাগপুরে এসেছিলেন। জেনারেল ফ্রাংকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক হয়ে তিনি ইংল্যাণ্ড থেকে স্পেনে গিয়েছিলেন। সেখানে যুদ্ধ করার সময় ফ্রাংকোর বন্দীরূপে তিনি কারাগারেও ছিলেন। ইংল্যাণ্ডে তিনি সাংবাদিকতার শিক্ষাগ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। তাঁকে সেখানে প্রেরণ

এবং সবরকম ব্যবস্থা করার ব্যাপারে ডাক্তারজী সাহায্য করেছিলেন। এক সময়ে উৎসাহের সঙ্গে যিনি সঙ্ঘের কাজ করছিলেন, এমন বুদ্ধিমান্ এবং তরুণ কার্যকর্তা চারটি স্বাধীন দেশের জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করে ফিরছেন, এটা ডাক্তারজীর পক্ষে অত্যন্ত আশাপ্রদ ঘটনা ছিল। শ্রী হুদ্দারের নিকট ব্যক্তিত্ব ও বক্তৃত্ব উভয় জিনিষই ছিল। অতএব, একজন উপযুক্ত কার্যকর্তার ফিরে আসায় স্বভাবতঃ ডাক্তারজীর নিকট আনন্দের ব্যাপার ছিল। ২৪শে ডিসেম্বর যখন তিনি নাগপুরে এলেন তখন ডাক্তারজী স্বয়ং স্টেশনে তাঁকে স্বাগত জানাতে এলেন। তারপরে অনেক বার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। ডাক্তারজী জানতে পারলেন যে বিদেশে যাবার পর তাঁর চিন্তাধারায় পরিবর্তন ঘটে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডাক্তারজীর ব্যবহারে লেশমাত্র পার্থক্য দেখা গেল না। যখন শ্রী হুদ্দারের সঙ্গে ডাক্তারজী সম্পর্কে পরবর্তীকালে আলোচনা হয়, তখন অত্যন্ত আবেগ-মথিত কণ্ঠে তিনি বলেন, "সত্যিকার বন্ধুত্বই ডাক্তারজীর সাফল্যের রহস্য ছিল! তিনি যে কোন স্তরের ও বয়সের ব্যক্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন। সব সময়ে বন্ধুত্ব বজায় রাখা ডাক্তারজীর স্বভাবের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। ডাক্তারজী এমন ছিলেন যে তাঁর সঙ্গে চিন্তার মতভেদ থাকলেও আমার মনে কখনো একথার উদয় হয়নি যে সদ্ভাবের সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হোক।"

ডাক্তারজী শ্রীহুদ্দারকে ১৯৩৮ সালে নাগপুর জেলার শীত শিবিরে স্বয়ংসেবকদের সম্মুখে তাঁর বিদেশ-যাত্রার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তিনি ঐসব দেশের কিষান ও শ্রমিকদের সংগঠন এবং জন-জাগৃতির বিষয়ে অনেক কথা বলেন। এ বিষয় পরে আলোচনা-প্রসঙ্গে ডাক্তারজী বলেন, "কিষান ও শ্রমিকদের উন্নতির কথা চিন্তা করা ঠিকই। কিন্তু ধনী ও শ্রমিকদের পারস্পরিক সংঘর্ষের ভাষা আমাদের চাইনা।"

দেশব্যাপী সংগঠন গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণ করে দেশকালের পরিস্থিতি এবং সমাজের মানসিক গঠনের বিবেচনা করে ডাক্তারজী কয়েকটি মর্যাদা পালন করার সিদ্ধান্ত নিজের মনে গ্রহণ করেছিলেন। এই সময়ের কতকগুলি পত্রে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। পরাধীন দেশে শরীর, মন এবং অর্থের দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে যে সমাজ, সেখানে প্রচণ্ড শক্তিশালী কাজ গড়ে তুলতে হলে নেতৃত্বের হাতে জলের মত পয়সা ঢালার যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। কিন্তু ডাক্তারজীর নিজেরই দুবেলো পেট ভরে খাবার জোগাড় করার সমস্যা ছিল, হাত খুলে পয়সা খরচ করার কথাও তাঁর কাছে বলা সম্ভব ছিলনা। সঙ্ঘের কিছু হিতাকাঙ্ক্ষী এই অভাব দেখে বড় কষ্ট পেতেন। এই কারণে কয়েকজন ভাবলেন যে অর্থ উপার্জনের জন্য একটা লটারী করা যেতে পারে। এই যোজনায় ডাক্তারজীর বন্ধু শ্রীবাবারাও সাভারকরেরও সমর্থন ছিল। ডাক্তারজীর নিকট এই ধরণের লটারীর পত্রকে স্বাক্ষর করার জন্য চিঠি এল। তার উত্তরে তিনি লিখলেন, "পূজ্য বাবারাও (সাভারকর)-এর পত্র পেয়েছি, তাঁকে জানিয়ে দেবেন। পূর্ণ বিবেচনা করার পর আমার অভিমত পূর্বের মতই স্থির আছে। লটারীর পত্রকে আমি স্বাক্ষর করতে পারছিনা।" সাদা-সিধা সমাজ এমনিতেই প্রায় উদ্যম-হীন হয়ে থাকে। এবং সেখানে কোন কষ্ট না করে লটারী ও জুয়ার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের লোভ জাগিয়ে দিলে সমাজের মন থেকে প্রয়াস ও পুরুষার্থের ভাবনা লোপ পেয়ে যাবে,

এর ফলে সমাজ আরো বেশী পঙ্গু ও পরাশ্রয়ী হয়ে পড়বে। লটারীর সংস্থা টাকা পেয়ে যাবে, কিন্তু যাদের জন্য সংস্থা তৈরী করা হয়েছে তারা দুর্বল হয়ে পড়বে। অতএব, মানুষের হৃদয়ের বিশুদ্ধ দেশভক্তি এবং সমাজের প্রতি বাস্তবিক আত্মীয়তার কারণে যে অর্থ পাওয়া যাবে, তুলনায় কম হলেও তা পরিণামে সমাজ তথা সংগঠনের পক্ষে অধিক লাভজনক বলে প্রমাণিত হবে। একথা ডাক্তারজী ভালভাবে জানতেন, এই কারণে তিনি আপদ্ধর্ম রূপেও সমাজের কণ্ঠে জুয়াড়ী বৃত্তির নতুন ফাঁসির দড়ি লাগানোর ব্যাপারে স্পষ্ট 'না' বলে দিয়েছিলেন। অর্থের মোহ এমনই অন্ধ হয় যে সেই সময়কার কয়েকটি রাজনৈতিক সংস্থা তাদের সঞ্চিত অর্থ নিজেরা খরচ না করে ইংরেজ সরকারের বণ্ডে জমা করে রেখেছিল। এর থেকে বড় পরিহাস আর কী হতে পারে?

একই ধরনের আর একটি ঘটনা — নভেম্বরের শেষ দিকে মহারাষ্ট্রের জনৈক ব্যাখ্যাতা আচার্য শ্রীরাম গোসাঁবীর এক পত্র এল। তিনি চেয়েছিলেন যে সঙ্ঘে তিনি যে সব ভাষণ দিয়েছেন তাঁর একটি সংকলন সঙ্ঘের নামে মুদ্রিত হোক এবং ডাক্তারজী তার প্রস্তাবনা লিখে দিন। এই পত্রের উত্তরে তিনি লেখেন, "আজ পর্যন্ত অনুসৃত নীতি অনুসারে আপনার পুস্তককে সঙ্ঘের নামে করা সম্ভব নয়। এইভাবে আজ পর্যন্ত আমি যে নীতি অনুসরণ করে চলেছি তদনুযায়ী আপনার পুস্তকের প্রস্তাবনা লেখার কাজও আমি স্বীকার করতে পারছিনা।"

ডাক্তারজী বিভিন্ন কার্যকর্তাদের নিকট যে সব পত্র লিখেছেন, তা ছাড়া অন্য কিছু আলাদা করে লিখে যাননি। স্বাতন্ত্র্য দৈনিকের পরিচালনা ও সম্পাদনা করেছিলেন ডাক্তারজী। অতএব, প্রবন্ধাদি লেখার গুরুত্ব যে ন্যূনাধিক তিনি জানতেন না, তা নয়। কিন্তু মানুষের মানসপটে লেখার কলা তাঁর আয়ত্বে ছিল, যার সদ্ব্যবহার করে শত-সহস্র তরুণদের সহজেই ধ্যেয়নিষ্ঠ করা সম্ভব — এই আত্মবিশ্বাস নিজ হৃদয়ে ধারণ করে তিনি লেখনীর ব্যবহার খুব কম করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি কখনো-কখনো বলতেন, "সাদাকে কালো না করে আমার ইচ্ছা হিন্দুদের অভেদ্য তথা অজেয় সংগঠন গড়ে তুলব।" প্রত্যক্ষ জীবন এবং চরিত্রের ছাপ ব্যবহারের দ্বারাই তরুণদের মনের উপর মুদ্রিত করে তার মধ্য থেকেই অনুশাসনপূর্ণ লোকসংগ্রহ করা যেতে পারে। ডাক্তারজীর এই নিদান এবং আত্মবিশ্বাস কত যথার্থ ছিল তার প্রমাণ আজ প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও সঙ্ঘকার্যের সাফল্য নিঃসন্দেহে এই আত্মবিশ্বাসের উপরেই নির্ভরশীল। এটা সকলেই চায় যে দেশের সম্মুখে সমুপস্থিত অসংখ্য বিপত্তির উপর যারা জয়লাভ করতে পারবে, এরকম নিষ্ঠাবান্ তথা পরাক্রমী তরুণদের প্রচণ্ড সামর্থ্যের নির্মাণ হোক। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে এই সামর্থ্য নির্মাণ করার ক্ষমতা ডাক্তারজীর প্রতিভা হতে উৎপন্ন কার্যপদ্ধতির মধ্যেই আছে। ডাক্তারজী যে সংগঠন গড়ে তোলেন তার দর্শনের দ্বারা সঙ্ঘের বাল্যাবস্থাতেই ভালো-ভালো লোকের মনেও কীরূপ সরস কল্পনার উদ্ভব হত, তা দেখার মত। একবার মহাসভার অধিবেশনে ডাক্তারজী তথা সঙ্ঘের উল্লেখ করে ডাঃ মুঞ্জে বলেছিলেন, "ডাক্তার হেডগেওয়ারের রাঃ স্বঃ সঙ্ঘের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নাগপুরে এমন দৃষ্টান্তমূলক সংগঠনের নির্মাণ করেছেন যে তাঁর একটি আহ্বানে মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে তিন হাজার যুবক ছুটে আসতে পারে। ....ডাক্তারজী

কর্তৃক নির্মিত এই যুবক-সঙ্ঘের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আমার মনে উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হয়।" ১৯৩৮-এর ডিসেম্বরে নাগপুরে স্বয়ংসেবক শিবিরের উদ্বোধন করতে স্বাতন্ত্র্যবীর ব্যাঃ সাভারকর এসেছিলেন। সেখানকার দৃশ্য দেখে তিনি উদ্দীপিত হয়ে এই উক্তি করেন, "এই প্রকার একাত্মতায় উদ্বুদ্ধ তরুণদের হাতে শস্ত্র থাকা আবশ্যক। আমার বিশ্বাস, সঙ্ঘকার্য দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিলাভ করবে এবং দুই বছরের মধ্যেই তা এমন সামর্থ্যশালী হয়ে উঠবে যে তাদের শক্তিবলে নাগপুর সব বাধা-বিপত্তিকে সরিয়ে দিয়ে অপ্রতিরোধ্য হয়ে এগিয়ে যেতে পারবে।"

কিন্তু এই দৃশ্য কেমন করে তৈরী করা সম্ভব হল? তার উত্তর ডাক্তারজীর ঐ ডিসেম্বর মাসের একটি পত্রে সহজেই পাওয়া যায়। তিনি লেখেন, "পুনায় সঙ্ঘের জেলা অধিকারীদের যে বৈঠক হবার কথা, আমার স্বাস্থ্য প্রবাসের উপযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও তাতে আমি যাব স্থির করেছি।" এইরূপ কঠোর সিদ্ধান্তের শক্তিতেই সঙ্ঘকার্য বৃদ্ধিলাভ করছিল।

২৭. দৃঢ়ীকরণ

বিশ্ব রাজনীতিতে দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটছিল। পরাধীন রাষ্ট্রগুলির তাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের উপযুক্ত সুযোগ নিকটবর্তী হচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল যে শক্তিশালী জার্মনীর আক্রামক নীতি এবং তাকে প্রতিহত করার জন্য ইংল্যাণ্ডের সন্তুষ্টিকরণের প্রচেষ্টার কারণে বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠছিল। পরম পূজনীয় ডাক্তারজীর সব প্রচেষ্টারই লক্ষ্য ছিল 'এই দেহে এবং এই চোখ দিয়েই' স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্রের বৈভবপূর্ণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার অতি মহৎ ও পবিত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আসন্ন পরিস্থিতির বাস্তবিকতা উপলব্ধি করার মত দূরদর্শিতা থাকার ফলে অদূর ভবিষ্যৎ তাঁর নিকট আশার সন্দেশবাহক প্রতীত হওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার ছিলনা। কিন্তু, মনে হয়, ১৯৩৯ সালের প্রথম দিক থেকেই একটি ব্যথা তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল যে একদিকে পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করার মত শক্তি দেশের নেই, এবং অপর দিকে তাঁর নিজের দুর্বল শরীরেও প্রয়োজনীয় দৌড়াদৌড়ি ও পরিশ্রম করার ক্ষমতা অবশিষ্ট ছিলনা। পরিস্থিতির অনুকূলতা এবং উপযুক্ত সুযোগে আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে উঠে দাঁড়াবার যোগ্যতার সংযোগই স্বর্ণসন্ধি বলে অভিহিত হয়। এর মধ্যে প্রথমটি সম্মুখে দৃশ্যমান ছিল, কিন্তু দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছিল না। বিদর্ভ, মধ্য প্রান্ত, মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাব প্রান্তগুলিতে শাখাগুলি কিছুটা সুস্থিতি লাভ করলেও অন্যান্য প্রান্তে কোথাও শুধু নামমাত্র কাজ ছিল, এবং অন্যত্র তাও ছিল না। নিজের কাজের এই অসহায় অবস্থা দেখে ডাক্তারজী অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর শিরায়-শিরায় কর্তব্যনিষ্ঠা তথা কর্মযোগ পরিব্যাপ্ত ছিল। অতএব, ভগ্ন স্বাস্থ্য সত্ত্বেও তাঁর প্রচেষ্টার মধ্যে কোন ঢিলেমি অথবা জীবনে কোন উদাসীনতা দেখা যায়নি। তিনি সর্বক্ষণ সচেষ্ট ছিলেন।

সঙ্ঘের সূচনা থেকেই প্রতিদিন কার্যক্রমে প্রযুক্ত আজ্ঞাসমূহে এবং প্রার্থনায় শ্রী আপ্পা সোহোনীর কী রূপ অবদান ছিল সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। যে সময় সঙ্ঘের কাজ শুধু নাগপুর ও আশে-পাশের প্রান্ত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, তখন সংস্কৃত ও মারাঠী মিশ্র আজ্ঞা এবং হিন্দী-মারাঠীর প্রার্থনায় কাজ চলে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন সঙ্ঘের শাখাসমূহ পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার, গুজরাট, কর্নাটক ইত্যাদি প্রান্তেও বিস্তার লাভ করেছিল। অতএব প্রার্থনা ও আজ্ঞাগুলির প্রকৃত স্বরূপ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ডাক্তারজীর ইচ্ছা ছিল যে প্রার্থনার রচনা এমন করতে হবে যাতে তার দ্বারা স্বয়ংসেবকদের মনের উপর ধ্যেয়নিষ্ঠার উত্তম তথা দৃঢ় ছাপ অংকিত হয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করার জন্য ডাক্তারজী ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর বন্ধু শ্রী নানাসাহেব টালাটুলের গ্রাম সিন্দীতে প্রমুখ কার্যকর্তাদের একটি বৈঠক আহ্বান করেন।

সিন্দীতে বৈঠকের ব্যবস্থা স্টেশনের নিকটেই শ্রী ববনরাও পণ্ডিতের বাংলোতে করা হল। এই বৈঠকে ডাক্তারজী ব্যতীত শ্রীগুরুজী, শ্রী আপ্পাজী জোশী, শ্রী বালাসাহেব দেওরস, শ্রী তাত্যারাও তেলঙ্গ, শ্রী বিট্ঠলরাও পাতকী, শ্রী বাবাজী সালোড়কর, শ্রী নানাসাহেব টালাটুলে এবং শ্রী কৃষ্ণরাও মোহরীর উপস্থিত ছিলেন। শ্রী ববনরাও পণ্ডিতের উপর সমস্ত ব্যবস্থাপনার ভার ছিল।

এই বৈঠকে সঙ্ঘের বিধান, আজ্ঞা, প্রার্থনা, কার্যপদ্ধতি এবং প্রতিজ্ঞা — সকল বিষয় নিয়েই বিশদ আলোচনা হয় এবং ক্রম-বর্ধিষ্ণু সংগঠনের দৃষ্টিতে কী কী পরিবর্তন আবশ্যক তার বিষয়ে বিবেচনা করা হয়। বিচার-বিমর্শের পরে ঠিক হল যে সঙ্ঘের আজ্ঞাসমূহ এবং প্রার্থনা দেববাণী সংস্কৃতেই রাখা হোক। সংস্কৃত সকলের নিকট সমানরূপে মান্যই নয়, সকলের শ্রদ্ধা তথা প্রেরণার উৎসও। প্রার্থনার জন্য কতকগুলি মূলগত চিন্তাও ডাক্তারজী সবার সম্মুখে উপস্থাপন করেন। তদনুসারে শ্রী নানাসাহেব টালাটুলে গদ্যের আকারে প্রার্থনা লেখেন। সেটাই পরে পদ্যরূপে রচিত হয়। পরিবর্তিত অবস্থা অনুসারে সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতি এবং আচার-পদ্ধতিতেও কিছু সংশোধন করা হয়।

বৈঠক প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত এবং বেলা ৩টে থেকে ৬টা পর্যন্ত, পরে রাত ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত সাধারণতঃ আট ঘন্টা চলত। দশ দিন যাবৎ এই ভাবেই বৈঠক চলে। বহু বিষয়ে বেশ গরম-গরম তর্ক-বিতর্ক হয়। কখনো-কখনো তাতে অংশগ্রহণকারীরা স্বভাব অনুসারে উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। কিন্তু ডাক্তারজী সকলের বক্তব্য মন দিয়ে শুনে নিরপেক্ষভাবে শান্তিপূর্বক বিতর্কিত বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করে যবনিকা টেনে দিলেই সম্পূর্ণ বিতর্ক শেষ হয়ে যেত এবং পরবর্তী বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হত। এই আলোচনায় কোন বিষয়ে উভয় পক্ষের বক্তব্য বুঝে সূক্ষ্মতার সঙ্গে সেগুলি বিশ্লেষণ করে তার প্রতিপাদনে শ্রীগুরুজীর দক্ষতা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। লাহোর প্রবাসের সময় শ্রীগুরুজী ডাক্তারজী মধ্যে যে সুসামঞ্জস্য স্বভাবের দর্শন করেছিলেন, তাঁর ব্যবহারেও সেই স্বভাবের প্রতিফলন দেখা গেল। ভক্তিভাবের সঙ্গে যে বিষয়ের চিন্তা করা যায়, তা মানুষের ব্যবহার ও স্বভাবে স্বতঃ পরিলক্ষিত হতে থাকে। শ্রী গুরুজী অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস ও অভিনিবেশ সহকারে বিষয়ের প্রতিপাদন করতেন। কিন্তু একবার ডাক্তারজী তাঁর অভিমত জানিয়ে দেবার পর এবং অন্য বিষয় শুরু হয়ে যাবার পর বিগত বিতর্কের তীক্ষ্ণতা জলের রেখার মতই বাষ্পীভূত হয়ে যেত এবং সকলের মনঃস্থিতি শান্ত ও প্রসন্ন হয়ে যেত। সাধারণভাবে তর্ক-বিতর্কে শ্রী লঃ রাঃ পাঙ্গরকরের নিম্নলিখিত বর্ণনাই সত্য হয়ে ওঠে ঃ —

"বাদেঁ চিত্ত জলে, সমত্ব বিতলে, সন্তোষ সারা পলে।;
দীর্ঘস্নেহ গলে, অহংকৃতি বলে, পুণ্যার্ধি তীহি ঢলে।
শান্তি ক্ষান্তি চলে, সুবুদ্ধিহি মলে, সংক্ষোভ বাদানলেঁ।
বাদী তো ন বলে, ন বাদহি খলে, হোতী খুলে আঁধলে।।"

("চিত্ত জ্বলে, সমতা চলে, ঢলে সকল সন্তোষ।
স্নেহ গলে, দম্ভ বাড়ে, ধসে পুণ্যের কোষ।
শান্তি ক্ষান্তি ধী হয় অস্তমান ক্ষোভে ভরে সব দিক।
তর্ক শুভ নয়, বিতর্কে আঁধার চতুর্দিক।।")

ঢোল শেষ হয়ে গেলেও যেমন ঢোলের গুঞ্জন চলতে থাকে, অথবা গাড়ী চলে গেলেও যেমন বাতাসে ধূলির ঝড় কিছুক্ষণ উঠতে থাকে, তেমনই তর্ক-বিতর্ক করার পরে তার্কিকেরও মনের অবস্থা হয়। এ ব্যাপারে শ্রীগুরুজীর স্বভাবের মধ্যে ব্যতিক্রম দেখে ডাক্তারজী প্রসন্নতা লাভ করতেন, এবং তাঁর এই মনোভাব তিনি অন্যদের সমক্ষে প্রকাশও করতেন। এই বৈঠকে ডাক্তারজীর ডান হাত বলে পরিচিত শ্রী আপ্পাজী জোশীকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন — "আমার জায়গায় শ্রী গুরুজীকে সরসঙ্ঘচালক করে দিলে কেমন হয়?" বৈঠকের সময় গৃহীত ডাক্তারজীর দুইটি আলোকচিত্রও পাওয়া যায়।

বৈঠক থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে শ্রীগুরুজী এবং শ্রী বিট্‌ঠলরাও পাতকীকে সঙ্ঘকার্যের জন্য কলকাতায় প্রেরণ করা হল। এই সময় ডাক্তারজী ও শ্রীগুরুজীর মনঃস্থিতি অনুধাবন করা সমীচীন হবে এবং তারই ফলশ্রুতি হবে উদ্দীপনাময়। ডাক্তারজীর তাঁর জীবনের অপর তট সন্নিকটবর্তী বলে মনে হচ্ছিল। তাঁর পরে তাঁর কল্পনা অনুসারে এই দেশব্যাপী সংগঠনের জোয়ালকে যথাযথভাবে বহন করতে পারে এরকম কার্যকর্তা নির্মাণের আতুরতা তাঁকে ব্যাকুল করে তুলছিল। তিনি ভাল করেই জানতেন যে যদি সুযোগ্য এবং দায়িত্ব নির্বাহে সক্ষম অনুগামী না পাওয়া যায়; তাহলে বড় বড় কাজও তার জন্মদাতার জীবনের সঙ্গে-সঙ্গেই লুপ্ত হয়ে যায়। ডাক্তারজী তাঁর অভিনব প্রতিভার দ্বারা দৈনিক শাখারূপে এমন সংস্কার কেন্দ্র খুলেছিলেন, যার থেকে, স্থায়ী সংস্কার গ্রহণ করে যারা হিন্দুত্বকে প্রাণ থেকেও প্রিয় বলে মনে করে এরকম প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম উৎপন্ন হতে পারে। এই সকল কেন্দ্রগুলিকে যে কোন পরিস্থিতির ঝঞ্ঝাবাত থেকে রক্ষা করে, তাদের পথ প্রদর্শন করে সর্বদা কর্মক্ষম এবং প্রগতিশীল রাখার মত যোগ্য নেতৃত্ব শ্রী গুরুজীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। "আমার পরে কী হবে?" প্রত্যেক গঠনমূলক কার্যকর্তার সম্মুখে এই প্রশ্নের উদ্ভব হয়, বিশেষ করে যখন তাঁদের শরীর ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে পড়ে। অনেক সময়ে অন্বেষণের পরে এমন ব্যক্তি পাওয়া গেলেও তার উপযুক্ত বিকাশ করার এবং তাকে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় সামর্থ্য ও দক্ষতা কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ডাক্তারজীর মনে সেরকম কোন চিন্তা ছিল না। তার কারণ, তিনি নিজের চতুর্দিকে হিন্দু রাষ্ট্রের জন্য জীবন-সর্বস্বকে পণ রাখার মধ্যেই যারা জীবনের সার্থকতা বলে মনে করে এরকম কার্যকর্তাদের নির্মাণ করেছিলেন। অতএব, "আমার পরে কী হবে?" একথা বলার অথবা চিন্তা করার প্রয়োজন তাঁর কখনো হয়নি। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে তিনি যাদের ছোট থেকে বড় করে তুলেছিলেন, সেই তরুণরাই ভবিষ্যতে স্বতঃপ্রেরণায় পারস্পরিক সহযোগিতা তথা সদ্ভাবের মাধ্যমে কাজকে ক্রমগত এগিয়ে নিয়ে যাবেই। ডাক্তারজী নিজের উত্তরাধিকারীর সন্ধান অবশ্যই করছিলেন, কিন্তু তাঁর মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন আশংকা ছিল না। রাষ্ট্রীয়

স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে অবাধে চালিয়ে নিয়ে চলার মত নিঃস্বার্থ তথা নির্লিপ্ত নিষ্ঠা তিনি অনেক তরুণদের মধ্যে নির্মাণ করেছিলেন, এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ঐ নিষ্ঠাই সংগঠনের পক্ষে প্রেরণাদায়ক এবং অবশেষে সমাজের উদ্ধারক বলে প্রমাণিত হবে। ধ্যেয়নিষ্ঠার পরম্পরা নির্মাণই ছিল ডাক্তারজীর সিদ্ধি।

এই সন্ধিক্ষণেই, অনাড়ম্বরভাবে, অথচ অনায়াসে শনৈঃ শনৈঃ ব্যক্তির স্বভাব পরিবর্তনকারী ডাক্তারজীর অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব শ্রীগুরুজীর হৃদয়ের উপর অংকিত হয়ে চলেছিল। তাঁর স্বভাবের মধ্যে কীভাবে পরিবর্তন ঘটে চলেছিল, তার বর্ণনা শ্রীগুরুজীর শব্দেই দেওয়া উপযুক্ত হবে। ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ পুনায় প্রান্তীয় বৈঠকের সমারোপ করার সময় তিনি বলেছিলেন, "আমি তো এক আপনভোলা, ভবঘুরে প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলাম। পাঠশালাতেও কখনো যথাযথ ব্যবহার করিনি। সব শিক্ষকেরই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকত। তবে পড়াশুনা ঠিকমত করতাম। পরীক্ষার আগে একটু পড়েই বেশ ভালমত উত্তীর্ণ হতাম। কলেজেও একইভাবে চলছিল। তাহলে আমার উপর সংস্কার কেমন করে হল? বলতে পারিনা। হয় পরমেশ্বর জানেন, নয় তো যিনি সংস্কার করেছেন তিনি জানেন। একবার ভুল করে ডাক্তারজীর ভাষণ শুনে ফেললাম। নিজের বুদ্ধির বিষয়ে গর্বিত, আমি তার মধ্যে যুক্তি খুঁজে পেলাম না, কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পেলাম না। তার মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান ছিল না, বড়-বড় প্রমাণযোগ্য বিষয় ছিল না। ডাক্তারজী কী বলেছিলেন? "স্বয়ংসেবক বন্ধুগণ! কাজ কর, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ কর, প্রেমের সঙ্গে কাজ কর।" আমি বললাম, "এ তো নিছক সিদ্ধান্ত মাত্র। এর মধ্যে বিশেষ কী আছে? একেবারে নিরর্থক।" তার কোন মূল্য প্রতীত হল না। সে সময় আমি বিদ্বান্ ছিলাম। কিন্তু এখন সব ভুলে গেছি। এখন পুরোদস্তুর নিরেট, যতই জল বয়ে যাক, সেই নর্মদার প্রস্তরখণ্ডের মত যার উপর কোন প্রতিক্রিয়া হয়না। সেই ভাষণের মধ্যে আমি কোন পাণ্ডিত্য দেখতে পেলাম না। তার অন্তর্নিহিত রসের আস্বাদ আনকোরা হৃদয় কেমন করে উপলব্ধি করতে পারবে? কিন্তু এ কথা সত্য যে তাঁর সেই ভাষণ অন্তরে ক্ষরণ হতে থাকল। আমার চার দিকে পাণ্ডিত্যের বিরাট আবরণ ছিল। সেই পাথরের মধ্যে দিয়েও ক্ষরণ হল কেমন করে? সহসা কারো নিকট পরাভূত না হওয়ার ব্যাপারে আমার খ্যাতি ছিল। কুড়ি-পঁচিশ হাজার গ্রন্থ পড়েছিলাম। আমার অগাধ পাণ্ডিত্য ও ব্যাপক পঠন-পাঠন! আমি বিদ্বান হতে পারি, কিন্তু ডাক্তারজীর ভাষণে হৃদয়ের ব্যাকুল স্পন্দন ছিল, সেটা আমার অন্তঃকরণে কেমন করে ক্ষরিত হল? তত্ত্ব সম্বন্ধে বিবেচনা না করে, মাঝে-মাঝে তাঁর সঙ্গে যে সাক্ষাৎ হত, তাঁর যে সান্নিধ্য পেতাম, তার মধ্য দিয়েই পরিবর্তন ঘটে গেল এবং জীবনের নিশ্চিত দিশা লাভ করলাম।

"ডাক্তারজী আমার অহংকারকে প্রবলভাবে নাড়া দিলেন। আমি তাঁর সামনে কেমন করে আনত হলাম? বি এ-তে ইংরাজী এবং রাজনীতি-বিজ্ঞান, এবং বি এস সি-তে একেবারে প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপনা করেছি এবং নানা রকম গণ্ডগোল ও দুষ্টুমি করেছি। কিন্তু কারো কোন কাজে লাগিনি। আমার প্রথম দিকের চিন্তা-ভাবনা চলে গেল কেন? কোথায় চলে গেল? একথার বর্ণনা করা কঠিন। এটুকুই বলতে পারি যে মনের মধ্যে সঙ্ঘের প্রবেশ

ঘটে গেল। জ্ঞানেশ্বরের বাণী মিথ্যা নয় যে 'হেঁ অনুভবাচেঁচি যোগেঁ। নোহে বোলাচিয়া।' — 'এ হল অনুভবের যোগ, কথার কথা নয়।'

"এ ব্যাপারে এখনো আমার আশ্চর্য বোধ হয়। কিন্তু সব থেকে বিচিত্র কথা হল যে এই শরণাগতির জন্য আমার দুঃখ নেই, ক্রোধ নেই। অহংকারী মানুষকে নত করার চেষ্টা করলে সে কী রকম গরম হয়ে ওঠে। কিন্তু এই ক্ষতিতে আমার তো উল্‌টে আনন্দই হল। এর একটাই কারণ যে যাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হল তাঁর মন ছিল অত্যন্ত বিশাল। সেই বিশালতার কারণে এত সহজে সব ঘটে গেল। ঐ অন্তঃকরণের বিশালতার মধ্যে শত্রু-মিত্র সকলের জন্য স্থান ছিল। এই গুণের কারণে প্রত্যেক ব্যক্তি তার মধ্যে ঠাঁই করে নিত। তাঁর প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে সঙ্ঘ ভরা ছিল। এই প্রকার মনের অত্যুৎকৃষ্ট অবস্থার ঐ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির মৌনতাও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। বাতাবরণে এও মনে হত বুঝি অন্তঃকরণের উপর তার নির্মাণ-কর্তার অবিরত কারিগরিই চলেছিল।"

এইরূপ মনঃস্থিতিতে শ্রীগুরুজী প্রচারের জন্য কলকাতা গেলেন এবং সেখানে ২২শে মার্চ বর্ষ প্রতিপদের শুভ দিনে শাখা শুরু করে দিলেন। ১৯৩৮-এর শেষে শ্রীগুরুজী "We or Our Nationhood Defined" নামক এক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রামটেকে কয়েকদিন থাকার সময় লেখেন। ডাক্তারজীর অনুরোধে লোকনায়ক বাপুজী অণে এক দীর্ঘ প্রস্তাবনা লিখে দেন। এই প্রবন্ধে তিনি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেন যে সঙ্ঘ যে হিন্দু রাষ্ট্রের পুনরুদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর, তার কল্পনা কত শাস্ত্রশুদ্ধ তথা যুক্তিসঙ্গত। শ্রীগুরুজী যখন কলকাতায় ছিলেন তখন নাগপুরে বর্ষ প্রতিপদের দিন এই প্রবন্ধ পুস্তক রূপে প্রকাশিত হয়। যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পরম্পরায় শ্রীগুরুজী ভারতীয় সংস্কৃতির দিব্য রূপের সাক্ষাৎকার করেন, সেখানে শ্রীকালী মাতা এবং জগন্মাতাকেই উপাস্য দেবতা বলে স্বীকার করা হয়। শ্রীগুরুজীর উপাস্য দেবতার দর্শন মৃন্ময়ী মূর্তি রূপে নয় 'হিন্দু রাষ্ট্র' রূপে হচ্ছিল। পুস্তকের প্রস্তাবনায় তিনি লেখেন — "I offer this work to the public as an humble offering at the holy feet of the Divine Mother, the Hindu Nation..." । মানুষের সেবাই নারায়ণের সেবা, এই উদাত্ত ভাবনা নিয়েই এখন শ্রীগুরুজী ডাক্তারজীর নেতৃত্বে চলছিলেন। ডাক্তারজীর পক্ষে অত্যন্ত সন্তোষের ব্যাপার ছিল যে সঙ্ঘকার্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্তার ঘটছিল, সেই সময় ঐ সকল স্থানের শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে সঙ্ঘের তাত্ত্বিক ভূমিকাকে সহজবোধ্য করতে এই পুস্তক যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

এই সময়েও ডাক্তারজীর ছোট-ছোট ভ্রমণ অব্যাহত ছিল। চতুর্দিক থেকে কার্যবৃদ্ধির সংবাদ অবিরাম আসছিল। শ্রীভাউরাও দেওরস উত্তরপ্রদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি সঙ্ঘ-শাখার জাল বিস্তার শুরু করে দিয়েছিলেন। ২৮শে এপ্রিলের পত্রে তিনি লেখেন, ".....সম্পূর্ণ সংযুক্তপ্রান্তে এখন সঙ্ঘের পক্ষে অবস্থা অনুকূল।" বিভিন্ন স্থান থেকে ডাক্তারজীর নিকট সঙ্ঘ শুরু করার জন্য নিয়মাবলী ও সূচনা-পত্রক প্রেরণ করার দাবী আসছিল। করাচীতেও শ্রীবাপুরাও ভিশীকর সেখানে এক বিদ্যালয়ে চাকুরী করতে-

করতে সঙ্ঘ-কার্যকে চোখে পড়ার মত দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। পাঞ্জাবে তো উৎসাহের কোন সীমাই ছিলনা। রাওয়ালপিণ্ডী, শিয়ালকোট ইত্যাদি স্থান থেকে নাগপুর হতে প্রেরিত কার্যকর্তাদের প্রশংসা করে এবং তাঁদের পরেও সেখানেই রেখে দেবার আগ্রহ প্রকাশ করে পাঠানো অনেক পত্র ডাক্তারজী পেয়েছিলেন। মাঝে-মাঝে শ্রী প্রতাপ সেঠের পক্ষ থেকে সঙেঘর উৎসাহপূর্ণ দৃশ্য দেখে ডাক্তারজীর নিকট দানও আসছিল। বিহারেও এই সময়ে কয়েকজন কার্যকর্তা পৌঁছে গিয়েছিলেন।

এই উৎসাহপূর্ণ বাতাবরণে মে মাসে প্রতি বছরের মত নাগপুরে অধিকারী শিক্ষণবর্গ শুরু হল। এ বছরও ডাক্তারজী সর্বাধিকারীরূপে শ্রী গুরুজীকে নিযুক্ত করেন। নাগপুরের বর্গ আরম্ভ হবার পূর্বে ডাক্তারজী ২২শে এপ্রিল পুনার বর্গের জন্য গিয়েছিলেন। যাত্রাপথে তিনি ধুলে, চালিশগাঁও, কল্যাণ, ঠাণে, বোম্বাই ইত্যাদি শাখাগুলি পরিদর্শন করেন। পুনা থেকে তিনি শ্রীগুরুজীকে একটি পত্র লেখেন। মানুষের উৎসাহবৃদ্ধির ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি কত সরল ছিল, সে কথা তাঁর পত্রে পরিলক্ষিত হয়। তিনি লেখেন, ‘‘আপনি আপনার সকল সহকর্মীদের সঙ্গে বর্গকে সফল করার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করছেন, তার কল্পনা আমার আছে। এই সময় আমি আপনাদের থেকে দূরে থাকলেও শীঘ্রই আপনাদের কাছে পৌঁছব, যদিও মন থেকে আজও আমি আপনাদের মধ্যেই বিচরণ করছি।’’

ডাক্তারজী ১৯৩৯ সালের মে মাসে যখন পুনায় ছিলেন, তখনকার একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। কোন ব্যক্তির হৃদয় যখন দেশাত্মবোধে ওতপ্রোত হয়ে যায়, তখন তার ব্যবহার কী রূপ হয়, তার কল্পনা ডাক্তারজীর সান্নিধ্যে থাকা সহৃদয় ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করতে পারে। তিনি নিজের শরীরকে প্রভাবী মনের হাতে সঁপে দিয়ে কীভাবে কাজ করতেন তার ধারণা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মনে উদ্বেগের সঞ্চার না হয়ে থাকতে পারেনা। এক দিন ডাক্তারজী নিজের ঘরে একাই চুপচাপ বসেছিলেন। তাই দেখে শ্রীভাউরাও দেশমুখ উকিল ভিতরে এলেন। এদিক-ওদিক কিছু কথার পর শ্রীভাউরাও বললেন, ‘‘ডাক্তারজী, আপনি বেশ দুর্বল হয়ে পড়ছেন। আপনার কষ্ট কম করার জন্য আমরা কী করব?’’ ডাক্তারজী শুধু হাসলেন, কিছু বললেন না। কিন্তু দু-তিনবার একই প্রশ্ন করা হলে ডাক্তারজী বললেন, ‘‘আপনি এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন, এতে আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু আমি এ প্রশ্নের প্রতি লক্ষ্য দিতে চাইনা।’’

কিছুক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘আপনি আমার জন্য কী করতে চান?’’

‘‘আমি আপনাকে দুপুরে দু-তিন ঘণ্টা বিশ্রাম দিতে চাই।’’

‘‘কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব?’’

‘‘দরজার কাছে একজন স্বয়ংসেবককে বসিয়ে দেব। আপনার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে সে তাকে বলে দেবে যে আপনি ঘুমোচ্ছেন। এই বলে বাইরে থেকেই তাকে ফিরিয়ে দেবে।’’

এরপর কথা ওখানেই শেষ হল। রাত্রে ভাউরাও শ্রী বাবারাও সাভারকরের সঙ্গে যোজনা তৈরী করে আবার এসে বসলেন। সেই সময় ডাক্তারজী ভাউরাওকে জিজ্ঞেস

করলেন, "আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন তা বাবারাওকে জিজ্ঞেস করবেন কি?"

এর অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করে বাবারাও বললেন, "ডাক্তারজী, আপনি আমার দিকে সংকেত করে পালাবেন না।"

ডাক্তারজী বললেন, "ভাউরাও প্রশ্ন করেছেন, তা আমি বুঝতে পারি, কিন্তু বাবাও বিশ্রামের প্রশ্ন উত্থাপন করলে কথাটা আমার বোধগম্য হয়না। প্রথমে আমি প্রশ্ন করছি, আপনি জবাব দিন। আপনার হাঁটুর ব্যথার জন্য ডাক্তার কাশীতে আপনাকে ত্রিশ-চল্লিশ দিন বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন, কিন্তু আপনি বিশ্রাম করেছিলেন কি? তখন কাজের জন্য আপনি সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন কি না? তাহলে কেন? আমারও একই অবস্থা।"

বাবারাওকে এইভাবে নিরুত্তর করে দিয়ে ডাক্তারজী এরপর একটু ভাবাবেগের সঙ্গে বললেন, "আপনার ইচ্ছা আমি বুঝতে পারি। 'কিন্তু আমার শক্তি নেই, আমার সময় নেই' এই বলে আমি কারো সঙ্গে কথা বলবনা—তা আমি করতে পারিনা। কারণ বিশ্রাম নিলেও বাঞ্ছিত পরিণাম হবার নয়, তাছাড়া, মানসিক দৃষ্টিতে আমার পক্ষে আরাম করা সম্ভব নয়। যতটা সম্ভব, ততটা আমি চেষ্টা করি।" ব্যস্, প্রশ্নের এখানেই ইতি হয়ে গেল।

পুনাতে অকোলার কার্যকর্তা শ্রী হরিহররাও পুরাড উপাধ্যের প্রেরিত একটি চিঠি অন্য এক কার্যকর্তার কাছে এসেছিল। তিনি ডাক্তারজীকে পত্রটি পড়তে দিলেন। তার থেকে জানা গেল যে শ্রী হরিহররাও-এর ৭ই মে শুভবিবাহ হবে। কিন্তু বিবাহের প্রস্তুতির ব্যস্ততায় ডাক্তারজীকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়নি। ডাক্তারজীর ৭ই মে তারিখেই পুনা থেকে নাগপুর পৌঁছবার কথা ছিল। তিনি ঠিক করলেন পথে অকোলায় নেমে এমন ঘনিষ্ঠ স্বয়ংসেবকের শুভবিবাহে অবশ্যই সম্মিলিত হবেন। যেখানে আত্মীয়তা থাকে সেখানে লৌকিকতার কোন স্থান থাকেনা। ডাক্তারজী শ্রী হরিহররাওকে লিখলেন, 'তোমার বিবাহের সংবাদ আমাকে জানাওনি কেন? আমি ৭ তারিখে সকালে পৌঁছচ্ছি।' তদনুসারে তিনি ৭ই মে সকালের ট্রেনে অকোলা পৌঁছলেন এবং বিবাহ উৎসবে উপস্থিত থেকে রাত্রে নাগপুর পৌঁছলেন। ডাক্তারজীর এইরকম অকৃত্রিম ভালবাসার কথা স্মরণ করে আজও অনেকের চোখে জল এসে যায়। এই সময়ে পথে ওয়ার্ধাতে থেকে শ্রী রাজাভাউ দেশমুখ ইত্যাদি তিন জন স্বয়ংসেবকের শুভবিবাহেও মঙ্গলাচরণের জন্য সময় করে নিয়েছিলেন।

এই সময় এক পত্রে তিনি লেখেন, "আমার শরীর আজকাল এত খারাপ হয়ে গেছে, হঠাৎ ভীষণ ডিপ্রেশন এসে যায় এবং কোন কাজ করা বা কথা বলাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।" এমন গুরুতর অসুস্থতার মধ্যেও তাঁর কাজের গতি হ্রাস পায়নি। নিজের মন ও শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার সামর্থ্য তাঁর মধ্যে বাস্তবিকই অলৌকিক ছিল। পুনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পরেই এক আত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষে তিনি বিলাসপুর গেলেন। সন্ধ্যায় বিবাহ, ভোজন ও বরযাত্রীর সঙ্গে যাওয়া প্রভৃতি সব কার্যক্রমেই অংশগ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর বেশ জ্বর এসে গেল, যা বাড়তে-বাড়তে ১০৪ ডিগ্রী পর্যন্ত বৃদ্ধি পেল। বিলাসপুর থেকে রাত্রেই তাঁর নাগপুরে ফেরার কার্যক্রম ঠিক করা ছিল। কিন্তু জ্বরে সারা শরীর পুড়ে যাচ্ছিল। তাঁর আত্মীয়রা আগ্রহ করলেন, "জ্বর কমে গেলে নাগপুরে যাবেন। ততক্ষণ বিশ্রাম করুন।"

ডাক্তারজী বললেন, "কাল শ্রী বিশ্বনাথ রাও কেলকর একটি দল নিয়ে ভাগানগর সত্যাগ্রহে যোগ দিতে যাবেন। তাঁকে বিদায় জানাতে আমাকে নাগপুরে যেতেই হবে।" ডাক্তারজীকে এই সংকট থেকে উদ্ধারের এক উপায় বের করলেন সাংসারিক ব্যাপারে কুশল এক ব্যক্তি। তিনি বললেন, "বিদায় জানিয়ে আজই আপনি শ্রী বিশ্বনাথরাও কেলকরকে অভিনন্দন-সূচক তারবার্তা পাঠিয়ে দিন। আপনার বিদায় জানানো হবে, সেইসঙ্গে বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগও পাওয়া যাবে।" এ কথা শুনে ডাক্তারজী দৃঢ়তাপূর্বক বললেন, "না, তা হতে পারে না। আমাকে যেতেই হবে। আরাম করার জন্য ভগবান অন্যদের সৃষ্টি করেছেন।" অত্যধিক জ্বর নিয়ে তিনি বিলাসপুর থেকে নাগপুর রওনা হলেন এবং পর দিন বিদায় সম্বর্ধনার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলেন।

নাগপুরে ফিরেই ডাক্তারজী অধিকারী শিক্ষণ বর্গে নিমগ্ন হলেন। এ বছর উত্তর ভারতের কয়েকটি প্রান্ত থেকে প্রথমবার স্বয়ংসেবকেরা বর্গে অংশগ্রহণ করতে এসেছিল। ডাক্তারজী তাদের থাকা ইত্যাদির পুরো ব্যবস্থা করলেন এবং নিজে তাদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখলেন। ডাল-ভাত, রুটি-তরকারী, এগুলি সাধারণভাবে সারা দেশের ভোজনে প্রধান জিনিষ হিসাবে থাকে। কিন্তু এগুলি রান্নার পদ্ধতি বিভিন্ন অঞ্চলে কিছুটা ভিন্ন প্রকার। এই পার্থক্যের কথা মনে রেখে ডাক্তারজী বিভিন্ন রুচি অনুসারে দু-তিন রকম রান্নার ব্যবস্থা করেছিলেন।

বর্গে বাংলা থেকে এক স্বয়ংসেবক শশীভূষণ বড়ুয়া এসেছিলেন। ডাক্তারজী জানতে পারলেন যে তিনি রাষ্ট্রীয় গীত অত্যন্ত ভাবাবেগপূর্ণ রীতিতে গাইতে পারেন। তাই, একদিন অবসর সময়ে তিনি তাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন এবং গান গাইতে বলেন। 'ধন-ধান্য পুষ্পে ভরা' এই গানের "আমার জন্মভূমি" এই পংক্তিটি তাঁকে ভাবে বিভোর করে তোলে এবং গানের শেষ পংক্তি শোনার সময় তাঁর দু চোখ দিয়ে অবিরল অশ্রুধারা বইতে থাকে। তিনি চাইতেন যে দেশাত্মবোধক কবিতা রচিত ও গান গাওয়া হোক। যখনই তিনি এই দিকে উৎসাহী ব্যক্তি দেখতে পেতেন, তাকে প্রোৎসাহন দিতেন। সেই বছর লণ্ডনে উচ্চশিক্ষার জন্য শ্রী 'কিরণ কবি' গিয়েছিলেন। তিনি সেখান থেকে তাঁর নিকট একটি কবিতা পাঠালেন। সে বিষয়ে তিনি তাঁকে লেখেন, "আপনার প্রেরিত কবিতা পড়ে সকলের বেশ ভাল লাগল। আপনাকে আমার পরামর্শ এই যে আপনি অখিল ভারতীয় হিন্দু রাষ্ট্রকে লক্ষ্য রূপে রেখে অবশ্য কবিতা লিখতে থাকুন।"

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কিছু লোক, সঙ্ঘ ভাগানগর সত্যাগ্রহে সঙ্ঘ-হিসাবে অংশগ্রহণ না করায় অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের অসন্তোষ পরস্পরের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সার্বজনীন রূপে অত্যন্ত তীব্রতার সঙ্গে ব্যক্ত করতে শুরু করলেন। বোম্বাই-এর মারাঠী 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা ক্রমান্বয়ে বারটি রচনা প্রকাশ করে সঙ্ঘ এবং সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হেডগেওয়ারের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করে। কিন্তু মহারাষ্ট্র ও বিদর্ভ অঞ্চলের সত্যাগ্রহে স্বয়ংসেবক অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির কাছে সে কথা গোপন ছিল না। সেই কারণে

অনেকেরই 'বন্দেমাতরম্'-এর প্রবন্ধগুলি পছন্দ হয়নি। তার নিজের পক্ষ থেকেই সমালোচনাকারীর বেশ মুখের মত জবাব দেওয়া হল।

২৭ শে মে নাগপুর থেকে প্রকাশিত 'সাবধান' লেখে, "যদি শ্রী গোঃ গোঃ অধিকারী নিত্য কার্য ও নৈমিত্তিক কার্যের মধ্যে বিবেচনা করতেন, তাহলে তিনি সঙ্ঘের বিরুদ্ধে বারোটি বিষাক্ত ফোঁস-ফোঁসানি ছাড়তেন না। ভাগানগর সত্যাগ্রহের বিপুল উৎসাহের শিশু-সুলভ আবেগে শ্রী অধিকারী বোধ হয় ভুলে গেছেন যে এখনও রাষ্ট্রের স্বাধীনতার কাজ বাকি পড়ে আছে। যে সময় রাষ্ট্রের মুক্তির জন্য শেষ প্যাঁচটি চালাতে হয়, তার পূর্ণ প্রস্তুতির জন্য রাষ্ট্র বিমোচনের কাজ হল নিত্য কার্য, এবং ভাগানগর সত্যাগ্রহের মত আন্দোলন হল তার নৈমিত্তিক কার্য। পরাধীনতা কালে ভিন্ন-ভিন্ন কর্মে সংলগ্ন সংস্থাগুলি পৃথক হয় — রাখতে হয় — এবং যদিও এই দুই কার্যই সমান্তরাল চলে-চালাতে হয় — তা সত্ত্বেও নিত্য কার্যে সংলগ্ন সংস্থা নৈমিত্তিক কার্যের জন্য এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না, যার ফলে তার শক্তি-সর্বস্ব ও বৈশিষ্ট্যকে বিস্মৃত হয়ে নিত্য-কার্যে বিঘ্ন উৎপন্ন হতে পারে।"

দেশভক্ত শ্রী বাবারাও সাভারকর এক প্রবন্ধ লিখে সঙ্ঘের ভূমিকার সমর্থন করেন। তিনি লেখেন, "..... সঙ্ঘের শিক্ষার ফলে যাদের মনে হিন্দুত্বের প্রেম ও গর্বের ভাব সৃষ্টি হয়েছে, তারা কখনো কোন কর্তব্যকর্ম থেকে পিছু হটেনি। তারা উপযুক্ত পথেই নিজেদের কর্তব্য পালন করেছে।"

এতৎসত্ত্বেও 'বন্দেমাতরম্' ৭ই জুন ডাক্তারজীকে অহংকারী বলে অভিহিত করে এক অত্যন্ত কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করে। তাতে লেখা হয় যে ".... ডাক্তার হেডগেওয়ারের নিকট আমরা বিনম্র নিবেদন করতে চাই যে অহংকারের বিষ সাপের বিষের চেয়েও ভয়ংকর। এই অহংকারের কারণেই গান্ধীর সর্বনাশের টাটকা ইতিহাস ভুলে যাবেন না। নিঃসন্দেহে রাঃ স্বঃ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের দ্বারা আপনি হিন্দু সমাজের উপকার করেছেন। কিন্তু পথচারীদের জন্য তৈরী করা পুষ্করিণীতে দাতা স্বয়ংই যদি হিংস্র জন্তু ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে কী বলা যায়? আপনি এই কাজই করছেন এবং জেনে বুঝে করছেন। অতএব, অনুগ্রহ করে বিরত থাকুন। যদি আপনি এরকম করেন, তাহলে নাম-মাত্র হলেও হিন্দু সমাজের ভাবী ইতিহাসকাররা আপনার অন্ততঃ উল্লেখ করতে পারবে।"

কয়েকজন ডাক্তারজীকে এই প্রবন্ধ পাঠ করে শোনালেন। তিনি হেসে বলেন, "আমারও তাই ইচ্ছা। আমার নাম ইতিহাসে না থাকলেও চলবে, কিন্তু সঙ্ঘের উপর যারা এইভাবে আঘাত করছে তাদের অবশ্য পুরোপুরি নামোল্লেখ হওয়া উচিত।" চার দিকে এইভাবে এই কাদা-ছোঁড়া চলছিল, কিন্তু ডাক্তারজী কখনো সেগুলির জবাব দেবার চেষ্টা করেননি। তিনি একথাই মানতেন যে নিরন্তর প্রগতিশীল প্রত্যক্ষ কার্যই, যারা অকারণ আঘাত করছে তার সঠিক উত্তর। আঘাতকারী আপনজনদের নিরুত্তর করা হলে অথবা তাকে উপহাস করলে সে আরো ক্রুদ্ধ হয়ে চিরকালের জন্য দূরে চলে যায়। ডাক্তারজীর সংযত ব্যবহারের দরুন এই অবস্থার উদ্ভব হতনা। উদাহরণ খোঁজার জন্য দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। 'বন্দেমাতরম্'-এর যে সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টিতে ভাবী ইতিহাসকারের পক্ষে ডাক্তারজীর

নামোল্লেখ পর্যন্ত অসহ্য মনে হয়েছিল, তিনি স্বয়ং ডাক্তারজীর মৃত্যুর পরে তাঁর গুণকীর্তন করে প্রবন্ধমালার সংকলন পুস্তক রূপে প্রকাশিত করে মারাঠী পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এমন নয় যে ডাক্তারজী কোন সমালোচকের কঠোর প্রতিবাদ করতে পারতেন না, কিন্তু 'নিজের দাঁত ও নিজেরই ঠোঁট'-এর নীতি অনুযায়ী বিবেকপূর্বক মৌনই থাকতেন এবং তার পরিণামে তাঁর শক্তি মঙ্গলজনকই প্রমাণিত হত।

বাইরে প্রবন্ধাদির মাধ্যমে তিক্ততা সৃষ্টির প্রয়াস হলেও, কারাগারের ভিতরে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা শাখা শুরু করে অন্যান্য সত্যাগ্রহী বন্দীদেরও দীক্ষিত করার প্রয়াস আরম্ভ করে দিয়েছিলেন এবং তাঁরা বিপুল সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। এ ব্যাপারে ডাক্তারজী মাঝে-মাঝে যে সব চিঠিপত্র পেতেন, তা থেকে এ বিষয়ে সংবাদ পাওয়া যেত। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক যেখানেই থাকুক, সে সাহস ও বুদ্ধির সাহায্যে নিজ ধ্যেয়ের জন্য কর্মরত থাকে — এই কথাই বেশী করে অনুভূত হচ্ছিল। ডাক্তারজীর পক্ষে এটা আনন্দ ও সন্তোষের বিষয় ছিল।

নাগপুরের অধিকারী শিক্ষণ বর্গ শেষ হবার কিছু দিন পরে ডাক্তারজী 'ভগোয়া ঝেণ্ডা' নামক চলচ্চিত্রের উদ্বোধনের জন্য পুনা গেলেন। শ্রীগুরুজী ছায়ার মত এই সময়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এই চলচ্চিত্র শ্রী সমর্থ রামদাস স্বামীর জীবন ও কার্যের ভিত্তিতে তৈরী করা হয় এবং তার মধ্যে সংগঠনের তত্ত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রদর্শিত করা হয়। চিত্র কথায় দেখানো হয় যে চন্দ্রগড় দুর্গের অধিপতির শাসনাধীন গ্রামবাসীদের শ্রী সমর্থ কেমন করে মদোন্মত্ত মুসলমান সরদারদের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য একতা ও সংগঠনের মন্ত্র দান করেছিলেন এবং কীভাবে তার ফলে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের কার্য সহজ হয়ে গিয়েছিল। 'সংগঠন' ও 'ভগোয়া ধ্বজ' শব্দ দুইটি উচ্চারিত হলেই অন্ততঃ মহারাষ্ট্রে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারজীর নাম মানুষের চোখের সামনে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠত। সেই কারণে, অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ডাক্তারজীকে এই চলচ্চিত্র উদ্‌বোধনের জন্য আমন্ত্রিত করা হয়েছিল।

পুনার 'মিনার্ভা চিত্রপট গৃহে' ১৭ই জুন অপরাহ্নে উদ্‌ঘাটন সমারোহ অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্রী দাদাসাহেব তোরণে এবং পরিচালক, চিত্রনাট্য রচয়িতা প্রমুখ সজ্জনরা উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে পরিচালক মহাশয় ডাক্তারজীর পরিচয় অত্যন্ত সুনির্বাচিত শব্দে এইভাবে দিলেন, "তিনশত বছর পূর্বে শ্রীরামদাস স্বামী যে পাঠ পড়িয়েছিলেন, সেই পাঠই পড়ানোর কাজ আজ ডাক্তার হেডগেওয়ার বৃহন্মহারাষ্ট্রেই নয়, অখিল হিন্দুস্থানে করে চলেছেন। ডাক্তারজী এই প্রয়াসই করছেন যে ভগোয়া ঝাণ্ডা রাষ্ট্রীয় ধ্বজ রূপে পুনরায় কেমন করে স্বীকৃতি লাভ করবে। এটা বাস্তবিকই আমাদের মহা সৌভাগ্য যে তাঁকেই আজ আমরা উদ্বোধনের জন্য লাভ করেছি।"

এর পর ডাক্তারজীর ভাষণ হল। ভগোয়া ধ্বজের প্রতি মোহের কারণেই এই আমন্ত্রণ স্বীকার করেছেন এ কথা বলে ডাক্তারজী বলেন, "যদি আমরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস অবলোকন করি, তাহলে হিন্দু রাষ্ট্রের একমাত্র ধ্বজ ভগোয়াকে পাব। আজ পর্যন্ত হিন্দুস্থানে অনেক বিপ্লব হয়েছে। এই সব ক্রান্তি বা বিপ্লবের প্রবর্তকরা এই ধ্বজের ছত্রছায়াতেই

নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করেন। শ্রী শঙ্করাচার্য এবং স্বামী বিদ্যারণ্য ভগোয়া ধ্বজকেই গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, রামায়ণের কালেও ভগোয়াই আমাদের একমেব ধ্বজ বলে স্বীকৃত ছিল। .... চলচ্চিত্র তৈরী হয় এবং তাদের মধ্যে সামাজিক ছায়াছবিও অনেক থাকে, কিন্তু রাষ্ট্রোদ্ধারক ছায়াছবি খুব কমই দেখা যায়। উপস্থিত চলচ্চিত্রের মূলে এই মহান্ ভাবনা রয়েছে, সেই কারণে যে ব্যক্তিরা এই ছবি তৈরী করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।"

অনুষ্ঠানের পরে সন্ধ্যায় চলচ্চিত্রের নির্মাতা শ্রী দাদাসাহেব তোরণে ডাক্তারজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শ্রী ভাউসাহেব অভাঙ্করের গৃহে এলেন। তাঁর আসার বিশেষ অভিপ্রায় ছিল এই যে ডাক্তারজী ভগোয়া ধ্বজের গৌরবের কথা বর্ণনা করে একটি ভাষণ দিন এবং সেই ভাষণের ধ্বনিমুদ্রণের অনুমতি দিন। ডাক্তারজীর প্রসিদ্ধি-পরাঙমুখ স্বভাবের পক্ষে একথা স্বীকার করা সম্ভব ছিলনা যে চলচ্চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাষণও চারিদিকে সম্প্রসারিত হোক। অতএব, অত্যন্ত কৌশল তথা দক্ষতার সঙ্গে তিনি ঐ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন। অনেকবার শ্রী তোরণে তাঁর বিষয়টি উত্থাপন করেন, কিন্তু ডাক্তারজী অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের কোন-না-কোন প্রসঙ্গ টেনে এনে কথাটি এড়িয়ে যান। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই কথার মার-প্যাঁচে কাকে হারতে হল! পরের দিন তিনি 'সরস্বতী সিনেটোন'-এ গেলেন। ঐ সময়ের একটি সুন্দর ছবি পাওয়া গেছে, যাতে ডাক্তারজী ও গুরুজী পাশাপাশি বসে আছেন। সেখানে তিনি উক্ত চলচ্চিত্র সম্পর্কে যে অভিমত লিখে দেন, তাতে তিনি বলেন, "শুধু প্রেম-কাহিনীতে ভরা নাটক-সিনেমার জগতে এই ধরণের প্রেরণাদায়ক ইতিহাসের প্রসঙ্গ চোখের সামনে তুলে ধরে প্রত্যেক পথের জনতাকে খাঁটি রাষ্ট্রসেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করার এবং রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ লক্ষ্য পুনরায় আমাদের উজ্জ্বল ধ্বজের প্রতি আকৃষ্ট করার এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং এই ব্যবসায়ে যুক্ত সবার পক্ষে অনুকরণীয়।"

পুনায় এই সময়ের প্রবাসকালে সঙ্ঘ-কার্যকর্তাদের বৈঠকে ডাক্তারজী শ্রীগুরুজীর হিন্দী ভাষায় পারদর্শিতার প্রশংসা করেন এবং তাঁকে হিন্দীতে দুইটি আখ্যান উপস্থাপন করতে বলেন। ঐ ভ্রমণকালে ডাক্তারজীর উপস্থিতিতে 'তিলক স্মারক মন্দিরে' শ্রীগুরুজীর ভাষণও হল। এই ভাষণে তিনি সরসঙ্ঘচালক পদ সম্বন্ধে এবং ডাক্তারজীর অসামান্য ব্যক্তিত্বের বিষয়ে নিজ হৃদয়ের ভক্তিভাব অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে ব্যক্ত করেছিলেন। এর পর মাত্র দশ-পনের মিনিট ডাক্তারজীর ভাষণ হল। তিনি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে "ভবিষ্যতে বাইরের কোন শক্তি কখনো সঙ্ঘের বিনাশ-সাধন করতে পারবেনা। যদি কেউ সঙ্ঘের উপর আঘাত করে তাহলে তার হাত ইস্পাতের কঠিন গোলার উপর প্রহারের অনুভবই লাভ করবে।"

এই সময়ে বিশ্বের পরিস্থিতি এবং আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতি ডাক্তারজীর সম্পূর্ণ লক্ষ্য ছিল। স্পষ্ট প্রতীত হচ্ছিল যে পরাধীন রাষ্ট্রের সংঘর্ষ করার মত অত্যন্ত অনুকূল পরিস্থিতি নিকটবর্তী হতে চলেছে। জার্মানী অধিকতর আক্রামক হয়ে উঠছে। দেশে শ্রী সুভাষচন্দ্র বসুর মত বিপ্লবী নেতাকে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে নিজের পৃথক দল গঠন করতে হয়েছিল। চতুর্দিকে আসন্ন বিপ্লবের চিহ্ন প্রতীয়মান হচ্ছিল। ডাক্তারজীর এই

সময় একটি মাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল যে ভারতের কোনায়-কোনায় সঙ্ঘ-শাখা সমূহের বিস্তার হয়ে এক প্রচণ্ড শক্তি শীঘ্রাতিশীঘ্র যেন নির্মাণ হয়। সেই সঙ্গে তিনি এই বিষয়টিও পরীক্ষা করে চলেছিলেন যে বিভিন্ন স্থানে স্বয়ংসেবকেরা প্রত্যেক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্য সতর্ক ও সদা প্রস্তুত হচ্ছে কি না। বিপ্লবী জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকার ফলে তিনি এ কথা ভাল করেই জানতেন যে স্বয়ংসেবকদের মধ্যে ঐ গুণগুলির বিকাশ না ঘটলে কোন অনুকূল অবস্থার সুয়োগ গ্রহণ করা সম্ভব হবেনা। এই উদ্দেশ্যে, ইদানীং তিনি যেখানে যেতেন সেখানেই সঙ্ঘচালককে এক ঘন্টা বা দু ঘন্টার মধ্যেই কোন নির্দিষ্ট স্থানে সমস্ত স্বয়ংসেবকদের পূর্ণ গণবেশে একত্রিত করার নির্দেশ দিতেন। এইভাবে তিনি পরীক্ষা করতেন যে প্রতিদিন যে স্বয়ংসেবকেরা শাখায় আসে তাদের মধ্যে কত জন এই প্রকার আকস্মিক আদেশে উপস্থিত হয়। ১৯৩৯ সালের ২০শে জুন, মঙ্গলবার, সকাল ৮টায় পুনা শহরের সমস্ত স্বয়ংসেবকদের এইভাবে একত্রীকরণ করা হয়েছিল। সেখানে খুব অল্প সময়ের মধ্যে শ্রী শিবাজী মন্দির ময়দানে নগরের নশো স্বয়ংসেবক উপস্থিত হয়েছিল।

এই কার্যক্রমের এক দিন পূর্বে ডাক্তারজী নগরের কার্যকর্তাদের বৈঠকে কথা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন যে "কোন কাজের জন্য তাৎক্ষণিক সূচনা দিয়ে স্বয়ংসেবকদের ডাকা হলে সকলকে সমবেত করতে কতক্ষণ সময় লাগবে?" এই প্রশ্নের উত্তরে কেউ চার ঘন্টা, আবার কেউ ছ ঘন্টা সময় আবশ্যক বলে। এ কথা শুনে ডাক্তারজী বলেন, "বাড়ীতে আগুন লাগলে তা নেভাবার জন্য স্বয়ংসেবকদের ডেকে একত্রে করতে যদি চার বা ছ ঘন্টা লেগে যায় তো লাভ কী?" রাত্রে বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে যায়।

পরদিন সকালে ছটার সময় ডাক্তারজী পুনার সঙ্ঘচালক শ্রী বিনায়করাও আপটেকে ডেকে আদেশ দিলেন যে 'দু ঘন্টার মধ্যে পুনার সমস্ত স্বয়ংসেবকদের শ্রী শিবাজী মন্দির সঙ্ঘস্থানে একত্র করুন।" এই আদেশ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কার্যবাহ, শিক্ষক, গটনায়কদের মারফৎ ক্রমান্বয়ে স্বয়ংসেবকেরা পায় এবং সকাল ঠিক আটটার সময় নশো স্বয়ংসেবক পূর্ণ গণবেশে উপস্থিত হয়।

এই ধরণের একত্রীকরণের পিছনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ডাক্তারজী সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তাতে তিনি ১৯৩১-এ তাঁর অকোলার কারাজীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তিনি বলেন, "জেলের একটি ঘটনা। দুপুরের ভোজনের সময় হঠাৎ 'ডেঞ্জার কল' অর্থাৎ বিপদের ঘন্টা বেজে উঠল। শোনার সঙ্গে-সঙ্গে জেলের সব রক্ষক, প্রহরী এবং অন্যান্য সমস্ত কর্মচারী নিজের-নিজের বন্দুক ও ডাণ্ডা নিয়ে দৌড়ে একেবারে সামনের ময়দানে চলে এল। কেউ ভোজন করতে-করতে উঠে এল, কেউ শুধু প্যান্ট পরে, আবার কেউ স্নান করতে-করতে ভিজে শরীর নিয়েই ছুটতে-ছুটতে এসে হাজির হল। সকলেই এক মুহূর্ত দেরী না করে, হাতের সব কাজ ফেলে সেখানে উপস্থিত হল। এই দৃশ্য দেখে আমার মনে হল যে ইংরেজ সরকারের কাছে এইরূপ ডাক দেওয়া মাত্র নিজেদের কাজ ছেড়ে ছুটে আসার লোক আছে। সেই কারণেই ওরা নিজেদের দেশ থেকে পাঁচ হাজার মাইল দূরে এত বড় দেশের উপর শাসন করতে পারছে। এই চাকররা তো বেতন পায়, কিন্তু কোন কিছুর

আশা না রেখে শুধু দেশভক্তির দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে নিজেদের সমস্ত ব্যক্তিগত কাজ এক পাশে সরিয়ে রেখে সঙ্ঘের আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকা ভিন্ন আমাদের দেশের দুর্দশা শেষ হবেনা।"

এই রূপ মৌলিক চিন্তার মাধ্যমে ডাক্তারজী তরুণ প্রজন্মের মনকে সঞ্জীবিত করে হিন্দু সমাজকে তার কর্তব্যের স্মরণ করাতেন। কত অভ্রান্ত ছিল তাঁর পথনির্দেশ।

২৮. জীবন-মরণ মাঝে

পরম পূজনীয় ডাক্তারজীর স্বাস্থ্যের ক্রমাগত অবনতি হচ্ছিল। সেই কারণে নাগপুরের সঙ্ঘচালক শ্রী বাবাসাহেব ঘটাটে অনুরোধ করেন যে পুনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি কিছু দিন দেওলালীতে এসে থাকুন। অন্য সমস্ত কার্যকর্তারা এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। ফলে, একবার আট-দশ দিন সেখানে থাকার কথা ডাক্তারজী মেনে নিলেন।

শ্রী ঘটাটে নাসিক থেকে আট-ন মাইল দূরে দেওলালীতে একটি বাংলো ভাড়া করেছিলেন এবং নাগপুরের ভীষণ উত্তাপ থেকে রেহাই পাবার জন্য সেখানে সপরিবারে বাস করছিলেন। দেওলালীর বাড়ীটা বেশ নিরিবিলি স্থানে অবস্থিত ছিল এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে জলবায়ু অনুকূল ছিল। ধোণ্ডী-মার্গের একেবারে পশ্চিমে দক্ষিণমুখী এই বাড়ীর সামনে খোলা মাঠ ছিল। এত ভীষণ গরমেও প্রচুর লাল গোলাপে চারিদিকে স্নিগ্ধ সুবাস ছড়িয়ে পড়ছিল। উঠোনে ফোয়ারার পাশে নিমগাছে সাদা নিমফুলের সুগন্ধে বাতাস ভরে উঠেছিল।

নাসিক ও দেওলালীতে সব সময় শীতল বাতাস বয়। আর এখন বর্ষা শুরু হয়ে যাওয়ায় কোথাও গরমের লেশমাত্র ছিলনা। ডাক্তারজীর সঙ্গে শ্রী গুরুজী ও শ্রী তাত্যা তেলঙ্গও এলেন। বলা বাহুল্য, সব ব্যবস্থাই সুন্দর ছিল। ডাক্তারজীর প্রয়োজনীয় ঔষধাদি দু-তিন দিনের মধ্যেই নাগপুর থেকে এসে গেল। বাংলো এত দূরে থাকা সত্ত্বেও নাসিক ও দেওলালীর স্বয়ংসেবকেরা সেখানে ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে আসত এবং সামনের বারান্দায় বসে ডাক্তারজী তাদের সঙ্গে কথা বলতেন। স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হওয়ায় ২৩শে জুন ডাক্তারজী নাসিক শাখায় গেলেন। তিনি নাসিকের সুরক্ষা মুদ্রণালয়ও দেখলেন, যেখানে সরকারী নোট ছাপা হয়।

দেওলালীতেও ডাক্তারজীর পত্রালাপ নিয়মিত চলছিল। নাগপুর থেকে কয়েকজন নতুন কার্যকর্তার সঙ্ঘকার্যের প্রচারের জন্য বাইরে যাওয়ার কথা ছিল। ডাক্তারজী দেওলালী থেকেই নির্দেশ দিলেন যে তাদের শ্রী বাবাসাহেব আপটে ও শ্রীআপ্পাজী জোশী যথাযোগ্য স্থানে নিযুক্ত করুন। এই সময় তিনি বেশীর ভাগ চিঠি-পত্র শ্রীগুরুজীকে দিয়েই লেখাতেন। ডাক্তারজীর স্বাস্থ্যের যতটুকু উন্নতি হচ্ছিল, তার চেয়ে বেশী ভাল বলে তিনি সকলকে জানাতেন। তিনি তাড়াতাড়ি নাগপুরে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। দেওলালীতে বসে চারদিকের কাজের দেখাশোনা করা সম্ভব ছিলনা, সেই কারণে তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্য তাঁর সহকর্মীদের দৃষ্টিতে তাঁর নাগপুর যাত্রা স্থগিত হওয়ার কারণ যাতে না হয়ে ওঠে, সেই জন্য তিনি সকলের মনে এই ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করছিলেন যে তাঁর শরীর ভাল হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, তিনি জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে দেওলালী থেকে যাত্রা করে চালিশগাঁও, ভুসাবল, অকোলা, মূর্তিজাপুর,

ওয়ার্ধা ইত্যাদি স্থান পরিদর্শন করে ২০ই জুলাই নাগপুরে পৌঁছবেন বলে কার্যক্রম স্থির করে পত্রও পাঠিয়ে দেন।

নাগপুর রওনা হওয়ার আগে নাসিকের কার্যকর্তাদের অনুরোধে সেখানেও যাওয়া আবশ্যক ছিল। অতএব, তাঁদের সূচনা অনুযায়ী শ্রী গুরুজী ১লা জুলাই নাসিকে গেলেন। পর দিন প্রভাত শাখার কার্যক্রম শেষ হবার পর সেখানকার অধিকারীদের দু ঘণ্টা পরেই স্বয়ংসেবকদের সমবেত করার নির্দেশ দেওয়া হল। পুনার মতই নাসিকেও স্বয়ংসেবকেরা সকাল নটায় 'শিবাজী উদ্যানে' সমবেত হল। সেই সময় ডাক্তারজীও দেওলালী থেকে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি এই ধরণের কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে ভাষণ দিলেন।

সেদিন দুপুরে শ্রী কেশব জগন্নাথ (কাকা রাও) আকুত, উকিলের গৃহে ডাক্তারজীর ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। দশ-পনের জনের খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সকলেই বেশ তৃপ্তি সহকারে ভোজন করছিলেন। কিন্তু পংক্তির এক কোনায় বসে ডাক্তারজী হেলান দিয়ে বসেছিলেন এবং অন্যান্য সময়ের মত কথা-বার্তাতেও তেমন অংশ নিচ্ছিলেন না। আসলে তাঁর খুব জ্বর ছিল। সারা শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তাঁর জন্য অন্য সকলের আনন্দ যাতে মাটি না হয়ে যায়, তাই সকলের সঙ্গে ভোজনে বসেছিলেন। কিন্তু এত করা সত্ত্বেও তাঁর মৌনতা ও অস্বাভাবিক অবস্থা তাঁর নিকটে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁদের চোখ এড়ায়নি। ভোজনের পরেই ডাঃ গোবিন্দরাও দামলে তাঁর শরীরে হাত দিয়ে দেখলেন শরীর খুব গরম। থার্মোমিটার দিয়ে দেখা গেল তাঁর ১০৩° জ্বর। তখনই ভিতরের ঘরে বিছানা পেতে তাঁকে শোয়ানো হল এবং ডাঃ দামলে ঔষধ ও উপচারের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর লোক-সংগ্রাহক স্বভাবের দরুন ডাক্তারজীকে কত কষ্ট সহ্য করতে হত, এই ঘটনা থেকেই সেকথা জানা যায়।

সন্ধ্যায় তাঁকে দেওলালীর বাংলোতে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর জ্বর ও দুর্বলতা বাড়তে থাকল এবং এই জ্বরে ডাক্তারজীর 'ডবল নিউমোনিয়া' হয়েছে বলে জানা গেল। তাঁর চিকিৎসাদির জন্য নাসিক থেকে ডাঃ গোবিন্দরাও দামলে এবং ডাঃ পাণ্ডুরঙ্গরাও চোভে দিনে দু বার দেওলালী আসতেন। তাঁদের নির্দেশমত ঔষধাদি ঠিকমত দেওয়ার ব্যাপারে শ্রীগুরুজী ও শ্রীতেলঙ্গ দুজনেই লক্ষ্য রাখতেন। তাঁদের সাহায্যের জন্য স্বয়ংসেবকরাও নাসিক থেকে আসত। বর্ষার দরুন রাস্তা জল-কাদায় ভর্তি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু স্বয়ংসেবকেরা জল-কাদা, ঝোপ, কাঁটা কোন কিছুতেই ভয় না পেয়ে প্রতিদিন সাইকেলে আসত। কিন্তু এত উদ্বেগ ও পরিচর্যা সত্ত্বেও ডাক্তারজীর কষ্ট বাড়তেই থাকল। একদিন অবস্থা এত খারাপ হয়ে গেল যে সকলে ঘাবড়ে গেলেন। জ্বর খুব বেশী বৃদ্ধি হল এবং ডাক্তারজী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। নাসিকের ডাক্তাররা শ্রী গুরুজীকে ডেকে বললেন, "এঁর আত্মীয়রা কোথায় আছেন তাঁদের এরকম অবস্থার খবর দিলে ভাল হয়।" গুরুজী ভাবলেন যে নাগপুরে ডাক্তারজীর এই অবস্থার খবর দিলে চারদিকে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে যাবে। তাই তিনি বললেন, "আমরাই এঁর আত্মীয়।" তাঁরা ডাক্তারজীর সেবা-শুশ্রূষায় কোন ত্রুটি ঘটতে দেননি। রাতদিন অষ্টপ্রহর তাঁর খাটের কাছেই বসে থাকতেন এবং অন্যান্য স্বয়ংসেবকদের সাহায্য নিয়ে সবরকম

শুশ্রূষা করতেন। জল গরম করা, ওষুধ দেওয়া, পিঠে সেঁক দেওয়া, জ্বর দেখা, কাপড়-জামা পাল্টে দেওয়া প্রভৃতি সবরকম সেবা-শুশ্রূষা করতেন। কখনো দু-এক ঘন্টা ঘুম হল তো ভাল, নয়তো তাও হতনা অনেক সময়। শ্রীগুরুজীর সেবার কথা বলতে গিয়ে নাসিকের জনৈক বয়োবৃদ্ধ উকিল বলেছিলেন যে "ডাক্তারজীর সব কাজ গুরুজী পাঠশালার ছাত্রের মত তৎপরতার সঙ্গে করতেন।"

ডাক্তারজীর এই গুরুতর অসুখের দুই-তিন দিন বড় উদ্বেগের মধ্যে কাটল। কিন্তু এই সময় ডাক্তারজীর হৃদয়ের অন্তরঙ্গ দর্শন শ্রীগুরুজী লাভ করলেন। জ্বরের প্রকোপে অচৈতন্য অবস্থাতে ডাক্তারজীর মুখ থেকে মাঝে-মাঝে যে অস্ফুট কথা উচ্চারিত হত, তা থেকে তাঁর মনে সঙ্ঘকার্যের জন্য তাঁর আকুলতা প্রকাশ পেত। "চল, আমাকে ঠিক সময় পৌঁছতে হবে। নগর থেকে কোন চিঠি-পত্র এলনা কেন?" ইত্যাদি বাক্য মাঝে-মাঝে শোনা যেত। অস্থিরতার কারণে ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করতেন। শ্রীগুরুজী তখন তাঁর গায়ের চাদর ঠিক করে দিতেন। ডাক্তারজী তাঁর পূর্ণ যৌবনকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিপ্লবী পরিকল্পনাগুলিকে সফল করার জন্য তাঁর জীবনকে অত্যন্ত গুপ্ত কার্যকলাপে নিয়োগ করেছিলেন। সেই সব যোজনা সফল হয়নি, কিন্তু তাঁর স্মৃতিগুলি অন্তরের গভীরে কোন স্থানে চাপা ছিল। ডাক্তারজীর প্রারব্ধ সংগঠনও অসম্পূর্ণ লক্ষ্যগুলিকে পূরণ করার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছিল। অত্যন্ত আশ্চর্যজনক তথা অসাধারণ ব্যাপার ছিল এই যে এমন প্রবল জ্বরের প্রকোপের মধ্যেও তাঁর মনের গভীরের সংযমের যবনিকা ছিন্ন হয়নি। অন্যথায়, অতি যত্নের সঙ্গে যে ভাবনাগুলি চেপে রেখেছিলেন, সেগুলি বাণীর সংযমের বাঁধ ভেঙে প্রবাহিত হয়ে পড়তে পারত। ডাক্তারজীর অন্তর্চেতনার উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ এতই গভীর ছিল যে এই অচৈতন্য তথা প্রলাপের অবস্থাতেও তা এতটুকু বিচলিত হয়নি। কিছু মানুষ তাদের জীবনের আচরণে কেবল নীতি হিসাবে উপরে-উপরে ভালোমানুষী তথা সদ্ব্যবহার দেখিয়ে থাকে। উপরে মিষ্টি, ভিতরে তিক্ত — অনেক লোকেরই স্বভাবের মধ্যে এইরূপ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কিন্তু ডাক্তারজী এই লৌকিক আচরণের দিক থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন। সেই কারণেই ভীষণ জ্বরে অচৈতন্য অবস্থার মধ্যেও তাঁর মুখ থেকে যে ভাঙা-ভাঙা কথা শোনা যেত তার মধ্যে কোন ব্যক্তির প্রতি অনুদারতা অথবা ঈর্ষার মনোভাব কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যক্ত হতনা। ডাক্তারজীর মনের দৃঢ়তা তথা বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে শ্রীগুরুজীর মনে এমনই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে তিনি একেবারে তাঁরই একান্ত ভক্ত হয়ে পড়লেন। দেওলালীর এই পনের-ষোল দিনের অভিজ্ঞতার কথা পরবর্তীকালে এক সময় তিনি এইভাবে বর্ণনা করেছিলেন, "মানুষ পরখ করার ব্যাপারে আমার দৃষ্টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। একেবারে প্রথম দিকে ডাক্তারজী সম্বন্ধে আমার মনে শুধু এই ধারণা ছিল যে তিনি এক অভিনব পদ্ধতিতে কর্মরত নেতা—এ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু মাত্র পনের-ষোল দিনের এই অবিরাম সান্নিধ্য লাভের পর আমি প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম যে সাধারণ মানুষের মত আচরণকারী এই পুরুষটির মধ্যে অবশ্যই কোন অসাধারণত্ব আছে।"

ডাক্তারজী ডবল 'নিউমোনিয়ায়' অসুস্থ থাকার অবস্থার মধ্যেই দেশপ্রেমিক শ্রী সুভাষচন্দ্র বসুর পক্ষ থেকে ডাক্তারজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় নিশ্চিত করার জন্য শ্রী বালাজী হুদ্দার

দেওলালী এলেন। তাঁর সঙ্গে শ্রী বসু বোম্বাই-এর ডাঃ বসন্তরাও রামরাও সঞ্চগিরীকেও পাঠিয়েছিলেন। দুজনে যখন দেখা করতে এলেন তখন ডাক্তারজীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের দুজনের কথা মন দিয়ে শোনেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল এই যে সুভাষচন্দ্র বসু যুদ্ধের পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চান।

সবশুনে ডাক্তারজী জিজ্ঞেস করলেন, "এটা ঠিক যে পরিস্থিতি অনুকূল হয়ে উঠছে, কিন্তু বিপ্লবের জন্য আপনাদের প্রস্তুতি কী রকম? প্রথমে অন্ততঃ ৫০ শতাংশ প্রস্তুতি অবশ্যই থাকা চাই। এ দিক থেকে সুভাষবাবুর কাছে এখন কত জন মানুষ আছে? নিজেদের প্রস্তুতি ব্যতীত স্বাধীনতার জন্য শুধু অপরের উপর নির্ভর করে কাজ হবেনা।"

সন্দেহ নেই যে সেই সময় ডাক্তারজীর অবস্থা আলাপ আলোচনা করার মত ছিলনা। সেই কারণে মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যেই শ্রীহুদ্দার ও ডাঃ সঞ্চগিরী বিদায় গ্রহণের জন্য উঠে দাঁড়ালেন, তখন ডাক্তারজী — "আবার একদিন শান্তিপূর্বক আলোচনার জন্য আপনি নাগপুরে আসুন" — এই বলে ডাঃ সঞ্চগিরীকে আগ্রহপূর্বক নিমন্ত্রণ জানালেন।

এই ঘটনা সম্ভবতঃ ৮ বা ৯ জুলাই-এর, কারণ ঐ সময় সুভাষবাবু বোম্বাইতে ছিলেন। কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হবার পর তিনি "ফরোয়ার্ড ব্লক" গঠন করে ইংরেজদের সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। স্বভাবতঃ তাঁর দৃষ্টি ডাক্তারজী দ্বারা নির্মিত ধ্যেয়নিষ্ঠ ও অনুশাসনপূর্ণ তরুণ-সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এমনিতেও এই দুই দেশভক্তেরই মূল প্রকৃতি ছিল বিপ্লবী, এবং সেই কারণে দুজনের মিলন ঘটানোর প্রচেষ্টার মধ্যে আশ্চর্যের কথা ছিল না। কিন্তু এই দুজনের মধ্যে সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা থাকলেও, ঐ সময় অথবা পরেও হয়ে ওঠেনি, এটাকে নিয়তির বিধান বলেই মেনে নিতে হয়।

শ্রী বালাজী হুদ্দার ও ডাঃ সঞ্চগিরী নাসিক থেকে ফেরার চার দিন পর ডাক্তারজীকে একটি পত্র লেখেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই পত্রটি হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে যায়নি। পত্রটি ১২ই জুলাই লেখা হয় এবং নাগপুরে পৌঁছায় ১৮ই জুলাই। সেই পত্রে তাঁরা লেখেন, "আমরা যে কাজের জন্য আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম তার তীব্র আবশ্যকতার বিষয় আপনি সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন। আপনি নাগপুরে যাবার জন্য যে নিমন্ত্রণ দিয়েছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু অপ্রত্যাশিত বাধার দরুন অন্ততঃ ঠিক এখনই নাগপুরে যাওয়ার চিন্তা স্থগিত রাখতে হচ্ছে। আপনি কি ২০ শে জুলাই বোম্বাই আসতে পারবেন? আমাদের প্রবল ইচ্ছা যে আমাদের সঙ্গে আপনি এখানে দেখা করুন। আমাদের বিশ্বাস, আপনি আমাদের হতাশ করবেন না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ২০ তারিখ রাত্রে এখান থেকে যাবেন। শুধু একদিনের জন্যই আসুন। আমাদের সকলের মঙ্গলের দৃষ্টিতে নিশ্চিতই কোন যোজনা বানাতে পারবেন।" বলা বাহুল্য, এই 'সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি' ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু।

ডাক্তারজীর জ্বর ধীরে-ধীরে কমে আসছিল। কিন্তু দুর্বলতা ছিল অত্যধিক। ডাক্তারজীর এমন গুরুতর তথা চিন্তাজনক অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও শ্রীগুরুজী যে সব পত্র নাগপুরে পাঠিয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যে অবস্থা কত উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছিল, তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কারণ, তাঁর বিশ্বাস ছিল যে নাসিকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ডাক্তারদের প্রাণপণে

করা উপযুক্ত চিকিৎসা, সঠিক নিদান এবং কুশল সেবা-শুশ্রূষার পর ডাক্তারজী নিশ্চিতই সেরে উঠবেন। তাঁর এই বিশ্বাস যথার্থই সত্য হল। জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পর ডাক্তারজীকে ১২ই জুলাই নাসিকে নিয়ে যাওয়া হল। এই স্থান পরিবর্তনের প্রধান কারণ ছিল এই যে ডাঃ দামলে ও ডাঃ চোভেকে প্রতিদিন ৮-৯ মাইল দূরে আসতে হত। তাঁদের এই কষ্ট লাঘব করা আবশ্যক ছিল। সেই সঙ্গে, নাসিকের স্বয়ংসেবকদের পক্ষেও এখন ডাক্তারজীর সেবা-শুশ্রূষার দিকে নজর দেওয়া আরো সহজ হল।

বোম্বাই-আগ্রা রোডের উপর 'জয় ভিলা' নামক বাংলোর নিচের তলার তিনটে ঘর ডাক্তারজীর থাকার জন্য নেওয়া হল। জ্বর ছেড়ে যাবার পর ক্রমে স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে লাগল। সেবা-শুশ্রূষার জন্য স্বয়ংসেবকদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। ডাক্তারজীর পিঠে সব সময় ব্যথা থাকত। সেখানে সেঁক দেবার জন্য একজন স্বয়ংসেবক প্রতিদিন সকাল ৯টা ও বিকেলে সাড়ে চারটের সময় আসত। কিন্তু সময়-নিষ্ঠা তার স্বভাবে ছিলনা। তবু দেরীতে এসেও সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলত — "কোন প্রশ্ন নয়, নটা মানে নটা।" তার এই অভিনব ব্যবহার দেখে ডাক্তারজী তার কথাটা ধরে নিলেন। পরে সে দেরী করে এলে ডাক্তারজী নিজেই তাকে "নটা মানে নটা" বলে হাসতে-হাসতে স্বাগত জানাতেন। তাঁর আগ্রহ ছিল যে প্রত্যেক ছোট-ছোট বিষয়ও ঠিক-ঠিক তথা উপযুক্তরূপে হওয়া উচিত। একবার তাঁর রুমাল এক স্বয়ংসেবক ঠিকমত পরিষ্কার করেনি। অসুস্থ অবস্থাতেও রুমাল আলনা থেকে নামিয়ে স্নানঘরে গিয়ে নিজে সেটা পরিষ্কার করে কেচে শুকোতে দিলেন।

ক্রমে ডাক্তারজীর ঘরে স্বয়ংসেবকদের আসা-যাওয়া শুরু হল। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর ঘরের আলো রাত বারোটা পর্যন্ত জ্বলতে দেখা গেল। তাঁর চিকিৎসকরা একথা জানতে পেরেই শ্রীগুরুজীকে বললেন, "এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকা ঠিক নয়। আপনি ওঁকে তাড়াতাড়ি শুতে দিন।" একথা শুনে গুরুজী উত্তর দিলেন, "এ কাজ আমার দ্বারা হবেনা। আপনারাই গিয়ে যদি ডাক্তারজীকে বলেন, তাহলে ভাল হয়।" অতএব, রাত্রের ভোজনের পরে এই দুই ডাক্তার ডাক্তারজীকে বেশী রাত পর্যন্ত জেগে না থাকার কথা বলতে এলেন। সেই সময় ডাক্তারজীর ঘরে অনেক স্বয়ংসেবক বসেছিল এবং কথা-বার্তা চলছিল। সেদিনও রোজকার মত একটা বিষয় থেকে আর একটা বিষয় নিয়ে এমন প্রাণবন্ত আলোচনা চলতে লাগল যে যাঁরা ডাক্তারজীকে জেগে থাকতে বারণ করতে এসেছিলেন, সেই ডাক্তাররাও তাতে মজে গেলেন। যখন বারোটার ঘন্টা বাজল, তখন তাঁদের খেয়াল হল যে আমরা কী করতে গিয়েছিলাম, আর কী হয়ে গেল। তারপর যখন আধ ঘন্টা-এক ঘন্টা পরে সব স্বয়ংসেবকেরা বাড়ী যাওয়ার জন্য উঠল, তখন শ্রীগুরুজী ঐ ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করলেন, "বলুন ডাক্তার, বৈঠক কেমন হল?" এই প্রশ্নের পিছনে লুকানো ব্যঙ্গ বুঝতে পেরে তাঁরা মাথা নিচু করে চলে গেলেন।

নাগপুরের ঠিকানায় ডাক্তারজীর নিকট প্রেরিত পত্রগুলি তাঁর নাসিকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হত। সেই সব পত্রে তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তা প্রকাশ করার সাথে-সাথে কার্যবৃদ্ধির সংবাদও থাকত। নরসোবা কী বাড়ীর এক স্বয়ংসেবক লিখেছিল যে "আপনার প্রাণ উদীয়মান

হিন্দু রাষ্ট্রের নবচৈতন্য। অতএব আপনি বেশী চিন্তা করবেন না।" শ্রীগুরুজীকে পাঞ্জাবের প্রবাসে প্রেরণ এবং সঙ্ঘের কাজ শুরু করার জন্য অধিক সংখ্যক কার্যকর্তার দাবী জানিয়ে পত্রও আসত। সুরাট ও মাদ্রাজে কাজ শুরু হওয়ার আনন্দদায়ক সংবাদও ডাক্তারজী নাসিকেই পেয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডে শিক্ষালাভ করতে যে স্বয়ংসেবকেরা গিয়েছিল, তাদের গুরুদক্ষিণা সংক্রান্ত পত্রালাপের কথাও ডাক্তারজীকে জানানো হয়েছিল। জবলপুর থেকে প্রেরিত এক পত্রে ডাক্তারজীর নিকট প্রার্থনা করা হয়েছিল যে সেখান থেকে একটি হিন্দুত্ববাদী মাসিক পত্র প্রকাশিত হবে, সেটি যেন সঙ্ঘে স্থান পায়। এবং তার জন্য একটি উপযুক্ত নামও যেন তিনি ঠিক করে দেন।

অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে হিন্দুত্ব এবং হিন্দুরাষ্ট্র সংক্রান্ত প্রত্যেকটি কাজ ও আন্দোলন ডাক্তারজীকেই তাদের একমাত্র ভরসা বলে মনে করতে লাগল। হিন্দুস্থানের সৈন্যবিভাগের অফিসাররা ভারতীয়দের সৈন্যবাহিনীতে ভর্তির জন্য নিযুক্তি সমিতিতেও ডাক্তারজীকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য নিমন্ত্রিত করেছিলেন। তাঁরা জানতে চেয়েছিলেন যে ৩রা জুলাই থেকে ২১শে জুলাই-এর মধ্যে কবে তিনি সিমলা আসতে পারবেন। কয়েকটি জায়গার স্থানীয় দলগুলির সঙ্ঘের সঙ্গে মিশে যাওয়ার সংবাদও পাওয়া যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে সেখানকার পরিস্থিতিতে ভিন্ন নামে সঙ্ঘকার্য আরম্ভ করার সংবাদও পত্রের মাধ্যমে জানা যাচ্ছিল। গোয়ালিয়রে সঙ্ঘের কাজ প্রথম-প্রথম 'রাণোজী স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' নামে শুরু হল। কলকাতায় সঙ্ঘের শাখা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে ডাঃ সন্তোষ কুমার মুখার্জী ডাক্তারজীকে লিখলেন, "আমরা উন্নতি করে চলেছি এবং বাংলায় রাঃ স্বঃ সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে।"

অবিরাম এই যে সব চিঠি-পত্র আসছিল, শ্রীগুরুজী ডাক্তারজীর সঙ্গে পরামর্শ করে সেগুলির উত্তর দিতেন। বেশী গুরুত্বপূর্ণ পত্রগুলি সকলে শুয়ে পড়ার পর শ্রীগুরুজী স্বয়ং ডাকঘরে নিয়ে যেতেন ডাকে দেবার জন্য। কখনো-কখনো গুরুজী ডাক্তারজীর পছন্দের জিনিষও আতিথেয়তার এক্তিয়ারে আনার পরামর্শ দিতেন। জীবনের পথ সুনিশ্চিত হয়ে যাবার দরুন শ্রীগুরুজীর মধ্যে এখন মনের স্থিরতা, ব্যবহারে তৎপরতা এবং স্বভাবে উৎসাহ সবই এক সঙ্গে দেখা যেতে লাগল। শ্রী গুরুজীর অন্তঃকরণে এখন সঙ্ঘ তথা ডাক্তারজী বিরাজ করছিলেন। এখন তাঁর একমাত্র উপাস্য হয়ে উঠেছিলেন ডাক্তার হেডগেওয়ার।

জুলাই-এর শেষে যদিও ডাক্তারজীর স্বাস্থ্য ঠিক হয়ে গিয়েছিল, তথাপি নিশ্চিত করা হল যে একবার বোম্বাইতে গিয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া হোক। অতএব, ১লা আগষ্ট তাঁকে বোম্বাই নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে ডাঃ গিল্ডার, ডাঃ আঠলো প্রমুখ বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন, কিন্তু তাঁরা কোন বিশেষ নিদান করতে পারলেন না। ২২শে আগষ্টের পত্রে ডাক্তারজী লেখেন, "আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নাগপুরের লোকেদের যা অভিমত ছিল, বোম্বাই-এর ডাক্তারদেরও প্রায় সেই একই অভিমত। এক্স-রে ও ইলেক্ট্রো-কার্ডিয়োগ্রাফ করা হয়েছে, কিন্তু তাতে কোন দোষ পাওয়া যায়নি।" এই পরীক্ষার পর ডাক্তারজী ৫ই আগষ্ট নাসিকে গেলেন এবং ৬ই আগষ্ট সবার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ

করে নাগপুরে গেলেন। ডাক্তারজী এমন ভীষণ রোগ-সংকট থেকে মুক্ত হলেন, সেই কারণে ডাঃ গোবিন্দরাও নিজে থেকেই, ডাক্তারজী নাসিক থেকে বিদায় গ্রহণের আগে সকলকে মিষ্টান্ন বিতরণ করে আনন্দ প্রকাশ করেন। সেই সময় তিনি বলেন, "হিন্দুস্থানের মহামূল্য হীরে আমাদের কাছে ছিল, এখন আমরা তা ফিরিয়ে দিচ্ছি। ভালো করে সামলে রাখুন।"

ডাক্তারজী নাসিক থেকে ৭ই আগষ্ট নাগপুর পৌঁছলেন। পথেই তিনি এক দুঃসংবাদ জানতে পারলেন। নাগপুরে পৌঁছবার পর এক পত্রে শ্রীগুরুজী লেখেন, "আমরা নাগপুরে নির্বিঘ্নে পৌঁছেছি। প্রবাসে কিছুটা ক্লান্তি এলেও, স্বাস্থ্যের উপর কোন পরিণাম হয়নি। দিনাংক ৩-৮-৩৯ শ্রী নানাসাহেব টালাটুলে স্বর্গগত হয়েছেন। এই হৃদয়-বিদারক সংবাদ আমরা ভুসাবল স্টেশনে জ্ঞাত হলাম। এই দুঃসংবাদে ভীষণ মর্মাহত হলাম। পরম পূজনীয় ডাক্তারজীর যে কত দুঃখ হয়েছে ও হচ্ছে, তার বর্ণনা করা সম্ভব নয়।"

নাগপুরে ফিরে আসার কয়েক দিন পরে ডাক্তারজী নাসিকের শ্রী রাজাভাও সাঠেকে পত্র লেখেন। তাতে তিনি লেখেন, "আমার ও আপনাদের সকলের যে দীর্ঘকালীন সান্নিধ্য ঘটল, তার ফলে আমার নাসিক সম্বন্ধে কী উপলব্ধি হয়েছে, তা কথায় লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মনের কথা তো মনই বুঝতে পারে।" এ ধরণের ভাব গুরুজীর পত্রেও ব্যক্ত হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন, "ডাঃ দামলে এবং ডাঃ চোভে ডাক্তারজীর স্বাস্থ্য নিয়ে যে চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন সেই ঋণ পরিশোধ যোগ্য নয়।"

নাসিক থেকে ফেরার এক সপ্তাহ পরে ১৩ই আগষ্ট গুরু পূর্ণিমা উৎসব পালিত হয়। ঐ সময়ে ডাক্তারজী বাবাসাহেব ঘটাটেকে নাগপুরের সংঘচালক এবং শ্রীগুরুজীকে সরকার্যবাহ নিযুক্তির কথা ঘোষণা করেন। তিনি নিজের স্বাস্থ্যের গতিবিধি তখন থেকেই বুঝতে পারছিলেন। তাই একথা বলতে হয় যে, অখিল ভারতীয় সংগঠনের যে ভার তিনি বহন করে চলেছিলেন তা ক্রমে শ্রীগুরুজী যাতে বহন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই ছিল এই নিযুক্তি। দূরদর্শিতা ডাক্তারজীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

এই বছর পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে নাগপুরের গুরুদক্ষিণা মহোৎসবের সংবাদ বিভিন্ন প্রান্তের প্রধান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হোক। তদনুসারে, যে সকল সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাদের মধ্যে উল্লেখনীয় হল — 'ট্রিবিউন' (লাহোর), 'হিন্দু আউটলুক' (দিল্লী), 'লীডার' (প্রয়াগ), 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (কলকাতা), 'সাণ্ডে টাইম্স' (মাদ্রাজ), 'কেশরী', 'ত্রিকাল' এবং 'নাগরিক' (মহারাষ্ট্র)। ডাক্তারজীর চিন্তানুসারেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছিল। প্রকাশন ও প্রসিদ্ধি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী প্রথম থেকে নিশ্চিত ছিল। জনসাধারণের মনোবৃত্তিকে প্রভাবিত করার জন্য সংবাদপত্রের উপযোগিতা কিছুটা অবশ্যই আছে, কিন্তু একটি স্থায়ী এবং অনুশাসনপূর্ণ সংগঠন নির্মাণে তার কোন উপযোগিতা ও গুরুত্ব নেই। এর জন্য স্বয়ংসেবকদের নিত্য একত্রিত করে খেলাধূলা, লাঠি, সঞ্চলন, গীত, বৌদ্ধিক এবং প্রার্থনার মাধ্যমে সংস্কার করার কার্যক্রমই প্রভাবী বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। যা কিছু ঘটেছে, সেগুলিকে তৎক্ষণাৎ ছাপার প্রতি মানুষের ঝোঁক থাকার দরুন, আমরা মানা করলেও ওরা কিছু না কিছু ছেপে দেবে, এ কথা উপলব্ধি করে ডাক্তারজী ঠিক করলেন

যে যথেচ্ছ ও অবাস্তব তথা বিকৃত সংবাদ প্রকাশিত হওয়া অপেক্ষা, সঙ্ঘের দিক থেকে 'অধিকৃত' সংবাদই প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠানোর ব্যবস্থা করাই উপযুক্ত হবে। ১৯৩৯ সালে বহু প্রান্তে সঙ্ঘকার্যের বিস্তার হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই এই বছরের গুরুপূজা উৎসবের সংবাদ সেই সমস্ত প্রান্তের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশ করার কথা চিন্তা করা হল। তাঁর ব্যবহারের মধ্যে দুরাগ্রহ ও হঠকারিতা ছিলনা। পরন্তু তার মধ্যে পরিস্থিতির যথাযথ অনুমান করে তদনুসারে প্রামাণ্য ও কল্যাণকর নমনীয়তা ছিল।

২৯. রাজগিরিতে চিকিৎসা

নাসিক থেকে ফেরার পর পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর পক্ষে প্রবাস করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়েছিল, কারণ তাঁর স্বাস্থ্য অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন স্থান থেকে জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্রামের জন্য আসার নিমন্ত্রণ আসছিল, কিন্তু তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন যে আরাম করার মত সময় তাঁর কাছে নেই। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে তিনি স্বল্পকালের অতিথি। অতএব, তাঁর সম্পূর্ণ আচরণে অবশিষ্ট সমস্ত শক্তিকে ধ্যেয় পূর্তির জন্য নিয়োজিত করার সংকল্পই প্রকাশ পাচ্ছিল। শ্রী বাবাসাহেব ঘটাটেকে নাগপুরের সঙ্ঘচালক কিছুদিন পূর্বেই নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁকে সঙ্ঘকার্যের সঙ্গে নিকট থেকে পরিচয় করাবার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন কোন-না-কোন শাখায় নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবার কার্যক্রম তৈরী করা হয়েছিল। পত্রালাপ ও দেখা-সাক্ষাৎ যথাসম্ভব অব্যাহত ছিল। তথাপি তার অধিকাংশ ভার এখন শ্রীগুরুজী উৎসাহপূর্বক গ্রহণ করেছিলেন।

নাসিকে অসুস্থতার পূর্বে ডাক্তারজীর মনে মাঝে-মাঝেই এই আশংকা দেখা দিত যে গুরুজী এখন বেশ উৎসাহের সঙ্গে সঙ্ঘের কাজে সংলগ্ন হয়েছেন, কিন্তু না-জানি কোন দিন আবার তাঁর মনে অন্তর্নিহিত বৈরাগ্যবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে এবং তিনি কাজ থেকে দূরে সরে যাবেন। তাঁর মনের এই ছট্‌ফটানি মাঝে-মাঝে প্রকাশও হয়ে পড়ত। কিন্তু ১৯৩৯ সালে তাঁর এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হচ্ছিল যে গুরুজীর জীবন এখন সঙ্ঘময় ও কর্মযোগীই থাকবে। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তিনি শ্রীগুরুজীকে সরকার্যবাহ নিযুক্ত করেছিলেন।

শ্রীগুরুজীও ডাক্তারজীর মধ্যে বিচরণশীল হিন্দু রাষ্ট্রপুরুষের আকাঙ্ক্ষার দর্শন লাভ করেছিলেন এবং তিনি মনে মনে নিজের সম্পূর্ণ তনু-মন-ধন এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য সমর্পণ করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। ডাক্তারজী এখন নিজের শরীরকে মাতৃভূমির সেবার কাজে শক্তিহীন ও অক্ষম বলে অনুভব করছিলেন। এইসময় একথা বলাই যুক্তিসঙ্গত হবে যে ডাক্তারজীর মনের সঙ্গে একরূপ হয়ে শ্রীগুরুজী তাঁর তরুণ শরীর তাঁর চরণে উৎসর্গ করেন। এই প্রকার অসামান্য, বিশুদ্ধ তথা অব্যাভিচারী নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রী গুরুজী বিভিন্ন প্রান্তে প্রবাস করে সেই সমস্ত স্থানের সঙ্ঘকার্যে অধিক গতি ও উৎসাহ সৃষ্টির প্রয়াস আরম্ভ করে দিলেন। আগষ্ট, ১৯৩৯-এ তিনি অধিকারী শিক্ষণ বর্গের' জন্য পাঞ্জাবে গেলেন এবং বিভিন্ন স্থানের শাখাগুলি পরিদর্শন করেন। লাহোর থেকে ২৫ শে আগষ্ট লিখিত পত্রে তিনি সেখানে গোঁড়া মুসলিম মদান্ধ প্রবৃত্তি হতে উৎপন্ন আন্দোলনের কথা ডাক্তারজীকে জানালেন। খাকসার সংস্থার কথা জানিয়ে তিনি লেখেন, "খাকসারদের কারণে আতঙ্কের দরুন এখানে বহু দল গজিয়ে উঠছে।" হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে যে খাকসার সংগঠনের নির্মাণ হয়েছে, তার কারণে

ওখানে সমাজের মধ্যে অনেকগুলি দলের জন্ম হলেও, ডাক্তারজীর মতে ঐ সব দলগুলির মধ্যে একমাত্র দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় সংগঠনই সাকার হওয়া উচিত। তিনি তাঁর এই অভিপ্রায় ঐ সময়ে ব্যক্তও করেছিলেন।

কলকাতার কাজের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার এবং গতি প্রদান হেতু ডাক্তারজী এই বছরের মাঝামাঝি শ্রী বিট্ঠলরাও পাতকীকে সেখানে প্রচারক রূপে নিযুক্ত করেন। শ্রী পাতকীর কলকাতা যাত্রার পূর্বে তিনি তাঁকে সতর্ক করে দেন যে বিদেশী ইংরাজ সরকার প্রথমতঃ তরুণদের প্রত্যেকটি সংগঠনের বিষয় শংকিত থাকে, তার উপর বাংলায় গুপ্ত বিপ্লবী কার্যকলাপের বিশেষ জোর থাকার কারণে সেখানে তাদের আরো কড়া নজর থাকবে। অতএব, যারা সম্পর্কে আসবে সেরকম প্রত্যেক ব্যক্তির পুরো চব্বিশ ঘণ্টার গতিবিধি সম্বন্ধে সূক্ষ্মতার সঙ্গে জ্ঞাত হবার পরেই তার সঙ্গে যথোচিত ব্যবহার করতে হবে। একথা বলার পর তিনি বলেন, "প্রত্যেকটা পাথরের নিচে বিছে লুকিয়ে আছে, এ কথা বুঝে আচরণ করলে সঙ্ঘের স্থায়ী কার্য অন্য গুপ্ত আন্দোলনের সম্পর্কের দরুন বাধাগ্রস্ত হবে না।"

ডাক্তারজী কাজের প্রয়োজনীয়তা কতখানি উপলব্ধি করতেন, তা তাঁর প্রতিটি শব্দ থেকে ব্যক্ত হত। শ্রীগুরুজীর নিকট লাহোরে প্রেরিত পত্রে তিনি লেখেন, "..... যথাসম্ভব অল্প সময়ে যত বেশী সম্ভব কাজ সম্পূর্ণ করে কলকাতায় যান। এই দিক থেকে পাঞ্জাব, বারাণসী, দিল্লী, বিহার প্রভৃতি সমস্ত স্থানে কতখানি সময় দিতে হবে, তার বিষয়ে যথাযথ বিবেচনা করে কার্যক্রম নিশ্চিত করুন এবং সে সব স্থানে জানিয়ে দিন।" ১৯৩৯-এর আগষ্ট মাসে সর্বত্র সঙ্ঘকার্যে জোয়ার আসছিল। অনেক প্রধান নগরের গুরুদক্ষিণার অঙ্ক হাজারের ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। চতুর্দিকে শাখাসমূহের সাধারণ বাতাবরণও প্রভাবী হয়ে ওঠার লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। ডাক্তারজীর ৩১ শে আগষ্ট লেখা এক পত্রে এই প্রগতি স্পষ্টরূপে প্রতিধ্বনিত হয়। শ্রী দাদারাও পরমার্থকে তিনি লেখেন, "পাঞ্জাব, সংযুক্ত প্রান্ত, বিহার, বাংলা এবং করাচী থেকে উৎসাহবর্ধক সংবাদ আসছে। লাহোরের ওঃ টিঃ সিঃ তে ত্রিশ স্থান থেকে দেড়শোরও বেশী স্বয়ংসেবক এসেছে এবং এ বছর পাঞ্জাবে সঙ্ঘের বাতাবরণে চতুর্দিক গুঞ্জিত করে দেবার সংকল্প করা হয়েছে। 'আর্যন লীগ'-এর বৈঠক নাগপুরে হওয়ার দরুন অনায়াসেই পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রান্তের অনেক অখিল ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাওয়া গেল। তাঁরাও নিজ-নিজ স্থানে সঙ্ঘকার্য বৃদ্ধি করতে স্বীকৃত হয়েছেন। মনে হয়, তাঁদের উপর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভাল পরিণাম হয়েছে। আপনি জানেন যে এখান থেকে চারজন কার্যকর্তা বিহারে গেছেন। তাঁরা সেখানে অবিরাম পরিশ্রম করে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। শ্রী মাধবরাওজী গোলওয়ালকরের শীঘ্রই সেখানে যাবার কথা। আপনার উপর মাদ্রাজ প্রান্তের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা আপনি সফলতাপূর্বক নির্বাহ করবেন, সে বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।"

১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করার সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। এই যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডও ঝাঁপিয়ে পড়ে। শত্রুর সংকটকাল পরাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে নিজেদের উদ্ধারের সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। এই নীতি অনুযায়ী হিন্দুস্থানেও দেশভক্তদের

আকাঙ্ক্ষাও বলীয়ান্ হয়ে উঠল এবং সম্পূর্ণ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে বিদ্রোহ করার নিজেদের সামর্থ্য অনুমান করে ভাবী পদক্ষেপের কথা বিবেচনা করা শুরু হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্বীপান্তরে কাল-কুঠুরীতে নির্বাসন-দণ্ড ভোগ করে আসার পর স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর এই সময় হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন। তিনি যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির বিষয় আলোচনার জন্য সভার কার্যকারিণীর জরুরী বৈঠক ১০ই সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে আহ্বান করেন। ডাক্তারজী হিন্দু মহাসভার কার্যকারিণীর সদস্য ছিলেন না। সঙ্ঘকার্যের ক্রমবর্ধমান বিস্তার এবং তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্যের দরুন তাঁর পক্ষে অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেওয়া সম্ভবই ছিল না। কিন্তু ব্যারিস্টার সাভারকর তাঁকে বিশেষ পত্র লিখে আমন্ত্রণ জানালেন। "..... আপনি বিশিষ্ট অতিথি রূপে এসে পথ-প্রদর্শন করুন", ব্যাঃ সাভারকর তাঁর নিমন্ত্রণের পত্রে লেখেন। কিন্তু ডাক্তারজী যেতে পারেন নি।

বোম্বাই-এর উক্ত বৈঠকে হিন্দু মহাসভা কার্যকারিণী 'হিন্দু মিলিশিয়া' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এবং প্রস্তাব করা হল যে ডাক্তারজী এই বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করুন। এই বাহিনীর যোজনা তৈরী করার জন্য পুনায় ৮ই অক্টোবর রাও বাহাদুর ভাস্কররাও জাধব, ডাঃ বাবাসাহেব আম্বেডকর, স্যার গোবিন্দ রাও প্রধান, শ্রী আপ্পাসাহেব ভোপটকর প্রমুখ নেতাদের এক বৈঠক হয়। ডাঃ মুঞ্জে একটির পর একটি পত্র লিখে ডাক্তারজীকে অবশ্যই আসার অনুরোধ করলেন। এ বিষয় ডাক্তারজী তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে দিনাংক ৩০শে সেপ্টেম্বর ডাঃ মুঞ্জেকে পত্র পাঠান। তাতে তিনি লেখেন, "... আমার স্বাস্থ্য প্রবাস করার উপযুক্ত না থাকায় আপনার আদেশ অনুসারে ৮ই অক্টোবর পুনাতে যেতে পারব না। যদি আপনি বলেন যে বৈঠক নাগপুরেই করা হোক, তাহলে সেই দিনই রাঃ স্বঃ সঙ্ঘের নাগপুরের জেলা কার্যকর্তাদের বৈঠক রাখা হয়েছে। আমার শরীর এখন একেবারেই ভাল থাকে না। এই কারণে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিজের উপর নিতে পারছি না। অতএব, 'হিন্দু মিলিশিয়া'-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যাপারে আপনি আমার নাম রাখবেন না। নাম না থাকলেও, আমার দ্বারা যতখানি সাহায্য করা সম্ভব তা আমি অবশ্য করব।"

ডাক্তারজী এমন স্পষ্ট ভাষায় তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করার পরেও ডাঃ মুঞ্জে তাঁর আগ্রহ ছাড়েননি। এক পত্রে তিনি লেখেন, "... প্রকৃত সত্য হল এই কাজ করার মত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি মহারাষ্ট্রে নেই।" তাঁর দ্বিতীয় পত্রে তিনি ডাক্তারজীকে লেখেন যে তাঁর প্রস্তাব বড়োদার নানাসাহেব শিন্দেও সমর্থন করেছেন। নিজের প্রাণের থেকেও বেশী যত্ন সহকারে তিনি যে সঙ্ঘকার্যের বৃদ্ধি করেছেন, তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তি এখন আর তাঁর শরীরে অবশিষ্ট নেই — সর্বক্ষণ এই চিন্তার কারণে ডাক্তারজী আরো অসুস্থ থাকতেন। এই ধরনের আগ্রহ তাঁকে অধিকতর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলত, তাই নিরুপায় হয়ে তাঁকে বার-বার জানাতে হত যে, "কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" কিন্তু এত করে বলা সত্ত্বেও 'হিন্দু মিলিশিয়া'র মহারাষ্ট্র সমিতিতে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হল এবং ১২ই অক্টোবরের পত্রে শ্রী শঃ রাঃ দাতে তাঁকে একথা জানিয়ে দিলেন।

ডাক্তারজীর পক্ষে এটা কোন আনন্দ বা সন্তোষের বিষয় ছিলনা যে তিনি ছাড়া অন্য কেউ এই ধরণের নতুন দল তৈরী করতে পারবে না। নেতৃত্বের এমন অপরিহার্যতা বস্তুতঃ তাঁর পক্ষে চিন্তারই কারণ ছিল। তিনি চেয়েছিলেন যে রাষ্ট্রের বিবিধ সমস্যাগুলির সমাধান করার জন্য অনেক কর্তৃত্বসম্পন্ন পুরুষদের মালিকার পর মালিকা তৈরী থাকা উচিত। সেই সঙ্গে তাঁর বিশ্বাস ছিল যে সঙ্ঘের সৃষ্টিধর্মী তথা স্থায়ী কার্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বিস্তার লাভ করলে সংগঠনের মধ্যে দেশের সমস্যাসমূহ সমাধান করার যোগ্যতা তথা ক্ষমতা অনায়াসেই গড়ে উঠবে এবং সেই কারণেই আমাদের শক্তিকে বণ্টন করে তাকে অন্যত্র নিয়োজিত করা তাঁর উচিত মনে হয়নি। নেতাদের মধ্যে এমন অনেকেই থাকেন যাঁরা কেবল নিজের যশবৃদ্ধির জন্য কোন সংস্থা বা সংগঠনের পরিচালনা সমিতির মধ্যে নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন এবং তার বিকাশ বা বিস্তারের ব্যাপারে এতটুকু চিন্তা করেন না অথবা বিন্দুমাত্র পরিশ্রমও করেন না। কিন্তু ডাক্তারজীর স্বভাবের মধ্যে এই ধরনের ব্যাপারের প্রতি ঘৃণাই ছিল। তিনি লোক-দেখানো অথবা নাটকে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর আচরণ ও ব্যবহারের মধ্যে এমন সততা ছিল যে যদি তিনি কোন কাজের দায়িত্ব একবার নিজের উপর নিতেন, তাহলে তা নির্বাহ করার জন্য সম্পূর্ণ শক্তি ও সাধন সহ কোমর বেঁধে লেগে থাকতেন। এই কারণেই তিনি ডাঃ মুঞ্জের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত সৌজন্য সহকারে তাঁর অনুরোধ মানতে অস্বীকার করেন।

ডাক্তারজী তরুণদের মধ্যে কী রকম দৃঢ় নিষ্ঠা উৎপন্ন করেছিলেন, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের একটি ঘটনা থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। রায়পুর শাখার এক তরুণ কার্যকর্তা শ্রী নারায়ণ কিরওয়াই অত্যন্ত গুরুতর জ্বরে আক্রান্ত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি আর বাঁচবেন না। তাই একটি কাগজে তিনি এই কথাগুলো লিখে রাখেন, "ডাক্তারজীকে বলবেন যে আমি সঙ্ঘের জন্য, হিন্দুত্বের জন্য নিজের বলি না দিয়ে জ্বরের বলি হয়ে গেলাম।" দেশের জন্য প্রাণ দিতে না পেরে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয় নিয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ডাক্তারজী পত্রটি পেলেন।

১৯৩৯-এর মার্চ মাসে শ্রীগুরুজী ও শ্রী বিট্ঠলরাও পাতকী কলকাতায় সঙ্ঘকার্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন। কাজে আরো গতি আনার জন্য ১৫ই নভেম্বর শ্রীবালাসাহেব দেওরসকে সেখানে পাঠানো হল। প্রথমদিকে, ডাক্তারজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকার দরুন যাঁরা সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন বয়োবৃদ্ধ শ্রী পুলিনবিহারী। কিছুদিন তাঁর 'বঙ্গীয় হিন্দু ব্যায়াম সমিতি'তেই তাদের আখড়ায় সঙ্ঘের শাখা চলত। বলা বাহুল্য, এই ভালবাসার পিছনে 'অনুশীলন সমিতি'র পুরানো দীক্ষাই কাজ করছিল। শ্রীদেওরসের কলকাতা যাওয়ার কিছুদিন পরেই ডাক্তারজী শ্রীগুরুজী ও শ্রীনানাসাহেব তেলঙের সঙ্গে পুনার প্রান্তীয় বৈঠকে গেলেন এবং সেখান থেকে কলকাতায় এলেন। ২৫নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের কার্যালয়ে স্বয়ংসেবকদের সম্মুখে তাঁর ভাষণ হয়। কিন্তু স্বাস্থ্য খারাপ থাকায় মাত্র দু-তিন মিনিটের বেশী তিনি ভাষণ দিতে পারেন নি। তাই তিনি শ্রীগুরুজীকে ভাষণ দিতে বলেন। শ্রীগুরুজী সেদিন ইংরাজীতে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা এখনও অনেকের স্মরণে আছে।

কলকাতা যাত্রার সময় নাগপুরের সঙ্ঘচালক শ্রীবাবাসাহেব ঘটাটেও সপরিবারে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। শ্রী ঘটাটে তাঁকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাত্রার জন্য বিশেষ আগ্রহ করেন, কিন্তু তিনি তা স্বীকার করেননি। তিনি বলেন, "এত কাজ কোথায় বেড়েছে? এখন খুব বেশী প্রবাস করতে হয়না।" তার ফলে, ডাক্তারজীর সঙ্গে যাত্রা করার সুযোগ লাভ করার জন্য, ঘটাটেজীও সকলের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীতে যাত্রা করলেন।

ডাক্তারজী এখন তাঁর জীবনের অন্য কুল দেখতে পাচ্ছিলেন। অতএব, তাঁর পরে সংগঠনের প্রধান কার্যকর্তাদের কী রকম ব্যবহার করতে হবে, ইত্যাদি বিষয়ে তিনি তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ নির্বাচিত কার্যকর্তাদের সাথে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কখনো-কখনো বৈঠকে তিনি প্রশ্ন করতেন, "শ্রী হনুমান ও ভরতের মধ্যে কার ভক্তি আদর্শ বলে মনে হয়?" কেউ হনুমানের ভক্তিকে আদর্শ বলত, তখন তিনি বলতেন যে "তিনি তো প্রভু রামচন্দ্রের অন্য কোন রূপকে স্বীকার করতেই রাজি ছিলেন না। তাঁকে সামনে রেখে কাল আপনারাই হয়তো বলবেন, 'আমরা দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালককে চিনি না।" এই বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থ কার্যকর্তাদের বুঝতে অসুবিধা হতনা। এইভাবে হিন্দুস্থানে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক রাষ্ট্রোত্থানের জন্য প্রারব্ধ কার্য তাঁদের কতদূর চলেছে এবং যদি না চলে থাকে তো কেন, এই সকল প্রশ্নের কারণ-মীমাংসা করে তিনি নিজ সংগঠনের সততা এবং অখণ্ড পরম্পরার জন্য কীরূপ নিষ্ঠা এবং অনুশাসন গড়ে তুলতে হবে — এই সব কথা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতেন। ১৯৩৯-এর শেষ দিকে নাগপুরের তরুণ কার্যকর্তাদের মধ্যে থেকে দু-তিন জনকে প্রতিদিন নিজ গৃহে ভোজনের জন্য ডেকে নিতেন এবং তাঁদের সঙ্গে সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ প্রগতি সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা করতেন। এই সব আলোচনায় শ্রীগুরুজী, ডাঃ পরাঞ্জপে, শ্রীবাবাসাহেব আপটে, শ্রীআপ্পাজী জোশী প্রমুখের ব্যবহার, কথাবার্তা ইত্যাদির বিষয় আলোচনা করে জিজ্ঞেস করতেন, "যদি আমি তিন-চার মাস অসুস্থ হয়ে পড়ি, তাহলে আমার কাজ এদের মধ্যে কাকে করতে বলা যায়?" এই সব প্রশ্নের উদ্দেশ্য কয়েকজন কার্যকর্তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এবং তাঁদের একথা ভেবে দুঃখ হত যে ডাক্তারজী এতই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন যে এখন অন্তিম সময়ের কথা চিন্তা করতে শুরু করেছেন।

যুদ্ধের আগুন দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছিল। ইংরেজদের সঙ্গে-সঙ্গে ভারতকেও যুদ্ধের মধ্যে টেনে আনা হয়েছিল। বাইরের যুদ্ধের সঙ্গে-সঙ্গে যে কোন রকম অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভকে দাবিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি সরকারের নীতির অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতি সরকারের প্রথমেই বক্রদৃষ্টি ছিল, আর যুদ্ধের সময় তা আরো কঠোর হয়ে উঠেছিল। সকল প্রান্তেই গণবেশধারী স্বয়ংসেবকদের অনুশাসনবদ্ধ কার্যক্রম সরকারের চোখের বালির মত খচ্-খচ্ করছিল। সাধারণভাবে, ডাক্তারজীর পত্রগুলিকে সরকার সর্বদাই মাঝখানে আট্‌কে, তদন্ত করে তবেই গন্তব্য স্থানে যেতে দিত। সেই সময় গণবেশের কাল লম্বা বুট নাগপুরে একসঙ্গে তৈরী করিয়ে সুলভ মূল্যে সব প্রান্তে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই কারণে ডাক্তারজীর নিকট প্রেরিত পত্রে বিভিন্ন স্থানের স্বয়ংসেবকদের পায়ের মাপও পাঠানো হত। যখন ডাক্তারজীকে জনৈক সজ্জন বললেন যে

সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ পথেই চিঠি-পত্র খুলে দেখে, সেইজন্য এ ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তখন ডাক্তারজী বলেন যে স্বয়ংসেবকদের লেখার ব্যাপারে যথেষ্ট সংযম থাকে। পরে তিনি বলেন, "আমার পত্রগুলি খুলে সরকার কী পাবে? খুব বেশী হলে 'জুতো' পাবে।"

অনেক কার্যকর্তার আগ্রহ ছিল যে সঙ্ঘের জন্য একটা বড় কার্যালয় দরকার। সে সময় সংগঠনের জন্য তার প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু ডাক্তারজী জানতেন যে ইংরাজ সরকার যুদ্ধরত অবস্থাতেও সঙ্ঘের মত সংস্থার উপর যে কোন সময় বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। অতএব, তাঁর লক্ষ্য ছিল এমন প্রভাবশালী তথা উগ্র সংগঠনের নির্মাণ করতে হবে যাতে সংগঠন সরকারী ক্ষমতার মুষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। এবং সেই যুদ্ধের কারণে জর্জরিত বিদেশী সত্তাকে নির্মূল তথা সমূলে উৎখাত করতে পারে — এমন শক্তি নির্মাণের উপরেই জোর দিতে হবে। এই কথা বোঝাবার জন্য তিনি বলতেন, "কাজ বাড়াও। অন্যথায় বিশাল কার্যালয় তৈরী করবে আর তার মধ্যে ইংরেজ আরাম করে নিজেদের কাছারি খুলে বসবে।"

ডাক্তারজী যেরকম আশঙ্কা করেছিলেন, সঙ্ঘের বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ভীতির বাতাবরণ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষ থেকে কিছু কিছু প্রয়াসও শুরু হয়ে গেল। ব্যাপারটা জানা গেল নভেম্বর মাসে যখন বোম্বাই-এর প্রান্তীয় সরকার সর্বত্র পরিপত্রক পাঠিয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের মধ্যে কে কে সঙ্ঘে অংশগ্রহণ করে তার তদন্ত করার নির্দেশ দেয়। সঙ্ঘের কাজে বাধা সৃষ্টি করার জন্য সরকার এর পরেও পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, তা বোঝা যাচ্ছিল। সঙ্ঘের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক আছে এরকম সরকারী কর্মচারীদের উপর সংকট আসতে পারে, এই আশঙ্কায় কয়েকজন ডাক্তারজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু ডাক্তারজী ভাল করেই জানতেন যে স্বাধীনতা লাভ করার আগে বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে ধৈর্যের সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। সেই কারণে তিনি তাঁদের বলতেন, "রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে নিজের ধুতি ছিনতাই হবার পর পৈতেটাও না ছিনতাই হয়ে যায়, সে কথা চিন্তা করছ কেন? যে পরিস্থিতি উৎপন্ন হবে তার মোকাবিলা করতে-করতে তার মধ্য থেকেই পথ খুঁজে নিতে হবে।"

এই সময়ে ডাক্তারজীর কাছে বোম্বাই, হুবলী, করাচী, সুরাট এবং উত্তর হিন্দুস্থানের কয়েকটি স্থান থেকে চিঠি এল যে "সঙ্ঘের মারাঠী প্রতিজ্ঞা এবং প্রার্থনার ব্যাপারে আপত্তি করা হচ্ছে। অতএব, এগুলি শীঘ্র পরিবর্তন করুন।" বস্তুতঃ সিন্দীর বৈঠকে এই সব বিষয় বিবেচনা করা হয়ে গিয়েছিল, এবং আদেশ ও প্রার্থনা সংস্কৃতে রচনার চেষ্টাও চলছিল। প্রার্থনার ভাবার্থ গদ্যে লিখে কয়েকজন পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত পদ্যে রচনার জন্য পাঠানো হয়েছিল। কয়েকটি স্থান থেকে পদ্যে রচিত সংস্কৃত প্রার্থনা পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু এই রচনাগুলির মধ্যে উত্তম তথা উপযুক্ত ও সঠিক শব্দসমৃদ্ধ ও যথাযথ ভাব ব্যক্ত করার মত প্রার্থনার নির্বাচন করতে-করতে ১৯৪০ সালের মার্চ-এপ্রিল মাস এসে গেল। ততদিন এইরূপ দাবী ও প্রস্তাব আসতে থাকল। কয়েকটি সংবাদপত্রেও এ ব্যাপারে মন্তব্য প্রকাশিত হল। সংযুক্ত প্রান্তের এক 'সঙ্ঘপ্রেমী' এক খোলা চিঠিতে 'মহারাষ্ট্র' পত্রিকায় লিখলেন, ".....

ভাষার সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে যথাযথ উচ্চারণ হয়না, অতএব প্রত্যাশিত শান্তি, স্থিরতা ও গভীরতা নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া, সঙ্ঘের প্রার্থনা মারাঠীতে হওয়ার কারণে সঙ্ঘে নবাগত ব্যক্তিরা সঙ্ঘ মারাঠীদের মনে করে তার প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। ...." এই সব পত্রের মাধ্যমে সর্বত্র যে সব অসুবিধার কথা উল্লেখ করা হত, তা ডাক্তারজী উপলব্ধি করতেন, কিন্তু অন্য ভাষা সম্বন্ধে এত অসহিষ্ণুতা তাঁর দৃষ্টিতে সমাজের আত্মবিস্মৃতি তথা স্বাভিমান-শূন্যতার লক্ষণ বলেই তাঁর মনে হত। সন্দেহ নেই যে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করে দেশের বিভিন্ন ভাষাগুলি পরস্পর ভগিনীরূপে সম্মানপূর্বক যাতে অবস্থান করে, এমন পরিস্থিতি নির্মাণ করার জন্য অত্যন্ত প্রবল সংস্কার আনা আবশ্যক ছিল।

যুদ্ধের পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে দেশব্যাপী জাগরণ সৃষ্টি করার জন্য কয়েকজন নেতার প্রয়াস শুরু হয়ে গিয়েছিল। কলকাতায় ছাত্রজীবনে শ্রী পুলিনবিহারী দাশের যে 'অনুশীলন সমিতি'তে ডাক্তারজী ভর্তি হয়েছিলেন, সেখানকার এক ত্যাগী ও অগ্রগণ্য বিপ্লবী শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীও এইরূপ প্রচেষ্টায় সংলগ্ন ছিলেন। শ্রী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ১৯৪০-এর প্রথম দিকেই তিনি পুরান বিপ্লবীদের এই সম্ভাব্য বিদ্রোহ সম্বন্ধে জাগরূক করা ও তার প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে প্রবাসে বেরুলেন। শ্রীআকবর শাহ, লাহোরের শ্রী ইন্দ্রচন্দ্র নারং ও বাবা রূঠা সিংহ, অমৃতসরের চৌধরী বুগ্‌গামল, হমীরপুর জেলার রাঠোর পণ্ডিত পরমানন্দ প্রমুখ পুরাতন ও অভিজ্ঞ বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি নাগপুরে এলেন এবং তাঁর পুরাতন সহকর্মী ডাক্তার হেডগেওয়ারের সঙ্গেও দেখা করেন। ডাক্তারজী যখন কলকাতায় পড়তেন তখন গুপ্ত জীবন-যাপন কালে শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী দু-একবার ডাক্তারজীর নিবাস-স্থানেও আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার পরে প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর পর এই সাক্ষাৎ ঘটল। একদিন অকস্মাৎ শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ডাক্তারজীর বাড়ীতে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। ডাক্তারজী তাঁকে চিনতে পারলেন না। তখন শ্রীচক্রবর্তী জিজ্ঞেস করলেন, "কালীচরণদার নাম মনে পড়ে?" এই প্রশ্নের উত্তর ডাক্তারজী তাঁর প্রগাঢ় আলিঙ্গনের মাধ্যমেই দিলেন।

তাঁদের এই সাক্ষাৎকারের সময় দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শ্রী চক্রবর্তী অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বলেন যে আসন্ন বিপ্লব আন্দোলনে ডাক্তারজীর নিজের সম্পূর্ণ সংগঠনের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। ডাক্তারজী একথা ভাল করেই এবং সঠিকভাবেই জানতেন যে সঙ্ঘের সেই সময়ের সামর্থ্য অপর্যাপ্ত ছিল। অতএব, ডাক্তারজীর পক্ষে বিশ্বাসপূর্বক "হ্যাঁ" বলে দেওয়া কঠিন ছিল। তাছাড়া, সংগঠনের মধ্যে বালক ও শিশুদের সংখ্যা অধিক হওয়ার দরুন তিনি সম্ভাব্য বিপ্লবে প্রভাবী সহযোগিতার ক্ষমতা সম্বন্ধে নিজের আশঙ্কা শ্রী চক্রবর্তীর সম্মুখে ব্যক্ত করেন। যাবার সময় শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী বলে গেলেন যে, "অন্ততঃ আপনার নির্বাচিত সহকর্মীদের বিপ্লবের জন্য তৈরী রাখুন। একবার আপনি তাদের সঙ্গে বিপ্লবের রণশিঙা বাজিয়ে দিলে অসংখ্য অনুগামী স্বয়ং এসে তাতে যোগ দেবে।" ডাক্তারজীর সামনে সম্পূর্ণ স্থিতি পরিষ্কার ছিল। সুযোগ উপস্থিত হলেও তাকে কাজে লাগাবার মত না-তো ব্যাপক ও অনুশাসনবদ্ধ সংগঠন ছিল, আর না জনতার মধ্যে পর্যাপ্ত

জাগৃতি ছিল। এই অভাব তাঁকে অত্যধিক ব্যথিত করত। নিজের সম্পূর্ণ শরীর রোগ-জর্জর হওয়ার কারণে ইচ্ছানুযায়ী পরিশ্রম করার ক্ষমতাও আর অবশিষ্ট ছিল না। এই চিন্তায় তাঁর মনের বেদনা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে তাঁকে আরো পীড়িত করে তুলত।

ডাক্তারজীর স্বাস্থ্য দিনের পর দিন ভেঙে পড়তে দেখে সকলেই তাঁকে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য কোথাও যাবার জন্য বারংবার অনুরোধ করছিলেন। কিন্তু তিনি সব সময় 'দেখা যাবে' বলে এড়িয়ে যেতেন। এই সময় 'মহারাষ্ট্র'-এর সম্পাদক এবং ডাক্তারজীর পুরানো বন্ধু শ্রী গোপালরাও ওগলে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলেন। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁকে চিকিৎসার জন্য বিহারের রাজগিরি যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। তদনুযায়ী শ্রী ওগলে সেখানে গেলেন। তিন মাস যাবৎ রাজগিরির (বর্তমানে 'রাজগীর' নামে পরিচিত) উষ্ণ প্রস্রবণে সকাল-সন্ধ্যা স্নান, এবং ভোজন ও পানের জন্য ঐ জলের ব্যবহারের ফলে স্বাস্থ্যের প্রচুর উন্নতি হল। তাঁর পাচনক্রিয়া স্বাভাবিক হল এবং অর্ধাঙ্গ বায়ুর তীব্রতাও হ্রাস পেল।

রাজগিরি থেকে এই অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসার পর শ্রী গোপাল রাও ডাক্তারজীকেও সেখানে যাবার জন্য আগ্রহ করলেন। হ্যাঃ-না- করে শেষকালে তিনি রাজগিরি যেতে স্বীকৃত হলেন। জানুয়ারীর অর্ধেক শেষ হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারজীর রাজগিরি যাওয়া নিশ্চিত হবার পর বিহারে সঙ্ঘের প্রচারের জন্য যাঁদের পাঠানো হয়েছিল, শ্রী বাপুরাও দিবাকর ও শ্রী নরহরপন্ত পারথীর সঙ্গে পত্রালাপ শুরু হল। ডাক্তারজী ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁর সঙ্গে শ্রী গুরুজী ও শ্রী আপ্পাজী জোশীও যেন রাজগিরি যান। অতএব, শ্রী আপ্পাজী জোশী প্রস্তুত হয়ে ৩০ শে জানুয়ারী নাগপুরে এসে গেলেন। কিন্তু কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রীগুরুজীর পক্ষে সময় বের করা সম্ভব হল না।

বুধবার, ৩১শে জানুয়ারী শ্রী আপ্পাজী জোশী, শ্রী বাবা ইন্দুরকর, শ্রীতাত্যা তেলঙ্গ এবং শ্রীবাবাজী কল্যাণীকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তারজী নাগপুর থেকে রাজগিরি রওনা হলেন। পরদিন রাত্রে তাঁরা গয়া পৌঁছলেন। পথে ভাণ্ডারা, গোন্দিয়া, জবলপুর, এলাহাবাদ, মোগলসরাই ইত্যাদি স্থানের স্বয়ংসেবকরা ডাক্তারজীর দর্শনের জন্য স্টেশনে এসেছিল। প্রত্যেক স্টেশনে সাক্ষাৎ করতে আগত স্বয়ংসেবকদের মধ্যে লাড্ডু, চিঁড়ে ভাজা ইত্যাদি বিতরণ করে গয়া পৌঁছতে-পৌঁছতে ডাক্তারজী তাঁর সব বোঝা হাল্কা করে ফেললেন। গয়াতে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা কুমার কৃষ্ণবল্লভ প্রসাদ নারায়ণ সিংহের (বাবুয়াজীর) গৃহে করা হল। ২রা ফেব্রুয়ারী সেখানকার শাখায় ডাক্তারজীর ভাষণ হল। তারপরে তিনি সকলের সঙ্গে পাটনা গেলেন। সেখানে তাঁরা তিন দিন ছিলেন। এরই মধ্যে একদিন সঙ্ঘস্থানে তাঁকে অভিনন্দন জানানোর কার্যক্রম রাখা হল। ঐ কার্যক্রম চলার সময় হঠাৎ বৃষ্টি নামায় ডাক্তারজী ও অন্য স্বয়ংসেবকেরা সকলেই ভিজে গেলেন। কিন্তু এই অবস্থাতেও নিজের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা না করে ডাক্তারজী শেষ পর্যন্ত সব কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলেন। ৬ তারিখ সন্ধ্যাবেলায় সঙ্ঘচালক শ্রী বাবুয়াজীর গাড়ীতে সকলেই রাজগিরি গেলেন। তার আগে তাঁরা বুদ্ধগয়া, বিষ্ণুপাদ, গয়া গদাধর, গায়ত্রী, শঙ্করাচার্য, ফল্‌গু ইত্যাদি ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের স্থানগুলিও পরিদর্শন করেন।

পাটনাতে শ্রী কৃষ্ণদেবপ্রসাদজীর সঙ্গে আলাপচারিতার সময় 'রাষ্ট্রীয় কে?' এই বিষয়ে ডাক্তারজী অত্যন্ত মৌলিক বিচার উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ''রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত, কার মনোবৃত্তি ভক্তিময় এবং কার ভোগবাদী — তা দেখেই গ্রহণ করা উচিত। কবি ইকবাল হিন্দুস্থানের বর্ণনা করে বলেছেন — 'হুম বুলবুলে হ্যাঁয় উসকী, ওহ্ গুলিস্তাঁ হমারা।' এই দেশকে যারা 'ভারতমাতা' বলে মনে করে, এমন প্রকৃত দেশভক্ত অর্থাৎ হিন্দুর মুখ থেকে কখনো এমন ভাষা বেরুতে পারে না।'' কিছুক্ষণ থেমে ডাক্তারজী বলেন, ''কিন্তু এদের শুধু দোষ দিলেই চলবে না যে, এই ভোগবাদী অরাষ্ট্রীয় লোকেরা দেশের স্বার্থের দিকে নজর দেয় না। বাড়ীর ভাঙাচোরা দেয়ালের চিন্তা যে অতিথি করে না, তার নিন্দা করে কী লাভ? কারণ সে তো সব জেনেই ভোগ করার জন্য এসেছে। ঘরের প্রতি নজর দেবার দায়িত্ব গৃহস্বামীরই। অতএব, সঙ্ঘ এই কথাই বলে যে হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের কর্তব্য পালন করতে হবে।'' এই প্রসঙ্গে তিনি একবার বলেছিলেন যে সঙ্ঘে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে হিন্দুদের অন্তঃকরণের রচনা করা হয়। তিনি বলেন, "In our country there are so many colleges of arts, but there are no colleges of hearts", (''আমাদের দেশে কলাবিদ্যা প্রশিক্ষণের অনেক মহাবিদ্যালয় আছে, কিন্তু হৃদয়ের প্রশিক্ষণের কোন মহাবিদ্যালয় নেই।'') আমার আকাঙ্ক্ষা এই যে সঙ্ঘ College of hearts (হৃদয়ের প্রশিক্ষণের মহাবিদ্যালয়) হয়ে উঠুক।'' তিনি বহুবার তাঁর এই মনোভাব ব্যক্ত করতেন যে সঙ্ঘ রাষ্ট্রীয় বৃত্তি নির্মাণকারী এক মহাবিদ্যালয়।

রাজগিরি পাটনা থেকে পঁয়ষট্টী মাইল দূরে অবস্থিত। মোটর ও রেলে দূরত্ব সমান। রাজগিরির ইতিহাস জরাসন্ধের সময়ের প্রাচীন। এখন তিন হাজার জনসংখ্যার মানুষের এক ক্ষুদ্র বসতি। কিন্তু অজাতশত্রুর সময় এই স্থান অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। তার ধ্বংসাবশেষ এখনও রাজগিরির দক্ষিণে ছড়িয়ে আছে। তার দক্ষিণে বিপুলাচল, বৈভারগিরি, রত্নাচল, উদয়গিরি এবং সোনগিরি — এই পাঁচ পর্বতের মণ্ডলাকার পংক্তি বিদ্যমান। জরাসন্ধের রাজধানী এই পার্বত্য অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। ভগবান বুদ্ধও কিছুকাল এখানে তপস্যা করেছিলেন। ঐ স্থানটি এখন 'গৃধ্রকূট' নামে বিখ্যাত।

ডাক্তারজীর থাকার জন্য রাজগিরির শ্রীরামলাল জৈনের বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। বাড়ীতে চারটি ভাল ঘর এবং ২৫ × ১২ মাপের একটি প্রশস্ত বসার ঘর ছিল। বাড়ীর ছাদও বেশ বড় এবং উন্মুক্ত ছিল। এখানে আসার পর থেকে ডাক্তারজী প্রতিদিন সকাল সাড়ে চারটেয় ঘুম থেকে উঠে শ্রী আপ্পাজীর সঙ্গে টমটমে বসে উষ্ণ প্রস্রবনে স্নান করতে যেতেন। অন্য স্বয়ংসেবকেরা তাঁদের পিছন-পিছন হেঁটেই যেত। স্নানের স্থান থেকে ডাক্তারজী নিবাস স্থান প্রায় এক মাইল দূরে ছিল। কিন্তু টমটমে যাত্রাও মাঝে মাঝে ডাক্তারজীর কষ্টকর মনে হত।

বৈভারগিরির পাদদেশ থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচুতে ওঠার পরেই উষ্ণ জলের এই সাতটি প্রস্রবণ দেখতে পাওয়া যায়। সাত-আট ফুটের তফাতে সিংহমুখের সারি থেকে অবিরাম ঝরনার মত জল পড়তে থাকে। দুইটি ঝরনা উত্তর দিকে এবং বাকি পাঁচটি পূর্বদিকে এক গুহা

থেকে নির্গত হয়। সপ্তর্ষিকুণ্ডের এই অংশ সাধারণভাবে চল্লিশ পা দীর্ঘ ও সাত পা প্রস্থ। এর পূর্ব অংশে ষোলটি সোপান দিয়ে নিচে নামার পর পনের বর্গফুট চওড়া ও চার ফুট গভীর এক সুন্দর কুণ্ড আছে। সেখানে উপর থেকে জলধারা পতিত হয়না, কারণ ঝরনার স্রোত নিচে থেকে ফোয়ারার মত উপরে ওঠে।

এই ঝরণাগুলি ও কুণ্ডের জল শরীরে খুব আরামদায়ক মনে হয় এবং তার মধ্যে গন্ধক বা অন্য কোন রকম গন্ধ না থাকায় পান করতেও খারাপ লাগে না। বিশেষতঃ শীতের দিনে এই ঝরনাগুলির জলে স্নানে খুব উপকার হয়। প্রথম-প্রথম জল স্পর্শ করলে শরীরে একটু উষ্ণতা বোধ হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই এত ভাল লাগে যে সেখান থেকে উঠে আসতে ইচ্ছা হয় না। এই উষ্ণ জলে আমবাত, সন্ধিবাত ও অন্যান্য রোগ নিরাময় হয় এবং এই জলে পাচনশক্তি বৃদ্ধির গুণ থাকায় সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত এইসব রোগে পীড়িত মানুষদের ভিড় লেগে থাকে।

ঝরণাগুলির মধ্যে তৃতীয়টি বড় এবং তার নিচে বসে স্নান করার স্থানটি বেশ খোলা ও অপেক্ষাকৃত আরামপ্রদ। সেইজন্য প্রত্যেকের দৃষ্টি থাকে ঐ ঝরনার দিকে। ডাক্তারজীর এটা ভাল লাগত না যে তিনি সেখানে বসে-বসে স্নান করবেন এবং অন্যরা তাঁর দিকে চেয়ে থেকে অপেক্ষা করবে। এই কারণে, অসংকোচে স্নান করার জন্য তিনি খুব ভোরে, মোরগের ডাকের আগেই সেখানে উপস্থিত হবার চেষ্টা করতেন। তিনি গরম জলের ঝরনার নিচে বসে তাঁর পিঠের ব্যথার উপর ভালভাবে সেঁক দিতেন। উষ্ণ জলের প্রবল প্রবাহের নিচে দশ-পনের মিনিট বসলে নিজে-নিজেই পিঠে মালিশের কাজ হয়ে যেত এবং সম্পূর্ণ দেহে রক্ত-প্রবাহের গতি তীব্রতর হওয়ায় বেশ শরীর তাজা তাজা হয়ে উঠত। মাঝে-মাঝে পৌঁছতে দেরী হয়ে যেত। কিন্তু কয়েক দিনের পরিচয়ের দরুন প্রতিদিন যাঁরা স্নান করতে আসতেন, তাঁদের উপর ডাক্তারজীর এমন প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল যে, তার কারণে তাঁরা স্বয়ং তাঁর জন্য জায়গা খালি করে দিতেন যাতে তিনি আরামের সঙ্গে স্নান করতে পারেন। বিহারের জনৈক জমিদার সাহেব তাঁর চৌকিদারদের প্রহরার মধ্যে স্নান করতেন। কিন্তু ডাক্তারজীর আগমনের সংবাদ জানতে পারলেই তিনি একপাশে সরে দাঁড়াতেন এবং তাঁকে স্নান করার অনুরোধ করতেন। শুধুমাত্র স্নান করতে গিয়েও ডাক্তারজী তাঁর সৌজন্যের দ্বারা সকলকে এমন প্রভাবিত করে দিয়ে ছিলেন যে কয়েকজন সজ্জন ডাক্তারজীকে তাঁদের নিবাস স্থানে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করেন এবং তাকে তাঁদের অহোভাগ্য বলে মনে করেন।

বেশ মনের মত স্নানের পর ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তরে অবস্থিত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দিরে শ্রী আপ্পাজী জোশী বিষ্ণুসহস্রনামের পাঠ করতেন। ডাক্তারজী পাশে বসে চুপ করে শুনতেন। কুণ্ড থেকে ফিরতে-ফিরতে সাতটা-আটটা বেজে যেত। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে ভোজন হত। প্রথম-প্রথম কিছুদিন ডাক্তারজীর সঙ্গে যে স্বয়ংসেবকেরা গিয়েছিল, তারাই রান্না-বান্না করত। পরে একজন রান্নার লোক পাওয়া গেল। দুপুরের ভোজনের পর প্রায় তিনটে পর্যন্ত বিশ্রাম করতেন। তারপর চা-পান করে রাত পর্যন্ত কথা-বার্তা ও চিঠি-পত্র লেখা ইত্যাদি চলত।

রাজগিরিতে বিশ্রামের সময় শুয়ে-শুয়ে ডাক্তারজী তাঁর জীবনের অনেক ঘটনার বিবরণ শোনাতেন। কখনো বা 'দাস-বোধ'-এর কোন শ্লোক নিয়ে তার ব্যবহারিক অর্থ বিশ্লেষণ করতেন। তাঁর অভিমত ছিল এই যে লক্ষ-লক্ষ মানুষকে সুসংবদ্ধ রূপে যারা সংগ্রহ করতে চায়, তাদের জন্য শ্রী সমর্থ রামদাস দ্বারা গ্রথিত সংগঠনের সূত্র ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অত্যধিক উপযোগী প্রমাণিত হতে পারে। একবার কথোপকথনের সময় তাঁকে প্রশ্ন করা হল, ''বিপ্লব আন্দোলনের সময় আপনি নানাধরনের কার্যকলাপের সহিত যুক্ত ছিলেন, কিন্তু এটা কেমন করে সম্ভব হল যে ঐ সব কার্যকলাপ একেবারে গুপ্ত থেকে গেল, এবং আপনি সরকারের জালে ধরা পড়লেন না?'' এর উত্তরে তিনি নাম বদল করা, ছদ্মবেশ ধারণ করা ইত্যাদি ছাড়া অন্য নানারকম সতর্কতা অবলম্বনের কথাও বলেন। তিনি বলেন, ''এইসব ব্যাপারে আমি কখনো কাউকে কোন চিঠি লিখিনি। কোন কাজে দরকার হলে আমি স্বয়ং দেখা করতে যেতাম, নয়তো কোন লোকের মাধ্যমে বার্তা পাঠাতাম। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ঠিকানাও আমি লিখে রাখতাম না। ঠিকানা আমার এমনিতেই মনে থাকত।'' একথা বলার পর তিনি একটু থামলেন, এবং পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বাংলা ইত্যাদি স্থানের পঁচিশ-ত্রিশজন মানুষের ঠিকানা গড়-গড় করে বলে গেলেন।

মাঝে-মাঝে ডাক্তারজী অজাতশত্রুর দুর্গের দিকে বেড়াতে যেতেন। একবার তিনি জরাসন্ধের রাজধানী নামে খ্যাত স্থানে গেলেন। সেখানে তাঁর এই দেখে বড় দুঃখ হল যে পুরাতন আখড়ার স্থানে জনৈক মুসলমান পীরের কবর তৈরী করে ঐ স্থানটি দখল করার প্রয়াস মুসলমানেরা করেছিল। ''হিন্দু সমাজের নিদ্রাতুর স্বভাবের দরুন এইরকম আক্রমণ প্রায়শই ঘটতে থাকে, এবং সেগুলিকে যথাশীঘ্র বন্ধ করা দরকার।'' তার কথাবার্তায় এই মনোভাব ব্যক্ত হত। তাঁর সেখানে অবস্থানকালেই কয়েকজন মুসলমান গুণ্ডামী ও জোর-জবরদস্তী করে বৈদিক ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মমতের পবিত্র ও পূজ্য স্থানে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল। ডাক্তারজীর একথা জেনে আশ্চর্য লাগল যে মুসলমানদের ঐ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার বা তাকে প্রতিহত করার কোন চেষ্টা হিন্দু সমাজের কেউ করেনি, তখন এক জাপানী বৌদ্ধ ভিক্ষুককে সেই কাজে অগ্রসর হতে হল। এই সব কথা শোনার পর তাঁর মনে এই চিন্তারই উদ্ভব হত যে এইভাবে দিনের আলোতে চোখের সামনে যে সমস্ত আঘাত তথা অত্যাচার চলছে সেগুলোকে চিরকালের মত শেষ করে দেবার সংকল্প হিন্দু সমাজের মধ্যে কবে তৈরী হবে?

কিছুদিন তিনি বিকেলেও ঝরণায় স্নান করতে যেতেন। সেখান থেকে ফিরে দুগ্ধপান করতেন। তাঁর পথ্যের মধ্যে ওভালটিন ও হরলিকস সহজপাচ্য বলে পান করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু যতদিন সম্ভব বিদেশী বস্তু গ্রহণ না করে তিনি ছাগলের দুগ্ধ পান করতেন।

ডাক্তারজীর মনের মধ্যে সর্বক্ষণ এই চিন্তা চলত যে তৎকালীন পরিস্থিতিতে সঙ্ঘকার্যের কতখানি বৃদ্ধি হলে স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ সক্রিয় প্রয়াস করা সম্ভব। দৈহিক দুর্বলতা এবং অত্যধিক তীব্র চিন্তার দরুন কখনো গভীর নিদ্রা হত না। একদিন দুপুরের ভোজনের পর ঘুমের মধ্যেই তিনি বলে ওঠেন — ''এই দেখ, ১৯৪০ও শেষ হতে চলল। আমরা এখনো

কিছু করতে পারলাম না। আজ আমরা পরাধীন কিন্তু স্বাধীন অবশ্যই হব।" এই ধরনের কথা তাঁর মুখ থেকে শুনে তাঁর পাশের শয্যা থেকে শ্রী আপ্পাজী জোশী বললেন, "ডাক্তারজী, মনে হচ্ছে আপনি স্বপ্ন দেখছিলেন। আপনি কি জেগে আছেন? এই বলে ডাক্তারজীকে জাগিয়ে দিলেন। সব সময় মনে যে চিন্তা চলে, সেটাই স্বপ্নে দেখা যায়। সন্দেহ নেই, স্বাধীনতালাভের আকুলতাই তাঁর উক্ত বাক্যগুলির মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়েছিল।

ডাক্তারজীর নিকট রাজগিরিতে চারদিক থেকে চিঠিপত্র আসত। ঐ ক্ষুদ্র জনপদে প্রতিদিন এত চিঠি আসতে দেখে সেখানকার পোস্টমাষ্টার মশাই বড় বিস্মিত হলেন। তিনি ভাবলেন, "কে এই হেডগেওয়ার, যাঁর নামে এত চিঠি আসে?" এই নিয়ে অন্যদের মধ্যেও আলোচনা শুরু হল, এবং কিছুদিন পরে কয়েকজন স্থানীয় সজ্জন ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ডাক্তারজীর সঙ্গে পরিচয় করে তাঁদের খুব আনন্দ হল। তাঁরা বললেন, "ডাক্তারজী, আপনার যখন যা প্রয়োজন হবে, আমাদের আদেশ করবেন, আমরা তা পূরণ করে দেব।" এঁদের মধ্যে শ্রী হংসদেব মুনি নামক এক সজ্জন ছিলেন। তিনি 'বড়ী সঙ্গত'-এর মহন্ত ছিলেন। বয়স কম, কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ এবং বেদান্তের জ্ঞাতা ছিলেন। ডাক্তারজীর সঙ্গে তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। কুণ্ডে যে পুরোহিতরা পূজা-পাঠ করাতেন, স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের সঙ্গেও পরিচয় হল। ডাক্তারজী সব সময় চিন্তা করতেন যে এই পরিচয়ের সূত্রে পরে এখানে শাখা শুরু করতে হবে। নগরের যে সজ্জনরা ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তাঁদের সঙ্গে ক্রমে ডাক্তারজী সঙ্ঘ সম্বন্ধে কথা-বার্তা শুরু করে দিলেন। রাত্রের আহারের পর পাচক ঠাকুরের সঙ্গেও তিনি সমাজের পরিস্থিতি এবং একতার প্রয়োজনীয়তার বিষয় অত্যন্ত সরল ভাষায় কথা বলতেন।

বসন্ত-পঞ্চমীর উৎসবের প্রস্তুতি নগরের বিদ্যালয়গুলিতে শুরু হল। কয়েকজন ছাত্র চাঁদা সংগ্রহের জন্য ডাক্তারজীর কাছেও এল। সেই সময়েই ডাক্তারজী কুণ্ড থেকে স্নান করে সবেমাত্র ফিরেছিলেন। একটু ক্লান্তি অনুভব করায় তিনি বালিশে হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন। ছাত্রদের দঙ্গলকে বাইরের রাস্তায় দেখে শ্রী তেলঙ্গ সেখানে এসে বললেন, "বাড়ীর মালিক এখন ঘুমোচ্ছেন। পরে এস," এই বলে তাদের বাইরে থেকেই বিদায় করে দিলেন। পাঁচ-সাত মিনিট পরেই ডাক্তারজীর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন — "কেউ এসেছিল নাকি?" শ্রী তেলঙ্গ ছাত্রদের আসা এবং তাদের বিদায় করার বৃত্তান্ত শোনালেন। একথা শুনে ডাক্তারজী একটু বিরক্ত হলেন। তিনি বললেন, "আমরা এক অপরিচিত স্থানে এসেছি। এখানে কোন কারণে স্বয়ং যে ছাত্ররা এসেছিল, তাদের সঙ্গে পরিচয় করার বদলে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। যাও, ওরা কাছাকাছিই আছে নিশ্চয়। ওদের ডেকে নিয়ে এস।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ ছাত্রদল ডাক্তারজীর বসার ঘরে এসে উপস্থিত হল। ডাক্তারজী তাদের আদর করে বসালেন এবং এক-এক করে তাদের সকলের বিস্তারিত পরিচয় জেনে নিলেন। ছাত্ররা বিকেলে কী করে, কোন খেলা খেলে, ছাত্রদের জনপ্রিয় শিক্ষক কে কে আছেন, ইত্যাদি কথা তিনি কথাচ্ছলে জেনে নিলেন। ওরা যাবার সময় তাদের এক টাকা চাঁদা

দিলেন। এই পরিচয়ের খুব লাভ হল, কারণ তারই ভিত্তিতে পরে সেখানে সঙ্ঘের শাখা শুরু করা গেল।

রাজগিরি থেকে শ্রীগুরুজীর ঠিকানায় মাঝে-মাঝে চিঠি আসত। তা থেকে একথাই জানা যেত যে স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয়নি। ১৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি লেখেন, ".... সকলের স্বাস্থ্যের উপর ভাল পরিণাম হয়েছে দেখা যাচ্ছে। নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আজ কিছু বলা যাচ্ছে না। সম্পূর্ণ ব্যবস্থা বেশ ভাল। ....." ডাক্তারজীর সঙ্গে গিয়েছিলেন শ্রী বাবা ইন্দুরকর। তিনি ২৩শে ফেব্রুয়ারীর চিঠিতে লেখেন, " ..... ডাক্তারজীর স্বাস্থ্যের উপর এখানকার জলবায়ুর দৃশ্যতঃ কোন সুফল হয়নি। এখানকার স্থানীয় লোকেদের মতে সুপরিণাম দেখতে এখন বেশ কয়েক সপ্তাহ লাগবে।"

রাজগিরিতে আসার পরে একমাসও কাটেনি। এমন সময় ডাক্তারজীর উদ্বেগ বৃদ্ধির একটি সংবাদ জানা গেল। পাঞ্জাব সরকার কর্তৃক প্রান্তে সৈনিক পদ্ধতিতে যে সব কাজ চলে, সেগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করায় সঙ্ঘকার্যের পথে কিছু বাধা সৃষ্টি হল। এই আদেশে বলা হয়েছিল যে, "ভারত সুরক্ষা বিধির নিয়ম ৫৮ অন্তর্গত উপনিয়ম (১) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল নির্দেশ দিয়েছেন যে পাঞ্জাব প্রান্তের সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তি হাতে শস্ত্র নিয়ে অথবা শস্ত্রের মত ব্যবহার করা যায় এমন কোন উপকরণ নিয়ে কোন প্রকার সামরিক পদ্ধতিতে কুচকাওয়াজ, ব্যায়াম অথবা অন্য কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করবে না।"

মনে হয়েছিল যে সরকার কর্তৃক ব্যতিক্রম রূপে স্বীকৃত বালবীর সংস্থা ব্যতীত সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক দলের উপর এই আদেশের অত্যন্ত প্রতিকূল পরিণাম হবে। ডাক্তারজী একথা ভালভাবেই জানতেন যে যুদ্ধের চাপে ভারাক্রান্ত বিদেশী সরকার এই ধরনের দমন-নীতি অবলম্বন করতে পারে। হিন্দু সমাজের উপর তার যাতে কোনরূপ বিরূপ প্রভাব না পড়ে, সে কথা বিবেচনা করে তিনি সকল কার্যকর্তাদের বলে রেখেছিলেন যে কোন পরিস্থিতির চিন্তা না করে অন্ততঃপক্ষে এক স্থানে প্রতিদিন একত্রিত হওয়ার কার্যক্রমের ওপর যেন জোর দেওয়া হয়। ৫ই মার্চ প্রেরিত তাঁর পত্রে তিনি পাঞ্জাব প্রান্তের প্রচারককে লেখেন, "এখন আমার পরামর্শ এই যে আপনারা বিভিন্ন প্রকার খেলাধূলা ও প্রার্থনার কার্যক্রম অব্যাহত রাখুন। নাম ইত্যাদি বদল করার কোন আবশ্যকতা আছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ, আমাদের নামের কোথাও কোনপ্রকার উল্লেখ করা হয়নি।" শুধু অনুকূল পরিস্থিতিতেই কাজ করার দুর্বল প্রবৃত্তি ডাক্তারজী কার্যকর্তাদের মধ্যে নির্মাণ করেননি। তিনি তো ভীষণ পরিস্থিতিসমূহকে পদদলিত করে এগিয়ে চলার শিক্ষাই লাভ করেছিলেন। অতএব, এই প্রকার সরকারী প্রতিবন্ধকতার পরেও পাঞ্জাবে সঙ্ঘকার্যের অগ্রগতি থেমে থাকেনি। স্বয়ংসেবকদের দৃঢ় নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং বুদ্ধিকুশলতারই পরিণামে এটা সম্ভব হয়েছিল।

ডাক্তারজী যখন রাজগিরির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তখন ঠিক হয়েছিল যে তিনি একমাস সেখানে বিশ্রাম করবেন এবং মার্চের প্রথম দিকে নাগপুরের সঙ্ঘচালক শ্রী বাবাসাহেব ঘটাটের পুত্রদের যজ্ঞোপবীত সংস্কারের সময় নাগপুরে ফিরে আসবেন। তদনুযায়ী ৩রা মার্চ ডাক্তারজী বিহার প্রান্তের সমস্ত কার্যকর্তাদের বৈঠক তাঁর নিবাসস্থানে রাখেন। সেইদিন

কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে রাজগিরিতে বিধিবৎ শাখা আরম্ভ করা হল। প্রান্তীয় বৈঠকে ডাক্তারজী নাগপুরে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। সব সঙ্ঘচালক তাঁর এই প্রস্তাবের প্রতি অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। এই বিষয় ৬ই মার্চ ডাক্তারজী শ্রী ঘটাটেকে এক পত্রে লেখেন, "…. সব সঙ্ঘচালক এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে মার্চ মাসে এখানে শীত কম থাকায় আবহাওয়া ভাল হয়ে যায়। এই মাস আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হবে। অতএব, এত দূরে এসে এত শীঘ্র রাজগিরি থেকে না গিয়ে আরো এক মাস এখানে থেকে এখানকার প্রাকৃতিক চিকিৎসার লাভ ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা উচিত হবে। আমি তাঁদের নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে আমার এখনই নাগপুর যাওয়া কেন আবশ্যক। কিন্তু এ ব্যাপারে এঁরা সকলে আমাকে রাজগিরি থেকে যেতে দেবেন না বলে সংকল্প করে বসে আছেন এবং তাঁদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য কয়েকজন এখানে দু দিন থেকেও গেলেন। ... এই পরিস্থিতিতে, মঙ্গলোৎসবে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থাকা সম্ভব হচ্ছে না, এই কারণে মন নাগপুরে এবং শরীর রাজগিরিতে — এইরূপ বিচিত্র অবস্থা হয়েছে। অনুগ্রহ করে এ ব্যাপারে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।"

ডাক্তারজী একথা জানাবার পরেও বার-বার পত্র ও তার বার্তা আসতে লাগল তাঁকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়ে। অতএব, দিনাংক ৯ মার্চ তিনি ও শ্রী আপ্পাজী জোশী নাগপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তাঁকে আনার জন্য শ্রী গুরুজী মোটরগাড়ী নিয়ে জবলপুর গেলেন এবং সেখান থেকে ডাক্তারজীকে নিয়ে সকাল চারটে বা সাড়ে চারটে নাগপুর পৌঁছলেন। দিনাংক ১৬ই মার্চ পর্যন্ত যজ্ঞোপবীত-সংস্কার-এর জন্য তিনি নাগপুরে রইলেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মধ্যপ্রান্তের বিভিন্ন স্থান থেকে যে কার্যকর্তারা এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে ডাক্তারজী সঙ্ঘকার্যের বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেন। যুদ্ধ-পরিস্থিতি এবং সরকারের বক্রদৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও সর্বত্র কাজের প্রসার ঘটে চলেছিল, কিন্তু তার জন্য ডাক্তারজীর মন তৃপ্তিলাভ করতে পারছিল না। যে হিন্দু সমাজে সংগঠনের ঘরে শূন্যই ছিল, সেখানে আজ হাজার-হাজার সংখ্যায় স্বয়ংসেবকদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি তৈরী হওয়া নিঃসন্দেহে গৌরবজনক তথা আশাপ্রদ ঘটনা ছিল। কিন্তু যে পরিস্থিতির উপর আধিপত্য নির্মাণ করার প্রয়োজন ছিল, তার ভয়ংকরতার তুলনায় এই শক্তি ছিল মহাসমুদ্রে বারি বিন্দুবৎ অতি নগণ্য। ডাক্তারজীর উদ্বেগের মূলে ছিল এই চিন্তা ও দূরদৃষ্টি। এই কয়েকদিন নাগপুরে থাকার সময় ডাক্তারজী কয়েকজন স্বয়ংসেবককে এই নির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে "স্বাধীনতা লাভ করার জন্য দেশের মধ্যে কত সংখ্যায় স্বয়ংসেবকদের তৈরী রাখা আবশ্যক?"

মনের এই চঞ্চল অবস্থা নিয়েই ডাক্তারজী ১৮ তারিখে পুনরায় রাজগিরি ফিরে এলেন। ট্রেনে অত্যধিক ভিড় থাকায় ডাক্তারজীর এই যাত্রা ছিল অত্যন্ত কষ্টপ্রদ। রাজগিরিতে ফেরার দু-এক দিন পরেই স্নানের ক্রম পুনরায় শুরু হল। সংগঠন কতখানি বৃদ্ধি লাভ করলে উদ্দিষ্ট পূর্ণ হতে পারবে, এ বিষয়ে তাঁর হিসাব তৈরী হয়ে গিয়েছিল। নিজের কয়েকজন সহকারীকে এ বিষয়ে অবহিত করার উদ্দেশ্যে তিনি নাগপুরে কয়েকটি পত্রও লেখেন। একটি পত্রে তিনি লেখেন, "আমাদের সঙ্ঘকে প্রভাবী করে তোলার জন্য আপনাদের সম্মুখে একটি কথাই

জানাতে চাই যে তিন বছরের মধ্যে (১৯৪০ থেকে ১৯৪২) নিজেদের প্রান্তে গণবেশধারী তরুণ স্বয়ংসেবকদের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে গ্রামাঞ্চলে এক শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে তিন শতাংশ করে ফেলতে হবে।

"কেমন করে একাজ করা যাবে, এ বিষয়ে পূর্ণ চিন্তা করে আপনারা সকলে উৎসাহ তথা নিষ্ঠা সহকারে কাজে সংলগ্ন থাকেন, তাহলে আমার বিশ্বাস তিন বছরের মধ্যে এই কাজ হৈ-হৈ করে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। পরমেশ্বরের কাছে আমার এই প্রার্থনা যে তিনি আপনাদের অঙ্গীকৃত কার্যে সাফল্য প্রদান করুন।"

ডাক্তারজীর উক্ত নির্দেশ অনুসারে সমস্ত শাখায় সংখ্যার এই লক্ষ্য পূরণের চিন্তা ও প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেল। নতুন-নতুন কার্যকর্তারা কাজের জন্য বেরুতে লাগলেন। এই সময়েই লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশন হল। তাদের প্রস্তাবগুলি এবং খাকসারদের বেল্চার ঝংকার-ধ্বনি তাদের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এই অধিবেশনে মুসলমানদের পৃথক ও স্বতন্ত্র রাজ্য নির্মাণের সংকল্প অত্যন্ত দ্বিধাহীন ভাষায় প্রকাশ করা হয়। সরকারের সামরিক সঞ্চলনের নিষেধাজ্ঞার উল্লঙ্ঘন করে লাহোরে খাকসারদের আন্দোলনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। এর পরিণামে পুলিশ ও খাকসারদের মধ্যে সংঘর্ষ হল, যার ফলে ত্রিশ-চল্লিশজন খাকসার নিহত হল। বিভিন্নস্থানে কার্ফু লাগিয়ে দেওয়া হল। পাঞ্জাবের এই ঘটনাবলির দিকে ডাক্তারজীর সম্পূর্ণ দৃষ্টি ছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে মুসলমানদের আক্রমণকারী প্রবৃত্তির সম্মুখীন হবার মত সামর্থ্য সঙ্ঘের সংস্কার-প্রাপ্ত তরুণদের মধ্যে অবশ্যই প্রকটিত হবে। তাঁর এই আত্মবিশ্বাস যে কত যথার্থ ছিল তা স্বয়ংসেবকেরা এই বিষম পরিস্থিতিতেও কার্যবিস্তার করে প্রমাণ করে দিয়েছিল। ডাক্তারজী যখন এই কার্যবৃদ্ধির সংবাদ পেতেন, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করতেন। এ বিষয়ে তিনি শ্রীগুরুজীকে একটি পত্রে লেখেন, "পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে আমাদের কাজ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার সুস্পষ্ট অর্থ এই যে আমাদের কাজ কোন বিশেষ কার্যক্রমের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং আমাদের ধ্যেয় এবং কার্যপদ্ধতির মধ্যে এমন অন্তঃশক্তি নিহিত আছে যে সর্বপ্রকার পরিস্থিতিতে সাফল্যই লাভ করতে থাকবে।" এই পত্রের মধ্যে অভিব্যক্ত বিজিগীষু বৃত্তি সমস্ত স্বয়ংসেবকদের হৃদয়ের মধ্যে তরঙ্গায়িত হচ্ছিল। ডাক্তারজী তাঁর জীবনের অখণ্ড যজ্ঞ দিয়েই এই জাদু সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ডাক্তারজী দ্বিতীয়বার যখন রাজগিরি এলেন তখন তাঁর সঙ্গে শ্রী আপ্পাজী জোশী আসেননি। তিনি চান্দাতে চারটি জেলার প্রান্তীয় সম্মেলন শেষ হবার পর ৩১শে মার্চ সেখানে এসে পৌঁছলেন। এই সময় ডাক্তারজীর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করা গেল। রাত্রে তাঁর পা তুলোর পটি দিয়ে সেঁক দেওয়া হত। নাগপুর থেকে আসার সময় ডাক্তারজী পড়ার জন্য গীতা নিয়ে আসার কথা বলেছিলেন এবং আপ্পাজীকে বাংলা পড়াবার জন্য কয়েকটি প্রাথমিক বাংলা বইও এনেছিলেন। কিন্তু এই দুই ব্যাপারেই রাজগিরিতে বিশেষ সময় পাননি। স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হতেই ডাক্তারজী বেশী সময় কথাবার্তা ও পত্রালাপেই নিয়োগ করতে শুরু করলেন।

ডাক্তারজী যত্নসহকারে তথা বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী তাঁর বংশগত স্বভাবকে শান্ত-সংযত করে তুলেছিলেন। মাঝে-মাঝে সেই স্বভাব তার আসল ও মূল রূপে ফিরে আসত। তাঁর ব্যবহারে একটু খিট্‌খিটে মেজাজ দেখা যেতে লাগল। কিন্তু ক্রোধের বশে অন্যের সঙ্গে তীক্ষ্ণ কথা বা ব্যবহার কখনই প্রকাশ পায়নি। তবে তাঁর কাছাকাছি যাঁরা থাকতেন, তাঁরা তাঁর মনের অপ্রসন্নতা অনুভব করতে পারতেন। রাজগিরিতে একদিন তাঁর একটু জ্বর হল। নিজের জন্য অন্য কাউকে কষ্ট দেওয়ার পরিবর্তে প্রয়োজনীয় জিনিষ স্বয়ং উঠে সংগ্রহ করা তাঁর নিয়ম ছিল। আপ্পাজী ডাক্তারজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বভাবের মধ্যে আগ্রহ ও সূক্ষ্মতা বেশী থাকার কারণে ডাক্তারজী সব সময় লক্ষ্য রাখতেন যে তাঁর ব্যবস্থার মধ্যে যেন কোন অভাব না থেকে যায়। শুধু তাই নয়, একবার আপ্পাজী আমবাতে পীড়িত হয়ে পড়লে ডাক্তারজী স্বয়ং তাঁর মাথার কাছে বসে তাঁর দেখাশোনা করেন। এই সময় ডাক্তারজীর চোখ সজল হয়ে উঠতে দেখে আপ্পাজী কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, "আমি আপনাকে আগ্রহ করে এখানে নিয়ে এলাম, আর আপনার ভাগ্যে এ কী জুটল?"

মাঝে-মাঝে বিভিন্ন স্থান থেকে স্বয়ংসেবকেরা ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে আসতো। একদিন ডাক্তারজী ওভারকোট, হাতে দস্তানা, পায়ে মোজা এবং মাথায় লম্বা টুপি পরে বাইরে বারান্দায় পাইচারী করছিলেন। সেই সময় গয়া থেকে কুড়ি-পঁচিশ জন স্বয়ংসেবক সাইকেলে করে সেখানে এল। সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ডাক্তারজী তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "কোথা থেকে এসেছেন?"

"গয়া থেকে।"

"কী কাজে এসেছেন?"

"ডাক্তার হেডগেওয়ারের সঙ্গে দেখা করতে।"

"ঠিক আছে। তিনি ভিতরে বসে লিখছেন।"

এই বলে ডাক্তারজী আপ্পাজীর দিকে আঙুল তুলে দেখালেন, সকলে ভিতরে গেল এবং আপ্পাজীকে ভক্তিভরে প্রণাম করল।

"আমাকে কেন নমস্কার করছ?"

"আপনাকে দর্শন করতে এসেছি।"

"কাকে?"

"ডাক্তারজীকে। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন স্বয়ংসেবক আমাদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।"

একথা শুনে আপ্পাজী খিল্‌-খিল্‌ করে হেসে উঠলেন এবং বললেন, "বাহ্‌। বেশ। তিনি শুধু স্বয়ংসেবকই নন, উনিই ডাক্তার হেডগেওয়ার।" ডাক্তারজীর পরিহাস বুঝতে পেরে সবাই বাইরে এল এবং হাসি ও আনন্দের পরিবেশে ডাক্তারজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। এই ধরনের বিনোদনের স্বভাব তাঁর জীবনের অভিন্ন অঙ্গ ছিল।

১৭ই মার্চ হিন্দু সভার পক্ষ থেকে 'রামসেনা' নামক এক স্বেচ্ছাসেবক দল নাগপুরে শুরু হল। এ বিষয়ে প্রকাশিত পত্রে লেখা হয় যে ".... রামসেনা মহাসভার সেনা হবে। মণ্ডলের

সভাপতি ডাঃ মুঞ্জে কর্তৃক প্রাপ্ত মহাসভার সকল আদেশ রামসেনাকে পালন করতে হবে।...'' এই পত্রকে একথাও খোলসা করা হয় যে পৃথক দল তৈরী করার প্রয়োজন কেন হল। তাতে লেখা ছিল, ''হিন্দুদের সামরিক শিক্ষণের দ্রোণাচার্য পূজ্য ডাক্তার হেডগেওয়ার নাগপুরে দল নিরপেক্ষ সংগঠন শুরু করেছেন।''

২৭শে মার্চ 'মহারাষ্ট্র' তে রামসেনার পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করা হয়। তার মধ্যে ডাক্তার হেডগেওয়ারের নামও ছিল। রাজগিরিতে ডাক্তারজী যখন এ কথা জানতে পারলেন, তাঁর বড় আশ্চর্য লাগল, একটু ক্রুদ্ধও হলেন। কারণ, সঙ্ঘ এবং রামসেনা দুটি ভিন্ন-ভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত সংগঠনে একই সময় পদাধিকারী থাকা সংগঠনের দিক থেকে ক্ষতিকর ছিল। তাছাড়া, তাঁর স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় তা সম্ভবও ছিল না। শুধু তাই নয়, তাঁর অক্ষমতার কথা তিনি বারংবার স্পষ্ট তথা অসন্দিগ্ধ শব্দের মাধ্যমে রামসেনার প্রবর্তকদের জানিয়ে দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর নাম টেনে আনার প্রবৃত্তি তাঁর ভাল লাগেনি। অতএব, ৩রা এপ্রিলের 'মহারাষ্ট্রে' তিনি এক সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় ব্যাখ্যা প্রকাশ করান। তাতে বলা হয়েছিল যে ''নাগপুর নগর হিন্দুসভা কর্তৃক গঠিত রামসেনাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যে আবেদন ২৭শে মার্চের 'মহারাষ্ট্রে' প্রকাশিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে রাঃ স্বঃ সঙ্ঘের চালক ডাক্তার হেডগেওয়ার রাজগিরি থেকে জানিয়েছেন যে 'ঐ পত্রকে আমার নাম আমার অজ্ঞাতসারে এবং অনুমতি ছাড়াই ছাপা হয়েছে।' ডাক্তারজী জানতেন যে এই ব্যাখ্যা প্রকাশিত হলে ডাঃ মুঞ্জের মত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের ভাল লাগবেনা, এবং সেই কারণে তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তিতও ছিলেন। কিন্তু পরাধীন দেশে রাষ্ট্রীয় জাগৃতির উদ্দেশ্যে গঠিত সংগঠনকে যুদ্ধের বিষম ও স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাকে রাজনৈতিক সংস্থা থেকে অলিপ্ত রাখা আবশ্যক ছিল। কিছুটা অসুবিধা হবে জেনেও তিনি এই কর্তব্য পালন করেন। কর্তব্য বহুবার এই রকম কঠোর হয়ে থাকে।

রাজগিরিতে প্রথম নিবাস কালে কুণ্ডে স্নান করতে যাওয়া আসা করার জন্য টম্‌টম ব্যবহার করা হত। কিন্তু তাতে ঝাঁকুনি লাগারফলে ডাক্তারজীর খুব কষ্ট হত। একথা জানতে পেরে গয়ার সঙ্ঘচালক শ্রী বাবুয়াজী ১লা এপ্রিল থেকে তাঁর মোটরগাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। এর ফলে ডাক্তারজীর কষ্ট অনেক লাঘব হল। যেদিন মোটরগাড়ী এল, সেদিনই ডাক্তারজী রাজগিরি থেকে সাত মাইল দূরে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ দেখতে গেলেন। যেখানে সহস্রাবধি ছাত্ররা এক সাথে বিদ্যাভ্যাস করত, সেই পবিত্র স্থান মুসলমানরা কী রকম ধ্বংস করে দিয়েছিল, সে কথা ইতিহাসের প্রত্যেক ছাত্রই জানে। এই প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখে ডাক্তারজীর দুঃখ হল যে এত দিন পরেও শত-শত বর্ষব্যাপী এই আক্রমণগুলিকে দূর করার সামর্থ্য হিন্দু সমাজে গড়ে ওঠেনি। ঐ বিধ্বস্ত বিহারকে দেখে তিনি বলেন, ''এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য ব্যাখ্যা করার মত যদি একাধজন চিন্তাশীল ও স্বাভিমানী প্রদর্শক থাকতেন তাহলে এখানে যারা আসে, সেই সব ব্যক্তিরা সঠিক ইতিহাসের দিকে যথাযথ দৃষ্টি লাভ করতে পারতো।''

১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত ডাক্তারজী রাজগিরিতে ছিলেন। সেখানকার বর্ষপ্রতিপদ উৎসব তাঁর

উপস্থিতিতেই অনুষ্ঠিত হল। সেখানে বসে তিনি বরাবর চিন্তা করতেন যে নাগপুর, পুনা ইত্যাদি স্থানে অনুষ্ঠিতব্য অধিকারী শিক্ষণ বর্গের সব ব্যবস্থা ঠিকমত চলছে কিনা। তিনি পূর্বেই সূচিত করে রেখেছিলেন যে, ২০ শে এপ্রিল তিনি নাগপুর পৌঁছাবার পরদিনই যাতে পুনা বর্গের জন্য শিক্ষক পাঠাবার ব্যবস্থা করে রাখা হয়। রাজগিরি থেকে ১৫ই এপ্রিল রওনা হয়ে গয়া, কাশী, প্রয়াগ এবং জবলপুরের শাখাগুলি পরিদর্শন করে তিনি ২০শে এপ্রিল নাগপুর পৌঁছলেন।

নাগপুরে তাঁর পুরাতন চিকিৎসকরা তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বললেন যে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সকলের কাছে এটা আনন্দের বিষয় ছিল। ডাক্তারজী কার্যবিস্তারের যে মর্যাদাগুলি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, সেগুলি পূর্ণ করার বাসনা ও উৎসাহ সকল কার্যকর্তাদের কথাবার্তা ও আচরণে ব্যক্ত হত। শ্রীগুরুজীও তাঁর পত্র ও বক্তৃতাগুলিতে সকলকে ডাক্তারজী কর্তৃক নির্দেশিত লক্ষ্যসমূহকে পূরণ করার জন্য প্রোৎসাহিত করতেন। কলকাতার ডাঃ সন্তোষ কুমার মুখার্জীকে তিনি লেখেন, "…. আমাদের সকলকে নিজেদের সম্পূর্ণ শক্তি এই বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত করা উচিত, যাতে যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে সংখ্যা ও গুণগত দৃষ্টিতে আমরা সক্ষম হয়ে উঠতে পারি। আমাদের যতই কষ্ট করতে হোক না কেন, এই কাজ সম্পূর্ণ করতেই হবে।"

সুরাটের প্রচারকের কাছে প্রেরিত পত্রে শ্রী গুরুজী লেখেন, "….আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে পরমপূজ্য ডাক্তারজী আমাদের কাজকে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়ে দেবেন।"

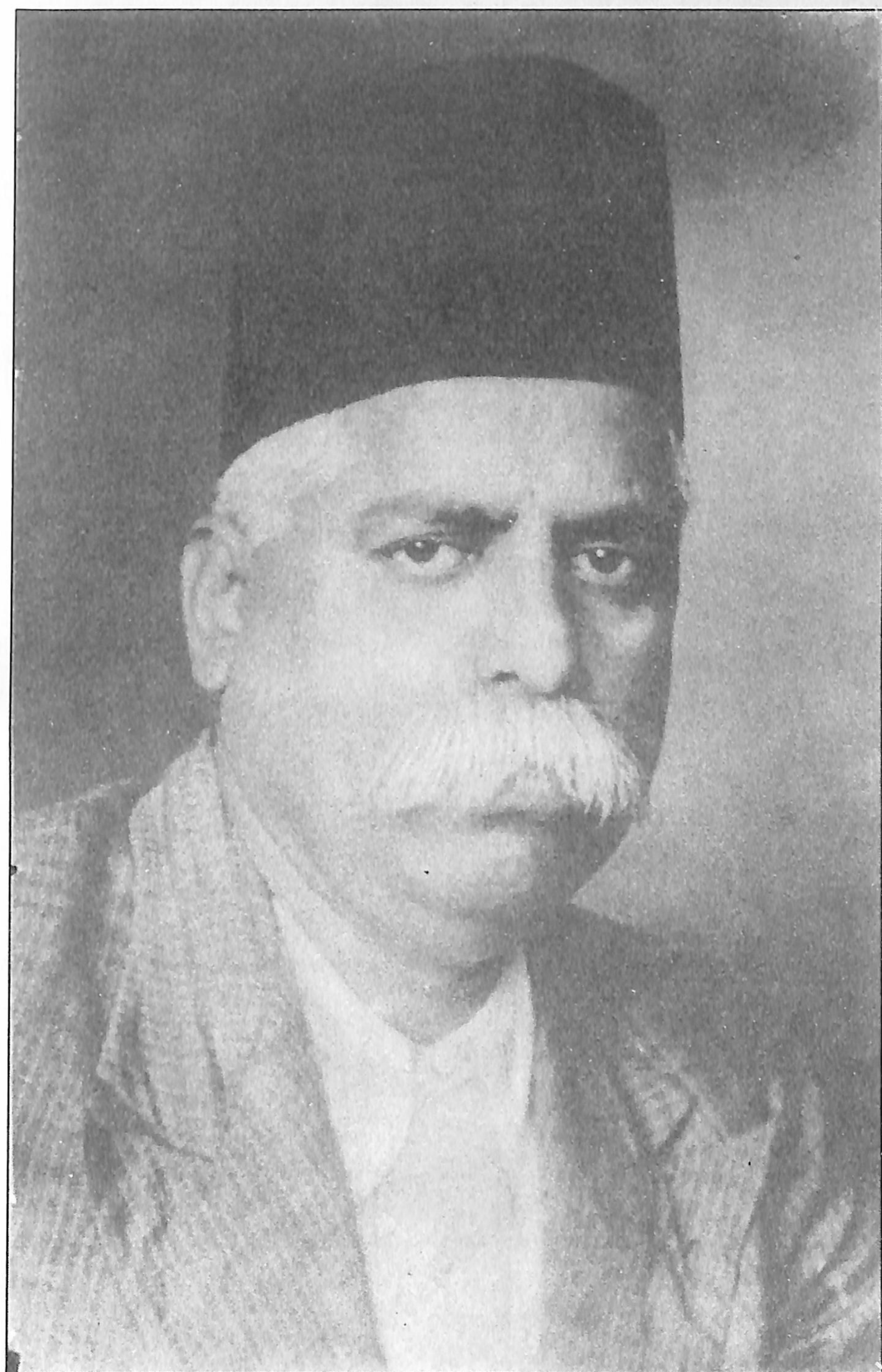
সঙ্ঘের পথ অভ্রান্ত, উৎসাহও অভূতপূর্ব, সময় অনুকূল এবং নেতৃত্ব অসাধারণ ছিল। কিন্তু এই সময় নিয়তি অন্য কোন ক্রূর কৃতির যোজনা তৈরী করছিল।

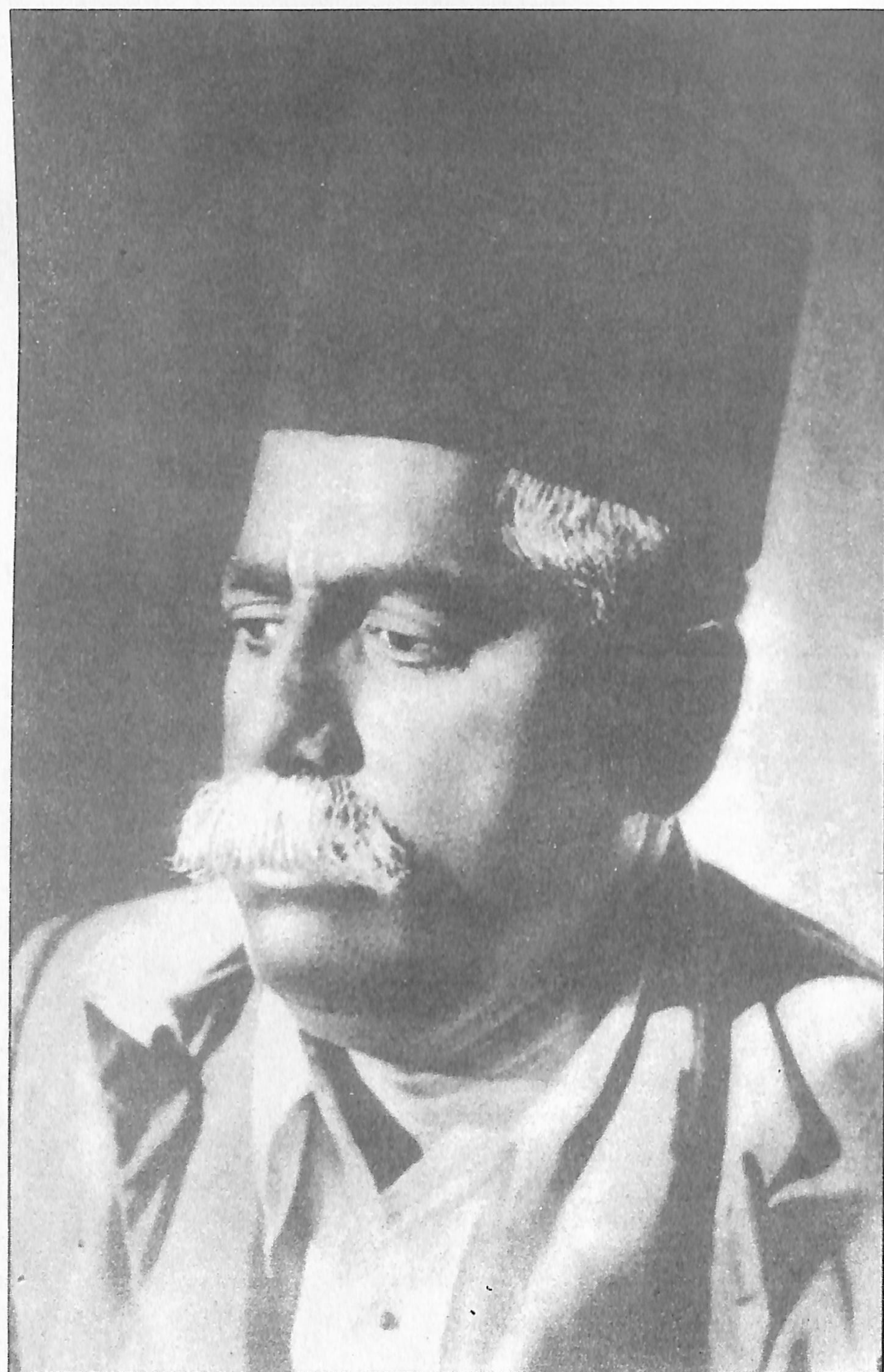
৩০. মৃত্যু

পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর আদেশ অনুসারে ২৩শে এপ্রিল ১৯৪০-এ পুনার অধিকারী শিক্ষণ বর্গ আরম্ভ হল। এই বর্গের বিশেষত্ব এই ছিল যে এই বর্গেই সর্বপ্রথম সঙ্ঘের সংস্কৃত আজ্ঞা ও প্রার্থনার প্রবর্তন হল। ১৯২৫ সালে নাগপুরে এক কোণায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের যে কাজ আরম্ভ হয়েছিল, আজ তা দেশব্যাপী হয়েছে। এর প্রমাণ এই সংস্কৃতের আজ্ঞাসমূহ এবং প্রার্থনা, যেগুলি এতদিন ধরে প্রচলিত হিন্দী-মারাঠীর মিশ্র আজ্ঞা ও প্রার্থনার স্থান গ্রহণ করল। সংস্কৃত ভারতে 'দেববাণী' রূপে সমাদৃত। এই ভাষার প্রতি সকল প্রান্তেই সমান শ্রদ্ধা ও আত্মীয়তার মনোভাব বিরাজিত, তার সম্মুখে সংকীর্ণ প্রান্তীয়তা এবং অসহিষ্ণুতামূলক ভাষাভেদ দাঁড়াতে পারেনা। ভারতের এক কোণ থেকে সুদূরবর্তী অপর কোণ পর্যন্ত কোটি-কোটি কণ্ঠে নিত্য নিয়ম ও ভক্তিভাবপূর্ণ সংস্কৃত প্রার্থনার উচ্চারণ সুনিশ্চিতভাবেই দেশের ঐক্য রাষ্ট্রীয়তার উদ্‌ঘোষের মাধ্যমে হিন্দুদের অভিন্নতার সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করবে। রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থানের দৃষ্টিতে এই সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পুনার বর্গে পনের দিন থাকার কার্যক্রম নিশ্চিত করে ডাক্তারজী দিনাংক ২৭শে এপ্রিল নাগপুর থেকে রওনা হলেন। এই সময় তাঁর স্বাস্থ্য সাধারণভাবে দেখে ঠিকই মনে হচ্ছিল। একথা বলা যায় যে তাঁর সদাপ্রসন্ন থাকার স্বভাবেরই পরিণাম ছিল এটা, কারণ নাগপুর থেকে পুনা যাবার সময় যখন তিনি একদিনের জন্য নাসিকে যাত্রা-বিরতি করলেন, তখন সেখানকার ডাঃ দামলে ও ডাঃ চোভে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। ১৯৩৯ সালে ডাক্তারজীর অসুস্থতার সময় তাঁরা তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন, সেই কারণে ডাক্তারজীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁরা ভালভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। এখন তাঁকে পরীক্ষা করে, তাঁদের অভিমত ছিল যে টাকায় বারো আনা উন্নতি হয়েছে। নাসিক থেকে কল্যাণ হয়ে ডাক্তারজী ২৯শে এপ্রিল পুনা পৌঁছলেন। কল্যাণে প্রান্ত সঙ্ঘচালক শ্রী কাঃ ভাঃ লিময়ে, বোম্বাই-সঙ্ঘচালক শ্রী দাদা নাইক, সাতারা-সঙ্ঘচালক শ্রী ভাউরাও মোডক এবং অন্য স্বয়ংসেবকেরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পুনা স্টেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য শত-শত স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিল। ডাক্তারজীর উপস্থিতিই অপূর্ব উৎসাহ ও আনন্দ সঞ্চারিত করত। পুনায় তাঁর আগমনের পরে প্রতিদিন এই কথাই অনুভূত হতে থাকে।

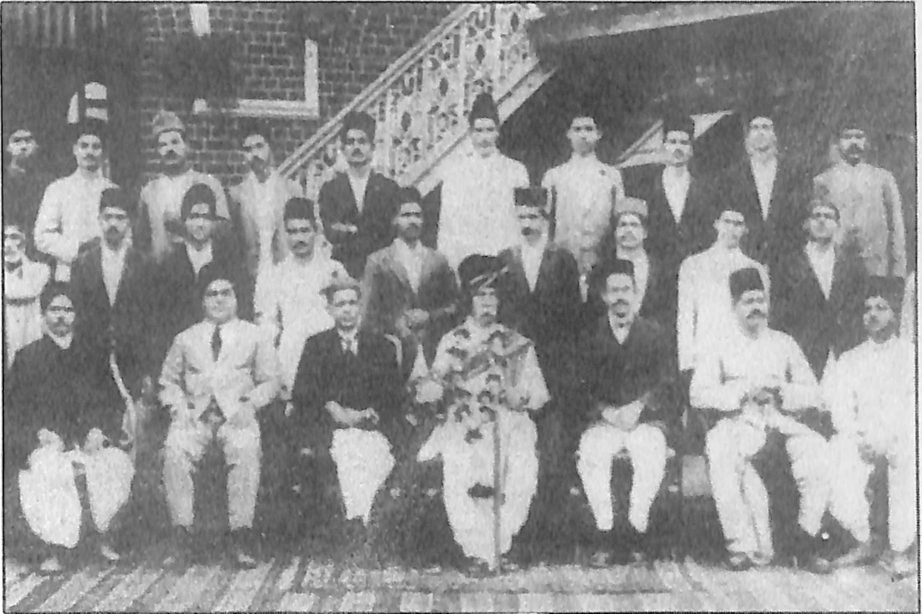
বর্গে শারীরিক এবং বৌদ্ধিকের সব কার্যক্রমগুলির দিকেই ডাক্তারজীর দৃষ্টি থাকত। মহারাষ্ট্রের ১৩২ স্থান থেকে ৮০০ স্বয়ংসেবক এই বর্গে যোগদান করেছিল। সংখ্যার দিক থেকে বিগত সমস্ত বর্গের থেকে এই সংখ্যা অধিক ছিল। প্রতিদিন দুপুরে ডাক্তারজী স্বয়ংসেবকদের জেলা অনুসারে বৈঠক নিতেন। তাতে কাজের বর্তমান অবস্থা এবং পরবর্তী





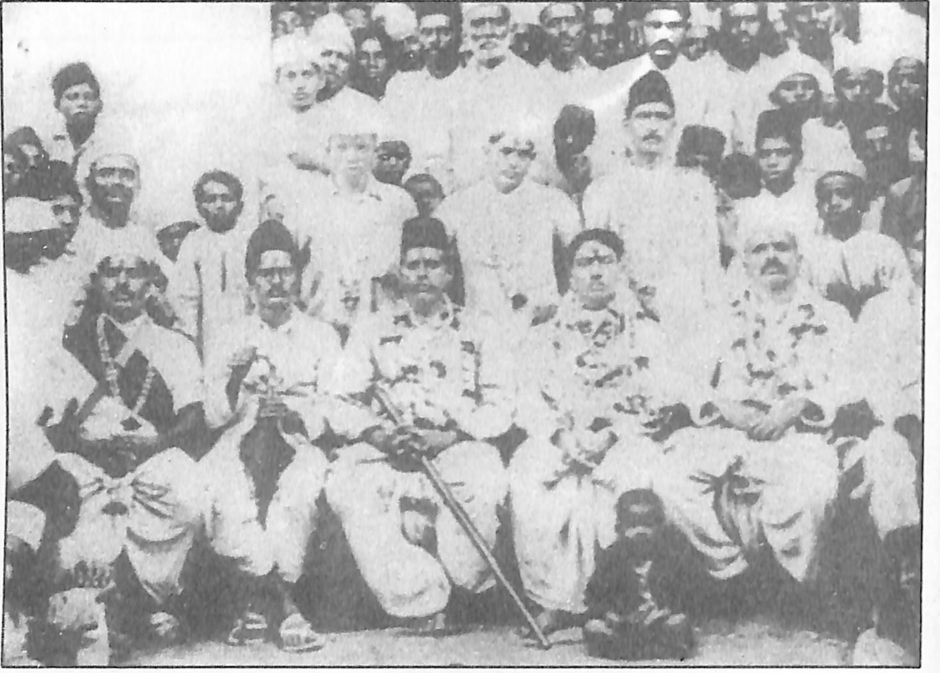


শুদ্ধি সমারোহ — বসে ঃ (২) দাজীসাহব বুটী; (৪) ডাঃ হেডগেওয়ার; (৭) ডাঃ কুর্তকোটী; (৯) রাজা লক্ষ্মণরাও ভোঁসলে; (১০) ডাঃ মুঞ্জে।



দি আইডিয়াল ডেমোক্রেটিক ইনসিওরেন্স কোং লিঃ, নাগপুর।

বসে ঃ (১) দত্তপন্ত পরাঞ্জপে; (২) দামুপন্ত দেশমুখ; (৩) শেষরাও পান্ঢরীপাণ্ডে; (৪) দাদাসাহেব খাপর্ডে; (৫) নানাসাহেব তেলঙ্গ; (৬) ডাঃ হেডগেওয়ার; (৭) ডি.ডি দেশপাণ্ডে।



জঙ্গল সত্যাগ্রহ ঃ চেয়ারে (১) বিট্‌ঠল্‌রাও দেব; (২) দাদারাও পরমার্থ; (৩) ডাঃ হেডগেওয়ার; (৪) ভৈয়াজী কুম্বলওয়ার; (৫) আপ্পাজী জোশী।



দাঁড়িয়ে (১) ডাঃ চোলকর; (২) ডাঃ হেডগেওয়ার; (৩) মার্তন্ডরাও জোগ; (৪) দাজী শাস্ত্রী চান্দেকর; (৫) ডাঃ মুঞ্জে; (৬) ভাউসাহেব টালাটুলে; (৭) ডাঃ পরাঞ্জপে; (৮) বিশ্বনাথরাও নবাথে। বসে ঃ গোবিন্দরাও লাখে; (২) দাদাজী লাম্বে।

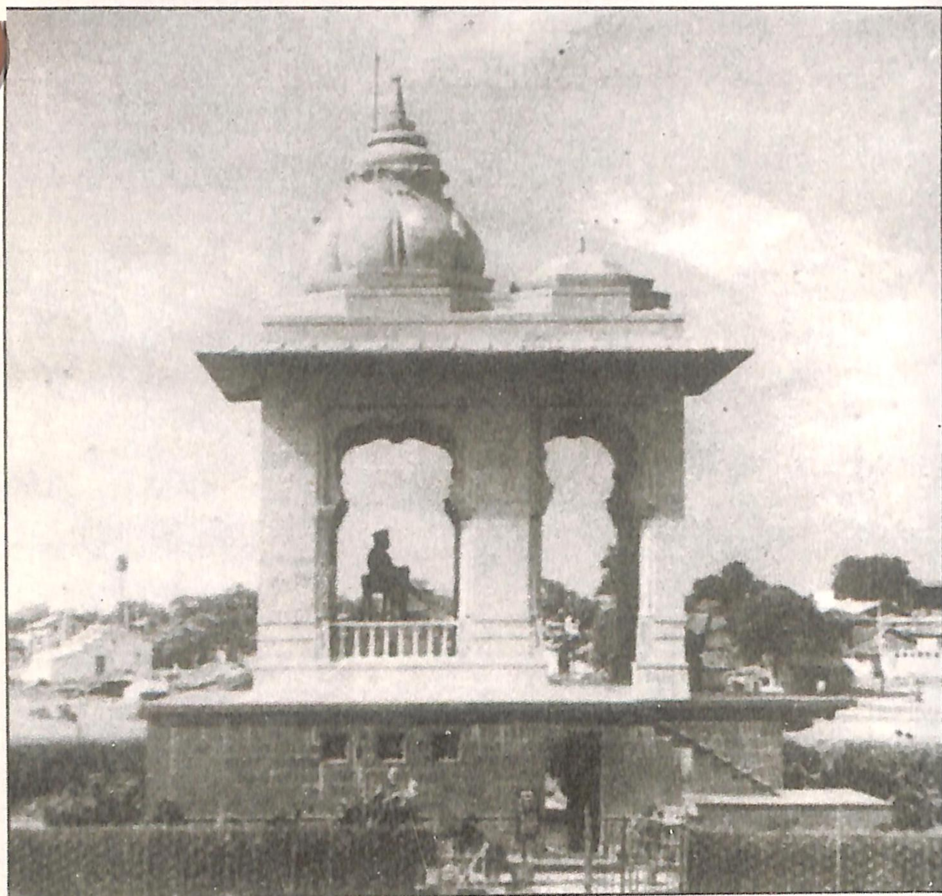

হিন্দু যুবক পরিষদ, শোভাযাত্রার দৃশ্য



সরস্বতী সিনেটোন, পুনায় অভ্যর্থনা

চেয়ারে ঃ (১) ভাউরাও অভ্যঙ্কর; (২) দাদাসাহেব তোরণে;
(৩) ডাঃ হেডগেওয়ার; (৪) মাধবরাও গোলওয়ালকর; (৫) নানাসাহেব তেলং





ডাঃ হেডগেওয়ার স্মৃতিমন্দির, রেশমবাগ, নাগপুর

যোজনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন এবং পরিশেষে তরুণ স্বয়ংসেবকদের সংখ্যা এবং গুরুদক্ষিণা বিষয়ে তাঁর প্রত্যাশা তাঁদের সামনে ব্যক্ত করতেন। বৈঠকগুলি থেকে ডাক্তারজী উপলব্ধি করলেন যে বর্গে আগত স্বয়ংসেবকদের মনে সঙ্ঘের পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য মহারাষ্ট্রের সর্বত্র সঙ্ঘকার্যের বিস্তার করার আকাঙ্ক্ষা ও আত্মবিশ্বাস পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এই বৎসর যারা স্নাতক হবে, সেই সব স্বয়ংসেবকদের কাছে ডাক্তারজী তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের যোজনা এবং তার মধ্যে সঙ্ঘকার্যের স্থান কতখানি থাকবে, সে বিষয়ে কথা বলেন। বলা অনাবশ্যক যে প্রচারকার্যের জন্য স্বয়ংসেবকেরা যাতে যায়, এই কথাবার্তার পিছনে সেটাই ছিল ডাক্তারজীর উদ্দেশ্য। দিনাংক ৭ই মে তিনি শ্রীগুরুজীকে যে পত্র লেখেন তাতে তিনি জানান, "এই বছরের ও.টি.সি. বিগত সমস্ত ও.টি.সি গুলিকে মাত করে দিয়েছে। সংখ্যা এবং ভবন উভয় দিক থেকেই এ বছরের বিশালত্বের অনেক বৃদ্ধি হয়েছে। স্বয়ংসেবকদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি লাভ করেছে এবং কার্য সম্বন্ধে গতিশীলতাও বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।"

পুনায় আসার পর যখন ডাক্তারজীর জেলা-সঙ্ঘচালক শ্রী ভাউরাও দেশমুখের সঙ্গে দেখা হল, তখন ডাক্তারজী একটি পুরাতন সংবাদপত্র বের করে লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দেওয়া একটি সংবাদ তাঁকে দেখালেন। তাতে বর্ষ প্রতিপদ উৎসবে শ্রী ভাউরাও প্রদত্ত ভাষণের একটি অংশ ছিল। সেখানে তিনি একটি রাজনৈতিক দলের সমালোচনা করেছিলেন। ডাক্তারজী রাজগিরিতে সেই ভাষণ পড়েছিলেন এবং যে অংশটি তাঁর মনে সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল, তার নিচে লাল পেন্সিল দিয়ে চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলেন। সেই অংশটির প্রতি শ্রী ভাউরাও দেশমুখের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বললেন, "এই উক্তির কী প্রতিক্রিয়া হয় সেটা ভাল করে লক্ষ্য করুন। স্বাস্থ্য ঠিক না থাকা সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টি সবদিকেই থাকত এবং প্রত্যেকটি বিষয় তিনি সূক্ষ্মভাবে অবলোকন করতেন।

গত কয়েক বছর যাবৎ ডাক্তারজীর শরীরে খুব বেশী ঘাম হত। গ্রীষ্মকালে এর দরুন আরো বেশী কষ্ট হত। এ বছর তাঁর পিঠের বাঁদিকে মাঝে-মাঝে অত্যধিক ব্যথা হত এবং পিঠের বাঁ দিকের তুলনায় ডান দিকটা খুব বেশী ঠাণ্ডা বলে মনে হত। একটু পরিশ্রমেই তাঁর ভীষণ ক্লান্তি অনুভূত হত, একটু কাছ থেকে তাঁকে দেখলেই সেকথা সহজেই বোঝা যেত। বাতাস লাগলে অথবা কোন ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণ করলে পিঠের ব্যথা ভীষণ বেড়ে যেত। তাই গরমকালেও তিনি কামিজের উপর মোটা উলের সোয়েটার পরতেন। কুঁজোর ঠাণ্ডা জলও কখনো পান করতেন না। এই সময়ে তিনি মোটা উলের কোটও পরতে শুরু করে দিয়েছিলেন। স্বাস্থ্যের এইরকম অবস্থাতেও তিনি পুনার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়ী গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং কার্যকর্তাদের সঙ্গে রাত্রি একটা-দুটো পর্যন্ত আলোচনার কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। এই বর্গ পুনার সুপ্রসিদ্ধ 'নূতন মারাঠী বিদ্যালয়' ভবনে চলছিল এবং প্রাসাদোপম বিদ্যালয়ের পিছনের দরজার ডানদিকে নিচের ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। ডাক্তারজীকে সেখানে দেখে বহু লোকের যাতায়াত শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং তিনিও তাঁদের সঙ্গে কথা-বার্তায় নিমগ্ন হয়ে যেতেন।

সকালের কার্যক্রম শেষ হবার পরেই ডাক্তারজী বিদ্যালয়ের পিছনে যোগেশ্বরী গলিতে অবস্থানকারী স্বয়ংসেবক শ্রী নানা ঘাণেকরের বাড়ীতে স্নান করতে যেতেন। স্নানের পূর্বে যখন তিনি কাপড়-জামা ছাড়তেন, তখন সেগুলি ঘামে এত ভিজে থাকত যে তখুনি কাচতে দিতে হত। কর্পূর দেওয়া তেল তিনি শরীরে বিশেষতঃ পিঠের ব্যথার জায়গায় ডলতেন। মালিশ তিনি নিজেই করতেন। যদি কোন স্বয়ংসেবক ঐ কাজের জন্য এগিয়ে আসত, তিনি বলতেন, "ব্যথার জায়গায় কত জোরে ডলতে হবে, তার অনুমান তুমি করতে পারবে না। তাই আমাকেই মালিশ করতে দাও।" তিনি আগেও অসুস্থতার সময় বা অন্য সময় কখনো-কখনো স্নানের পূর্বে তেল-মালিশ করতেন। তিনি মালিশ ভালবাসতেন। স্বাস্থ্যের অবনতি হলেও তাঁর আচরণে সহজ ও অসংকোচের ভাব বিদ্যমান ছিল। শ্রীনানা ঘানেকরের স্ত্রী প্রথম দিনেই স্নানের পর ডাক্তারজীকে কেশর ও বাদাম মেশানো দুধ দিলেন। দুগ্ধ পান করার সময় তিনি হেসে বললেন, "খুব ভাল দুধ দিয়েছ, কিন্তু দুধ-পান করার পর আমার বড়-বড় গোঁফগুলোকে ধোবার জন্য জল দিতে ভুলেই গেছ!"

এই সময় ডাক্তারজীর ভোজনের পরে খানিকক্ষণ কথা বলতে অসুবিধা হতে শুরু হয়েছিল। তা সত্ত্বেও, তিনি সেই অবস্থাতেও সঙ্ঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে স্বয়ংসেবকদের সামনে চারটি ভাষণ দেন। এই ভাষণগুলিতে চিন্তার সুসংবদ্ধতা, ভাবনাগুলির সহজ প্রকাশ-ভঙ্গী এবং বাণীর ওজস্বিতা দেখে কেউ অনুমানও করতে পারতনা যে তিনি কিছুটা শারীরিক কষ্ট অনুভব করছিলেন। তাঁর বোঝানোর পদ্ধতি ছিল পাকা ফলের মত সুমিষ্ট ও রুচিকর। তাঁর শব্দগুলির পিছনে চল্লিশ বছরের অখণ্ড তপস্যার বল ছিল। সেই কারণে প্রত্যেকটি শব্দ শ্রোতাদের সংশয় সমূলে উচ্ছেদ করে দিত।

পুনার ঐ চারটি ভাষণ বহু উল্লেখযোগ্য চিন্তায় সমৃদ্ধ। রাষ্ট্রীয়ত্বের মনোভাব না থাকার দরুন কেমন করে আমাদের সমাজকে পরাভূত হতে হয়, তার বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যখন নিজেকে 'হিন্দুরাষ্ট্রাঙ্গভূত' রূপে উপলব্ধি করে তদনুরূপ আচরণ করবে, তখনই আমরা এই অধঃপতন থেকে পুনরায় অভ্যুত্থান করতে পারব। তিনি বলেন, "হিন্দুস্থান এক রাষ্ট্র হওয়ার কারণে আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি তার অঙ্গ এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রের জন্য — একথা আমাদের বুঝতে হবে। বিরাট রাষ্ট্র-পুরুষের সকল অঙ্গকেই সেই বিরাট স্বরূপের পূর্ণতার জন্যই প্রযত্নশীল থাকতে হবে। শরীরের কোন অংশ, যেমন আঙুল, সম্পূর্ণ শরীর থেকে আলাদা অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে চলতে চাইলে তা সম্ভব নয়। সমাজের প্রতি অঙ্গের অবস্থাও তা-ই।" সঙ্ঘ পনের বছরে মানুষের চোখে যে স্থান করে নেবার মত সংগঠন নির্মাণে সাফল্য অর্জন করেছে, তার মর্ম বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন, "আমরা যে সাফল্য লাভ করেছি, তা স্বয়ংসেবকদের নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের শক্তিতেই হয়েছে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই কাজ হতে পারত না। কোন তত্ত্বজ্ঞানকে যদি প্রমাণ করতে হয় এবং সত্যতা জনসাধারণকে শেখাতে হয়, তাহলে তার জন্য শক্তির অধিষ্ঠান আবশ্যক। মনে রাখবেন, যদি শক্তি না থাকে তাহলে ন্যায়বিচারও মূল্যহীন হয়ে পড়ে (Justice without force is impotent)।" তিনি এ কথাও অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে জানান যে, সর্বদা সতর্ক

থাকতে হবে যে সংগঠন কোন ভাবেই যেন অন্তর্কলহের শিকার না হয়। তিনি বলেন, "সঙ্ঘ বাইরের আক্রমণে ভীত নয়। কিন্তু ভিতরে কোন গণ্ডগোল যেন না হয়। সঙ্ঘের সকল কাজ প্রেম-প্রীতির ভেতর দিয়েই হওয়া উচিত। আজ আমাদের কাছে আর কোন শক্তি নেই। আমাদের শুধু নৈতিক শক্তি আছে এবং তার সাহায্যেই আমরা আমাদের কাজ করে চলেছি।"

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্রম-বর্ধমান সামর্থ্য থেকে অনেকের মনে হল যে এদের দিয়ে কিছু কাজ করানো যাক। মহাবলেশ্বর থেকে অধ্যাপক ভালচন্দ্র পুণ্ডলিক আডারকর, এম.এ, ডাক্তারজীকে পত্র লিখে দেশের সমস্যাবলী এবং সঙ্ঘের ধ্যেয় ও নীতির বিষয়ে আলোচনা করতে দু দিনের জন্য পুনায় আসার কথা জানিয়েছিলেন। তদনুসারে তিনি এলেন। তিনি ডাক্তারজীর সঙ্গে আলোচনা করার সময় যে চিন্তা ব্যক্ত করেন তা সঙ্ঘের চিন্তাধারার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ছিল। বক্তৃতার পরে চা-পানের সময় একজন কার্যকর্তা সে কথার উল্লেখ করেন। প্রোফেসার সায়েবের কথাটা পছন্দ হল না এবং তিনি পরের দিন রাত্রের পরিবর্তে সেইদিনই চলে যাবেন বলে ঠিক করে ডাক্তারজীর কাছে তাঁর অভিপ্রায় জানিয়ে দেন। তিনি কেন তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইছেন, সে কথা বুঝে নিতে ডাক্তারজীর দেরী হল না এবং তিনি শ্রী আডারকরের সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন যে তাঁর ক্রোধ একেবারে শান্ত হয়ে গেল, সেই কারণে তিনি তাড়াতাড়ি চলে যাবার সংকল্প ত্যাগ করলেন। প্রান্ত-সঙ্ঘচালকের সঙ্গে এব্যাপারে কথা বলার সময় ডাক্তারজী বলেছিলেন যে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তার জন্য আমাদের উত্তম ব্যবহারের মধ্যে কোন প্রকার ন্যূনতা কখনই থাকা উচিত নয়। ডাক্তারজীর সেদিনকার আচরণের বর্ণনা করে শ্রী কাশীনাথ পন্ত লেখেন, "যেমন কোন শ্বশুর তার জামাই-এর মানভঞ্জন করে, সেইভাবে ডাক্তারজী প্রবোধ দিচ্ছিলেন।" সংগঠনের মঙ্গল তথা উন্নতির স্বার্থে ডাক্তারজী সর্বপ্রকার শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট সহ্য করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন।

ডাক্তারজীর পুনায় থাকাকালেই দিনাংক ৫ই মে গয়ার সঙ্ঘচালক শ্রী বাবুয়াজী শ্রী আপ্পাজী জোশীর সঙ্গে সেখানে এলেন। দিনাংক ১১ই মে মহারাষ্ট্র প্রান্তের কার্যকর্তাদের দু দিনের বৈঠক শুরু হল। বৈঠকে সরকার্যবাহ শ্রীগুরুজীও এসেছিলেন। মহারাষ্ট্রের সব জেলার কার্যকর্তারা ছাড়াও ধারওয়ার, বেলগাঁও এবং বিদর্ভের কয়েকটি জেলার কার্যকর্তারাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সর্বপ্রথম প্রত্যেক জেলার কার্যকর্তারা নিজ-নিজ ক্ষেত্রের কাজের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। সেই সময় মহারাষ্ট্রে আড়াই শো শাখা এবং আঠার হাজার দৈনিক উপস্থিতি থাকত। সকলের কার্যবৃদ্ধি সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পাচ্ছিল।

দুপুরের বৈঠক চলছিল, সেই সময় হঠাৎ স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরের আগমন হল। ডাক্তারজীর আগ্রহে তিনি পাঁচ মিনিট বক্তৃতাও দিলেন। তাতে তিনি বললেন, "...... আজ হিন্দুরাষ্ট্রের অবস্থার ভীষণ অবনতি ঘটেছে। এই অবস্থায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘই একমাত্র ভরসাস্থল। সঙ্ঘ আজ যা করছে মহান্ রাষ্ট্রগুলিকেও তা-ই করতে হয়েছে। দুর্বলতা থেকে সবলতার দিকে অগ্রসর হওয়ার পথই হল সংগঠন। অতএব, আপনারা আপনাদের নেতার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখুন। আমরা সারা জীবন ধরে দেশের জন্য অনেক আন্দোলন করেছি,

কিন্তু কোনটাই পুরোপুরি সফল হয়নি। সেই কারণে পুনরায় আমি জোর দিয়ে বলছি যে এই এক সংগঠনই হিন্দুরাষ্ট্রের উদ্ধার করতে সক্ষম হবে।"

পরের দিনই বৈঠকে শ্রীগুরুজী এবং শ্রী আপ্পাজী জোশীর ভাষণ হল। শ্রীগুরুজী বললেন, "..... আজ আমাদের কাজ এমন হয়ে ওঠেনি যে আমরা সন্তুষ্ট হয়ে বসে পড়তে পারি। আত্মতুষ্টি ও নিজেদের বাহবা দেবার প্রবৃত্তি উন্নতির পক্ষে মারাত্মক। এই কারণে কাজে কখনও আত্মতৃপ্ত হয়ে চলবেন না।" রাত্রি দশটার পর ডাক্তারজীর দু ঘণ্টা ব্যাপী সমারোপ ভাষণ হল। এই সময় 'নূতন মারাঠী বিদ্যালয়'-এর সভাগৃহে কার্যকর্তাদের দ্বারা একেবারে পরিপূর্ণ ছিল। অসুস্থতার কারণে ডাক্তারজী চেয়ারে বসে ভাষণ দেন। তাঁর এই ভাষণে তিনি সংযম তথা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সংগঠনে ব্যবহার এবং কার্যপদ্ধতির এমন চমৎকার বিশ্লেষণ করেন যে তার দৃঢ় ছাপ উপস্থিত কার্যকর্তাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে গেল।

ভাষণের সূচনাতেই তিনি প্রতিপাদন করে দেখালেন যে আমাদের আগ্রহ — লেখন, ভাষণ, প্রকাশন ইত্যাদি না হয়ে সমস্ত জোর 'কাজ করা'র উপর দেওয়া হয়। এর পরে কীভাবে কার্যকর্তাদের আচরণ হওয়া উচিত, তার বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন, "সকলের সঙ্গে অতি আন্তরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার কর। কংগ্রেস, সোশ্যালিস্ট, হিন্দু সভা ইত্যাদি সংস্থার মানুষেরা আমাদেরই আপনজন। আমরা যেন তাঁদের সঙ্গে নিষ্কপট মনোভাব নিয়ে আচরণ করি। কারো সঙ্গে মিথ্যাচরণ কোরোনা, এবং কাউকে বিপদে ফেলোনা। কংগ্রেসের কোন ব্যক্তি আমাকে এতটুকু দ্বেষ করতে পারেনা। দ্বেষের কারণই বা কী হতে পারে? যদি দল ভিন্ন হয়, তা সত্ত্বেও বন্ধু হিসাবে মুক্ত হৃদয়ে এক স্থানে মিলিত হতে আপত্তি কোথায়? আমাদের শুধু সম-মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের নিয়েই কাজ করতে হবে, এমন নয়, বিরোধীদেরও আপন করে নিতে হবে। এর জন্য সঙ্ঘ সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব স্পষ্ট ও শুদ্ধ হওয়া দরকার। আমাদের ধ্বজ ও চিন্তাধারা তাঁরা স্বীকার না করলেও তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার প্রয়োজন নেই। আমরা তাঁদের বিরোধিতা করার সুযোগই যেন না দিই। যদি আমরা চাই যে সব কাজ ব্যবস্থিত রূপে চলুক, তাহলে প্রীতির ভাব নিয়ে চলুন। ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন পথই নেই। প্রীতি ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করতে-করতেই যেন আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হয়।"

সঙ্ঘের সূচনা থেকেই ডাক্তারজী শিশু এবং বালকদের উপর শুচি-শুদ্ধ সংস্কার করার এবং তাদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আজ সংগঠনের বৃদ্ধি সত্ত্বেও উক্ত বিষয়ের প্রতি এতটুকু অবহেলা যেন না করা হয়। একথা বলার পর তিনি বলেন, "শিশুদের গণ প্রমুখ ত্যাগী ও উজ্জ্বল চরিত্রের হওয়া প্রয়োজন। শিশুদের খেলা করানো সহজ কাজ নয়। তাদের খেলাতে-খেলাতে মাঝে-মাঝে নীরসতা ও একঘেয়েমির সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই একঘেয়েমির কাজই রাষ্ট্রের জন্য করতে হয়। আজকের নেতারা এই কাজ করেন না। রাষ্ট্রীয় সংগঠনের কাজ অত্যন্ত কষ্টকর ও তিক্ত-কষায়। কিন্তু তার মধ্য থেকেও তেজস্বিতার সৃষ্টি হয়। নাগপুরের শাখায় যে শিশুরা আসত, আজ তারাই উৎসাহী তরুণ কার্যকর্তা হয়ে কাজ করছে। এইরকম, আজকের বালক স্বয়ংসেবকেরা আমাদের ভাবী শক্তি।"

অতঃপর তিনি বলেন যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নগরে তিন শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে এক শতাংশ হারে আমাদের কার্যবৃদ্ধি করতে হবে। তিনি একথাও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন যে আমাদের কাজ শুধু এইজন্য নয় যে বিদেশী ইংরাজ অথবা মুসলমান আমাদের উপর আক্রমণ করছে। তিনি বলেন, "বিদেশী শক্তি আমাদের উপর আক্রমণ করছে, সেই জন্য আমাদের কাজ করা উচিত — এই চিন্তা একধারে সরিয়ে রাখুন। খাকসাররা বাড়ছে, অতএব আমাদেরও বাড়তে হবে। এরকম চিন্তা করলে ওরা থেমে গেলে আমাদেরও থেমে যেতে হবে। আমাদের কাজ প্রতিক্রিয়ামূলক নয়। অত্যাচার অথবা লড়াইএর জন্য আমরা সংগঠন করছিনা। সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে এর জন্য সংগঠন বৃদ্ধি করবেন না। বরং সংকট সৃষ্টিই হতে না পারে, তার জন্য প্রয়াস করুন।"

এইভাবে, একথাও বলেন "স্বয়ংসেবক-বৃদ্ধির কলা আমাদের শিখে নিতে হবে, এবং সব কাজই অভ্যাসের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে করা যায়।" তিনি স্পষ্ট করে দেন যে সংগঠনের সদস্য কেমন এবং কত তৈরী করতে হবে। এ বিষয়ে তিনি বলেন যে "যারা কট্টর নিষ্ঠাবান হিন্দু, তাদের প্রথমে সঙ্গে নিতে হবে। একশত লোকের মধ্যে অন্ততঃ একজন তো হিন্দুত্বনিষ্ঠ, ধ্যেয়নিষ্ঠ, সঙ্ঘের কাজকে প্রধান কাজ বলে স্বীকার করে তার জন্য নিজের জীবন সঁপে দেবার মত স্বয়ংসেবক চাই। সে হবে একেবারে পাক্কা এবং তার সারা জীবন সঙ্ঘের কাজই করা উচিত।"

শুধু নমুনা হিসাবে উদ্ধৃত এই কয়েকটি বিন্দু থেকে তাঁর ভাষণে ব্যক্ত চিন্তাধারার সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। প্রান্তীয় বৈঠক শেষ হতেই ডাক্তারজীর নাগপুরে যাওয়ার কার্যক্রম নির্ধারিত ছিল। তাঁকে অর্পণ করার জন্য বর্গের স্বয়ংসেবকেরা অর্থ-সংগ্রহ করতে শুরু করে। ঐ সময় পুনার 'মাধব আর্ট স্টুডিও'র শ্রী দেবধর ডাক্তারজীর কয়েকটি ফটো তাঁকে দেখাবার জন্য নিয়ে আসেন। ডাক্তারজী আলোকচিত্রগুলি দেখে হালকা সুরে বলেন, "আমার শরীর ভিতর থেকে এমন ঝাঁঝরা হয়ে গেছে যে তার ছবিই ভাল তোলা সম্ভব!"

১৪ই মে শ্রীগুরুজী নাগপুর রওনা হলেন এবং পরদিন শ্রী বাবুয়াজীর সঙ্গে ডাক্তারজীর পুনা থেকে রওনা হবার কথা। স্বয়ংসেবকদের কাছে বিদায় গ্রহণের কার্যক্রম 'নূতন মারাঠী বিদ্যালয়'-এর প্রাঙ্গণে ১৪ তারিখের রাত্রে অনুষ্ঠিত হল। ঐ সময় ডাক্তারজীকে মাল্যশোভিত করে স্বয়ংসেবকদের সংগৃহীত অর্থের তোড়া অর্পণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে কয়েকজন স্বয়ংসেবকের বক্তৃতাও হয়। সেই সময় জনৈক স্বয়ংসেবক বক্তৃতা দিতে অনভ্যস্ত হওয়ার দরুন তার মুখ থেকে ভুল করে এই বাক্য উচ্চারিত হল — "আমরা ডাক্তারজীকে শেষ বিদায় জানাচ্ছি।" নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে ঘাবড়ে গিয়ে একটু থেমে গেল। তার উক্তি সকলকেই বিচলিত করে তুলল। কিন্তু ডাক্তারজী হাসতে লাগলেন। এই অনুষ্ঠানে যে গান গাওয়া হয়, তাতে ব্যক্ত ভাবনা সমস্ত স্বয়ংসেবকদের মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। গানটি ছিল —

"তুম্‌হি অসল্যাবরতি অম্‌হাঁ কায় হো উণেঁ।
তুম্‌হি অসল্যাবরতি গমে গগন ঠেগেণেঁ।"

("তোমাকে পেলে আর কী চাওয়ার থাকে।
তোমাকে পেলে গগনও বড় ছোট লাগে।।")

এই মনোভাবই স্বয়ংসেবকদের বক্তৃতাগুলির মধ্যেও ব্যক্ত হয়।

পর দিন পুনা স্টেশনে ডাক্তারজীকে বিদায় জানাতে আগত স্বয়ংসেবকদের ভিড়ে পুরো প্ল্যাটফর্ম ভরে গিয়েছিল। ডাক্তারজী স্টেশনে এসে উপস্থিত হতেই প্রান্ত সঙ্ঘচালকজী স্বয়ংসেবকদের অন্তর্মুখ করে দুইটি পংক্তিতে সম্পৎ করার নির্দেশ দিলেন। ডাক্তারজী দুই পংক্তির মাঝখান দিয়ে স্বয়ংসেবকদের নিরীক্ষণ করেন এবং কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করে ডাক্তারজী রেলের কামরার কাছে এসে দাঁড়ালেন। কামরার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক্তারজী কার্যকর্তাদের সাথে হাস্য-পরিহাস করছিলেন এমন সময় ট্রেন ছাড়ার ঘন্টা বাজল। গাড়ী চলতে শুরু করলে ডাক্তারজী হাতের ছড়ি উপরে তুললেন এবং সকলকে নমস্কার জানিয়ে সবাই যাতে শুনতে পায়, এইরকম জোরে বল্লেন — "এই দেখ আমি চললাম"। শত-শত স্বয়ংসেবকদের অশ্রুসজল চোখের সামনে ডাক্তারজীর প্রসন্ন মূর্তি গাড়ীর সঙ্গে-সঙ্গে দূরে, আরো... আরো... দূরে মিলিয়ে গেল।

পরদিন শ্রী বাবুয়াজী ও ডাক্তারজী নাগপুরে পৌঁছলেন। নাগপুর স্টেশনে অধিকারী শিক্ষণবর্গের সর্বাধিকারী হিসাবে শ্রীগুরুজী ডাক্তারজীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এক সুন্দর মোটা মালা নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তারজী কামরা থেকে নামতেই শ্রীগুরুজী ভক্তিভরে তাঁকে মালা পরাতে উদ্যত হতেই ডাক্তারজীর চোখের সংকেত শ্রীগুরুজী বুঝে গেলেন যে তিনি বলছেন, "আমাকে কেন মালা পরাচ্ছ, নবাগত বাবুয়াজীকে পরাও" এবং ইঙ্গিত বুঝে শ্রীগুরুজী ঐ মালা তিনি বাবুয়াজীকে অর্পণ করেন। কঠোর কর্মযোগের অভ্যাসের ফলে স্বাগত-সম্বর্ধনা-স্তুতি ইত্যাদির লালসা তাঁর মন থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অতএব, তাঁর এই আচরণে একথাই নির্ণয় হল যে সঙ্ঘে নবাগত কর্তৃত্ববান্ পুরুষকে নিজ সৌজন্যের দরুন আনন্দের অনুভূতি লাভ করিয়ে সানন্দে সঙ্ঘের অনুগামী হয়ে উঠে নিজেকে তিনি যেন ধন্য মনে করেন।

নাগপুরে ডাক্তারজী নীল সিটি বিদ্যালয়ে অধিকারী শিক্ষণ বর্গের অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট বসতিগৃহে গেলেন। দুপুরের বৌদ্ধিকবর্গে তিনি উপস্থিত ছিলেন। পুনা থেকে নাগপুরের দীর্ঘ ট্রেন যাত্রার ক্লান্তি তাঁর চেহারায় ফুটে উঠেছিল। নাগপুরের প্রচণ্ড গ্রীষ্মের হল্‌কায় তাঁর কষ্ট আরো বেড়ে গেল। নাগপুরের ১১৫-১১৬° তাপমাত্রায় সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়ে। সুতরাং রোগ-জর্জর দুর্বল-দেহ ডাক্তারজীর অবস্থা অবর্ণনীয় হয়ে উঠল। নাগপুরের তুলনায় পুনার উষ্ণতাকে শীতলই বলা চলে। পনের-কুড়ি দিন পুনায় থাকার পর নাগপুরের উষ্ণতা তাঁকে বড় বেশী পীড়িত করে তুলল এবং সন্ধ্যার দিকে জ্বর হল। তা সত্ত্বেও তিনি বর্গের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতেন।

বিভিন্ন প্রান্তে সঙ্ঘের কাজ মাত্র তিন-চার বছর আগে আরম্ভ হয়েছিল, তবু এ বছরের মত এত স্বয়ংসেবক অধিকারী শিক্ষণবর্গে সঙ্ঘের শিক্ষা গ্রহণের জন্য এ পর্যন্ত কখনো আসেনি। বর্গের চৌদ্দশত শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ছয় শত সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ,

বিহার, বাংলা, মাদ্রাজ, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট থেকে এসেছিল। স্বভাবতঃ এই প্রগতি দেখে ডাক্তারজী আনন্দিত হলেন। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত এই সব কার্যকর্তাদের সঙ্গে আগামী কুড়ি-পঁচিশ দিন ভাবী কার্যক্রমের যোজনা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে, এই আশা নিয়ে তিনি নাগপুরে এসেছিলেন। কিন্তু নিয়তির যোজনা ছিল অন্যরকম!

যে দিন ডাক্তারজী নাগপুরে এলেন, সেই রাত্রেই বর্গে সমস্ত স্বয়ংসেবকদের জন্য সন্ত তুকড়োজীর ভজনের কার্যক্রম রাখা হয়েছিল। জ্বর থাকা সত্ত্বেও ডাক্তারজী কার্যক্রমে সম্মিলিত হলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর সেখানে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। অতএব, তিনি উঠে একাই বাড়ী চলে গেলেন। সেই সময় বাড়ীর সকলেও ভজনের কার্যক্রমে গিয়েছিলেন। যেমন-তেমন করে উপরে উঠে তিনি নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। রাত্রে বাড়ীর লোকেরা ফিরে এসে দেখলেন ডাক্তারজীর ১০৪° জ্বর।

পরদিন ঔষধ ও সেবা-শুশ্রূষা শুরু হয়ে গেল। জ্বর ও পিঠের ব্যথা কখনো কম্‌ত, আবার কখনো অত্যন্ত বেশী বেড়ে যেত। ডাঃ হরদাস, ডাঃ বিঞ্চুরে প্রমুখ ডাক্তাররা বার বার এসে তাঁকে পরীক্ষা করে যেতেন। কিন্তু জ্বর বা পিঠের ব্যথা কমার কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছিল না। দিনে দিনেই ডাক্তারজীর রোগের কষ্ট ও দুর্বলতা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল। সেই সঙ্গে অন্য সকলের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ডাক্তারজীর বড় দুঃখ হচ্ছিল যে সারা ভারত থেকে এত তরুণ কার্যকর্তা সমবেত হয়েছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলার মত শক্তিও তাঁর অবশিষ্ট নেই। এই দুশ্চিন্তা ও বেদনার আরো কুপরিণাম হচ্ছিল তাঁর অসুস্থতার উপর। ডাক্তারজীর অসুস্থতার সংবাদ শোনার পর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবকেরা অন্ততঃ একবার ডাক্তারজীর দর্শনলাভের জন্য তাঁর বাড়ীতে আসতে শুরু করল। ডাক্তারজীর ঘরে কেউ এসেছে জানলেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে বসতেন। বার-বার এ রকম ওঠা ও শোওয়ার দরুন তাঁর দুর্বলতা আরো বেড়ে গেল। সেই কারণে বাধ্য হয়ে স্বয়ংসেবকদের নির্দেশ দেওয়া হল যে, কেউ যেন ডাক্তারজীর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না যায়। তা সত্ত্বেও নাগপুরের বাইরের কোন-না-কোন স্বয়ংসেবক ডাক্তারজীর দর্শনলাভের জন্য এসে পড়ত। এদের বাইরে থেকেই ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করা হত, কিন্তু ডাক্তারজী যখনই কারো আসার কথা বুঝতে পারতেন, তাকে তখনই ভিতরে পাঠিয়ে দিতে বলতেন।

ডাক্তারজীর এই গুরুতর অসুস্থতার সময়ে বোম্বাই থেকে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর চিঠি এল যে তিনি ২০শে মে ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে নাগপুরে আসছেন এবং একদিন থেকে ২১শে মে কলকাতা যাবেন। এই সময় বাংলায় ফজলুল হকের মন্ত্রিমণ্ডল চলছিল এবং তার গোপন চক্রান্তে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি অঞ্চলে হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু হয়ে গিয়েছিল। হিন্দুদের উপর মুসলমানদের এই অত্যাচারের দিক থেকে ইংরাজ সরকার জেনে-বুঝে চোখ বন্ধ করে রেখেছিল। ইংরেজদের কূট-কৌশল ছিল যে হিন্দুরা যেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের সুযোগ না পায় এবং মুসলিম লীগের মাধ্যমে হিন্দুদের উৎসাহ ভগ্ন করা যায়। এই বিষম পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী চেষ্টা করছিলেন

এবং এবিষয়ে পরামর্শ করার জন্য তিনি ডাক্তারজীর সঙ্গে সাক্ষাতের কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন।

নাগপুরে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সঙ্ঘের বর্গ পরিদর্শন করলেন এবং রাত্রি নটায় ডাক্তারজীর বাড়ীতে এলেন। ডাক্তারজী এগিয়ে এসে তাঁকে স্বাগত জানালেন। হাত মেলাবার সময় শ্যামাপ্রসাদ ডাক্তারজীর দিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘আমি শুনেছিলাম আপনি অত্যন্ত অসুস্থ এবং শয্যাশায়ী হয়ে আছেন?’’ একথা শুনে ডাক্তারজী হেসে বললেন, ‘‘আপনার মত বড় ডাক্তার আমার বাড়ীতে আসছেন শুনেই আমার অসুখ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে।’’ এই সময় ডাক্তারজীর ১০৩° জ্বর ছিল, তা সত্ত্বেও তিনি কোথা থেকে এত শক্তি ও উৎসাহ পাচ্ছিলেন, তা উনিই জানেন।

ডাক্তারজী শ্যামাপ্রসাদকে এনে বসালেন এবং তাঁর কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করলেন। তারপর কথাবার্তা শুরু হল। সেই সময় শ্রীগুরুজী, ভাণ্ডারার শ্রী দাদাসাহেব দেব, শ্রী আপ্পাজী জোশী এবং নাগপুরের কয়েকজন প্রমুখ কার্যকর্তাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আনুষ্ঠানিক প্রশ্নাবলীর পর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বাংলার হৃদয়-বিদারক ঘটনাসমূহের বর্ণনা শুরু করলেন। তাঁর প্রতিটি শব্দ থেকে ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশ পাচ্ছিল। উপস্থিত সকলেই তাঁর বর্ণনা শুনে শংকিত হয়ে উঠলেন। ডাক্তারজী শ্যামাপ্রসাদের কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। বহু হৃদয়বিদারক বিবরণ দিয়ে ডঃ মুখার্জী বললেন, ‘‘এখন বাংলায় কোন ‘হিন্দু রক্ষা দল’ বানানো ছাড়া হিন্দুদের বাঁচার কোন রাস্তা নেই।’’ এই কথা বলার সময় তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। তাঁর কথা শুনে ডাক্তারজী আশংকা প্রকাশ করে বললেন, ‘‘আপনি ‘হিন্দু রক্ষা দল’ তৈরীর কথা চিন্তা করছেন, কিন্তু ইংরেজ ও লীগপন্থী মুসলমানরা কি তাদের চোখের সামনে তাদের অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাবে যে দল তাকে চলতে দেবে?’’

একথা শুনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ চিন্তায় পড়ে গেলেন এবং বললেন, ‘‘তাহলে এই অবস্থায় হিন্দুদের জন্য সঠিক রাস্তা কী?’’

ডাক্তারজী অত্যন্ত গম্ভীর এবং শান্ত স্বরে নিজের ভূমিকা বিশদ করে বললেন, ‘‘বাংলা অথবা পাঞ্জাবে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং নানা স্থানে হিন্দুদের পক্ষে যে বিকট পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছে, তার মূল কারণ হল আমাদের সমাজের অসংগঠিত অবস্থা। এই অবস্থাকে স্থায়ীরূপে দূর করা না গেলে, কোন-না-কোন স্থানে হিন্দুদের উপর এইরকম উপদ্রব চলতেই থাকবে। এর বিরুদ্ধে ক্ষণস্থায়ী প্রতিক্রিয়ামূলক তথা আংশিক উপায়-যোজনা করে পরিস্থিতিকে স্থায়ীরূপে পরিবর্তন করা যাবেনা। এর জন্য সমগ্র দেশের হিন্দুদের মনে সমষ্টিভাব নির্মাণ করা এবং এক রাষ্ট্রীয়ত্বের সংস্কারের মধ্যে দিয়ে হিন্দুদের মনকে প্রভাবী করে তোলা আবশ্যক। হিন্দুদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম এবং রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে বৈভবের শিখরে আরূঢ় হওয়ার মহত্বাকাঙ্ক্ষা নির্মাণ করাই রাষ্ট্রোত্থানের বিধায়ক ও স্থায়ী পথ এবং সঙ্ঘ সেই পথই অনুসরণ করে চলেছে।’’

এই সম্ভাষণে ডঃ মুখার্জী এই প্রস্তাবও করেন যে সঙ্ঘের এবার রাজনীতিতে প্রবেশ করা উচিত। ডাক্তারজী তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন যে ‘‘সঙ্ঘ প্রচলিত রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

করবেনা।" ডাক্তারজী শ্যামাপ্রসাদের নিকট এই আশাও প্রকাশ করেন যে অল্প দিন পূর্বে বাংলায় সঙ্ঘের যে কাজ শুরু হয়েছে, সে কাজ যদি তাঁর মত ব্যক্তির সমর্থন ও আশীর্বাদ লাভ করে, তাহলে সঙ্ঘের কাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উন্নতি করবে এবং হিন্দুদের রক্ষা ও সহায়তার ব্যবস্থা আপনা থেকেই হয়ে যাবে। ডাক্তারজীর আত্মবিশ্বাসপূর্ণ তথা মৌলিক চিন্তাধারায় ডঃ মুখার্জী অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন, এবং যখন তিনি তাঁর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণের জন্য উঠে দাঁড়ালেন তখন দুজনে পরস্পরের দিকে এমন আত্মীয়তার দৃষ্টিতে দেখছিলেন যে শব্দের দ্বারা তার বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

অধিকারী শিক্ষণবর্গে অংশগ্রহণকারী চৌদ্দ শত স্বয়ংসেবক ভোর চারটে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকত। শ্রী গুরুজী সর্বদা চেষ্টা করতেন যে সব কার্যক্রমই যেন যোজনা অনুসারে, নির্ধারিত সময়ে এবং সংস্কারক্ষম রীতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত দৌড়াদৌড়ির মধ্যেও তিনি সময় করে ডাক্তারজীর কাছে আসতেন এবং তাঁর ঔষধ-পথ্য যথাযথভাবে চলছে কিনা তার খোঁজ-খবর ও দেখাশোনা করতেন। ডাক্তারজীর শুশ্রূষার জন্য তাঁর বাড়ীর লোকেরা ছাড়া কয়েকজন স্বয়ংসেবকেরও আসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শ্রী যাদবরাও জোশী, শ্রীকৃষ্ণরাও মোহরীর, শ্রী শ্রীকৃষ্ণ পুরাণিক, শ্রী বাবাসাহেব দেশমুখ, শ্রী ভাউরাও দেওরস ইত্যাদি স্বয়ংসেবকরাই প্রধানতঃ সেবা-শুশ্রূষার কাজে সংলগ্ন ছিলেন। ডাক্তারজী বিছানায় শুয়ে এই স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে কথা বলতেন। তিনি তাঁদের বলতেন, যত বেশী সম্ভব কলেজের শিক্ষা লাভ করার পর এক-একটি প্রান্তের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। একবার কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণকারী এক তরুণ স্বয়ংসেবক শ্রী বিশ্বনাথ লিময়ে তাঁকে বললেন, "আমার শিক্ষার এটা শেষ বছর। এরপরে আমার পড়া-শুনা চালিয়ে যাবার ইচ্ছা বাবার নেই। সেই কারণে, আগামী বছর আমি কাশী যেতে পারব বলে আমার মনে হয়না।" একথা শুনে একটু দুঃখিত হয়ে ডাক্তারজী বললেন, "কাশীতে সকলে পড়াশুনা করতেই যায়। সঙ্ঘের জন্য কেউ যায় না। একথা আমি জানি। শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে সঙ্ঘের যোজনা তৈরী করতে হয়। তবে এর পর এ বিষয়ে একটু গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করা প্রয়োজন।" ডাক্তারজী গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় যে চিন্তা ব্যক্ত করেছিলেন, তার পরিণাম এই হল যে শ্রী লিময়ে প্রচারক হিসাবে সঙ্ঘের কাজ করতে বেরিয়ে পড়েন।

ডাক্তারজীর নাগপুরে আসার পর প্রায় পনের দিন হতে চলল। কিন্তু তাঁর রোগ প্রশমনের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছিল না। অতএব, থেকে-থেকেই তাঁর আশঙ্কা হচ্ছিল যে আর কয়েকদিনের মধ্যেই বর্গ শেষ হবে এবং সব স্বয়ংসেবক নিজেদের বাড়ী ফিরে যাবে, আর তিনি তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন না। তিনি বর্গের অধিকারীদের কাছে জেদ ধরে বসলেন যে একবার আমাকে বর্গে নিয়ে চলুন এবং সব স্বয়ংসেবকদের একবার প্রাণ ভরে দেখে নিতে দিন। অতএব, রবিবার, ২রা জুন, ১৯৪০ সন্ধ্যার শান্ত সময়ে তাঁকে বৌদ্ধিক বর্গে নিয়ে যাওয়া হল। সেদিন শ্রীগুরুজীর 'শ্রী ছত্রপতি শিবাজীর মির্জা রাজা জয়সিংহকে লেখা পত্র' এই বিষয়ে চিন্তাশীল ও ওজস্বী ভাষণ হল। সেই ভাষণে ব্যক্ত আত্মবিশ্বাস তথা হিন্দুরাষ্ট্রের উদ্ধারের জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা ডাক্তারজীকে পর্যন্ত উদ্বুদ্ধ করে

তোলে। তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্তে বাড়ী ফিরলেন। বহু মানুষের কাছে তিনি শ্রীগুরুজীর ভাষণের বিশেষ প্রশংসা করেন।

বর্গ সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলছিল। প্রত্যেক স্বয়ংসেবকের মনে এই ব্যথা জাগছিল যে এখানে আসা সত্ত্বেও ডাক্তারজীর ভাষণ শোনার সৌভাগ্য হল না। সঙ্ঘের দৃষ্টিতে বর্গ এক মহান পর্বের সমান। এই সময় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকার দুঃখ ডাক্তারজীর মনকে বেদনায় ভরে তুলেছিল। দিনাংক ৮ই জুন যখন বর্গের সার্বজনীন সমারোপ হল, তখন ডাক্তারজী শ্রীগুরুজীকে এবং তাঁর ডাক্তারদের কাছে সেখানে যাবার ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থা অত দূরে খোলা মাঠে নিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত ছিল না। অতএব বাধ্য হয়ে ডাক্তারদের তাঁর ইচ্ছায় সায় দেওয়া সম্ভব হল না। ডাক্তারদের এই অস্বীকৃতির কথা শুনে ডাক্তারজী অতিশয় বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হল, সব কিছু করার পরেও যখন স্বাস্থ্য ঠিক হচ্ছে না, তখন স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে মিলনে তাঁকে অকারণ বঞ্চিত করা হচ্ছে কেন?

সমারোপের কার্যক্রম থেকে ফিরে আসার পর ডাক্তারজীর মনের ছট্‌ফটানি সকলেই উপলব্ধি করলেন। সেই কারণে ঠিক হল যে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য পরদিন সকালে ঘরোয়া সমারোপের কার্যক্রমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে। এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে ডাক্তারজীর মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, কারণ সঙ্ঘকার্যের প্রগতি সম্বন্ধে সন্তোষ প্রকাশ এবং ভবিষ্যতের প্রত্যাশার কথা জানাতে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন।

পরদিন তাঁকে বর্গে নিয়ে আসা হল। সকালের এই অনুষ্ঠানে প্রায় দেড় থেকে দুই হাজার ব্যক্তি যাতে তাঁর ভাষণ ভাল করে শুনতে পায় এবং তাঁর যথাসম্ভব কম কষ্ট হয়, তার জন্য ধ্বনিবর্ধক যন্ত্রের ব্যবস্থা করা হয় এবং চেয়ারে বসার জায়গায় ও দুপাশে নরম বালিশ রেখে দেওয়া হয়। যথাসময়ে ডাক্তারজী এলেন। বালিশগুলি দেখে তিনি নিজেই সেগুলি সরিয়ে দিলেন, কারণ তাঁর আরামের জন্য এত সব ব্যবস্থা ডাক্তারজীর ভাল লাগেনি। এরপর বিভিন্ন প্রান্তের কয়েকজন নির্বাচিত স্বয়ংসেবক অধিকারী শিক্ষণ বর্গে কী লাভ করলেন এবং নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে ফিরে গিয়ে কীভাবে সঙ্ঘের কাজ করবেন এ বিষয়ে তাঁদের মনোভাব প্রকাশ করেন। তাঁদের সকলের কথায় সাধারণভাবে শিক্ষার্থীদের আশা কীরকম বৃদ্ধিলাভ করেছে, সেকথাই ব্যক্ত হয়। তারপর ডাক্তারজী যে ভাষণ দেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, "মাননীয় সর্বাধিকারীজী, প্রান্ত সঙ্ঘচালক মহোদয়, অধিকারীবর্গ এবং স্বয়ংসেবক ভাইসব! আমি জানিনা যে আমি আজ আপনাদের সম্মুখে দুটি শব্দও ঠিকভাবে বলতে পারব। আপনারা জানেন যে গত চব্বিশ দিন যাবৎ আমি রোগশয্যায় পড়ে আছি। সঙ্ঘের দৃষ্টিতে এই বছরটি বড় সৌভাগ্যের বছর। আজ আমার সম্মুখে হিন্দু রাষ্ট্রের এক ক্ষুদ্র প্রতিবিম্বই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমার শারীরিক অসুস্থতার জন্য এতদিন নাগপুরে থাকা সত্ত্বেও আপনাদের পরিচয়-লাভের আমার ইচ্ছাকে আমি সার্থক করতে পারিনি। পুনার ও.টি.সি.-তে আমি পনের দিন ছিলাম এবং সেখানে আমি প্রতিটি স্বয়ংসেবকের সঙ্গে নিজে পরিচয় করে নিয়েছি। আমি ভেবেছিলাম যে নাগপুরের সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গেও আমি সেই রকমই করতে

পারব। কিন্তু আপনাদের এতটুকু সেবাও করতে পারিনি। এই কারণেই আজ এখানে আমি আপনাদের দর্শন করতে এসেছি।

আমার ও আপনাদের কোন পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও এমন কী কারণ আছে, যার দরুন আমার অন্তঃকরণ আপনাদের দিকে এবং আপনাদের আমার দিকে ধাবিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের চিন্তাধারাই এমন প্রভাবশালী যে যাদের পরস্পরের পরিচয় পর্যন্ত নেই, সেই স্বয়ংসেবকদের মধ্যেও প্রথম দৃষ্টিপাতেই পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য অনুভূত হয় । কথা শুরু হতে না হতেই তারা বন্ধু হয়ে পড়ে। কিছুদিন আগে আমি যখন পুনাতে ছিলাম, তখন একদিন আমি ও সাংলির শ্রী কাশীনাথজী লিময়ে কাঠপুলের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম। ঠিক সেই সময় নয়-দশ বছরের দুটি বালক অপর দিক থেকে আসছিল। আমাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় ওরা একটু মুচ্‌কি হেসে এগিয়ে গেল। তখন আমি শ্রী কাশীনাথজীকে বললাম, "এই বালকরা সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক।" আমার এই কথায় শ্রী কাশীনাথরাও আশ্চর্য প্রকাশ করলেন। কোনরকম জানা-শোনা না থাকা সত্ত্বেও আমি ওই বালকদের অসন্দিগ্ধ স্বরে স্বয়ংসেবক কেমন করে বললাম, একথা শ্রীকাশীনাথ রাও-এর কাছে রহস্যময় মনে হল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন — 'একথা আপনি কেমন করে বলছেন যে ওরা আমাদের স্বয়ংসেবক?' কারণ, ওদের বেশভূষায় স্বয়ংসেবকত্বের কোন বাহ্য চিহ্ন ছিলনা। 'আমি বলছি এইজন্য। আপনি কি পরীক্ষা করে দেখতে চান?' ছেলে দুটি তখনো বেশী দূরে যায়নি। আমি হাতের ইশারায় ওদের কাছে ডাকলাম আর জিজ্ঞেস করলাম, 'কী, আমাদের চেন নাকি?' ওরা তক্ষুনি বলল, "আজ্ঞে হাঁ, দু বছর আগে আপনি শিবাজী-মন্দিরের বালক-শাখায় এসেছিলেন। আপনি আমাদের সরসঙ্ঘচালক ডাক্তার হেডগেওয়ারজী এবং আপনার সঙ্গে ইনি সাংলির শ্রী কাশীনাথজী লিময়ে।" এ হল সঙ্ঘের তপস্যার ফল, কেবল কোন একজন ব্যক্তির এই কাজ নয়। একটু আগে এখানে যিনি বক্তৃতা দিলেন, তিনি মাদ্রাজের শ্রী সঞ্জীব কামথ, এখানে একজন অপরিচিত মানুষ হিসাবে এসেছিলেন এবং এখন কয়েক দিনেই আমাদের ভাই হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। এর কৃতিত্ব কোন মানুষের নয়, সঙ্ঘের। ভাষার ভিন্নতা এবং আচার-ব্যবহারের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পাঞ্জাব, বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, সিন্ধু প্রভৃতি প্রান্তের স্বয়ংসেবকেরা পরস্পরকে কেন এত ভালবাসেন? কেবল এই জন্য যে ওঁরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সদস্য। আমাদের সঙ্ঘের প্রত্যেক সদস্য অন্য স্বয়ংসেবকদের নিজের সহোদর ভাই-এর থেকেও বেশী ভালবাসে। সহোদর ভাইয়েরাও অনেক সময় সম্পত্তির জন্য পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে। কিন্তু স্বয়ংসেবকদের মধ্যে এ জিনিষ হতে পারেনা।

"আমি আজ চব্বিশ দিন যাবৎ বাড়ীতে পড়ে আছি। কিন্তু আমার হৃদয় ছিল এখানেই, আপনাদের কাছে। আমার শরীর ছিল বাড়ীতে কিন্তু মন বর্গে, আপনাদের মধ্যেই পড়ে থাকত। গতকাল সন্ধ্যায় অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্য কেবল প্রার্থনা করার জন্য সঙ্ঘস্থানে যাবার জন্য মন খুব ছট্‌ফট করছিল। কিন্তু ডাক্তারদের কঠোর নিষেধের কারণে আমাকে চুপ করে বসে থাকতে হল।"

"আজ আপনারা নিজ-নিজ স্থানে ফিরে যাচ্ছেন। আমি আপনাদের ভালবাসার ভেতর দিয়ে বিদায় জানাচ্ছি। যদিও এটা বিচ্ছেদের সময়, তবু এটা দুঃখের কখনও নয়। যে কার্য সম্পন্ন করার সংকল্প নিয়ে আপনারা এখানে এসেছিলেন, সেই কার্য সম্পূর্ণ করার জন্যই আপনারা নিজ-নিজ স্থানে ফিরে যাচ্ছেন। প্রতিজ্ঞা করুন যে যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে, সঙ্ঘকে ভুলবেন না। কোন মোহ যেন আপনাদের বিচলিত করতে না পারে। আপনাদের জীবনে এমন কথা বলার সুযোগ আসতে দেবেন না যে পাঁচ বছর পূর্বে আমি সঙ্ঘের সদস্য ছিলাম। আমরা যতক্ষণ জীবিত থাকব, ততক্ষণ স্বয়ংসেবক থাকব। তনু-মন-ধন দিয়ে সঙ্ঘকার্য করার দৃঢ় -নিশ্চয়কে অখণ্ডরূপে জাগিয়ে রাখুন। প্রতিদিন শুতে যাবার সময় চিন্তা করুন যে 'আজ আমি কতখানি কাজ করেছি?' একথাও মনে রাখবেন যে শুধু সঙ্ঘের কার্যক্রম ঠিকমত করলে অথবা প্রতিদিন নিয়মিতরূপে সঙ্ঘস্থানে উপস্থিত থাকলেই সঙ্ঘকার্য পূর্ণ হতে পারেনা। আমাদের তো আসেতু-হিমাচল বিস্তৃত বিশাল হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করতে হবে। সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্ষেত্র শুধু স্বয়ংসেবকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সঙ্ঘের বাইরে যারা আছে, তাদের মধ্যেও কাজ করতে হবে। তাদের সকলকে রাষ্ট্রোদ্ধারের প্রকৃত পথ প্রদর্শন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য, এবং সে পথ হল শুধু সংগঠনের পথ। হিন্দু জাতির পরম কল্যাণ শুধু এই সংগঠনের পথেই সাধিত হতে পারে। অন্য কোন কাজই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ করতে চায় না। প্রশ্ন ওঠে যে পরে সঙ্ঘ কী করবে? এ প্রশ্ন অর্থহীন। সঙ্ঘ এই সংগঠনের কাজকেই দ্রুতবেগে বহুগুণ বৃদ্ধি করে যাবে। এই গতিবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সেই স্বর্ণময় দিন অবশ্যই আসবে যেদিন সারা ভারতবর্ষকে সঙ্ঘময় দেখা যাবে। তখন হিন্দু জাতির দিকে বক্রদৃষ্টিতে দেখার সামর্থ বিশ্বের কোন শক্তির থাকবেনা। আমরা কাউকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিনা, কিন্তু এ ব্যাপারে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে যে আমাদের উপরেও যেন কেউ আক্রমণ করতে না পারে।"

"আমি আজ আপনাদের কাছে কোন নতুন কথা বলছিনা। প্রত্যেক স্বয়ংসেবককে সঙ্ঘকার্যকেই নিজ জীবনের সর্বপ্রধান কাজ বলে মনে করতে হবে। আমি আজ আপনাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বিদায় জানাচ্ছি যে আপনারা নিজ হৃদয়ের মধ্যে এই মন্ত্রকে দৃঢ়ভাবে অংকিত করে এখান থেকে যাবেন যে সঙ্ঘকার্যই আমার জীবনের একমাত্র কাজ।"

ডাক্তারজীর ভাষণের পর দূর-দূরান্ত থেকে আসা স্বয়ংসেবকদের মনে হল তাদের নাগপুর-যাত্রা সার্থক হল। বস্তুতঃ আজ তারা এমন পাথেয় লাভ করল, যা তাদের সম্পূর্ণ জীবন পথের প্রতিপলে পর্যাপ্ত মনে হবে। ডাক্তারজীর মুখ থেকে অমৃতবাণী শ্রবণের সৌভাগ্য লাভের দরুন স্বয়ংসেবকদের হৃদয় আনন্দে ভরে গিয়েছিল। কিন্তু ভাষণের পরে ডাক্তারজী এত বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি তৎক্ষণাৎ সর্বাধিকারীজীর কক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তাঁকে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হল। সেদিন যে স্বয়ংসেবকেরা নিজ-নিজ স্থানে ফিরে যাচ্ছিল, তারা প্রত্যেকেই একে-একে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছিল। তাঁর বিছানা মাঝখানের ঘরে পাতা ছিল, এবং সেখানে হাল্কা আলোর ব্যবস্থা ছিল। বিদায় গ্রহণকারী স্বয়ংসেবকদের ডাক্তারজী স্নেহ-প্রীতি ভরা হৃদয় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ

করছিলেন এবং তাদের স্থানের প্রৌঢ় কার্যকর্তাদের ও সঙ্ঘচালকদের নমস্কার জানিয়ে দেবার কথা বলছিলেন। অসুস্থতার দরুন, এই সময় যে সব চিঠিপত্র আসত, তার উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। সেই কারণে সেই সব স্থানে যে স্বয়ংসেবকরা ফিরে যাচ্ছিল। তাদের মাধ্যমে তিনি ঐ পত্রলেখকদের জানিয়ে দিলেন যে 'শীঘ্রই আপনাদের পত্রের উত্তর পাঠাব, রাগ করবেন না।' বোম্বাই-এর শ্রী বাপুরাও লেলের মাধ্যমে শ্রীবাবারাও সাভারকর এবং শ্রী দাদা নাইকের কাছেও এই বার্তা পাঠালেন।

বর্গ শেষ হতেই ডাক্তারজী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর পত্র পেলেন। পত্রে কলকাতার নিকটেই ১৮ই জুন থেকে ছয় সপ্তাহের একটি শিক্ষণ-কেন্দ্র শুরু করার সিদ্ধান্তের সূচনা দেওয়া হয়েছিল। ঐ কেন্দ্রে যারা শিক্ষা গ্রহণ করতে আসবে এরকম প্রায় ১০০ জন শিক্ষার্থীকে শারীরিক, সামরিক এবং হিন্দুরাষ্ট্রের উত্থানের দৃষ্টিতে বৌদ্ধিক শিক্ষণ দেবার জন্য কয়েকজন সুযোগ্য তথা প্রশিক্ষিত শিক্ষক প্রেরণ করার আবেদন জানান হয়েছিল। এই পত্র অনুসারে কী করা যায়, এ বিষয়ে তিনি চিন্তা করছিলেন। সেই সময় বাংলা থেকে বর্গে আগত স্বয়ংসেবকেরা বিদায় গ্রহণের জন্য ডাক্তারজীর কাছে এলেন। তখন রাত ৮টা বেজেছিল এবং শ্রীগুরুজী ডাক্তারজীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিয়ে সবেমাত্র বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। এতজন স্বয়ংসেবককে আসতে দেখে সাক্ষাৎ পর্ব তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দেবার নির্দেশ তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতার ব্যাপারে ডাক্তারজীর স্বাভাবিকভাবেই বেশ চিন্তা ছিল । তিনি আগত স্বয়ংসেবকদের জিজ্ঞেস করেন, "বাংলায় এবার কাজ কী রকম হবে?" কিছুক্ষণ তিনি বাংলাতেই কথা বলেন। তিনি বললেন, "ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী লিখেছেন প্রচারক পাঠাও। প্রচারক তো পাঠাবই, কিন্তু আসল কাজ প্রচারক পাঠালে হবেনা। তার জন্য আপনাদের স্থানীয় মানুষদেরই সমস্ত কাজ সামলাতে হবে।"

বর্গ শেষ হবার পর শ্রীগুরুজী এবং অন্যান্য প্রমুখ কার্যকর্তারা এখন বর্গের কাজকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এবার স্বাভাবিকভাবেই ডাক্তারজীর স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসার দিকে সকলে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেবার অবকাশ পেলেন। কিন্তু ডাক্তারজীর অবস্থা প্রতিদিনই বেশী চিন্তাজনক হয়ে উঠতে লাগল। তাঁর চিকিৎসা যে ডাক্তাররা করছিলেন, তাঁরা সঠিক রোগ-নির্ণয় করতে পারছিলেন না। সেই কারণে সকলে ভাবলেন যে তাঁর সম্পূর্ণ শরীরের আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করানো দরকার। সেই সঙ্গে, বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর চিকিৎসার জন্য সেই সব স্থানে তাঁকে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ আসতে লাগল। লাহোর থেকে ধর্মবীরজী লিখে পাঠালেন যে পাঞ্জাবের জলবায়ু এবং চিকিৎসা উভয়দিক থেকে উপযুক্ত স্থান। সেখানকার বিশিষ্ট চিকিৎসকদের মতে হিসার জেলার সিরসা এবং লাহোরের কাছে শাহদরা উভয় স্থানই অতি উত্তম। তিনি আরেকটি পত্রে জিজ্ঞেস করে পাঠালেন যে পাঞ্জাব পর্যন্ত যাত্রার ধকল ডাক্তারজী সহ্য করতে পারবেন কি না। মহারাষ্ট্রেও কোরডা ও মিরজ যাওয়ার নিমন্ত্রণ এল। এ দিকে নাগপুরের সঙ্ঘচালক শ্রী বাবাসাহেব ঘটাটে ছিন্দওয়াড়া যাবার আগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

এই সব আগ্রহের পিছনে ডাক্তারজীর প্রতি অনন্য শ্রদ্ধা তথা আন্তরিক ভালবাসার মনোভাবই ব্যক্ত হচ্ছিল। কিন্তু নিষ্ঠুর কালের যোজনা ছিল অন্যরকম। জলবায়ুর জন্য স্থান পরিবর্তন করার মত শক্তিও শরীরে অবশিষ্ট ছিল না। ১৫ই জুন বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ অনুযায়ী ডাক্তারজীকে মেয়ো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা শুরু হল। তাঁর বুকের এক্স-রে করা হল, কিন্তু তাঁর পিঠের যন্ত্রণার কারণ জানা গেল না। হাসপাতালের আবহাওয়া ডাক্তারজীকে যেন আরো বেশী অসুস্থ করে তুলল। সেখানে যাবার পর তিনি তাঁর বন্ধু শ্রীনানাসাহেব তেলঙ্গকে ডেকে আনার জন্য গাড়ী পাঠালেন। তিনি তাঁর শয্যার পাশে এলে ডাক্তারজী তাঁকে বললেন, "আপনার অসুস্থতার কথা আমি জানতে পেরেছিলাম, কিন্তু আমার এই রকম অবস্থা হওয়ায় আপনার সংবাদ নেওয়ার জন্য যেতে পারিনি। আপনি এসেছেন, ভাল হয়েছে।"

সেই দিনই তাঁর পাশে শ্রী যাদবরাও জোশী এসে বসলে ডাক্তারজী জিজ্ঞেস করলেন, "সঙ্ঘের বরিষ্ঠ অধিকারীর দেহাবসান হলে আপনারা তাঁর অন্তিম সংস্কার সামরিক পদ্ধতিতে করবেন কি?" এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ কোন স্বয়ংসেবকের পক্ষেই রুচিকর হতে পারেনা। তাই যাদবরাওজী তাঁর প্রশ্ন শুনেও শুনলেন না এবং তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন যে ওষুধ খাবার সময় হয়েছে। কিন্তু ডাক্তারজী সেকথা কানে না নিয়ে পুনরায় তাঁর পূর্বের প্রশ্ন প্রসঙ্গে বলেন, "সঙ্ঘ এক বিশাল পরিবার, কোন সামরিক সংগঠন নয়। অতএব, পরিবারের কর্তার মৃত্যুর পর যেভাবে অন্তিম সংস্কার করা হয়, সেই ভাবেই সাদাসিধে তথা সাধারণ পদ্ধতিতে হওয়া উচিত।"

হাসপাতালের বাতাবরণ ডাক্তারজীর ভাল লাগছিলনা। অতএব, মেয়ো হাসাপাতালের পরীক্ষাদি শেষ হবার পরেই তিনি বাড়ী যাবার কথা বার-বার বলতে থাকেন। ১৮ই জুন সব পরীক্ষা শেষ হল। সেই দিনই, ডাক্তারজীর সম্মতি এবং তাঁর যথাযথ সেবা-শুশ্রূষার কথা বিবেচনা করে তাঁকে শ্রী বাবাসাহেব ঘটাটের সিভিল লাইন্স-স্থিত বাংলোয় নিয়ে যাওয়া হল। বাংলোয় প্রবেশ করার পর ডানদিকের প্রশস্ত দালানে তাঁর পালঙ্ক পাতা হল। সেখানে সব রকম অনুকূল পরিবেশ ছিল। সব রকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, সুন্দর বাতাবরণ, উন্মুক্ত বাতাস এবং শুশ্রূষা করার জন্য শ্রী গুরুজী, শ্রী বাবা সাহেব ঘটাটে এবং অন্যান্য প্রিয় তরুণ কার্যকর্তারা ইত্যাদি সবই প্রস্তুত ছিল। বস্তুতঃ, ডাক্তারজীর নিজ গৃহে যাওয়ারই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁর গৃহের আশে-পাশের আবদ্ধ পরিবেশ, অপর্যাপ্ত স্থান, বাড়ীর পিছনে নোংরা নালা ইত্যাদির দরুন সেখানে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা ত্যাগ করতে হল।

ধরমপেঠে ঘটাটেজীর বাংলোয় আসার পর সব ব্যবস্থা অনুকূল থাকা সত্ত্বেও ডাক্তারজীর পিঠের ব্যথা এবং শরীরের আনচান ভাব কম হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অস্থিরতার দরুন তিনি ঘরের এধার থেকে ওধার পাইচারি করতেন এবং বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়লে খাটে এসে শুয়ে পড়তেন। মাঝে-মাঝে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে তিনি ঘরের বাইরে বেরিয়ে বাংলোর বাগানে এসে বসতেন। রাত্রে ঘুম প্রায় হতইনা, সেই কারণে তিনি রাতেও এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতেন। এইভাবে চলে-ফিরে বেড়ালে তিনি ক্লান্ত হয়ে যেতেন দেখে

শুশ্রূষাকারী স্বয়ংসেবকদের অনেক সময় তাঁকে বলতে হত যে 'দরজার বাইরে বেরুবেননা' এবং তাঁকে বাইরে যেতে মানা করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ত। এই ভাবে তাঁকে আট্‌কে রাখা ডাক্তারজী পছন্দ করতেন না। একবার শ্রীগুরুজী তাঁর কাছে এলে তিনি হাসতে-হাসতে জিজ্ঞেস করেন, ''আপনি আমার কাছে এই 'অ্যাটেন্ডেন্ট' রেখেছেন, না আমাকে আট্‌কাবার জন্য পালোয়ান?''

সাধারণতঃ সকালের দিকে দু-তিন ঘন্টা ডাক্তারজীর শরীর ভাল থাকত এবং চেহারায় টাট্‌কা ভাব দেখা যেত। কিন্তু তারপর নাগপুরের প্রচণ্ড গরমে তাঁর জ্বর বাড়তে শুরু করত এবং তাঁর মুখে অসুস্থতা ও বেদনার মলিনতা ফুটে উঠত। মাঝে-মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে অস্ফুট বাক্য নিঃসৃত হত। তা থেকে বোঝা যেত যে তাঁর মনের মধ্যে চিন্তার তুফান চলছিল। শোনা যেত তিনি বলছেন, ''যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল আর আমরা সময়ের পিছনে পড়ে রইলাম।'' অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি নিজের থেকে অন্যের বিষয়েই বেশী চিন্তিত থাকতেন। এটা তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, এবং এইরূপ শারীরিক অবস্থাতেও তিনি সেই স্বভাব ত্যাগ করতে পারেননি। তাঁর শুশ্রূষা করতে আসা স্বয়ংসেবকদের সকাল-বিকেল তাঁর সঙ্গে চা-পান করানো হোক - এই রকম তাঁর ইচ্ছা ছিল। এক দিন রাত্রি-জাগরণের দরুন স্বয়ংসেবকেরা সকালে অনেক দেরী পর্যন্ত ঘুমিয়েছিল। শ্রী গুরুজী সে সময় কোথাও বাইরে গিয়েছিলন। শ্রী যাদবরাও জোশী যখন ডাক্তারজীর সামনে চা নিয়ে এলেন, তখন তিনি 'ও কোথায়?' 'সে কোথায়?' বলে প্রত্যেকের বিষয় জিজ্ঞেস করছিলেন। যাদবরাও বললেন, ''আপনি চা নিন, ততক্ষণে ওরা এসে পড়বে।'' একথা শুনে অসন্তুষ্ট হয়ে ডাক্তারজী চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পরে শ্রী গুরুজী এসে পড়লেন এবং সব ঘটনার কথা জানতে পারলেন। ত্রিনি তৎক্ষণাৎ সবাইকে ডাকলেন এবং আবার চা তৈরী করতে বললেন। যখন সকলের সঙ্গে বসে চা-পান্ করা হল, তখন ডাক্তারজীর মুখে তৃপ্তির আনন্দ প্রকাশ পেল।

ডাক্তারজীর এই অসুস্থ অবস্থাতেই তাঁর বিপ্লবী জীবনের জনৈক বাঙালী বন্ধু ১৯শে জুন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। অনেক বছর পরে সাক্ষাৎ হওয়ায় ডাক্তারজী তাঁকে তাঁর বিছানায় বসিয়েই তাঁকে আলিঙ্গন করেন। পুরান দিনের চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলী স্মরণ করে দুজনেই অত্যন্ত প্রীত হলেন। বিছানায় শুয়ে-শুয়েই ডাক্তারজী এই বন্ধুর সঙ্গে দশ-পাঁচ মিনিট কথা বলেন। এই কথোপকথনের সময় তিনি একবার তাঁর পুরানো বিপ্লবী বন্ধুদের কাছে সঙ্ঘকার্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে সুবিধামত কলকাতা যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এই সাক্ষাৎকারের সময়েই তাঁর বন্ধু বলেন যে পরদিন সকালে শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসুর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসার কথা। একথা শুনে ডাক্তারজী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

এমন অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি বোম্বাইয়ের একজন স্বয়ংসেবকের কাছে পত্র লেখেন, যাতে তিনি উক্ত স্বয়ংসেবকের অপারেশনের সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করেন। উল্লেখযোগ্য যে এই চিঠি ডাক্তারজী ১৯শে জুন লেখেন।

মেয়ো হাসপাতালে যে সব পরীক্ষাদি হয় এবং নাগপুরের ডাঃ ডেভিড প্রমুখ বিশেষজ্ঞ

ডাক্তারদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেও রোগের কোন নিদান করা যায়নি। জ্বর ক্রমাগত বেড়েই চলছিল। ১৮ই ও ১৯শে জুন তাঁর অবস্থা দেখে আশে পাশের সকলেই আভাস পেয়ে গিয়েছিল যে অসুখ কোন্ চরম অবস্থায় পৌঁছেছে। এই কারণেই সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও বেদনার্ত হয়ে পড়েছিলেন। এইরূপ অবস্থায় ১৯শে জুন শ্রীগুরুজী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে যে পত্র লেখেন, তার মধ্যে তাঁর মনের অবস্থা প্রতিফলিত হয়। তিনি লেখেন, "ডাক্তারজীর স্বাস্থ্যের প্রতিদিনই অবনতি হচ্ছে এবং এখন তাঁর অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হয়ে পড়েছে। এমন অবস্থায় তিনি কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য দিতে সক্ষম নন, এবং আমাদেরও এ সময় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিন্তা করা সম্ভব নয়।"

বুধবার, ১৯শে জুনের রাত অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে কাটল। সারা রাত ডাক্তারজী চোখের পাতা এক করতে পারেননি। তাঁর দুর্বলতা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পেল। এই অবস্থায় দিনাংক ২০শে জুন সকালে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু এবং শ্রী রামভাউ রুইকরের মোটর গাড়ী ঘটাটেজীর বাংলোর সামনে এসে দাঁড়াল। সংযোগবশতঃ ঠিক ঐ সময় ডাক্তারজী একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

সুভাষবাবু নাগপুরে ফরোয়ার্ড ব্লকের অধিবেশনের জন্য ১৮ তারিখে এসেছিলেন। ডাক্তারজীর অসুস্থতার সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। সেই সময় ডাক্তারজীর কাছে শ্রী শ্রীকৃষ্ণ পুরাণিক ও শ্রী যাদবরাও জোশী বসেছিলেন। সুভাষবাবু ঘরে প্রবেশ করে ডাক্তারজীর দিকে দেখলেন এবং নিকটে উপবিষ্ট স্বয়ংসেবকদের কাছে তাঁর অসুস্থতার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁকে বলা হল, "গত দশ-পনের দিন যাবৎ জ্বর ১০৩-১০৪ ডিগ্রীর নিচে নামছেনা। তাঁর ঘুমও হয়না, কিন্তু এখন একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছেন দেখা যাচ্ছে।" স্বয়ংসেবকরা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার যদি জরুরী কোন প্রয়োজন থাকে তাহলে তাঁকে ডেকে তুলে দিই।" একথা শুনে শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু বললেন, "বস্তুতঃ আমি এক জরুরী কাজেই এসেছিলাম। কিন্তু এই সময় ডাক্তারজীর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে শুধু তাঁকে দেখতেই এসেছিলাম। পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসব।" এর পর তিনি কিছুক্ষণ ডাক্তারজীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন এবং চোখ বন্ধ করে দুহাত জোড় করে তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর কিছুক্ষণ বাইরের ঘরে বসে চলে গেলেন। তাঁর মোটরগাড়ী ঘটাটেজীর বাংলো ত্যাগ করার সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্তারজীর তন্দ্রা ভেঙে গেল। তখন সেখানে উপস্থিত স্বয়ংসেবক তাঁকে শ্রী সুভাষচন্দ্র বসুর আসার সংবাদ জানালেন। ডাক্তারজী অত্যন্ত উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "তিনি কী বললেন?" ডাক্তারজীকে জানান হল যে "তিনি আপনাকে দেখে এইমাত্র চলে গেলেন এবং আবার দেখা করতে আসবেন বলে গেলেন।" এইভাবে কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা হলনা বলে ডাক্তারজী মনঃক্ষুণ্ণ হলেন এবং তিনি সুভাষচন্দ্রের নাম উচ্চারণ করে হাত জোড় করে তাঁকে নমস্কার করলেন। গত বছর নাসিকে অসুস্থ থাকার দরুন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি, আর এবার এরকম কাণ্ড ঘটল। "দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্" একথা বলাই যুক্তিযুক্ত হবে।

বৃহস্পতিবার, ২০শে জুন সকালে ডাঃ হরদাস, ডাঃ বিঞ্চুরে এবং ডাঃ গোবিন্দলাল শর্মা ডাক্তারজীকে পরীক্ষা করলেন। তাঁদের মতে স্বাস্থ্যের অনেক বেশী অবনতি ঘটেছিল। রক্তচাপ

অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ডাক্তাররা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ডাঃ শর্মা অবিলম্বে মেরুদণ্ডে জমা জল বের করে দেবার পরামর্শ দিলেন। ডাক্তারজী এই চিকিৎসার কথা শুনেই নিজের অসুস্থতার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করলেন এবং তিনি বুঝে গেলেন যে তাঁর আয়ুর সীমা শেষ হতে চলেছে। তিনি ডাক্তারদের কাছে ডেকে বললেন, "আপনারা কিছু করার আগে আমার একটু সময় দরকার।" সেই সময় তাঁকে গভীর চিন্তামগ্ন দেখা গেল। বাইরের ঘরে ডাক্তাররা শলা-পরামর্শ করছিলেন যে অস্ত্রোপচার এখনই করবেন, না কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন। এই সময় ডাক্তারজী শ্রী গুরুজীকে তাঁর ঘরে ডাকলেন এবং সকলের সামনে ঘোষণা করলেন, "এখন লাম্বার-পাংচার করার সময়ও এসে গেছে। আমি যদি বেঁচে যাই, তাহলে ঠিক আছে। নইলে এর পর সঙ্ঘের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করবেন।" এইরূপ অন্তিম ব্যবস্থার ভাষা শুনে গুরুজী অত্যন্ত শোক-বিহ্বল হয়ে বলতে থাকলেন, "ডাক্তারজী আপনি এ কী কথা বলছেন? আপনি শীঘ্রই সেরে উঠবেন। একথা শুনে ডাক্তারজী একটু মুচকি হেসে বললেন, "ঠিক আছে, কিন্তু আমি যে কথা বললাম, সেকথা অবশ্য মনে রাখবেন।"

ততক্ষণে বাইরের ঘরে ডাক্তাররা ঠিক করলেন যে এখনই লাম্বার-পাংচার না করে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক । ডাক্তাররা বিদায় নেবার পর ডাক্তারজীর অস্থিরতা ক্ষণে-ক্ষণে বাড়তে লাগল। দুপুরের সারা সময়টা এভাবেই কেটে গেল উদ্বেগজনক অবস্থার মধ্য দিয়ে। গত কয়েকদিন ঘুম একেবারেই হয়নি। এখন তাঁর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে ভিতরে তাঁর অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। আশপাশের কার্যকর্তারা বিষণ্ণ মুখে বসেছিলেন। ডাক্তারজীর ক্ষণে-ক্ষণে ওঠা-বসা, ঘরে পায়চারী করা এবং অস্থির হয়ে এধার-ওধার ছট্‌ফট্‌ করা দেখে কার্যকর্তাদের বুক কেঁপে উঠছিল।

সারা দিন উদ্বিগ্নতার মধ্যে কাটল। বেলা তৃতীয় প্রহরে ডাঃ হরদাস, ডাঃ চোলকর এবং ডাঃ তত্ত্ববাদী বাংলোতে এলেন। তাঁরা ডাক্তারজীর অবস্থা দেখে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে লাম্বার-পাংচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। পাংচার করার সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে ফোয়ারার মত জল বেরুতে লাগল। সাধারণভাবে এত বেশী স্রাব হয়না। তাই দেখে ডাক্তারদের মনে আশংকার সৃষ্টি হল। এই সময় ডাক্তারজীর অসহ্য কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর এই কষ্ট যাতে অন্যদের দুঃখিত না করে, সেই কারণে তিনি দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিলেন। শারীরিক কষ্ট অবর্ণনীয় ছিলই, সেই সঙ্গে মানসিক বেদনা তাঁকে অত্যধিক পীড়িত করে তুলেছিল যে এই জন্মে তিনি পদদলিত হিন্দু সমাজকে সংগঠনের শক্তিতে বৈভবশালী করে তোলার নিজ আকাঙ্খাকে চরিতার্থ করে যেতে পারলেন না। সব জল বেরিয়ে যাবার পরেও রক্তচাপ হ্রাসের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এই কারণে ডাঃ হরদাস রাত্রে তাঁর দেহ থেকে কিছুটা রক্ত বের করে দিলেন, কিন্তু যথেষ্ট রক্ত বের করা সম্ভব হল না। ডাক্তারজীর এইরূপ অবস্থা দেখে ডাঃ তত্ত্ববাদী, ডাঃ বিঞ্চুরে ইত্যাদিরা সারা রাত তাঁর শয্যা-পার্শ্বে রইলেন।

প্রতি মুহূর্তে অবস্থার অবনতি হচ্ছিল। রাত্রি ১১টার পর জ্বরও বাড়তে লাগল এবং প্রতি এক ঘন্টা বা দু ঘন্টায় ১ ডিগ্রী জ্বর বাড়তে থাকল। মধ্যরাত্রের পর তাঁর মুখমণ্ডলে গাম্ভীর্য তথা উদ্বেগের চিহ্ন অতিমাত্রায় প্রতিফলিত হচ্ছিল, যা দেখে মনে হচ্ছিল তিনি গম্ভীর চিন্তায়

নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। রাত্রি আড়াইটার সময় তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন এবং সম্ভবতঃ শেষ পর্যন্ত সংজ্ঞাহীনই রইলেন। 'সম্ভবতঃ' বলার কারণ এই যে মাঝে-মাঝে তাঁর মুখ থেকে দু-একটা অস্ফুট শব্দ শোনা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন নাকের সামনে স্থির দৃষ্টিতে তিনি কিছু একটা দেখছিলেন। সকাল হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মুখের উগ্র গাম্ভীর্য বিলীন হয়ে তার স্থানে ক্রমে এক ধরনের শান্তি বিরাজিত হচ্ছিল, এমনকি একবার তাঁর মুখে মৃদু হাসির ঝিলিকও দেখা গেল। এইভাবে কি নিকটে সমাগত কালকে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি?

শুক্রবার প্রাতঃকালে (জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া, ১৮৬২ শকাব্দ) ইং ২১শে জুন, ১৯৪০, জ্বর ১০৬ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠে গেল। আশ-পাশের সকলের চেহারা একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। শ্রীবাবাসাহেব ঘটাটে ছুটে গিয়ে ডাঃ হরদাস এবং ডাঃ নাঃ ভাঃ খরেকে ডেকে আনলেন। কিন্তু তাঁরা সব আশা ত্যাগ করলেন এবং বললেন অন্তিম সময় এসে গেছে। তৎক্ষণাৎ চতুর্দিকে হাহাকার ছড়িয়ে পড়ল। টেলিফোনে নাগপুরের সমস্ত প্রধান সঙ্ঘের অধিকারীদের, কার্যকর্তাদের এবং ডাক্তারজীর বন্ধুদের ঘটাটেজীর বাংলোতে ডেকে পাঠানো হল। এঁরা পৌঁছতে-না পৌঁছতেই ডাক্তারজীর নাভিশ্বাস উঠতে লাগল। সর্বত্র মৃত্যুর করাল ছায়া বিস্তৃত হল। প্রত্যেকেই শোক-বিহ্বল হৃদয় নিয়ে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগল। শোক সংবরণের বৃথা চেষ্টা করে ডাক্তারজীর মৃত্যু-শয্যার চারদিকে শোক ছড়িয়ে পড়ল। শেষ অবস্থায় ডাক্তারজীর দারুণ কষ্ট চোখে দেখাও ছিল ভীষণ বেদনাদায়ক। বাইরে যারা বসেছিলেন তাঁরাও ডাক্তারজীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ঘর্ঘর শব্দ শুনে আরো বিচলিত হয়ে পড়ছিলেন। নিষ্ঠুর মৃত্যুর সেই ক্রূরতা চোখে দেখা যায় না। প্রায় এক ঘণ্টা এই ভাবে শ্বাস চলছিল। তারপর ঠিক নটা পঁচিশ মিনিটে ডাক্তারজীর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। এবং তাঁর ঘাড় পাশে হেলে গেল। "ডাক্তারজী চলে গেলেন" চারদিকে হাহাকার ও ক্রন্দন শুরু হয়ে গেল। তখনই অকস্মাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস আবার শুরু হল। ঠোঁট ও পলক বুঝি একটু নড়ে উঠল। প্রাণ তখনও শেষ হয়নি। কিছুটা স্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু মাত্র দু মিনিট পরেই সকাল নটা বেজে সাতাশ মিনিটে সব শেষ হয়ে গেল — ডাক্তারজী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

৩১. শবযাত্রা

পরমপূজনীয় ডাক্তার হেডগেওয়ারের মৃত্যু-সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে সম্পূর্ণ শহরে ছড়িয়ে পড়ল। সমগ্র নগরে এই বজ্রাঘাত সমস্ত মানুষকে স্তব্ধ-বিমূঢ় করে দিল। প্রতিটি ঘরে শোকের ছায়া নেমে এল। চতুর্দিক থেকে অসংখ্য মানুষ সব কাজ-কর্ম ফেলে ডাক্তারজীর অন্তিম দর্শনের উদ্দেশ্যে ঘটাটেজীর বাংলোর অভিমুখে যেতে শুরু করল, মনে হচ্ছিল আজ সব রাস্তা গেছে ধরমপেঠের দিকে। বিভিন্ন প্রান্তের প্রমুখ কার্যকর্তাদের তার করে এই শোক-সংবাদ জানানো হল। সর্বত্র হাহাকার শোনা গেল। ডাক্তারজীর অসুস্থতার কথা অনেকেই জানত, কিন্তু কারুর এমন কল্পনাও ছিল না যে ঐ অসুখ তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ডাক্তারজীর গুরুতর অসুখের কথা তারের মাধ্যমে স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরকেও জানানো হয়েছিল। সেই তার-বার্তা পাবার পরমুহূর্তে তিনি নাগপুর যাত্রার আয়োজন করছিলেন, তখনই তাঁর কাছে ডাক্তারজীর মৃত্যু-সংবাদ পৌঁছল। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নাগপুরে তার করলেন, "ডাক্তার হেডগেওয়ার চলে গেলেন! হেডগেওয়ার অমর থাকুন! হেডগেওয়ার চলে গেলেন! সঙ্ঘ চিরজীবী হোক!" বয়োবৃদ্ধ ডাঃ মুঞ্জে সে সময়ে নাসিকে ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে তার-বার্তা এল, "ডাক্তারজীর অকালে অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে অত্যধিক মর্মাহত। তাঁর মৃত্যু এক জাতীয় বিপর্যয়।"

নাগপুরের "মহারাষ্ট্র" এবং পুনার "কাল" পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে এই হৃদয় বিদারক সংবাদ সর্বত্র প্রসারিত করে। এই মর্মান্তিক সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে নাগপুর থেকে দূরে বসবাসকারী স্বয়ংসেবকেরা নিজ নিজ স্থানে একত্রিত হয়ে পরম পূজনীয় সরসঙ্ঘচালকের স্মৃতিতে তাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে। একশো থেকে দেড়শো মাইল বৃত্তের মধ্যে বসবাসকারী স্বয়ংসেবকগণ তৎক্ষণাৎ নাগপুরের উদ্দেশ্যে ছুটে চলল। ডাক্তারজীর পার্থিব দেহ দর্শন করার ইচ্ছাটুকুই এখন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। প্রত্যেক দিক থেকে নাগপুরের দিকে আগমনকারী বাস, ট্রেন ইত্যাদি অসংখ্য মানুষের ভীড়ে ঠাসা ছিল। অকোলা, অমরাবতী, চান্দা, ভাণ্ডারা, ওয়ার্ধা, হিঙ্গনঘাট, আর্বী, কাটোল, উমরেড, সাবনের ইত্যাদি বহু স্থান থেকে স্বয়ংসেবকেরা নাগপুরে এসে উপস্থিত হ'ল। নাগপুরের আশে-পাশের স্বয়ংসেবকরা অনেক মাইল পথ সাইকেলে অতিক্রম করে নাগপুরে এসে পৌঁছল।

২১শে জুন সকাল থেকে অপরাহ্ন পর্যন্ত ডাক্তারজীর অন্তিম দর্শনের জন্য অসংখ্য নারী-পুরুষের ভিড় লেগেছিল। প্রত্যেকের স্মৃতিতে সঞ্চিত ডাক্তারজীর সঙ্গে তার সান্নিধ্যের সুখ-স্মৃতির উৎসাহজনক ঘটনার বর্ণনা করছিলেন। এমন অলৌকিক স্নেহ ও অনাবিল

ভালোবাসা থেকে আমরা চিরকালের জন্য বঞ্চিত হলাম বলে সকলে বিলাপ করছিলেন। অধিকাংশ স্কুলে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়, এবং অবশিষ্ট স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীরা ছুটি নিয়ে পথে এসে দাঁড়াল।

বিকেল পাঁচটায় শোকযাত্রা শুরু হবে বলে স্থির করা হয়। বাংলোর সামনে স্বয়ংসেবকেরা ও নাগরিকবৃন্দ সমবেত হল। বিকেল প্রায় চারটের সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে এবং প্রথমে ঝির্-ঝির্ করে বৃষ্টি শুরু হল, আর তারপরেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। মনে হল বুঝি মেঘেরা নিজেদের দুঃখের অশ্রুবর্ষণ করে নিজেদের অন্তঃকরণের ভার কিছুটা লাঘব করে নিল। মনে হচ্ছিল যেন ডাক্তারজী তাঁর জীবনকেও এইরূপ অনায়াস মনোভাব নিয়ে রাষ্ট্রকে অর্পণ করে মুক্তিলাভ করে চলে গেলেন।

বিকেল প্রায় পাঁচটায় বর্ষণের প্রবলতা হ্রাস পেল। শবযাত্রার প্রস্তুতি শুরু হল। বহু সংস্থা ও ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে মরদেহে পুষ্প-স্তবক ও পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হল। এবং ঠিক পাঁচটায় শোকযাত্রা শুরু হল। প্রায় সওয়া মাইল দীর্ঘ এই শোকযাত্রা ধরমপেঠ থেকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হল। স্থানে-স্থানে জনসাধারণ ডাক্তারজীর মরদেহে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে, পুষ্পবৃষ্টি করে ডাক্তারজীর শেষ দর্শন করছিল। নগরের কোন শ্রেণীর মানুষ এমন ছিল না যারা ডাক্তারজীর পার্থিব দেহে পুষ্প অর্পণ করেনি। ডাক্তারজী অজাতশত্রু ছিলেন এবং সমাজ সম্বন্ধে তাঁর মমত্ব এতই অকৃত্রিম ছিল যে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, ফরোয়ার্ড ব্লক, সোশালিস্ট পার্টি, শ্রমিক সংস্থাসমূহ, হরিজন বন্ধুরা, পারসী, খ্রীষ্টান ও মুসলমান শ্রেণীর সকলেই শোকযাত্রায় সম্মিলিত হল। শোকযাত্রায় সর্বপ্রথম সাইকেল-আরোহী দল এবং তার পিছনে স্বয়ংসেবকদের চার-চার পংক্তিবদ্ধ হাজার হাজার স্বয়ংসেবক চলছিল। তারপরে অসংখ্য নাগরিক চলেছিল। এরপরে মরদেহ এবং তার পিছনে বিশিষ্ট নাগরিক-বৃন্দ ও অন্যান্য নেতারা ছিলেন। সবশেষে আবার সাইকেল-সওয়ার দল ছিল। ডাক্তারজীর মরদেহের সাথে তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভগোয়া ধ্বজ ছিল। যে সব পথ ধরে শোকযাত্রা অগ্রসর হচ্ছিল, সে সব পথের দুধারে, ছাদে, অলিন্দে, বারান্দায়, জানালায় ডাক্তারজীর শেষ দর্শনের জন্য হাজার-হাজার মানুষ শোক-বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অসহায় তথা আত্মবিশ্বাসহীন সমাজের মধ্যে ডাক্তারজী স্বাভিমান ও বীরত্বের নবচৈতন্যের উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। অসংখ্য অশ্রুসজল মানুষের চক্ষু তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছিল। স্থানে-স্থানে শোকযাত্রার আলোকচিত্র তোলা হয়। রাত্রি প্রায় নটায় এই অভূতপূর্ব শোকযাত্রা নাগপুরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত রেশমবাগ সঙ্ঘস্থানে এসে পৌঁছল। সাধারণ শ্মশানভূমির পরিবর্তে এই নিজস্ব স্থানে অন্তিম সংস্কার করার অনুমতি শেষ মুহূর্তে প্রশাসনিক-কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পাওয়া গিয়েছিল। এখানেই সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় শাখা চলে এবং প্রতি বছর অধিকারী শিক্ষণ বর্গের কার্যক্রমও এই স্থানেই অনুষ্ঠিত হয়। সেই কারণে ডাক্তারজী এই স্থানটিকে 'তপোভূমি' বলতেন। এই তপোভূমিতে একটি সুউচ্চ মণ্ডপ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং সেখানেই চিতা সাজানো হয়েছিল। ডাক্তারজীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাত্যাজী হেডগেওয়ার অন্যদের সাহায্যে তাঁর ভ্রাতার শবদেহ বিধিবৎ চিতায় স্থাপন করেন। এরপর

সকলে দাঁড়িয়ে সঙ্ঘের নিত্যদিনের প্রার্থনা করে। সবশেষে পরম পূজনীয় আদ্য সরসঙ্ঘচালকের পার্থিব দেহকে শেষ প্রণাম জানানো হয়।

অতঃপর মন্ত্রাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় এবং লেলিহান অগ্নিশিখায় গৈরিক আবরণে ঢাকা পরমপূজনীয় ডাক্তার হেডগেওয়ারের পার্থিব শরীর ভস্মীভূত হয়।

৩২. অসামান্য ব্যক্তিত্ব

সঙ্ঘের বিকাশ সাধন করে হিন্দু রাষ্ট্রকে নিজ বল ও বৈভবের সাথে পুনরায় একবার বিশ্বের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়েই পরম পূজনীয় ডাক্তার হেডগেওয়ার ভগবানের দেওয়া সম্পূর্ণ শক্তিকে সংহত করে নিজ জীবন গঠন করেন এবং সর্বপ্রকার প্রয়াস করেন। এই কাজের জন্য মাঝে-মাঝে তিনি বাইরে পরিভ্রমণে যেতেন, কিন্তু প্রত্যেক প্রবাসের পরে কিছু দিন সঙ্ঘের কেন্দ্র নাগপুরে অবশ্য থাকতেন। তাঁর নিত্যদিনের আচরণে কেউ অতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে দেখলেও স্বার্থবুদ্ধির লেশমাত্র সন্ধান পেত না। সন্ন্যাসী যেমন নিজের শ্রাদ্ধকর্ম সেরে অগ্রসর হন, সেই মনোভাব নিয়েই ডাক্তারজী নিজ জীবনে আচরণ করতেন। তাঁর শরীরে সন্ন্যাসীর গৈরিক বস্ত্র না থাকলেও এবং তিনি সমাজের লৌকিক ব্যবহার পরিত্যাগ না করলেও, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তা সমগ্ররূপে হিন্দুরাষ্ট্রময় হয়ে গিয়েছিল। তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি জনসমক্ষে এমন ভাব দেখাতেন না যেন তিনি কোন অলৌকিক কাজ করেছেন। তিনি প্রথম থেকেই বিচার-বিবেচনা করেই এই কার্যপদ্ধতি স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে সমাজের মধ্যে থেকে সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার করে জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করবেন। তিনি সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের অনুভূত অভিজ্ঞতা দেখে বুঝেছিলেন যে বাহ্যিক ব্যবহারে বিশেষত, বেশভূষা ও আচার-আচরণে অলৌকিকতা প্রদর্শন করলে, আর্থিক ও শারীরিক দিক থেকে অত্যধিক দুর্বল লোকেরা তার চেলাগিরি শুরু করে দেয়। একথাও তাঁর অবিদিত ছিল না যে এইসব ভক্তরা তাদের গুরুর গুণাবলী অনুকরণ করার পরিবর্তে দিনের পর দিন মনের দিক থেকে আরো বেশী পরাবলম্বী তথা সত্বহীন হয়ে পড়তে থাকে। ডাক্তারজী চেয়েছিলেন হিন্দুস্থানের ঐহিক জীবনকে ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধ তথা সম্পন্ন করে তোলার মত বুদ্ধিমান্ ও কর্তৃত্ববান্ তরুণ যাতে বিপুল সংখ্যায় তৈরী হয় এবং এই জন্যই, যে সন্ন্যাসীর বেশভূষার কারণে অতি সাদা-সিধা সরল মানুষেরাই অধিক সংখ্যায় চতুর্দিকে এসে একত্রিত হয়, তিনি সেই বেশ-ভূষা ভেবে-চিন্তেই পরিহার করেছিলেন। নিঃস্বার্থভাব, চিন্তা-ভাবনায় তর্কশুদ্ধতা, স্বভাবের মাধুর্য, চরিত্রের নিষ্কলংকতা, প্রচেষ্টার পরাকাষ্ঠা এবং সততা — এই গুণগুলি যদি নিজ আচরণে ব্যক্ত হয় তাহলে সমাজের নেতৃত্ব করার যোগ্যতা যে সব তরুণদের মধ্যে সুপ্তাবস্থায় থাকে, তাদের সহজেই নিজের চারদিকে আকৃষ্ট করা সম্ভব, এই আত্মবিশ্বাসের কারণেই তিনি সাধারণ মানুষদের মতই নিজের বাহ্য স্বরূপ বেছে নিয়েছিলেন। নাগপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে সে যুগে মধ্যম শ্রেণীর মানুষদের প্রচলিত বেশভূষাই তিনি সর্বদা পরিধান করতেন।

পায়ে জুতা বা চপ্পল, সাদা ধুতি, কামিজ ও কলারযুক্ত কোট এবং শক্ত ও একটু উঁচু কালো টুপি — এই ছিল তাঁর বেশভূষা। বাইরে বেরুবার সময় রূপোলী মুঠিযুক্ত ছড়ি তাঁর হাতে থাকত। সেই গোলাকার মুঠির উপর সিংহের মূর্তি এবং ডাক্তারজীর মনের পরাক্রমশীলতা ব্যক্তকারী 'স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা' ধ্যেয় বাক্যটি উৎকীর্ণ থাকত। ১৯৩৮-৩৯ সাল থেকে তাঁর শরীরে পশমের বস্ত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু অসুস্থতার দরুন সে বস্ত্র অপরিহার্য ছিল বলেই তিনি সেই বস্ত্র ধারণ করতেন। তার পূর্ব পর্যন্ত তিনি মোটা সূতী বস্ত্রই পরিধান করতেন। কখনো-কখনো তাঁর ছেঁড়া বস্ত্র তাঁর দারিদ্র্যের সাক্ষ্য বহন করত। চাদর বিশেষ ক্ষেত্রেই তিনি ব্যবহার করতেন। শেষ দিকে গলা খারাপ থাকায় তিনি মাফ্‌লার ব্যবহার করতেন। তিনি স্বয়ং সাদা-সিধা জীবন যাপন করতেন এবং অন্যদেরও এই কথাই বলতেন, "বিলাসের বস্তু পাওয়া যাচ্ছে বলেই তা ব্যবহার করা ঠিক নয়। সিধে-সাদা জিনিষ ব্যবহার করাই সব থেকে ভালো, এবং তাতে আনন্দও পাওয়া যায়।" পরিধেয়-বস্ত্র সম্বন্ধে তিনি বলতেন, "বাহ্যিক বেশভূষায় আমরা যেন দুনিয়াকে ছাড়িয়ে 'অত্যাধুনিক' হয়ে না যাই। আবার অনেক পিছিয়ে থেকে লোকের চোখে যেন আমাদের খেলো বা কুসংস্কারযুক্ত বলেও না মনে হয়। অন্যদিকে সমান সমান থাকলেও সবদিক আগলে রাখা যাবেনা। কারণ সেই অবস্থায় আমরা তাদের দোষ-গুণ পরখ করতে পারব না। তাই সময় থেকে শুধু এক-পা এগিয়ে থাকাই ভালো।"

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি যেখানেই যেতেন তাঁর ব্যবহার থাকত সহজ ও অত্যন্ত আত্মীয়তাপূর্ণ। তাঁর কাছে হিন্দুস্থানের কোন স্থানই নাগপুর থেকে আত্মীয়তার দিক থেকে দূরের বলে মনে হতনা, কারণ সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানই তাঁর নিজস্ব ঘর-বাড়ীতে পরিণত হয়েছিল এবং সেখানে বসবাসকারী বিশাল সমাজ তাঁর নিজের পরিবার-পরিজন বলেই মনে হত। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে নাগপুরে নিজের বাড়ীতে থাকার সময় তাঁর ব্যবহার অন্য পাঁচজনের মত হেডগেওয়ার পরিবারের একজন সদস্যের মতই হত। তিনি তাঁর জীবনে শুরু থেকেই এমন কোন বৈশিষ্ট্য আসতে দেননি যাতে মানুষের মনে তাঁর বিষয়ে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়।

তাঁর বাড়ীর দোতলায় সামনের ঘরে বৈঠকখানা ছিল। সেখানে একটা সতরঞ্চী পাতা থাকত। সতরঞ্চীর কোথাও এতটুকু কুঁচকে থাকা তাঁর সহ্য হত না। কেউ দেখা করে চলে যাবার পর ঘরে সব ব্যবস্থা ঠিকমত আছে কিনা, সে বিষয়ে ডাক্তারজী সবসময় নজর রাখতেন। বৈঠকখানা ঘরে লোকমান্য তিলক, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং ডাক্তারজীর বন্ধু স্বর্গীয় ভাউজী কাবরের ছবি টাঙানো থাকত এবং একটি কাচের আলমারিতে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের আবক্ষ মূর্তি রাখা থাকত। এই ঘরটি ১৯২৬ সালে তৈরী করা হয়েছিল, তবে তাকে খুব মজবুত বলা যায় না। ডাক্তারজীর ওজন ১৭৫ পাউণ্ডের বেশী ছিল। তিনি যখন উপরে উঠতেন, তখন সিঁড়ি বেচারী কেঁপে উঠত, এবং তার সঙ্গে সহানুভূতি জানিয়ে ঘরের দেওয়ালও নড়তে থাকত।

ঘরের এক কোণায় ডাক্তারজীর একটা মোটা লাঠি রাখা ছিল। ওজন ও আকার দেখে

সেটাকে মুষল বলাই ঠিক হবে। লাঠিটাকে প্রচুর তেল পান করানো হয়েছিল, যার ফলে খুব চক্‌চক্ করত। তার দুই প্রান্তে লোহার টুপি পরানো ছিল। পিঠ সোজা রেখে হাতকে শরীরের সঙ্গে চেপে রেখে দাঁড়িয়ে লাঠির সরু দিকটা বাঁহাতে নিয়ে এবং অপর দিকটা মাটিতে ঠেকিয়ে রেখে বাহু ও কব্জি না নাড়িয়ে শুধু হাত দিয়ে লাঠিটাকে মাটির সমান্তরালে তোলা বড় কঠিন কাজ ছিল, কিন্তু ডাক্তারজী অবলীলায় তা করতে পারতেন। তাঁর কাছে বাইরে থেকে স্বয়ংসেবকেরা এলে কোন-কোন তরুণকে তিনি এইভাবে লাঠিটা তুলতে বলতেন। যদি কোন স্বয়ংসেবক তাঁর প্রত্যাশা অনুসারে লাঠি তুলতে সক্ষম হত, ডাক্তারজী তার পিঠে হাত রেখে তাকে বাহবা দিতেন, এবং স্বয়ংসেবকও এতে খুব আনন্দ পেত। তিনি চাইতেন যে তরুণদের কব্জি যেন লৌহদণ্ডের মত বলশালী হয়। এই কথা বোঝাবার জন্য তিনি লাঠি তোলার খেলা করতেন। একবার নাসিক থেকে কয়েকজন স্বয়ংসেবক নাগপুরে এল। ডাক্তারজী তাদের ঐভাবে লাঠি তুলতে বলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন তা করতে পারল না। কিন্তু একজন সাফল্যের সঙ্গে লাঠি তুলে নিল। তখন ডাক্তারজী বললেন, "সবাই এই কাজ করতে পারে না। যে ব্যক্তি শক্তি ও যুক্তিকে মেলাতে পারবে, সেই শুধু এখানে সফল হবে।"

ঘর ছোট ছিল, কিন্তু সব জিনিষই যথার্থ স্থানে অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণভাবে সুসজ্জিত থাকত। সব জিনিষ যেন নিজ-নিজ স্থানে থাকে এ বিষয়ে তিনি সব সময় লক্ষ্য রাখতেন। বাড়ীর কোন কাজ করার ব্যাপারেই তিনি কখনো হীনমন্যতা বোধ করতেন না। রবিবার সকালে সঙ্ঘের সাঙ্ঘিক কার্যক্রমের সমাপ্তির পর বাড়ী ফিরে তিনি বাড়ীর বারান্দা, উঠোন এবং ঘর-দোর পরিষ্কার করার কাজে নেমে পড়তেন। সেইভাবে স্বাস্থ্য ঠিক থাকলে তাঁর দাদা শ্রী সীতারামপন্ত বাড়ীর উঠোনে কাঠ কাটতেন। ডাক্তারজীর কাছে যে স্বয়ংসেবকেরা আসত, তাদের নিজেদের বাড়ী অপেক্ষা ডাক্তারজীর বাড়ীই বেশী আপন বলে মনে হত এবং তাঁর সঙ্গে কাজ করার সময় তাদের কখনো মনে হত না যে আমরা বিশেষ কোন কাজ করছি। 'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চসখা ত্বমেব' এইরূপ একাত্মবোধ যাদের ডাক্তারজীর সঙ্গে হয়ে গিয়েছিল, সেই স্বয়ংসেবকেরা যদি কুড়ুল নিয়ে ডাক্তারজীর বাড়ীর জন্য কাঠ কাট্‌তে থাকত, তা হলে তাতে কেউ আশ্চর্য বোধ করত না।

ডাক্তারজীর ঘরোয়া জীবন নতুন-পুরাতনের সঙ্গম ছিল। তাঁর দাদা সীতারামজী পুরোহিতের কাজ করতেন। তাঁর পোষাক ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। শুধু ধুতি ও চাদর। স্বভাবতঃ, তাঁর চাল-চলনে পুরাতন প্রজন্মের কঠোর কর্মকাণ্ড ছিল। কিন্তু ডাক্তারজীর ব্যবহারে হিন্দু সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য — সে যে কোন প্রান্ত বা জাতির হোক না কেন — কোন ভেদাভেদ ছাড়াই সমান স্থান ছিল। আপন-পর, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ইত্যাদি নিয়ম সীতারামজী অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তথা কঠোরতার সঙ্গে মেনে চলতেন। কিন্তু ডাক্তারজীর ঘরে এ সব জিনিষের জন্য কোন জায়গা ছিল না। উপর থেকে দেখলে দুজনের স্বভাব ও আচরণ ছিল দুই মেরুর মত একেবারে ভিন্ন ধরনের, কিন্তু উভয়ের মধ্যে অত্যধিক ভালবাসা থাকার কারণে তাঁদের মধ্যে এগুলি কোন অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। কিছুদিন তাঁরা একটা চশমাতেই দুজনে কাজ চালাতেন। দুজনের কণ্ঠস্বর এমনই একরকম ছিল যে বাইরে থেকে আসা কোন

নতুন ব্যক্তি বুঝতেই পারত না যে ওঁদের মধ্যে কে কথা বলছেন। উভয়ের কণ্ঠস্বর ছিল গম্ভীর ও ভারী। দু ভাইয়ের জীবনের ধারা ছিল ভিন্ন ধরনের। ডাক্তারজীর বৌদি মানে সীতারামজীর স্ত্রী, দুজনের জন্যই চিন্তা করতেন। তাঁকে অনেক সময় সার্কাসে তারের উপর হাঁটার মত কঠিন কাজ করতে হত, কিন্তু তিনি সারা জীবন সেই কঠিন কাজ হাসিমুখে, ভালভাবে নির্বাহ করেন। ডাক্তারজীর গৃহে বসবাস করে কলেজের শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছিলেন শ্রী শ্রীকৃষ্ণ পুরাণিক। এই বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন, ''এই টানাপোড়েনে সৌভাগ্যবতী রমা ভাবী বেশ মুশকিলে পড়ে যেতেন। একদিকে দেবরের মনের মত বাড়ীর সব কিছু করা, আর অপরদিকে পতিদেবতার কর্মকাণ্ড ও দৈনিক আহ্নিকও কোন বিঘ্ন ছাড়াই হতে থাকুক, এইসব দিকে লক্ষ্য রেখে এই পরস্পর-বিরোধী আচার-বিচার সহ গৃহস্থালীর কাজ সামলাতে তাঁকে খুব ঝামেলা সহ্য করতে হত। তা সত্ত্বেও তাঁর মনের শান্তি ও ভারসাম্য কখনো নষ্ট হয়নি। সকলের সময় ও অভ্যাসকে সামাল দিয়ে ঐ সাধ্বী ডাক্তারজীকে বাড়ীর ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত রেখে 'আর এক ভাবে' রাষ্ট্রের বিরাট সেবা করে গেছেন।''

দুই ভাইয়ের ঘরোয়া জীবনের ছোট-ছোট কিছু ঘটনা উল্লেখনীয়। ডাক্তারজীর বৈঠকখানায় আলাদা পাত্রে পানীয় জল রাখা থাকত। একথা স্মরণ রাখা হত যে এই জল যেন রান্নাঘরে না যায়। ১৯৩৫ সালে ডাক্তারজী বার-বার অসুস্থ হয়ে পড়তেন, সেই কারণে তাঁকে ব্যবহৃত জামা-কাপড় পরেই ভোজনে বসতে হত। এরকম সময় শাস্ত্রীজী ভুল করেও তাঁর পংক্তিতে ভোজন করতে বসতেন না। বাড়ীতে কখনো-কখনো দুই ভাইয়ের মধ্যে নানা সামাজিক ও ধার্মিক বিষয়ে আলোচনা চলত। তাঁরা এত জোরে কথা বলতেন যে প্রতিবেশীদের মনে হত বুঝি দু ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া চলছে। ডাক্তারজীর ইচ্ছা ছিল যে বাড়ীতে একটি দুগ্ধবতী গাভী থাকুক এবং তিনি তাঁর এই ইচ্ছা ব্যক্তও করে ফেলতেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা কখনো পূরণ হয়নি। কারণ কী? শ্রী সীতারামজী গরু বা বলদের মত মূক পশুকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে 'বন্ধনে' রাখা নিষিদ্ধ বলে জ্ঞান করতেন। ডাক্তারজী জানতেন যে দাদার কারণেই তাঁর ঘরোয়া জীবন বা পারিবারিক বাতাবরণের মধ্যে থাকা সম্ভব হচ্ছে। অতএব, সীতারামজীর কিছু চিন্তা-ভাবনা তাঁর অপছন্দ হলেও ভ্রাতৃপ্রেম এবং উপরিউক্ত কারণে তিনি তাঁর সমাদর করতেন। দাদার সন্তানদের খাইয়ে দেওয়া, খেলানো, প্রয়োজন হলে চা করা, রান্না ইত্যাদি করা, দাদার অসুস্থতার সময় কয়েক রাত জেগে তাঁর শুশ্রূষা করা ইত্যাদি কাজ মতপার্থক্য সত্ত্বেও ডাক্তারজী সহজাত ভাবনায় করতে পারতেন। অনুরূপভাবে, ডাক্তারজীর আচার-বিচার সম্বন্ধে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও 'আমাদের কেশব সমাজ-সংগঠনের এক মহৎ কাজ করছে', শুধু মাত্র এই একটি কথা চিন্তা করে সীতারামজী ডাক্তারজীর অনেক অরুচিকর ব্যাপারেও চোখ বন্ধ করে নিতেন। শাস্ত্রীজীর উরুতে ফোড়া হওয়ার দরুন একবার তা অপারেশন করানো হল। ভিতরে তুলোর এক টুকরো থেকে যাওয়ার ফলে অনেক কিছু করার পরেও ফোড়া সারছিল না। ডাক্তারজী পুনরায় অস্ত্রোপচার করিয়ে ঐ তুলোর টুকরো বের করিয়ে দিলেন। এই সময় ডাক্তারজী এমন সেবা-শুশ্রূষা করেন যে তাঁর স্বভাব অনুযায়ী আক্ষরিক অর্থে রাত-দিন এক করে দিয়েছিলেন। তাঁর সেবা শুশ্রূষার পরিণামেই শাস্ত্রীজী ঐ ভীষণ অসুখ থেকে

মুক্তিলাভ করতে পেরেছিলেন। নিজের সামাজিক কাজের ব্যাপ্তি সামলেও ডাক্তারজীর দিক থেকে শাস্ত্রীজী এই যে ভ্রাতৃপ্রেম লাভ করেছিলেন সেকথা তিনি কোন দিন ভুলতে পারেন নি। এই মনোভাবই তাঁর সহিষ্ণুতা বজায় রাখতে বিরাট সাহায্য করেছিল।

ডাক্তারজীর কাকা শ্রী আবাজী বয়সে অনেক বড় এবং বংশ পরম্পরা অনুসারে ক্রোধী স্বভাবের মানুষ ছিলেন। নাগপুরে ডাক্তারজীর সঙ্গে থাকতে এসে কিছুদিন তিনি সঙ্ঘকার্য ও ডাক্তারজীর প্রচেষ্টাকে দূর থেকেই কৌতূহল ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতেন। কিন্তু ১৯৩২-৩৩ থেকে তিনি ক্রমে ডাক্তারজীর কাজের স্বরূপ উপলব্ধি করে সঙ্ঘকার্যে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। কাকা হিসাবে ডাক্তারজী তাঁকে বিশেষ সম্মান করতেন। কিন্তু পরে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে অন্যান্য স্বয়ংসেবকদের মত আবাজীও ডাক্তারজীর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। সঙ্ঘের আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা তথা ব্যবহারিক দক্ষতাপূর্ণ দৃষ্টি সহ মনোযোগ দিতে শুরু করেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে সঙ্ঘ-শাখা স্থাপনের কাজেও তিনি মাসে বা দু মাসে প্রবাসে যেতে আরম্ভ করলেন।

ডাক্তারজী নাগপুরে থাকলে অনেকে তাঁর বাড়ীতে আসতে আরম্ভ করতেন। আগত ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা ডাক্তারজী অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে করতেন। বাইরে থেকে যাঁরা আসতেন তাঁদের থাকার ও ভোজনাদির বিষয়ে তিনি অত্যন্ত আত্মীয়তার সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন, এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিজ গৃহেই কারো-কারো থাকার ব্যবস্থা করতেন। চায়ের জল প্রায় সারা দিনই উনুনে বসানো থাকত। বহুবার ডাক্তারজী যখন অকস্মাৎ আগত অতিথিদের অভ্যর্থনা ও বসাবার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতেন, তখন তাঁর বৌদির সামনে বাড়ীতে যা কিছু আছে, তাই দিয়ে অতিথিদের সকলের চা-জল খাবারের ব্যবস্থা কেমন করে করা যায়, এই সমস্যা দেখা দিত। পরিবারের পেশা ছিল পুরোহিতগিরি, অতএব সঞ্চয় ও নিশ্চিন্ততার কথা চিন্তা করাই সম্ভব ছিলনা। দান-দক্ষিণার সাহায্যে কোন রকমে সংসারের গাড়ী চলত। শাস্ত্রীজী নিমন্ত্রিত হয়ে ভোজন করার জন্য যজমানদের বাড়ী চলে যেতেন। কিন্তু ডাক্তারজীর কারণে বাড়ীতে অতিথিদের আগমনে কোন বিরাম ছিলনা। ডাক্তারজীর ভোজনের সময় কেউ এসে পড়লে তাঁর মুখ থেকে এমন কথা কখনো শোনা যেত না যে "আপনি একটু বসুন, আমি খেয়ে আসি।" বরং সেখানে যেই উপস্থিত থাকত, তাকেই ভোজনের জন্য ভিতরে নিয়ে যেতেন এবং যা কিছু তাঁর জন্য রাখা থাকত, তাকে আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের কাছে বসিয়ে খাওয়াতেন। কখনো-কখনো ঠিক খাবার সময় অতিথি এসে পড়লে এবং খাবার খুব অল্প থাকলে তিনি বলতেন, "আমি এইমাত্র খেয়ে উঠেছি, আসুন আপনি ভোজন করে নিন।" এই কথা বলে অতিথিকে ভোজন করাতেন এবং তাঁর সামনে পিঁড়েতে বসে কথাবার্তা বলতেন। দারিদ্র্যের দুঃখ কখনো তাঁর চেহারায় প্রকাশ পেত না। এইভাবে খালি পেটে থেকেও আগন্তুক সজ্জনকে লঙ্কার আচার পরিবেশন করার সময় ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করতেন, "এটাতে ঝাল কম হয়েছে বলেই মনে হয়।" কখনো-কখনো এইভাবে হঠাৎ আগত অতিথিকে আতিথ্য দেওয়া ডাক্তারজীর কাছে নিজের পরীক্ষার মতই হয়ে দাঁড়াত। একবার রাত্রে অতিথিদের আগমনের পর দেখা গেল যে বাড়ীতে উনুন জ্বালাবার কাঠ নেই। সেই সময়ে তিনি নিজের

ঘরের দু-একটা তক্তা খুলে নিয়ে কাজ চালালেন। অখিল ভারতীয় সংগঠন নির্মাণে সাফল্যলাভ-কারী ডাক্তারজীর এইরূপ ছিল গৃহজীবন! দারিদ্র্যাচী অমুচী দীক্ষা, সত্ত্বাচী প্রতিপদীঁ পরীক্ষা" (দারিদ্র্যই আমার দীক্ষা, প্রতি পদে সত্ত্বের পরীক্ষা), এটাই ছিল তাঁর জীবনের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। ডাক্তারজী কোন বিশেষ দিনে ব্রতোপবাস করতেন না। কিন্তু এইরূপ উপবাসের সুযোগ বহুবার তিনি লাভ করতেন।

ডাক্তারজী তাঁর যুবাবস্থায় অতি উগ্র দেশভক্তির মনোভাবের দরুন চা পান করতেন না। কিন্তু সঙ্ঘ আরম্ভ করার পর ১৯২৭ সালে চান্দাতে একটা ঘটনা ঘটল, যার ফলে তিনি চা পান করতে আরম্ভ করলেন। তিনি একজন গরীব স্বয়ংসেবকের বাড়ী গিয়েছিলেন। সেখানে জল খাবারের জন্য তাঁর সামনে চা ও পোহা (চিঁড়ের পোলাও) রাখা হল। ডাক্তারজী পোহা খেলেন, কিন্তু চা পান করলেন না। বাড়ীতে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যখন জানতে পারলেন যে ডাক্তারজী চা-পান করেন না। অথচ তাঁকে দেবার মত দুধ বাড়ীতে যথেষ্ট ছিলনা। বাড়ীর লোকদের এই অস্বস্তি ডাক্তারজীর চোখ এড়াল না। তিনি সেখান থেকে ফিরে আসার পরেও থেকে-থেকে তাঁর মন সেই কুটিরের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। সন্ধ্যার কাজকর্ম শেষ হবার পর তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং কোট, টুপি পরে নিলেন এবং বললেন, "চল, ঐ স্বয়ংসেবকের বাড়ী গিয়ে চা খেয়ে আসি।" তিনি জানতেন যে চারজন লোককে সঙ্গে নিয়ে চলতে হলে তাদের সমানই ব্যবহার করতে হয় এবং এই কথা চিন্তা করেই তিনি চা পান করতে শুরু করে দিলেন। তাঁর চায়ের কোন অভ্যাস ছিল না, এবং তার প্রতি রুচিও ছিল না। কিন্তু তিনি ভাবতেন যে চা-এর অজুহাতে পাঁচ-দশ মিনিট বসার এবং কথা-বার্তা বলার সহজ সুযোগ লাভ করা যায়। তাঁর প্রত্যেকটি রুচি-অরুচির কষ্টিপাথর ছিল লোকসংগ্রহের আবশ্যকতা ও তার উপভোগ্যতা। ব্যক্তিগত অভিরুচির কারণে কেউ চা পরিবেশন করলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হলেও তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করতেন। একবার জনৈক সজ্জনের সঙ্গে দেখা করতে ডাক্তারজী গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ কথা হবার পর উক্ত সজ্জন বললেন, "একটু বসুন, এখনই চা করতে বলছি।" একথা শুনে ডাক্তারজীর সঙ্গে যিনি গিয়েছিলেন, তিনি উঠে বললেন, "না, না, আজ সকাল থেকে অনেকবার চা খাওয়া হয়েছে, এবং তাঁকে চা-এর কথা মানা করে দিলেন। অর্থাৎ কিছুক্ষণ মাত্র কথা বলেই ডাক্তারজীকে সেখান থেকে যেতে হল। এই কথা ডাক্তারজীর ভাল লাগল না। "রাখাবীঁ বহুতাঁচীঁ অন্তরে" — অনেকের মন রাখতে হবে, এটা তাঁর স্বভাবের নীতি হওয়ার কারণে তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে সঙ্গী কার্যকর্তার উপর একটু বিরক্তিও প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, "চা-এর খরচ হলে ঐ সজ্জনের হত, তোমার কী হত? যতক্ষণ চা তৈরী হত ততক্ষণ তাঁর সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ কথা বলার সুযোগ পাওয়া যেত। তোমার মানা করার ফলে সেই সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল।"

চা-এর প্রচার সেই সময় বেশ হচ্ছিল, সেই কারণে ডাক্তারজী চা-পান করা আরম্ভ করে দিলেন। কারণ প্রায়ই এদিক-ওদিক দেখা সাক্ষাৎ করতে যেতে হত এবং আক্ষরিক অর্থেই দিনে শতাধিক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে হত। যদি কেউ চা দিত, তাহলে তার মনে কষ্ট দিয়ে মানা করা সংগঠনের দিক থেকে হিতকর বলে মনে হত না। তাই তাঁর সামনে চায়ের পেয়ালা

রাখা হলে এক ঢোঁকই হোক না কেন, সেটুকু পান করে তিনি তার আতিথ্য গ্রহণ করতেন। কিন্তু ঐ চায়ের কারণেই তাঁর বৌদি সৌঃ রমাদেবীকে বেশ কষ্ট করতে হত। তবু সেই জননী, দেবরের কাছ থেকে চায়ের প্রয়োজনের কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে কখনই উনুনে চা-এর জল চড়াতে তিনি কষ্ট বলে মনে করতেন না। একথা বলাই উপযুক্ত হবে যে তাঁর বৌদির রূপ পরিগ্রহ করে মূক সেবাই বুঝি মূর্তিমতী হয়ে ডাক্তারজীর গৃহে বাস করত। কিন্তু মাঝে-মাঝে এমন অবস্থা হত যে উপর থেকে চা-এর নির্দেশ এলেও বাড়ীতে কখনো চা নেই, কখনো চিনি নেই। এরকম সময় কোন স্বয়ংসেবককে বাজারে পাঠিয়ে কোন রকমে মান বাঁচাতে হত। একবার ডাক্তারজীর বন্ধু শ্রী বিশ্বনাথ রাও কেলকর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ডাক্তারজী তাঁর জন্য চা করে পাঠাবার নির্দেশ দিলেন, কিন্তু পাঁচ মিনিট পরেও চা এলনা দেখে ডাক্তারজী শ্রীবিশ্বনাথ রাওকে একটু বসতে বলে ভিতরে খোঁজ করতে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন যে না-তো চা আছে, আর না কেনার জন্য পয়সা। এদিকে ডাক্তারজী তাঁর বন্ধুকে চায়ের জন্য বসিয়ে রেখেছেন, আর ওদিকে বাড়ীর মধ্যে এই অবস্থা। তৎক্ষণাৎ ডাক্তারজী দোকানে গিয়ে চা নিয়ে এলেন এবং যেমন তেমন করে অবস্থার সামাল দিলেন। কিন্তু শ্রী কেলকরের ব্যাপারটা বুঝতে বাকি রইলনা। এর পরে তাঁর যখন শ্রী গুরুজীর সঙ্গে দেখা হল, তখন তিনি ডাক্তারজীর বাড়ীর আর্থিক অবস্থা এবং তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশদভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং জিজ্ঞেস করেন যে "আপনারা তাঁর বাড়ীর অসুবিধার দিকে দেখেন না কেন? তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে বলে--আমার মনে হল।" ডাক্তারজী দারিদ্র্যের আঘাত সহ্য করতে পারতেন কিন্তু তাঁর অ-যাচিত স্বভাবের মধ্যে কোন রকম পরিবর্তন করার কল্পনাও তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। এ বিষয় ভালোভাবে জানা ছিল বলে, তাঁরই মত ঐহিক অসুবিধাগুলির প্রতি উপেক্ষার মনোভাব পোষণকারী শ্রীগুরুজী উত্তর দিলেন, "একাদশীর পেট শিবরাত্রি কেমন করে ভরবে?" (একাদশী ও শিবরাত্রি — দুইই হল উপবাসের ব্রত, অর্থাৎ কে কার পেট ভরায়!) একথা শুনে শ্রী বিশ্বনাথ রাও বললেন, "ডাক্তারজীর বাড়ীর খরচের জন্য আমি আমার দিকে থেকে পত্র-পুষ্প রূপে প্রতি মাসে আপনাকে পঁচিশ টাকা করে দেব।" এ কথা শুনে শ্রী গুরুজী বললেন, "আপনি তাঁর বন্ধু, অতএব, আপনি আজ নিজের হাতে এই টাকা তাঁর হাতে দিলেই ভাল হয়।" কিন্তু ডাক্তারজীর স্বভাবের বিষয় অবহিত থাকার দরুন শ্রী বিশ্বনাথ রাও-এর পক্ষে তাঁর সামনে এই বিষয়টি উত্থাপন করার সাহস হয়নি।

১৯৩৪-৩৫-এর মে মাসে অনুষ্ঠিত অধিকারী শিক্ষণ বর্গের শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে ডাক্তারজীকে একটি শ্রদ্ধানিধি সমর্পণ শুরু হয়েছিল। এই নিধি থেকে ডাক্তারজীর হাতে পাঁচ-ছ শো টাকা আসত। এতৎসত্ত্বেও ডাক্তারজীর বাড়ীর অভাব দূর হয়নি, কারণ তিনি এই নিধি থেকে বেশ বড় অংকের গুরুদক্ষিণা দিতেন। সেই সঙ্গে স্বয়ংসেবকদের অসুবিধা দূর করার ব্যাপারে তাঁর হাত আগে থেকে আরো বেশী উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তার উপর প্রবাসও বৃদ্ধি লাভ করেছিল। স্বয়ংসেবকদের অসুবিধা এবং বাড়ীর অসুবিধার মধ্যে তিনি প্রথমটিকেই অগ্রাধিকার দিতেন। এক বছর তাঁর ঘরের একটা দেওয়াল ভেঙে পড়ে। তাকে তৈরী করার

দরকার ছিল, কিন্তু সেটা ঐ অবস্থাতেই বহু দিন পড়েছিল। তার কারণ এই যে ডাক্তারজীর কাছে টাকা-পয়সা এলেই তিনি অসুবিধাগ্রস্ত স্বয়ংসেবকদের জন্য তা খরচ করে দিতেন। তার দেওয়াল তৈরী করার জন্য পয়সা বাঁচতনা। কিন্তু ডাক্তারজীর সে বিষয়ে চিন্তা কোথায়? তাঁর মনে হত সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের অবস্থা আকাশ ভেঙে পড়ার মত হয়েছে, তখন আমি আমার বাড়ীর কথা চিন্তা করি কেমন করে?

প্রৌঢ় স্বয়ংসেবকদের মতই ডাক্তারজীর স্নেহের স্নিগ্ধ ছায়ায় ক্রীড়ারত বালক ও কিশোর স্বয়ংসেবকেরাও তাঁর দারিদ্র্যের কথা অনুমান করতে পারত। একবার নাগপুরের জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সেই সময় কয়েকজন বালক স্বয়ংসেবকও সেখানে বসেছিল। কিছুক্ষণ কথা-বার্তার পর ভদ্রলোক যখন যাবার জন্য উঠলেন, তখন ডাক্তারজী তাঁকে আগ্রহপূর্বক থামালেন এবং অন্ততঃ সুপুরি গ্রহণ করার অনুরোধ করলেন। তাঁর দাদার পুরোহিতগিরির কাজে প্রাপ্ত সুপারির একটা টুকরোও যদি পাওয়া যায়, এই আশায় তিনি নিচে গিয়ে প্রত্যেক কৌটো নেড়ে দেখতে লাগলেন। সৌভাগ্যক্রমে একটা ভাঙা সুপারি পাওয়া গেল। সেটাকেই পানের কৌটাতে রেখে নিয়ে এলেন এবং অতিথি-সৎকার করলেন। তিনি বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর ডাক্তারজী বললেন, "দেখ, তাঁর বাড়ীতে গেলে উনি কী চমৎকার আমাদের আদর-যত্ন করেন। আর এখানে এলেন, তো তাঁকে দেবার মত সুপারিও জুটলনা।"

ডাক্তারজীর মুখ থেকে এইরকম স্বগতোক্তি শুনে কয়েকজন বালক স্বয়ংসেবক তাঁর বাড়ীর অবস্থা বুঝতে পারল। তাদের কোমল বালক-হৃদয় এই দুঃখ দেখে বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। কিছু দিন পর ডাক্তারজীর জন্মদিন উপস্থিত হলে ঐ বালক স্বয়ংসেবকেরা নিজেদের মধ্যে যোজনা তৈরী করে তাঁকে কিছু নমস্কারী অর্পণ করল। তার মধ্যে এক জোড়া ধুতি তো ছিলই, সেই সঙ্গে সুপারির এক বড় ঠোঙা দিতেও ভুলল না। পরে জানা গেল, এই নমস্কারীর জন্য ঐ স্বয়ংসেবকেরা নিজেদের মধ্যে পয়সা সংগ্রহ করেছিল, এবং একজন স্বয়ংসেবক তাঁর সোনার অলংকার বিক্রী করে পয়সা দিয়েছিল।

হিন্দুত্বের প্রতীক শিখা ডাক্তারজী নিজে রেখেছিলেন এবং তাঁর প্রত্যাশা ছিল যে সকল হিন্দুই যেন শিখা রাখে। কিন্তু তার জন্য তিনি কখনো কারো উপর চাপ দেননি। তবে স্বয়ংসেবকদের গণবেশ নিরীক্ষণ করার সময় পরিচ্ছন্নতা, ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য যেমন নম্বর দেওয়া হত, তেমনই শিখার জন্যও পাঁচ নম্বর নির্দিষ্ট থাকত।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পূর্বে ডাক্তারজী স্নানের পরে নিয়ম করে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতেন। সেই সময় পরনের ধুতির একাংশ শরীরের উপর ধারণ করতেন। পরবর্তী কালে দৌড়াদৌড়ির ব্যস্ত জীবনে সন্ধ্যা-আহ্নিকের জন্যও সময় করা কষ্টকর হয়ে পড়ল।

একবার তাঁর বন্ধু শ্রী প্রহ্লাদ পন্ত ফড়নবীস তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "এত বয়স হয়ে গেল, কিন্তু তুমি সন্ধ্যা, পূজা, নাম স্মরণ ইত্যাদি কিছুই করনা?" একথা শুনে ডাক্তারজী বললেন, "আপনার কথা সত্যি। কিন্তু কাল যমরাজের সামনে যদি আমাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় তো সে আমার কী করবে? কারণ আমি আমার জীবনে নিজের জন্য কিছুই

করিনি।" স্নানের পরে তিনি কুঙ্কুম-চন্দনের টিকা লাগাতেন। কোথাও যাবার সময় উপর থেকে নিচে নেমে তিনি ঠাকুরঘরে গিয়ে দেবতাকে প্রণাম করে বাইরে যেতেন। তাঁর পূজ্য মাতা পিতার শ্রাদ্ধ একই দিনে ছিল। সেদিন তিনি তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য নিয়ম করে বাড়ীতেই থাকতেন। তিনি শ্রাবণীর সংস্কার অনুষ্ঠানেও যোগ দিতেন। আশ্বিন মাসে গোবৎসদ্বাদশীর দিন ডাক্তারজীর গৃহে কুল-পরম্পরায় একটি অনুষ্ঠান [১] হত। প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর দ্বারা অভিষেক এবং বেদপাঠ এবং তার পরে আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে ভোজনের কার্যক্রম থাকত। পুরোহিতরা ছাড়া, নাগপুর তথা প্রান্তের অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশ জন বন্ধুদের সেদিন ডাক্তারজী অবশ্যই নিমন্ত্রণ করতেন। খুব ধূমধাম করে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত।

ডাক্তারজী একজন সাত্বিক তথা আস্তিক ব্যক্তি ছিলেন। ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে তাঁর অচল শ্রদ্ধা ছিল। 'শ্রী' অথবা 'ওম্' ছাড়া তিনি কখনো দৈনন্দিনী অথবা পত্র লিখেছেন, এমন দেখা যায়নি।

তাঁর দৃঢ় শ্রদ্ধা ছিল যে সঙ্ঘ ঈশ্বরীয় কাজ এবং এই বিশ্বাস তাঁর কথায় এবং পত্রগুলিতেও বার-বার ব্যক্ত হত। তিনি এই ধারণা নিয়েই ব্যবহার করতেন যে আমরা সকলে পরমেশ্বরের হাতের এক উপকরণ মাত্র, এবং তিনি সূত্র-সঞ্চালন করেন এবং তদনুসারেই সব কাজ আপনা থেকেই হয়। সঙ্ঘকার্যকে ঈশ্বরীয় কার্য বলার সময় একথাও পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতেন যে শ্রী মদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত সজ্জনদের সংরক্ষণ এবং দুর্জনদের দলনের ঈশ্বরীয় কার্যই সঙ্ঘ করছে। সেইরকম 'দাসবোধ'-এর মর্মকে ডাক্তারজী আত্মস্থ করেছিলেন, অতএব শ্রী সমর্থ

---

(১) গোবৎসদ্বাদশীর এই কার্যক্রমের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মৃতি যুক্ত হয়ে আছে বলে মনে হয়। হেডগেওয়ার বংশের মূলপুরুষ ছিলেন বল্লভেশ। ডাক্তারজী ছিলেন নবম প্রজন্মের বংশধর। শ্রী বল্লভেশের বিপুল ভক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত দিবসরূপে তাঁর বংশে এই দিনটি পালিত হয়।

শ্রী বল্লভেশ দত্তাত্রেয়র অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। উপজীবিকার জন্য তিনি ব্যবসা করতেন। সুশীল এবং আচারনিষ্ঠ হওয়ার দরুন জনসাধারণের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। একবার তিনি ব্যবসার জন্য বাইরে গিয়েছিলেন। বাড়ী থেকে যাবার সময় তিনি সংকল্প করেছিলেন যে ব্যবসায়ে ভাল লাভ হলে কুরবপুরে যাত্রা করার সময় তিনি ব্রাহ্মণদের সহস্র ভোজন করাবেন। পরে তাঁর প্রত্যাশা অনুসারে ব্যবসায়ের উন্নতি হল এবং তাঁর যথেষ্ট লাভ হল। নিজের সংকল্পের কথা স্মরণ করে পর্যাপ্ত অর্থ নিয়ে গুরু শ্রীপাদের নাম স্মরণ করে তিনি যাত্রা করলেন। পথে কিছু ধূর্ত লোকের তাঁর কাছে প্রচুর অর্থ থাকার বিষয়ে ধারণা হয়। ওরাও ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে শ্রী বল্লভেশের সঙ্গ নেয়। দু-তিন দিন যাত্রার পরে একদিন রাত্রে যখন সকলে কুরবপুর-মাহাত্ম্য পরস্পরের নিকট শোনাতে ব্যস্ত ছিল, তখন চোরেরা বল্লভেশের উপর আক্রমণ করে তাঁর শিরচ্ছেদ করে এবং সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নেয়। এমন সময় এক ত্রিশূল ও খড়্গধারী জটামণ্ডিত দিব্য পুরুষ প্রকট হলেন এবং চোরদের শেষ করে দিয়ে বল্লভেশকে পুনর্জীবিত করে দেন। সেই দিনটি ছিল কুরবপুর যাত্রার দিন, অর্থাৎ গুরু-দ্বাদশীর দিন।

বর্ণিত ঈশ্বরীয় কার্যও তাঁর নিকট অজ্ঞাত ছিলনা। শ্রী সমর্থ পুরুষার্থকেই ঈশ্বরের স্বরূপ বলেছেন। সঙ্ঘকার্যকে ঈশ্বরীয় কার্য বলার সময় ডাক্তারজীর সম্মুখে নিশ্চিতরূপে সমর্থের "যত্ন তো দেব জাণাবা" ("যত্নকেই দেব জানবে") এবং "অচুক যত্ন তো দেবো। চু কনে দৈত্য জাণিজে" (অভ্রান্ত যত্নই দেব, ভ্রান্তিই দৈত্য জানবে") এই পদটি থাকত। সঙ্ঘের প্রার্থনাতেও সর্বশক্তিমান্ প্রভুকে সম্বোধন করে দুইটি পংক্তি যুক্ত হওয়ার মধ্যেও এই আস্তিকতাই ব্যক্ত হয়েছে। সঙ্ঘের প্রতিজ্ঞাতেও পরমেশ্বর ও পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে হিন্দু রাষ্ট্রের পুনরুদ্ধার এবং তাকে বৈভবসম্পন্ন করার জন্য প্রযত্নশীল থাকার সংকল্প করা হয়। নিঃসন্দেহে, এর মধ্যে ডাক্তারজীর অন্তঃকরণের ভাবনাই প্রতিফলিত হয়।

জীবনে ধার্মিকতা থাকা সত্ত্বেও ডাক্তারজী কখনো তার প্রদর্শন করেননি। তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেন যে তিনি কখনো-কখনো প্রাতঃকালে উঠে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসতেন। পীড়িত তথা দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত সমাজের জন্য দিবা-রাত্র প্রয়াস করার উপযুক্ত ছিল তাঁর উজ্জ্বল তপশ্চর্যা এবং তাঁর মন এমন উন্নত অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল যে সর্ব অবস্থাতেই তা অবিচল থাকতে সক্ষম ছিল। সন্ত একনাথের এই বাণী — "কডকডীত বিজেচে কল্লোল। তেণেঁ গগনাসি নসে খলবল। তৈসা নানা ঊর্মী মাজী নিশ্চল। গাম্ভীর্য কেবল য়া নাঁব।" "বিদ্যুৎ যতই চমকাক, আকাশে তার আলোড়ন কোথায়। সেইরূপ নানা তরঙ্গাঘাতেও নিশ্চল। এর নামই প্রকৃত গাম্ভীর্য।" তাঁর আচরণে এ সবই সার্থক হতে দেখা গেছে। তাঁর মন সর্বদা বিবেকের সিংহাসনে আরূঢ় থাকত। তাঁর যে কোন মুহূর্তের ব্যবহারে এবং যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিঃসংশয়ে তার প্রমাণ পাওয়া যেত।

একদিন সন্ধ্যায় ডাক্তারজীর কয়েকজন বন্ধু বসেছিলেন। ঘরের মাঝখানে একটি আলো উপরে ঝোলানো ছিল। ঐ অনুজ্জ্বল আলোকে গল্প-গুজব খুব জমে উঠেছিল। সকলে যখন এইরূপ হাস্য-পরিহাসে মশগুল ছিলেন, ঠিক সেই সময় ডাক্তারজীর খুড়তুতো ভাই বামন কোন কারণে ঐ ঝুলন্ত আলোর তলা দিয়ে ছুটে গেল। তার মাথার ধাক্কা লেগে কাঁচের চিম্‌নি নিচে পড়ে ভেঙে গেল এবং তেল পড়ে যাওয়ার ফলে আলোও ভক্-ভক্ করে নিভে গেল। এই ঘটনায় জম্‌জমাট আসরের রসভঙ্গ হওয়ায় বামনের পিতা শ্রী আবাজী হেডগেওয়ার প্রদীপের মতই দপ্ করে জ্বলে উঠলেন। কিন্তু ডাক্তারজী তাঁকে শান্ত করে বসিয়ে দিলেন, যেন কিছুই হয়নি। এবং শান্ত ভাবে অন্য চিম্‌নি এনে লাগিয়ে দিলেন। তাঁর সংযম দেখে সকলেই বিস্মিত হলেন।

ডাক্তারজীর বিপ্লবী জীবনকাল থেকে অর্থাৎ ১৯১৫-১৬ থেকেই তাঁর প্রতি আত্মীয়তা তথা স্নেহ-পরায়ণ মনোভাব যাঁরা পোষণ করতেন এরকম গুরুজন সমগ্র প্রান্তে ছড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যে মনে হত তিনি তাঁদের পরিবারেরই একজন। তিনি যখন সেই সব স্থানে যেতেন তখন তাঁর ব্যবহারও এই ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ অত্যন্ত আন্তরিক আত্মীয়তাপূর্ণ ও নিঃসংকোচ হত। ডাক্তারজীর যুবাবস্থায় তাঁর হৃষ্ট-পুষ্ট তথা ভীমকায় শরীর, সেবাভাব এবং বিনয়ী স্বভাবের কারণে সব গুরুজনরাই অত্যধিক প্রভাবিত ছিলেন। এ বিষয়ে বর্ণনা করে সাবনের-এর উকিল শ্রী মামা

হরকরে বলেন যে "তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আমাদের বাড়ীতে আসা মাত্র আমার বাবা বাড়ীর ভিতর জলখাবারের নির্দেশ পাঠিয়ে বলতেন, "আরে! হনুমান এসেছেন।" ডাক্তারজীর ভোজনের বহর দেখে তাঁকে ভালবেসে 'হনুমান' বলে অভ্যর্থনা জানানোটাই উপযুক্ত মনে হত। বিবাহ-যজ্ঞোপবীত ইত্যাদির নিমন্ত্রণে তাঁর পাতে চল্লিশ-পঞ্চাশটা জিলিপি প্রথমেই পরিবেশন করে দেওয়া হত এবং তিনিও হাসতে-হাসতে সেগুলি শেষ করে ফেলতেন। ১৯৩০ সালের কারাবাসের সময় পর্যন্ত তাঁর সব বন্ধুরাই এরকম ভোজন-রসিক ছিলেন এবং যদি সকলে এক সঙ্গে কারো গৃহে ভোজন করতে যেতেন তাহলে একবার মাখা আটা শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে আবার আটা মাখতে হত, এবং রুটির সঙ্গে তরকারীও শেষ হয়ে গেলে মোরব্বা বা আচারের সাহায্য গ্রহণ করতে হত। এবং তখনও তাঁরা বয়াম পুরোপুরি সাবাড় না করে ছাড়তেন না। কোন-কোন বাড়ীতে ডাক্তারজীর এত বেশী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যে তিনি বাড়ীর বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাদের অসংকোচে বলতেন, "মাসিমা, আজ আমাকে নারকেলের গুজিয়া করে খাওয়াও।" আর পাঁচ সাতটা নারকেলের 'পূরণ' চোখের নিমেষে শেষ হয়ে যেত। ডাক্তারজী ভাকরীর সঙ্গে লঙ্কা ও তেল খুব পছন্দ করতেন। শুধু তাই নয়, বড়া ভাত, ভাজা ভাত, চক্‌লী, থালীপীঠ, পুড়া কী বড়ী, মুড়ির সঙ্গে চিঁড়ে ভাজা প্রভৃতি ভাজা জিনিষ তাঁর খুব প্রিয় ছিল। ১৯৩৪ পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল, কিন্তু তার পর পরিস্থিতি বদলে গেল। আগেকার অভিজ্ঞতার কারণে সকলেই তাঁকে ভোজনের আগ্রহ অবশ্যই করতেন, কিন্তু সেগুলি তাঁর স্বাস্থ্যের অনুকূল হতনা। তাতে তাঁর ক্ষতিই হত।

বিদর্ভ ও মধ্যপ্রান্ত ঘুরলে ডাক্তারজীর আহার সম্বন্ধে অনেকের মুখ থেকে মজার গল্প শুনতে পাওয়া যায়। তাঁদের প্রত্যেকেই তাঁদের বাড়ীতে ডাক্তারজী যা খেতেন, সেটাই তাঁর সব থেকে রুচিকর খাদ্য বলে বর্ণনা করেন। এই সব ধরনের খাদ্য-পদার্থের বর্ণনা শুনে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে ডাক্তারজীর সব জিনিষই পছন্দ ছিল, অথবা যার গৃহে ভোজন করতে যেতেন, তাকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করতেন যে তাঁর মনের মত ভোজন তৈরী হয়েছে!

এইরূপ ভোজনের বর্ণনার সঙ্গে-সঙ্গে, অনেকে ডাক্তারজীকে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে কুয়া বা নদীতে ঘন্টার পর ঘন্টা সাঁতার কাটতে দেখেছে। একবার কাশীতে বিশাল গঙ্গা সাঁতরে এপার-ওপার করেন। এইভাবে খালি বাসনের মত মোটর সাইকেল তুলে বাড়ীর বাইরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ডাক্তারজী মাঝে মাঝে শ্রী গোবিন্দরাও চোলকরের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা করতেন। তাঁর শরীর ছিল স্বাস্থ্যবান্, খুব খেতে পারতেন এবং কাজ শেষ করার তৎপরতা তথা পরিশ্রম করার ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। কিন্তু আমরা যেন একথা ভুলে না যাই যে সুস্বাদু ভোজন গ্রহণ করার সময় তিনি যেরকম আনন্দ পেতেন, অনাহারে থাকলেও ঠিক সেই রকম আনন্দ তাঁর চেহারায় দেখা যেত। দুনিয়ার দৃষ্টিতে ডাক্তারজীকে 'কখনো বিলাসী' 'কখনো প্রবাসী' মনে হলেও তাঁর অবিচল দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত হিন্দুরাষ্ট্রের উদ্ধারের জন্য লক্ষ-লক্ষ ভ্রাতৃবৃন্দকে এক সংগঠন-সূত্রে আবদ্ধ করার লক্ষ্যে, এই কারণে অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা উভয় অবস্থাতেই তিনি সমান উৎসাহী তথা কর্মক্ষম থাকতেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকা পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে

খেলাচ্ছলে মারামারি, বালিশ-তোষক পরস্পরের দিকে নিক্ষেপ করে পুরো বৈঠকখানা যেন মাথায় তুলে ধরতেন। শুধু তাই নয়, নরম বালিশ দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে মারাটা তেমন জুতসই হত না বলে বালিশের মধ্যে অড়হর ডাল ভরে বালিশকে খুব শক্ত করে নেওয়া হত। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা এইভাবে মনের আনন্দে হৈ-হল্লা করলে তাঁর খুব আনন্দ হত, এবং মাঝে-মাঝে তিনি নিজেও এইরকম তারুণ্যসুলভ হট্টগোলে মেতে উঠতেন। ছুঁলেই কুঁকড়ে যায়, এরকম পুরুষ মানুষ তাঁর পছন্দ ছিলনা।

সংগঠনের জন্য হিন্দু সমাজের সর্বসাধারণ মানুষ একত্র হয়ে স্নেহের সম্পর্ক বৃদ্ধি করুক — এই লক্ষ্যে ডাক্তারজীর সর্বক্ষণ প্রয়াস চলত। কিন্তু তাঁর কখনোই একথা মনে হতনা যে এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সমাজ থেকে জাতিগুলির প্রচলিত সংস্কারগুলিকে সমূলে পরিত্যাগ করা হোক। ডাক্তারজী হিন্দু সমাজের যে কোন ব্যক্তির গৃহে অসংকোচে ভোজন গ্রহণ করতেন এবং এরজন্য তাঁর এতটুকু মনে হত না যে তিনি বিশেষ কিছু করছেন। নাগপুরে যদিও ডাঃ মুঞ্জের গৃহে তাঁর যথেষ্ট যাতায়াত ছিল, কিন্তু ডাঃ মুঞ্জের মাংসভক্ষণের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাতিত্ব থাকার বিষয়ে তিনি ভিন্ন;মত পোষণ করতেন। অপরদিকে ডাঃ মুঞ্জে নিরামিষ ভোজনকে সর্বদা অত্যন্ত হেয় দৃষ্টিতে দেখতেন এবং রাষ্ট্রে পরাক্রমের মনোভাব জাগ্রত করার জন্য মাংসভক্ষণের সুপারিশ করতেন। ডাঃ মুঞ্জের সঙ্গে অত্যধিক আত্মীয়বৎ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ডাক্তারজী এই বিষয়ে তাঁর অনুকরণ করেননি। কোন ব্যক্তির উত্তম গুণ অবশ্য অনুকরণ করা উচিত, কিন্তু ঐ ব্যক্তির সদ্‌গুণের সঙ্গে-সঙ্গে অন্য সব বিষয়েও তাঁর অনুকরণ করা ডাক্তারজীর কখনই স্বীকার্য ছিলনা। তাঁর বিবেক সর্বদা জাগ্রত থাকত।

তাঁর বন্ধুত্ব ছিল অত্যন্ত ব্যাপক তথা উচ্চ কোটির। একবার যে ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে আসত, সে সহসা দূরে যেতে পারতনা। যদি নিজ স্বভাবের কারণে কেউ দূরে সরে যেত, তাহলে পৃথিবী থেকে দূরে থেকেও চন্দ্র যেমন তার চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে, সেই রকম ডাক্তারজীর অসামান্য মাধ্যাকর্ষণের পরিধিতেই সে ঘুরতে থাকত। রাজনৈতিক অথবা নীতিগত মতভেদ তাঁর স্নেহ-সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করতে পারতনা। তাঁর পত্রগুলি 'পরম মিত্র' সম্বোধন দিয়ে শুরু হত। কিন্তু এই শব্দ দুইটি কেবল পদ্ধতি বা শিষ্টাচার হিসাবে প্রযুক্ত হতনা বরং তার পিছনে হৃদয়ের সত্যিকার স্নেহ-ভালবাসার ভাব থাকত। শ্রী সন্ত একনাথের 'ভাগবতের' বর্ণনা অনুসারে এই শব্দ দুইটির মধ্যে অত্যন্ত উদ্দাত্ত তথা উচ্চ কোটির হৃদয় ও ব্যবহারের পবিত্রতা সমাবিষ্ট থাকত। "মনেঁ ধনেঁ কর্তব্যতা। জ্যাচী অনন্য অবঞ্চকতা। ত্যা নাঁব পরমমিত্রতা। হে খুণ তত্ত্বতা জাণাবী" ("মনে থাকুক কর্তব্য ও অবঞ্চনার ভাব। পরম মিত্রতা তারই নাম — যেখানে কপটতার চিহ্নমাত্র নেই।") এই শ্লোকটি পূর্ণাংশে ডাক্তারজীর অকৃত্রিম স্নেহের কারণে সার্থক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এই অলৌকিক তথা সহজাত প্রেমের কারণেই মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তিনি নাগপুরের কংগ্রেস নেতা ব্যারিস্টার অভ্যাংকরের কাছে এক রাত্রে অকস্মাৎ প্রয়োজন হওয়ায় পাঁচ শত টাকা ধার নিতে গিয়েছিলেন। টাকা নিয়ে ডাক্তারজী হ্যাণ্ডনোট লিখতে উদ্যত হলে ব্যারিস্টার অভ্যয়ঙ্করের মুখ থেকে তৎক্ষণাৎ এই কথা ব্যক্ত হল যে "আমি এমন পাগল হয়ে যাইনি যে ডাক্তার হেডগেওয়ারের কাছ থেকে

কাগজ লিখিয়ে নেব।" ডাক্তারজীর প্রেম কত উচ্চ কোটির ছিল, এই ঘটনা থেকে তার কিঞ্চিৎ অনুমান করা যেতে পারে।

ডাক্তারজীর সঙ্গে ১৯২১ সালে কারাগারের সঙ্গী কর্মবীর শ্রী পাঠক বলেছিলেন, "মতান্তর হওয়ার দরুন আমি ডাক্তারজীর সঙ্গে উদাসীনতার সম্পর্ক রেখেছিলাম। কিন্তু তিনি সব সময়ে স্নেহের সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। তিনি মত-পার্থক্যকে কখনো এমন পর্যায়ে যেতে দিতেন না যাতে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যায়।" তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করে 'তরুণ ভারত'-এর সম্পাদক শ্রী গঃ ত্র্যঃ মাডখোলকর বলেন, "গণতন্ত্রের পক্ষে তাঁর মনোবৃত্তি এমন অনুকূল ছিল যে তাঁর ব্যবহারে প্রত্যক্ষ বিরোধীও সৌজন্য লাভ করত।" কংগ্রেসের বহু কার্যকর্তা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার পরেও ডাক্তারজীর সঙ্গে ব্যবহারের সময় নিজেদের বিরোধিতা ভুলে যেতেন। ডাক্তারজীর প্রেম-প্রীতির বিষয় বলতে গিয়ে কংগ্রেসের প্রমুখ কার্যকর্তা শ্রী মামা হরকরে উকিল বলেন, "ডাক্তারজীর সঙ্ঘে প্রতিষ্ঠিত স্বয়ংসেবকেরা যে কাজ করেন, সেই কাজ শুধু ডাক্তারজীর প্রতি ভালবাসা থাকার কারণে আমি আজও করতে প্রস্তুত।" ডাক্তারজীর সঙ্গে যাঁদের রাজনৈতিক মতভেদ ছিল, তাঁদেরই যখন এরকম অবস্থা, তাহলে তাঁর সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন যে সব বন্ধু তাঁদের অভিজ্ঞতা কত মাধুর্য-মণ্ডিত ছিল, তা বলা বাহুল্য।

পুরানী শুক্রবারীতে ডাক্তারজীর সঙ্গে শৈশবে তাঁর এক বন্ধু শ্রীরাম ভাউ পাটণকর শাস্ত্রী একসঙ্গে বল খেলতেন এবং পাঠশালায় যাবার পথে টক-টক কুল খেতে-খেতে যেতেন। শ্রী শাস্ত্রী এখন পুনায় থাকেন। একবার অনেক বছর পরে নাগপুরে গিয়ে স্বাভাবিক আকর্ষণবশতঃ ডাক্তারজীর বাড়ী গেলেন এবং উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, "কেশব আছে নাকি?" পঁচিশ-ত্রিশ বছর ডাক্তারজী তাঁকে দেখেন নি। কিন্তু তাঁর ডাক শুনেই তিনি তাঁকে চিনতে পারলেন এবং "রাম, তুই এখানে কবে এলি?" বলেই তাঁকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেন। একবার যাকে আপন করে নিতেন, ডাক্তারজীর হৃদয়ে তার জন্য চিরকাল আন্তরিকতার আসন পাতা থাকত। এই স্নেহ-প্রীতির কারণেই, তাঁর বন্ধুদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা-শুশ্রূষায় রাত-দিন এক করে দিতেন। তাঁর নিজের ঘর-সংসার না থাকলেও পরিচিত ও বন্ধুদের ছেলে-মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। স্বয়ংসেবকদের অভিভাবকদের ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে আমাদের ছেলে-মেয়েরা আমাদের চেয়ে ডাক্তারজীর কথাই বেশী মান্য করে। সেই কারণে তাঁরাও ডাক্তারজীর পিছনে সর্বদা এই গাওনা গাইতে থাকতেন, "আমার ছেলেকে বিয়ে করতে আপনিই বলে দিন।" প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক শ্রী গঃ ত্র্যঃ মাডখোলকর-এর প্রেম-বিবাহ, ডাক্তারজীর মধ্যস্থতার কারণেই সফল হয়েছিল। তার বর্ণনা শ্রী মাডখোলকর তাঁর 'জীবন-সাহিত্য' নামক পুস্তকে অতি সুন্দর শব্দে করেছেন। "আমার ঋণের এখনো দুই কিস্তি বাকি ছিল। নাগপুরে এই সময় আমি এতই অপরিচিত ছিলাম যে আমার মত গৃহহীন অজ্ঞাতকুলশীল তরুণকে নিজের কন্যা দান করা অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়ার মতই দুঃসাহসের কাজ ছিল। তাছাড়া, আমি যে মেয়েটিকে

দেখেছিলাম, সে তো নিজের মা-বাবার একমাত্র সন্তান ছিল।" কিন্তু তা সত্ত্বেও ডাক্তারজীর চেষ্টায় রাস্তা বেরিয়ে এল এবং গজাননরাও 'মীরা'র 'প্রভু' হয়ে গেলেন।

ডাক্তারজীর বন্ধুত্বের মনোভাবের মধ্যে কোন খাদ ছিলনা এবং নানা স্থানে তার পরিচয় পাওয়া যেত। প্রসিদ্ধ সর্বোদয় নেতা স্বর্গীয় তাত্যাজী বঝলওয়ারের অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে উল্লেখনীয়। গ্রীষ্মকালে অধিকারী শিক্ষণ বর্গের সময় ডাক্তারজী সময় বাঁচাবার জন্য তাত্যাজীর গৃহে স্নান করতে যেতেন। তাঁদের দুজনের সম্পর্ক এমন ঘনিষ্ঠ ছিল যে কথাবার্তায় তারা একবচনেরই প্রয়োগ করতেন। একদিন ডাক্তারজীর সঙ্গে যে স্বয়ংসেবক গিয়েছিল, সে তাত্যাজী কর্তৃক ডাক্তারজীকে 'কেশব' নামে সম্বোধন করতে শুনতে পেল। ডাক্তারজী স্নানঘরে প্রবেশ করলে স্বয়ংসেবকটি তাত্যাজীকে বলল, "এ কথা ঠিক যে ডাক্তারজীর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় আপনি ডাক্তারজীকে 'কেশব' না বলে 'কেশবরাও' বললে ভাল হয়।" কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারজী স্নান সেরে বেরুলে তাত্যাজী হাসতে-হাসতে স্বয়ংসেবকটির প্রস্তাব ডাক্তারজীর সন্মুখে রাখলেন। এ কথা শুনে ডাক্তারজী গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু পরে স্বয়ংসেবকটির দিকে ঘুরে বললেন, "আমাকে কেশব বলে ডাকার মত নাগপুরে এখন মাত্র দু-চার জনই আছেন। তাঁদেরও তোমরা 'আপনি' 'আজ্ঞে' বলতে বাধ্য করবে?" একথা বলার সময় ডাক্তারজী ও তাত্যাজীর চক্ষু অশ্রু-সজল হয়ে ওঠে।

ডাক্তারজীর বন্ধুত্বের গভীরতা সম্বন্ধে আর একটি উদাহরণ স্মরণীয়। যদি কোন ব্যক্তি বন্ধুত্বের কারণে কোন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে অথবা কোন প্রত্যাশা রাখে, তাহলে সেই দায়িত্ব অথবা বন্ধুর প্রত্যাশা পূরণের জন্য কত দূর চেষ্টা করা উচিত, তার উত্তর ডাক্তারজীর ব্যবহার থেকে পাওয়া যেত। একবার ওয়ার্ধা জেলার সঙ্ঘচালক শ্রী আপ্পাজী জোশী নির্বাচনে দাঁড়ালেন। ভোটের দিন তিনি নাগপুর থেকে একটি মোটর গাড়ী পাঠাবার অনুরোধ করলেন। গাড়ীটি সকাল ছটা থেকে ৭ টার মধ্যে ওয়ার্ধা পৌঁছানো আবশ্যক ছিল। সন্ধ্যায় যখন এই বার্তা এল, সেই সময় ডাক্তারজী জ্বরে শয্যাশায়ী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি নিকটে উপবিষ্ট স্বয়ংসেবককে মোটর গাড়ী ঠিক করার জন্য টাঙা ডাকতে বললেন। ডাক্তারজীর অসুস্থ অবস্থায় বাইরে বেরুনো ঠিক হবেনা ভেবে স্বয়ংসেবকটি বলল, "এই কাজ তো আমিই করতে পারব।" এই বলে সে ওয়ার্ধা থেকে আগত ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেল। সে তিন-চার জায়গায় গাড়ী ভাড়া করার চেষ্টা করল, কিন্তু কেউ অত ভোরে ওয়ার্ধা যাবার জন্য রাজী হলনা। অবশেষে, সে ডাক্তারজীর কাছে তার ব্যর্থতার কথা জানাতে সংকোচ হওয়ায়, ওয়ার্ধা থেকে আগত লোকটিকে ডাক্তারজীর কাছে গাড়ী পাওয়া গেলনা বলতে পাঠিয়ে নিজে কার্যালয়ে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এই কথা জানার সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্তারজী গরম মাফলার ও শাল গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং রাত একটার সময় শ্রীকেশবরাও ব্রহ্মের দরজার কড়া নাড়লেন। তিনি দরজা খুলে সামনে ডাক্তারজীকে দেখতে পেলেন। ডাক্তারজীকে এত কষ্ট করতে দেখে শ্রীব্রহ্মে বেশ ঘাবড়ে গেলেন এবং বললেন, "ডাক্তারজী, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি এক্ষুনি গাড়ী নিয়ে ওয়ার্ধা রওনা হচ্ছি।"

গাড়ি ঠিক হয়ে যাবার পর ডাক্তারজী কার্য্যালয়ে গেলেন এবং দরজার কড়া নাড়লেন।

সেই স্বয়ংসেবক উঠে দেখে প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে রাত তিনটের সময় ডাক্তারজী দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখে সে বলে উঠল, "আপনি কেন এলেন? মোটর গাড়ী পাওয়া গেলনা, এই খবর কি আপনি পাননি?" ডাক্তারজী বললেন, "মোটর গাড়ী না পাওয়ার দরুন তোমার যাতে চিন্তা না হয়, শুধু এই কারণেই আমি বলতে এলাম যে শ্রী ব্রহ্মে যথাসময় মোটরগাড়ী নিয়ে যাত্রা করছেন।" এর পর ডাক্তারজী বাড়ী ফিরে ওয়ার্ধার জন্য পত্র লিখলেন এবং প্রত্যূষে মোটরগাড়ী ওয়ার্ধা রওনা করিয়ে দিয়ে তারপর বিছানায় শয়ন করলেন।

এইরূপ গভীর আন্তরিক-প্রেমের ভিত্তিতেই ডাক্তারজী সহস্রাবধি মানুষকে একেবারে আপন করে নিতে পেরেছিলেন। তাঁর সঙ্গে শুধু দু-একদিন থাকার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল কোল্হাপুরের এক ইংরাজী স্কুলের পরিচালকের। ডাক্তারজীর স্থায়ী বন্ধুত্ব যে কত খানি ভরসা এনে দিত, তাঁর কাছ থেকেই সেটা জানা যায়। ঐ পরিচালক সজ্জন লেখেন, "আপনার সাহায্য ফেরৎ ডাকে আসা জরুরী, আমি পথ চেয়ে থাকবো। প্রয়োজন মনে করলে আপনি আপনার জীবনের বহু ত্যাগের মধ্যে রাত্রের ভোজন ত্যাগকে সম্মিলিত করে নেবেন এবং এ বিষয়ে যে সম্ভাব্য খরচ বাঁচবে, সেটাও সাহায্য হিসাবে প্রার্থনা অনুযায়ী ফেরৎ ডাকে পাঠাবেন।" ডাক্তারজীর গৃহ-জীবন ও আর্থিক অবস্থার কথা যে একটুকুও জানে, তার কাছে এই পত্র বিচিত্র মনে হবে। কিন্তু এই বিচিত্র ব্যবহারের পিছনে মানুষের এই দৃঢ় বিশ্বাস নিহিত ছিল যে ডাক্তারজী সংকটের সময় অবশ্যই সাহায্য করবেন। নতুন লোকেরই যখন এরকম বিশ্বাস জন্মাত, তখন চির-পরিচিত ব্যক্তিরা তাঁর উপর কত আস্থা রাখতেন, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। একথা বলা এতটুকু অতিশয়োক্তি হবেনা যে অনেক লোকের কাছে ডাক্তারজীই তাদের জীবন ও প্রাণ ছিলেন। ডাক্তারজীর বন্ধু সিন্দীর শ্রী নানাসাহেব টালাটুলে একবার অত্যধিক অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর মনে হল যে জীবনের আর কোন আশা নেই। তখন তিনি ডাক্তারজীর ছবি তাঁর সামনে এমনভাবে রাখতে বললেন যে তিনি যাতে সহজে ও ভালোভাবে সেই ছবি দেখতে পান। তারপর তিনি তাঁর চোখের প্রেমাশ্রু দিয়ে মনে-মনে পরম ভক্তিভরে ডাক্তারজীর অভিষেক করে নিজ দেহ বিসর্জন দেন। ডাক্তারজীর ভালবাসা নিঃসন্দেহে এমনই দিব্য ছিল।

ডাক্তারজীর স্বভাব ছিল খুবই আমুদে ও খেলোয়াড়-সুলভ এবং বন্ধুদের মাঝে তো দুষ্টুমিও করতেন। একবার নাগপুরের সুপ্রসিদ্ধ শ্রমিক নেতা শ্রী রামভাউ রুইকর শ্রী সকলাতওয়ালার সম্বর্ধনার জন্য চাঁদা চাইতে এলেন। রুইকরজীর পারিবারিক অবস্থা ভালই ছিল আর এদিকে ডাক্তারজীর গৃহে তো দারিদ্র্যেরই সাম্রাজ্য ছিল। কিন্তু অন্যান্য শ্রমিক নেতার চোখে ডাক্তারজী যেহেতু সমাজবাদী ছিলেন না, সেই কারণে তিনি পুঁজিপতি শ্রেণীর ব্যক্তি বলেই গণ্য হতেন। অতএব তিনি চাইতেই ডাক্তারজী বললেন, "আপনারা হলেন মালদার মজদুর, আর আমি হলাম গরীব পুঁজিপতি, অতএব, অর্থ কোথা থেকে দেব?" আর এক বন্ধুর তো ডাক্তারজীর পরিহাসের চোটে বেলুন চুপ্‌সে গিয়েছিল। ছাত্রজীবন থেকেই যাঁর সঙ্গে বাড়ীর লোকের মত সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল, সেই প্রহ্লাদ পন্ত ফড়ণবীস নিজের বৈঠকখানায় পালঙ্কের উপর গোল তাকিয়ায় আরাম করে হেলান দিয়ে বসে ডাঃ মুঞ্জের

পরাক্রম ও ধৈর্যের অত্যন্ত সরস বর্ণনায় একেবারে মেতে উঠতেন। কিন্তু ডাক্তারজী তাঁর ভীরু স্বভাবের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত ছিলেন। একদিন তাঁর গল্প যখন খুব জমে উঠেছিল এবং শ্রোতাদের মধ্যে ডাক্তারজীও খুব আগ্রহ সহকারে তাঁর গল্প শুনছিলেন, এমন সময় এক পুলিশ ইন্সপেক্টর ভিতরে প্রবেশ করে কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করল — "এখানে প্রহ্লাদরাও ফড়ণবীস কে আছেন?" এই কথা শুনেই বীররস মুহূর্তে পলায়ন করল এবং তার স্থানে করুণার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হল। প্রহ্লাদপন্ত একেবারে ঘাবড়ে গেলেন। তাঁর চেহারার রং দ্রুত বদলে যেতে লাগল এবং মনে হল যে ভয়ের চোটে তিনি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবেন। অন্য সজ্জনদের ডাক্তারজী আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন যে একজন পুলিশ অফিসার এসে এইরকম মজা করবেন। তাই প্রহ্লাদপন্তের বাক্যরোধ হবার পরে উক্ত পুলিশ অফিসার সহ সবাই খুব জোরে হাসতে-হাসতে লুটিয়ে পড়লেন। ওদিকে প্রহ্লাদপন্তের অবস্থা কাহিল। তিনি না হাসতে পারছিলেন, না কাঁদতে !

পুষ্পের সঙ্গে সুগন্ধ এবং সূর্যের সঙ্গে কিরণের মতই ডাক্তারজীর সাহচর্যে হাসি সর্বদাই লেগে থাকত। তাঁর বিশাল গুম্ফের ফাঁক দিয়ে যখন তিনি হাসতেন তখন উঠোনের নিম গাছের আড়াল থেকে যেন রুপালি চন্দ্রকিরণের উন্মুক্ত প্রসন্নতারই বর্ষণ হতে থাকত। হাসি নির্মল অন্তঃকরণকেই প্রতিবিম্বিত করে। মনের মধ্যে দ্বেষ তথা অসূয়ার হলাহল ব্যাপ্ত থাকলে উপর-উপর 'লোক দেখানো হাসি কাগজের ফুলের মত নির্জীব ও গন্ধহীন বলে মনে হয়। হাসির মাধুর্য তার পিছনে নিহিত বিশুদ্ধ তথা নিষ্পাপ সাত্ত্বিকতারই পরিণাম। ডাক্তারজীর প্রাণখোলা হাসির মধ্যে এই মাধুর্য সর্বদাই অনুভব করা যেত।

ডাক্তারজীর বৈঠকই ছিল এক মহান্ সংস্কার কেন্দ্র। তাঁর বৈঠকে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণ ও নীরস চার দেয়ালের বাইরে বেরিয়ে সামাজিক জীবনের অনন্ত আকাশে আকাঙ্ক্ষার পক্ষ বিস্তার করে উন্নতির শীর্ষে উড্ডীন হওয়ার প্রেরণা লাভ করত। ডাক্তারজীর নাম স্মরণ মাত্রই কুড়ি-পঁচিশ জন তরুণের মধ্যমণি রূপে বিরাজমান আলাপরত মূর্তি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ডাক্তারজী সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ছিলেন। অতএব, সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে তাঁর সাক্ষাৎলাভ কঠিন হলে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কারণ, নেতার বিষয়ে সাধারণ ধারণা এটাই যে তাঁর শুধু আবশ্যক কাজকর্মেই সমাজের সামনে উপস্থিত হওয়া উচিত, এবং অন্য সময় স্বাধীনভাবে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ দুর্লভ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ডাক্তারজীর নীতি ছিল একেবারে অন্যরকম। তাঁর কাছে 'এস, যাও, বাড়ী তোমারই' এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করা যেত।

ডাক্তারজী যতই কাজে ডুবে থাকুন না কেন; তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসা কারোর প্রতি ঠিক মত মনোযোগ দেওয়া হয়নি, অথবা তাকে যথাযথ প্রোৎসাহন ও পথ-প্রদর্শন করা হয়নি এমন কখনো হতনা। আম্রকুঞ্জের স্নিগ্ধ ছায়ায় শীতল জলের উদারতাই অনুভব হত সেখানে। কাজে প্রত্যাশিত সাফল্য না পেলে, অথবা কর্মক্ষেত্রে আকস্মিক বাধা-বিপত্তির ফলে হতবুদ্ধি ও হতাশাগ্রস্ত কার্যকর্তা একবার বৈঠকে বসলেই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে জোরদার সংঘর্ষ করার প্রেরণা লাভ করে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে নেমে পড়ত।

ডাক্তারজীর বৈঠকে রাজনীতি থেকে আরম্ভ করে ধর্ম, সব বিষয়েই প্রসঙ্গানুসারে আলোচনা চলত, এবং ডাক্তারজী সে সব বিষয়ে সরল ভাষায় হাসতে-হাসতে নিজের অভিজ্ঞতার যে কথাগুলি বলতেন, সেগুলি হত মহা-মূল্যবান। তাঁর বক্তব্য এমন সরস, যথার্থ তথা আকর্ষক হত যে পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই নবাগত ব্যক্তি মজে যেত। সেখানে আগত লোকেরা অনেক সময় নিজেদের কথা এতই ভুলে যেত যে অন্য সব বিষয়ে যেন তারা সংবিৎ হারিয়ে ফেলত। কখনো মানুষের অহংকারের বিষয় উত্থাপিত হত, আবার কখনো অনুগামী কেমন হওয়া উচিত এ বিষয় আলোচনা হত। কখনো বাস্তবিক ধার্মিকতা কি রূপ, সে বিষয় চর্চা হত। আবার কখনো মানুষের সামর্থ্যের জয়গান ডাক্তারজীর মুখ থেকে শুনতে পাওয়া যেত। তাঁর কথার মধ্যে প্রবাস-এর বর্ণনা এবং সমাজের তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতায় যে সমস্ত সংকট হৃদয়কে ব্যথিত করে তোলে এমন কথারও উল্লেখ থাকত।

এই ধরনের বার্তালাপের মাধ্যমে ডাক্তারজী কার্যকর্তাদের মধ্যে আত্মনিরীক্ষণ করে নিজেদের যোগ্যতা তথা স্বভাবকে কাজের অনুকূল করে তোলার ইচ্ছা তৈরী করে দিতেন, এবং আমাদের নির্দিষ্ট কাজ কোনটা এবং কেমন করে সেই কাজ করতে হবে সে বিষয়ে কার্যকর্তাদের জ্ঞানকে প্রসারিত করে দিতেন। তাঁর কথা বলার মধ্যে কৃত্রিমতার কোন স্থান থাকতনা, আর না থাকত অহংকারের দর্প। তাঁর কথায় লোক-দেখানো শব্দাড়ম্বরের সর্বথা অভাব থাকত। তাঁর প্রতিটি শব্দের মধ্যে দিয়ে, যাঁরা চোখ খুলে চলেন, সেই সব কর্মযোগী ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা সমূহের যথার্থতাই ব্যক্ত হত। তিনি হাস্য-পরিহাস, ঠাট্টা সবই করতেন, কিন্তু তার মধ্যে কাউকে আঘাত করার মত অপচেষ্টা থাকতনা, বরং স্বজন-সুলভ কৌতুকই থাকত। ডাক্তারজীর সঙ্গে ছায়ার মত সব সময় যিনি থাকতেন, সেই শ্রী কৃষ্ণরাও মোহরীর বলেন যে "ডাক্তারজীর বৈঠকগুলি স্বয়ংসেবকদের দৃষ্টিতে সর্বস্ব ছিল। সেখানে বসে স্বয়ংসেবকেরা স্বর্গের পরিবেশ যেন অনুভব করত। সঙ্ঘস্থানের কার্যক্রমে যে স্বয়ংসেবকেরা অসম্পূর্ণ থেকে যেত, তারা ডাক্তারজীর বৈঠকের উৎসাহপূর্ণ বাতাবরণে পূর্ণতা প্রাপ্ত হত। তাঁর বৈঠকগুলির যথাযথ বর্ণনা করা অসম্ভব।" ডাক্তারজী গূঢ় থেকে গূঢ়তর বিষয়গুলিকেও ছোট-ছোট কথায় ও দৃষ্টান্ত দিয়ে সরল করে দিতেন। উপযুক্ত দৃষ্টান্ত ও রূপকের মাধ্যমে তিনি নিজ বক্তব্যকে সহজ করে দিতেন।

স্বয়ংসেবকদের নিজ কার্যক্ষেত্রে যে বাতাবরণের অভিজ্ঞতা হত, তার থেকে সমগ্র দেশের পরিস্থিতির অনুমান করা ঠিক নয় — এ বিষয় তিনি যে আখ্যানটি শোনান, সেটি অত্যন্ত প্রভাবী রীতিতে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে। আখ্যানটি ছিল এইরূপ —

এক রাজা ছিলেন। প্রতিদিন যে নাপিত তাঁর দাড়ি কামিয়ে দিত, একদিন তাকে খুব খুশি-খুশি দেখে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "কিগো, নাপিত ভায়া, রাজ্যের জন সাধারণের আর্থিক অবস্থা কী রকম?"

নাপিত তার রোজগারের থেকে কিছু পয়সা বাঁচিয়ে আট-দশ তোলা সোনা কিনে রেখেছিল। সে উত্তর দিল, "মহারাজ, মানুষ খেয়ে-পরে বেশ সুখেই আছে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকের কাছে আট-দশ তোলা সোনাও জমা হয়েছে।" "ভাল কথা", বলে রাজা সন্তোষ

প্রকাশ করলেন। কিন্তু বাস্তব তথ্য ছিল এই যে মাঝে-মাঝে দুর্ভিক্ষের কারণে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিলনা। রাজা একথা জানতেন, এবং তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে নাপিত নিজের অবস্থা দেখে সকলের অবস্থা আন্দাজ করেছে। রাজা নাপিতের ভ্রান্ত ধারণা তাকে বুঝিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে একটু মজা করার কথা ভাবলেন। পরের দিন মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, "রাজমহলে যে নাপিত আসে, তার বাড়ীতে আট-দশ তোলা সোনা আছে। সে যাতে বুঝতে না পারে, এমন কৌশলে সেই সোনা বের করিয়ে আনুন।" রাজার আদেশানুসারে জনৈক গুপ্তচর হাত সাফাই করে নাপিতের সোনা গায়েব করে দিল। সোনা চুরি যাওয়ায় নাপিত বড় দুঃখিত হল।

দু-চার দিন পরে নাপিত রাজার দাড়ি কামাতে এলে রাজা দেখলেন যে তার মুখ ভার। রাজা তার চিন্তার কারণ জানতেন। মনে-মনে হেসে এদিক-ওদিক কথা বলার পর রাজা নাপিতকে জিজ্ঞেস করলেন, "রাজ্যের অবস্থা এখন কেমন?"

নাপিত দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলল, "কী বলি মহারাজ, চোরেরা সাধারণ মানুষের সব লুটপাট করে নিয়ে যাচ্ছে।"

এইরকম ছোট-ছোট গল্প-উপাখ্যানের মাধ্যমে ডাক্তারজী বহু গূঢ় তত্ত্ব স্বয়ংসেবকদের অতি সরল করে বুঝিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, স্বয়ংসেবকদের নিজ কর্তব্য পূরণ করার জন্য মন দিয়ে প্রয়াস করা উচিত এবং এই কাজ করার সময় নিজের প্রতিষ্ঠা-বৃদ্ধির কথা চিন্তা করা উচিত নয়। শুধু তাই নয়, নিজ স্বভাব অনুসারে যদি প্রতিষ্ঠা পিছন-পিছন আসতে থাকে, তাহলে সে দিকে ফিরেও তাকানো উচিত নয়।

এই প্রকার মনোরঞ্জনকারী উপাখ্যান বলে স্বয়ংসেবকেরা যাতে স্বয়ং চিন্তা করতে শেখে, সে বিষয়ে ডাক্তারজীর কৌশল ছিল অসামান্য। বৈঠকে আগত স্বয়ংসেবকদের মনের উপর তৎক্ষণাৎ তাঁর ভাবনার উত্তম পরিণতি হত, কিন্তু তার কারণে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া হয়েছে - এমন ব্যথা কেউ কখনো অনুভব করতনা। বরং আত্ম-নিরীক্ষণ করার সাত্ত্বিক বিবেকশীলতার উন্মেষ ঘটত। ডাক্তারজীর ভালবাসা তথা স্নেহ এত অধিক ছিল যে ঠাট্টাচ্ছলে বলা কোন কথা যদি কারো ভালো না-ও লাগত, তা সত্ত্বেও সে তাঁর মাধ্যাকর্ষণের পরিধির বাইরে বেরিয়ে যাবার কথা কখনো চিন্তা পর্যন্ত করতে পারতনা। তাঁর বৈঠকে কখনো কথা কাটাকাটি হতনা। একজন যদি কোন কঠোর শব্দ উচ্চারণ করত, তখন ডাক্তারজী অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে পরিস্থিতি সামলে নিতেন। অবশ্য, কখনো-কখনো তিনি গরম হয়ে উঠতেন। তখন সামনে উপবিষ্ট ব্যক্তির মনে হত — "আমি কী বলে ফেললাম" এবং সে আক্ষরিক অর্থেই কেঁপে উঠত। একবার অমরাবতীর এক তরুণ স্বয়ংসেবক তাঁর বৈঠকে এল এবং সঙ্ঘের প্রতি আক্ষেপ করে বলল, "পৃথিবীতে সব থেকে নীচ ও পতিত সমাজ হল হিন্দু। তার আবার কী সংগঠন করছেন?" নিজে নিষ্ক্রিয় থেকে শুধু বক্-বক্ করার স্বভাবযুক্ত তরুণের কথা শুনে ডাক্তারজী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তীব্র কণ্ঠে বললেন, "সমাজ যদি অধঃপতিত হয়, তবে তার জন্য কোন রকম চেষ্টা না করে শুধু এইভাবে বেহায়ার মত তার উপর যারা আক্রমণ করে, সেই তোমরাই তো সমাজের সব থেকে নিকৃষ্ট সদস্য। ডাক্তারজীর

সেই রুদ্ররূপ দেখে সে বেচারার তো জ্ঞানগম্যি লোপ পাওয়ার অবস্থা হল। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা ক্বচিৎ-কদাচিৎই ঘটত এবং পরে বহু দিন তাঁর মন খচ্-খচ্ করত যে এরকম করা বোধহয় ভাল হয়নি।

ডাক্তারজী একবার নিজের ঘরের জন্য দুটি হাতপাখা এনে রেখেছিলেন। তার একটার উপর শিবাজী মহারাজের ছবি ছিল, এবং অন্যটাতে বালগন্ধর্বের স্ত্রীলোকের বেশ পরিহিত চিত্র ছিল। তাঁর কাছে ছত্রপতি শিবাজীর চিত্র-সম্বলিত পাখা থাকা স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু অন্য ছবিটা ডাক্তারজী কেমন করে পছন্দ করলেন, সে কথা অনেকেরই মনে উঁকি মারত। একবার তাঁর বৈঠকে এই কৌতুহল প্রকাশ হয়ে পড়ল। শুনে ডাক্তারজী বললেন, "প্রবাস করার সময় পাখা দুটো দেখে পছন্দ হওয়ায় কিনে নিলাম। কেউ ভুল করে বা ধোকা দিয়ে গছিয়ে দেয়নি। পাখা দুটি আমাকে এবং এখানে যারা আসে তাদের সহজেই মনে করিয়ে দেয় যে তিনশো বছর পূর্বের সমাজ কত পরাক্রমী তথা স্বাভিমানী ছিল, আর আজ সেই সমাজ কী রকম সত্ত্বহীন এবং স্ত্রৈণ হয়ে পড়েছে।" তাঁর প্রত্যেকটি ছোট-ছোট ব্যাপারের মধ্যেও এই প্রকার রাষ্ট্রীয় দৃষ্টি থাকত।

ডাক্তারজীর তাঁর প্রিয় ব্যক্তিদের আদরের ডাকনাম রাখার অভ্যাস ছিল। বিপ্লবী জীবনে তাঁর এক অনুগামী ছিলেন ঠাকুর নরহরিসিংহ রাজপুত। তিনি কখনো-সখনো তাঁর গৃহে আসতেন। তাঁর শরীর যেমন মোটা-সোটা ছিল, ভোজনও ছিল রাক্ষসের মত। তিনি যখন ডাক্তারজীর বাড়ী আসতেন তখন তাঁর ভোজনের জন্য রুটির বেশ একটা স্তূপ তৈরী করে রাখতে হত। ডাক্তারজী তাঁকে 'অগড়বম্ব' বলে ডাকতেন। আর তিনিও তাঁর নাম জিজ্ঞেস করা হলে বলতেন ঠাকুর নরহরি সিংহ অগড়বম্ব। একবার তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে এই নামই বলেন। 'অগড়বম্ব' কথার অর্থ বুঝতে না পেরে যখন তাঁকেজিজ্ঞেস করা হল, তখন ঠাকুরজী হেসে বললেন— 'অগড়বম্ব' ডাক্তার হেডগেওয়ারের দেওয়া টাইটেল। নাগপুরে ডাক্তারজী যেখানেই যেতেন, অধিকাংশ সময় শ্রী কৃষ্ণরাও মোহরীর তাঁর সঙ্গে থাকতেন। ডাক্তারজী নিজে ছিলেন কৃষ্ণবর্ণের, এবং তাঁর পিছনে ছায়ার মত থাকতেন সেই শ্রী কৃষ্ণরাও নিজের নাম সার্থক করে তাঁর ছায়ার মতই কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। তাঁদের দুজনের দিকে দৃষ্টিপাত করার পর সঙঘ ছাড়া অন্য কোন কিছুর চিন্তাই মনে আসতনা। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণরাও-এর মামা শ্রী আপ্পাজী তিজারে যখনই ডাক্তারজীর কাছে আসতেন, তখনই ডাক্তারজী বলে উঠতেন, "এই দেখ, সঙ্ঘের মামা এসে গেছেন।" এইভাবে, কাউকে 'বৈশাখনন্দন', কাউকে 'আজমেরী লোটা' প্রভৃতি নামকরণ করে তিনি সবাইকে খুব হাসাতেন। কখনো-কখনো এই সব নামের পিছনে যে কিংবদন্তী আছে, তাও বুঝিয়ে দিতেন। একদিন বয়সের তুলনায় একটু বেশী মোটা-সোটা স্বয়ংসেবককে 'বৈশাখ-নন্দন' বলে সম্বোধন করে তিনি তার অর্থ বুঝিয়ে বলেন — "গাধা বর্ষা ঋতুতে চরতে-চরতে যখন পিছন ফিরে দেখে, তখন তার মনে হয় — আমি তো কিছুই খাইনি, চতুর্দিকে ঘাস ভর্তি হয়ে রয়েছে। এই কথা ভেবে বেচারা রোগা হয়ে যায়। কিন্তু বৈশাখ মাসে যখন গরমের জন্য কোথাও একটা ঘাসও দেখতে পায়না, তখন সে এই ভেবে মোটা হয়ে যায় যে আমি সব ঘাস খেয়ে ফেলেছি। অর্থাৎ যখন সে প্রচুর ঘাস খেতে

পায়, তখন রোগা হয়ে যায়, এবং যখন একটুও ঘাস পায়না তখন মোটা হতে থাকে। সেই কারণে তার নাম 'বৈশাখ-নন্দন'।"

সমাজের সংগঠনে ব্রতী কার্যকর্তাদের নিজ ব্যবহারে ছোট-ছোট বিষয়েও অত্যন্ত দক্ষতা থাকা উচিত — এই দিকে তাঁর বিশেষ আগ্রহ থাকত। তাই স্বয়ং তিনি এই ব্যাপারে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন। কৃতি ও উক্তি দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে তিনি তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ মেপে-মেপে রাখতেন। তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত একটি শব্দও শূন্যগর্ভ হতনা, তেমনি নিজ কৃতিতেও কখনো সংযম হারাননি। বাজারে সব্জি বিক্রেতা দু-একটা লঙ্কা বা ভিণ্ডি বেশী ওজন করার উদারতা দেখাতে পারে, কিন্তু হীরা-মুক্তার জহুরী তার ওজন-যন্ত্রের কাঁটা এক চুল এদিকে-ওদিকে হতে দিলে ভগবানই তাকে বাঁচাতে পারেন। ডাক্তারজীর শব্দ চয়ন ও ব্যবহার জহুরীর মতই সূক্ষ্ম তথা দক্ষতাপূর্ণ হত। তাঁর প্রতিটি শব্দ হত যেন ছাঁচে ঢালাই করা, নিখুঁত মাপ-জোখ করা। সঙ্ঘের কার্যক্রম সঠিক সময়েই করা উচিত, এই মানদণ্ড তিনি তৈরী করেন এবং নিজে তা পালনও করতেন। নিমন্ত্রণ পত্রে "ঠিক অমুক সময় কার্যক্রম হবে" এই কথা লেখার পদ্ধতির তিনি প্রচলন করেন।

নাগপুরে সঙ্ঘের প্রারম্ভিক দিনগুলিতে তিনি তাঁর জনৈক সহকর্মীকে নিমন্ত্রণ-পত্রের প্রারূপ তৈরী করতে বলেন। তিনি সেই সময়ের পদ্ধতি অনুসারে "আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উৎসব" এই বাক্যগুলি লেখেন। ডাক্তারজী "আমাদের' (हमारे) শব্দের স্থানে 'আমাদের সকলের' (अपने) শব্দ প্রয়োগের প্রস্তাব করেন। ডাক্তারজীর শুধু এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে সঙ্ঘ যেন সমাজ থেকে আলাদা না থাকে। সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। এই আকাঙ্ক্ষা তিনি 'আমাদের সকলের সঙ্ঘ' (अपना संघ) এই শব্দাবলীর মাধ্যমে ব্যক্ত করেন। তিনি সব সময় বলতেন যে স্বয়ংসেবকদের একেবারে মেপে, ওজনকরে কথা বলা উচিত। তাদের মুখ থেকে কখনো অর্থহীন বা ক্ষতিকর শব্দ উচ্চারিত হওয়া উচিত নয়। একবার জনৈক বক্তা, — রাজপুত কন্যারা ধর্ম ও সতীত্ব রক্ষার জন্য হাসতে-হাসতে জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিয়ে জহর-ব্রত পালন করার কথা উল্লেখ করার সময় তাঁদের প্রসঙ্গে 'রাজপুত রমণী' শব্দ-প্রয়োগ করেন। ডাক্তারজীর এই শব্দ প্রয়োগ উপযুক্ত মনে হয়নি। ভাষণের পরে ঐ কার্যকর্তা যখন ডাক্তারজীর কাছে এলেন, তখন ডাক্তারজী তাঁকে বলেন যে এইরূপ মহীয়সী মহিলাদের উল্লেখ করার সময় তাঁদের 'রাজপুত দেবী' বলাই উপযুক্ত। ডাক্তারজী এইরকম ওজন করে শব্দ চয়ন করতেন বলে কখনো তাঁকে বলতে হয়নি যে "আমি এরকম কথা বলিনি' অথবা 'আমার বলার অর্থ এই ছিলনা।' চিন্তা না করে কথা বলার জন্য তার ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন কখনো তাঁর হয়নি।

ডাক্তারজীর ভাষণ অত্যন্ত, সোজা সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় হত, কিন্তু তার পিছনে হৃদয়ের আন্তরিকতা এবং উৎকৃষ্ট ভাবনার সমাবেশ থাকত। সেই কারণে, তাঁর ভাষণ শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করত, তার অন্তরে প্রবেশ করত। যুবাবস্থায় তাঁর বক্তৃতার মধ্যে স্তম্ভ বিদীর্ণ করে প্রকাশমান নরসিংহের ঘন-গর্জন থাকত। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর বাক্-প্রবাহ সমতল

ক্ষেত্রে প্রবাহমান গঙ্গার স্রোতের মত গম্ভীর তথা স্নিগ্ধ-শান্ত হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে ভাবনার উদ্রেক থাকত, কিন্তু বিবেক ও যুক্তির ভূমিকা বাদ যেত না। নিজে স্বয়ং যা করা সম্ভব সেটাই তাঁর মুখ থেকে নিসৃত হত এবং প্রতিটি শব্দ তাঁর অনুভূতির আর্শীবাদ নিয়েই ব্যক্ত হত। ডাক্তারজীর কর্ম-ব্যস্ত জীবনে অনেক গ্রন্থপাঠের সুযোগ হয়নি, অতএব বিরাট গ্রন্থকারদের উদ্ধৃতি, সন্দর্ভ ইত্যাদির প্রয়োগ সহসা তিনি করতেন না। তিনি জনমানসকে উত্তমরূপে পাঠ করেছিলেন। তাঁর অধ্যয়ন ছিল দেশকালের পরিস্থিতির। এই পাঠ তথা অধ্যয়নের জন্য তিনি তাঁর সম্পূর্ণ জীবনকে লাগিয়ে দিয়েছিলেন এবং সাহসী ডুবুরীর মত জলের উপরের স্তরে ওঠা পরিস্থিতির উত্তুঙ্গ ঢেউ-এর তাণ্ডবের কথা চিন্তা না করে ইতিহাসের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে দেশোদ্ধারের জন্য একান্ত আবশ্যক অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত-সমূহের মৌলিক রত্নরাজি খুঁজে এনেছিলেন। তুকারামজীর শ্লোকগুলির গভীর ভাব তথা আত্মবিশ্বাস ডাক্তারজীর কথায় ব্যক্ত হত। সরলতা ছিল তাঁর বক্তব্যের প্রাণ। হিন্দু সমাজের বর্তমান দৈন্য অবস্থার বর্ণনা করার সময় তাঁর কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে উঠত। এবং হিন্দুরাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের যশোগান করার সময় তাঁর হৃদয় গর্বে ভরে উঠত। ডাক্তারজীর বক্তৃতাগুলি প্রত্যক্ষ ক্রিয়াশীলতাকে সঞ্চালিত করে হতাশাসমূহকে দূরীভূত করত, এবং তাঁর বক্তব্যগুলি তাঁর জীবনকে প্রতিবিম্বিত করত। কৃতি ও উক্তি জীবন-মুদ্রার দুই পিঠ। ডাক্তারজীর জীবনে কৃতি ও উক্তি দুইটিই ছিল প্রবল ও প্রভাবী।

ডাক্তারজী তাঁর অবসর সময়ে যতটুকু পড়াশুনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন, তার মধ্যে সমর্থ রামদাসের 'দাসবোধ' এবং লোকমান্য তিলকের 'গীতারহস্য' তাঁর চিন্তাধারাকে অত্যধিক প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। সংবাদপত্র তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পরে প্রথম দিকে তিনি শুতে যাবার আগে একটি খাতায় ডায়েরীও লিখতেন। এই দৈনন্দিনী রচনাগুলির মধ্যে তাঁর পঠিত গ্রন্থের কিছু প্রতিফলন — কিছু সুক্তির যেমন উল্লেখ আছে, তেমনই তাতে আছে তাঁর হৃদয়-সম্পৃক্ত ভাবনারাশি। সমর্থ রামদাসের কতকগুলি নির্বাচিত পদও এই পুস্তিকায় পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রধানতঃ সেই সব বচনের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে যেগুলি সংগঠনের পক্ষে আবশ্যক। তাঁর সংগঠন-কুশলতা দেখে মনে হয় যে তিনি ঐ সব উক্তিগুলি বিশেষভাবে মনন করেছিলেন।

"বোলণ্যাসারখেঁ চালণেঁ। স্বয়েং কুরূনি বোলণেঁ।"
"ক্রিয়েবীণ শব্দজ্ঞান। তেচি শ্বানাচেঁ বমন।"
"ঠায়ীঁ ঠায়ীঁ শোধ ধ্যাবা। মগ গ্রামীঁ প্রবেশ করাবা।"
"কষ্টেঁবিণ ফল নাহীঁ। কষ্টেঁবিণ রাজ্য নাহীঁ।
"কেল্যাবিণ হোত নাহীঁ। সাধ্য জনীঁ।"
"স্বয়ে আপণ কষ্টাবেঁ। বহুতাঁচে সোশীত জাবেঁ।"
("যেমন বলবে করবেও তেমনই। প্রথমে করবে তারপরে বলবে।"
"ক্রিয়া বিনা তত্ত্বজ্ঞান। কুকুরের বমন সমান।"
"প্রথমে যাচাই করে নেবে। পরে গ্রামে প্রবেশ করবে।"

"কষ্ট বিনে ফল নাহি। কষ্ট বিনে রাজ্য নাহি।"
"না করলে হয়না কিছুই সাধ্য এ জগতে।")

— এই প্রকার নানা শ্লোক সেখানে পাওয়া যায়। এই বচনগুলি লেখার পূর্বে ১৯২৯ এর ৪ঠা মার্চের পৃষ্ঠায় ডাক্তারজী সমর্থের বিষয় যে দুটি বাক্য দুটি লিখে রাখেন সে দুটি তাঁর সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। তিনি লেখেন, "শ্রী সমর্থের নিজের জন্য কোন কিছুই চাহিদা ছিলনা। নিজের কৃতিত্বের অহংকার যেন নিজেকেই না ঘিরে ধরে, সেকথা মনে রেখে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ জীবন স্বধর্ম-বান্ধবদের অবস্থার চিন্তায় এবং আত্মোন্নতির পথ অনুসন্ধানেই নিয়োগ করেন।"

যদিও ডাক্তারজীর পুস্তক-পাঠের সংখ্যা অল্পই ছিল, কিন্তু যে উদ্দেশ্য-পূরণের জন্য পুস্তক পাঠ করা আবশ্যক, তা এইগুলি পাঠের মাধ্যমেই লাভ হয়ে গিয়েছিল যে রামদাসের কথায় "উগীচ করিতী বডবড। পরি করুনি দাখবিণেঁ হেঁ অবঘড" ("অকারণে বক্‌বক্ না করে, কাজে করে দেখাও।")-এর সার ডাক্তারজী চিনে নিয়েছিলেন, এবং পঠিত জ্ঞানকে কৃতিতে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তিনি সারা জীবন চলেছিলেন। কেবল বইপড়া-পাণ্ডিত্যের টাটকা সন্তোষ তাঁর কাছে রুচিকর মনে হতনা। 'যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ' ('কর্তৃত্ববান্ ব্যক্তিই পণ্ডিত') এই শ্রেণীর মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন।

সুনির্দিষ্ট শব্দ চয়ন এবং সংযম তাঁর পত্রলেখনের বৈশিষ্ট্য ছিল। বিপ্লবী জীবনে পদে-পদে যে সতর্কতা অবলম্বন করতে হত, সেটাই ডাক্তারজীর স্বভাবে স্থায়ী গুণে পরিণত হয়েছিল। দেশব্যাপী সংগঠন গড়ে তোলার জন্য যা কিছু বলার বা শোনার থাকে, প্রত্যক্ষ দেখা-সাক্ষাতেই সেগুলি আলোচনা করা উচিত - এ কথা জেনেই তিনি তদনুরূপ ব্যবহার করতেন। স্বয়ংসেবকদের কীভাবে পত্র লেখা উচিত সে কথা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমাদের পত্রের স্বরূপ এমন হওয়া উচিত যে কেউ যদি ভুল করেও সেটি চৌমাথায় সেঁটে দেয়, তাহলেও তার কারণে আমাদের মনে যেন ভয় বা সংকোচের সৃষ্টি না হয়।" তাঁর পত্রও এই প্রকার হত। এই কারণে, একবার জনৈক সজ্জন যখন হুম্‌কি দেন যে "আমাদের মধ্যে যে পত্র-ব্যবহার হয়েছে, সেটা আমি প্রকাশ করে দিচ্ছি" — তখন তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীকৃতি দিয়ে তাঁকে জানান যে "আমার এতে এতটুকু আপত্তি নেই, শুধু তার কারণে আপনারই হয়রানি হবে। অতএব, আর একবার ভাল করে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিলে ঠিক হবে।" যেখানে চারটে বাসন থাকবে, সেখানে ঠোকাঠুকি হতেই পারে। সংগঠনেও এই রকম তিক্ত প্রসঙ্গ মাঝে-মাঝে সৃষ্টি হয়। অতএব ডাক্তারজীর নিকট বিক্ষুব্ধ পত্রও আসত। একবার এইরকম একটি পত্র পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভাবুকতার প্রথম আবেগে সেইরকমই জোরদার উত্তর লিখে ফেললেন, কিন্তু ডাক্তারজীর নিয়ম ছিল যে গুরুত্বপূর্ণ পত্রগুলিকে তাঁর ঘনিষ্ঠ দু-চার জন সহকর্মীকে না দেখিয়ে কখনো ডাকে দিতেন না। আবার কখনো এই ধরনের পত্র সম্বন্ধে দু-তিন দিন চিন্তা-ভাবনা করার পর নতুন করে পত্রটি লিখে তৈরী করা হত। উল্লিখিত পত্রটি লেখার পর তিনি নিজেই সেটিকে সরিয়ে রেখে দিলেন এবং দু-চার দিন পরে ভাবাবেগ শান্ত হয়ে যাবার পর তাঁর লেখনী থেকে একেবারে নতুন পত্র রচিত হল। কখনো-কখনো একটি শব্দের জন্য

পত্রলেখন থেমে যেত এবং উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাওয়ার পরে লেখা অগ্রসর হত।

ডাক্তারজী পত্রের মধ্যে কাটাকুটি পছন্দ করতেন না। পত্রে কোন অংশ লিখে কেটে দিলে সংশয়ের সৃষ্টি হয় এবং চিন্তার অনিশ্চয়তা ব্যক্ত হয়। অতএব সংগঠনের কথা চিন্তা করে তিনি কখনো কাটাকুটি করা চিঠি পাঠাতেন না। যদি কোন কিছু কাটার প্রয়োজন বলে মনে করতেন, তাহলে সেই কাগজটিকে আলাদা সরিয়ে রেখে আর একটি কাগজে নতুন করে লিখতেন। প্রাপ্ত প্রত্যেক পত্রের উত্তর যাতে ঠিক সময় পাঠানো হয়, সে বিষয়ে তিনি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতেন। পত্র ভাঁজ করা এবং তার উপর ঠিকানা লেখার মধ্যেও তাঁর সুরুচি তথা সুব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যেত। নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ে যদিও ডাক্তারজী অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন, তবু তিনি এটাই উচিত মনে করতেন যে অন্যের হাতে যে কাগজ পৌঁছবে, তা যেন সুন্দর, পরিষ্কার এবং উত্তম হয়। পত্রালাপের জন্য তিনি এই ধরনের কাগজই ব্যবহার করতেন। তাঁর পত্রের উপরে তুকারামের এই বাণী লেখা থাকত — ''দয়া তিচেঁ নাঁব। ভূতাঁচে পালণ। আণিক নির্দালণ কন্টকাঁচে।'' (''শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের সংহার। এরই নাম দয়া।'') সঙ্ঘকার্যের নিরন্তর বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি কয়েক সহস্র ব্যক্তিকে পত্র লিখেছিলেন এবং সেগুলির মাধ্যমে সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতিকে স্পষ্ট করে স্বয়ংসেবকদের মনে প্রত্যেক পরিস্থিতিতে অক্ষয় ধ্যেয়নিষ্ঠা জাগ্রত করার সফল প্রয়াস করেন। যদি কেউ তাঁর পত্রসমূহের সংকলন করেন তাহলে সংগঠন-শাস্ত্র সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত মূল্যবান তথা মৌলিক গ্রন্থ হবে সেটি।

যদি কোন স্বয়ংসেবক বাইরের এমন কোন নগরে যেত যেখানে সঙ্ঘের শাখা আছে, অথবা এমন স্থান থেকে আগত কোন স্বয়ংসেবক তাঁর সঙ্গে দেখা করে ফিরে যেত, তাহলে তিনি তার হাতে সেই স্থানের অধিকারীদের কাছে পত্র অবশ্য পাঠাতেন। তাঁর নিয়ম ছিল যে এই ধরনের পত্রের খামের মুখ কখনো আটকে দিতেন না।

ডাক্তারজী নাগপুরেই থাকুন অথবা দেশের অন্য কোন স্থানে যান, সেখানকার প্রমুখ নাগরিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা তাঁর কার্যসূচীর আবশ্যক অঙ্গ ছিল। তিনি তাঁদের সঙ্গে সঙ্ঘের প্রগতি, সেই কাজের সামনে যে সব বাধা-বিঘ্ন আসত, ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করে এই সমাজ সংগঠনের কাজে তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন। 'আমি ভাল আর আমার কাজ ভাল' এই মনোভাব নিয়ে কেবল সঙ্ঘকে ঘিরেই যত কথা, তা কিন্তু তাঁর মনোবৃত্তি ছিল না। কর্তৃত্ববান্ হিন্দু যে কোন দল অথবা মতাদর্শের ব্যক্তি হোন না কেন, তাঁকে সঙ্ঘের পরিধির মধ্যে আকৃষ্ট করার জন্য সেই ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করার এবং তাঁর মনে সঙ্ঘের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির জন্য তিনি সর্বদা চেষ্টা করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে সঙ্ঘের যাঁরা কট্টর বিরোধী ছিলেন এবং প্রত্যক্ষভাবে এই কাজে বাধা সৃষ্টি করতেন, তাঁদের সঙ্গেও ডাক্তারজী সম্পর্ক রাখতেন। দেখা যেত যে ডাক্তারজীর সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার, অকৃত্রিম ভালবাসা এবং শীলসম্পন্ন কর্মযোগীর জীবনের পরিণাম স্বরূপ ঐ সব ব্যক্তির বিরোধিতার তীক্ষ্ণতাও হ্রাস পেতে থাকত। ঐ ব্যক্তিরা সঙ্ঘের জন্য প্রত্যক্ষ কার্য না করলেও, ডাক্তারজী জানতেন যে তাঁদের মনে সঙ্ঘের প্রতি আস্থা বজায় থাকলে সমাজের মধ্যে কাজের অনুকূল বাতাবরণ তৈরী হবে। এই কারণে, সমাজের মধ্যে — কোন সময় কাজ করার কারণে যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ

করেছেন, কিন্তু এখন আর কোন কাজই করছেন না, এমন মানুষদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে আসার পর ডাক্তারজী বলতেন, 'আমি দেবদর্শন করে এলাম।' মূর্তি নিজের স্থান থেকে নড়েনা, কিন্তু তার কৃপায় উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, ডাক্তারজীর 'দেবদর্শন' করে আসার নিহিতার্থ এই ছিল। এইরূপ দেবদর্শনে অত্যন্ত স্বাভাবিকতা থাকার ফলে, ভক্তের সঙ্গে সাক্ষাতের মতই তাঁরা যে প্রসন্ন হতেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। একদিন খুব ভোরেই ডাক্তারজী শ্রীরামভাউ রুইকরের বাড়ীতে চা-পান করতে গেলেন, এবং "সূর্যবংশী মহারাজ জেগে উঠুন" বলে তাঁকে ডাকলেন। ডাক্তারজী এসেছেন দেখে শ্রীরুইকরজী স্মিতহাস্যে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। বসার পরে ডাক্তারজী বললেন, "যদি বাঁকা উত্তর না দেন তো একটা প্রশ্ন করব? শ্রী রামভাউ 'হ্যাঁ' বলার পর ডাক্তারজী প্রশ্ন করেন — "যদি আমি আপনাকে এই অদ্ভুত ঘটনা শোনাই যে গতকাল রাত্রে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ সমাধি থেকে বাইরে আসেন এবং তাঁর রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে, তাহলে আপনার কী রকম লাগবে?" শ্রী রুইকর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "কী রকম লাগবে একথা জিজ্ঞেস করছ কেন? আমি তো আনন্দের চোটে মিষ্টি বিলোতে শুরু করে দেব।"

প্রত্যাশিত এই উত্তর পেয়ে ডাক্তারজী বললেন, "যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের কেন উল্‌টো-পাল্‌টা নাম ধরে ডাকেন? বস্তুতঃ আমাদের উভয়ের ইচ্ছাই সমান। কিন্তু যা মনে হয় বুক ঠুকে সে কথা বলার হিম্মত আমাদের আছে, আপনাদের নেই। এটাই এই প্রশ্নের সোজা উত্তর।"

সমাজের মধ্যে যাঁরা ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাঁদের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করতেন ডাক্তারজী। তিনি তাঁর মেলা-মেশার মধ্যে নব-পরিচিতদের এবং সঙ্ঘের সঙ্গে সহমত-পোষণকারী ব্যক্তিদের মন কেমনভাবে জয় করে নিতেন, সেকথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

'দেবদর্শন'-এই কার্যক্রমের জন্য ডাক্তারজী হাতে ছড়ি বা ছাতা নিয়ে হেঁটেই বেরিয়ে পড়তেন। তাঁর সঙ্গে একাধজন কার্যকর্তাও থাকতেন। পরবর্তীকালে স্বাস্থ্যের খুব বেশী অবনতি হবার পর পকেটে পয়সা থাকলে টাঙ্গাও করে নিতেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে তাঁর স্বাস্থ্য এত খারাপ হয়ে গেল যে জ্বর, কাসি, ঘাম ও পিঠের ব্যথা — মাঝে-মাঝে আগত অতিথির বদলে ঘর-জামাইয়ের মত শরীরের মধ্যে স্থায়ী আসন গেড়ে বসে পড়ত। কিন্তু তখনও শীত-গ্রীষ্মের তোয়াক্কা না করে তিনি নিয়ম করে বাইরে বেরুতেন। তাঁর স্বভাব অনুযায়ী তিনি নিজের দৈহিক কষ্ট চাপা দেবার যতই চেষ্টা করুন না কেন, এখন আর তা লুকিয়ে রাখা সম্ভব হত না। বাতের জন্য তাঁর শরীর বেশ স্থূল হয়ে পড়েছিল এবং এত বেশী ঘাম হত যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘামে ভেজা জামা-কাপড় বদল করা ছাড়া উপায় থাকত না। বার-বার কাপড় ছাড়া ও পরা সকলেই দেখতে পেত। সেই কারণে গরমের সময় তাঁর নাগপুরের কয়েকজন বন্ধু তাঁর পদব্রজে যাওয়ার কষ্ট লাঘবের জন্য মাঝে-মাঝে নিজেদের মোটর গাড়ী তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু এতে ডাক্তারজী সংকোচ বোধ করতেন। অতএব, ডাক্তারজীর জন্য একটি মোটর গাড়ী কেনা হল। তাঁর বাড়ীর সামনের

খালি জমিতে তার জন্য একটা গ্যারেজও বানানো হল। তাঁর গাড়ীটি ছিল পুরানো মডেলের, আর তার ধরণ-ধারণও ছিল অভিনব। গাড়ী রাস্তায় চললে পথচারীদের সরাবার জন্য আলাদা হর্ণ বাজাবার দরকার হতনা, কারণ তার দরজা, জানালা আর জোড়-যুক্ত জায়গাগুলো এমন প্রচণ্ড ঝণৎকার শুরু করত যে সবাই বুঝতে পারত ডাক্তারজীর গাড়ী আসছে। এমন কখনো হতনা যে ডাক্তারজী গাড়ীতে একলা চলেছেন। তাঁর গাড়ী পুরোপুরি ভর্তি থাকত। মাঝে-মাঝে রাস্তা থেকেও কাউকে তুলে গাড়ীতে বসাতে হত, তখন একে-অপরের কোলে দত্তকের মত বসে যেতে হত। অথচ বুড়ো হাড়ের মত ঐ পুরানো গাড়ীও বরাবর চলত। এমন প্রায় কখনই হতনা যে গাড়ী বিগড়ে গিয়ে মাঝ রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঠাট্টাচ্ছলে ডাক্তারজী গাড়ীটার নাম রাখলেন — 'স্টেট কার'। যাই হোক, ১৯৩৮-এর পর এই গাড়ীর দরুন ডাক্তারজীর কষ্ট কিছুটা লাঘব হল। ডাক্তারজীর নাগপুরের সর্বসাধারণ মানুষের মধ্যে দুর্দান্ত প্রভাব গড়ে উঠেছিল। শৈশব থেকেই দেশভক্তিতে ওতপ্রোত এবং নিরন্তর বিকশিত আদর্শ জীবন সকলে চোখের সামনে উন্মীলিত হতে দেখেছিল এবং তাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের সাক্ষ্য দিতেন তাঁর সঙ্গে যাঁরা ভিন্ন মত পোষণ করতেন, তাঁরা পর্যন্ত। ডাক্তারজীর এমন দাপট ছিল যে তিনি কোন জনসভায় উপস্থিত থাকলে নাগপুরের সভাগুলি ভাঙতে আসা বেশ জবর্দস্ত লোকেরা পর্যন্ত গজ্-গজ্ করতে-করতে চুপচাপ বসে পড়ত। নাগপুরের কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হওয়ার ফলে ডাঃ মুঞ্জে ও ব্যারিস্টার অভ্যঙ্কর দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ডাক্তারজীকে মুঞ্জে গোষ্ঠীর লোক বলে মনে করা হত। তবু একথা উল্লেখযোগ্য যে গালি-গালাজের ব্যাপারে যাঁকে অগ্রগণ্য মনে করা হত, সেই ব্যারিস্টার অভ্যঙ্করের মুখ থেকে ডাক্তারজী সম্বন্ধে কখনো উল্‌টো-পাল্‌টা শব্দ উচ্চারিত হয়নি। এখানে বলে দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে তদানীন্তন মধ্যপ্রান্তের অনেক সর্বজনীন কার্যকর্তাদের জীবনের বহু ছোট-বড় ও গোপনীয় ঘটনা ডাক্তারজীর জানা ছিল। কিন্তু তাঁর জীবনে এমন একটি ঘটনাও কেউ খুঁজে বের করতে পারত না, যার দিকে কেউ অঙ্গুলি-নির্দেশ করতে পারে। গঠনমূলক কার্য এবং উজ্জ্বল চরিত্রের মধ্য দিয়ে ডাক্তারজীর প্রতিষ্ঠা তথা প্রভাবের জন্ম হয়েছিল, সেই কারণেই তাঁর সম্পর্কে সকলের মনেই শ্রদ্ধার ভাব দেখা যেত।

কাউকে এক পাই-পয়সাও রেয়াৎ করত না পাণ্ডোরা বাপট নামক যে দোকানদার, সে-ও ডাক্তারজীকে সামনে দিয়ে যেতে দেখলে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে দোকানে ডেকে এনে বসিয়ে চা ও দুগ্ধ পান করাত এবং নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করত এই ভেবে যে ডাক্তারজীর চরণ স্পর্শে তার স্থান পবিত্র হয়ে গেছে। ডাক্তারজী যখন নাগপুরে থাকতেন, তখন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে বসে তিনি আড্ডা মারতেন এবং তাঁর পছন্দের সুপারি চিবুতে-চিবুতে প্রাণ খুলে গল্প-গুজব করতেন। তিনি যেখানেই যেতেন, সকলে তাঁকে নিজের লোক বলে মনে করত এবং সেই জন্য সকলে তাঁকে কাছে পেতে চাইত। আখড়া থেকে বেরিয়ে আসা পালোয়ান তাঁকে দেখেই জোড় হাত করে 'রাম রাম' বলে প্রণাম জানাত, আবার টাঙ্গাওয়ালাও তাঁকে দেখে স্মিত হাস্যের সঙ্গে তাঁকে অভিবাদন জানাত। শত-শত

স্বয়ংসেবকদের অভিভাবকগণ তরুণদের মনে ডাক্তারজীর অতুলনীয় প্রভাব লক্ষ্য করে তাঁর প্রতি সম্মান না জানিয়ে থাকতে পারতেন না।

সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের বিষয়ে ডাক্তারজী বলতেন যে তাদের যখন পরস্পরের সঙ্গে পথে-ঘাটে সাক্ষাৎ হবে, তখন যেন তারা নমস্কারের পরিবর্তে একটু মুচকি হেসে নিজেদের অভিবাদন জানায়। সঙ্ঘের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবহারে যেন কোন লৌকিকতা না থাকে, সেটাই তিনি উক্ত বক্তব্যের দ্বারা ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন।

ডাক্তারজী আক্ষরিক অর্থেই অসংখ্য তরুণদের হৃদয়সিংহাসনে বিরাজমান হয়ে গিয়েছিলেন। বিবাহ, উপনয়ন, সত্যনারায়ণ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে তাঁকে নাগপুরের হাজার-হাজার মানুষের বাড়ীতে যেতে হত। অত্যধিক ভালবাসা ও একান্ত আপন বলে তাঁকে যাঁরা নিমন্ত্রণ করতেন, ডাক্তারজী তাঁদের শ্রদ্ধাকে কখনো উপেক্ষা করতেন না। তিনি তাঁর অসংখ্য কাজে যত ব্যস্তই থাকুন না কেন, তাঁদের গৃহে সময় করে অবশ্য যেতেন এবং পূর্বেকার স্নেহ-সম্পর্ককে দৃঢ়তর করে নিতেন। অসুস্থ স্বয়ংসেবক বা পরিচিতদের দেখতে যেতে অথবা কারো মৃত্যু হলে আত্মীয়দের শোক-সমবেদনা জানাতে তিনি কখনো ভুলতেন না। কেউ সত্যাগ্রহ করতে গেলে, অথবা বিদেশ যাত্রা করতে গেলে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অথবা অন্য কোন সম্মান লাভ করলে, — ডাক্তারজী এরকম প্রত্যেক সময়ে তাদের হার্দিক শুভকামনা জানিয়ে তাঁর ভালবাসার পরিচয় দিতেন। সমাজের সাধারণ ব্যবহারে নিজেকেই সবার থেকে বড় বলে মনে করে যারা আচরণ করে অথবা কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে অন্যদের সঙ্গে পরিচয় করে নেয়, অথবা সামনে দেখা হয়ে গেলে নমস্কার করে নেবার মত অনেক লোক দেখা যায়। কিন্তু ডাক্তারজীর সম্পর্কে যারা আসত, তাদের প্রত্যেকের প্রতিই তাঁর আত্মীয়তা গভীর ও আন্তরিক হয়ে উঠত। এই দিক থেকে অকোলার একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একবার ডাক্তারজী ও শ্রী বাপুসাহেব সোহোনী মোটরে শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন একজন সজ্জন ডাক্তারজীকে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে নমস্কার করলেন। কিন্তু ডাক্তারজী তখন অন্য দিকে মুখ করে বসেছিলেন, তাই তিনি কোন প্রত্যভিবাদন করেননি। চলন্ত গাড়ীর মধ্যে যখন বাপুসাহেবের কাছ থেকে যখন এই ব্যাপারটি জানতে পারেন, তখন ডাক্তারজীর বড় দুঃখ হল যে তাঁর অমনোযোগের কারণে উক্ত ব্যক্তিকে নমস্কারের উত্তর পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। পরে বাপুসাহেবের কাছ থেকে ঐ ব্যক্তির নাম-ঠিকানা জেনে নিয়ে ডাক্তারজী তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখা করলেন।

লোক-সংগ্রহ ডাক্তারজীর স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। সেই কারণেই উপরে লিখিত ব্যবহারগুলি তাঁর দ্বারা সহজাত ভাবেই হত। কোন ব্যবসায়ীর মত তাঁর ব্যবহারে কোন লোক-দেখানো ব্যাপার ছিল না। তিনি এত সহজে সকলের সঙ্গে মিশতে পারতেন যে "How to Win Friends and Influence People" ইত্যাদি যে সব গ্রন্থে মানুষের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত বলে শেখানো হয়, সেগুলি শুধুমাত্র ডাক্তারজীর মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দিয়েই সমৃদ্ধ করা যায়। তাঁর মধ্যে এক অভিনব আন্তরিক সরলতা ও সহজাত আকর্ষণ ছিল। যে হিন্দু সমাজে একমাত্র শবযাত্রা ছাড়া চারজন কখনো একদিকে মুখ করে চলতে পারত না,

সেখানে হাজার-হাজার তরুণদের হিন্দু রাষ্ট্রোত্থানের জন্য দেশব্যাপী সংগঠন ডাক্তারজী মাত্র পনের বছরেই সার্থক তথা সাকার করে দেখালেন — এ তাঁর অসামান্য কর্মশক্তির অতুলনীয় উদাহরণ, যা বিশ্ব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে।

ডাক্তারজী অনুশাসন-প্রিয় ছিলেন এবং স্বয়ং নিজ জীবন থেকেই অনুশাসনের আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর আগ্রহ ছিল যে সংগঠনের মধ্যে যদি কোন বিষয়ের যোজনা করা হয়, তা হলে সেটা যেন তৎক্ষণাৎ এবং সঠিকভাবে কার্যে রূপায়িত করা হয়। নাগপুরের একটি কার্যক্রমে নিশ্চিত সময়ে পৌঁছবার জন্য সেখান থেকে কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত অড়েগাঁও থেকে মধ্যরাত্রে পদব্রজেই যাত্রা করতে হয়েছিল। অনুশাসনের ব্যাপারে তিনি স্বয়ং যত কঠোর ছিলেন, অন্যদেরও সেই অভ্যাসে রপ্ত করেছিলেন। এই সংস্কারের জন্য তিনি সঙ্ঘস্থানে সামরিক এবং শারীরিক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে করার উপর অত্যধিক জোর দিতেন।

তিনি প্রত্যেক স্থানে সুনিশ্চিততা, সুব্যবস্থা তথা সুষ্ঠুতার পক্ষপাতী ছিলেন। একবার পুণার গণবেশধারী স্বয়ংসেবকদের নিরীক্ষণ করার পর তাঁর ভাষণে তিনি বলেছিলেন যে, "এটা সন্তোষজনক কথা যে অনেক স্বয়ংসেবকই গণবেশ তৈরী করে নিয়েছে। কিন্তু এখনো তাদের মধ্যে সামরিক দক্ষতা তথা তেজস্বিতা দেখা যাচ্ছে না। আপনাদের গণবেশ বড় নিরামিষ বলে মনে হয়।" শিথিল তথা ঢিলা-ঢালা কথাবার্তাও তিনি পছন্দ করতেন না। কেউ যদি সেভাবে কথা বলত তাহলে তিনি 'হতেও পারে, না-ও হতে পারে' বলে তাকে উপহাস করতেন। একবার নাগপুরের শিবিরে রাত্রি দশটায় নির্দিষ্ট সময়ে দীপনির্বাণের পরে সকলে যখন ঘুমোতে চলে গেল, তখন সকলে ঠিকমত শুয়েছে কিনা, অথবা কারো কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা দেখার জন্য ডাক্তারজী এবং শিবিরের সর্বাধিকারী লণ্ঠন নিয়ে বাইরে বেরুলেন এবং একটি তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। সেখানকার অধিকারী উঠে দাঁড়িয়ে ডাক্তারজীকে প্রণাম করতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার তাঁবুতে কতজন স্বয়ংসেবক আছে?" "সাতাশ বা আঠাশ হবে" এইরকম অনির্দিষ্ট উত্তর শুনে ডাক্তারজী ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন — "ওরা আম নাকি যে সাতাশ-আঠাশ বলচ? ঠিক-ঠিক বল সাতাশ না আঠাশ?"

শুধু সঙ্ঘেই নয়, সঙ্ঘের বাইরেও কেউ যদি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে শক্তির অহংকারের বশে যা খুশি তাই করার চেষ্টা করত, তাহলে ডাক্তারজী আপাদ-মস্তক গরম হয়ে উঠতেন এবং তখন 'শঠে-শাঠ্যং'-এর নীতি অনুযায়ী তার সঙ্গে ব্যবহার করতেন। একবার নাগপুর টাউন হলে ডাঃ মুঞ্জের সভাপতিত্বে সভা হচ্ছিল। সেই সময় ডাক্তারজী কয়েকজন স্বয়ংসেবককে সঙ্গে নিয়ে শাখা থেকে ফিরছিলেন। সভায় কী হচ্ছে দেখার জন্য স্বভাবতঃই ঐ দিকে চললেন। সেখানে পৌঁছে তিনি দেখলেন যে ব্যারিস্টার অভ্যঙ্কর ও শ্রী রামভাউ রুইকরের মধ্যে এই নিয়ে ঝগড়া চলছে যে, আগে কে বলবে? সভাপতি মহাশয় শ্রী রুইকরকে বলার অনুমতি দিলেও ব্যাঃ অভ্যঙ্কর তাঁর গোঁ ছাড়তে রাজি হচ্ছিলেন না। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কোন লাভ হচ্ছে না দেখে ডাক্তারজী একটি চিরকুটে সভাপতির কাছে লিখে পাঠালেন যে এঁদের দুজনের বলার আগে আমাকে দু মিনিট বলতে দিন। অনুমতি পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্তারজী মঞ্চে উঠতে শুরু করেন। ব্যাঃ অভ্যঙ্করও একই সঙ্গে উঠে পড়েন এবং দুজনেই পরস্পরকে

নিচে নামাবার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু টিটের সঙ্গে টিটপনা এবং 'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর'-এর নীতি গ্রহণের ফলে ডাক্তারজীকে নিচে নামানো সহজ ছিল না। অন্যদিকে অভ্যঙ্করের জেদও কম ছিল না। উভয়ই শরীরের দিক থেকে বেশ শক্ত-পোক্ত ছিলেন। এই কারণে মঞ্চের টেবিল ডগমগ করতে শুরু করল। বিবাদ বন্ধ করার জন্য যেই ডাক্তারজী দেখলেন যে অভ্যঙ্করের কয়েকজন সঙ্গী ডাক্তারজীকে নিচে নামাবার জন্য এগিয়ে আসছে, তিনি তৎক্ষণাৎ অভ্যঙ্করের কোমর কঠিনভাবে জাপ্‌টে ধরলেন। ইতিমধ্যে কেউ আলোগুলো নিভিয়ে দিল। সভা স্থল থেকে দর্শক-শ্রোতারা পালাতে শুরু করল এবং সভা সেখানেই শেষ হয়ে গেল। মঞ্চে ওঠার আগে ডাক্তারজী তাঁর বজ্রকণ্ঠে তীব্র ভাষায় ব্যাঃ অভ্যঙ্করকে বলেছিলেন, " শ্রীরুইকরকে বলতে দিলেই ভাল হত। আর যদি 'জোর যার মুলুক তার' নীতিকেই আইন বলে মনে করে থাকেন, তাহলে আগে আমি বলব।"

এই রকম সময় ডাক্তারজীর যে ক্রোধ ব্যক্ত হত, তা হত অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ও সাত্ত্বিক। অতএব, সেই কারণে কোন স্থায়ী বিরোধিতা সৃষ্টির কোন সম্ভাবনা থাকতনা। যদি কখনো তাঁর নিকটস্থ লোকেরা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করত, তাহলেও তাঁর মনের স্থিরতা ও মহত্ত্ব হারাতো না। এই রকম এক মিত্রকে ১৯৩৪ সালে তিনি লিখেছিলেন যে "এর থেকে সামনে দাঁড়িয়ে আপনার উদ্দেশ্য পুরোপুরি জানিয়ে যদি আপনি আমার বুকে ছুরি চালিয়ে দিতেন, তাহলে বেশী ভাল হত, এবং আমার দিক থেকে কোন বিরোধিতাই করা হত না। পূর্বের মতই সৌহার্দ্য অব্যাহত রাখবেন, এই প্রার্থনা করি।" তাঁর মনের এই বিশালতার বর্ণনা করে শ্রী গুরুজী বলেন, "তাঁর বাণী যুধিষ্ঠিরের মত দুর্যোধনকেও সুযোধন বলার মত মধুর এবং ততটাই বিশ্বাসযোগ্যও ছিল"। এই মাধুর্য এবং ডাক্তারজীর মন ও ব্যবহার প্রত্যক্ষ করে, সমর্থ রামদাস সত্ত্বগুণের যে বর্ণনা করেছেন, সে কথাই মনে পড়ে —

"সকল জনাসী আর্জব। নাহীঁ বিরোধাচা ঠাব।
পরোপকারী বেঁচী জীব। তো সত্ত্বগুণ।।
পরাব্যাচে দোষগুণ। দৃষ্টীস দেখে আপণ।
সমুদ্রাঐসী সাঁঠবণ। তো সত্ত্বগুণ।।"
("সকলের প্রতি আরজি, বিরোধ না থাকে যেন।
পরহিতে অর্পিত জীব। তাকেই সত্ত্বগুণ জেন।।
নিজ দোষগুণ যে দেখে, সেই মতিমান্।
সাগর-সদৃশ শান্ত থাকাই সত্ত্বগুণ জেন।।")

সন্দেহ নেই যে ডাক্তারজীর মনও ছিল সমুদ্রের মতই বিশাল, মান অপমান সব অবস্থাতেই সমান থাকত।

হিন্দু সমাজে কারো দোষ অথবা অপরাধ দেখে ডাক্তারজী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন, আবার খনিক পরেই তাঁর ক্রোধ শান্ত হয়ে যেত। কিন্তু পরাধীনতা এবং হিন্দুদের উপর অত্যাচারের কথা শুনলে তাঁর সংযমের বাঁধ ভেঙে যেত এবং ক্রোধাগ্নি জ্বলে উঠত। তিনি অবশ্য সতর্ক থাকতেন যাতে এরকম প্রসঙ্গ সহসা যেন উপস্থিত না হয়। নাগপুরের 'সাবধান' সাপ্তাহিকে

সিন্ধু ও পাঞ্জাবের হিন্দুদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচারের সবিস্তারিত ও রোমহর্ষণকারী বর্ণনা প্রকাশিত হচ্ছিল। একবার 'সাবধান'-এর সম্পাদক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে ডাক্তারজী তাঁকে বললেন, "আমার মত লোকেদের পক্ষে এই সব অত্যাচারের বর্ণনা পড়াও কষ্টকর। আপনি লেখেন কেমন করে? আপনার অন্তঃকরণের কি মৃত্যু ঘটেছে?" একবার পুনায় তাঁর নিবাসকালে তাঁর ঘরে ধর্মবীর সম্ভাজী মহারাজের ছবি টাঙানো হল। ঐ ছবিতে দেখানো হয়েছিল যে বেদীর উপর দণ্ডায়মান ছত্রপতি সম্ভাজীর উপর চতুর্দিক থেকে বর্শা, উত্তপ্ত সাঁড়াসি, তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করা হচ্ছে এবং রক্তাক্ত দেহে সম্ভাজী নির্ভীক ভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ঘরে প্রবেশ করতেই ডাক্তারজীর দৃষ্টি ছবিটির দিকে আকৃষ্ট হল এবং তাঁর মুখ-চোখ ক্রোধে লাল হয়ে উঠল। তিনি একজন কার্যকর্তাকে ডেকে বললেন, "এই অপমান আমি সহ্য করতে পারছিনা," এই বলে ছবিটি সেখান থেকে সরিয়ে দিতে বললেন। সে সময় তাঁর মুখমণ্ডল অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠেছিল, এবং ছবি সরিয়ে দেবার পরেও বহুক্ষণ তিনি বিষণ্ণ হয়ে বসেছিলেন। একবার জনৈক স্বয়ংসেবক বিশেষ পশুর লোমের টুপি পরে এসেছিল। তিনি বললেন, "আজই এই টুপি পুড়িয়ে ফেল। অন্য কাউকে দিয়ে এই বিদেশী বস্তু ব্যবহারের পাপ তার উপর চাপিওনা।" যে কোন আলোচনা কালে ডাক্তারজী অত্যন্ত শান্ত-সংযত থাকতেন, কিন্তু কেউ যদি ধর্মের অপমান করতে শুরু করত, তাহলে ডাক্তারজী একেবারে রেগে উঠতেন। একবার জনৈক সজ্জন বললেন, "সঙ্ঘকে রেজিস্টার্ড করিয়ে নিন. তাহলে সবাই বুঝবে সঙ্ঘকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া উচিত।" একথা শুনে ডাক্তারজী জিজ্ঞেস করলেন, "এর অর্থ এই যে বিদেশী ইংরেজদের উপর আপনার বিশ্বাস আছে। নিজেদের লোকেদের উপর নেই। যদি আমাদের উপর কারো বিশ্বাস না থাকে তাহলে আমরা আমাদের পক্ষপাতশূন্য সেবা দিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করব যে শুধু পয়সাই নয়, সমাজ আমাদের সর্বস্ব দেবে।"

রেলগাড়ীতে ইংরেজ ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের জন্য সংরক্ষিত স্থান রাখার ব্যাপার তাঁর পছন্দ হতনা। কখনো-কখনো তাদের সঙ্গে রীতিমত মারধোর করেও তিনি ঐধরনের কামরায় ভ্রমণ করতেন। একবার ট্রেনের অন্য কোন কামরায় তিল-ধারণের স্থানও না থাকায় তিনি এই ধরনের এক সংরক্ষিত কামরায় জানালা দিয়ে প্রবেশ করলেন এবং দরজা খুলে দিয়ে অন্য যাত্রীদেরও ভিতরে বসিয়ে নিলেন। কামরার ইংরেজ যাত্রীরা ক্রুদ্ধ হয়ে জোরে চিৎকার শুরু করে দিল। কিন্তু ডাক্তারজী হার মানার লোক ছিলেন না। অতএব, ব্যাপারটা এতদূর গড়াল যে রেলের অফিসারদের ডাকা হল। স্টেশন মাস্টার গোরাদের পক্ষ নিয়ে ভিতরে বসে থাকা যাত্রীদের ধমক দিয়ে বলল, "নিচে নামো"। তার এই ধমকানি শুনে যাত্রীরা উঠে দাঁড়াতে গেল। তা দেখে ডাক্তারজী স্টেশন মাস্টারের থেকে জোরালো গলায় গর্জে উঠলেন, "কোথায় যাচ্ছেন? বসে পড়ুন।" এই দৃঢ় আদেশ শুনে সকলে নিজের নিজের জায়গায় বসে পড়ল। এই গুরু-গম্ভীর শব্দ শুনে ইংরেজ যাত্রীদেরও কথা বন্ধ হয়ে গেল এবং সকলে ঐ কামরাতেই বসে যাত্রা করতে পারলেন। এই অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে ডাক্তারজী ঠাট্টাচ্ছলে বলতেন, "একে বলে জনমত।"

বিদেশী প্রভুত্বের চিহ্নগুলি তাঁর একেবারে সহ্য হতনা। অতএব তিনি অনেকগুলি নামই বদলে দেন, যেমন, 'আলিপুর' কে 'শিবপুর', 'মঙ্গলুরপীর' কে 'মঙ্গলুরনাথ' নামকরণ করেন। 'মঙ্গলুরদস্তগীর'-এর নাম 'মঙ্গলুরদত্ত' এই নামে বিখ্যাত করে দিলেন এবং 'দাবলভক্ত' স্বয়ংসেবকের উপনাম পরিবর্তিত হয়ে 'গৌতম' হয়ে গেল। সঙ্ঘের মধ্যে তিনি দেশীয় খেলাগুলিকে প্রচলিত করেন এবং সংস্কৃত ভাষার আজ্ঞা, প্রার্থনা ও সংজ্ঞাসমূহের প্রচলন করেন। যদিও তিনি ভাষা-শুদ্ধির কোন স্বতন্ত্র আন্দোলনের প্রবর্তন করেননি — কিন্তু এমন স্বদেশাভিমানী স্বয়ংসেবক নির্মাণে তিনি অবশ্যই অগ্রদূতের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা স্বদেশী শব্দসমূহের ব্যবহারেই নিজেদের ধন্য মনে করতেন। তাঁর প্রতিটি লোমকূপে স্বদেশ ও স্বধর্মের স্বাভিমান ওতপ্রোত ছিল। এই কারণে স্বদেশী পালিশ যতদিন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি ততদিন তিনি তাঁর বেল্টের পিতলের অংশ সব সময়ে ইটের গুঁড়ো দিয়ে পরিষ্কার করে চক্‌চকে করে নিতেন। টুপিতে আগে যে চামড়া লাগানো হত, সেটা তাঁর পছন্দ ছিলনা। সেই কারণে বিনা চামড়ার স্বদেশী পশমের টুপির তিনি প্রচলন করেন। এইভাবে তাঁর প্রতিটি আচরণের মধ্যে 'স্বত্ব' তথা নিজস্বতা থাকত এবং তাঁর সম্পর্কে যারা আসত, এরকম প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে তার ছাপ পড়ত অবধারিতভাবে।

আমাদের সমাজের অভ্যুদয়ের জন্য অসংখ্য ব্যক্তি নির্মাণ করতে হবে, এই চিন্তাই ছিল তাঁর সব ব্যবহারের মূলে। তার মধ্যে তাঁর নিজের কোন ইচ্ছা তথা আকাঙ্ক্ষার স্থান ছিল না। 'ত্যাগ', 'আত্ম-সমর্পণ', 'স্বার্থের আহুতি' ইত্যাদি শব্দগুলির মূলেও অহংভাব নিহিত থাকে। ডাক্তারজী তো হিন্দুসমাজের জীবনের মধ্যে এমন একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর কাছ থেকে 'আমি-তুমি' এই মনোভাবই সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছিল।

নতুন প্রজন্মকে হাতে নিয়ে তাদের হিন্দু রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত করে ভাবী ইতিহাস নির্মাণের কর্তৃত্বের জন্ম দেন ডাক্তারজী। তিনি যখন এই কাজে আত্মনিয়োগ করে মনপ্রাণ ঢেলে সর্বতোভাবে মগ্ন হয়েছিলেন, তখন মাঝে-মাঝে লোকে প্রশ্ন করত, "এই সব ছেলে-ছোকরাদের দিয়ে কী কাজ হবে?" কিন্তু ডাক্তারজীর আত্মবিশ্বাস অটল ছিল। তিনি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছিলেন যে এই কাজের মাধ্যমে, শুধু এদের মাধ্যমেই রাষ্ট্রকে চৈতন্যযুক্ত করে তোলা সম্ভব হবে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের উদ্দীপনাময় উৎসাহের মধ্যে তিনি ভবিষ্যৎ কালের দিব্য চিত্র স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করছিলেন এবং এই নিশ্চিত বিশ্বাসের কারণেই তিনি সন্দেহপ্রবণ মানুষদের কাছে ডাঃ মুঞ্জের দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করতেন ঃ

"জহাঁ বালোঁ কা সঙ্গ, ওহাঁ ওঁহা বাজে মৃদঙ্গ।
জহাঁ বুড্‌ঢোঁ কা সঙ্ঘ, ওঁহা খর্চে সে তঙ্গ।।"
("যেখানে বালকদের সঙ্গ, সেখানে বাজে মৃদঙ্গ।
যেখানে বুড়োদের সঙ্ঘ, সেথা-খরচা ছাড়েনা সঙ্গ।।")

তিনি এই কাজে যেরকম নিমগ্ন হয়েছিলেন, অন্যরাও সেইরকম মগ্ন হোক, এটাই তাঁর স্বাভাবিক ইচ্ছা ছিল। তিনি অনেক সময় জিজ্ঞেস করতেন, "তোমাদের মাথায় সঙ্ঘের ভূত চেপেছে কিনা?" এই প্রশ্নের পিছনে এই মনোভাব ছিল যে যেমন ভূতের খপ্পরে পড়ে মানুষ

নিজেকে ভুলে যায়, নিজের রুচি-অরুচির কথা চিন্তা না করে মাথার উপর যে অতৃপ্ত আত্মা চেপে বসেছে তার ইচ্ছাকেই ব্যক্ত করে তদনুসারে সব আচরণ করে, সেই রকম সম্ভব সম্পর্কে হয় কিনা?

ডাক্তারজীর কর্মময় জীবনের বহুবিধ বর্ণাঢ্য চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে সব সময় এটাই মর্মপীড়ার কারণ হয়ে উঠে যে, শব্দ-সম্ভার দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ মহত্ত্ব প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শুধু এটুকুই বলতে হয় যে উপর থেকে শান্ত, কিন্তু অন্তরে জাজ্বল্যমান ডাক্তারজীর জীবন, বর্ণনা করার স্থানে, উপলব্ধি করার বস্তু ছিল। তাঁর সহকর্মীরা নিজেদের প্রচেষ্টার গতি যতই বাড়াক না কেন, কার্যপূর্তির সামর্থ্য, অভ্রান্ত প্রয়াসে এবং সাহসে তাঁরা ডাক্তারজীকে সব সময় চার পা এগিয়ে থাকতেই দেখতে পেতেন। কিন্তু ডাক্তারজী তাঁর ঐকান্তিক বৃত্তির এইরূপ পরিচয় কখনো দিতেন না যাতে কারো মনে হতে পারে যে আমরা যেহেতু তাঁর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারবনা, অতএব মাঝ রাস্তা থেকেই সরে যাওয়া বা মাথায় দুহাত চেপে বসে পড়াই ভালো। সাহস এবং গতিশীলতা নিয়ে এগিয়ে চলার প্রয়োজনীয়তা তিনি যেমন অনুভব করতেন, সেইরকম তিনি একথাও জানতেন যে নিজের সঙ্গে অন্যদেরও নিয়ে চলতে হবে। তিনি নিজে স্বয়ং সদা জাগ্রত থাকতেন এবং নিজের সঙ্গে অসংখ্য অনুগামীদেরও জাগিয়ে রাখতেন। সমাজের কোন ব্যক্তিকেই তিনি অনুপযুক্ত বলে মনে করতেন না। এবং সমাজের দোষত্রুটিগুলিকে নিজেরই মনে করে দিনরাত সেইগুলিকে দূর করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ডাক্তারজীর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে তাঁর থেকে বয়স, অর্থ-প্রতিপত্তি, জ্ঞান, ক্ষমতা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিক থেকে অনেক বড় মাপের মানুষও তাঁর অনুগামী হয়ে থাকার মধ্যেই আনন্দ এবং আক্ষরিক অর্থে জীবনের সার্থকতা অনুভব করতেন। তাঁর সান্নিধ্য যে ব্যক্তিই লাভ করেছে তারই মনে হত ডাক্তারজী সবাইকে ভালবাসেন ঠিকই, কিন্তু তার প্রতি তাঁর ভালবাসা সব থেকে বেশী। তাই, সমদর্শী ডাক্তারজী এই অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়েছিলেন বলেই তাঁর কথা মনে পড়লে অসংখ্য মানুষের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তাঁদের ভালবাসার অশ্রুতে অভিষিক্ত হয় ডাক্তারজীর দিব্য আত্মা এবং তেমন একটা অবস্থায় তাঁদের মুখ থেকে ডাক্তারজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির যে বাণী উৎসারিত হয় তার প্রতিটি শব্দ থাকে আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ, সার্থক হয় তাঁদের ডাক্তারজী-স্মরণ ও মনন।

তব অণু যদি হয় কণামাত্র তেজোময়।
অন্ধকার ভূমণ্ডল করে তুলি জ্যোতির্ময়।।
(কণ-কণ ভী যদি অণু মেঁ তেজ হো তুম্হারা।
চমকায়েঁ তিমির-ভরা ভূমণ্ডল সারা।।)

পরিশিষ্ট ঃ ১

পরমপূজনীয় ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের জন্মপত্রিকা

।। শ্রী গজাননঃ প্রসন্নঃ।।

।। শ্রী গণেশায় নমঃ।। স জয়তি।।

আদিত্যাদিগ্রহাঃ সর্বে সনক্ষত্রাঃ সরাশয়ঃ।

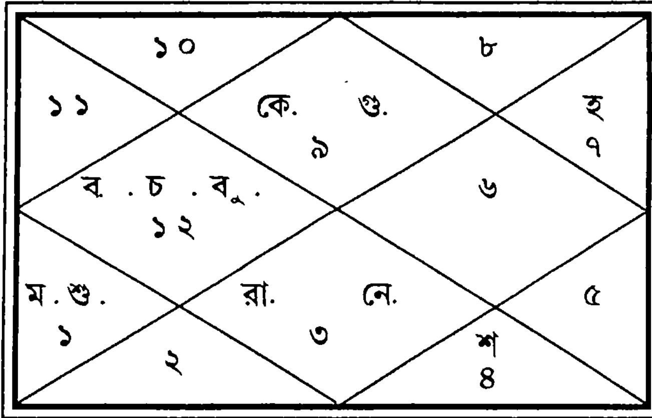
কুর্বন্তু মঙ্গলং তস্য যস্যৈষা জন্মপত্রিকা।।১।।

জননী জন্ম সৌখ্যানাং বর্ধিনী সর্বসম্পদাম্।

পদবী পূর্বপুণ্যানাং লিখ্যতে জন্মপত্রিকা।।২।।

স্বস্তি শ্রীমন্নৃপবিক্রমার্কসময়াতীত সংবৎ ১৯৪৫ তথা চ শ্রীমদ্ ভূপতিশালিবাহন শকে ১৮১০ সর্বধারীনাম সংবৎসরে উদগয়নে বসন্তর্তৌ মাঙ্গল্যপ্রদশুভকারিণি ফাল্গুনমাসে কৃষ্ণপক্ষে অমাবাস্যায়াং তিথৌ ঘ০ ২৫ প০ ২৯ পরং চৈত্রশুক্ল ১ রবিবাসরে শকে ১৮১১ বিরোধীনাম সংবৎসরে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে ঘ০ ১৪ প০ ৫৭ ব্রহ্মযোগে ঘ০ ৬ প০ ২৭ পরং ঐন্দ্রযোগে তাৎকালিকে কিংস্তুঘ্নকরণে এবমাদিপঞ্চাঙ্গ শুদ্ধাবত্রদিনে শ্রীমন্মার্তণ্ডমণ্ডলোদয়াদিষ্ঠ ঘ০ ৪৭ প০ ৩০ তৎসময়ে সকল ধৈর্য্যাদিগুণসম্পন্ন রাজমান্যরাজশ্রী বলিরামপন্ত হেডগেওয়ার তস্য ভার্যা কুলদ্বয়ানন্দদায়িনী সৌভাগ্যবতী রেবতী-তথা যমুনা-নাম্নী পুত্ররত্নং প্রাসূত।। অসৌ দেবদ্বিজ প্রসাদাদ্দীর্ঘায়ুর্ভূয়াৎ।। তস্য অবকহডাচক্রানুসারেণ রেবতীজন্মনক্ষত্রস্য দ্বিতীয় চরণানুগং দোমদেব ইতি জন্মনাম সুপ্রতিষ্ঠিতম্।। দেবগণঃ।। গজযোনিঃ।। অন্ত্যনাড়িঃ।। মীনরাশিঃ।। বর্জ্যবারঃ শুক্রবারঃ।। মঙ্গলমাহেশ্বরী শুভং ভবতু।

।। ইয়ং জন্মলগ্নকুণ্ডলিঃ ।।



শুভং ভবতু

জন্মস্থান — নাগপুর, তারিখ- ৩১ শে মার্চ, ১৮৮৯ মধ্যরাত্রির পরে ১ টা বেজে ১৩ মিনিট, অর্থাৎ জন্ম তারিখ- ১ লা এপ্রিল ১৮৮৯ এবং জন্মতিথি চৈত্র শুক্ল ১, শক সংবত- ১৮১১

পরিশিষ্ট ঃ ২

ডাক্তারজীর স্বহস্তে লিখিত পত্র

श्री [illegible] पुणें

ता. ८-५-३६

तीर्थस्वरूप

श्री. आबाजी यांस

कृतानेक सा. न. वि. वि. —

काल रोजीं श्री. [illegible] यांचेबरोबर पाठविलेलें ते पत्र पावलें असेलच. आज आपलें ता. ६-५-३६ चें श्री. कृष्णरावांचे मार्फतीचें पत्र मिळालें. वाचून आनंद झाला. इकडील सर्व काम ठीक चाललें असून सर्व लोक पूर्णपणें आनंदांत आहोत.

मी उद्यां ता. ९ रोजीं नागपूर मेलनें निघून मध्यंतरीं कुठेंही न थांबतां ता. ११ रोजीं सकाळीं नागपूरला येऊन पोंचेन. प्रत्यक्ष भेटीनें सर्व गोष्टी कळतीलच. कळावें

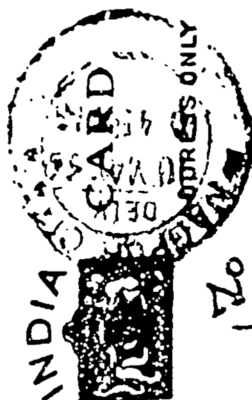
आपला — के. ब. हेडगेवार

পরম পূজনীয় ডাক্তারজী তাঁর কাকা শ্রী আবাজী হেডগেওয়ার দ্বারা প্রেরিত একটি পত্রের দু পিঠের আলোক চিত্র। এই পত্রে তাঁর দেবনাগরী হাতের লেখা ও স্বাক্ষর দেখা যাচ্ছে। পত্রের অন্য পৃষ্ঠায় তাঁর নাম ঠিকানা তিনি ইংরাজীতে লিখেছিলেন, তা থেকে তাঁর ইংরাজী হাতের লেখাও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পত্রে 'তীর্থস্বরূপ' শব্দের 'র্থ' এবং মাঝখানে 'মধ্যান্তরী' শব্দের 'ত' অক্ষর দুটি ফাইলে লাগাবার জন্য যে ছিদ্র করা হয়, তার জন্য কেটে গেছে।

পরিশিষ্ট ঃ ৩

পত্রের বিপরীত দিক





পরিশিষ্ট ঃ ৪

হেডগেওয়ার কুলপঞ্জি

